পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-অনুষদের অধীনে
বাংলা বিভাগ থেকে পি-এইচ. ডি. (আর্টস) উপাধি প্রাপ্তির জন্য
প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষণার বিষয়

অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিলোক : লেখকের আত্মদর্শনের বিচিত্র রূপের স্বরূপ সন্ধান

গবেষক

জয়ন্ত মিস্ত্রী

পঞ্জীয়ণ সংখ্যা : ১০০১৫৪০১১১১০২০০০৩

তারিখ : ৩০/১০/২০১৫

বাংলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

২০২০

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-অনুষদের অধীনে
বাংলা বিভাগ থেকে পি-এইচ. ডি. (আর্টস) উপাধি প্রাপ্তির জন্য
প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষণার বিষয়

অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিলোক : লেখকের আত্মদর্শনের বিচিত্র রূপের স্বরূপ সন্ধান

গবেষক

জয়ন্ত মিস্ত্রী

পঞ্জীয়ণ সংখ্যা : ১০০১৫৪০১১১১০২০০০৩

তারিখ : ৩০/১০/২০১৫

বাংলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

২০২০

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বেরুনানপুকুরিয়া, মালিকাপুর, বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগণা, কলকাতা- ৭০০ ১২৬
লক্ষ্যং বিশ্বমানম্
বাংলা বিভাগ

স্মারক নং .... তারিখ ....

Certificate from the Supervisor

This is to certify that the thesis entitled "অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিলোক : লেখকের আত্মদর্শনের বিচিত্র রূপের স্বরূপ সন্ধান", submitted by Jayanta Mistri, who got his name registered on 30th October 2015 for the award of Ph.D. (Arts) degree of West Bengal State University is absolutely based upon his on work under the supervision of Professor Mohini Mohan Sardar, Professor & Head, Department of Bengali, West Bengal State University, Barasat, Kolkata-700126 and neither his thesis nor any part of the thesis has been submitted for any degree or any other academic award anywhere before.

Signature of the Supervisor

(MOHINI MOHAN SARDAR)
Professor & Head, Department of Bengali,
West Bengal State University, Barasat, Kol-700126

Phone : 033 2524 - 1975, 033 2524 - 1976 ▪ Fax : 033 2524 - 1977 ▪ Email: wbsubregistration.org.

Declaration of the Ph.D. Scholar

I, Jayanta Mistri bearing PhD. Registration No. 100154011110200003, dated 30/10/2015, hereby declare that the work described in this thesis entitled : **"অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিলোক : লেখকের আত্মদর্শনের বিচিত্র রূপের স্বরূপ সন্ধান"** is enterely my own work. No portion of the work referred to in this thesis has been submitted in support of an application for another degree or qualification of this or any other university or institute. Any help or source information, which has been availed in the thesis, has been duly acknowledged.

(JAYANTA MISTRI)
PhD Scholar, Department of Bengali,
West Bengal State University, Barasat, Kol-700126

অধ্যায় বিভাজন

পৃষ্ঠা

প্রস্তাবনা ১০-১৬

প্রথম অধ্যায় ১৭ - ৭৫
অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তি পরিচয় ও রাহী জীবনের অনুসন্ধান

দ্বিতীয় অধ্যায় ৭৬ - ১৫০
দুলাল মুখোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক সত্তার অনুসন্ধান : বিচিত্র মানুষের জীবন-পরিচয় উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ

তৃতীয় অধ্যায় ১৫১ - ২৬২
বড়ো গল্প বা উপন্যাস-কল্প রচনার বিষয়ানুসন্ধান : বীভৎসতা, বিচিত্র নরনারী ও অশ্লীলতা প্রসঙ্গে অবধূত

চতুর্থ অধ্যায় ২৬৩ - ৩২০
গল্পকার অবধূত: চলমান জীবন-অন্বেষা ও রস নির্মিতির অনুসন্ধান

পঞ্চম অধ্যায় ৩২১ - ৩৬৬
ভ্রমণ-সাহিত্যিক দুলাল মুখোপাধ্যায় : ভারতের তীর্থক্ষেত্রের সাক্ষাৎদ্রষ্টা ও রূপদক্ষ শিল্পীর স্বরূপ সন্ধান

ষষ্ঠ অধ্যায় ৩৬৭ - ৪১১
দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য : দুর্গমে ও শ্মশানে অতীন্দ্রিয় অনুভবের স্বরূপ সন্ধান

সপ্তম অধ্যায় ৪১২ - ৪৬১
ফলকথা : একালে দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার

পরিশিষ্ট ৪৬২ - ৪৯৪

গ্রন্থপঞ্জি ৪৯৫ - ৫০৩

"**আ**রও স্পষ্ট করে বলতে হলে বলতে হয়---যাদের মন দেখতে পেয়েছি, তাদের কথাই ত শোনাতে চেয়েছি এ পর্যন্ত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে নিজেকে বাদ দিয়ে কারো কথাই যে শোনাতে পারি না। যাকে দেখেছি, তাকে কি অবস্থায় দেখেছি, কোন্‌খানে দেখেছি, এমন কি কি পেঁচালো পর্ব ঘটেছিল যার দরুণ তাদের মনের ছোঁয়াও পেয়েছি আমি, এ সমস্ত বলতে গেলে যে নিজের কথাও এসে পড়ে। চোখ দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, তা হয়ত রঙ-তুলি দিয়ে হুবহু আঁকা যায়। কিন্তু চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না তা যে দেখতে হয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে। সে ছবি রঙ-তুলিতে ফোটানো যায় কিনা, জানি না। কিন্তু কালি-কলমের সাহায্যে সে ছবি আঁকতে গেলে ঘটনা গুলোকে যে অবিকৃত অবস্থায় ছকে যেতে হয়---সে সময় আমি নামক হতভাগ্যটিকে বাদ দিই কেমন করে?"

---অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়

সুখ শান্তি ভালবাসা, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'কালিকানন্দ অবধূত' দুলাল মুখোপাধায়ের সন্ন্যাস জীবনে পাওয়া নতুন নাম। গ্রন্থকার হিসেবে তিনি লিখতেন কেবল 'অবধূত'। অবধূতের জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে প্রকাশিত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'দীপ্রকলম' (২০১০)-র ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত অবধূতের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা তাঁকে নিয়ে গবেষণা করতে আমাকে উৎসাহিত করে। 'দীপ্রকলম'-এ দেওয়া দূরভাষ নম্বর থেকে যোগাযোগ করি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর একজন সদস্য সম্মাননীয় প্রবীর আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি ও তাঁর ভাই শ্রদ্ধেয় সঞ্জয় আচার্য পরম আন্তরিকতায় আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় জ্ঞানদাসের পবিত্র আবির্ভাব-ধন্য ভূমি কাঁদড়ায়। পরবর্তীকালে অবধূত সম্পর্কে নানা তথ্য তাঁদের সহায়তায় আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। তাঁদের প্রতি আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো।

দশ বছর ধরে নানা তথ্য ও যুক্তির আশ্রয়ে বহু গুণীজনের সহায়তায় আলোচ্য গবেষণা-কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। প্রথাভিত্তিক ঋণস্বীকার করতে গিয়ে দেখছি সে ঋণের বোঝা বিস্তর! গবেষণা কর্মটির সম্পাদনে বহু মানুষের কাছে আমার ঋণ ; তাঁদের আন্তরিকতা ও সাহায্য এতটাই কাজে লেগেছে যে সত্যই সে ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত রইল।

অবধূত ও তাঁর রচনাবলি নিয়ে গবেষণা করার জন্য আমাকে আপ্লুত ক'রে কার্যকরী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন অধ্যাপক সম্মাননীয় মোহিনীমোহন সরদার মহাশয়। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক ও সৃষ্টিকর্মের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাকে উৎসাহ না দিলে এ কাজ আরম্ভই করা যেত না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর সময়োপযোগী পরামর্শ ও প্রেরণালাভে আমি উপকৃত হয়েছি। তাঁর যোগাযোগে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বিশেষ সহায়তা আমি পেয়েছি। বিষয়টিকে তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলতে তাঁর অভিজ্ঞতা আর পরামর্শ সবসময় কাজ করেছে। তিনি অনেক পরিশ্রমসাধ্য কাজ হাসি মুখে সম্পন্ন করে দিয়েছেন। তাঁর অবদান সর্বোতভাবে বক্ষ্যমাণ গবেষণা কর্মে ফলপ্রসূ হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভের নামকরণ ও অধ্যায় বিভাজনের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ও লক্ষ্যভেদী করতে তিনি বিস্ত র কষ্ট হাসি মুখে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। বয়সে তরুণ কিন্তু অভিজ্ঞতায় ও সহৃদয়তায় তিনি পরম শ্রদ্ধেয়। এই সুযোগে কৃতজ্ঞ চিত্তে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁকে জ্ঞাপন করলাম।

গবেষণা-কর্মে অবধূতের ব্যক্তি জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় ও নির্ভরযোগ্য বহু তথ্য পেয়েছি তাঁর চুঁচুড়ায় অবস্থিত জোড়াঘাটের বাড়িতে। এখানে তাঁর পুত্রবধূ সূচনা দেবী এবং জ্যেষ্ঠ পৌত্র তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় আমাকে অকৃত্রিম আন্তরিকতায় সাহায্য করেছেন বার বার।

অবধূতের আরাধ্যা দেবী ও তাঁর সন্ন্যাস-জীবনে ব্যবহৃত চিমটা এবং তাঁর অপ্রকাশিত বহু আলোকচিত্র দেখার সৌভাগ্য গবেষকের হয়েছে---এই পরিবারের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। পরিশিষ্ট অংশে 'অবধূতের পৌত্র তারাশঙ্কর ও অবধূতের পুত্রবধূ সূচনাদেবীর সাক্ষাৎকার' (সং-১২) শিরোনামে তাঁদের কষ্টসাধ্য সাক্ষাৎকার যুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে প্রথম দেখা করার ক্ষেত্রে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের (১৮৩১-১৮৯৪) পৌত্র শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রপৌত্র সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়। এছাড়াও অবধূত সম্পর্কে নানান তথ্য আমায় প্রদান করেছেন বহুবার। এই অবসরে তাঁদের প্রত্যেকের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যে ক'খানি গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে পেরেছি সেগুলি হলো : কোচবিহার রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরি, এ.বি.এন শীল কলেজ লাইব্রেরি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, বিধাননগর কলেজ লাইব্রেরি, চৈতন্য লাইব্রেরি, শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরি, বারাসাত সরকারি কলেজ লাইব্রেরি, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বেথুন কলেজ লাইব্রেরি, লিট্‌ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি এবং গবেষণা কেন্দ্র, রামমোহন লাইব্রেরি, জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, বিধাননগর সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, বারাসাত ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি, টাকি সরকারি কলেজ লাইব্রেরি, টাকি ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং জাতীয় গ্রন্থাগার। এই সব প্রতিষ্ঠানের আধিকারিক এবং কর্মিদের অকৃত্রিম সহায়তা আমি পেয়েছি বারবার। তাঁদের সেই উৎসাহ ও সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি এবং এই অবসরে তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক বাসব চৌধুরী এবং বিধাননগর কলেজের অধ্যক্ষা সম্মাননীয়া মধুমিতা মান্না মহাশয়দ্বয়ের অনুপ্রেরণা ও বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের উৎসাহ উদ্রেককারী বক্তব্যে আমি উৎসাহিত হয়েছি বারবার এ প্রসঙ্গে তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

বিভিন্ন গুণীজনের আমাকে পরামর্শদান প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে শ্রদ্ধেয় কবি সব্যসাচী দেবের কথা। রামমোহন লাইব্রেরির সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে ওনার পরিচিতি আমার কঠিন পথকে সুগম করেছে। আমার পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গগত শিক্ষক অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মহাশয়ের পরামর্শ ও সাহায্যে এই গবেষণা কর্মটি ঋদ্ধ হয়েছে। তাঁকে আমি প্রণাম জানাই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী মহাশয়ার পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ভোলার নয়, গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁর সেই অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি এবং তাঁকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। সস্নেহ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সরকারি কলেজের ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় সুব্রত পাণ্ডা মহাশয়ের সস্নেহ আশীর্বাদ প্রথমাবধি আমাকে ধন্য করেছে। তাঁকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বিধাননগর মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রদ্ধেয় উদয়শংকর বর্মা এবং ইংরাজি বিভাগের প্রধান

শ্রদ্ধেয় তপোময় দাস মহাশয়দ্বয় গবেষণাকর্মের প্রাথমিক সূত্র, কার্যকরী তথ্য ও সক্রিয় সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন---তাঁদের সেই ঋণ আমি স্বীকার করি।

স্বল্প পরিসরে সকলের কথা লেখা যায় না কিন্তু মনে তাঁদের সম্মানীয় স্থান অস্পষ্ট হওয়ার নয়। এত রকমের সাহায্য ও অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও স্বীকার করি এই গবেষণাকর্মের যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে গেল তা সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের; যা কিছু সুন্দর স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন, আমি জানি, তা সম্ভব হয়েছে উপরি-উক্ত গুণী মানুষদের সাহায্যের জন্য। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেও কম হয়। এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমার পরিবারের সদস্যদের সাহায্যও কম নয়, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এই অবসরে সেই ঋণ স্বীকার করছি।

জয়ন্ত মিস্ত্রী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৬

প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষায় সার্থক উপন্যাসের সৃষ্টি সম্ভাবিত হয়েছিল ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের অবদানে এর কত না বিস্তার! এই ধারায় অবধূত একদা বহুশ্রুত এবং বর্তমানে অল্পশ্রুত একটি নাম। অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায় আঠারো বছরের 'রাহী' বা পথিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সমাজ জীবনের নানা বিচ্যুতিকে অবলম্বন করে তিনটি গল্পসংকলন ও সাতাশটি উপন্যাস মিলিয়ে মোট ত্রিশটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৬ ---এই বাইশ বছর তিনি স্বারস্বত সাধনায় মগ্ন ছিলেন। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, অদ্ভুত,এবং বাৎসল্য রসের ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ তবু 'ভয়ানক' ও 'বীভৎস'–এই দুটি ব্যতিক্রমী রসের লেখক হিসেবেই তাঁর একান্ত পরিচিতি। সেইসাথে সমকালে অশ্লীল বিষয়ের উপস্থাপক হিসেবে অনেকের কাছে তিনি নিন্দিত। এ কথা সত্য যে পতিতা-জীবন, পঞ্চাশোর্ধ্ব পুরুষের অসংযম, কোনো কোনো নারীর ব্যাভিচার এবং অনেক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অসংযম ইত্যাদি তাঁর রচনায় এসেছে। শুধু অবলম্বিত বিষয়ের কারণেই কোনো লেখক নিন্দিত হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না। অন্তত এসব প্রসঙ্গ উত্থাপনের অনিবার্যতাকে তাঁর রচনার ক্ষেত্রে বিচার করতেই হয়। তদুপরি আমাদের মনে হয়েছে, যদি তাঁর সৃষ্টিলোকের নিস্পৃহতা ও প্রকাশের সংযম নিন্দুকের চোখ এড়িয়ে না যেত, তাহলে তিনি অবশ্যই সুলেখক হিসেবে প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হতেন না। কালের বিচারে[১] অমোঘ সত্য একদিন উঠে আসবেই। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভ 'অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিলোক : লেখকের আত্মদর্শনের বিচিত্র রূপের স্বরূপ সন্ধান' অংশে আমরা সেই প্রচেষ্টাই করতে চেয়েছি।

অবধূত সম্পর্কে এর আগেও কাজ হয়নি এমন নয়, কিন্তু অকর্ষিত থেকে গেছে অনেক জায়গাই। এ প্রসঙ্গে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করতে চাই অবধূতকে নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করেছেন অবধূত শতবর্ষে 'দীপ্রকলম'[২], 'জাগরণ'[৩] 'কথাসাহিত্য'[৪], এবং 'প্রসাদ'[৫] প্রভৃতি নামের সাহিত্যপত্রিকা। আমরা আমাদের প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভে সাতটি অধ্যায়ে আলোচনাটিকে বিন্যস্ত করতে চেয়েছি এবং অধ্যায়গুলির সারকথা থেকে আমরা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টাও করেছি।

পরাধীন ভারতে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে অবধূত এক অত্যাচারী সাহেবকে হত্যা করেছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়াও পোর্টট্রাস্ট এর স্টোর-কিপারের চাকরি-রত অবস্থায় রেবতীমোহন ছদ্মনামে অস্ত্র কিনতেন ও বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ

করতেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। কিছুদিন পরে পুলিশ তাঁকে সন্দেহ করলে তিনি পালিয়ে যান। একদিন ঝড়জলের রাতে যখন নৌকায় ক'রে উত্তাল ঢেউ আর রাতের অন্ধকারের আড়ালে তিনি পদ্মা পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন পুলিশ তাকে গুলি করে। মাঝ নদী থেকে নৌকা ফিরিয়ে আনিয়ে নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। পুলিশের বিশ্বাস হয় যে, তাদের ছোঁড়া গুলি খেয়ে পদ্মার স্রোতে ভেসে গেছে আসামীর লাশ। পুলিশের খাতায় দুলাল মুখোপাধ্যায় মৃত বলে ঘোষিত হন। এদিকে অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তারী এড়াতে নানা ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকেন। এ সময় তিনি সন্ন্যাসীর ভেকও ধারণ করেছিলেন। পরে সন্ন্যাস-জীবনে আগ্রহী হয়ে কেটে যায় তাঁর জীবনের আঠারোটি বছর। নানা ব্রত নিয়ে নানা তীর্থে তিনি এসময় ঘুরে বেড়িয়েছেন। নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল এসময়। অন্যদিকে অবধূত নিজের পরিচয় লুকাতে চেয়েছিলেন বলে তাঁর জীবন সম্পর্কিত অনেক কিছুই আমরা জানতে পারিনি। তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে আমরা অনুসন্ধান করতে চেয়েছি অবধূতের ব্যক্তি জীবন ও তাঁর সৃষ্টিলোককে।

আমাদের গবেষণা প্রকল্পের প্রধান অভিপ্রায় দুলাল মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তি জীবন অনুসন্ধান ও তাঁর জীবনের নানান অভিজ্ঞতার উদ্ধার। তাই তিনি কীভাবে সাহিত্যিক হলেন এবং কতগুলি উপন্যাস, গল্প এবং নভেলা বা উপন্যাস-কল্প রচনা করলেন তার পরিচয় উদ্ধার ও তারসৃষ্টির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা আমাদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আমাদের গবেষণার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত এমন নানা প্রসঙ্গ বারে বারে এসে পড়েছে। তাই সাতটি অধ্যায়ে আমরা অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর কথাসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রতিটি অধ্যায়কে আবার বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে কয়েকটি করে উপ-অধ্যায়ে ভাগ করতে হয়েছে। সমকালে পাঠক সমাজে অবধূত যেমন অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তেমনি ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকারও হয়েছিলেন তিনি। এইসব নিন্দা ও সমালোচনার সন্ধান ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে আমরা লেখকের 'সৃষ্টিলোকের স্বরূপ' স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি।

পাঁচটি সংকলন গ্রন্থ সহ মোট ঊনপঞ্চাশটি গ্রন্থ অবধূত-এর রচনা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা তাঁর রচিত কথাসাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা নির্মাণ করার চেষ্টা করেছি। তবে সবকটি গ্রন্থ আমরা পাইনি। কয়েকটি গ্রন্থ আবার একাধিক নামে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছে। বর্তমানে অবধূতের প্রতি গবেষক ও সাধারণ পাঠকের আগ্রহ বাড়ছে অতএব দুস্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি---যা আমরা উদ্ধার করতে পারিনি তা নিশ্চয়ই আবার কেউ না কেউ উদ্ধার করবেন। তাঁর যন্ত্রস্থ গ্রন্থগুলিও নিশ্চয়ই প্রকাশিত হবে; তখন অবধূতের যথার্থ মৌলিক গ্রন্থ ক'টি সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা যাবে। এখন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলে আমরা অবধূতের কোন্ কোন্ গ্রন্থ উদ্ধার করতে পেরেছি আর কী কী গ্রন্থ উদ্ধার করতে পারিনি সে কথা তথ্যসহ বলবার চেষ্টা করেছি পরিশিষ্টে। বর্তমান প্রসঙ্গে অবধূতের ত্রিশটি সার্থক উপন্যাস,উপন্যাসকল্প রচনা এবং গল্পসঙ্কলন বিশ্লেষণ করে অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিলোক : লেখকের আত্মদর্শনের বিচিত্র রূপের স্বরূপ সন্ধান' ---এই গবেষণা

প্রকল্পটিকে ধাপে ধাপে তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রয়াস করেছি।

অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ'(১৯৫৪)'উদ্ধারণপুরের ঘাট' (১৯৫৬) এবং 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫) বাংলাসাহিত্যের অসামান্য গ্রন্থ। তাঁর স্রষ্টাব্যক্তিত্বকে বুঝে নেওয়ার জন্য প্রতিনিধি স্থানীয় রচনা হিসেবে এ গুলিকে গ্রহণ করা যায়। গবেষণা অভিসন্দর্ভে একই 'জাঁর'(genre)-এর আর পাঁচখানা বইয়ের সঙ্গে তুলনা মূলক সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতিতে দুলাল মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলির বিচার করা সম্ভব হয়নি। কারণ অবধূতের সমগোত্রীয় গ্রন্থ অপ্রতুল। তাই মূলত বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা পদ্ধতিকে গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলী 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' (১৯৬৫) উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন :

> "অবধূত যখন তাঁর 'মরুতীর্থ' নিয়ে মুরুব্বীহীন হালে নিঃশব্দে বাংলাসাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেন তখন উভয় বাঙলার বাঙালী পাঠক মাত্রই যে বিস্মিত হয়েছিলেন সে-কথা নিশ্চয়ই অনেকের স্মরণে আছে। এ তো মরুতীর্থ নয়, এ যে রসে রসে ভরা 'রসতীর্থ'। ...অবধূত যদি তাঁর কল্পনা তাঁর সৃজনীশক্তি, তাঁর স্পর্শকাতরতা মরুতীর্থের পাতায় পাতায় ঢেলে না দিয়ে থাকতেন তবে পুস্তকটি রসহীন মরুই থেকে যেত। বড় জোর সেটা হত গাইড বুক্। ...'পালামৌ'-র পরই 'মরুতীর্থ। এবং তার পরও তাকে কেউ আসনচ্যুত করতে পারেনি।"

'উদ্ধারণপুরের ঘাট' (১৯৫৬) উপন্যাসটিকে সমকালে বিদগ্ধজনেরা কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার কয়েকটি নমুনা[৬] এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে :

১. "অলংকার শাস্ত্রে যে নবরসের উল্লেখ আছে তার মধ্যে ভয়ানক ও বীভৎস রস লেখকেরা যথাসাধ্য পরিহার করে থাকেন। আপনার নূতন গ্রন্থে এই দুই রসই প্রধান অবলম্বন এবং তা দিয়েই আপনি পাঠককে সম্মোহিত করেছেন, শেষ পর্যন্ত কোনো আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন নি।" ---রাজশেখর বসু।

২. "আপনার 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' পড়ে চমৎকৃত হয়েছি।...কেবল বিষয়বস্তু অসাধারণ বলে নয়, আপনি তাকে যে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন, তা অনন্যসাধারণ। সে রূপের বৈচিত্র্যে বাংলাসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে।" ---অতুলচন্দ্র গুপ্ত

৩. "অদ্ভুত বই আপনি লিখেছেন। ...মড়ার গদী আর তার সমস্ত বাতাবরণের মধ্য থেকে নিতাই বোষ্টমীর কথাটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ...সার্থক আপনার দৃষ্টিশক্তি,আরও সার্থক আপনার রসসৃষ্টি।" ---সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪. "বাংলা কথাসাহিত্যে অবধূতের আবির্ভাব এক বিস্ময়। নির্লিপ্ত বর্ণনাভঙ্গীতে এবং বিষয়ের নূতনত্বে তিনি গতানুগতিকতার পল্বল-সলিলে আলোড়ন তুলিয়াছেন। ...উদ্ধারণপুরের ঘাটে ...যে আলেখ্য তিনি আঁকিয়াছেন তাহা বাংলাসাহিত্যে সর্বৈব নূতন।" ---সজনীকান্ত দাস।

৫. 'লেখক আশ্চর্যরূপ সার্থক রূপক-ব্যঞ্জনায়, উপাদান বিন্যাসের অদ্ভুত কুশলতায়,... চতুর্দিকে হিল্লোলিত কামনা-তরঙ্গের চঞ্চল ছন্দে, প্রতিবেশের স্থূল বাস্তবতা ও

সূক্ষ্ম ভাবসঙ্কেতের সাহায্যে ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলাসাহিত্যের সর্বপ্রথম ...শ্মশানের মহাকাব্য রচিত হইয়াছে।'' ---শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা করে তবে নিস্কৃতি পায়'। অবধূতের 'দুর্গমপন্থা' (১৯৬০), 'মায়ামাধুরী' (১৯৬০),'ভূমিকালিপি পূর্ববৎ' (১৯৬০), 'নিরাকারেনিয়তি' (১৯৬৩), 'ফক্কড়তন্ত্রম্' (১৯৬৮), 'দেবারীগণ' (১৯৬৯) ---ইত্যাদি কথাসাহিত্য সম্পর্কে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাকে স্মরণে রেখে সাহিত্যরসের বিশ্লেষণ ও চরিত্র নির্মাণের সার্থকতা ও ব্যর্থতার দিকগুলি নির্দেশ করেছি। আমরা লক্ষ করেছি কোনো সমালেচকই অবধূতের সৃষ্টিক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন করেননি। সংশয় প্রকাশ করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় নির্বাচন নিয়ে। অর্থাৎ সবার নজরে এসেছে যে অবধূতের সৃষ্টিলোক যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। অবধূতের শব্দ-চেতনা, চরিত্রনির্মাণ,কাহিনি পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমরা এই গবেষণা পত্রে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রধান বাধা হলো সমকালীন লেখকদের বাস্তবভূমিকে গ্রহণ করেও রসনির্মিতির ক্ষেত্রে ও রসপরিণতির জায়গায় দুলাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন স্বতন্ত্র। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র বা কাহিনির স্বাভাবিক পরিণতিকে তিনি কেবল আদর্শের দোহাই দিয়ে সমাজের মুখ চেয়ে বদলে দিতে চাননি। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে আদর্শের পক্ষপাত এবং আত্মপ্রচার তাঁর রচনায় আছে কি-না থাকলেও তার মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ঘটেছে কি-না তা আমরা বলবার চেষ্টা করেছি।

লেখকের পথিক সত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে স্রষ্টার কী প্রভাব পড়েছে তা আমরা তাঁর রচনার ক্ষেত্রে লক্ষ করেছি। ভ্রমণমূলক রচনাগুলিতে তো বটেই অন্যান্য উপন্যাসের চরিত্রগুলির গভীরে তিনি যে যেতে চান নি তাও লক্ষ করেছি আমরা। পথের দেখায় যতটুকু চোখে পড়ে ততটুকুই তিনি বলেছেন, আমাদের গবেষণায় স্রষ্টার এই বৈশিষ্ট্য সাধারণ সত্য হিসেবে উঠে এসেছে বারে বারে। 'শুভায়ভবতু' (১৯৫৭), 'সাচ্চা দরবার' (১৯৬০), 'পথভুলে' (১৯৬২), 'হিংলাজের পরে' (১৯৬২), 'টপ্পাঠুংরি' (১৯৬৯), 'ভোরের গোধূলি' (১৯৬৯), 'পথে যেতে যেতে' (১৯৭৬) ---ইত্যাদি উপন্যাসে এই ধারাকে আমরা অবধূতের রচনার একটি সাধারণ সূত্র হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করেছি। অনেকসময় অনেক লেখক সময় দিয়ে কোনো চরিত্রকে তৈরী করলেও তা আমাদের মনে দাগ কাটে না আবার অবধূতের লেখার প্রধান গুণ এই যে, তিনি অল্প ঘটনা ও কথার মাধ্যমে এমন সব চরিত্র নির্মাণ করেছেন, যাদের পাঠক মনে রাখেন। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' (১৯৫৪) উপন্যাসের শতজীর্ণ পোশাকের মূর্তিমান খিদের মত নিরন্ন কুয়োমালিক কিম্বা শেরদিলের মত সাহসী ও অতিথিপরায়ণ চরিত্রকে অল্প সময়ের জন্য দেখলেও ভোলা সম্ভব নয়।

অবধূতের রচনার প্রধান অবলম্বন বাস্তব অভিজ্ঞতা এটা যেমন আমরা বিশ্লেষণ করে তথ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছি তেমনি তিনি যে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে, তাঁর লেখা চরিত্র বা কাহিনির ওপর আরোপ করতে আগ্রহী নন---সেটিও লক্ষ করেছি আমরা। প্রসঙ্গত দেখাতে চেষ্টা করেছি

যে,তিনি তাঁর দেখার জগৎ থেকে বিষয় ও ব্যক্তিকে নিয়েছেন এবং তাদের অপ্রয়োজনীয় অংশ ছাঁটাই করেছেন ,তাতেই তাঁর কথাসাহিত্য উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অথচ নিজের আদর্শ চাপিয়ে বা কল্পনার যোগ ঘটিয়ে চরিত্রগুলিকে অবিশ্বাস্য করে তোলেন নি। ভিলেন ততটুকুর জন্যই ভিলেন যতটুকু বাস্তবে ঘটেছে। ভিলেনের চরিত্রে কুটিল স্বভাব আরোপ করে ভিলেনটিকে গাঢ় রঙে আঁকার চেষ্টা করেননি তিনি। 'টপ্পাঠুংরি'-র বদন বাগচী, 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এর 'সিঙ্গী মশাই ও আগম বাগীশ, 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী'-র পরশুরাম মিত্তির, 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' -এর বিদুর বাবা ও খাণ্ডারণী মহিলা---প্রমুখ চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই এ কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। 'বহুব্রীহি' (১৯৬৪) গল্পের 'বহুব্রীহি' চরিত্রটিকেও তিনি ভোগলিপ্সার জগৎ থেকে সরিয়ে এনে সেবার কাজে যুক্ত করেছেন ---একে আমরা সাধারণত 'পোয়েটিক জাস্টিস' বলে থাকি।

'নীলকণ্ঠ হিমালয়' (১৯৬৫) উপন্যাসে মা আনন্দময়ী কথক অবধূতের জিহ্বাকে অলিজিহ্বার সাথে আটকে দিয়েছিলেন। হিমালয়ের রাস্তায় ও বিভিন্ন আশ্রমে তিন বছরের এই মৌনতা তাঁর দর্শনেন্দ্রিয়কে আরো সজাগ করে সবকিছুকে দেখতে সাহায্য করেছিল। লেখার ক্ষেত্রেও যেন সে স্বভাব কাজ করেছে। তিনি সাহিত্যে যে রূপ নির্মাণ করেছেন আর পরিবেশকে যেভাবে রূপ দিয়েছেন তাতে কথার ব্যবহার একান্তভাবে প্রয়োজন মাফিক। সব তাঁর নজরে থাকা সত্ত্বেও মা কালী যেমন জিভ কামড়ে আছেন ঠিক তেমনিভাবে লেখক অবধূত তাঁর রচনায় বিচিত্র চরিত্রকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে অবধূত তাঁর রচনার কাহিনি ও চরিত্রকে এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে পাঠক তা পড়ে চরিত্র আর পটভূমিকে শুধু উপলব্ধি করেন না; যেন চোখের সামনে দেখতেও পান।

অবধূতের কথাসাহিত্যের বড়ো বিষয় হলো তাঁর ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই তিনি কাহিনির পটভূমি আর চরিত্র নির্মাণ করেই তিনি পাঠকের ওপর ছেড়ে দেন। কাহিনিকে লেখক টেনে বাড়িয়ে এগিয়ে নিতে চান না। পাঠ প্রতিক্রিয়ায় নিজের মত করে বুঝে নেন পাঠক। অবধূতের সাহিত্যরচনার এই ভাষাগত পরিচয় সন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একেই আমরা 'রূপদক্ষতা' বলেছি। অবধূতের সৃষ্টিলোকের এই সার্থক প্রবণতা তাঁর লেখা বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা সন্ধান করার চেষ্টা করেছি আমরা।

বিপরীতধর্মী জীবন-আচরণ থেকে তৃতীয় এক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে। আমরা একে অবধূতের চরিত্র নির্মাণের বহুল ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছি। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' (১৯৫৬) উপন্যাসে চরণদাস গোঁসাই, নিতাই বোষ্টমী ও খন্তা;'মায়ামাধুরী' (১৯৬০) উপন্যাসে পুরুষোত্তম, প্রহেলিকা ও বভ্রুবাহন; 'কৌশিকী কানাড়া' (১৯৬৩) ---উপন্যাসে গোপিকারমণ দস্তিদার ও যশোদা; 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' উপন্যাসে প্রিন্সিপ্যাল ওরফে বিন্দুবাসিনী দেবী ও আলো বন্দ্যোপাধ্যায়; 'শুভায়ভবতু' (১৯৫৭) উপন্যাসে ব্রজমাধব চৌধুরী, দুরি বৌদিও দুরি বৌদির স্বামী এবং 'টপ্পাঠুংরি' (১৯৬৯) উপন্যাসে নিশিকান্ত দা, অনুপম ও সানুদি ওরফে সান্ত্বনা ভট্ট প্রমুখ এর উদাহরণ।

কথাসাহিত্যিকদের ভাষাভঙ্গি কি ব্যক্তি-নির্দিষ্ট---এই প্রশ্নটি বক্ষ্যমাণ গবেষণা অভিসন্দর্ভে

অবধূতের ক্ষেত্রে সন্ধান করেছি আমরা। যে ভাষায় একাকী গোঁসাই উদ্ধারণপুরের নির্জন শ্মশানে বসে আকাশের তারা, গঙ্গার বাতাস আর নিস্তব্ধ রাতের রূপ দেখেন আর তার মায়াবী খেলার পরিচয় পাঠককে শোনান সে ভাষায় তো আর সিঙ্গী মশায়ের পচা গলা শব আনা কেঁধো কাহারদের সঙ্গে কিম্বা পাঁচ হাত লম্বা খন্তা ঘোষের সাথে কথা হয় না! এমনকি পথভুলে’ -র মত উপন্যাসের হাস্য রসিকতাময় সংলাপমুখ্য রচনার সঙ্গে ‘নীলকণ্ঠ হিমালয়’ হিংলাজের পরে’ –ইত্যাদি উপন্যাসের ভাষার মিল পাওয়া যায় না। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি অবলম্বিত বিষয়-অনুসারেই অবধূত বার বার ভাষাকে বদল করেছেন তাই তাঁর নিজস্ব ভাষা ছাঁদ তৈরী হয়নি। আমরা বলতে চেয়েছি দক্ষ ভাষা-শিল্পীর উপযুক্ত সৃষ্টিলোকের অধিকারী ছিলেন তিনি। ‘সপ্তস্বরা পিনাকিনী’, ‘সাচ্চা দরবার’, ‘কলিতীর্থ কালীঘাট’, ‘নীলকণ্ঠ হিমালয়’, ‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’, ---প্রভৃতি উপন্যাসের সর্বত্র দেখি ভদ্র-সভ্য সুধী জনের ভাষা আর অপরাধ জগতের ভাষা এক নয়। আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি ভাষা স্রষ্টার নয়, ভাষা সৃষ্ট চরিত্রের আর পরিবেশের সঙ্গে লাগসই করে নির্মাণ করার ক্ষেত্রেই আসল সার্থকতা লুকিয়ে থাকে। অবধূত সেই কাজটি সাফল্যের সঙ্গেই করেছেন নাকি ব্যর্থ হয়েছেন গবেষণায় সেকথা গুরুত্বসহ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি আমরা।

আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি অবধূত তাঁর কাহিনিকে এবং চরিত্রকে বাঙলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। অধিকাংশ রচনার ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন প্রদেশে ও নানা ভাষাভাষির মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। এই ভৌগোলিক সীমা পূর্বে বাংলাদেশ, পশ্চিমে কচ্ছ, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত।

তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বা বটুকসিদ্ধ যোগী---যে পরিচয়ই হোক না কেন তাঁর রচনার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সক্রিয় ছিল তা আমরা লক্ষ করেছি। অবধূতের আত্মদর্শনের বিচিত্র রূপ আমরা তাঁর অধিকাংশ রচনার ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি। তিনি একদিকে যেমন নির্লিপ্ত অন্যদিকে তেমনি দয়াশীল। নিজের মধ্যে তিনি যেমন নানা সত্তাকে আবিষ্কার করেছিলেন তেমনি তাঁর রচিত সাহিত্যে সেই আত্মদর্শনের বিচিত্র রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’-এ থিরুমলের মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য কুন্তীর অসহায় আত্মধিক্কার ও আত্মপীড়নের সময়ে সহযাত্রী গোকুলদাসের কামলোলুপতাকে তিনি ক্ষমার চোখে দেখেছেন। আবার ‘টপ্পাঠুংরি’ তে অনুপম তার কৃত অন্যায়ের জন্য মায়ের পায়ে বলি হয়ে গেল নিশিকান্তদার ক্রোধে। অবধূত এখানে পাপের দণ্ড বিধান করেছেন। ‘নীলকণ্ঠ হিমালয়’ উপন্যাসে লাঙ্গুলবাড়িয়ার জিতেন সাধু, বজ্রগিরি, বিদুর মহারাজ, প্রমুখ চরিত্র তাঁর বিচিত্র জীবন দর্শনের প্রতীক। চির পথিক সত্তা অবধূতের জীবনে যেন নানা বিচিত্র ভাবের সমাবেশ ঘটিয়েছে। আমরা আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে অবধূতের সেই বিচিত্র মানস প্রবণতাকে উদ্ধার করার প্রয়াস করেছি। সবমিলিয়ে আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা অবধূতের সৃষ্টিলোকের নির্লিপ্তি ও আত্মদর্শনের বিচিত্র স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য

১. সর্বগুণ সম্পন্ন কবি কালিদাস সম্পর্কেও একটি অসম্পূর্ণ মূল্যায়ন সাহিত্য সমাজে শ্লোকবদ্ধ হয়ে অমরতা পেয়ে গেছে। ‘উপমা কালিদাসস্য’–এই মূল্যায়ন কবির মহত্বকে ক্ষুণ্ন করে। মনে হয় যেন উপমা অলঙ্কারের সার্থক ব্যবহারই কালিদাসের একমাত্র গুণ। প্রবাদ-প্রতিম এই শ্লোকে যেন তাঁর কাব্যদেহের সুঠাম সুমিতি উপেক্ষিত হয়ে কেবল অলঙ্কার-সৌন্দর্যই প্রাধান্য পায়। বর্তমানে কালিদাসের যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে।

২. শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দীপ্রকলম (১০ম বর্ষ, ৩৮তম প্রকাশ, এপ্রিল সংখ্যা, ২০১০) সাহিত্য পত্রিকা অবধূত বিষয়ে সমকালের ও একালের লেখকের আলোচনা প্রকাশ করেছে।

৩. জাগরণ পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় অবধূত বিষয়ে তাঁর সমকালের ও একালের বিভিন্ন লেখকের আলোচনা প্রকাশ করা হয়েছে বার বার। এছাড়াও ‘জাগরণ’ ৪র্থ বর্ষ,উৎসব সংখ্যা, ১৪০৯ -তে ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ বিষয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

৪. শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ‘কথাসাহিত্য’ (৬১ বর্ষ, বইমেলা সংখ্যা, ১৪১৫) সাহিত্য পত্রিকা অবধূত বিষয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর আলোচনা প্রকাশ করে।

৫. অবধূত জন্ম শতবর্ষের উদ্‌যাপন : প্রসাদ পত্রিকা, এপ্রিল ২০০৯, দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৬৯, চিত্র নং-৭

৬. অবধূত, ‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’ মিত্র ও ঘোষ, ১৯৫৬ গ্রন্থের পশ্চাৎ প্রচ্ছদ পত্রে উক্ত বিভিন্ন মন্তব্যগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৯৪; চিত্র নং-৩১

প্র থ ম অ ধ্যা য়

অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তি পরিচয় ও রাহী জীবনের অনুসন্ধান

প্র থ ম অ ধ্যা য়

অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তি পরিচয় ও রাহী জীবনের অনুসন্ধান

	পৃষ্ঠা
এক. অবধূতের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট	২০ - ২৮
দুই. অবধূতের ব্যক্তি পরিচয় ও বংশলতিকা	২৯-৩৮
তিন. কথা-সাহিত্য রচনার কাল	৩৮ - ৪৬
চার. লেখকের আত্মদর্শন ও 'রাহী' জীবন	৪৭ - ৭৫

প্র থ ম অ ধ্যা য়

অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তি পরিচয় ও রাহী জীবনের অনুসন্ধান

ভূ মি কা

গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের (০২.১১.১৯১০-১৩.০৪.১৯৭৮) সম্পর্কে আমরা যা বলেছি তার ভর অবধূতের কথাসাহিত্য আর ঝোঁক অবধূতের ব্যক্তিসত্তাকে খুঁজে বার করা। এই অধ্যায়ে গবেষণার নির্যাস হিসেবে আমরা বলতে পারি ইনি ব্যক্তিজীবনে অতিথিবৎসল, পরোপকারী, দেশভক্ত, তন্ত্রসাধক ও তত্ত্বদর্শী। বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী এবং সংস্কৃত ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। ভারতের পুরাণাদির সাথে নন্দনতত্ত্বের উপরেও অবধূত যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন। ধর্মকে তিনি ব্যক্তিগত স্তরে রেখেছেন। জনসাধারণের সাথে চলার ক্ষেত্রে ধর্মাচার অন্তরায় হয়নি। ‘ধর্ম’ যখন তাঁর রচিত সাহিত্যের অবলম্বিত বিষয় হিসেবে এসেছে তখন শিল্পীর স্বভাব-সুলভ রসিকতা সেখানে বজায় রেখেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যে অন্ধভক্তি আর অলৌকিকতা প্রশ্রয় পায়নি। ‘রাহী’ বা ‘পথিক জীবনে’ অবধূত দক্ষিণভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন কি-না তা তাঁর লেখা থেকে আমরা জানতে পারিনি। তবে উত্তর ভারতের অধিকাংশ তীর্থস্থানে রসিকের খোলা দৃষ্টি ও উদার মন নিয়ে তিনি গিয়েছেন। প্রধানত কলকাতা-চুঁচুড়া-কৃষ্ণনগর-ব্যাণ্ডেল- বীরভূম এলাকার মানুষ তাঁর লেখায় বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছে। কৈশোর জীবন ও সন্ন্যাস-জীবন বাদে মূলত চুঁচুড়া-কলকাতার মধ্যেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সৃষ্টিশীল সময় কাটিয়েছেন। শক্তি-সাধনার বিচিত্র অভ্যাসে ‘অবধূত’ রূপে তাঁর নতুন জন্ম হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথা নানা উপন্যাসে বেশ মুন্সিয়ানার সাথে তিনি রূপ দিয়েছেন। কারো কারো কাছে তাঁর রচনার বিষয় স্বভাবতই অপরিচিত বলে বনে হয়। দেখা গেছে স্রষ্টা হিসেবে তাঁর লেখার শক্তি জন্মগত। সাহিত্যিক হিসেবে কোনো প্রাক-প্রস্তুতি তাঁর ছিল না। অথচ সমকালে তিনি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিলেন। তাঁর রচনাবলি[১] বিষয়-স্বাতন্ত্র্যে নতুন ধারার জন্ম দিয়েছে। অবধূতের সাহিত্যে অবলম্বিত প্রধানতম রস ‘বীভৎস রস’। বাংলাসাহিত্যে এই রসের ব্যবহারে তিনি পথিকৃৎ। অবধূতের ব্যক্তি-পরিচয় তথা ‘রাহী’ জীবনকে আমরা নিম্নোক্ত চারটি ভাগে আলোচনা করবো।

এক : অবধূতের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট

> " No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance. His appreciation is the appreciation of his relation to the dead poes and artist. You can not value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead."--- Tradition And Individual Talent : T.S Eliot

অবধূতের প্রথম উপন্যাস 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত। তাঁর বয়স তখন ৪৪ বছর। ১৯৭৬ সালে মুদ্রিত হয় অবধূতের শেষ উপন্যাস 'পথে যেতে যেতে'। এর দু'বছর বাদে ১৯৭৮ সালে ৬৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। সাহিত্য সাধনার এই বাইশ বছরে[২] উপন্যাস ও গল্পসংকলন মিলে অবধূত মোট একচল্লিশটি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক।[৩] এখন আমরা নিম্নোক্ত শিরোনামে সংশ্লিষ্ট বিষয়-নির্দিষ্ট আলোচনা ও প্রামাণ্য তথ্যের মাধ্যমে অবধূতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপবিভাগ 'অবধূতের আবির্ভাবের সময়'কে বুঝে নেব।

অবধূতের সাহিত্যসৃষ্টির যুগধর্মকে বুঝতে হলে তাঁর অগ্রজ, সমকালীন ও অনুজ সাহিত্যিকদের অবদান সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। অগ্রজদের মধ্যে অবশ্যই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়[৪] (২৩.০৭.১৮৯৮-১৪.০৯.১৯৭১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-০৩.১২.১৯৫৬), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২.০৯.১৮৯৪-০১.১১.১৯৫০),বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৯.০৭. ১৮৯৯-০৯.০২.১৯৭৯) প্রমুখ স্মরণীয়। অবধূত-সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে অবশ্য-স্মরণীয় সতীনাথ ভাদুড়ী (২৭.০৭.১৯০৬-৩০.০৩.১৯৬৫), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৫.০৫.১৯০৪-২৮.১০.২০০২), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) আশাপূর্ণা দেবী (০৮.০১.১৯০৯-১৩.০৭.১৯৯৫) প্রমুখ। অবধূত-পরবর্তী বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১), অদ্বৈত মল্লবর্মন (০১.০১.১৯১৪-১৬.০৪.১৯৫১), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (০৪.০২.১৯১৮-০৬.১১.১৯৭০), মহাশ্বেতা দেবী (১৪.০১.১৯২৬-২৮.০৭.২০১৬), মণিশঙ্কর মুখার্জি (শঙ্কর: ০৭.১২.১৯৩৩), প্রফুল্ল রায় (১১.০৯.১৯৩৪) প্রমুখ। পরাধীন দেশের বিবেকবান মানুষ মাত্রই স্বাধীনতা-প্রত্যাশী। শিল্পীমন আরো সংবেদনশীল ও স্বাধীনতা প্রিয়। দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে অবধূত সম্পর্কে সেকথা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অবধূত বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, সমগ্র হিমালয়-ভারত, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, পাকিস্তান সহ নানা ভৌগোলিক সীমায় বিস্তৃত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা 'মায়ামাধুরী', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়', 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ইত্যাদি উপন্যাসে বলেছেন অথচ জীবনের গভীরে ডুবতে চাননি---এখানেই তাঁর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে। ইংরেজ-শাসনাধীন ভারতে তাঁর বয়স যখন মাত্র নয় বছর তখন ১৯১৯ সালে ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড। সে সময় থেকে ভারতের স্বাধীনতা (১৯৪৭) অর্জন পর্যন্ত ২৬-২৭ বছরের এই সময়-পর্বকে ধরা যেতে পারে সাহিত্যিক

অবধূতের প্রস্তুতির কাল। ইংরেজ শাসনাধীন চারের দশকে ঘটা সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় এবং সাহিত্যসৃষ্টির নানা ঘটনা যুবক অবধূতের সাহিত্য-জীবন[৫]কে প্রভাবিত করবে -এতো স্বাভাবিক। এখন আমরা অবধূতের স্বপ্ন ও যন্ত্রণাকে বুঝতে দেশ-কাল-পটভূমিকে এই পরাধীন সময়ের প্রেক্ষাপটে বুঝে নেবো।

রাজনৈতিক পটভূমি

অবধূত সময়-সচেতন শিল্পী। তাই নয় বছর বয়সের স্মৃতি থেকে ৩৬ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনাগুলি তাঁর সৃষ্টিকর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপবিভাগ 'অবধূতের আবির্ভাবের সময়'কে বুঝতে হলে তাঁর সময়ের এই পর্বের নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি বিশেষভাবে জানা দরকার। ১৯১৯ সালে রাউলাট আইন জারি হয়েছে এবং ঘটেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। ১৯২০ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের[৬] মৃত্যু এবং গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা। এছাড়া রাশিয়ায় ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২০ সালেই। ১৯২২ সালে অনিয়ন্ত্রিত জনরোষে চৌরিচৌরা থানা আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটে। গান্ধীজী[৭]-র নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়।[৮] ১৯২৫ সালে কানপুরে 'ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি'-র প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯২৬ সালে সাম্যবাদী পত্র-পত্রিকা : 'লাঙল', 'গণবাণী', 'ক্রান্তি', 'কীর্তি'.'কিষাণ'-ইত্যাদির প্রকাশ হয়। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত চার বছরে আনুমানিক ৪৫০ জনের মৃত্যু হয় ও ৫০০০ জন আহত হন।[৯] ১৯২৮ সালে সারা ভারতে ২০০ টিরও বেশি শিল্পধর্মঘট হয়। লালা লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে সাণ্ডার্সকে হত্যা করা হয়। মহম্মদ জিন্না এই বছরেই কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯২৯ সালে হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করে। মহম্মদ আলী জিন্না চোদ্দ দফা দাবি পেশ করেন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় ভগৎ সিং বোমা নিক্ষেপ করেন এবং বড়লাট আরউইনের ট্রেনে বোমা ছোঁড়া হয়।

১৯৩০ সাল নানা কারণে বিখ্যাত যেমন : গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযান, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, পেশোয়ার, মাদ্রাজ, বম্বে, কলকাতা, চট্টগ্রাম, করাচী, দিল্লীতে হিংসাত্মক কার্যকলাপ, সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। বিনয়-বাদল-দীনেশের মহাকরণ অভিযান;ব্রিটিশের দমন নীতির ফলে মেদিনীপুর, কলকাতায় সন্ত্রাসের রাজত্ব, ২৬ জানুয়ারি দেশনেতাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কংগ্রেস পার্টি বেআইনী ঘোষণা, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত, মহাত্মা গান্ধীর কারাবরণে তীব্র গণ-প্রতিবাদ। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন-এর ২য় পর্ব, গান্ধীজী সহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বন্দী, গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ ও পুণাচুক্তি।

১৯৩৩ সালে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা ও বামপন্থী দলের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৩৮ সালে হরিপুরায় কংগ্রেসের বাৎসরিক

অধিবেশন হয়।

১৯৩৯ কংগ্রেস দল থেকে সুভাষচন্দ্র বসু পদত্যাগ করেন। ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হয়। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণপরিষদের দাবী; সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তার, গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা। ১৯৪১ সালে অন্তরীণ সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান। আটলান্টিক সনদ : রুজভেল্ট[১০] ও চার্চিলের[১১] যুদ্ধ ঘোষণা। ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি। কলকাতায় 'ব্ল্যাক আউট'।

১৯৪২ সাল : সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের পতন। ক্রীপস্ মিশন ব্যর্থ। ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু। কংগ্রেস দল বেআইনী ঘোষিত। সারা ভারতে হাঙ্গামার সূত্রপাত। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় আজাদ হিন্দ ফৌজের সহায়তায় জাপানী সৈন্যের ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অনুপ্রবেশ। মিত্রবাহিনীর ফ্রান্সে অবতরণ, ইম্ফলে জাপানী সৈন্যের পরাজয়। ১৯৪৭ সালে অর্জিত হলো স্বাধীনতা। সাথে সাথে দেশ বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে লক্ষ লক্ষ জীবন অবক্ষয়ের পথে, অপচয়ের পথে ক্রমাগত নেমে যেতে লাগল। সরকার উদ্বাস্তু সমস্যায় কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারলো না।

সামাজিক পটভূমি

এই সময় দেশে নামে দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ। দেখা দেয় জগৎ ও জীবনে আশাভঙ্গের অন্তর্জ্বালা। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে শঠতা, সংশয় মানুষকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছিল। চোরা কারবার, 'মন্বন্তর, অভাব, অবসাদ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মানুষের নৈতিক অধঃপতন সব মিলিয়ে এক পর্যুদস্ত সময়কাল।'[১২] ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলন হয়। অবধূতের লেখা 'একা জেগে থাকি'(ফেব্রুয়ারি,১৯৬৭) উপন্যাসে এই খাদ্য আন্দোলনের স্মৃতি আছে। চাল নিয়ন্ত্রণের নামে ট্রেনে ট্রেনে পুলিশী অত্যাচারের ছবি আছে। ট্রেন থেকে পুলিশকে ফেলে দেওয়ার কথাও আছে। এই আন্দোলন এ উপন্যাসে প্রধান ঘটনা নয় তবে এর প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না।

ধর্মীয় পটভূমি

বিশ শতকের দুইয়ের দশকে ভারতের মানুষ ধর্মের মূল কথা যে সংযম -তা ভুলে গিয়েছিল। এ যুগের ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। প্রাচীনকালে ভারতের ধর্ম ছিল জীবনের অঙ্গ-কিন্তু এখন তা জীবন থেকে অনেক দূরে। এ ধর্ম অন্তঃসার-শূন্য। এ ধর্ম 'মানুষকে কেবল আচার-বিচারে আটে-ঘাটে বন্ধন করিবারই ফাঁদ[১৩] এ জন্যই ব্রিটিশ সরকার নিজের স্বার্থে এই ধর্মকে ব্যবহার করতে পেরেছে। ক্রমে ক্রমে আর্যদের 'শুদ্ধি', 'সংগঠন', আন্দোলন ও মুসলিমদের 'তাঞ্জিম', 'তবলিস' আন্দোলন পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। ফলশ্রুতিতে ১৯২৩-১৯২৬ সালের মধ্যে ভারতে ৭২ টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়।

সাহিত্যিক পটভূমি

> "...নজরুলের কবিতা বাজেয়াপ্ত 'দেশের ডাক', 'ফাঁসির সত্যেন', আমাদের হাতে ঘুরছে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'সব হারাদের গান', বিমল সেনের 'ফুলঝুরি', প্রেরণা দিচ্ছে ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 'বেণু' পত্রিকা, কানে বাজছে প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই আশ্চর্য পংক্তিগুলো: দারুণ দেবতার ডাক যে পেলো তার /আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে।"[১৪] ---নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সমালোচকদের মতে শোভন, কোমল, মার্জিত শব্দের স্থান নিলো জীবন-ঘনিষ্ঠ শব্দ। 'নষ্ট', 'পচা', 'বেড়াল', 'শকুন', 'ঠ্যাং' ভূত, ইঁদুর', 'পেঁচা', ব্যাং, 'মশা', 'মাছি', 'বুড়ি', (আট বছর আগের একদিন)'শুয়োরের মাংস', (বোধ)-ইত্যাদি।[১৫] ব্যক্তির পরিবর্তে এসেছে গোষ্ঠীবদ্ধতার যুগ। 'প্রগতি' (১৯২৩), 'কালি-কলম' (১৯২৬), 'সংহতি'(১৯২৪), 'উত্তরা', (১৯২৫), 'বিচিত্রা'(১৯২৬) ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার যুগ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই যুগের নাম দিয়েছেন 'কল্লোল যুগ'। শৈলজানন্দের ভাষায় :আজকের দিনে যত নতুন লেখক স্তব্ধ হয়ে আছে সবারই ভাষা ঐ কল্লোল।'[১৬]

'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'-র বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছে সজনীকান্তের 'শনিবারের চিঠি'। এসব পত্রিকাগুলি স্বল্পায়ু হলেও সাহিত্যে ঘটিয়েছে বিপ্লব। পরবর্তী সাহিত্যক্ষেত্রে এদের অবদান অনস্বীকার্য।

অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' (১৯৫৪) প্রকাশের বছরেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হরফ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালে 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'- এর সাথেই প্রকাশিত হয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৈশোর স্মৃতি সম্বলিত 'কালান্তর'। ১৯৫৬ সালেই মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম উপন্যাস 'ঝাঁসির রাণী' এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' মুদ্রিত হয়।

সাধারণভাবে সময় বা বিশেষ কাল-খণ্ড সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা বিশেষ সময়ের প্রভাব সাহিত্যে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সেইরকম বিশ শতকের পাঁচের এবং ছয়ের দশক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়েই অবধূতের কথাসাহিত্যে ধরা পড়েছে। পাঁচের দশকে ঘটেছে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ সেইসাথে দেশভাগ-পরবর্তী মানুষের মূল্যবোধ হয়েছে স্বার্থ-চেতনায় বিকৃত। সঙ্গত কারণে সে আঘাতে স্রষ্টাদের মধ্যে কেউ ইতিহাসের মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছেন, কেউ-বা ভূগোলে। সেই সঙ্গে চলেছে টেকনিকের সন্ধান। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই বিচিত্র টেকনিকের উপলব্ধি এবং ভাঙাগড়া সম্ভব হলো জীবনকে নানা ক্ষেত্রে খুঁজতে গিয়েই। টেকনিকের জগতে ব্যতিক্রমী হলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রমুখ। তাঁদের রচনায় স্থান পেলো ব্যক্তির অর্ন্তজগতৎ বা চেতনাস্রোত। অন্যদিকে তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুত্ব দিয়েছেন কন্টেন্ট বা বিষয়-জ্ঞানের অভিনবত্বের উপর। পরবর্তীকালে পাঁচের- ছয়ের দশকের ঊপন্যাসিকদের তা মেনে চলার দায় রইলো না। কেননা ইতিহাস কিম্বা ভূগোলকে আশ্রয় করায় কনটেন্ট এবং টেকনিকের ক্ষেত্রে

ব্যাপক পরিবর্তন এলো কথাসাহিত্যের জগতে। আর অবধূতের কথাসাহিত্য এই কারণেই ব্যতিক্রমী। এ প্রসঙ্গে জনপ্রিয় লেখক অবধূত-সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> "যেন জীবন নামক ব্যাপারটা কখনো সংসারে থাকে, কখনো সংসারে থাকেই না, তখন সে থাকে শ্মশানে, অথবা জঙ্গলে!"[১৭]

পাঁচের দশকে অবধূত অপরিচিত পরিবেশ, আঞ্চলিক ভাষা, লোকাচার, ইত্যাদির সাথে ঘনিষ্ঠতা ও ব্যক্তি-পরিচয় সূত্রে পাঠকের বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। অধিকাংশ মানুষ যে পরিবেশ ও সমাজের সাথে পরিচিত একজন 'বটুক ভৈরব' সিদ্ধ[১৮] মানুষের অভিজ্ঞতার সাথে তার মিল কোথায় ? অনেকের কাছে তাই আজগুবি মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। দায়িত্বশীল মানুষের মন্তব্য খুব বেশি হলে নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ঘটে কি-না! অবধূতের অভিজ্ঞতা সাধারণের কাছে অপরিচিত। ভিন্ন প্রকৃতির। গারবেয়াং থেকে মানস সরোবরের পথে কালী নদীর উজানে লোধা সিং-এর কথা বলতে গিয়ে হিমালয়ের সাধকদের অতিপ্রাকৃত আকর্ষণের কথা বলেছেন অবধূত :

> "যে সর্বনেশে একটা কিছুর টানে ইহ জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে এসেছে..."[১৯]

---তাদের কথাই 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'-এ আছে। সাধারণ মানুষ এসব অভিজ্ঞতা কীভাবে পাবেন? স্বভাবতই অবধূতের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তাদের কাছে আজগুবি মনে হয়েছে।

অবধূতের বেশকিছু কথাসাহিত্য শাক্ত-সাধনার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে। অনেকে এজন্য আপত্তি করে থাকেন। ধর্ম কথাসাহিত্যের আসরে বিষয় হতে পারে কী-না তা অন্য প্রসঙ্গ তবে মানুষের জীবনে ধর্ম কি অচ্ছেদ্য নয়? আজকের দিনেও কি জীবন থেকে অতিপ্রাকৃতকে দূর করা গেছে ? ২০১৮ সালের কেরলে ভয়াবহ বন্যা-পরিস্থিতিতে লক্ষাধিক লোক আটকে আছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দশকোটি টাকার অর্থ সাহায্য করেছেন। প্রধান-মন্ত্রী সরেজমিনে দেখে সবরকম সাহায্য করছেন। মানবিক মুখ উঠে এসেছে পাইলট,এঞ্জিনীয়ার,সাধারণমানুষ এবং শিশু-কিশোরদের থেকেও। চালু হয়েছে জলে-স্থলে বায়ুমণ্ডলে সমান পরিষেবা। এর্নাকুলাম-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ট্রেন চলছে এ রাজ্যের বাসিন্দাদের ফিরিয়ে আনতে। সবই সভ্য মানুষের কাছে অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত -এ সবের উৎসে মানবিকতা আর মাধ্যমে বিজ্ঞান। চেতনার গভীরে ও প্রত্যক্ষে অতিপ্রাকৃত তবু রয়ে গেছে। কেরলের ১৩ টি জেলার এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য বিপন্নরা ভাবছেন গো-দেবতার রোষ ! শবরীমালা মন্দিরে দশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মহিলাদের প্রবেশের অধিকার মিলেছে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে। তাই নাকি একশ বছরেও যা হয়নি তা হোল! এই বয়াবহ বন্যা! মোহিনী রূপধারী নারায়ণ ও শিবের সন্তান 'আয়্যাপ্পা' বা 'আইয়াপ্পা'। তাঁর রোষ! ২০১৮ সালেও মানুষের মনে আছে এই বিশ্বাস। পাঁচের দশকের সার্থক উপন্যাস 'ইছামতী'। এটি ইতিহাসের তথ্যে সমৃদ্ধ। নির্দিষ্ট কালখণ্ডের চিত্রণে,সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই উপন্যাসটি সমকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রমথনাথ বিশী (১১.০৬.১৯০৯-১০.০৫.১৯৮৫)র 'লালকেল্লা', 'কেরীসাহেবের মুন্সি', রমাপদ চৌধুরী (২৮.১২.১৯২২-

২৯.০৭.২০১৮)র 'লালবাঈ' (জানু.১৯৯৭), গজেন্দ্র কুমার মিত্র (১১.১১.১৯০৮-১৬.১০.১৯৯৪) -র 'কলকাতার কাছেই' আশাপূর্ণা দেবী (০৮.০১.১৯০৯-১৩.০৭.১৯৯৫)-র 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪) প্রভৃতি এই সময়ের উল্লেখ্য রচনা।

বেস্টসেলারদের তালিকায় অবধূতের সাথে অবশ্যই উঠে আসেন বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১)-র 'সাহেব বিবি গোলাম'(১৯৫৬) এবং 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। তবে দায়িত্বশীল লেখক 'মণিশঙ্কর মুখার্জি (শঙ্কর, ০৭.১২.১৯৩৩, বয়স ৮৬ বছর)'। বিনোদনের দিকটি না ভুলেও সামাজিক দায়িত্ব মনে রেখেছেন। শঙ্করের 'সীমাবদ্ধ', 'জন-অরণ্য' -এ কথার সাক্ষ্য দেয়। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা বোধহয় সমরেশ বসু-র 'গঙ্গা'(১৯৫৭)।

অবশেষে বলতে হয় পাঁচের দশকে নতুন পথের সন্ধানে অনিবার্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ। উত্তরকালে বন্দ্যোপাধ্যায় -ত্রয়ীতে যার প্রতিষ্ঠা। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই সে -সময়ের লেখকদের মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন :

> ''আবার ইতিহাসকে আশ্রয় করে যেখানে সমকালকে পরিহার করেছেন লেখকেরা, সেখানেও তাঁরা মনে করেছেন ইতিহাসের পুঞ্জীভূত তথ্যরাশির সঙ্গে কাহিনীর চুনবালি কোনোক্রমে মেশাতে পারলেই বুঝি উপন্যাসের প্রাসাদ খাড়া করা যাবে।''[২০]

ইতিহাসকে যথার্থভাবে অনুসরণ ও সাহিত্যরসের সঞ্চার সহজ কর্ম নয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'derivation of the individuality of the character from the historical peculiarity of the age' (গিয়র্গি লুকাচ) পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকের ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস গুলিতে সে সত্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সময়ের অনিবার্য প্রভাব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরেও পড়েছে। সমালোচকের ভাষায় :

> ''রাধা' উপন্যাসে মোগল আমলের শেষপাদে বর্গির হাঙ্গামা-অধ্যুষিত বাংলার ধর্মীয় সাধনার পটভূমিতে লিখিত এই উপন্যাসে যে পরিমাণে চড়া রঙের ব্যবহার সে পরিমাণে কান্তি নেই। এ -অভিজ্ঞতার রসরূপ নির্মাণে কোন্ বিশিষ্ট বক্তব্য দ্যোতনা লাভ করল তা স্পষ্ট হয়নি।'' [২১]

অবধূতের ইতিহাস-কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। তবে গল্পকথনভঙ্গি, জীবনাভিজ্ঞতা, নতুন জীবন-দর্শন, রসবোধ -ইত্যাদি যে অবধূতের জনপ্রিয়তার অবলম্বন তা অস্বীকারের উপায় নেই।

অবধূতের প্রথম উপন্যাস 'মরুতীর্থ হিংলাজ' প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। এই বছরে প্রকাশিত অন্যান্য লেখকের উপন্যাসগুলি হলো: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁপাডাঙার বৌ', বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চপর্ব', 'লক্ষ্মীর আসন', 'পিতামহ', আশাপূর্ণা দেবীর 'নরজন্ম' 'কল্যাণী', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'অচিন রাগিনী', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শুভাশুভ', 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অসিধারা', 'মেঘরাগ''নিশিযাপন', 'ভস্মপুতুল', 'সন্ধ্যার সুর', 'পাতালকন্যা', নির্জন শিখর', 'তৃতীয় নয়ন', 'ব্যাধের দরজা''আলোকপর্ণা', প্রতিভা বসুর 'বিবাহিতা স্ত্রী' প্রভৃতি।

এছাড়াও, ১৯৫৪-১৯৫৫ সালে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'বিষম জ্বর, টাইফয়েড, নীরঞ্জনা, আশাপূর্ণা দেবীর 'নির্জন পৃথিবী', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হরফ' পরাধীন 'প্রেম',নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'সূর্য সারথী', এবং 'বিদিশা' রচিত হয়।

'উদ্ধারণপুরের ঘাট' (১৯৫৬) অবধূতের বিখ্যাত উপন্যাস। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত বাংলাসাহিত্যে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২৩.০৭.১৮৯৮-১৪.০৯.১৯৭১)'পঞ্চপুত্তলী', আশাপূর্ণা দেবীর 'শশীবাবুর সংসার', বুদ্ধদেব বসুর 'শেষ পাণ্ডুলিপি', 'নীলাঞ্জনের খাতা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ নদী সবুজ বন', 'মাশুল', প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান', বিমল করের 'দেওয়াল', অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম', প্রভৃতি। বলাবাহুল্য এই বছর অবধূতই জনপ্রিয়তার ও সার্থকতার শীর্ষে ছিলেন।

১৯৫৭ সালে প্রকাশ পায় অবধূতের 'শুভায় ভবতু'। এ বছরই তারাশঙ্করের 'বিচারক' ও 'সপ্তপদী' প্রকাশ পায়। ১৯৫৭ সালে আরো প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্য বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (১৯.০৭, ১৮৯৯-০৯.০২.১৯৭৯) 'ভুবন সোম', আশাপূর্ণা দেবীর (১৮.০১.১০০৯১৩.০৭.১৯৯৫) 'উন্মোচন', 'নেপথ্য নায়িকা', 'অতিক্রান্ত' অন্নদাশঙ্কর রায়ের (১৫.০৫.১৯০৪-২৮.১০.২০০২) 'রস ও শ্রীমতী', (১ম) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৯.০৫.১৯০৮-০৩.১২.১৯৫৬) 'মাটি ঘেঁষা মানুষ'(অসমাপ্ত), প্রফুল্ল রায়(১১.০৯.১৯৩৪-০৭.০২.২০১৪)---এর 'পূর্ব পার্বতী', দ্বারেশ চন্দ্র শর্মাচার্যের 'ভৃগুজাতক', স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাথুর' প্রভৃতি।

১৯৫৮ সালে অবধূত লেখেন ৩ টি উপন্যাস যেমন: 'দুই তারা', 'দুরি বৌদি'ও 'মিড় গমক মূর্ছনা'। এই সময় অন্যন্য লেখকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হলো তারাশঙ্করের 'বিপাশা', 'ডাক হরকরা', বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের(১৯.০৭.১৮৯৯-০৯.০২.১৯৭৯)'মহারাণী' অন্নদাশঙ্কর রায়ের (১৫.০৫.১৯০৪-২৮.১০.২০০২) 'রত্ন ও শ্রীমতী' (২য় খণ্ড), বারীন্দ্রনাথ দাসের 'চায়না টাউন' প্রভৃতি। ১৯৫৯ সালে অবধূতের 'দেবারিগণ' ও 'তাহার দুই তারা' প্রকাশিত হয়। এই বছরেই তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'রাধা' ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত', বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নীশ্বর', 'জলতরঙ্গ', আশাপূর্ণা দেবীর (১৩.০৭.১৮৯৫-০৮.০১.১৯০৯)-'কনকদীপ', 'ছাড়পত্র', প্রফুল্ল রায়ের 'সিন্ধুপারের পাখি', বিবেকানন্দ ভট্টাচার্যর 'বন্দরের কাল' প্রকাশ পায়।

অবধূতের সবচেয়ে ফলবান বছর হলো ১৯৬০ সাল। এই বছরে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা এগারোটি যথা 'অনাহুত আহূতি', 'উত্তররামচরিত' , 'একটি মেয়ের আত্মকাহিনী', 'কান পেতে রই', 'তুমি ভুল করেছিলে', 'দুর্গম পন্থা', বশীকরণ,' 'ভূমিকা লিপি পূর্ববৎ', 'মন মানে না' ও 'মায়ামাধুরী'। ১৯৬০ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাশ্বেতা', 'যোগভ্রষ্ট', 'না', 'নাগরিক', বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'ওরা সব পারে', 'দুই পথিক', আশাপূর্ণা দেবীর 'উত্তর লিপি', 'মেঘপাহাড়', বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) 'নীলাঞ্জনের খাতা', 'দুই ঢেউ এক নদী' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। অবধূতকে বোঝার জন্য এবং তাঁর রচনা অন্য রচনার থেকে পৃথক কোথায় -তা জানার জন্য এগুলির প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে মনে করি। তাঁর সমকালের এইসব

গ্রন্থকার বিশেষ করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ ও তাঁদের রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলির কথা জানলে অবধূতের সময়কে বোঝা যাবে।

১৯৬১ সালে প্রকাশিত দুলাল মুখোপাধ্যায় রচিত একটিই গ্রন্থ 'পিয়ারী'। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি পৃথক- উপন্যাস 'হিংলাজের পরে' এবং 'সীমন্তিনী সীমা'। ১৯৬৩ সালেও প্রকাশিত হয় ২টি উপন্যাস যথা 'কৌশিকী কানাড়া', 'অবিমুক্ত ক্ষেত্রে' এবং একটি গল্প গ্রন্থ---'নিরাকারের নিয়তি'। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় অবধূতের 'বহুব্রীহি' নামের গল্প-সংকলন গ্রন্থ। এর পর 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' (১৯৬৫) 'একা জেগে থাকি'[২২] (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭)'ফক্কড়-তন্ত্রম্'[২৩](১৯৬৮) প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় 'টপ্পা ঠুংরি' আর 'ভোরের গোধূলি'। ১৯৭০ সালে 'স্বামী ঘাতিনী' ও 'সাচ্চা দরবার' প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালে 'কলিতীর্থ কালীঘাট' এবং'সুমেরু-কুমেরু' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে 'আমার চোখে দেখা' (১৯৭৫) 'পথে যেতে যেতে' (১৯৭৬) প্রভৃতির মত একটি করে উত্তম গল্পগ্রন্থ বা উপন্যাসের জন্ম হয়েছে।

১৯৫৪-১৯৭৬ এই ২২ বছর ধরে গল্প-উপন্যাস মিলিয়ে অবধূত প্রায় ৪১ টি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে ১৯৬৬, ১৯৭১, ১৯৭৩, ১৯৭৪-এই চার বছরে একটিও গ্রন্থ প্রকাশ পায়নি। তবে চার খানি গ্রন্থ প্রকাশকাল বিহীন যেমন 'একাঘ্নী, 'বিশ্বাসের বিষ', 'যা নয় তাই' ও 'সাধনা'। এগুলির প্রকাশ কাল জানা গেলে নিষ্ফলা বছরের হিসাব হয়তো পাওয়া যেতো। ---যাইহোক এই চার বছরে লেখা কোনো পাণ্ডুলিপিও আমরা উদ্ধার করতে পারিনি।

অবধূতের ভৈরবী সরোজিনী দেবী। সরোজিনীর জন্মও বরিশালে। 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর ১৫৯ পৃষ্ঠায় 'অঘোর নদীর টানে কুন্তীর ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ সময়ে বলেছেন'বরিশাল না থাকলে রাজস্থান টানের চোটে ভেসেই যেত।' ১৯৭৭ সালের ১৭ই অগাস্ট দেহ রক্ষা করেছেন। এক বছরের মধ্যেই ১৯৭৮ সালের ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বিকালে অবধূতও মারা যান। জীবিতকালের শেষ দুবছর অর্থাৎ ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ সালে অবধূত কিছুই প্রকাশ করতে পারেননি।

অবধূত তাঁর লেখক হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে বলেছেন খাতা কলমের সাথে তাঁর যোগাযোগ আকস্মিক। লেখক হওয়ার কথা কষ্মিনকালেও তিনি ভাবেন নি। বিভিন্ন উপন্যাসে আমরা তার সমর্থন পাই। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের[২৪] তিনি অনুরাগী পাঠক ছিলেন। 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর ১৩ নং পৃষ্ঠায় এ লিখেছেন :

> ''রসুলপুরের নদীর তীরে সহযাত্রিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত নবকুমার যখন আগুন দেখতে পেয়েছিলেন, তখন ওখানে মানুষ আছে নয়ত আগুন জ্বালালো কে, ---এই চিন্তা করে আশ্রয়ের আশায় তাড়াতাড়ি সেই আগুনের কাছে গিয়ে কাপালিকের খপ্পরে পড়েন। ...কার মনে কী উদয় তা বলতে পারি না, তবে কাপালিকের কথাটা আমার স্মরণ হয়নি। হলে হয়ত বনদেবী কপালকুণ্ডলার চাক্ষুষ পরিচয় লাভের আশায় কী করে বসতাম তার ঠিক নেই। হলফ করে বলতে পারি বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর মলাটখানির ছবিও মনের কোণে ভেসে ওঠেনি।''[২৫]

বীরভূমের কীর্ণাহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সাথে ব্যক্তিগত আলাপে অবধূত জানিয়েছিলেন তিনি বি.এ পাশ। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো প্রমাণ আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে আলোচিত প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় থেকে বোঝা যায় বাংলা, হিন্দীর পাশাপাশি ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী তার কারণ রাস্কিন[২৬], কালিদাস[২৭], মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের কথা সরাসরি তাঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ও 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসে এসেছে। হিমালয়ের সৌন্দর্য প্রসঙ্গে কালিদাসের কথা এসেছে 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এ ১৩১ এবং ১৩৬ পৃষ্ঠায়। এসেছে যক্ষের কথা। এছাড়া 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসে আগম বাগীশের মুখে নানা বিস্তর মন্ত্রোচ্চারণ যজ্ঞ করা-ইত্যাদি প্রসঙ্গে নানা শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন অবধূত। উৎস নির্দেশ করে 'ঋগ্বেদ'-এর কথা বলেছেন বিস্তর প্রসঙ্গে। যেমন : 'ঋগ্বেদ'-এর ১০ মণ্ডল, ১৭০ সূক্ত এবং ৫ মণ্ডল, ৮২ সূক্ত উল্লেখ করেছেন। মধুসূদন দত্তের কথা এসেছে অবধূত শতবার্ষিকী সংকলনের ১৮১ পৃষ্ঠায়। মনে রাখতে হবে অবধূত তাঁর পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[২৮], তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা এসেছে 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এ, মিত্র ও ঘোষ-এর 'অবধূত শতবার্ষিকী সংকলন'-এর ২৮ পৃষ্ঠায়। এরকম সংস্কৃত বৈদগ্ধ্যের পরিচয় মেলে 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫), উপন্যাসে কথকের মুখে। 'দেবারীগণ'(১৯৬৯) উপন্যাসের নীলকণ্ঠ পণ্ডিত ও কীর্তিমান লেখক শান্তনু রুদ্রের মুখে। 'মরুতীর্থ হিংলাজ'(১৯৫৪) উপন্যাসে দুটি উটের কথা আছে। ভৈরবী তার ছোটটির নাম দিয়েছিলেন উর্বশী। এছাড়া 'দেবারীগণ' উপন্যাসে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকে বোঝা যায় অবধূত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'চিত্রা'(১৩০২) কাব্যের সৌন্দর্য-বিষয়ক কবিতা 'উর্বশী'-র সাথে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া এই উপন্যাসেই গীতবিতানের দুটি গোটা গান[২৯] তিনি ব্যবহার করেছেন। আবার 'দেবারীগণ'[৩০]উপন্যাসে ভাস্বতীর নৃত্যরতা ছবির নিচে উর্বশী কবিতার লাইন লেখা ছিল : 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষ মাঝে চিত্ত আত্মহারা ছুটে রক্তধারা'। দক্ষ লেখক সর্বজ্ঞ ও সর্বত্রগ। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের গতি অবাধ। অবধূত নিঃসন্দেহে সে গুণের অধিকারী ছিলেন। অবধূত প্রসঙ্গক্রমে 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এ নিজের লেখা আরেক উপন্যাস 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এর কথা স্মরণ করেছেন মিত্র ও ঘোষ-এর 'অবধূত শতবার্ষিকী সংকলন'-এর ৪৭ পৃষ্ঠায়।

তাঁর রচিত কথাসাহিত্য যে অতিরিক্ত দীর্ঘ নয় তার কারণ তাঁর রচনায় তিনি প্রয়োজনীয় কথাটুকু শুধু বলেছেন---বিশ্লেষণে আগ্রহী হননি। চলমান জীবনের স্বভাবই তাঁর সৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে জীবনের পথ বিস্তৃত হয়েছে এ দেশের নানা রাজ্যে, নানা ভৌগোলিক পরিবেশে, বিচিত্র ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে কিন্তু কোথাও তলানি ঘুলিয়ে তোলা নেই। পথিক যেমন নানা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয় কিন্তু নিজেকে যুক্ত করে না, থেমে থাকে না তিনিও তেমনি পক্ষপাতী বিশ্লেষণে আগ্রহী হননা-উপস্থাপনের দায়িত্ব নেন নিজের স্বকপোলকল্পিত ভাবাতিরেক থেকে মুক্ত থাকেন।

অবধূতের কথাসাহিত্যের বিষয় ও চরিত্র বড় বিচিত্র ধরণের। তাঁর রচনায় নানা ভৌগোলিক

অঞ্চল ও নানা স্বভাবের বহু-বিচিত্র মানুষ আছে। তাদের সাথে পরিচিত হলে লেখক অবধূতের সামগ্রিক স্রষ্টাব্যক্তিত্বের স্বরূপ বুঝতে সুবিধে হয়। তিনি সাধক এবং স্রষ্টা। পথই তাঁর ঘর। ব্যক্তিসুখ আর যশের প্রত্যাশী তিনি ছিলেন না। জীবনকে যেভাবে জেনেছেন সেভাবে সাহিত্যের আধারে পরিবেশন করেছেন। পাহাড়-পর্বত অলি গলি রাজনীতি, হিংসা, কামনা, কুটিলতা, বিপ্লব, বোমাবাজি, ব্যবসা, গোলামো, ভাঁড়ামো, প্রেম প্রতিজ্ঞা-সবই তিনি ছুঁয়েছেন, যেন কমণ্ডলুর 'পুতঃবারি নিষেকে' সঞ্জীবিত করেছেন কিন্তু মিথ্যার ফেনিল রূপ 'জীবনের মর্ম' বলে চালাতে চান নি। কপালে যাঁর বিভূতি, শ্মশানের ভস্ম যাঁর ভূষণ তাঁকে কি ভড়ং সাজে ? তিনি মেকি সমাজ-সম্পর্ক আর ভণ্ড সাধুর মুখোশ খুলেছেন কিন্তু বাহবার আশায় নয়। সত্যকে প্রকাশের জন্য তা করেছেন। নিজে যোগের দৃষ্টি পেয়েছেন কিন্তু তার প্রচার কখনো চাননি। তাঁর জীবন ও গ্রন্থ পর্যালোচনা করে বলা যায় ভক্ত, ভবিতব্য আর সামাজিক ভণ্ডামো নিয়ে যে অজস্র মেকি বা পবিত্র জীবনধারা সমাজ-জীবনের কূলে কূলে অতিলৌকিক বিস্ময় জাগায় সে জীবনের সংস্পর্শে আঠারো -বিশ বছর কাটিয়েও অবধূত আশ্চর্য-রকম নির্মোহ।

দুই : অবধূতের ব্যক্তি পরিচয় ও বংশলতিকা

কার্ত্তিক মাসের কালী পূজার পরের দিন অর্থাৎ ০২.১১.১৯১০ তারিখে বরিশালে[৩১] দুলাল মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। তিনি বাবা-মায়ের বড় সন্তান। এছাড়া ভাই মৃণাল ও চার বোনসহ মোট ছয় ভাইবোন ছিলেন তাঁরা। অবধূত ঢাকা ডিভিশনের গাজীপুর জেলার একটি উপজেলা কালিগঞ্জে পড়াশুনা করেছেন। 'শুভায় ভবতু' উপন্যাসে কালীগঞ্জের উল্লেখ আছে। শচীন নামক এক বন্ধুর সঙ্গে কথাসূত্রে উঠে এসেছে এই কালীগঞ্জের প্রসঙ্গ। বাবা অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়। মায়ের নাম প্রভাবতী দেবী। তাঁর ঠাকুরদার নাম ছিল গোপাল মুখোপাধ্যায়। প্রপিতামহ ছিলেন রামরাম মুখোপাধ্যায়। বাবা অনাথনাথ রেলিফ কোম্পানীর অধীনে চাকরি-সূত্রে কোলকাতায় বসবাস শুরু করেন। দুলাল মুখোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যে 'অবধূত' নামে বিখ্যাত।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'অবধূতের পূর্বাশ্রমের নাম যে দুলাল মুখোপাধ্যায় তা এখান থেকেই জানলাম।'[৩২] রিষড়া স্টেশনের কাছে অবধূতের প্রাসাদোপম শ্বশুর বাড়ি। অবধূত সে পরিচয় দিতেন না। তাঁর ছোটো শ্যালকের (সোমদেব ?) কাছ থেকে লেখক সম্বন্ধে জানতে পারেন ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পোর্ট কমিশনার্সের অফিসে চাকরি করতেন। স্বদেশী আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন। প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়ে সূতিকা-জ্বরে মারা যান প্রথমা স্ত্রী সুখময়ী। শ্মশানে স্ত্রীর মুখাগ্নি করে বেরিয়ে যান আর ফেরেননি। বহুদিন পরে কালীঘাটের মন্দিরে হঠাৎই চিনে ফেলেন শ্যালিকারা। এরপর চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে- ক্রমান্বয়ে অমল-সহ গৃহাশ্রমের অন্যান্যদের সাথে। এই জোড়াঘাটেই অবধূত স্থিত হন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ এখানেই রচিত হয়।

দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে অবধূতের শৈশবের ও অজ্ঞাতবাসের কথা তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্য থেকে অনেকখানি জানা যায়। 'শুভায় ভবতু' উপন্যাসের কাহিনী কথকের মুখে

নিজের জন্ম-সময়ের কথা বলেছেন অবধূত তা থেকে পাঠক জানতে পারেন যে তাঁর জীবনের আরম্ভটা নাকি হয়েছিল মহাসমারোহে। সন্তানের শুভ কামনায় তিন দিনের পথে নৌকায় মানুষ পাঠিয়ে পায়ের ধূলো আনানো হয়েছিল সার্বভৌম ঠাকুরের। ইঁদুরে-তোলা মাটি পাঠিয়ে সেই মাটি পায়ে ছুঁইয়ে আনা হয়েছিল। শুধু সার্বভৌমের নয়, আরও একাদশ জন বাছা বাছা ব্রাহ্মণের পদধূলি যোগাড় করা হয়েছিল। সেই ধূলি ঠেকানো হয়েছিল নবজাতকের কপালে। বড় আশায় এই সমস্ত করা হয়েছিল। অবধূত ঠাট্টা ক'রে বলেছেন যে দ্বাদশটি বাঘা ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ কিছুতেই বিফল হবে না, এ সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না তাঁদের মনে, যাঁরা এতকাণ্ড করেছিলেন ষেটেরা পূজোর দিন। বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে অবধূত জানিয়েছেন :

> "এসব কথা আমার জানার কথা নয়। ছদিন বয়সে কি হয়েছিল, না হয়েছিল তা আর কে মনে রাখতে পারে? ছদিন বয়সে মন জন্মেছিল কিনা তা-ই এখন মনে নেই। কিন্তু দ্বাদশজন ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ যে আমি গোল্লায় পাঠিয়েছি,এ কথাটি আমাকে দ্বাদশ লক্ষ বার শুনতে হয়েছে গুরুজন দের মুখে। শুনে শুনে ওটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে আমার। এক রকম বিশ্বাসই হয়ে গেছে যে আমার যা হওয়া উচিত ছিল তা যে হতে পারি নি, এজন্যে একমাত্র আমিই দায়ী।"[৩৩]

অবধূতের পরিচয় : নানা অভিমত

অবধূত সাহেব-হত্যার দায়ে ফেরার ছিলেন বলে তাঁর পরিচয় বেশির ভাগটাই অজ্ঞাত। তাঁর সম্পর্কে আমরা নানাভাবে তথ্য সংগ্রহ করেছি। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্যাভিধান'-এ এবং সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু 'বাঙালি চরিতাভিধান'-এ (সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃ.২১৪, মোট পৃষ্ঠা-৬৭৯) তাঁর সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। অবধূতের জন্ম বরিশালে,২রা নভেম্বর ১৯১০ সাল। শঙ্কু মহারাজ বা কমলকুমার গুহ বলেছেন 'তাঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' নিয়ে তখন চারিদিকে হৈচৈ। তিনি আবার বরিশালের লোক। আমিও তাই।'(দ্রষ্টব্য জাগরণ, পৃ.৭, পরিশিষ্ট) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত সর্বজন বিদিত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'(মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রকাশিত) এবং সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সাহিত্য- সমালোচনা গ্রন্থ 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লিখিত কয়েকটি সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থে ও সাহিত্য পত্রিকায় অবধূতের সাহিত্য-সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ২০০৯ সালে (২৬.১২.২০০৯, শনিবার এবং ২৭.১২.২০০৯ রবিবার) জোড়াঘাটস্থিত 'বন্দেমাতরম ভবনে' অনুষ্ঠিত হয় অবধূতের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব[৩৪]। সেখানে বহু গুণীজনের সাথে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমত্যা সূচনা মুখার্জ্জী (অবধূতের পুত্রবধূ) এবং শ্রী গোপাল ধর (অবধূতের স্নেহধন্য শিষ্য)। এই দুজনের স্মৃতি চারণা ব্যক্তি অবধূতকে জানতে সাহায্য করেছে। এছাড়া অবধূতের প্রপৌত্র তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এবং অমলের স্ত্রী সূচনা দেবীর দেওয়া সাক্ষাৎকার, 'জাগরণ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, বারিদবরণ ঘোষ-সম্পাদিত অবধূতশতবার্ষিকী সংকলন, ষষ্ঠীপদ

চট্টোপাধ্যায়-রচিত 'রুদ্রচণ্ডী মঠের ভৈরব', চুচুঁড়ার জোড়াঘাটে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের (১৮৩১-১৮৯৪) পৌত্র শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রপৌত্র সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের[৩৫] স্মৃতিচারণা (ভূদেব-রামগতি-অবধূত স্মৃতিরক্ষা কমিটি, বড়বাজার, মোগলটুলি, চুঁচুড়া)এবং অবধূত শতবর্ষে প্রকাশিত দীপ্রকলমের দেওয়া বিভিন্ন তথ্য আশ্রয় করে আমরা অবধূতের জীবনী ও পরিচয় উদ্ধার করেছি। সমর্থন পেয়েছি অবধূতের লেখা বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পের তথ্য বিশ্লেষণ করে। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভে এইসব উপাদান গুলিকেই বিবেচনা করা হয়েছে অবধূতের জীবনী-রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে।

দীপ্রকলমের * দেওয়া তথ্যানুসারে নাবালক অবস্থাতেই ঠাকুরদা গোপাল মুখোপাধ্যায় আদরের নাতি দুলালের বিয়ে দেন অশিক্ষিতা কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী সরোজিনী দেবীর সঙ্গে। বিশ শতকীয় আলোক প্রাপ্ত শিক্ষিত অনাথনাথ ছেলের এ বাল্য বিবাহ স্বভাবতই মেনে নেন নি। সদ্য বিবাহিত ছেলেকে নিয়ে আসেন কলকাতায়, তাঁর কর্মস্থলে। কলকাতায় (ভবানীপুর) কয়েকবার বাসা বদল হয়। পরে বাবার পছন্দের পাত্রীর সাথে বিয়ে হয়। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে সেই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুখময়ী মারা যান। দীপ্রকলমের দেওয়া তথ্যানুসারে সন্তানের মুখ পর্যন্ত দেখেন নি অবধূত। সংসারে বীতশ্রদ্ধ অবধূত তারপরেই সংসার ত্যাগ করেন। তারপরে আঠারো বছর কেটে যায়। অবধূতের এই আঠারো বছরের জীবন প্রায় অজ্ঞাত। অবধূত এ সময় ইংরেজ-হত্যার দায়ে ফেরার ছিলেন।

অবধূতের প্রকৃত নাম দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গসাহিত্যাভিধান'-এ জানিয়েছেন অবধূতের জন্ম কলিকাতার ভবানীপুরে। তাঁর প্রকৃত নাম দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পুত্র অমলের জন্মের পর পত্নীবিয়োগে সন্ন্যাস গ্রহণে নাম হয় কালিকানন্দ অবধূত সাহিত্য ক্ষেত্রে অবধূত নামে পরিচিত। চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে রুদ্রচণ্ডী মঠের প্রতিষ্ঠাতা-এই মঠেই বসবাস ও মৃত্যু। তান্ত্রিক সাধক। উদ্ভট কাহিনীকল্পনা, বীভৎস রস, তান্ত্রিক ধর্মসাধনার গুহ্য রহস্য ও উৎকট যৌনাচার অবধূতের রচনা বৈশিষ্ট্য, শক্তিমত্তা সত্ত্বেও শিথিল বিন্যাস ও যৌনতার আধিক্য ত্রুটিরূপে গণ্য। এখানে অবধূতের লেখা কয়েকটি উপন্যাসের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন: 'মরুতীর্থ হিংলাজ' (জুলাই, ১৯৫৪) 'বশীকরণ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'পিয়ারী' (জুলাই, ১৯৬১) 'তাহারা দুই তারা' (১৯৫৯) 'বহুব্রীহি', 'ভোরের গোধূলি', 'টপ্পাঠুংরি'(১৩৭৬), 'ভূমিকা লিপি পূর্ববৎ', 'কান পেতে রই', 'তুমি ভুল করেছিলে', 'অনাহুত আহুতি', 'স্বামী ঘাতিনী', 'ফক্কড়তন্ত্রম্'১ম, ২য়, ৩য়, 'দুর্গম পন্থা', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংসদ বাংলা চরিতাভিধান মতে অবধূত (০২.১১.১৯১০-১৩.০৪.১৯৭৮) ভবানীপুর-কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং 'মরুতীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থ লিখে খ্যাত হন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্ন্যাস নেন। পরে উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে অবধূত হন-'কালিকানন্দ অবধূত'। তাঁর একজন ভৈরবী ছিল। চুঁচুড়ায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'রুদ্রচণ্ডী' মঠে তিনি মারা যান। <u>অবধূতের লিখিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হলো 'বশীকরণ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'কলিতীর্থ কালীঘাট',</u>

পাদটীকা :*দীপ্রকলম,১০ম বর্ষ, ৩৮ তম প্রকাশ , এপ্রিল সংখ্যা,২০১০, দ্রষ্টব্য: পৃ. ৪৯০

‘কঙ্করতন্ত্র’ প্রভৃতি। চুঁচুড়াবাসী পুত্র পুত্র-বধূদের বয়ান অনুসারে তিনি সম্ভবত হাতিবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূমের কীর্ণাহার গ্রামের বাসিন্দা রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায় অবধূতের বন্ধুপ্রতিম ছিলেন। ইনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন জন্মস্থান ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে।

অবধূতের পরিচয় বিষয়ক কিছু সংবাদ আমরা পেয়েছি লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রসাদ পত্রিকায় অবধূতের শিষ্য ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল দুলাল মুখোপাধ্যায় এবং তিনি সিলেটের লোক। জন্মস্থানের মত জন্ম সাল নিয়েও ভিন্ন মত শোনা যায়। অবধূতের বন্ধু রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরিতে লেখেন যে অবধূতের জন্ম ১৯১০ সালে। সূচনা দেবী, বড়ো নাতি তারাশঙ্কর ও ছোট নাতি সঙ্কর্ষণের মতানুসারে তাঁর জন্ম হয় ১৯১১ সালে। জন্ম সাল নিয়ে ভিন্ন মত থাকলেও কালী পূজার দিন তাঁর জন্ম হয় এ বিষয়ে সকলে এক মত। অবশেষে প্রমাণিত যে তাঁর জন্ম ১৯১০ সালে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে অবধূতের বংশ পরিচয় ও বংশলতিকা উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি আমরা। এখানে সেটি দেখানো হলো (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৬৩)।

অবধূতের বন্ধু কীর্ণাহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা ভৈরবী মায়ের একটি চিঠি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। ২৫.১০ ১৯৭৫ সালে চিঠিটি পোস্ট করা হয়েছিল। এখানে লেখা আছে :

“আগামী ১৬ কার্ত্তিক ইংরেজি ২ রা নভেম্বর রবিবার ৯/৪৮ থেকে অমাবস্য। দীপান্বিতা অমাবস্যায় মায়ের মহাপূজা এবং বটুকনাথের বিশেষ হোম। পরদিন ভোরে অবধূতজীর শুভ জন্ম লগ্ন।” চিঠিটি লেখা হয়েছিলো জোড়াঘাটে, চুঁচড়ো, ভৈরবী মা, ৩রা কার্তিক সোমবার ১৩৮২ সালে।

জানা যায় যে ৩০ চৈত্র, ১৩৮৪ (১৩ এপ্রিল ১৯৭৮) বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে অবধূতের মহাপ্রয়াণ ঘটে। অবধূতের বন্ধু, কীর্ণাহার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন :

> “গতকল্য১৩/০৪/১৯৭৮ তারিখে ১৩৮৪.২৪ শে চৈত্র বৃহস্পতিবার বৈকাল ৩.৩০ মিনিটে চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে তাঁর রুদ্রচণ্ডী আশ্রমে পরলোক গমন করেন। (যুগান্তর বার্তা, ১৪/০৪/১৯৭৮)। -এ কথার সমর্থন মেলে বাঙালি চরিতাভিধানে। ১৪.০৪.১৯৭৮ তারিখের আনন্দবাজার অবশ্য ছেপেছিল চুঁচুড়া হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।”

আমরা এ বিষয়ে প্রমাণাদি বিচার করে দেখেছি যে তাঁর জন্ম ২.১১.১৯১০ এবং মৃত্যু ১৩.০৪.১৯৭৮। অবধূতের পৌত্র সঙ্কর্ষণ লিখেছেন ১৯২৮-১৯২৯ সালে, অর্থাৎ ১৮/ ১৯ বছর বয়সে অবধূত বিপ্লবীদের[৩৬] সংস্পর্শে আসেন। যাইহোক ১৯৩২-৩৩ সাল নাগাৎ পোর্ট ট্রাস্ট অফিসে মাসিক তিনশ টাকা বেতনে স্টোরকিপারের সমতুল চাকরি পান। ঘটনা চক্রে ইংরেজ-

পাদটীকা: * শঙ্কুমহারাজ ওরফে কমল কুমার গুহ বলেছেন ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ নিয়ে তখন চারিদিকে হৈ চৈ। তিনি আবার বরিশালের লোক। আমিও তাই। (জাগরণ, ১৪০৯,পৃ. ৭,

হত্যার দায়ে ফেরার হন। পুলিশের নজর এড়াতে চলে আসেন বাংলাদেশের বরিশালে*। সালটা আনুমানিক ১৯৩৫। এ সময় তিনি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস-জীবনে দুলালের নাম হয় অবধূত, সরোজিনী তাঁর সাধথন সঙ্গিনী। তাঁর পোষা একটি বিড়ালের কথা মনে পড়ে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপন্যাসে কুন্তীর উপর বলাৎকার প্রসঙ্গে। 'জজান আশ্রম'-এর দীঘিরপাড়ে মনু নামের বিড়াল টাকে তিনটে শেয়াল কীভাবে ছিঁড়ে ফেলেছিল। 'তার সাদা লোমের উপর লাল রক্ত গড়িয়ে নামছে।'[৩৭] 'মনু' নামের এই বিড়ালটি সরোজিনী দেবীর খুবই প্রিয় ছিল।

সমালোচকের চোখে অবধূত : রটনা ও ঘটনা

'খুব সত্য কথাটা হলো, অবধূতের আকস্মিক আর্বিভাব তৎকালীন (১৯৫০ এর পর) বাংলা সাহিত্য জগতে তুমুল চমক আনলেও ক্রমশ : 'গেরুয়ার তলে মীনধ্বজের চাঞ্চল্য' তাঁকে সৎ সাহিত্যের ক্ষেত্রে চ্যুত করে। এ প্রসঙ্গে আমাদের অবশ্যই মনে পড়বে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের। মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের ভোগী সন্দীপের সৃষ্টির কথা তৎসত্ত্বেও অবধূত কেন ব্রাত্য হলেন এটাই বিস্ময়কর। 'অবধূতের রচনা সমূহ যদি একমাত্রিক বিষয়াবলম্বিত না হয়ে সু-সাহিত্যের বিচিত্র নির্মাণ-ধর্মিতার মেঠো পথও ধরত তাহলে তাঁকে ও তাঁর সাহিত্যের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কিছু পাতা ব্যয় করার সুযোগ পেত।'- এহেন কথারও আমরা বিরোধিতা করি কেননা তাঁর লেখা উপন্যাসে ও গল্পে বিষয়বৈচিত্র্য নেই একথা কোনভাবেই গ্রহণ করা যায় না। তাঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', নীলকণ্ঠ হিমালয়'-এর মত অনেক রচনাই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। আমাদের লক্ষ্য অবধূতের যথার্থ মূল্যায়ন। প্রসঙ্গত ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে সোনাগাছির নিষিদ্ধপল্লীর সাথে অবধূতের সম্পর্ক কেমন ছিল সেকথা জেনে নেব। ষষ্ঠীপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা অকপটে বলেছেন।

> ''কালীশবাবু পেট্রল পাম্প থেকে এগিয়ে বাঁদিকের একটি দোতলা বাড়িতে ঢুকে যাবার একটু পরেই প্রায় দশ-বারো জন সুন্দরী যুবতী হই হই করে ছুটে এল। শাড়ি পরা সেই সব মেয়েরা যেন শুভ্রতার প্রতীক। তাদের কেউ শাঁখ বাজালো, কেউ গঙ্গাজলে পা ধুয়ে দিল। সে কি ভক্তি। কেউ কেউ বলল, 'বাবা আপনার মরুতীর্থ হিংলাজ, উদ্ধারণপুরের ঘাট' বই আমরা পড়েছি। আপনাকে কখনও চোখে দেখব বা প্রণাম করতে পারব তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। আসুন আমাদের ঘরে একটু চরণের ধূলি দিয়ে যান।' অবধূত বললেন, 'নারে মা, আমাকে এখনই চলে যেতে হবে। বহুদিন পরে কলকাতায় এসেছি। তাই তোদের ওই সোনা মুখগুলো একটু দেখে গেলাম।''[৩৮]

---ঐদিন হাতিবাগানের মোড়ে কচুরি ও মালপোয়া খেতে খেতে অবধূত খানিকটা আত্মগত ভাবে বলেন যে তাঁকে একটি বিষয়ে সাক্ষী রাখছেন। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ও অবধূতের কথোপকথন একটু বিস্তৃতভাবে তুলে ধরছি :

"আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'কীসের সাক্ষী?'
'আজকের এই সোনাগাছির দৃশ্যটার। আমার চরিত্র নিয়ে কত লোকে কত খারাপ কথা বলে তা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। আমার প্রধান শিষ্যদের বউ মেয়েরা যখন তখনই আমার কাছে আসে বলে অনেকেই অনেক কটু মন্তব্য করে। নিত্যনতুন মেয়ে না হলে আমার চলে না এমন কথাও বলে অনেকে। কিন্তু তুমি তো জান যারা যারা আসে আমার কাছে তারা সবাই 'বাবা' বলে ভক্তিভরে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। আজও তো সেই ঘটনা হল। তাই আমার চরিত্র খারাপ করব বলে যদি কখনও সোনাগাছিতে আসি তখন ইচ্ছে করলেও কি ওদের কারো সঙ্গে শুয়ে পড়তে পারব? আমি বললাম, 'না। তা কখনও পারবেন না।"[৩৯]

আমাদেরও মনে হয় মুখরোচক আলোচনা বহু গুণী মানুষকে কলঙ্কলিপ্ত করে অবধূত তেমনি একজন ব্যক্তি যিনি একদা মৌনী সাধক ছিলেন তবু নিস্তার পাননি।

অবধূতের লেখা উপন্যাস-ছোটগল্পে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের সাধারণভাবে চরিত্রহীন বলা হয়ে থাকে। সমালোচকেরা এজন্য হয়ত তাঁকে নিন্দায় মুখর হয়েছেন। বিশেষ করে দেহপসারিণী মহিলাদের কথা আছে কিন্তু এঁরা পরিবেশ-জাত,স্বাভাবিক। তাকে ফেনিয়ে তোলার কোনো চেষ্টা লেখকের নেই। এটাই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় শংসাপত্র।

'বহুব্রীহি' গল্পের কথক একজন সন্ন্যাসী। কাশীতে তিনি অনেকদিন ছিলেন তাঁর মধ্যে আমরা অবধূতকে পেতে পারি। এখানে স্রষ্টা আর তাঁর সৃষ্টি যেন একাকার হয়ে গেছে:

"আবার সেই কালীতলার মা ঠাকরুণকে প্রণাম, আবার সেই বাঁ হাতি গলি, সেই অন্ধকার পথ দিয়ে এ গলি সে গলি পেরিয়ে যাওয়া। নিত্যকার ব্যাপার। এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, চোখ বুঁজেও চলে যেতে পারি।"[৪০]

---অবধূতের বিষয়ে খুব বেশী তথ্য আমাদের জানা নেই, আর না থাকাটা স্বাভাবিক কেননা পুলিশের চোখ এড়াতে তথ্য গোপন করতেই তিনি চেয়েছিলেন। তাই তাঁর সম্পর্কে যা-কিছু জানা যায় তাও অকাট্য তথ্য-প্রমাণ নির্ভর এমন দাবি করা যায় না। মনে রাখতে হবে পুলিশের ডায়ারিতে তিনি মৃত ব'লেই উল্লেখিত। অগত্যা তাঁর নিকট-আত্মীয় ও পরিচিত মানুষের দেওয়া বিবৃতির উপর আমাদের নির্ভর করতেই হয়। তাঁদের নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এখন 'জাগরণ' পত্রিকায় প্রকাশিত নানা পরিচিত-পরিজনের রচনা ও সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ থেকে আমরা ব্যক্তি অবধূতকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করবো। এখানে আমরা 'জাগরণ' পত্রিকায় প্রকাশিত সূচনা দেবী, শান্তনু চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয় আদ্যের নিবন্ধ থেকে অবধূতের জীবনের অনেক গুলি কথা তুলে ধরবো।

পুত্রবধূ সূচনা দেবীর[৪১] চোখে অবধূত

'তাঁকে প্রথম দেখি বেথুয়া ডহরিতে আমার দিদির বাড়িতে। একমাত্র পুত্রের উপযুক্ত পাত্রী নির্বাচনের জন্যই তিনি এসেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় তিনি আমাকে দেখে একটি প্রশ্নও করেননি।

শুধু মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েই স্বগতোক্তি করেন 'এ বেটি আমার ঘরে যাবেই। আসলে মুখ দেখেই মানুষ চিনে নেবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল বাবার। বিয়ের পর এ বাড়িতে এসেও আমি তার পরিচয় পেয়েছি।' এর পরেও তিনি বলেছেন :

> "এমন স্বনামধন্য সাহিত্যিক, এত ক্ষমতাবান মানুষ অন্তরটা তাঁর ছিল একেবারে শিশুর মতন। শিশুর মতই তীব্র অভিমান ছিল তাঁর। এজন্যই সামান্য মনোমালিন্যের কারণে নিজের একমাত্র পুত্রের সাথে (আমার স্বামী) ৫৬৩ দিন বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়! বিচ্ছেদের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি দিন কিন্তু লিখে রেখেছিলেন খাতার পাতায়।"[৪২]

সূচনা দেবী সুস্থ শরীরে এবং সপ্রতিভতার সাথে সে কথা নিজ মুখে চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের বাড়িতে ১৯.০৪.২০১৯ তারিখে আমাদের শুনিয়েছেন। এছাড়া অবধূতের স্বভাবের সাথে প্রপৌত্র তারাশঙ্করের চরিত্রগত অনেক মিলের কথাও তিনি জানিয়েছেন। অবধূত বিষয়ে আমাদের সত্যিই পরিতাপের শেষ নেই! পরিতাপের কারণ বহুরকমের। তিনি প্রৌঢ়ত্বে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকে অন্যতম উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেন রচনার ক্ষেত্রে। সজনীকান্ত দাস এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "তিনি আমারই মতো প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিতে চলিয়াছেন। এ বয়সে সাহিত্য-শিল্প-সৃষ্টির উপযোগী নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা থাকার কথা নয়"।[৪৩]

অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' প্রভৃতি উপন্যাসে বীভৎস রস থাকলেও সার্থক। কেউ কেউ মনে করেন 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' প্রভৃতি;কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবধৌতিক ক্রিয়াকলাপ অনর্থপাত ঘটিয়েছে। কেননা লেখক যেন মানুষের ও তাঁর সাহিত্যের মধ্যে একটাই টাইপ - চরিত্রকে দেখেন, যে সংসার-উদাসীন অথচ রমণীরমণে সুকৌশলী। মানুষমাত্রেই যেন 'তালব্য' রসের মাতলামিকে পছন্দ করেন এমন প্রত্যয় হয়ত তাঁর মধ্যে উঁকি দিয়েছিল। এখানেই তাঁর যাত্রাভঙ্গ। আমরা এই মতকে সমর্থন করিনা। 'সাচ্চা দরোবার', 'কলিতীর্থ কালীঘাট', 'মায়ামাধুরী', 'পথভুলে', 'দেবারীগণ', 'যা নয় তাই' ইত্যাদি উপন্যাস অবধূতের রচনা বৈচিত্র্যকে স্বতঃপ্রমাণিত করে।

'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' ও 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'-এর যিনি স্রষ্টা তিনি কেন আজও অনেক শিক্ষিত বাঙালির কাছে অজ্ঞাত আছেন তা জানা নেই। অবধূতের 'ভ্রমণ অমনিবাস' -এর বাজার যে মোটেই ভালো নয় তা সকলেই জানেন। উপর্যুপরি অন্যান্য বই (বেশিরভাগ 'যন্ত্রস্থ' বা বলা উচিত 'লোপত্ব') দুষ্প্রাপ্য। এর মধ্যে অবশ্য ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিয়েছে একটা ব্যাপারে। ব্যাপারটা হলো অবধূতের জীবনী সম্পর্কে বেশকিছু কৌতূহলী ব্যক্তি ইদানিং বেশ উৎসাহ দেখাচ্ছেন। দীপ্রকলম, জাগরণ কথাসাহিত্য, প্রসাদ ইত্যাদি ছাড়াও আনন্দবাজার পত্রিকায় ২০২০ সালের জুলাই মাসে অবধূত বিষয়ে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এর থেকে অবধূতের জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। এবার আমরাও অবধূতের সাহিত্য এবং

জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে জানতে অগ্রসর হবো।

'কালিকানন্দ অবধূত' তাঁর সাধন পর্বের নাম। দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলো তাঁর পিতৃদত্ত নাম। এবং পরবর্তীতে জোড়াঘাটে 'অবধূত' নামে তিনি সাহিত্য রচনা করেন। অতএব আসল মানুষটি হলেন বরিশালের দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যিনি তাঁর মধ্য বয়সে চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে বাড়ি করে সংসার পাতেন ও এখানেই অধিকাংশ সাহিত্য রচনা করেন। আমরা এক সাক্ষাৎকারে [৪৪] অবধূতের পৌত্র তারাশঙ্করের কাছে জেনেছি জোড়াঘাটে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' লেখেননি। এই বাড়িতে লেখা হয়েছিল ৪০ টি গ্রন্থ। চুঁচুড়ার স্টেশন চত্বর থেকে বাসে তোলাফটক পার হয়ে ঘড়ির মোড়। এরপর হাঁটার দূরত্বে জোড়াঘাট। এ তথ্য আমরা সকলেই জানি। কিন্তু 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসটির পশ্চাতে যে বাস্তব ও সত্যকারের একটা কাহিনি রয়েছে তা বোধ হয় অনেকেরই অজানা। এ বিষয়ে আলোচনার মধ্যেই তাঁর জীবন দর্শন ও শিল্প-নির্মাণ ভাবনার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে।

> "অবধূত মহাশয়ের একাধিক রচনাতে ধর্মজীবন ও ধর্মচর্যারত সন্ন্যাসী, তীর্থযাত্রী এবং গুরু জাতীয় মানুষের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ধর্মের প্রতি তাঁহার বিষয়গত আকর্ষণ যেমন প্রবল, ধর্মাচারীদের আত্মপ্রবঞ্চনা, অবরুদ্ধ যৌনকামনা, প্রতিষ্ঠালোলুপতা প্রভৃতি গোপন দুর্বলতার প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি সেইরূপ অসামান্যরূপ তীক্ষ্ণ। তাঁহার গ্রন্থ পড়িলে ধারণা জন্মে যে, ইন্দ্রিয়বিকার যেন ধর্মগত কৃচ্ছ্রসাধনের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। সুস্থ ও নির্মল ধর্মসাধনার চিত্র তাঁহার উপন্যাসে বড় একটা নাই। ধর্মব্রতী জীবনের প্রতি তাঁহার ব্যঙ্গকুটিল, তির্যক-ইঙ্গিতপূর্ণ, গোপনছিদ্রান্বেষী মনোভঙ্গী সদা-উদ্যত।"[৪৫]

পঞ্চাশ বছর বয়সে অবধূত লেখেন 'পিয়ারী'। সমালোচকের মতে :

> "তাঁহার শ্লেষের বাঁকা তরবারি ছদ্মভক্তির আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার বর্ণিত চরিত্র গুলির দূষিত অন্ত্র গুলিকে নিষ্কাষিত করিয়াছে। তাঁহার এই মানস প্রবণতার তাপজ্বালা তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার আধুনিকতম রচনা 'পিয়ারী'-তে (জুলাই, ১৯৬১) ব্যঙ্গরসিকের আশ্চর্য দ্যোতনা শক্তির মাধ্যমে উগ্রভাবে প্রকটিত হইয়াছে।"[৪৬]

'পিয়ারী' গল্পে তিনি এক সাধু মহান্তর জবানীতে গুরু সম্প্রদায়ের কুকীর্তিগুলি উল্লেখ করে তাঁদের জীবনচর্যার ভয়াবহ রূপ দেখিছেন। বিপরীত দিকে সত্যকার সংযমী সাধুচরিত্র এবং তার শিষ্যের সততাকেও অবধূত দেখিয়েছেন জগমোহন ও তাঁর গুরুদেবের মধ্য দিয়ে। একজন সুন্দরী মহিলাকে ভুলিয়ে নিজের শিবিরি আনলে রাত্রের অন্ধকারে শিষ্য জগমোহন ভণ্ড সাধুর নাক কেটে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। এভাবে অবধূত অন্যায়কারী ভণ্ড সন্ন্যাসীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এমন যে জগমোহন তাকে মরতে হলো আর এক কুলটা মহিলার জন্য! নারী হলেই ভালো আর পুরুষ হলেই খারাপ এমন তিনি ভাবেননি। পরিবেশ ও পরিস্থিতিই আমাদের বদলে দেয় অবধূত খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সেকথা তাঁর কথাসাহিত্যে জানিয়েছেন।

অজ্ঞাতবাসে অবধূত

দুলাল মুখার্জী তখন এক সাহেবকে হত্যা করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন অবিভক্ত এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলায় ,পাহাড়ে পর্বতে বনে জঙ্গলে। তবুও হঠাৎ করেই পুলিশের নজরে পড়ে গেলেন তিনি। যখন পালাবার পথ খুঁজছেন তখনই তাঁকে রক্ষা করলেন ফরিদপুর জেলার হরিণধরা গ্রাম নিবাসী বৃন্দাবনচন্দ্র দাস[৪৮] নামে এক সহৃদয় ব্যক্তি। তিনিও ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন। গোপন পথে নিয়ে এলেন ঢাকায়। সময়টা বর্ষাকাল ঝিরঝিরে বৃষ্টি সমানে চলছে। তার উপর ভীষণ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে পদ্মা। শক্ত হাতে হাল ধরে পদ্মাপারে নিয়ে যেতে লাগলেন বন্ধু দুলালকে। ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে তবুও রেহাই নেই। তারা কীভাবে যেন জেনে গেল ব্যাপারটা। নৌকো লক্ষ করে এগিয়ে এল স্পিড বোট। সেখান থেকে দু'দুটো গুলি ছুটে এল ফেরারী আসামীকে লক্ষ করে। ভাগ্য ভালো যে পদ্মার ডেউয়ের দোলনে দুটি গুলিই ফসকালো। চতুর বৃন্দাবন দাস শেষ চেষ্টা করলেন। কাঠের পাটাতন ফাঁক করে নৌকোয় খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন আসামীকে। ব্রিটিশ পুলিশ এসে চেপে ধরল বৃন্দাবনকে। বৃন্দাবনের তখন মাঝিমাল্লার বেশ। পুলিশ জানতে চাইল কিছুক্ষণ আগে এই নৌকায় যে ছিল সে কোথায় ? বৃন্দাবনও অকপটে বললন যে পুলিশের গুলির আঘাতে পদ্মায় পড়ে গেছে সে। তার মনে হয় লোকটি তলিয়ে গেছে, নয়তো ভেসে গেছে দূরে কোথাও। এরপর পুলিশ জানতে চায় :

> ''এই লোকটার পরিচয় জানো? ও একটা খুনের আসামী।' বৃন্দাবন বললেন, 'তা তো আমি জানি না। তবে ও আমার পরিচিত। ওর নাম দুলাল মুখার্জী। খুব বিপদে পড়ে আমার কাছে এসেছিল, তাই ওকে নদী পার করে দিচ্ছিলাম।''[৪৭]

---এরপর পুলিশের লোকের আর কী করার থাকে? উত্তাল ঢেউ তখন পদ্মায় একটু এদিক ও দিক খুঁজে নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নিল। মৃতের নামে ওয়ারেন্ট থাকে না। তাই জীবিত দুলাল মুখার্জী পুলিশের গুলিতে মৃত বলেই ঘোষিত হলো। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে আমাদের সাথে সাক্ষাতকারে পৌত্র তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় অবধূতের অসাধারণ সন্তরণ-দক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সাক্ষাতকারটি পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> ''ইতিমধ্যে জোরদার স্বদেশী আন্দোলনের সময় এক প্রভাবশালী ইংরেজকে গুলি করে হত্যা করেন এবং বাধ্য হয়েই চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যান। ব্রিটিশ সরকারের নজর এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ানো তখনকার দিনে খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। ওয়ারেন্ট জারি করে হন্যে হয়ে দুলাল মুখার্জীকে খুঁজে বেড়াতে লাগল পুলিশ। দুলালচন্দ্র তখন উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে 'অবধূত' হন-নাম হয় 'কালিকানন্দ অবধূত'।''[৪৮] ---সম্ভবত ১৯৩১ সালে তিনি এই দীক্ষা গ্রহণ করেন।

'বশীকরণ' উপন্যাসে এই সময়ের কথা আছে। 'বশীকরণ' উপন্যাসটি উত্তম পুরুষের জবানিতে লিখিত। কথক তাঁর জীবনের কথা বলছেন। কাহিনীর প্রয়োজনে চরিত্রের নাম ও

স্থানের পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। উপন্যাসে পুলিশী নির্যাতনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন অবধূত। রাজসাহীতে শেফালীর সাথে দ্বিতীয়বার দেখা হয় শেফালীর এক বন্ধুর বাড়িতে পুলিশের গুলি বিদ্ধ হয়ে কথক ছিলেন একমাস। সেখানে অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাঁকে শেফালী দিন-রাত সেবা ক'রে সুস্থ করে তোলে। এরইমধ্যে কখন প্রিয়তম সান্নিধ্যে উপন্যাসের নায়িকা শেফালী গর্ভবতী হয়। কথকের বক্তব্যানুসারে তিনি চলে আসার পর ওর বাবার সরকারী চাকরিটি চলে যায়।

'দুরি বৌদি' তথা 'শুভায়ভবতু'উপন্যাসে পোর্ট ট্রাস্টে চাকরির ভয়াবহ অনিশ্চয়তা, হৃদয়হীনতা, অত্যাচার-উৎপীড়নের কথা আছে। ১১৭ পৃষ্ঠায় আনন্দমঠের উল্লেখ আছে। পুলিশ কর্তা ব্রজমাধব চৌধুরীর বাড়িতে পড়ছিলেন কথক। ইংরাজ-বিরোধী গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কথা যেমন আছে তেমনি ধরা পড়ার পর ভয়াবহ উৎপীড়নের কথাও আছে পোর্ট ট্রাস্টের কালোবাজারির দৌরাত্মময়-অভিজ্ঞতার কথা 'ভোরের গোধূলি' উপন্যাসেও আছে। অর্থাৎ অবধূতের অজ্ঞাতবাসের অভিজ্ঞতাই যেন এসব উপন্যাসে রূপ পেয়েছে। সে সময় বন্দর অঞ্চলে একটা নৈরাজ্য যে চলছিল সেকথা অবধূতের উপন্যাসে গোপন থাকেনি। 'বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে লেখক রচনার মধ্যে সরাসরি নিজের নাম ব্যবহার করেছেন:

> ''কেউ কেউ হয়ত বিশেষ রকম ক্ষুণ্ণ হবেন এই ভেবে যে, অবধূত লোকটার চিত্তে তেমন শ্রদ্ধা নেই পাঠক-পাঠিকাদের সহৃদয়তার ওপর।''[৪৯]

আমাদের মনে হয় নিজের কথা গোপন করতে চাইলেও অনেকক্ষেত্রে সাহিত্যস্রষ্টারা তা পারেন না। সৃষ্টির সাথে একাত্মতা বোধহয় সেই না পারার কারণ। ব্যঞ্জনায় আমরা বুঝতে পারছিলাম 'বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসের কথক আর কেউ নন স্বয়ং অবধূত। এ প্রসঙ্গে বলা যায় অবধূত নিজের জীবনে ঘটা নানা অভিজ্ঞতাকেই স্বীয় রচনায় রূপ দিয়েছেন। জীবন খুঁজতে হলে সেই রচনাকেই ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। গবেষণা অভিসন্দর্ভে তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নিজের পরিচয় তিনি গোপন রেখেছেন বলেই অকপটভাবে তাঁর জীবনে ঘটা সত্য বিষয় গুলি লিখে যেতে পেরেছেন–এ কথা বলা বাহুল্য। গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে[৫০]খোঁজার কথা বলেছেন রানী চন্দ আর নীরোদ শ্রী চৌধুরী। বর্তমান অভিসন্দর্ভে অবধূতের জীবনী-সন্ধানে তাঁর রচিত কথাসাহিত্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন। এই সূত্রে আমরা অবধূতের বিভিন্ন উপন্যাসের প্রসঙ্গকে তাঁর জীবন বিষয়ক নির্ভুল তথ্য হিসেবে দাবি করতে পারি।

তিন : কথা-সাহিত্যের প্রকাশকাল

অবধূত ২২ বছর ধরে কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৬ সাল। প্রথম উপন্যাস 'মরুতীর্থ হিংলাজ'। এটি ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত। শেষ উপন্যাস 'পথে যেতে যেতে'-র প্রকাশকাল ১৯৭৬ সাল। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে অবধূত রাহী জীবনের পরিচয় তাঁর বহু উপন্যাস আর ছোটগল্প কিম্বা বড়োগল্পে রেখেছেন। এ সব গ্রন্থ জীবনসত্য আর সাহিত্যের কল্পনায় সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। তাইবলে গ্রন্থের প্রকাশকালকে অবধূতের জীবনাভিজ্ঞতার ক্রমানুসারে

সাজিয়ে নেওয়া যাবে না। প্রথম প্রকাশিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' (১৯৫৪) গ্রন্থটি লেখকের রাহী জীবনের অন্তিম পর্বের ঘটনাকে অবলম্বন করে লেখা। সন্ন্যাসগ্রহণের প্রায় আঠারো বছর পরের কথা 'মরুতীর্থ হিংলাজ' এবং 'হিংলাজের পরে' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। অবধূতের ভৈরবী সরোজিনী দেবী ১৯৭৭ সালের ১৭ই অগাস্ট দেহ রাখেন। এরপর একাকীত্ব জ্বরায় আক্রান্ত অবধূত-এর মদ্যপান প্রচণ্ড বেড়ে যায়। এক বছরের মধ্যেই ১৯৭৮ সালের ১৩ ই এপ্রিল অবধূতও মারা যান। জীবিতকালের শেষ দুবছর অর্থাৎ ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ সালে অবধূতের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। অতএব সাহিত্য সাধনার মোট সময় ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৬* সাল পর্যন্ত এই ২২ বছর ধরাই যায়। এই পুরো সময়টাই তিনি উপন্যাস-ছোটগল্পই রচনা করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত ক্যাটালগ ঘেঁটে এ পর্যন্ত জানা গেছে যে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৪৯**। তুলি-কলম, মিত্র ও ঘোষ ছাড়াও অন্যান্য পাবলিশার্স[৫১] থেকে অবধূতের বই প্রকাশিত হয়েছিল। ক্লাসিক প্রেস, অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, গুপ্ত প্রকাশিকা, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ত্রিবেণী প্রকাশন (ক্রীম) ইত্যাদি প্রকাশনার নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান-এর সাহায্যেও নতুন কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান আমরা পেয়েছি। এখন অবধূতের লেখা মোট মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা কত ---এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো মুদ্রণ বিভ্রাটের ফলে একই গ্রন্থ একাধিক নামে বেরিয়েছে। যেমন 'আমার চোখে দেখা (১৯৭৫) 'পথে যেতে যেতে' (১৯৭৬) এবং 'ফক্কড়তন্ত্রম'(১৯৬৮) যথাক্রমে 'টপ্পাঠুংরি'(১৯৬৯) ও 'দুর্গম পন্থা'(১৯৬০),'বশীকরণ' (১৯৬০)-এরই অন্য নাম। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয়েছে এই জন্যও যে অবধূতের গ্রন্থতালিকায় উল্লিখিত অনেকগুলি গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। সেগুলি পাওয়া গেলে নিশ্চিত করে বলা যেত তাঁর মৌলিক গ্রন্থ ঠিক কটি এবং তাঁর শেষ রচনা কোনটি। সে-সব বাদ দিলে অবধূতের মোট মৌলিক গ্রন্থ আমাদের মতে ত্রিশটি। আর গবেষণা-প্রাপ্ত নিচের গ্রন্থ গুলির নির্মিত তালিকার[৫২] ভিত্তিতেই অবধূতের কথাসাহিত্য সাধনার সময়কাল যে ১৯৫৪-১৯৬৯ সাল তা স্পষ্ট করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য আমরা যে গ্রন্থগুলির নাম পেয়েছি অথচ তাদের সরেজমিনে দেখতে পাইনি তারা যদি কোনোদিন প্রকাশ্যে আসে তবে আমাদের নেওয়া সিদ্ধান্তকে অবশ্যই প্রাপ্ত তথ্যের দ্বার সংশোধিত করতে হবে। আমাদের আশা অবধূতের মৌলিক গ্রন্থ এবং তাঁর সাহিত্য-সাধনার খবর ভবিষ্যতে আরো সুস্পষ্ট হবে।

পাদটীকা:* 'পথে যেতে যেতে' (১৯৭৬) এই বইটি আসলে 'দুর্গম পন্থা'(১৯৬০) এর ভিন্ন নাম। তাই পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী অবধূতের শেষ রচনা 'টপ্পাঠুংরি' ও ' দেবারীগণ' – এই গ্রন্থদ্বয় ১৯৬৯ সালে রচিত। অতএব অবধূতের সাহিত্য সাধনার সময়কাল ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত মোট পনের বছর। ** দ্রষ্টব্য: অবধূতের সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা, গ্রন্থপঞ্জি, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭

অবধূতের রচিত কথাসাহিত্য

১. অনাহুত আহুতি, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৬০
২. অবিমুক্ত ক্ষেত্রে, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৬৩
৩. উত্তর রামচরিত, দেবশ্রী সাহিত্য সমিতি, কলকাতা, ১৯৬০
৪. উদ্ধারণপুরের ঘাট, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৫৬
৫. একটি মেয়ের আত্মকাহিনী, ১৯৬০
৬. একা জেগে থাকি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭
৭. একাঘ্নী, (রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন)
৮. কঙ্করতন্ত্র (গ্রন্থটি আমরা সরেজমিনে দেখতে পাইনি,এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে)
৯. কলিতীর্থ কালীঘাট, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৫
১০. কান পেতে রই, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৬০
১১. কৌশিকী কানাড়া, কলিকাতা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৬৩
১২. ক্রীম, ত্রিবেণী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬০
১৩. টপ্পাঠুংরি, ক্লাসিক প্রেস, কলিকাতা, ১৯৬৯
১৪. তুমি ভুল করেছিলে, ১৯৬০
১৫. তাহার দুই তারা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯১৯
১৬. দুই তারা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৫৮
১৭. দুরি বৌদি, ১৯৫৮
১৮. দুর্গম পন্থা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬০
১৯. দেবারীগণ, গুপ্ত প্রকাশিকা, কলকাতা, ১৯৬৯
২০. ন ভূতং ন ভবিষ্যতি
২১. নিরাকারের নিয়তি, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৬৩
২২. নীলকণ্ঠ হিমালয়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৫
২৩. পথভুলে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৬২
২৪. পিয়ারী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬১
২৫. বশীকরণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬০
২৬. বহুব্রীহি, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪
২৭. ভূমিকালিপি পূর্ববৎ, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৬০
২৮. ভোরের গোধূলি,তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৬৯
২৯. মন মানে না, ১৯৬০
৩০. মরুতীর্থ হিংলাজ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৫৪
৩১. মায়ামাধুরী, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬০
৩২. মিড় গমক মূর্ছনা, অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৮

৩৩. যা নয় তাই (?)
৩৪. শুভায় ভবতু, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৫৭
৩৫. সপ্তস্বরা পিনাকিনী, প্রথম প্রকাশকাল ও প্রকাশক অজ্ঞাত
৩৬. সাচ্চা দরবার, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬০
৩৭. সাধনা (গ্রন্থটি আমরা সরেজমিনে দেখতে পাইনি,এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে)
৩৮. সীমন্তনী সীমা, ১৯৬২
৩৯. সুমেরু কুমেরু, জ্যোতি প্রকাশন, ১৯৭২
৪০. স্বামীঘাতিনী, ১৯৬০, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত অবধূত শতবার্ষিকী সংকলন, ১৯৭০
৪১. হিংলাজের পরে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৬২

কথাসাহিত্য রচনার প্রেক্ষিত

অবধূতের কথাসাহিত্য রচনার প্রেক্ষিত বুঝতে 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অবধূতের রচনায় যে পথের দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-তার সম্যক পরিচয়ের ক্ষেত্রে এই উপন্যাসটির প্রথমাংশ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের কলকাতার প্রেতাবেশ, তন্ত্রসাধনা, গুরুবাদ, ঈশ্বর-বিশ্বাস - নানা সংবাদ আমরা এখানে পাই। কবিতা বা নাটক তাদের দীর্ঘদিনের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে সমালোচকদের নানা নিয়ম-অনুশাসনের শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এক সংবদ্ধ আর্ট-ফর্মের রূপ নিয়েছে। তাছাড়া উপন্যাসের জগতে কোনো অ্যারিস্টট্ল বা ভরতের আবির্ভাব ঘটেনি, ফলে এখানে স্রষ্টার অবাধ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। পাঠকের কাছে উপন্যাসের আবেদন বর্ণনা করে মার্ক স্কোয়ার বলেছেন : 'as though it were not at all but an immediate transcript of life, a journalistic form of history'

উৎকৃষ্টতার হিসাবে যদি সাজিয়ে নিই তবে রচনার ক্রম হবে : ১. নীলকণ্ঠ হিমালয় ২. মরুতীর্থ হিংলাজ ৩. উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪. বশীকরণ ৫. কলিতীর্থ কালীঘাট ৬. সপ্তস্বরা পিনাকিনী ৮. কৌশিকী কানাড়া ৯. দেবারীগণ ১০. বিশ্বাসের বিষ ১১. ভোরের গোধূলি ১২. 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫) অবধূতের লেখা একটি অসাধারণ উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ হিমালয়। 'উপন্যাস' এই প্রকরণটি সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় পৌঁছাতে প্রায় সকলেই অক্ষম। সকলেই এ বিষয়ে সহমত পোষণ না করার কারণ হল এর বহুবিচিত্র সত্তা। গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করব।

'নীলকণ্ঠ হিমালয়' (১৯৬৫) ভ্রমণমূলক উপন্যাস নয়। ব্যতিক্রমী। এখানে হিমালয়বাসী পরিশ্রমী সাধারণ মানুষ,সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীর মতো গৃহত্যাগী পথিক মানুষ আছেন -তাদের জীবনের কথাই প্রধানত ব্যক্ত হয়েছে। হিমালয় দর্শনের প্রাকৃতিক অনুভূতি বর্ণিত হয়নি। ।এই উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই যে অবধূত তিনবছর ধরে হিমালয়ের বিভিন্ন এলাকাতে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে গেছেন। তখন তাঁর বয়স ২১ থেকে ২৪

বছর। সেদিনের সেই স্মৃতি গুলিই লিপিবদ্ধ করেছেন। উপন্যাসের আঙ্গিকে। যখন উপন্যাসটি লিখছেন আর যখন হিমালয়ের মধ্যে তিনি কাটাচ্ছেন এই দুটি সময়ের মধ্যে প্রায় ত্রিশ বছরের ব্যবধান। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগেই বলে রাখা ভালো কোনো নিটোল কাহিনির অনুসন্ধান এখানে বৃথা। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য কথক ওরফে অবধূত বিচিত্র মানুষের কাছে গেছেন। হিমালয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপট বলতে গিয়ে এসেছে নানা মানুষ ও পরিবেশের কথা। আলাদা করে প্রতিটি প্রসঙ্গ খুবই চিত্তাগ্রহী -তবে পরস্পর সংযুক্ত নয়। আমরা উপন্যাসটির উপক্রমণিকায় কিছু মানুষের কথা বলে নেবো।

এখানে দেখা গেছে লেখক পথে নেমেছেন। হিমালয়ে যাচ্ছেন। গৃহত্যাগ করে তিনি যাবেন সেটা আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। চিত্তেশ্বরী মন্দিরের এক সন্ন্যাসী সে ভবিষ্যৎ -এর কথা বলে দিয়েছিলেন। সুবাসী দিদির সামনে সেই সন্ন্যাসী যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তখন তিনি বিশ্বাসই করেননি, যে তিনি কখনোই হিমালয়ে আসবেন বা হিমালয়ের জীবন নিয়ে তিনি লিখবেন। কিন্তু তাঁর কপালে সেটা জন্ম সময়েই বোধ হয় লেখা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি সত্যিই হিমালয়ে কাটালেন তিনটি বছর। তিনটি বছর যে কাটালেন তা-কি সোজা ভাবে? 'মৌনী ব্রত', 'অজগর ব্রত', 'পঞ্ছীব্রত'-এই তিনটি বড়ো বড়ো ব্রত কাঁধে নিয়ে তিনি হিমালয়ে কাটিয়েছিলেন। 'মৌনী ব্রত' অবলম্বন করলেন-অর্থাৎ তিন বছর নিজের মুখে কোনো কথা বলেননি। কোনো প্রয়োজনে ইঙ্গিত পর্যন্ত করতে পারবেন না। কথা তো নয়-ই -এই ব্রতের নাম মৌনী ব্রত। সেই সাথে 'অজগর বৃত্তি' ও 'পঞ্ছী বৃত্তি'। 'অজগর বৃত্তি' এবং 'পঞ্ছীবৃত্তি' কাকে বলে তা আমরা জেনে নিয়েছি 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাস পড়ে। অজগর সাপ নিজের শিকার নিজে সন্ধান করে না, যে সন্ন্যাসী ভিক্ষা করেন না যা জোটে তাই খান---তিনি এই ব্রতধারী। খাবার জোগাড় করতে নিজে চেষ্টা করবেন না---এই ব্রতের এটাই নিয়ম।

পাখি যেমন নিজের খাবার জমা করে না তেমনি খাবার কেউ দিলেও দিনের টুকু নিয়ে সবটাই বিলিয়ে দিতে হবে। পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করতে পারবেন না। এই নিয়ম পালন করতে হয় পঞ্ছীব্রতধারীকে। অবধূত 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসে তিনটি ব্রতের নিয়ম আমাদের জানিয়েছেন।

লাগামহীন কৈশোর

কথক তাঁর জীবনের শুরুতে যা ঘটেছিল তা আমাদের শুনিয়েছেন। ধনঞ্জয় সোম কীভাবে নেড়া সোম বা নুলো সোম হোল তার ইতিহাস জানা গেছে এই সূত্রে। বোমা বাঁধতে গিয়ে সে মরতে বসেছিল। এই 'নেড়া' -ই খবর নিয়ে এসেছিল প্রফেসর মজুমদারের। 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসে ইনি একটি আকর্ষণীয় চরিত্র। ইনি হিমনোটইজ করতে পারতেন। প্রেতাবেশ ঘটাতে পারতেন। এঁর কাছে এসে কথক দেখেছিলেন চোখ বাঁধা অবস্থায় কীভাবে শব্দ শুনে তীর বিদ্ধ করা যায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

সুবাসী দিদির বাড়িতে তিনি ভাড়া থাকতেন পরে এঁর সাথে মনোমালিন্য হওয়াতে সুবাসী

দিদি কথককে নিয়ে আসেন চিত্তেশ্বরী মন্দিরে। 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫)-এ অবধূতের যেসব অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানতে পারি তা বিভিন্ন মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। যেমন প্রথমেই আমরা জানতে পেরেছি মালবারের[৫৫] ছেলে তার নাম ছিল নারায়ণ সানা, কান ফাটা নারায়ণ স্বামী বলা হতো তাকে, সে ভালো করে হিন্দী বলতে পারতো না এবং তার বয়স কুড়ি পার হয়নি, তার জীবনে একটা ঘটনা ঘটে। গোরখপুরে[৫৬] এক শেঠ হরিণের চামড়া দেওয়া শুরু করে, সেই হরিণের চামড়া সে চায় কিন্তু সে পায়নি, অভিমান করে বসেছিল, সেই বাচ্চাটিকে আবার দেড় বছর পর কেদারের কাছে এক চটিওয়ালার দরজায় পড়ে থাকতে দেখেন অবধূত। তার গা ময় ঘা, মুখের উপর মাছি ভ্যানভ্যান করছে, দুই চোখে বরফের চাহনি। চটিওয়ালার কাছ থেকে জানা গেল যে, একটা দারুণ অত্যাচার তার উপর হয়ে গেছে নাগা সাধুদের দ্বারা।' নীলকণ্ঠ হিমালয়'-র ১৭১ পৃষ্ঠায় তার বর্ণনা আছে। এখানে অবধূত সংযতবাক।

"বলবার দরকারও ছিল না। বুঝতে পারলাম, যারা নাগা হয়ে ইন্দ্রিয় জয় করার সাধনা করেন তারা ওর তাজা দেহটা পেয়ে জোরসে তপস্যা চালিয়েছিলেন।" -এর পরেই অবধূত মন্তব্য করছেন :'বিষ আগাগোড়া' অর্থাৎ 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসে পাঠক যদি আধ্যাত্মিক জগতের অমৃত আশা করেন, তা হলে হতাশ হতে হবে। হিমালয়বাসী মানুষের মনের বিষে যেন হিমালয় 'নীলকণ্ঠ' হয়ে গেছে এবং এই সমস্ত অনাচার সেখানে হয় বলেই লেখকের মনে হয় নীলকণ্ঠের কিরীট চিরতুষারমণ্ডিত কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন। উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে স্মৃতি থেকে। অনেক মানুষ আর দুর্গমপথের প্রত্যক্ষ পরিচয় নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস, ফলে সাধারণ উপন্যাসের প্রত্যাশা নিয়ে এখানে কাহিনি-সন্ধান পণ্ডশ্রম।

উপন্যাসের অগ্রগমনে আমরা দেখেছি যে এ উপন্যাসে স্মৃতিচারণা করেছেন অবধূত। স্মৃতিচারণার আঙ্গিকে রচিত উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' (১৯৬৫) নিজে কীভাবে সন্ন্যাসী হলেন-এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন ছত্রিশ বছর আগের এক সন্ধ্যায় সর্বপ্রথম উনি জানতে পেরেছিলেন যে নীলকণ্ঠ তথা হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবে। সেই পরিচয়টা হবে মর্মান্তিক ধরণের। যখন ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিলেন স্বাভাবিকভাবে তখন তিনি বিশ্বাস করেননি কিন্তু একসময় জীবনে আশ্চর্যজনকভাবে তা সত্যি হলো। এইবার সেই সত্যিটা কীভাবে হয়েছিল সেটা তাঁর মনে পড়ছে-লেখকের জবানীতে পাঠক উপন্যাস-সূত্রে জেনে যাচ্ছেন। এইভাবে উপন্যাসটির আগ্রগমণে একটির পর একটি অভিজ্ঞতা কাহিনি-সূত্রে এসে গেল এলো নানা চরিত্র। তাঁর বিশেষভাবে মনে পড়ে যে উত্তরকাশীতে কালীবাড়িতে মা আনন্দময়ী তাঁর বাক্‌শক্তি হরণ করে নিয়ে কানে কানে বলে দিয়েছিলেন :

> "চোখ চেয়ে দেখবি, কান পেতে শুনবি আর বুদ্ধি দিয়ে বুঝবি জিভ বার করে দাঁত কামড়ে থাকলে কি কেউ কিছু বলতে পারে রে তাই তোর মা জিভ বার করে দাঁত কামড়ে রয়েছে। ঐরকমটাই করে দিলুম। যা ঘুরে বেড়াগে যা। যাকে খুঁজছিস এইবার সে ধরা দেবে।" [৫৭]

অবধূতের এ সময় বয়স আনুমানিক ৪২ বছর। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সূত্রে হিমালয়ের

নানা ধরণের মানুষ,তাদের জীবন-যাপন, সংস্কার যেমন এসেছে তেমনি আধ্যাত্মিক চর্চার নানা পথানুসন্ধান-বিচিত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান—সবই এ উপন্যাসে এসেছে। আমরা পরে এ প্রসঙ্গে জানতে পারব বিশদে। আপাতত আমরা দেখছি যে ন্যাড়া সোমের কথা বিশেষভাবে সন্ন্যাস-প্রসঙ্গে উপন্যাসের শুরুতেই পটভূমি হিসেবে আসছে। বলাবাহুল্য এই পটভূমি উপন্যাসের প্রকৃতি নির্ধারণে সাহায্য করেছে। ন্যাড়াসোমের সঙ্গে তার ছোটবেলার পরিচয়। ধনঞ্জয় সোম ন্যাড়া আর নুলো এই দুরকম কেন হোলো তা বলেছেন কথক তথা লেখক। তারা দুজনে বোমা বাঁধতে গিয়েছিল এবং বোমা বাঁধতে গিয়ে দুজন দুটো কাজ করছিলো। ন্যাড়ার নাম তখন কেবল ধনঞ্জয় সোম-ই ছিলো।

বোমা বাঁধার একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন লেখক। কৈশোর বয়স্ক ধনঞ্জয় ওরফে ধনা সোম পাট পাকিয়ে বাঁধছে, হাত দুখানা রয়েছে একটা গামলার ওপর। গামলা ভর্তি মেথিলেটের স্পিরিট। হাবু লাহিড়ী একটা মগে করে সেই স্পিরিট তুলে ওর হাতের ওপর ঢালছে, বাঁধা হয়ে যাওয়ার পর বড়ো জোর মিনিট পনেরো লাগবে স্পিরিটটুকু উবতে তখন আলতো করে মালটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বোমাটি ফেটে যাবে। এই অবস্থায় ঘটলো দুর্ঘটনাটা।

এটা হয়েছিল ভূত চতুর্দশীর দিন। মল্লিকদের পোড়ো আস্তাবলের ভিতরে এই মাল বানানো চলছিলো। উপন্যাসের ১৭৩ পৃষ্ঠায় তার বর্ণনা আছে। বোঝাই যাচ্ছে এ বর্ণনা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরের। সম্ভবত ঘটনাটি ঘটে ১৯২৮ সাল নাগাত। লেখকের বয়স তখন ১৮ বছর।

> ‘‘গিয়ে দেখি একদম পরিষ্কার আস্তাবলটাই উড়ে গেছে পেছনেই একটা বেলগাছ ছিলো তার প্রায় অর্ধেকটা সাবাড়। ইঁট, সুড়কি, কড়িবরগা সরিয়ে ওদের বার করা হলো। হাবিটার মুখ মাথার অর্ধেকটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ধনার বাঁহাতের কব্জির নীচে থেকে উধাও হয়েছে দেখা গেল।’’[৫৮]

মাথার চুল সব পুড়ে গেছে। তাই সে এখন ‘ন্যাড়া’। আর হাতের কব্জি থেকে উড়ে গেছে বলে সে আরেকটি নাম পেলো -‘নুলো’। সে যাই হোক এইভাবে যে ছেলেটি নুলো হয়ে গেল সে কিন্তু থেমে থাকলো না সে-ই প্রথম এসে একটা নতুন খবর দিলো। একটি আশ্চর্য ক্ষমতাশালী এক মানুষের এই খবরের বিশেষ দাম আছে সে বয়সের বাউণ্ডুলেদের কাছে।

অলৌকিকতার জগৎ ও অবধূত

মানুষটি হলেন প্রফেসর মজুমদার। ইনি ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ থেকে বিস্তর উপাধি পেয়েছেন এবং তাঁর কাছেই এরা গিয়ে হাজির হলো। ভদ্রলোকের ব্যতিক্রমী চেহারার বর্ণনা আছে---একটু বেঁটেখাটো শক্তগোছের মানুষ, দুটো চোখ অস্বাভাবিক সাদা---ইনিই প্রফেসর মজুমদার। এঁর চোখের মধ্যে যে দুটো তারা আছে তা মনেই হয় না। প্রথম দিনেই তাঁর অসাধারণ শক্তি দেখালেন শব্দ ভেদি বাণ নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে। পঁচিশ হাত সামনে থেকে ধনুক বাণ নিয়ে একটি টুলের উপর বসলেন তিনি। একখানা বড় রুমাল নিয়ে তাঁর

চোখ বেঁধে দেওয়া হল, দুটো কান খোলা আছে, তিনি ঘন্টা গুলোর দিকে পেছন ঘুরে বসলেন তারপর ১ ২ ৩ করে যখনই নেড়া ঘন্টার গায়ে বাড়ি মারছে প্রফেসার চোখ বাঁধা অবস্থায় বাণটা ছাড়ছেন এবং পরপর ১ ২ ৩ ৪ ৫ পাঁচটা বাণ লক্ষ্যভেদ করছে ! এ অবিশ্বাস্য ঘটনা তারা দুজনে নিজের চোখে দেখল। কিশোর বয়সে দুলাল মুখোপাধ্যায় যে বেশ স্বাধীনভাবে জীবন কাটিয়েছেন --তা বোঝা যায়। সে যাই হোক, দুই কিশোর বয়স্ক বন্ধুর আরো অনেক কিছু দেখবার তখনও বাকি ছিলো। দ্বিতীয়বার অনেককে বিস্মিত করে প্রফেসার হিপনোটজিমের খেলা দেখালেন দমদমের এক বাগান বাড়িতে। সেখানে দেখা গেল একজন রায়বাহাদুরকে তিনি হিপনোটাইজ করেছেন। তাঁকে বলছেন ‘চড়ে বসুন আপনার ঘোড়ার ওপর, আপনি খুব ভালো ঘোড়া চড়েন শুনেছি, দেখান আমাদের ঘোড়ায় চড়ার কায়দা’ বলে তাকিয়ার এক মাথার দড়ি খুলে তাঁর হাতে দিলেন। মোসাহেবরা হুজুরের কাণ্ড দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে এবং তিনি তখন এতটাই হিপনোটাইজড হয়ে আছেন যে তাকিয়ার দুপাশে দু’পা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসেছেন আত্মমর্যাদা ভুলে। হোতকা রায়বাহাদুর তাকিয়ার দড়ি দুহাতে ধরে ‘হেট্ হেট্’ করে ঘোড়া হাঁকাতে শুরু করেন।

এরপরে তৃতীয় বিস্ময়। ন্যাড়া এবং কথক এঁরই কাছে ‘প্রেতাবেশ’ বিষয়টা শিখলেন। দেখা গেল এই প্রেতাবেশের ফলে নানানরকম ঘটনা ঘটে। বিষয়টি হলো ‘প্রেতের আবেশ’ তাই ঘটে যাওয়া ঘটনাটির নাম ‘প্রেতাবেশ। চোখের সামনে না ঘটলে কী করে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, যে মানুষ ইংরেজি পর্যন্ত জানেনা অনর্গল সে ফরাসি ভাষায় বক্তৃতা করতে লাগল কিম্বা জীবনে যে ‘সা রে গা মা পা’ সাধেনি সে হঠাৎ উঁচু ঘরানার ভৈরবি- ঠুংরি জুড়ে দিল!--এই ঘটনায় যে প্রেতের আগমন ঘটলো সে তো ক্ষতিকর নয় কিন্তু খারাপ প্রেতের ব্যাপারটা যথেষ্ট ভয়ের। তার একটা প্রত্যক্ষ বর্ণনা করছেন অবধূত। তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছিল সেই ঘটনাটা। এক যুবক ভূত-প্রেত কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করে না। ‘প্রেতের আবির্ভাব’ বলে কিছু একটা হতে পারে, সে কিছুতেই মানবে না। তখন সেই ছোক্‌রাকে তিনি ডাকলেন এবং তাকেই হিপনোটাইজ করলেন এবং তারপর তার উপর প্রেতাবেশ ঘটালেন। সে বর্ণনাটি এই রকম যে দুহাত মেলে এগিয়ে গেলেন প্রফেসর ছোকরার শরীরের এক বিঘত ওপর দিয়ে খুব আস্তে আস্তে বারকতক সঞ্চালন করলেন হাত দুখানা, তারপর ওঁর নিজস্ব ঢঙে অমানুষিক স্বরে হুকুম দিতে লাগলেন ‘ওঠ, উঠে বস।’ তখন একটু একটু করে সোজা হয়ে উঠতে লাগলো তার কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত। বীভৎস অবস্থা হয়েছে তার চোখ মুখের। চোখের তারা দুটো কপালের পেছনে ঠেলে উঠেছে। আধখানা জিভ বেরিয়ে পড়েছে। নাকের ফোড় দুটো ফুলে উঠেছে অস্বাভাবিক রকম। উঠে বসবার পর পৈশাচিক আওয়াজ বেরোতে লাগলো জিভ বার করা মুখ থেকে। ধাঙড়রা খুঁচিয়ে শুয়োর মারে যখন তখন ঐ জাতের একটা চিৎকার করে শুয়োরে। ব্যাপার দেখে কয়েক হাত পিছিয়ে গেলেন প্রফেসর। তাঁরও চোখ দুটো তখন কপালে উঠে গেছে। ভয়াবহ কণ্ঠে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ‘কে তুমি ? তুমি কে?’ ইতিমধ্যে লোকটা সটান উঠে দাঁড়ালো দু হাত মেলে এগিয়ে গেলো প্রফেসরের

দিকে। হুঙ্কার শব্দ করতে করতে। অন্য যাঁরা ছিলেন ঘরে তাঁরা হুড়ো হুড়ি করে ঘর ছেড়ে পালালেন। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর 'ধরো ধরো, ধরে ফেলো ওকে। এরপরে আরো চার পাঁচ জন সাকরেদ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। তুলকালাম কাণ্ড হতে লাগলো। রোগা পটকা ছোকরার শরীরে তখন অসুরের শক্তি। ঘরের আসবাব লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল। শেষে কোনোরকমে তাকে ফেলা হল ঘরের মেঝেতে। ঠেসে ধরে রাখলো সকলে। একটু এগিয়ে এসে প্রফেসর আদেশ দিতে শুরু করলেন 'ঘুমোও, ঘুমিয়ে পড়ো, তুমি ঘুমাচ্ছো, ভয় নেই, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকো তুমি।' ক্রমেই কাঠের মত শক্ত শরীরটা এলিয়ে পড়তে লাগলো। তারপর তার মুখ চোখের অবস্থাও পাল্টালো। তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা সরে দাঁড়ালাম। এর পরেই প্রফেসর বললেন

> "তোমাদের জন্য বেঁচে গেলাম আজ একটা শয়তান কুপ্রেত এসে গিয়েছিল। মারা পড়ত ছোকরাও। এ যাত্রা খুব বেঁচে গেল।"[৫৯]

বর্ণনার গুণে পাঠকের এমন উপলব্ধি হয় যেন লেখকের শৈশবের ঘটনা তাঁরাও চোখের সামনে দ্বিতীয়বার ঘটতে দেখলেন। ঔপন্যাসিকের চরিত্র নির্মাণ এবং কাহিনি নির্মাণের অসাধরণ নৈপুণ্য এখানেও স্বতোপ্রমাণিত। কিশোর বয়সের এমন দামাল স্বভাবের জন্য অনেক সময় বিপদের সম্মুখীনও হতে হয়েছে। কথকের স্বগতোক্তিতে জানা গেল নিমতলা স্ট্রিটে প্রফেসর মজুমদারের পাল্লায় পড়াটা যতটা সহজ ছিল বেরিয়ে আসা ততটাই কঠিন। এই অবস্থায় আমরা আরো একটি ঘটনা পেলাম। এবার এলো সুবাসী দিদি। এটি উপন্যাসের ১৭৬ পৃষ্ঠায় আছে। সুবাসী দিদি এখন মজুমদারের সাথে বিরোধিতায় নেমেছে। এক সময় খাতির ছিল এখন বিরাগ। 'বুকে বসে দাড়ি উপড়োবি?' –এই হোল সুবাসীর আক্রোশ। সুবাসী দিদি তাঁকে তাড়াতে পারছে না কারণ ততক্ষণে প্রফেসরের অনেক সাগরেদ জুটে গেছে। সেই সাকরেদদের অন্যতম ন্যাড়া ওরফে ধনঞ্জয় এবং কথক রূপী অবধূতকে তাই সরানোর চেষ্টা শুরু হোল। উদ্দেশ্য প্রফেসরের ক্ষমতা কমানো। বাড়িউলি 'সুবাসীদি'-র মধ্যে দিয়ে নারীর এক ভিন্ন রূপ দেখালেন অবধূত। এই ধরনের নারী কোনো ন্যায় নীতির ধার ধারে না। নিজের জৈব ইচ্ছাটুকু পূরণ করার সূত্রে নিজের জন বা দুর্জন বলে ধরে নেয়। এক্ষেত্রে প্রফেসরকে তাড়ানোর চেষ্টায় 'সুবাসীদি' উঠে পড়ে লাগলো।সেইমতো কথক অবধূতকে একটা টোপ দেওয়ার জন্য নতুন সাধুর খোঁজ দিলেন। পূর্বজন্ম এবং পরজন্ম সম্পর্কে অভ্রান্ত কথা বলতে পারেন এই সাধু। ১০৮ বছর যিনি সূর্যের দিকে তাকিয়ে একাসনে ঠায় তপস্যা করেছেন হিমালয়ে। তাঁকে শহরে আসতে হোলো কেন -এই সন্দেহের নিরসন ঘটালেন সুবাসী দিদি।

> "মহাপুরুষ নিজের গুরুর আসন দেখতে এসেছেন। কলকাতা শহর যখন শহর হয়ে ওঠেনি তখন চিত্তেশ্বরী তলাতে ১০৮ টা[৬০] নরবলি দিয়ে যিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনিই হলেন এই মহাপুরুষের গুরু।"[৬১]

---সুবাসী দিদি' 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র।

সময়টা মোটামুটি বিশ শতকের তৃতীয় দশক লেখকের বয়স তখন ২১-২২ বছর। অবধূতের

এই নতুন সাধুর সাথে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে উপন্যাস-কথক জানিয়েছেন যে সময়টা গভীর রাত। তখন নিঃশব্দ ঘর। উপস্থিত সব ভক্তরা জানেন সাধু আসবেন আর সামনের ঐ আসনে এসে বসবেন। খুব সম্ভব গঙ্গায় গেছেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটু সন্ত্রস্ত ভাবে সবাই নড়ে উঠলেন। তারপর ধ্বনিত হলো মন্দিরের ঘন্টা। গেটের সামনে চিত্তেশ্বরীর মন্দির। অনেকগুলি ঘন্টা ঝুলছে সেখানে। সব কটা ঘন্টা বেজে উঠল হঠাৎ। ঘণ্টাগুলো থামবার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবাই স্পষ্ট টের পেলেন, সামনের আসনে বাঘ ছালের ওপর কে যেন বসে আছেন। দেখে মনে হলো মূর্তিটা যেন বাষ্প দিয়ে তৈরী। বাষ্প দিয়ে তৈরী মূর্তিটা ক্রমেই জমে উঠতে লাগল। অবশেষে দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হল সর্ব অবয়ব। স্পষ্ট হয়ে উঠল আস্ত মানুষটি। দাড়ি গোঁপ চুল কিছুই নেই। অঙ্গেও কোনো আবরণ নেই। সোজা হয়ে বসে আছেন এক ছোট খাঁটো এক বৃদ্ধ। হ্যাঁ বৃদ্ধই বটে। কিন্তু আড়াইশ তিনশ বছর বয়স বলে মনে হল না। তবে যথেষ্টই বয়স হয়েছে প্রায় একশ বছরের কাছাকাছি পৌঁছেছেন নিশ্চয়। দুধে আলতা গোলা গায়ের রঙ শরীরে এতটুকু মেদ নেই। কোমরটি এমন সরু যে দুহাতের চেটোয় ধরা যায়। নজর করে দেখলাম যে তিনি চোখ মেলে আছেন। আর মুখখানি প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠেছে। প্রায় মিনিট দুয়েক ঘরসুদ্ধ মানুষ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেই মূর্তিটির দিকে। তারপর তাঁর ঠোঁট দুখানি নড়ে উঠল। অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরুলো যেন তিন-চার বছরের শিশু কথা বলছে। কথক শুনতে পেলেন 'রাম রাম জয় সিয়া রাম'। এরপর বাড়িউলি 'সুবাসী দি' বললেন 'বাবা সেই ছোঁড়াটাকে নিয়ে এসেছি।'

এইভাবে লেখক অবলীলায় জানিয়ে দিলেন সংসারী আর পাঁচজন মানুষের সাথে চলতে ফিরতে কখন যে সাধুসঙ্গ হয়ে যায় তার খবর সে নিজেও রাখে না। এখানে উপলক্ষ হিসেবে আমরা দেখলাম বাড়িউলি 'সুবাসীদি'কে। ইনি নিজের বাড়িতে মোহ-মুগ্ধ নারী-পুরুষের অসামাজিক স্বেচ্ছা-মিলনের অবকাশে ভাড়ার টাকা আদায় করেন। এ বাড়িগুলি তাঁর নিজের উদ্দেশ্যপূরণের জন্য অল্প খরচে টিন বা টালির ছাউনি দিয়ে নির্মিত। উট্‌কো ঝামেলা হিসেবে এই পরিবেশে প্রফেসর এলেন। তাঁর ভূত-চালনাশক্তি প্রথমে নিজের কাজে লাগবে বলে ভেবেছিলেন 'সুবাসীদি' পরে দেখলেন হিতে বিপরীত হয়েছে। তখন তাঁকে তাড়াবার বুদ্ধি এঁটে প্রথমে সাগরেদদের বিতাড়নে নিযুক্ত হলেন। নেড়া ওরফে নুলো এবং এ উপন্যাসের কথক পারলৌকিক শক্তির টানে প্রফেসরের সঙ্গ ছাড়বে- এই বিশ্বাসেই 'সুবাসীদি' এই নতুন সাধুর খোঁজ দিলেন। আমরাও জেনে গেলাম'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫) উপন্যাসটি রচিত হওয়ার মূলে অবধূতের যে ভগবৎ-পিপাসার চরিতার্থতা বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশ তার শুরুটা কেমনভাবে হয়েছিল। এ থেকে পাঠকের আর সন্দেহ থাকে না যে বাউণ্ডুলের জীবনও লেখকের জীবনে বদলে যেতে পারে যেকোনো সময়ে।

চার : লেখকের আত্মদর্শন ও 'রাহী' জীবন

ব্যক্তি জীবনের ইহলৌকিক নানা অভিজ্ঞতা আর পারলৌকিক জীবনের সাথে তার যোগসূত্র

আবিষ্কার---এই নিয়ে গড়ে ওঠে সার্থক মানুষের আত্মদর্শন। পৃথিবীর সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মূল কথাই হলো নিজেকে জানা। মানুষ ভিন্ন আর কোনো জীবেরই এই আত্মদর্শন ঘটেনা। মানুষ যত মহৎ-ই হোক না কেন ব্রহ্মজ্ঞানীকেও জীবনের দায় মেনে চলতে হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জ্বরাগ্রস্ততা এবং মৈথুন সব জীবের মত মানুষকেও বিচলিত করে। তাই স্বীকার করতেই হয় চিন্তাশীল মানুষের কাম্য পরিস্থিতির তারতম্যে আত্মদর্শন সম্পর্কিত বর্তমান বক্তব্যের সত্যতা পরিবর্তনশীল। সাধারণভাবে দীক্ষাগ্রহণ, ধ্যান-জপ, নিদিধ্যাসন -এই হলো বৃহত্তর তথা অনন্ত জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যম। এই পর্যায়ে ওঠার পরে মানুষ নিজের সম্পর্কে বা অন্যের সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়-নির্ভর জ্ঞান সবসময় সত্য আবিষ্কারে সফল হয়না। সাধক-লেখক কালিকানন্দ অবধূতের আত্মদর্শনের স্বরূপ সন্ধান নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষের মত নয়-অবশ্যই অনেকখানি রাহী-জীবন ভিত্তিক।

অবধূত জীবনের অধিকাংশ সময় পথে কাটিয়েছেন। এরফলে বিচিত্র জীবন-পরিচয় ঘটেছে নানা স্থানে[৬২] ঘুরে বেড়ানোর জন্য। পথে দস্যু-প্রতারককে যেমন পেয়েছেন তেমনি উপকারী মানুষকেও দেখেছেন। সাধন-পথে আবার নানা সাধু-সন্তকেও পেয়েছেন। ভেকধারী সাধু এবং সত্যকার মহাত্মার সাথে অবধূতের পরিচয় তাঁর জীবনকে সত্যিই বিচিত্রদর্শী করে তুলেছে।

অবধূতের রচনায় ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা

অবধূত প্রায় আঠারো বছর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি পথাশ্রমে না গৃহাশ্রমে সে প্রশ্ন না তুলেও বলা যায় বাস্তব পারিবারিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তিনি ছিলেন। এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য বলতে কী বোঝায় তা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। স্বামীজীর জীবনে ভৈরবীর স্থান গুরুত্বপূর্ণ। সন্ন্যাস জীবনে তা বাস্তব জীবনের পূর্ণতা এনে দিয়েছিল। অবধূতের তথা লেখকের আত্মদর্শনের ক্ষেত্রে তা গভীর প্রভাব-সঞ্চারী।

পাশ্চাত্যে একটি ধারণা প্রায় সকলেই পোষণ করেন যে উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা খুবই জরুরী। চলমান বিশ্বে আমরা অভিজ্ঞতার বাইরে কিছুই লিখতে পারি না। এর পাশাপাশি অবশ্যই স্বীকার্য মনস্তাত্ত্বিক দুনিয়া। অনন্ত বিশ্বের মত সুবিশাল-এই জগৎ। এখানে নানা অন্তঃশীল ভাবোদয়ের মাধ্যমে লেখক হয়ে উঠতে পারেন সহস্র ধারার উৎস। আমরা অবধূতের ক্ষেত্রে বর্হিজাগতিক অভিজ্ঞতা ও অর্ন্তলোকের উপলব্ধি –দুটি লক্ষণই পরম সার্থকতায় রূপ পেতে দেখি।

স্বভাবতই বাঙালী গৃহকেন্দ্রিক। অবধূতের জীবন ঠিক তার বিপরীত। তাঁর জীবনের অনেক কিছুই জানা যায় না। তবে অবধূতকে জানার ইচ্ছা অনেকটাই পূরণ হতে পারে যদি তাঁর রচনার মধ্যে কেউ ঢুকে যেতে পারেন। স্রষ্টার সৃষ্টিকে সবসময় আলাদা করা যায় না। অবধূত স্বীয় অভিজ্ঞতার বিশিষ্ট রূপকার। সে সব ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার মণিমঞ্জুষা ছড়িয়ে আছে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' , 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'পথে যেতে যেতে', 'যা নয় তাই','কলিতীর্থ কালীঘাট' 'বশীকরণ', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' ইত্যাদি উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' এবং

‘হিংলাজের পরে’-এই গ্রন্থ দুইখানিতে সরোজিনী ওরফে ভৈরবী চরিত্র হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ এই দুটি গ্রন্থে অবধূতের জীবনের শেষ দিককার কথা আছে। অন্যান্য গ্রন্থগুলি অবধূতের নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক’রে লেখা।

অবধূতের এসব গ্রন্থ পাঠ করলে দুলাল মুখোপাধ্যায় ওরফে অবধূতকে এবং তাঁর জীবন দর্শনকে যথার্থভাবে চেনা যাবে। অতএব রসিকের দৃষ্টি নিয়ে অবধূতের রচনা পাঠে মনোযোগী হতে পারলে অবধূতের জীবন-সম্পর্কিত এইসব তথ্য খুব সহজেই আমরা উদ্ধার করতে পারবো।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে ‘টপ্পা ঠুংরি’ (১৯৬৯) উপন্যাসটির শুরু হয়েছে এমন ভাবে যে মনে হবে যেন লেখক কথাসাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অনিবার্য যোগের কথা বলতে চান। এ উপন্যাসে যেন কোনো সাহিত্যতত্ত্ব আলোচকের ভূমিকা হঠাৎ বদলে গেলো কথাসাহিত্যের নির্মাণশৈলী সংক্রান্ত অভিনব মুখবন্ধ রচনায়। তারপর লেখকের মনোযোগ এলো কাহিনি ও চরিত্রের সামঞ্জস্য-পূর্ণ বিন্যাসে সর্বত্রই লেখক স্বতঃস্ফূর্ত। গোটা উপন্যাসে আদ্যন্ত সাবলীলতার ছোঁয়া লেখকের রচনা-শক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। বৈঠকী মেজাজের এই লেখার ধরণ নাটকের মত সজীব । সব চরিত্রকেই তাদের স্বভাবসুদ্ধ আমাদের সামনে হাজির করে দেয়। বর্ণনার জাদুতে আমরা যেন ঘটনাগুলিকে চোখের সামনে দ্রুত ঘটে যেতে দেখি। বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করার ফুরসৎ পাইনা। বোধহয় পাঠকও বুঝতে পারেন না যে পাঠকই কখন চলতে শুরু করেছেন লেখক-কথকের সঙ্গে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের এ গুণ আয়ত্ব করেছিলেন বলে অবধূতের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো নানা বিষয়কে অবলম্বন করে কথাসাহিত্যের একচল্লিশটি গদ্য গ্রন্থ রচনা করা। অবধূত স্বীকার করেছেন:

> ‘‘কবে কোথায় কোন বয়েসে গল্প লেখার সাধনা শুরু করেছিলাম, এ প্রশ্নটি হামেশা শুনে থাকি। উঠতি বয়েসের ছেলে মেয়েরা বিশ্বাস করতে চায়না যে কোনও কালে আমি স্বপ্ন দেখিনি গল্প লেখার। ঝাড়া ত্রিশটা বছর বেওয়ারিশ জীবন-যাপন করেছি, ঝুলি কাঁধে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। কাগজ কলম পুঁথি-পত্রের সঙ্গে ভাশুর ভাদ্রবউ সম্পর্কটা আমার সেই হাতে-খড়ির দিন থেকেই বজায় আছে। পথে পথে ঘুরে যার দিন গুজরান হয়, সে কোথায় বসে গল্প লেখার তালিম নেবে?’’[৬৩]

এই কথার সত্যতা পাই অবধূতের অন্যান্য আরো অনেক রচনায়। অবধূতের বিশেষ চারিত্র্যলক্ষণ হলো সত্যকার বিনয় এবং পরশ্রী-প্রচার। বিপরীতক্রমে নিজের গুণ সম্পর্কে বলার ক্ষেত্রে তিনি এক ভিন্নজাতীয় কুণ্ঠা পোষণ করে গেছেন। আজকের আত্ম-প্রচারের যুগে অবধূত ভয়ঙ্কর রকম ব্যতিক্রম। অনেক সময় বরং এটা দেখা গেছে যে তিনি নিজের সাধুতা এবং যোগ্যতা নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। কেমন যেন একটা ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল বলে মনে হয় যে অনুচিতনিন্দা লাভই লেখকের বড়ো হওয়ার রাস্তা। বিরূপ সমালোচনাই তো পারে লেখককে আরো ভালো হওয়ার প্রেরণা যোগাতে! অনেকসময় দুর্বলচেতারা বিরূপ-সমালোনার বিষণ্ণতায় হারিয়ে যেতে পারেন কিন্তু অবধূতের মত শক্তিশালী বজ্রকঠিন মনের অধিকারী মানুষ বিরূপ

সমালোচনাকে উস্কে দেবেন এতে বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না। অবধূত নিজেকে যেমন খুশি ঠাট্টা করেছেন আর সে ঠাট্টা তাঁর নিজের সম্পর্কে অবধূতের সমকালে স্বীকারোক্তি বলে অনেকসময় পরশ্রীকাতর লেখকদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। আজকে সে-সব স্বার্থ-কলুষতা ধুয়ে-মুছে গিয়ে তাঁর লেখক-সত্তার মুন্সীয়ানাই যোগ্য সমালোচকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বা এখনো যত আলোচিত হবেন অবধূতের লেখনীর প্রশংসা ততই বাড়বে। লেখক অবধূত জগত সম্পর্কে নিস্পৃহ সেই নিস্পৃহতা লেখার ক্ষেত্রে যেমন আত্মপ্রচারের ক্ষেত্রেও তেমন লক্ষ করা গেছে। বাহবা পাওয়ার জন্য নিজের ঢাক পেটানোতে তাঁর অনাগ্রহ। নিজের সাফল্য পেতে নামজাদা কারো দোহাই দেওয়া তো দূরের কথা আশীর্বাদ মাথায় নিলেও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-গুরুর নামপর্যন্ত নেননি। আসলে নিজের প্রচারের পালে হাওয়া লাগাতে চাননি। আমরা জানি ইনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আজীবন অবধূত তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন:

> "ভাগ্য ভবিতব্য বা নিয়তি কার কারসাজিতে ঠিক বলতে পারব না জুটে গেল এক কলম পেয়ে গেলাম কয়েকখানা সাদা কাগজ তারপর অযাচিত ভাবে যিনি এসে দাঁড়ালেন সামনে তাঁর নামটি উল্লেখ করার সাহস নেই। বাগ্‌দেবীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন নিজে। সেই সিদ্ধির এক কণা কৃপা করে দান করলেন আমায়। বরাভয় মুদ্রায় আশীর্বাদ করলেন ব্রাহ্মণ- ভয়কে জয় কর, সংশয় পরিত্যাগ কর। জীবনকে যেভাবে দেখেছ, যেমন করে জেনেছ, তাই শোনাও। তোমার পথ নির্বিঘ্ন হোক।"[৬৪]

সাহিত্যে ব্যক্তি অবধূতের প্রকাশ

হিংলাজ গিয়েছিলেন তীর্থ করতে; বই লেখার ভাবনাটা তখনও তাঁর মনের কোনেও উঁকি দেয়নি। ১৩৫৩ সালের ঘটনাগুলো লিখতে বসলেন ১৩৬১ সালে---লেখা হলো 'মরুতীর্থ হিংলাজ' আর সেখান থেকে ফিরে গেলেন কোটেশ্বর। লেখা হলো 'হিংলাজের পরে'(১৯৬২)। ১৩৬৯ সালে লিখতে শুরু করলেন ১৩৫৩ সালের ঘটনা। মরুতীর্থের বালু সমুদ্রের পরে এটি আরব সাগর পাড়ি দেওয়ার ঘটনা। সমুদ্রের বুকে ছ'দিন ছ'রাতের পরে কচ্ছে পৌছানো। লেখা হলো 'হিংলাজের পরে' (১৯৬২) উপন্যাসটি।

কচ্ছে কোটেশ্বর ভৈরব দর্শন করেন। সেখানে যবনত্ব ঘোঁচাবার জন্য নিষ্ঠুর ভাবে গায়ে গরম লোহার ছ্যাঁকা দেওয়া রীতি। ভৈরবীর নাকে সেরকম এক ভয়ঙ্কর ছ্যাকা দেগে দেওয়া হয়। ভৈরবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুখ ফুলে যায় জ্ঞান থাকে হারান। জ্বরে ভুল বকতে থাকেন। দরিদ্র সাধারণ মানুষদের ওপর ব্রাহ্মণদের অন্যায়-অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে। জোর করে ভগবানের নামে ভেড়া আদায় করা, কুয়োর জল না দেওয়া, তীর্থযাত্রীদের ওপর জুলুম করা–ব্রাহ্মণদের সাথে মুসলিমদের সংঘর্ষ–সবই এখানে আছে। ভৈরবীর যবনত্ব ঘুচাবার জন্য নাকে ছ্যাঁকা দেওয়ার পরে তাঁকে সুস্থ করেছিল সেই যবন রাই। রওশান সেবা যত্ন করে ভৈরবীকে সারিয়ে তোলেন। রওশন নৌকার হালের মাঝি জমশেদজীর স্ত্রী।

মরুতীর্থ হিংলাজ থেকে করাচী ফিরে এলেন। তারপর শুরু হলো করাচী থেকে সমুদ্রপথ

কোটেশ্বর যাত্রা সাধারণভাবে সময় লাগে ছ'দিন ছ'রাত। হিংলাজ দর্শনের পরে কোটেশ্বর ভৈরবকে না দেখলে তীর্থফল মেলে না। পৌত্র তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়-এর সাক্ষাতকারে আমরা জেনেছি অবধূত একাকী পরিভ্রমণ করেন প্রায় আঠারো বছর। পরে সরোজিনীকে বিবাহ করেন। এরপরেই লেখা শুরু। তবে উপন্যাসের আত্মকথন-মূলক এই সাক্ষ্য থেকে বলা যায় সরোজিনী দেবীকে বিবাহের পরেও তিনি গৃহে স্থিত হতে পারেননি-বহুদিন। এজন্য সরোজিনী দেবীর মনে গভীর আক্ষেপ ছিল, তিনি এই উপন্যাসে তা প্রকাশও করেছেন। এই জলের ওপর থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে যান সবাই। আর্তির মত শোনায় যখন ভৈরবীর মুখে শুনি যে তাঁর আবার দেশ! ঘর! কোথায়? —ব্যক্তিজীবনকে সন্ধান যদি করতেই হয় তবে এসব প্রসঙ্গ আসবেই। প্রাজ্ঞ অবধূত এই জীবনের থেকে কষ্ট যেমন পেয়েছেন তেমনি কৃতজ্ঞচিত্তে তার দানটুকুকেও স্বীকার করেছেন। এখন আমরা তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেতে পারি'টপ্পাঠুংরি' উপন্যাসের দুটি এই অংশে :

> ১.''তবে এ কথাটা যদি না মানি যে এন্তার জলজ্যান্ত গল্প দিনের পর দিন চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি, তাহলে নিশ্চয়ই আমার সেই ত্রিশ বছরের মুসাফিরির সঙ্গে নিমকহারামি করা হবে।''[৬৫]

> ২.''রাইচাঁদ বলত---দেখ দেখ, ভবের হাটখানা চোখ মেলে দেখে নে। হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি নায়ক, নায়িকা ; দিনের পর দিন অগুনতি গল্প ঘটে যাচ্ছে নাকের ডগায়। ...ঘটবার জন্যে মুখিয়ে বসে আছে। কালকের পর পরশু যেমন আসবেই তেমনি পরশু দিনের গল্প পরশু দিন ঘটবেই। আজ কাল পরশু এক একজন রাহী, আসছে আর চলে যাচ্ছে। আজ কাল পরশুদের সঙ্গে পা ফেলে চলতে থাক, জলজ্যান্ত গল্প দেখতে দেখতে মনটা উদাস উদাস হয়ে যাবে।'[৬৬]

একাকী অবধূতের শ্মশানচারী আচরণ ও অভ্যাস পুরো দস্তুর তান্ত্রিকদের মত ছিল। তিনি সারাদিন মদ ও মৃতদেহের পোড়া মাংস খেয়ে দু-ছিলিম গাঁজার টান দিয়ে সেই অতি বিখ্যাত 'গদি'-র উপর বসে থাকতেন। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসে তার পরিচয় আছে। রাত্রে তিনি কাছাকাছি এনায়েত পুরের বন্য কালী মন্দিরে যেতেন - আবার রাত্রেই ফিরে আসতেন। ব্যাপারটা আদৌ সহজ নয়। বিশাল পথ, দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে এমন এক স্থানে কালী মন্দির যেখানে ডাকাতরাও যেতে সাহস পেত না। অনেক দর্শনার্থী দিন দুপুরে ওই দেবীদর্শনের ইচ্ছাকে সংবরণ করতে বাধ্য হন। অতএব, যে সাধুজী বা সন্ন্যাসীর জীবন ও মনোজগৎ এমন এক বিভীষিকাময় পরিবেশে দিনের-পর দিন কেটেছে তাঁর শিল্প নির্মাণেও সেরূপ সাধারণের অবিশ্বাস্য অতিলৌকিক কাহিনি থাকবে সেটি স্বাভাবিক। তবু বলা যায় উপন্যাসে এমন বাস্তব অথচ বীভৎস জীবনকে তুলে ধরেননি অবধূত। তাঁর কাহিনি ও প্লটের জন্য যেটুকু বর্ণনা করেছেন তিনি তাতেও বঙ্গ-পাঠক বিস্মিত, শিহরিত।

জোড়াঘাটে গৃহী জীবনে যখন তিনি অধিষ্ঠিত তখন তাঁর অভিজ্ঞতা গেলো বদলে।

দূর দূরান্তর থেকে পাঠকের চিঠি আসে, এমন সমস্ত স্থান থেকে আসে যার নাম পর্যন্ত তিনি কখনও শোনেন নি। সে-রকম স্থানে বাঙলা দেশের মানুষ আছেন, তাদের কাছে তাঁর লেখা বই পৌঁছে গেছে, তাঁরা বই খানি পড়ে চিঠি লিখেছেন, এটা যে কতবড় উত্তেজনাকর কাণ্ড, অবধূত মনে করেন লেখক না হলে তা' সবাই আন্দাজ করতে পারবেন না। তাঁর বিরুদ্ধে সমকালে যে সমালোচনা হয়েছিল তার কথাও বলেছেন অবধূত :

" কলমের অমর্যাদা হচ্ছে আপনার হাতে। কলম ছেড়ে স্যানিটারি ইন্‌সপেকক্টারের চাকরি একটি জুটিয়ে নিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করুন। নিজের দেশ নিজের জাতি তথা ভবিষ্যৎ বংশধরদের মাথাগুলি আর চিবিয়ে খাবেন না।"[৬৭]

'বিশ্বাসের বিষ' (১৯৭৪) উপন্যাসে ১৯৯ পৃষ্ঠায় সরাসরি জোড়াঘাটের উল্লেখ আছে। সন্ধ্যার সময় নৈহাটির গঙ্গার ঘাটে কাঁকন আর তার মাকে নামিয়ে দিয়ে নৌকার মাঝিকে তার নিজের ঠিকানায় নামাতে বললেন সেই প্রসঙ্গটি আমরা স্মরণ করতে পারি :

"একদম খিঁচড়ে গেল মেজাজ। মাঝি জিজ্ঞাসা করলে কোথায় যেতে হবে। হাত তুলে ওপারের জোড়াঘাটটা দেখিয়ে দিয়ে চোখ বুজে রইলাম।নৌকা ঘাটে লাগল। যেখানকার মানুষ সেখানেই ফিরে এসেছি-কোনও চুলোয় যাওয়া হল না।"[৬৮]

এই উপন্যাসের ২০০ পৃষ্ঠায় আছে ডা: দেবীদৎ সারোগীকে আপ্যায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর বাড়ীর আতিথেয়তার প্রমাণ মেলে। ...'তা যাক, কিন্তু এরা আপনাকে চা-টা দিয়েছে তো?' দস্তুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে ডাক্তার বললেন :

"অনেকবার অনেকবার। শুধু চা নয়, আরও অনেক কিছু পেয়ে গেছি। আপনার আসতে অনেক দেরি হতে পারে, আর যতক্ষণ না আপনি আসবেন ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করব শুনে আমার জন্যে রান্নাবান্নাও হচ্ছে। রাত্রে আমি কি খাই, তা পর্যন্ত জেনে নিয়েছেন! আদর্শবাড়ি, আদর্শ ব্যবস্থা, অভিযোগ করার কিছু নেই।"[৬৯]

বিবাহের পরে সরোজিনী-সহ অবধূত যে দেশভ্রমণ করেছেন আগের সন্ন্যাস অপেক্ষা ভিন্নরকমের। আঠারো বছর ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করার পরে অবধূত শুরু করলেন সরোজিনী পথচলা। পুরুষ-প্রকৃতি যেখানে ছান্দিক পথ খুঁজে পান, সে শ্মশান কিম্বা জঙ্গল- যেখানেই হোক, তা জীবন-সম্পদে ঋদ্ধ হবেই। এখানেও তাই ধরে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে যে অবধূতের জীবন-অভিজ্ঞতায় পূর্ণ ছিলো। অন্তর ছিলো জীবন-রসে আর্দ্র। সেই অভিজ্ঞতার পূর্ণপাত্র---সঞ্চিত জীবনরস পাঠকের জীবন তৃষ্ণাকে তৃপ্ত করে। যে জীবন আমাদের নয় অথচ হতে পারত, সেই অপরিচিত জীবনের রূপকার অবধূত। তাই বলে সে জীবন-রসের সত্যতা কি অস্বীকার করা যায়? অন্ধকার হলে কি পানীয়জল তার তৃষ্ণাহর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে? তা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি অবধূতের জীবন সাধনা লোকচক্ষুর অন্তরালে চললেও সে জীবন-কথা যে বাস্তব জীবন -রসের যোগানেই নির্মিত, তা আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না। আর সেইজন্যই সে রচনা আজও প্রাসঙ্গিক।

'ফক্কড়তন্ত্রম্' (১৯৬৮) উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি চিঠির উল্লেখ আছে। সে চিঠির লেখক দীননাথ। চুপি চুপি একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে পথে নামলেন আজকের নামজাদা লেখক-একদা যিনি ছিলেন ফক্কড় দীনুদার সাথী। এই স্বভাব সত্যিকারের 'ফক্কড়'-দেরই হ'য়ে থাকে। এটি অবধূতের জীবনেরই ঘটনা।

'দুর্গম পন্থা' (১৯৬০) উপন্যাসে বা অন্য নামে 'পথে যেতে যেতে (১৯৭৬) উপন্যাসে অবধূতের জাহাজবন্দরের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। দীর্ঘদিনের অবস্থান ভিন্ন এমন বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। কথকের জবানীতে অবধূত বলেছেন :

> "ছোট্ট একখানি স্টীমার। স্টীমার ঠিক নয়, প্যাসেঞ্জার-বহা স্টীমার বলতে আমরা বুঝি সেগুলোকে, যেগুলো খুলনা বরিশাল গোয়ালন্দে যাওয়া আসা করে। কলকাতা বন্দরে বড়ো জাহাজ টানবার জন্যে যেরকম স্টীমার জাহাজের সামনে পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, যাকে বন্দরের ভাষায় টাগবোট বলা হয়, এ হচ্ছে সেই জাতীয় ব্যাপার।"[৭০]

বোঝাই যাচ্ছে ভ্রমণ করতে বেরিয়ে কয়েকদিনের জানার ভিত্তিতে নয় খুলনা -বরিশাল এর মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এমন তুলনা আসতে পারে। এ থেকে স্পষ্ট করে বরিশালের মানুষ হিসেবে অবধূতকে আমরা চিনে নিতে পারি। বরিশালের লোক হিসেবে তাঁকে গল্প শুনিয়েছিলেন 'হিংলাজের পরে' উপন্যাসে জমশেদ।

দুলাল মুখোপাধ্যায়ের রচনার সবচেয়ে বড় গুণ হলো এঁর রচনায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কোন কোন বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের জোগান দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' ও 'উদ্ধারণ পুরেরঘাট'---এই উপন্যাস দুটির নাম করতেই হয়।

'আমার চোখে দেখা' বা 'টপ্পাঠুংরি'-র (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯) লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীটাই খুব বলিষ্ঠ। এমন ব্যক্তির পক্ষেই লেখা খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এমনই সমৃদ্ধ যে কোনো প্রথাগত দীক্ষা ছাড়াই তাঁর পক্ষে গল্প বলা হবে স্বতঃস্ফূর্ত। রাইচরণ যখন কথা বলে তখন পাঠকের বুঝতে বাকী থাকে না যে সে কথা আসলে অবধূতের কথাই। যেমন ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের কমলাকান্ত থেকে নাট্যকার উৎপল দত্তের জপেন দা কিম্বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঢোলগোবিন্দ পর্যন্ত সকলেই একই প্রেরণায় গড়া চরিত্র। স্রষ্টার মনের কথা বলার এমন দ্বিতীয় কথক-মাধ্যম দেশী বিদেশী সকল রচনাতেই অজস্র। রাইচরণ বলেছে :

> "ওই যে আকাশখানা ;ওর মালিক কে জান? আমি আমি এই আমি, ঐ নীল আকাশের নীচে যা কিছু দেখছো সব আমার সম্পত্তি, আলো হাওয়া জল, মাটি বিলকুল আমার। বসুন্ধরার বুকের ওপর দড়ি ফেলে বসুন্ধরাকে যারা নিজের জন্য এক টুকরো আলাদা করে নিয়ে বাকীটার ওপর থেকে দাবী তুলে নেয়, তারা গাড়ল।"[৭১]

স্রষ্টা হিসেবে অবধূত যে অত্যন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ লেখক তার কারণ ব্যাখ্যাত হয়েছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখে। রাইচরণ বলে ভবের হাটখানা চোখ মেলে দেখে নেওয়া দরকার।

সেখানে হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি নায়ক নায়িকা। রাহী জীবনে এখানে আজ যে গল্পটি ঘটল সেটিকে মনে গেঁথে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে কাল যেখানে পৌঁছাবে সে দেখবে সেখানে আরো মজাদার আর একটি গল্প ঘটবার জন্য যেন মুখিয়ে বসে আছে। রাহী যদি হতে পারেন লেখক, যদি থেমে না যান, বসে না পড়েন, তাহলে নিত্য নতুন জলজ্যান্ত গল্প চোখের ওপর ঘটতে দেখবেন।

বোঝা যাচ্ছে লেখক অবধূত যেন পাঠককে সেই প্রত্যক্ষ জীবনের টাটকা ঘটনাই শোনাতে চান তাঁর লেখায়। 'টপ্পাঠুংরি' (১৯৬৯) বা 'আমার চোখে দেখা' (১৯৭৫) উপন্যাসের প্রথম গল্পের পরে লেখক-কথক অবধূত বলেছেন :

> ''নায়ক পেস্তা কুন্তল এরা কেউ বর্ণচোরা নয়। এদের চেনা সহজ, এদের বুঝে ফেলতে এতটুকুও দেরি হয় না। ঐ মামা কাকা মেসোমশাইদের আসল রূপটি চেনাবার জন্যে আমৃত্যু আমি চেষ্টা করে যাব। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে যাদের, তাদের সম্বন্ধে সাবধান হও। হুঁশিয়ার হো।''[৭২]

একাধিক উপন্যাসে লেখক অবধূতকে খুঁজে পাওয়া যায় 'কথক'-চরিত্রের মধ্যে, ব্যতিক্রম 'বিশ্বাসের বিষ'। জানা গেল 'বিশ্বাসের বিষ' (১৯৭৪)উপন্যাসের কথকের নাম কালী। প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যাক :

> ''হাত দিয়ে খলটা ঠেলে সরিয়ে দীনুদা' জিজ্ঞাসা করলে---
> 'কালী, মরে যাবার পরে মানুষের কি দশা হয় বলতে পারিস?''[৭৩]

---কে এই কালী? আমাদের মনে হয় ইনি স্বয়ং দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে কালিকানন্দ অবধূত। সরাসরি নিজের নাম নিলেন অবধূত এই উপন্যাসে।

ব্যতিক্রমী জীবনাভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ লেখক অবধূত। সংসার ত্যাগী মানুষের লেখার মধ্যে অসাধারণত্ব থাকবেই সেই অসাধারণত্ব সাহিত্যে রূপ পায় তখন, যখন তিনি মূলত সংসারী। অবধূতের জীবনের পর্যায় গুলি সাজিয়ে নিলে দেখা যায় পথই তাঁর সংসার। সংসারের যাবতীয় অনুভব তাঁর পথেই হয়েছে। বন্ধন ভীরু মন কিম্বা ঐশী প্রেরণা অথবা দুই-ই কী তাঁর এই ব্যতিক্রমী জীবন বোধের কারণ? এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত সহজ নয়। ভারতে বেদেরা এবং আরবে বেদুঈনরা জীবন কাটায় পথে পথে ;দুলাল মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই কোনোটিই নন। পরাধীন দেশে আরো পাঁচজন তরুণের মতো তিনিও দেখেছিলেন স্বাধীনতার স্বপ্ন। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়া তাই অস্বাভাবিক নয়। তিনি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত বিপ্লবীদের নিকট-সান্নিধ্যে ছিলেন বলে এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মত লিখতে পারেন কারাবন্দী জীবনের কথা। 'বশীকরণ' উপন্যাসে আমরা তার প্রমাণ পাই।

জেলের মধ্যে জেল, তার মধ্যে সেল। বিচার কর্তা বাইরে থেকে লিখে দিলেন যে এই আসামী 'বি ক্লাস'-এ থাকবে। সি ক্লাসের আসামীরা একসাথে থাকতে পারে। বি ক্লাসের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। তাদের আলাদা করে রাখতে হবে---এটাই নিয়ম! কাজেই ফাঁসির আসামীর সেল একটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দশ হাত লম্বা আর পাঁচ হাত চওড়া একটি ঘর যার একমাত্র

প্রবেশ এবং নির্গমন পথে দু' ইঞ্চি মোটা লোহার গরাদের গায়ে শক্ত লোহার জাল। আসামী বেরুতে পারবে না কিন্তু হাওয়া আলো বৃষ্টির ছাট এ সকলের জন্য অবারিত দ্বার। সেই ঘরের মধ্যে সি ক্লাসের মত কম্বল একখানি আর থালা মগ নিয়ে থাকতে পারলেও স্বস্তি হয়ত মিলত কিন্তু সেখানকার ব্যবস্থা তা নয়। এই ছোট্ট ঘরের মধ্যে আছে একরাশ অস্থাবর সম্পত্তি ---এগুলি বি ক্লাসের। সেগুলি হলো চার হাত লম্বা দু'হাত চওড়া একটি লোহার খাট। তার ওপর ছোবড়ার গদি এবং ছোবড়ার বালিশ। ছোবড়ার বালিশ গদি যেমন হয় এগুলি তেমন নয়। নারকেলের ছোবড়া সেখানে গাদা করা হয়েছে ঠিকই তবে তা গদি হয়ে ওঠেনি। বিষয়টা হলো নারকেলের থেকে ছোবড়া ছাড়িয়ে নিয়ে সদ্য সদ্য একটা চটের থলেয় পুরে দেওয়া হয়েছে। নারকেলের ছোবড়া গুলোকে পেটানো বা পেঁজা হয়নি, ফলে তা বেশ শক্ত এবং পিঠের পক্ষে যন্ত্রণাজনক। তারপর বলা দরকার মশারির কথা। এই মশারির চারদিকের ঝুল চার রকমের। একদিকের একহাত একদিকের দু'-হাত, একদিকের তিন হাত আর এক দিকের চার হাত। একখানি টেবিল ও একটি চেয়ার। কথকের নিজের ভাষায় :

> "আর একটি জিনিসও ছিল আমার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে। তান্ত্রিক সাধকরা পূজায় বসতে হলে আসনের পিছনে হাত ধুয়ে জল-টল ফেলবার জন্যে একটি পাত্র রাখেন। ওটির নাম ক্ষেপণী-পাত্র। আমার সেই দশ হাত পাঁচ হাত ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টার জন্যে দেওয়া হত একটি ক্ষেপণী-পাত্র। চার সের আন্দাজ জল ধরে এই রকমের গোল একটি আলকাতরা মাখানো ঢাকনা ওয়ালা জিনিস। বেহিসেবী হলে রক্ষে নেই। ঘর ভাসতে থাকবে নিজের অন্তরের অন্তরতম মালমসলায়। তারই মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা কাটিয়ে পরদিন সকালে অকথ্য গালাগালি উপরি পাওনা।"[৭৫]

দুর্দশার শেষ নেই---কিন্তু সবেতেই মজা করেছেন তিনি। এরপর অবধূত নিজের কথাই বলেছেন উত্তম পুরুষের জবানীতে কথকের মাধ্যমে। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি সেল থেকে বেরিয়ে এসে তোরাবের সঙ্গে উঠানের দরজা পার হতেন। তারপর সেই তিন হাত চওড়া গলিটার একপ্রান্তে পৌঁছে কলের নিচে মাথা পেতে বসে থাকতেন। সকালের ছুটির পুরো আধ ঘন্টাই বসে থাকতেন কলের নিচে। সবার নয় বি ক্লাসের ওই টুকুই সুবিধা।

সাহেব-খুনের দায়ে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয় নানা বেশ ও নানা পেশার আড়ালে। তাঁর ছোট গল্পে ও উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রে আড়ালে তাঁকে খুঁজে নেওয়া আমাদের বর্তমান লক্ষ্য : 'বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে লেখক রচনার মধ্যে সরাসরি নিজের নাম ব্যবহার করেছেন:

> "কেউ কেউ হয়ত বিশেষ রকম ক্ষুণ্ন হবেন এই ভেবে যে, অবধূত লোকটার চিত্তে তেমন শ্রদ্ধা নেই পাঠক-পাঠিকাদের সহৃদয়তার ওপর।"[৭৬]

আমরা জানি দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'অবধূত' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন।'টপ্পাঠুংরি' বা 'আমার চোখে দেখা' উপন্যাসটিতে তিনি বলেছেন যে ঝাড়া ত্রিশ বছর বেওয়ারিস জীবন-যাপন করেছেন, ঝুলি-কাঁধে নিয়ে ঘুরেছেন পথে পথে। কাগজ কলম পুঁথি-পত্রের সঙ্গে ভাশুর-

ভাদ্রবউ সম্পর্কটা তাঁর সেই হাতে খড়ির দিন থেকেই বজায় ছিল। আর পথে পথে ঘুরে দিন গুজরান হত, সেজন্য কারো কাছে কোথাও বসে গল্প লেখার তালিম নেওয়া ছিল অসম্ভব। অভিজ্ঞ মানুষেরা আমরা বিশ্বাস করেন যে মানুষের জীবনের পরিণতি কী এবং প্রাপ্তিই বা কী তা মানুষের বোধের বাইরে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে: 'It is never too late to begin' ---কথাটি যেন সত্য প্রমাণিত হলো অবধূতের ব্যক্তি জীবনে ও লেখক-জীবনে। পুলিশের চোখে ফেরার দুলালচন্দ্র তথা যোগী অবধূত শেষ পর্যন্ত পেশা হিসেবে বেছে নিলেন 'লেখা'কে। ছদ্মবেশী জীবনের শেষে জোড়াঘাটের বাসভবনে স্থায়ীরূপে পুরোমাত্রায় যখন লেখায় আত্মনিয়োগ করেছেন অর্থাৎ হয়ে উঠেছেন কলম-নির্ভর, তখন তাঁর বয়স হয়ে গেছে চুয়াল্লিশ বছর! তার আগে আঠারো বছর ধরে পাহাড়ে জঙ্গলে দুর্গম ও প্রত্যন্ত গ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন। সহ্য করেছিলেন দিনযাপনের কষ্ট। ঠিক ছিল না কোথায় কীভাবে রাত কাটবে। অচেনার পথে তখন তিনি প্রতিটি দিনকে পেয়েছেন অন্যদিনের চাইতে আলাদা। বিস্ময়ে, বৈচিত্র্যে, এবং নাটকীয়তায় ভরপুর সে-সব দুঃসময়ের দিনগুলি পরে সম্পদ হয়ে দেখা দিয়েছিল ঔপন্যাসিক অবধূতের জীবনে।

কথায় বলে 'বাড়তে গেলে ছাড়তে হয়'–এই 'বাড়া' মানে সমৃদ্ধ হওয়া মানুষ যত বেশি জানবে ততই সমৃদ্ধ হবে-এটাই স্বাভাবিক। অবধূত প্রথম যৌবনের অনেক কিছু ছেড়েছেন ---নিজের ঘর, নিজের গ্রাম-শহর, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত মানুষ, এমনকি নিজের অভ্যস্থ পোশাক-পরিচ্ছদও---তাই হয়ত ভিতরে ভিতরে মানুষ হিসেবে অনেকটা বেড়ে উঠেছিলেন। নানারকম মানুষের সান্নিধ্যে এসে তাদের সংস্কার, জীবন-যাপন, ধর্ম-মানসিকতা-সবই তিনি জেনেছিলেন। বেড়ে গিয়েছিল তাঁর জীবনের ভূগোল ও মনের আকাশ। ধর্মীয়, সামাজিক, ব্যক্তিগত নানা সূত্রে নতুন নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন নিজেকে। অবধূত এইভাবে এক জন্মেই বহু জন্মের অভিজ্ঞতায় ভ'রে উঠেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে পুষ্ট হয়েছিল তাঁর লেখক সত্তা। সাধারণ পরিচয়ে দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর জীবনাভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া মানুষ অবধূত এক মানুষ ছিলেন না। তিনি হয়ে উঠেছিলেন উজ্জয়িনীতে মহাকাল মন্দিরে দীক্ষিত কালিকানন্দ অবধূত থেকে লেখক অবধূত। লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন তাঁর প্রথম দর্শনের কথা :

> "অবধূত ছিলেন। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছিলেন। ভাবগম্ভীর মুখ। বড় বড় চোখ। ঠিক যেন কালভৈরব। আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকালেন। যদিও আমি চিনেছি তবুও দু'হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'আপনিই অবধূত?' উনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'ওদিকে এসো।'"[৭৭]

সন্ন্যাস জীবনের কঠোর তপস্যায় তিনি কেমন হয়েছিলেন 'রাহী জীবন' প্রসঙ্গে আমরা তার পরিচয় নেবো।'বহুব্রীহি' গল্প সংকলনের একটি গল্প 'বাগীশ্বরী'---এই গল্পের নতুন সাধুই অবধূত স্বয়ং। অসীমানন্দ তাঁকে এইভাবে আবিষ্কার করলেন:

> "খালি পেট, এমন খালি যে পিঠে পেটে লেগে গেছে। সর্বাঙ্গ ফাটা, এ হেন ফেটেছে যে সাদা জলের মত রস বার হচ্ছে মুখ কপাল আর হাতের চেটো

থেকে। দুই চোখের ওপর নিচের পাতায় ঘা, হিমালয়-বাসের জীবন্ত ফল, পিসু পোকার দংশন থেকে যার উৎপত্তি। ঠোঁট দু'খানা ফোলা ...সেই বিকট মূর্তির আবরণ মাত্র কৌপীন আর এক চিলতে ন্যাকড়া।''[৭৮]

---বোঝাই যাচ্ছে ইনি জীবনের তত্ত্ব-সন্ধানে পথিক, পথই তাঁর ঘর। এই গল্পসূত্রে অবধূতের মনের কথা জানা যায়। অবধূতকে তাঁর গুরুদেব বলেছিলেন:

''সাবধান বেটা, কখনও হরিদ্বারে বা হৃষিকেশে আটকা পড়িস নে।এ বড় ভীষণ দ', এখানের ঘূর্ণিজলে জাল ছেঁড়া বাঘা মাছেরা জন্মের মত আটকা পড়ে ঘায়েল হয়ে যায়। ওজন দরে ধর্ম বস্তুটার কেনাবেচার এতবড় বাজার ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই।''[৭৯]

অবধূতের ব্যক্তি জীবনের অনেক কথাই যেন হরিদ্বারের আশ্রমে অসীমানন্দের মুখে শোনা যায়। একজন কথাসাহিত্যিকের এই খুঁটিনাটি দেখার চোখ খুব গুরুত্বপূর্ণ :

''কি ভয়ানক কাণ্ড ! এই কিম্ভূত কিমাকার মূর্তি দেখে কার সাধ্য চিনবে। একেবারে ব্যাস বাল্মীকি বনে গেছে মানুষটা। সেই চার পাঁচ বছর আগে দেখেছিলাম কাশীতে। তারপর যতবার কাশী গেছি, খোঁজ করেছি। সবাই বলে পালিয়েছে। কেন পালিয়েছে, তাও কেউ জানে না। বদখত কিছু একটা ঘটিয়ে পালিয়েছে কি না? না তাও নয়। তবে খামকা মানুষটা গা ঢাকা দিতে গেল কেন! তখন এইরকমই কিছু একটা ধারণা হয়েছিল আমাদের- নিশ্চয়ই কোথাও সাধন-ভজন বা তীর্থ দর্শন করতে গেছে। একি অমানুষিক কাণ্ড! ভগবান রক্ষা করুন- আমার ভগবান দর্শন পাওয়ার দরকার নেই বাবা!'' [৮০]

কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানায় ফেরার তাগিদ তাঁর ছিল না---এ জীবন-ই রাহী জীবন। নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এ জীবন। ব্যতিক্রমী এই গল্পে সন্ন্যাসীদের ভোজন বিষয়ে বলেছেন অবধূত। আমরা এই বর্ণনা থেকে অবধূতের জীবনের ভোজন-সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে পারি।

''সন্ন্যাসীকে সব একসঙ্গে খেতে দেওয়া নিয়ম। সন্ন্যাসী তো খান না কিছুই, সব ব্রহ্মে অর্পণ করেন পুরী ভাজি চাটনি দই পেঁড়া সব একসঙ্গে থালায় সাজিয়ে সামনে দিয়ে গেল এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।''[৮১]

ঝর্ণা নিত্য বহমান। সরোজিনীর সাথে দ্বিতীয় বিবাহের পূর্বে আঠারো বছর অবধূতও চির পথিক। আত্মকথনের ঢঙে এই গল্পেই বলেছেন যে তাঁর কান ঠিক নেই, অবিরাম পাহাড়ী নদীর গোঙানি শুনতে শুনতে কানের দফাও রফা হয়ে গেছে। এঁর সম্পর্কে আশ্রমের জননী শ্রীর কাছে উপস্থিত হয়ে অসীমানন্দ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আরো বলেছেন যে শরীরে নানারকম সমস্যা হওয়াটা স্বাভাবিক। হবে না কেন? এঁরা তো আনন্দের তপস্যা করেন না। এঁদের যে দুঃখের তপস্যা–দুঃখ নিঙড়ে আনন্দের রস বার করার সাধনা করেন এঁরা। হলাহল মন্থন করেন----অমৃত লাভের আশায়। ফলে একটা সুস্থ সবল দেহের এই হাল হয়েছে। ---একথা শোনার পরে চোখে দেখার যন্ত্রণায় শ্রীর অবস্থা লক্ষ করার মত। তাঁর দুচোখে যে কোথা থেকে জল

এসে গেল চোখ ছাপিয়ে সেই জল বড় বড় মুক্তার মত গড়িয়ে নামতে লাগল গাল বেয়ে। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হল অবধূতের। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। অবধূত কলকাতার মানুষ কিন্তু জীবন খুঁজতে হরিদ্বারে! এখন তিনি 'রাহী'। আমাদের গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য অবধূতের 'রাহী' জীবন-পরিচয় অর্থাৎ পথিক সত্তার পরিচয় এখানে বহুলাংশে মিলতে পারে। প্রসঙ্গটি স্মরণীয়। কাশীর সাধু ওরফে অবধূতকে সামনে রেখে অসীমানন্দ বলেছেন :

> "দেখ শ্রী এবার আমরাও যাব তপস্যা করতে। এতদিনে একজন ভালো লোক পাওয়া গেল। সদ্য সদ্য তপস্যা করে ফিরলেন ইনি, সুতরাং আমাদের পথ বাতলাতে পারবেন।"[৮২]

আমরা 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এ আকাশগঙ্গার জল বোতলে ভ'রে নেওয়ার সময় ভৈরবীর মুখে ঘর না থাকার কথা বলতে শুনি। যাদের ঘর নেই তারা কীজন্যে এ জল নেবে। পথে পথে জল বয়ে বেড়ানো কী সম্ভব? তখন কুন্তী বলে যে তার বাবাকে বলে কাশী, বৃন্দাবন বা জুনাগড় যেখানে খুশী একটি আশ্রম বানিয়ে নেবে। তার বাবা বড় লোক এবং দয়াশীল। –যদিও কুন্তী মরুভূমিতেই হারিয়ে যায়। সে প্রসঙ্গ আলাদা। আমরা গৃহহীন রাহী অবধূতকে জেনে নিতে পারি। আমরা 'হিংলাজের পরে' উপন্যাসেও এই একই আকুতি শুনতে পাই ভৈরবীর মুখে। সবাই নেমে যাবে ঘরে পৌঁছাবে কিন্তু তাঁদের ঘর নেই। তাঁরা চির পথিক। কচ্ছে নেমে পরমানন্দ জী মহারাজের জন্য সরকারি লোক এলো। পার্শী দম্পতিরাও চেনা জায়গায় গেলেন, কৌশল্যানন্দন, ক্যাপটেন মাঝিরাও তাঁদের বাড়িতে গেলেন। তাঁদের কোনো বাড়ি নেই এবং ঠিকানা নেই। পথই ঘর ঘরই পথ।

'রাহী জীবন' অবলম্বন করেছিলেন ব'লে চলার পথে বহু মানুষকে তিনি পেয়েছেন। সাহিত্যের আধারে তাদের অনেকের নবজন্ম হয়েছে; যাদের মধ্যে অনেকের কথা বেশ চিত্তাকর্ষক। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' (১৯৬৫) উপন্যাসে টিহরীর পথে মোট বওয়া মানুষগুলোকে অবধূত বলেছেন 'লক্ষ্মণ মানুষ'। সেখানে রামছাগলে বোঝা বয় তাই এই বোঝা বওয়া মানুষ গুলোকে বলেছেন 'লক্ষ্মণ মানুষ'। এঁরা নির্লোভ তাই সুখী। একজন দক্ষ ঔপন্যাসিকের চোখে সবই মূল্যবান।

> "..মালপত্র হৃষীকেশ পর্যন্ত ট্রেনে বা লরিতে গিয়ে পৌঁছয়। তারপর রামছাগল আর লক্ষ্মণ-মানুষদের পিঠে চাপে।"[৮৩]

অবধূত মনে করেন নির্লোভ হবার বাসনায় এঁদের সাধনা করতে হয়না---এঁরাই প্রকৃত মানুষ। আমরা অন্ধ তাই গুরু খুঁজে মরি।– এ দর্শন মানবতাবাদী। অবধূতের এই আত্মদর্শন তাঁর রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণত্ব দেখতে পেয়েছেন–একজন দক্ষ ঔপন্যাসিকের এটি একটি গুণ। নীরব ঘটনাকে সামনে আনার দক্ষতা অবধূতের ছিল।

'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসের কাহিনি-সূত্রে হিমালয়ে প্রথম যে সাধুর কথা বলেছেন তিনি রামভক্ত। সামনে এসে শিষ্টাচার দেখিয়ে বললেন 'নমো নারায়ণ'। যজ্ঞের কালি মাখা দাড়ি চুলে আবৃত। হাড় গোনা যায় এমন চেহারার এক সন্ন্যাসী। কাশির চোটে যেন হৃদপিণ্ডটাই বেরিয়ে আসবে। তাঁর সম্পর্কে লেখক যা বলেছেন তাতে তাঁর আত্মদর্শন হলো অভাবকে না

প্রশ্রয় দেওয়া :

"... সীয়ারামের কৃপায় স্বভাবকে তুমি ধ্বংস করে ছেড়েছ। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ধ্বংস হয়ে গেছ। সসাগরা ধরণীর কোনও বস্তুর প্রয়োজন নেই তোমার, অভাব তোমার নাগাল পাবে কেমন করে।"[৮৪]

—এ চরিত্র সাধারণ মানুষের কাছে অচেনা। এমন ধরণের সন্ন্যাসী পাহাড়ে জঙ্গলে গিরি-গুহায় কদাচিৎ মেলে জনবসতির কাছে সচরাচর চোখে পড়ে না। রাহী জীবনেই অবধূত এঁদের সাথে পরিচিত হন। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপন্যাসে কুন্তী মরুপথে নৃশংসভাবে ধর্ষিতা হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায়। বাধা দিতে গিয়ে অপারগ তার পুরুষ সঙ্গীটির অবস্থাও আশঙ্কাজনক। আমরা সে বর্ণনায় লেখকের সংযম লক্ষ করতে পারি।

"পুরুষটাকে ওরা ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে গেল। ভৈরবী আর আমি মেয়েটাকে তুলতে গেলাম। তার পায়ের দিকে ধরতে গিয়ে ভৈরবী চমকে উঠে ইশারায় আমাকে দেখালেন। শুভ্র নিটোল পা হাঁটু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, পায়ের পাতার উপর রূপোর চওড়া একটা অলঙ্কার আর হাঁটুর উপর দিয়ে ঘাঘরার নীচে থেকে পা বেয়ে রক্তের রেখা পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। সেই দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম!"[৮৫]

এরপর কুন্তীর ওপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের স্বরূপ বোঝালেন কিন্তু কোথাও মাত্রাতিরিক্ত নয়। সে বর্ণনা মানুষের যন্ত্রণার শরিক হওয়া ভিন্ন অতিরিক্ত কৌতূহল সৃষ্টি করেনি।

"ফিরোজা রং-এর ঘাঘরা তার পরনে, তাতেও রক্ত লেগে শুকিয়ে শক্ত হয়ে রয়েছে। সরু কোমরে ঘাঘরাটা যেখানে কষে বাঁধা তার উপরে পেটের চামড়া অনেকটা দেখা যাচ্ছে। গায়ে কমলা রংএর কাঁচুলী জাতীয় জামা,মাত্র বুকের উপরের মাংসপিণ্ড দুটিকে ঢেকে রেখেছে। উপরে আধখানা বুক গলা পর্যন্ত খোলা। মাথার চুলের থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে সন্দেহের অবকাশ রইল না যে হাড় মাংস রক্তে গড়া এই নিখুঁত বস্তুটির উপর লালসা নখদন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে একে নিংড়ে মুচড়ে দলে থেঁতলে এই অবস্থা করে দিয়েছে।"[৮৬]

আমাদের গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে অবধূতের ব্যক্তি স্বভাবের এই নির্লিপ্ততা তাঁকে চিনতে সাহায্য করে। আমরা এই উপন্যাসের শেষপর্যন্ত পৌঁছেও একই সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারব যে অবধূত মানুষটা জীবনের সমস্ত সম্পর্ককে এবং প্রাপ্তিকে ক্ষণস্থায়ী বলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই অত্যন্ত আসক্তি বা পেতে মরিয়া হওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল না।

মানুষের মনের গভীরে বা সম্পর্কের নিবিড় গভীরে ঢুকতে তিনি অনাগ্রহী। অবধূতের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা যেসব সূত্রে এসেছিল তার মধ্যে 'উদ্ধারণপুর ঘাট' উপন্যাসের নানা প্রসঙ্গ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্মশান ঘাটটি লোকালয় থেকে দূরে। মরা মানুষ আর শ্মশান-রীতির বিচিত্র কর্মকাণ্ড এ উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় অবধূতের ব্যক্তি পরিচয় ও রাহী জীবনের সাথে

এ উপন্যাসের যোগ গভীর। আমরা প্রথমেই এ শ্মশানের অবস্থান ও লোকালয়ে এর গুরুত্ব কতখানি তা বুঝে নেবো।

কাটোয়া থেকে কয়েক কিমি উত্তরে অথবা গঙ্গাটিকুরি রেল স্টেশনের পূর্বে পবিত্র গঙ্গা নদীর তীর সংলগ্ন উদ্ধারণপুরের শ্মশান ঘাট। আমরা চুঁচুড়ার 'ভূদেব-রামগতি-অবধূত স্মৃতিরক্ষা কমিটি'র সৌজন্যে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানতে পারি যে উদ্ধারণ নারায়ণ দত্ত নামক পরম বৈষ্ণব ও সাধকের নামানুসারে এই বন্য অথচ অপূর্ব স্থানটির নাম 'উদ্ধারণপুর'। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে অবধূতের শ্মশানচারী আচরণ ও অভ্যাস পুরো দস্তুর তান্ত্রিকদের মত ছিল। তিনি সারাদিন মদ ও মৃতদেহের পোড়া মাংস খেয়ে দু-ছিলিম গাঁজার টান দিয়ে সেই অতি বিখ্যাত 'গদি'র উপর বসে থাকতেন। অবশ্য এখনকার কথা আলাদা। কমলকুমার গুহ[৮৭] ২০০৮ সাল নাগাৎ শ্মশানঘাটে গিয়েছিলেন। তিনি বিস্ময়ে হতবাক্! আসলে তিনি ১৯৫০-১৯৫৫ নাগাদ (?) অবধূতের সঙ্গে এই শ্মশানঘাট দেখতে এসে রীতিমত ভয় পেয়েছিলেন। ভয়ের কারণ, দুর্ভেদ্য জঙ্গল ঠেলে এগিয়ে যাওয়া, যেতে -যেতে শিয়াল সাপ মৃতদেহের সাক্ষাৎ এবং আলো-আঁধারের রহস্যময়তা। অতএব সহজেই অনুমেয় অবধূত যখন এই শ্মশান ঘাটে আত্মগোপন করে সন্ন্যাসীবেশে দীর্ঘ কয়েকটা বছর ছিলেন তখনকার পরিবেশ কেমন ছিল। ১৯৮২ সালে 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' সিনেমা করতে নেমে পরিচালক অঞ্জন দাস অবশ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি শ্মশানকে[৮৮] বেছে নেন। অবধূতের ঔপন্যাসিক সত্তার বিশ্লেষণে নিচের বিষয়গুলির বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী।

প্রসঙ্গত, 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে যে সংস্কৃতির (ধর্ম) ছোঁয়া আছে তা রাঢ় সংস্কৃতি। শাক্তধর্মের পীঠস্থান রাঢ়বঙ্গ- তার মধ্যে বর্ধমান ও বীরভূম জেলা সুবিদিত। কিন্তু কাটোয়া সংলগ্ন বৃহত্তর এলাকায় উগ্র শাক্ত তন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে সপ্তদশ শতকে। কারণ চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম যখন এই অঞ্চলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং চতুর্দিকে মঠ, আশ্রম আখড়া গড়ে ওঠে তখন শাক্ত ধর্মাবলম্বীগণ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে উগ্র শাক্ত তন্ত্রের ব্যভিচারের জন্ম দেয়।

আলোচ্য উপন্যাসে চরণ দাস বাবাজি নেতাই বোষ্টমী নামকরণ স্মরণীয়। আবার সন্ন্যাসী লাঙ্গুলিবাড়িয়ার জিতেন সাধু ও আগমবাগীশ চরিত্র দুটির আচার লক্ষণীয়। তার থেকেও অনুধাবন যোগ্য এই দুই ভিন্ন ধর্মমতের পারস্পরিক মিলন -মিশ্রণ। আসলে রাঢ় সংস্কৃতির ঐতিহ্য হল এই মিশ্রণ। এই মিশ্রণ-'ভিয়েনের' মত। অবধূত এ গ্রন্থে একজন সার্থক ঔপন্যাসিকের মত তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বুদ্ধি, বোধ ও অনুভব দিয়ে এই অঞ্চলকে ধরতে পেরেছিলেন বলেই এই উপন্যাসটি ডায়েরী বা ভ্রমণ গ্রন্থ হয়নি-হয়েছে উপন্যাস। অনেকটা বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' গ্রন্থের মত অসংখ্য চরিত্র , কাহিনি, দৃশ্য -সব মিলে যেন এক চলচ্ছবির মতো পাঠকের মানস পটে বিধৃত হয়েছে। আসলে অবধূতের চেতনায়, ইহজীবন ক্ষণিক মাত্র, লয়ই তার ধর্ম এবং যাবতীয় সুখ-বৈভব সমৃদ্ধি হাস্যকর-এমন একটা দর্শন তাঁকে শ্মশান-বৈরাগ্যে দীক্ষিত করে। তা না হলে কোন সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে শ্মশানবাসী হওয়া সম্ভব নয়।

ফলত তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে বৈচিত্র্য ক্রমশ কমে আসে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জন্য 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে ছয় পাতার আলোচনা (৭৯০-৭৯৫) যুক্ত করেছেন এবং মূল্যায়নে প্রশংসার পাশাপাশি সীমাবদ্ধতার কথাও বলেছেন। এখানে সমালোচক লেখকের আত্মদর্শনকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

> "ধর্মসাধনার গুহ্য রহস্য ও বীভৎস মানস-প্রেরণার গভীরে অবধূতই সর্বাধিক সাফল্যের সহিত অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। উৎকট তান্ত্রিক ক্রিয়ার বীভৎসতা, শ্মশান-সমাগত শোকবিহ্বল নরনারীর আকস্মিক মানস প্রতিক্রিয়া, মৃত্যু সম্মুখীন মানবের উদাস বৈরাগ্য ও বেপরোয়া মনোবৃত্তি তাঁহার রচনা-তালিকায় শীর্ষ স্থানের অধিকারী। হিন্দুর ধর্ম সংস্কারপুষ্ট মনে শ্মশানের যে ভাবাবেদন তাহা নানা চরিত্র ও ঘটনার মাধ্যমে অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সর্বপ্রথম শ্মশানাধিপতি গোঁসাইবাবা যেন শ্মশান-প্রহেলিকারই একটি মানবিক প্রতিরূপ।"[৮৯]

চরিত্র মানেই আত্মদর্শনের সাথে বাস্তবের মিশেল। অবধূতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অবধূত সাধারণের থেকে আলাদা। তাঁর আত্মদর্শন গৃহীর আত্মদর্শন নয়। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি বৈশিষ্ট্য খুব সুন্দরভাবে বলেছেন :

১. 'তিনি মানবের সমস্ত শোকে ও বুকফাটা কান্নায় শ্মশানের মতই নির্বিকার ও উদাসীন' এবং

২. 'তাঁহার প্রচণ্ড মনোবল মৃত্যুর ন্যায়ই কুণ্ঠাহীন ও অপরাজেয়।'

আমারাও অনুভব করতে পারি -এই বৈশিষ্ট্য দুটি অবধূতের লেখক সত্তার তথা আত্মদর্শনের মূল কথা। তবে মানুষকে তো আর এত সোজা সংজ্ঞায় বেঁধে ফেলা যায় না। এসব বাইরের মূল্যায়নের পরেও জেগে থাকে মানুষের বিশেষ করে স্রষ্টার অন্তরলোকের দ্বিধা। সত্তার দ্বান্দ্বিক উপস্থিতি। অবধূতের ব্যক্তি-সত্তার সেই নিগূঢ় অনুভূতির আবিষ্কার লেখকের আত্মদর্শনের ক্ষেত্রে উপেক্ষণীয় নয়। শ্মশানভৈরবের কথায় মনে পড়ে সেই নিগূঢ় মানসদ্বন্দ্ব।

ভালবাসার ব্যাকুল আবেদন, মানব মনের সমস্ত অসংবরণীয় শোকোচ্ছ্বাস তাঁর লৌহবর্মাবৃত হৃদয়ে কোন দাগ না কেটে প্রতিহত হয়। অথচ মানবচিত্তের সূক্ষ্মতম অনুভূতি, স্নেহপিপাসু অন্তরের মান-অভিমান ছদ্ম-ঔদাস্যের ক্ষীণতম কম্পন, শ্মশান-বাতাবরণের নিগূঢ়তম ভাবসঙ্কেত তাঁর সংবেদনশীল মনে ছায়া ফেলে, তারের বাদ্যযন্ত্রের মতো সব সুর ধরে রাখার উপযোগী মন তাঁর।

নিন্দুকের ভবিষ্যদ্বাণী উপেক্ষা করেই বাংলার পাঠক সমাজ তাঁদের প্রিয় লেখককে মনে রেখেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী আরো বলেছেন 'অবধূত যখন তাঁর 'মরুতীর্থ' নিয়ে 'মুরুব্বীহীন হালে' নি:শব্দে বাংলাসাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেন তখন উভয় বাংলার বাঙালী পাঠক মাত্রই যে বিস্মিত হয়েছিলেন ভেবেছিলেন এ তো মরুতীর্থ নয়, এ যে রসে ভরা 'রসতীর্থ'। -গ্রন্থটির চাক্ষুস বর্ণনা এতটাই জীবন্ত যে পাঠকের মনে হবে এমনটাই দেখা যাবে কেবল যাওয়ার অপেক্ষা!

> "মরুতীর্থ হিংলাজ'গ্রন্থটির সম্পাদনা করতে গিয়ে সমকালীন লেখক সৈয়দ

মুজতবা আলী জানিয়েছেন তাঁর বিশ্বাসের কথা।'আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, অবধূত-মহারাজ সাধু ব্যক্তি; সে সাধুতা তিনি লেখক হিসেবেও রক্ষা করেছেন এবং তাঁর পুস্তকে তিনি অতিরঞ্জন করেননি।''

আসলে লেখকের কল্পনাশক্তি, সৃজনী প্রতিভা এবং সর্বোপরি তাঁর স্পর্শকাতরতা মরুতীর্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। -তাই বলে একে গাইডবুক বলা যাবে না। তা যদি না হতো তবে বইটি রসকষহীন মরুই থেকে যেত। বড় জোর হত একটা গাইডবুক। গাইডবুক প্রয়োজনীয় হলেও তা সাহিত্য নয়। ব্যক্তি জীবন আর পথিক সত্তা অবধূতের ক্ষেত্রে একাকার। মরুতীর্থের আলোচনা এইজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে যদি অবধূতের এমন কয়েকটি রচনাকে খুঁজে বার করতে হয় যেখানে ব্যক্তি মানুষটিকে, তাঁর আত্মদর্শনকে বুঝে নিতে সাহায্য করবে তবে তার একটি নিঃসন্দেহে 'মরুতীর্থ হিংলাজ'।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ'-এর পরে 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কেউ কেউ মনে করেন সন্ন্যাসীদের যে ফক্কুড়ী, ধাপ্পাবাজী আছে তার নিরতিশয় নগ্নরূপ আমাদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন অবধূত -এটাও আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। অবধূতের কথাসাহিত্য তাঁর আত্মদর্শনের স্বরূপকে অভিজ্ঞতার মিশেলে অনবদ্যভাবে প্রকাশ করেছে।

অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিলোকের বড় কথা হলো বিষয়ান্তরে যাওয়ার অনায়াস-দক্ষতা। আমরা জানি সাধক এবং পরিব্রাজক মৃত্যু-সচেতন এই লেখক ছিলেন সর্বদাই তত্ত্ব-সন্ধানী। জীবন দর্শনের প্রভাব লেখার মধ্যে থাকবেই। নিজে 'রাহী' সদা ভ্রাম্যমাণ লেখার ক্ষেত্রে তাই অবলীলায় বিষয়ান্তরে প্রবেশে তিনি সমর্থ। যিনি এখনি জীবন ও মৃত্যুর তত্ত্ব নিয়ে ভাবছেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিন্তায় ডুবে আছেন, পরমুহূর্তেই গভীর নির্মম বাস্তবতার কথা লিখতে বসলেন। আমরা একেই বলছি বিষয়ান্তরে যাওয়ার ক্ষমতা। মরুভূমির দিকে একদৃষ্টে এই ভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে পড়ল :

''দুহাত দিয়ে চোখ রগড়ে এবার ভালো করে চেয়ে দেখি না, কিছুতেই ভুল দেখছি না–নিশ্চয়ই কিছু একটা এগিয়ে আসছে এদিকে। চেয়ে রইলাম মোহাবিষ্ট হয়ে।''[৯০]

লেখক অবধূতের এই জাতীয় বিষয়ান্তরে যাওয়ার প্রবণতা সার্থকতার সাথেই অধিকাংশ উপন্যাসে দেখা যায়।'কৌশিকী কানাড়া' (১৯৬৩) উপন্যাসটি দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, অত্যাচার ---উৎপীড়নের কথা যেমন নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছে তেমনি লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতাকেও সমানভাবে চিনিয়ে দেয়। তাঁর আত্মদর্শন যেন আত্মনিয়ন্ত্রণকে সম্ভব করে তুলেছে তাঁর রচিত কথা সাহিত্যে। দেশের কাজে নারীর আত্মত্যাগ বর্ণনা করতে গিয়ে অযথা আবেগে ভেসে যাননি মুহূর্তে ফিরে এসেছেন বাস্তবে। এই উপন্যাসে করুণাকেতন -প্রসঙ্গ এমনই এক চরিত্র-পরিচিতি-বিমিশ্র সত্তার সহাবস্থান। প্রসঙ্গত স্মরণীয় শুভায় ভবতু বা দুরি বৌদিতে বিপ্লবী আন্দোলনের ত্রুটির কথা বলেছেন।

বিভিন্ন ধরণের মানুষকে চিনতেন বলে তাঁর সৃষ্টিলোক ছিল অনিঃশেষ। হপকিন্স অ্যাণ্ড হিলারী কোম্পানীর ছোট সাহেব করুণাকেতন ওরফে 'ড্যাট'। মিস্টার সিংহরায়, মিস্টার গুহা,

মিস অসিতা ঠাকুর, মিস গোমা কাপুর, শ্রীমতী রুবি মুস্তাফি এবং আরো অনেকের ঘনিষ্ঠ ইনি। একসাথে পিকনিক করতে যান কখনো কখনো শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। করুণাকেতন সম্পর্কে জানা যায় :

> "প্রায় প্রতি রাতেই আকণ্ঠ হুইস্কি বোঝাই করে, ঐ হুইস্কি বোঝাই একটা বা দুটো নারীদেহ নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ওঠেন তিনি, ...কিন্তু সেই হুল্লোড়ের অন্তে অতৃপ্তির হলাহল মনমেজাজ বিষিয়ে তোলে, অবসাদ ছাড়া আর কিছু সঞ্চয় হয় না। আর এই এক নারী দেহ, বহু ভাবে বহু রকমে দেহটিকে নিয়ে খেপে উঠেছেন তিনি, কিছুতেই পুরোনো হয়নি। শুধু রহস্য, অজানা অচেনা জগতে তলিয়ে যাবার মত একটা অদ্ভুত চেতনা, আর তৃপ্তি, এই তিন বস্তু দিয়ে তৈরী কৃষ্ণার শরীর। করুণাকেতন ঐ দেহ-দেউলে পূজা দিয়ে প্রতিবার নবজীবন লাভ করেন যেন, অসীম তৃপ্তিতে তাঁর ওপর ভেতর পরিপূর্ণ হয়ে যায়।"[৯১]

কামনা-বাসনার বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও করুণাকেতন সোজা মনের মানুষ। তাঁর মধ্যে জটিলতা কম। বহু নারী সমাগমে এঁর জীবনে স্খলন সুস্পষ্ট। তার মধ্যেও তিনি কৃষ্ণাকে বিশেষভাবে দেখেন। আর পাঁচজনের সাথে গুলিয়ে ফেলে না। কৃষ্ণা করুণাকেতনের বহুগামিতার কথা জানেন তবু তাঁর প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার কমতি ঘটে না। কৃষ্ণার মত বিদুষী ও সুন্দরীর পক্ষে এই প্রেমের যথার্থ কারণ সাধারণভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ঔপন্যাসিক অবধূত কৃষ্ণা ও করুণাকেতনের মানসিকতাকে এবং তাদের কাজের পরিবেশকে এমন বিচিত্র কাহিনির মধ্যে এগিয়ে নিয়ে গেছেন যে তাঁদের পারস্পরিক এই বোঝাপড়ার মধ্যে পাঠকের কোনো অসন্তোষ কাজ করে না। বিপ্লবী কার্যকলাপের ঘূর্ণাবর্তে এই দুইজনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন না। একটা কথা মনে রাখা দরকার জীবনকে অবধূত নিজের অভিজ্ঞতার আলোয় চিনিয়েছেন অতিরঞ্জন করা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। সত্যকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া অনেক সময় কঠিন। ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করে অবধূত সেই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে একটি সুলভ প্রচার আছে এই যে তিনি অশ্লীল বিষয়ের চর্চায় আগ্রহী। অবধূত সম্পর্কিত এই গবেষণায় আমাদের মনে হয়েছে একথা ঠিক নয়। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে উপন্যাস ও ছোটগল্প আলোচনা প্রসঙ্গে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি। এখন 'বহুব্রীহি' গল্পের মাধ্যমে সংক্ষেপে বিষয়টি বুঝে নিতে চাই। দশাশ্বমেধের ঘাটে যে বুড়ি বাবু লোকেদের জন্য দেহপশারিনীদের যোগান দেয় তার মুখে লেখক যে বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন তাতে কোন অশ্লীল বিষয়ে তিনি যে এতটুকু আগ্রহী নন তা বোঝা যায় :

> "তারপর একটু একটু করে অনেক কথাই বেরলো বুড়ির পেট থেকে। যে বাসায় সে থাকে সে বাসায় দশ ঘর ভাড়াটে। বুড়ীকে ভাড়া দিতে হয় না। কারণ সে ভাড়াটেদের দু'পয়সার মুখ দেখতে সাহায্য করে। যে বউটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল বজরায়, ওর স্বামী আর শাশুড়ী আজ বুড়ীর চামড়া তুলে নেবে বউকে না নিয়ে ফিরলে।" [৯২]

এখানে লেখক কোনরকম অসংযমী-মাদকতার যোগানে লাগামছাড়া মাতলামোর পরিচয় দেন নি বরং ভাষায় গভীর সংযমের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। কাশীতে যে ধরনের কাজ করে এক শ্রেণির মানুষ বেঁচে আছে সে মানুষ তো কলকাতাতেও আছে। আমরা মৌরী সহ আরো যেসব মেয়েদের 'বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসে পেয়েছি তারাও তো একই গোত্রের। তবে তার মূল কথা হলো পেটের দায়। সেই কথাটা সাধু -সন্ত বা ঘর ছাড়াদের যতটা চোখে পড়ে গৃহস্থ সুখী ও সীমাবদ্ধ তথাকথিত সামাজিক মানুষের ততখানি পড়বে কেমন করে? স্বার্থ এবং পরিচিতের সীমা ছেড়ে পথে নামে যারা তাদের মত অভিজ্ঞতা হবে কেমন করে ? ভবঘুরে শরৎচন্দ্রের লেখাতেও আমরা এমন ব্যতিক্রমী জীবনের প্রচুর উদাহরণ পাই -এ-সব চরিত্রের পরিচয় এজন্য সম্ভব হলো যে লেখক নিজে 'রাহী' ছিলেন। তাঁর সৃষ্টিলোক ছিল বহুব্যাপ্ত।

পাশ্চাত্যের মত সার্থক ভ্রমণ সাহিত্য বাংলা ভাষায় বেশি নেই। যাও-বা আছে তার অধিকাংশ আবার ভ্রমণের গাইডবুক-সাহিত্য পদবাচ্য নয়। উপন্যাসে উদ্ভাসিত লেখকের আত্মদর্শন বলতে যা বুঝি তেমন কিছু সে-সব ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তুলনায় বলা যায় অবধূতের আত্মদর্শন অধিকাংশ উপন্যাসের গৌরব। অবধূতের আত্মদর্শন আর পথের দর্শন যেন সমার্থক হয়ে উঠেছে। কথা সাহিত্যের সর্বত্রই অবধূত তত্ত্ব-সন্ধানী। লেখকের আত্মদর্শন তাই অবধূতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। দেখা যায় অবধূতের লেখা 'মরুতীর্থ হিংলাজ'(১৯৫৪), 'মায়ামাধুরী'(১৯৬০), 'দুর্গমপন্থা' (১৯৬০), 'হিংলাজের পরে' (১৯৬২), 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫), 'টপ্পা ঠুংরি (১৯৬৯)-র মত অধিকাংশ উপন্যাস এবং 'বহুব্রীহি' (১৯৬৪)-র কিছু গল্প–সর্বত্রই সেই পথের দর্শন। অবধূতের আত্মদর্শন আর পথের দর্শন যেন অনেকটাই সমার্থক হয়ে যায়। তবে লেখকের আত্মদর্শন উপন্যাসে স্বতন্ত্র জায়গা দখল করেনি। যেখানে লেখকের আত্মদর্শন প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে তা এসেছে অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায়। লক্ষ করলে দেখা যায় যে সে-সব ক্ষেত্রে লেখকের আত্মদর্শন ভিন্ন কাহিনি ও চরিত্র জীবন্ত হতে পারত না। অর্থাৎ লেখকের আত্মদর্শন কাহিনি বা চরিত্রের সাথে ওতপ্রোত, যেন অস্থি-মজ্জায় অবিচ্ছেদ্য।

আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে পথে নামলে লেখকের ব্যক্তি জীবনের ধারা বহু জীবনের সাথে মেশে। তখন লেখকের এইটি জীবনেই হতে পারে বহু জীবনের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার ফলে স্রষ্টা ব্যক্তির জীবন-পাত্র পূর্ণ হয়ে যায়। তখন সে লেখকের মধ্যে প্রকাশের ক্লান্তি থাকে না, থাকে পূর্ণতার উচ্ছ্বাস। প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ততা! অবধূতের কথাসাহিত্যে সেই উচ্ছ্বাস প্রকাশিত। অবধূত দূলাল মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিলোক পূর্ণ হয়েছিল নানা অভিজ্ঞতায়। রাজনীতি, জেল, ধর্ম, সন্ন্যাস,রাহী জীবন, শ্মশান সাধনা,শব সাধনা-জীবনের বিচিত্র রূপের মধ্যে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেছেন। সঞ্চিত জীবন-অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে রূপ দেওয়ার দক্ষতা আবিষ্কারের কাজটিও লেখকের স্বরূপ সন্ধানের একটি মহৎ দিক। লেখার শৈলী নিঃসন্দেহে সাহিত্যের একটি প্রধান অবলম্বন। অবধূতের লেখার জাদু আবিষ্কার করে সৈয়দ মুজতবা আলী 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' -এর মুখবন্ধে যা বলেছেন এ প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে।

“এই অভিনয় দক্ষতা আপন কলমে স্থানান্তরিত করতে পারলেই লেখকের ‘সকলং হস্ততলং’-লেখা তখনই হয় convincing; তার বিগলিতার্থ, অভিনয় করার সময় যে রকম প্রত্যেকের আপন আপন ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা অপরিহার্য, লেখার বেলাও তাই। এখানে কর্মটি কঠিনতর। কারণ এখানে অঙ্গভঙ্গী করতে পারবেন না, চোখের জল ফেলে দেখাতে পারবেন না। অর্থাৎ টকি সিনেমার কাজ গ্রামোফোন রেকর্ড দিয়ে সারতে হচ্ছে। আসলে তার চেয়েও কঠিন, কারণ, কণ্ঠস্বর দিয়ে বহুৎ বেশী ভেল্কিবাজী দেখানো যায়। অনেকের অনেক রকম ভাষা ---কেউবা স্ল্যাং ব্যবহার করে, কারো বা ইডিয়মে জোরদার, কেউ কথায় কথায় প্রবাদ ছাড়ে, কেউ বা বাল ভশ্চাযের মত সংস্কৃত-ঘ্যাঁষা ভাষা, কেউ কিঞ্চিৎ যাবনিক-এ সব-কটা করায়ত্ত না থাকলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথাবার্তা convincing ধরণে প্রকাশ করা যায় না। এ বাবদে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ মধুসূদনের ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ।”

‘প্রকাশই সাহিত্য’ কথাসাহিত্যিক অবধূত অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং অন্তরঙ্গ অনুভবকে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্ত হলো অবধূত প্রয়োজন-অনুযায়ী ভাষা-ব্যবহারে দক্ষ। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি যখন বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে পড়ে আছে ক্যাঙ্গারু এবং পিনাকী দেখতে পেলো যে তার দুচোখের কোণ দিয়ে জল গড়াচ্ছে সেই সময়টির কথা অবধূত খুবই সংযমের সাথে বর্ণনা করেছেন। পিনাকী বলল :

-“কেঁদ না ক্যাঙ্গারু। বড়মানুষদের খিদমত খাটতে গিয়ে এইভাবেই আমরা বেঘোরে প্রাণ দি। নিমকহারাম বড়মানুষ জাত, এইমাত্র ঐ লোকটা বললে কি জান, বললে ও তোমাকে চেনেই না। মরতে মরতে উঠে গিয়ে তুমি ওকে ফোন করেছ, ও এসে তোমায় মরতে দেখে বললে যে তোমাকে চেনেই না।”[৯৩]

‘ঐ লোকটা’ পরশুরাম মিত্র, সে মিনতি মিত্রর স্বামী। সে ক্যাঙ্গারুকে লাগিয়েছিল চণ্ডীর পিছনে। অবধূতের ব্যবহৃত এই ভাষাতে আরবী-ফারসির মিশেলে হুতোমী কলকাত্তাই উঠে এসেছে। লেখকের বৈশিষ্ট্য এখানে যা প্রকাশ পেয়েছে তা ভালোভাবে খেয়াল না করলেও পাঠক বুঝতে পারবেন :

১. বিষয় কিম্বা উপলব্ধিকে প্রকাশ করবার ভাষার ক্ষেত্রে কোন সচেতন গোত্র সন্ধান নেই। যেকোনো ভাষাকে, সংলাপের বা পরিবেশের প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করতে পারেন।
২. ভাষার কৌলিন্য-সচেতনতা নয় উপলব্ধির সত্যতা পাঠকের হৃদয় জয় করে নেয়।
৩. বৈঠকী কথাবার্তার মেজাজে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন অবধূত।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে ‘টপ্পাঠুংরি’-র সাড়ে চার পৃষ্ঠা (১ম-৫ম পৃষ্ঠার শুরুর অনুচ্ছেদ) জুড়ে সাহিত্যে প্রত্যক্ষতার মূল্য আলোচনায় আমরা ক্লান্ত হতে পারিনা যে বিশেষ গুণটির জন্য তা হলো মুখোমুখি বসে কথা বলার সজীব অনুভব। কথককে যেন সামনে দেখতে

পাওয়া যায়। লেখক অত্যন্ত আড্ডা প্রিয় বলেই উপযুক্ত শব্দও এসেছে কথা বলার স্বাভাবিক বেগে। 'মার্জিত শব্দ প্রয়োগ করবো শৈল্পিক চেতনা নিয়ে' ---এরকম ভাব অনেক সময় প্রকাশকে আড়ষ্ট করে---সে সব চিহ্ন তো নেই-ই উল্টে কথার স্বচ্ছন্দতায় জীবনের সপ্রাণতায় একটুও সংকোচ না করে পথে ঘাটে শোনা জীবনের স্রোতে ভেসে আসা শব্দও অবলীলায় ভূমিকাপূর্ণ স্থান দখল করেছে যেমন: বেওয়ারিস, ভাশুরভাদ্রসম্পর্ক, মুসাফিরি, নিমকহারামি, ('টপ্পাঠুংরি', পৃ. ১) বিলকুল, গাড়ল, হক, রগড়, ('টপ্পাঠুংরি', পৃ. ২) ঝুট ঝামেলা, টহল, নিত্যি নতুন, মাল উগরে, চিজ, বাসটে মড়া (পৃ. ৩) রেগে কাঁই, রামছাগলে (মানুষ অর্থে) বলাৎকার, জান, পিলে চমকানো ইত্যাদি।

৪. লেখক মনে করেন কল্পনার সৃষ্টি প্রাণহীন। যিনি নির্দিষ্ট স্থানের বাসিন্দা তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথার চর্বিত চর্বণ করেন। নিজে যখন রাহী জীবন যাপন করেছেন তখন তিনি যা লিখতে পারতেন জোড়াঘাটে বসবাস করার সময় আর তা পারছেন না। তাঁর নিজের কথায় :

> "বসে পড়ার দরুণ সত্যিকারের জ্যান্ত গল্প পড়ার পাঠ একদম চুকে গেছে। আজ কাল পরশুরা আসছে আর চলে যাচ্ছে। আজ কাল পরশুদের সাক্ষী রেখে কত জায়গায় কত গল্প ঘটে যাচ্ছে, আমি তাদের নাগাল পাচ্ছি না। এক জায়গায় আটকে গিয়ে মনে মনে টহল দিতে দিতে মনের খোঁজে মরছি।"[৯৪]

৫. লেখক অবধূত লেখার মধ্যে আনন্দ পাচ্ছেন না কেন তার ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যায় আমরা সাহিত্য স্রষ্টার সীমাবদ্ধতার কথা বিশেষভাবে জানতে পারি। নিজের লেখার মূল্যায়ন এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত সততার সাথে তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন:

> "সেই মনগড়া মনের মানুষদের মনরক্ষা করার গরজে খুব সাবধানে ঢেকেঢুকে সাজিয়ে গুছিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করছি। তারপর সেই মাল উগরে দিচ্ছি সাদা কাগজের উপর।"[৯৫]

৬. অবধূতের রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো চলমান জীবনের স্বরূপ-সন্ধান। তিনি সৃষ্টির স্বরূপ-সন্ধানে যেমন ব্যাপৃত ছিলেন ঠিক তেমনি কথাসাহিত্যের আধারে পরিবর্তমান জীবনকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চরিত্র-চিত্রণের মূল কথাই গতিমানতা। কেউ যেন থেমে থাকতে চায় না। কোনো গণ্ডী কেটে কেউ বাস করতে যেন জানেই না। তত্ত্বাকারে সব মানুষই 'চরৈবেতি'-র সংজ্ঞা বোঝেন। যিনি বাস্তবে বাসা-হীন রাহী তিনি এ তত্ত্বের অভ্যাস করেছেন জীবনে তাই তাঁর দেখার একটা স্বতন্ত্র দিক থাকবেই। অবকধূত তাঁর রচনায় তা প্রমাণ করেছেন। তাঁর সৃষ্টিতে মনে হবে পরিচিত জীবনের গভীরে তিনি ঢুকছেন না -কেবল দেখছেন পথ চলতি ব্যস্ততায়! চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়ে দেখা নৈশ অন্ধকারে জ্বলা কুঁড়ে ঘরের প্রদীপ কিম্বা অট্টালিকার জানালায় ক্ষণিকের দেখা জীবন তাঁর কথাসাহিত্যের অবলম্বন আর বাকীটুকু কল্পনায় ভরিয়ে নেওয়া। জীবনের খুঁটিনাটি দেখার আগ্রহ ঔপন্যাসিকের নেই। এধরণের ঔপন্যাসিকের

বিরুদ্ধে বাঁধা গতে অবাস্তবতার অভিযোগ তুলে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কথা। তাঁর রচনার বড় গুণ বাহুল্য বর্জন অবধূতের লেখার মধ্যে সেই বাহুল্য বর্জনের মহৎ গুণটি বিদ্যমান।

৭. যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ- দেশবিভাগ মানুষের মূল্যবোধের মূলে আঘাত করেছে। সে আঘাতে কেউ বা ইতিহাসের মধ্যে অশ্রয় খুঁজেছেন, কেউ-বা ভূগোলে। সেই সাথে চলেছে টেকনিকের সন্ধান। বেশ কিছু ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। এই বিচিত্র টেকনিকের উপলব্ধি এবং ভাঙাগড়া সম্ভব হয়েছে জীবনকে খুঁজতে গিয়েই। ধূর্জটিপ্রসাদ, গোপাল হালদার যে চিন্তাধারা ও চেতনাস্রোতকে ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়েছেন অথবা তারশঙ্কর, বিভূতি, মানিক যে ঔপন্যাসিক কন্টেন্ট জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন, পাঁচের- ছয়ের দশকে ইতিহাস ভূগোলকে আশ্রয় করায় কনটেন্ট এবং টেকনিকের সে দায় এই দশকের বাজার-লক্ষ্য ঔপন্যাসিকদের মানতে হয়নি। অবধূত ছিলেন ব্যতিক্রমী। জনৈক লেখক অবধূত-প্রসঙ্গে বলেন : ''যেন জীবন নামক ব্যাপারটা কখনো সংসারে থাকে, কখনো সংসারে থাকেই না, তখন সে থাকে শ্মশানে, অথবা জঙ্গলে!''[৯৬]

পাঁচের দশকে অবধূত অপরিচিত পরিবেশ, আঞ্চলিক ভাষা, লোকাচার, ইত্যাদির সাথে ঘনিষ্ঠতা ও ব্যক্তি-পরিচয় সূত্রে পাঠকের বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। অধিকাংশ মানুষ যে পরিবেশ ও সমাজের সাথে পরিচিত একজন তান্ত্রিকের অভিজ্ঞতার সাথে তার মিল কোথায়?[৯৭]

অবধূত সমকালীন রচনা 'ইছামতী'। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটি ইতিহাসের তথ্যে সমৃদ্ধ। নির্দিষ্ট কালখণ্ডের চিত্রণে, সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই উপন্যাসটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ ছাড়া প্রমথনাথ বিশীর লালকেল্লা, 'কেরীসাহেবের মুন্সি', রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ', গজেন্দ্র মিত্রের 'কলকাতার কাছেই' আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' প্রভৃতি এই সময়ের বিশ শতকের পাঁচের দশকের উল্লেখ্য রচনা। বেস্টসেলার দের তালিকায় অবধূতের সাথে অবশ্যই উঠে আসেন বিমল মিত্র (সাহেব বিবি গোলাম, কড়ি দিয়ে কিনলাম)। তবে দায়িত্বশীল লেখক 'শঙ্কর'। বিনোদনের দিকটি না ভুলেও সামাজিক দায়িত্ব মনে রেখেছেন। 'সীমাবদ্ধ', 'জন-অরণ্য'-এ কথার সাক্ষ্য দেয়। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা বোধহয় সমরেশ বসু-র 'গঙ্গা'(১৯৫৭)। অবশেষে বলতে হয় পাঁচের দশকে নতুন পথের সন্ধানে অনিবার্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যাদর্শ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই সে-সময়ের লেখকদের মানসিকতাকে তুলে ধরেছেন।

> ''আবার ইতিহাসকে আশ্রয় করে যেখানে সমকালকে পরিহার করেছেন লেখকেরা, সেখানেও তাঁরা মনে করেছেন ইতিহাসের পুঞ্জীভূত তথ্যরাশির সঙ্গে কাহিনীর চুনবালি কোনোক্রমে মেশাতে পারলেই বুঝি উপন্যাসের প্রাসাদ খাড়া করা যাবে। 'derivation of the individuality of of the character from the historical peculiarity of the age' (গিয়র্গি লুকাচ) পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকের ইতিহাস-নির্ভর

উপন্যাস গুলিতে সে সত্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।"[৯৮] সময়ের অনিবার্য প্রভাব তারাশঙ্করের উপরেও পড়েছে।[৯৯]

৭. গল্পকথনভঙ্গি, জীবনাভিজ্ঞতা, নতুন জীবন-দর্শন, রসবোধ ইত্যাদি যে অবধূতের জনপ্রিয়তার অবলম্বন তা অস্বীকারের উপায় নেই। অবধূতের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গল্প বলা গল্প বলে চলেছেন কথক। কথককে যেন সামনে দেখতে পাওয়া যায়। লেখক অত্যন্ত আড্ডা প্রিয় বলেই উপযুক্ত শব্দও এসেছে কথা বলার স্বাভাবিক বেগে। পাঠকের অজানা জগৎ তাই বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। অবধূতের এই গুণটি ছিলো বলেই আজও তাঁর পাঠকের অভাব নেই। তিনি আজও সাধারণ পাঠকের মন কাড়তে সক্ষম।

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলব যে ব্যক্তি অবধূত সম্পর্কে যা জানলাম তা তাঁর অজ্ঞাত জীবনের অসম্পূর্ণ বিবরণ। আত্মপরিচয় গোপন করতে চেয়েছিলেন বলেই তা এত সংশয়াকীর্ণ। তাঁর বন্ধুপ্রতিম রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায় , ষষ্ঠীপদ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কু মহারাজ, সূচনা দেবী, সঙ্কর্ষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের স্মৃতি থেকে অবধূত সম্পর্কে অনেক তথ্য শুনিয়েছেন আমরা তা উল্লেখ করেছি। তিনি লিখে একসময় প্রচুর আয় করতেন। প্রায় মাসে বারোশ' টাকা। তুলি ও কলম এবং মিত্র ও ঘোষ ছাড়াও আরো অনেক পাবলিশার তাঁর গ্রন্থ ছাপেন। 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-র গ্রন্থ সত্ত্ব দেন পুত্রবধূ সূচনা দেবীকে। অন্যান্য বইয়ের গ্রন্থসত্ত্ব লিখে দেন পৌত্র তারাশঙ্করকে। চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের বাড়িটির জন্য জমিটি তিনি রিফিউজি হিসেবে পান। সে দলিল পৌত্র তারাশঙ্করের কাছে আছে বলে তিনি জানিয়েছেন।এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে এক আড্ডার আসরে নৈহাটির বন্ধু ও লেখক সমরেশ বসুর সাথে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এই বিচ্ছেদ আরো বড় আকার ধারণ করে; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ভুল বোঝেন। অজ্ঞাত কারণে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে এড়িয়ে চলতে থাকেন। কোনো কোনো প্রকাশক তাঁকে ফাঁকি দিতেন। সিনেমা পত্রিকায় তাঁর একটি লেখা ছাপা হলেও তার জন্য টাকা তো পান নি এমন কি সৌজন্য কপিও তাঁরা দেন নি। স্বভাব-রসিক এই মানুষটি খোলা মনে চলতে গিয়ে কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু অহেতুক প্রত্যাঘাত করেননি। বাইরের শক্ত পোক্ত চেহারার অন্তরালে একটি কুসুমকোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। পৌত্র তারাশঙ্কর এবং পুত্রবধূ সূচনা দেবীর সাক্ষাৎকার[১০০] থেকে আমরা তা জানতে পারি।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য

১. অবধূতের প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৪৯টি (৪টি সঙ্কলন গ্রন্থ ও একই বিষয় ভিন্ন নামে প্রকাশিত এমন চারটি গ্রন্থ সহ) সঙ্কলন গ্রন্থগুলি আসলে কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাই এগুলি মৌলিক রচনাবলি থেকে বাদ যাবে। আমরা সরেজমিনে উদ্ধার করতে পারিনি সাতটি গ্রন্থ। তবে পরোক্ষ উল্লেখ আছে এসব গ্রন্থের। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে মোট ত্রিশটি মৌলিক গ্রন্থের উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করতে পেরেছি। এর মধ্যে আছে মোট ২৭টি উপন্যাস ও তিনটি গল্প সংকলন।

২. ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এই বাইশ বছর অবধূতের সাহিত্য রচনার প্রকৃষ্ট সময়।

৩. একটি মাত্র কবিতা তিনি লিখেছিলেন বলে জানা যায়। কবিতাটি শতবর্ষ সঙ্কলনে আছে । দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৭৬, চিত্র নং ১৪

৪. তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়ায় অবস্থিত জোড়াঘাটের বাড়িতে অবধূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র নং ৫। একদা সমরেশ বসুর বাড়িতে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমরেশের সঙ্গে অবধূতের বন্ধুত্ব নষ্ট হয় এবং তা তারাশঙ্কর পর্যন্ত গড়ায়। তারাশঙ্করও একদা অবধূতকে ভুল বুঝে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু অবধূত আমৃত্যু তাঁকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত শ্রদ্ধা করতেন।

৫. অবধূত প্রেম, হাস্য-রসিকতা, সাধু-সঙ্গ, ভ্রমণসাহিত্য, শক্তি-সাধনা,অলৌকিক জগৎ, জাদুবিদ্যা,স্বাধীনতা সংগ্রাম, বারবণিতা জীবন ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ত্রিশটি কথাসাহিত্য রচনা করেছেন।

৬. বালগঙ্গাধর তিলক (২৩.০৭.১৮৫৬-০১.০৮.১৯২০)

৭. গান্ধীজী (০২.১০.১৮৬৯-৩০.০১.১৯৪৮)

৮. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'আধুনিক ভারত' ২ খণ্ড, ১৯৮৪, স্ট্যাটুটরি কমিশনের রিপোর্ট, ৪র্থ খণ্ড, ১ম অংশ, পৃ. ১০৬

৯. ঐ, পৃ. ১০৬

১০. রুজভেল্ট (৩০.০১,১৮৮২-১২.০৪.১৯৪৫)। এঁর পুরো নাম ফ্রাঙ্কলিন দিলানো রুজভেল্ট (FranklinDelano Rosevelt)। ইনি আমেরিকার ৩২তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

১১. চার্চিল (৩০.১১.১৮৭৪-২৪.০১.১৯৬৫)। ইনি ইংরেজ রাজনীতিবিদ ও লেখক। এঁর পুরো নাম হলো উইনস্টন চার্চিল।

১২. সঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৯৮,পৃ.৯

১৩. রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৮২, পৃ.৫৩০

১৪. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'শিল্পীর স্বাধীনতা', দেশ, ২০ পৌষ, ১৯৬৯, পৃ. ৮৯৫

১৫. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা', কলকাতা, ১৩৪৬, পৃ. ৭৬, ৮০, ৭২

১৬. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ' প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, পৃ. ৩৭

১৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৮৩

১৮. অবধূতের ছেলে অমল মুখোপাধ্যায় চিত্র পরিচালক অঞ্জন দাসকে বলেছিলেন ---অবধূত 'বটুক ভৈরব' সিদ্ধ ছিলেন। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৯০

১৯. অবধূত, নীলকণ্ঠ হিমালয়, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬৫, পৃ. ২৮৩

২০. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৮৩

২১. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৮৩

২২. 'একা জেগে থাকি', ১৪১০, পঞ্চম সংখ্যা, পৃ. ১৮

২৩. অবধূতের লেখা 'বিশ্বাসের বিষ' পরবর্তী সময়ে ৮ বছর বাদে 'ফক্কড়তন্ত্রম' (১৯৬৮) নামে প্রকাশিত হয়।

২৪. বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এর উল্লেখ আছে 'দুরি বৌদি' বা 'শুভায় ভবতু' উপন্যাসে, ব্রজমাধবের বাড়িতে। এই উপন্যাসের ২১১-২১২ পৃষ্ঠায় বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর জগৎসিংহ ও ওসমানের উল্লেখ আছে দুরির প্রেম-সঙ্কটের সময়ে।

২৫. অবধূত ভ্রমণ সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, মরুতীর্থ হিংলাজ, পৃ. ১৩

২৬. রাস্কিন (Ruskin, London 08.02.1819--20.01.1900)

২৭. কালিদাস গুপ্তযুগের কবি 57 BC-র রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি।

২৮. 'শুভায় ভবতু' উপন্যাসে কথক অবধূত তাঁর স্কুল জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বলেছেন 'আহমদ, ঘাঁটি মাস্টারের ক্লাসে লুকিয়ে পড়ছিল শরৎ চাটুয্যের বই।' শুভায় ভবতু, পৃ. ৭১

২৯. রবীন্দ্রনাথের দুটি গান অবধূত ব্যবহার করেছেন। দ্রষ্টব্য–অবধূত ভ্রমণ সাহিত্য, মরুতীর্থ হিংলাজ, মিত্র ও ঘোষ,কলকাতা, পৃ. ১৫২-১৫৩ এবং ১৫৭, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'দুরি বৌদি' উপন্যাসের ১১৭ পৃষ্ঠায় আছে ব্রজমাধবের বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'আনন্দমঠ' পড়ছেন কথক।

৩০. গৌরীশৃঙ্গ হোটেলে নৃত্যগীত প্রদর্শিত হলো। ভাস্বতীর অপূর্ব দর্শন লাস্যময়ী ছবির উপরে লেখা আছে : 'ঊষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা / তুমি অকুণ্ঠিতা', বিজ্ঞাপনে নৃত্যরতা ভাস্বতীর ছবির নীচে রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতার এই লাইনটি : 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা নাচে রক্তধারা।' লেখা ছিল। দ্রষ্টব্যঃঅবধূত, দেবারীগণ,গুপ্ত প্রকাশিকা,কলকাতা,১৯৬৯ পৃ. ১৫১

৩১. ভৈরবীর পত্র,অবধূতের বন্ধু কীর্ণাহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যয়ের ডায়ারি,পঞ্জিকা-বিচার, ষষ্ঠীপদ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কু মহারাজ (কমলকুমার গুহ) ও অবধূতের পৌত্র তারাশঙ্কর, সঙ্কর্ষণ–প্রমুখের সহমতে অবধূতের উক্ত জন্মদিন জোড়াঘাটে অবধূতের আবক্ষ মূর্তির নিচে খোদিত হয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ আবক্ষ মূর্তির আলোকচিত্র, পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৭০, চিত্র নং ৯

৩২. অবধূত,সুখ শান্তি ভালোবাসা(উপন্যাস সংকলন),শুভায় ভবতু, তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৭৮

৩৩. অবধূত 'একাঘ্নী' নামক গ্রন্থটি রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। ইনি বন্ধুপ্রতিম ছিলেন। কীর্ণাহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি ডায়ারি লিখতেন। অবধূত সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য-সমৃদ্ধ এই ডায়ারি।

৩৪. অবধূত জন্ম-শতবর্ষের আমন্ত্রণ-লিপির আলোকচিত্র, দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৭৯, চিত্র নং ৬

৩৫. চুচুঁড়ার জোড়াঘাটে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের (১৮৩১-১৮৯৪) পৌত্র শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবধূত সম্পর্কে স্মৃতি চারণ করেন এবং প্রপৌত্র সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে অবধূতের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়।

৩৬. 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসে আমরা দেখেছি ১৯২৮ সাল নাগাত তিনি বোমা বাঁধতে শিখেছেন। ধনঞ্জয় সোম ছিল তাঁর সঙ্গী। অল্প বয়সেই তিনি বেপরোয়া জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। পৌত্র সঙ্কর্ষণ মুখোপাধ্যায় লেখেন ১৯২৮–৩০ সালে তিনি বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িয়ে যান। দ্রষ্টব্য,জাগরণ পত্রিকা, পৃ. ১০, পরিশিষ্ট, ৪৯০

৩৭. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রচণ্ডীমঠের ভৈরব, দীপ প্রকাশন,কলকাতা, পৃ. ৬

৩৮. অবধূত, বিশ্বাসের বিষ, তুলি-কলম, ১৯৭৪, সবিনয় নিবেদন, পৃ. ১৩৬

৩৯. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রচণ্ডীমঠের ভৈরব, দীপ প্রকাশন,কলকাতা,পৃ. ৬

৪০. অবধূত, বহুব্রীহি গল্পগ্রন্থ, বহুব্রীহি, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ১৩

৪১. অবধূত জন্ম শতবর্ষে দীপ্রকলম, চতুর্থ সংখ্যা, ২০১০

৪২. সূচনা দেবীর আলোক চিত্র, দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৬৫, চিত্র নং ২/চ। ১৯.০৪. ২০১৯ তারিখে তাঁর সাথে দেখা করে এ বিষয়ে শোনা গেছে। পুত্রবধূ সূচনা দেবী,স্মৃতি থেকে যা বলেছেন তা এই রকমঃ তিনি খেতে এবং খাওয়াতে খুব ভালেবাসতেন। বিশাল দেহী সুপুরুষ ছিলেন তিনি। শোনা যায় একটা গোটা পাঁঠা তিনি খেয়ে ফেলতে পারতেন। তাঁর কাছেই মাংসের নানা পদ রান্না করতে শিখেছিলেন–সূচনা দেবী। জোড়াঘাটের বাড়িতে।

৪৩. সজনীকান্ত দাস, 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৫৬

৪৪. অবধূত বিষয়ক সাক্ষাৎকার। অবধূতের পৌত্র তারাশঙ্কর ও অবধূতের পুত্রবধূ সূচনাদেবীর সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৭২

৪৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, সপ্তম সংস্করণ,১৯৮৪,পৃ. ৭৯০

৪৬. ঐ, পৃ. ৭৯০

৪৭. আলোচ্য বৃন্দাবন দাস কে অবধূত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' (১৯৫৪) গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। আমরা দেখেছি 'শুভায় ভবতু'(১৯৫৭) উপন্যাসে অবধূতের ঈংরেজ বিরোধী মনোভাব প্রকাশিত। পুলিশের বড়কর্তার পদে চাকরি করেও এই উপন্যাসের 'ব্রজমাধব চৌধুরী বিপ্লবীদের প্রকারান্তরে সাহায্য করতেন।

৪৮. অবধূত, বিশ্বাসের বিষ,দ্বিতীয় পর্ব, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ.২

৪৯. ঐ, পৃ. ৬

৫০. প্রসঙ্গত মনে পড়ে ‘শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ’বইটির মধ্যে লেখিকা রানী চন্দ অবনীন্দ্রনাথের গান শোনার কিছু খবর জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গান একটার পর একটা শুনতে শুনতে তিনি না কি বলে উঠতেন একসময়ে :‘তোমরা সব রবিকার জীবনী খুঁজছ, রবিকার গানই তো তাঁর জীবনী।...গানের মধ্যে রবিকার সারা জীবন ধরা আছে। সুর ও কথার অন্তরে তাঁর জীবন্ত ছবি ওইখানেই পাবে।’ প্রায় একইকথা নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছেন ‘আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ’-এর মধ্যে। তিনি লিখেছেন ‘গানগুলিকে তারিখ অনুযায়ী সাজাইলে এগুলি হইতেই তাঁহার মানসিক জীবনী লেখা যায়।’

৫১. দ্রষ্টব্য : নিরাকারের নিয়তি’ উপন্যাসের প্রচ্ছদপত্রের ফটোকপি, পরিশিষ্ট,চিত্র নং ১৮ এবং চিত্র নং ১৯ । ন্যাশনাল পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত। উক্ত ‘নিরাকারের নিয়তি’ গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে অবধূত রচিত ‘সীমন্তিনী সীমা’ ও ‘দুই তারা’ নামের আরো দুটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এই বই দুটির নাম মিত্র ও ঘোষ বা তুলি-কলম উল্লেখ করেননি।

৫২. দ্রষ্টব্য গ্রন্থপঞ্জি: পৃ.৪৯৬-৪৯৮, অবধূত,‘ভ্রমণ কাহিনী সমগ্র,‘নীলকণ্ঠ হিমালয়’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,১৯৭৯, ---র ৪৪৯ পৃষ্ঠায় এই ইংরেজ বিদ্বেষ-এর কথা বলেছেন।

৫৩. অবধূতের উপন্যাস ‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’ ধারাবাহিক ভাবে কথাসাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৫৪. অবধূতের উপন্যাস ‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে ‘তরুণের স্বপ্ন’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে তিনটি পর্বে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য : জাগরণ পত্রিকা, পৃ. ১৮

৫৫. মালবার : মালবার সমুদ্রসৈকত কেরালার উত্তরাংশে এবং মালবার পাহাড় মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। এটি গোয়ার দক্ষিণ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ৮৪৫ কি.মি বিস্তৃত। এখানকার ভাষা মালয়ালাম।

৫৬. গোরখপুর: এটি লক্ষ্ণৌ থেকে উত্তর-পূর্বে ২৭৩ কি.মি.। উত্তর প্রদেশের রাপ্তি নদীর তীরে অবস্থিত।

৫৭. অবধূত, নীলকণ্ঠ হিমালয়’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ১৭১

৫৮. ঐ, পৃ. ১৭১

৫৯. অবধূত শতবর্ষিকী সংকলন, নীলকণ্ঠ হিমালয়, মিত্র ও ঘোষ,২০১০,পৃ. ১৮৯

৬০. প্রসঙ্গত মনে পড়ে অবধূত রচিত ‘হিংলাজের পরে’ উপন্যাস দেবী আশাপূর্ণার উল্লেখ আছে। ইনি ব্যাঘ্রবাহিনী। এক সাহেব গুলবাঘ শিকার করলে দেবীর নির্দেশে কচ্ছের রাজা ১০৮ টি নরবলি দিয়েছিলেন। সেখানকার মঠের সন্ন্যাসী বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত ধ্রুব মহারাজ ১৪ নং পরিচ্ছেদে তিনজন ডাকাতকে সেই মন্দিরে বলি চড়িয়েছিলেন ইনি আবার কথক

অবধূতকে কোটেশ্বর মন্দিরে সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষাও করেন।

৬১. অবধূত, নীলকণ্ঠ হিমালয়', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ১৮

৬২. 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫) উপন্যাসে দেখা গেছে দস্যুরা তাঁর স্বর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। প্রজ্ঞানাথের আশ্রমে তারা ধরা পড়ে। অবশ্য অবধূত ওরফে কথক কোনো জিনিসই দাবি করেননি। নাগরাজ্যে পৌঁছানোর আগে নিশ্চিৎ মৃত্যুর হাত থেকে অবধূতকে বাঁচিয়েছে এক গুজরাটী মহিলা ---যশোমতী পারেখ।

৬৩. অবধূত, 'আমার চোখে দেখা', তুলি-কলম, কলকাতা, জুন ১৯৭৫, পৃ. ১

৬৪. অবধূত, হিংলাজের পরে, মিত্র ও ঘোষ,কলকাতা,১৯৬২, প্রথম অধ্যায়, হিংলাজ থেকে ফিরে কোটেশ্বর যাত্রার সময়।

৬৫. অবধূত, টপ্পাঠুংরি,ক্লাসিক প্রেস ৩/১ এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৬৯

৬৬. ঐ

৬৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৮৩

৬৮. অবধূত, বিশ্বাসের বিষ, শ্রাবণ, ১৩৮১, ১৯৭৪, তুলি-কলম, দ্বিতীয় পর্ব, সবিনয় নিবেদন, পৃ. ১৩৬

৬৯. অবধূত, বশীকরণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,১৯৬০, পৃ. ১৩৫

৭০. অবধূতের উপন্যাস 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'(১৯৫৬) এবং 'মরুতীর্থ হিংলাজ' (১৯৫৪) পড়ে সজনীকান্ত দাস অভিভূত এই মন্তব্য করেন।

৭১. অবধূত, টপ্পাঠুংরি, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ বা 'আমার চোখে দেখা' (১৯৭৫)

৭২. ঐ

৭৩. অবধূত, বিশ্বাসের বিষ, শ্রাবণ, ১৩৮১, ১৯৭৪, তুলি-কলম,পৃ. ৩১-৩২

৭৪. ঐ, পৃ. ৩২

৭৫. ঐ, পৃ. ৩০-৩১

৭৬. ঐ, পৃ. ৩৩

৭৭. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রচণ্ডীমঠের ভৈরব,দীপ প্রকাশন,কলকাতা,২০১৯ পৃ. ১৪

৭৮. অবধূত, বাগীশ্বরী, বহুব্রীহি (গল্প গ্রন্থ), ১৯৬৪, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ৭৫

৭৯. ঐ, পৃ. ৭৮

৮০. ঐ, পৃ. ৭৯

৮১. ঐ, পৃ. ৭৫

৮২. ঐ, পৃ. ৭৭

৮৩. অবধূত,নীলকণ্ঠ হিমালয়,মিত্র ও ঘোষ,১৯৬৫,পৃ. ১৭৯

৮৪. ঐ, পৃ. ১৭৮

৮৫. অবধূত,মরুতীর্থ হিংলাজ, ভ্রমণ কাহিনীসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃ. ১৭

৮৬ ঐ, পৃ. ১৮

৮৭. কমলকুমার গুহ ওরফে শঙ্কু মহারাজ নিজের বই প্রকাশের জন্য অবধূতের সুপারিশ নিতে চুঁচুড়ায় জোড়াঘাটের তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন। তারপর এই পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

৮৮. দ্রষ্টব্য: জাগরণ পত্রিকা,পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৯০, চিত্র নং ২৭ উল্লেখ্য যে 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'গ্রন্থটিকে পরিচালক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সিনেমা করতে শুরু করেছিলেন ১৯৮২ সালে। আর আট দিনের মত কাজ বাকি ছিল এমন অবস্থায় ধরা পড়েন প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ বসু। ইনি চিটফাণ্ডের মালিক ছিলেন গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য সিনেমাটি টাকার অভাবে বন্ধ হয়েযায়। খন্তা ঘোষ–তরুণকুমার,চরণদাস বৈরাগী–বেদশ্রী চক্রবর্তী, নিতাই বোষ্টমী–বনী– এভাবে অভিনয় করবেন বলে স্যুটিং-ও শুরু হয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েকটি চিত্রও 'জাগরণ' সাহিত্য পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, উৎসব সংখ্যা, ১৪১০ -এ আছে। দ্রষ্টব্য: অঞ্জন দাসের সাক্ষাৎকার, পৃ. ৩৩-৩৮

৮৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী,সপ্তম সংস্করণ ১৯৮৪,পৃ. ৭৯০

৯০. অবধূত,মরুতীর্থ হিংলাজ, ভ্রমণ কাহিনীসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ২৭

৯১. অবধূত,কৌশিকী কানাড়া, কলিকাতা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৫০

৯২. অবধূত,বহুব্রীহি, (গল্পগ্রন্থ)বহুব্রীহি, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬৪, পৃ. ১৩

৯৩. অবধূত, সপ্তস্বরা পিনাকিনী, (প্রকাশকাল অজ্ঞাত)পৃ. ১১৯

৯৪. অবধূত,টপ্পাঠুংরি ১৩৭৬, ক্লাসিক প্রেস ৩/১ এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৬৯,পৃ. ৬

৯৫. অবধূত,টপ্পাঠুংরি ১৩৭৬, ক্লাসিক প্রেস ৩/১ এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৯

৯৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৮৩

৯৭. অনেকের কাছে তাই আজগুবি মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে প্রশ্ন থেকেই যায় আজকের দিনেও কি জীবন থেকে অতিপ্রাকৃতকে দূর করা গেছে ? ২০১৮ সালের কেরলে ভয়াবহ বন্যা-পরিস্থিতিতে লক্ষাধিক লোক আটকে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দশকোটি টাকার অর্থ সাহায্য করেছেন। প্রধান-মন্ত্রী সরেজমিনে দেখে সবরকম সাহায্য করেছিলেন। মানবিক মুখ উঠে এসেছিল পাইলট, এঞ্জিনীয়ার, সাধারণ মানুষ এবং শিশু-কিশোরদের থেকেও। চালু হয়েছিল জলে-স্থলে বায়ুমণ্ডলে সমান পরিসেবা। এর্নাকুলাম-সাঁতরাগাছি স্পেশাল ট্রেন চলেছিল এ রাজ্যের বাসিন্দাদের ফিরিয়ে আনতে। সবই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ও বিজ্ঞান-সম্মত। এরই

পাশাপাশি কেরলের ১৩ টি জেলার এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য বিপন্নরা ভাবছেন গো-দেবতার রোষ! মন্দিরে দশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মহিলাদের প্রবেশের অধিকার দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । তাই নাকি একশ বছরেও যা হয়নি তা হোল! এই ভয়াবহ বন্যা !

৯৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৮৩

৯৯. 'রাধা' উপন্যাসে মোগল আমলের শেষপাদে বর্গির হাঙ্গামা-অধ্যুষিত বাংলার ধর্মীয় সাধনার পটভূমিতে লিখিত এই উপন্যাসে যে পরিমাণে চড়া রঙের ব্যবহার সে পরিমাণে কান্তি নেই। এ -অভিজ্ঞতার রসরূপ নির্মাণে কোন্ বিশিষ্ট বক্তব্য দ্যোতনা লাভ করল তা স্পষ্ট হয়নি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়,'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাস', বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৩৮৩

১০০. দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট, পৃ.৪৭২, অবধূতের পৌত্র তারাশঙ্কর ও অবধূতের পুত্রবধূ সূচনাদেবীর সাক্ষাৎকার–১২

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

দুলাল মুখোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক সত্তার অনুসন্ধান : বিচিত্র মানুষের জীবন-পরিচয় উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ

পৃষ্ঠা

এক. ঔপন্যাসিক সত্তার গভীরে বিচিত্র জীবনের সন্ধান	৭৮
দুই. উপন্যাস প্রসঙ্গ	৭৯
তিন. বাংলা উপন্যাস ও অবধূত	৯০
চার. 'যা নয় তাই': পিতৃসত্তার হাহাকার	৯৩
পাঁচ. 'উদ্ধারণপুরের ঘাট': জীবনের বিচিত্র পরিণতি	৯৮
ছয়. 'কলিতীর্থ কালীঘাট' ও ঔপন্যাসিকের দক্ষতা	১০৭
সাত. 'বশীকরণ' ও ঔপন্যাসিকের মনস্তত্ত্ব	১৩৩
আট. 'শুভায় ভবতু': শিল্পে স্রষ্টার অপরিহার্যতা	১৩৬
নয়. 'বিশ্বাসের বিষ' : অসহায়া নারীর জীবন-যন্ত্রণা	১৪০
দশ. চরিত্র-বৈচিত্র্যে অন্যান্য উপন্যাস-কল্প রচনা	১৪১

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

দুলাল মুখোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক সত্তার অনুসন্ধান : বিচিত্র মানুষের জীবন-পরিচয় উদ্ধার ও তার বিশ্লেষণ

ভূমিকা

কথাসাহিত্যিক দুলাল মুখোপাধ্যায় অবধূত নামে হাস্য, মধুর এবং বীভৎস রসকে আশ্রয় করে ত্রিশটির বেশি সার্থক উপন্যাস ও ছোটগল্পের সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন। তবে বীভৎস রসের এমন সার্থক ব্যবহার বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর আগে বা পরে দেখা যায়নি। তাঁর রচিত মৌলিক ও সঙ্কলন গ্রন্থের একটি তালিকা গ্রন্থপঞ্জিতে নির্মাণ করা গেছে সেখানে সব মিলিয়ে আছে মোট ৪৮ টি গ্রন্থ। এর মধ্যে 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়', 'কলিতীর্থ কালীঘাট', 'মায়ামাধুরী','বশীকরণ', 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী', 'কৌশিকী কানাড়া', 'শুভায় ভবতু', 'হিংলাজের পরে', 'দেবারীগণ','সাচ্চাদরবার', 'পথে যেতে যেতে','টপ্পাঠুংরি' বা 'আমার চোখে দেখা', 'বিশ্বাসের বিষ', 'ভোরের গোধূলি' ইত্যাদি উপন্যাস বা উপন্যাস-কল্প রচনা এবং 'ক্রীম', 'বহুব্রীহি', 'নিরাকারের নিয়তি' ইত্যাদি ছোটগল্প সঙ্কলন তাঁর সৃষ্টিনৈপুণ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবধূতের মত একজন ঔপন্যাসিক কীভাবে সাধারণ জীবনের মধ্যে উপন্যাসের উপাদান পেয়ে যান এবং 'সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞা'-র সাহায্যে কথাসাহিত্য নির্মাণ করেন সেই সত্তার স্বরূপ আমরা অবধূতের রচনা বিশ্লেষণ করেই এই অধ্যায়ে দেখবার চেষ্টা করবো। এই চেষ্টার আর একটি সহায়ক উপাদান হিসেবে আমরা দেখবো অবধূতের নির্মিত চরিত্রকে। ঔপন্যাসিক সত্তার বিশ্লেষণে কাহিনি এবং চরিত্র---উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে বলা নিস্প্রয়োজন যে কথাসাহিত্যিকের প্রধান অবলম্বন ভাষা। ভাষার ওপর দখল না থাকলে জীবন্ত চরিত্রই নির্জীব হয়ে পড়ে। সফল ভাষা প্রয়োগে অবধূত সম্পূর্ণ পারদর্শী। তাঁর অবাঙালী ভারতীয় (কিষণ কুন্দন ভট্টজী, টপ্পাঠুংরি'-র দ্বিতীয় কাহিনি) কিম্বা বিদেশী চরিত্রও (জুলি ম্যাডাম---'নীলকণ্ঠ হিমালয়', 'দেবারীগণ' উপন্যাসের বাড়িউলি মিসেস আদুরী চৌধুরী বা এডোর---ইনি স্কটল্যাণ্ডের মানুষ) স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত।

এক. ঔপন্যাসিক সত্তার গভীরে বিচিত্র জীবনের সন্ধান

কত বিচিত্র ধরণের মানুষকে যে অবধূত তাঁর রাহী জীবনের নানা স্তরে দেখেছিলেন আর তাদের রূপ দিয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। সাধারণ গৃহবাসী মানুষের কাছে এ এক পরম বিস্ময়। অবধূতের কথাসাহিত্যে মাধুর্যময় প্রেমিক- প্রেমিকা (ক্রীম-দলজিৎ, গোমা, ছায়া, ভ্যানিশিং ক্রী-স্বাতী সোম, রূপকথার মত : মণিকান্ত চৌধুরী ও অরুণা) যাযাবর, (হিলাজের পরে) রাহী (নীলকণ্ঠ হিমালয়), ভণ্ড সাধু(নীলকণ্ঠ হিমালয়), ভদ্রবেশী কামুক(সপ্তস্বরা পিনাকিনী-লোকনাথ রায়, 'আমার চোখে দেখা-বদন বাগচী) তান্ত্রিক (টপ্পাঠুংরির তৃতীয় কাহিনির একটি চরিত্র-নিশিকান্তদা) বিকৃত কামা নরনারী (নীলকণ্ঠ হিমালয়), চোর (কলিতীর্থ কালীঘাট : ধনা,) দেহপশারিণী, (বিশ্বাসের বিষ, সাচ্চা হিমালয়) সমাজবিরোধী (সপ্তস্বরা পিনাকিনী : ক্যাঙারু, শোভান কাইজার, বিশ্বাসের বিষ, মায়ামাধুরী), বিপ্লবী (সপ্তস্বরা পিনাকিনী, কৌশিকী কানাড়া), স্বভাবকূটিল সরকারি আমলা (সপ্তস্বরা পিনাকিনী), ঘুষখোর পুলিশ (সপ্তস্বরা পিনাকিনী, মায়ামাধুরী), অর্থপিশাচ স্বাস্থ্যকর্মী (সপ্তস্বরা পিনাকিনী), নিঃস্ব নির্লোভ পাহাড়ী মানুষ (নীলকণ্ঠ হিমালয়), দুষ্ট পুলিশ কর্মী (ভ্যানিশিং ক্রীম-এর কামুক দুই পুলিশ) উকিল (ভ্যানিশিং ক্রীম-ধনুর্ধর উকিল) খাণ্ডারণী মহিলা (বিশ্বাসের বিষ, নীলকণ্ঠ হিমালয়, সাচ্চা দরবার), জাদুকর (নীলকণ্ঠ হিমালয়, ভোরের গোধূলি), শিল্পী (সপ্তস্বরা পিনাকিনী-কাজল গুপ্ত) কোর্টের বিচারপতি (সপ্তস্বরা পিনাকিনী-বাদল গুপ্ত), গায়িকা, নৃত্যশিল্পী (দেবারীগণ), সিনেমার নায়িকা (মায়ামাধুরী), আইসক্রীম :জগদ্ধাত্রী প্রসাদ, ক্রীমক্র্যাকার-শ্রীমান নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য ১১টি নাম---নিয়েছেন ইনি। এই গল্পে পরে সুজাতার সাথে বিয়ে হয়। ভাঁড়ের মতন আছে পুলিশ---নকুড় মামা, আছেন কর্তব্য পরায়ণ ডাক্তার সুবিমল মৈত্র। ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অফিসার হলেন 'রূপকথার মত' গল্পের মণিকান্ত চৌধুরী, ইনি নিকুঞ্জ ডাক্তারের মেয়ে অরুণ কে বিবাহ করেন নানা মিষ্টি মধুর ঘটনার মধ্য দিয়ে। বিভ্রম গল্পে আছেন এক জমিদার, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা ও পুরুষ চরিত্র গুলিও বিচিত্র (দেবারীগণ, সপ্তস্বরা পিনাকিনী---ওস্তাদ, মিস গোমা কাপুর), উচ্চবর্ণের ভণ্ডামো, মঠ-মন্দিরের পাণ্ডার দৌরাত্ম্য (হিংলাজের পরে), ডালাধরা(কলিতীর্থ কালীঘাট), ভিখারী (কাকবন্ধ্যা,কলিতীর্থ কালীঘাট), নাবিক (হিংলাজের পরে), ক্যাপটেন (হিংলাজের পরে), ক্ষুধা-তৃষ্ণাজয়ী সন্ন্যাসী (নীলকণ্ঠ হিমালয়-খরসালির সাধু), সর্বংসহা বিপ্লবী নারী ও পুরুষ (সপ্তস্বরা পিনাকিনী:আলো বন্দ্যোপাধ্যায়, বিন্দুবাসিনী দেবী, 'কৌশিকী কানাড়া': গোপিকা রমণ দস্তিদার,কৃষ্ণা দস্তিদার,যশোদা দস্তিদার), বলবান ও দুঃসাহসী পুরুষ(মায়ামাধুরী-বভ্রুবাহন, হংসরাজ, পুরুষোত্তম, পথে যেতে যেতে নৃসিংহপ্রসাদ) অপরাজেয়া নারী (টপ্পাঠুংরি : দ্বিতীয় কাহিনির নায়িকা---সানুদি থেকে শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্ট, সপ্তস্বরা পিনাকিনী), বিদুষী নারী (টপ্পাঠুংরি, পথে যেতে যেতে), লেখক(দেবারীগণ শান্তনু রুদ্র, 'বিশ্বাসের বিষ'---কালী) ব্যক্তিত্বমী নারী ('ভোরের গোধূলি' দেবযানী সোম, সপ্তস্বরা পিনাকিনী-বিন্দুবাসিনী দেবী), অপরূপ সুন্দরী নারীর অসহায়তা (ক্রীম,স্বাতী সোম), অবাঙালী চরিত্র (সপ্তস্বরা পিনাকিনী :

বাচ্চা সিং, কুলদীপ সিং,) এয়ার হোস্টেসের জীবন(ক্রীম---নন্দা), উকিল, ব্যারিস্টার, পণ্ডিত (চতুর্ভুজ ত্রিবেদী, দাবানল)---কতনা বিচিত্র পেশার মানুষ তাঁর রচনায় সামিল হয়েছে!

দুই. উপন্যাস প্রসঙ্গ

আমরা এখন আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসব চরিত্রকে সংশ্লিষ্ট উপন্যাস ও গল্পের পটভূমিতে বুঝে নেবো। তারজন্য কথাসাহিত্যে উপন্যাস কী তা বুঝে নেওয়া যাক। আধুনিক যুগে বাংলা গদ্যসাহিত্যে উপন্যাস জনপ্রিয়তম শাখা। জীবনের বহুমুখী সমস্যা এই মাধ্যমকে আশ্রয় করে শিল্পরূপ পাচ্ছে বলেই মানুষ উপন্যাসের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। সেদিক থেকে উপন্যাস সত্যিই 'হোল্ড-অল' (hold all) এই সামগ্রিক আধার হয়ে ওঠার কারণ উপন্যাসে স্থান পায় অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন অর্থাৎ অর্ন্তজীবনের অনাবিষ্কৃত বহু তথ্য আজ উঠে আসছে উপন্যাসকে কেন্দ্র করে। অতৃপ্ত পিপাসার নিবৃত্তি-বাসনা মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহলকে বাড়িয়ে দেয়। স্বভাবতই উপন্যাস পাঠকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়বে-এবং দিনে দিনে তা সত্য প্রমাণিত হয়ে চলেছে।[১] আমরা অস্বীকার করতে পারিনা যে :

> "পৃথিবীর প্রগতিশীল সাহিত্যে জীবন ও জগতের বিচিত্র শৈল্পিক অভিব্যক্তিসহ উপন্যাস নিত্য নতুন আঙ্গিকবৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।"[২]

তাই উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। অগত্যা প্রায় সমধর্মী আরেক সাহিত্য-শাখা নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের তুলনায় আকার ও প্রকরণগত পার্থক্যের ভিত্তিতে উপন্যাস সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'দুলাল মুখোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক সত্তার অনুসন্ধান' প্রসঙ্গে উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে নেব।

তুলনামূলক আলোচনা : নাটক ও উপন্যাস

জীবনের বহুধা বিস্তার শিল্পিত মাধ্যমে ধরা পড়ে সাহিত্যের দুই প্রধান শাখা-নাটক ও উপন্যাসে। দুটি ক্ষেত্রেই জীবনানুসরণই লেখকের মূল প্রেরণা হয়ে থাকে। তবে নাটকের জন্ম উপন্যাসের আগে। অতএব সময়ের আধিক্যে নাটক অধিকতর আকর্ষণীয় হতে পারত পাঠকের কাছে। বাস্তবে বোধহয় তার ব্যতিক্রমই চোখে পড়ে। বয়সে নাটক প্রাচীন হলেও পাঠকের সংখ্যা উপন্যাসেরই বেশি। এর প্রধান কারণ বোধহয় প্রকরণগত। নাটকের দৃশ্যরূপ মঞ্চায়নের পূর্বে সফলভাবে নাট্যবক্তব্য দর্শকের কাছে উপলব্ধ হয় না। নাটকের সাহিত্যিক উপাদানের ষোলো-আনা সার্থকতার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগনৈপুণ্য ও অভিব্যক্তি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

নাটকের বিকল্প উপন্যাস

Marion Crawford কৌতুক করে উপন্যাসকে PocketTheatre -এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

তুলনার কারণ বলাবাহুল্য উপন্যাসে শুধু প্লট এবং চরিত্র মাত্র থাকে না। সাজসজ্জা, দৃশ্য এবং নাটকীয় অভিব্যক্তির অপরাপর উপাদান গুলিও উপন্যাসে থাকে। তবে নাটকের মত উপন্যাস-রস রঙ্গমঞ্চের উপর নির্ভরশীল নয়। তার গতি ও বিরতির স্বাধীনতা অনেকটা নমনীয়। নাটকে গতি তীব্র -বিরতি নেই বললেই হয়। অনস্বীকার্য যে উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্র দর্শনযোগ্য হলে যে বাস্তবোচিত রসের উপলব্ধি হত প্রকরণগত কারণে তা সম্ভব নয়। কিন্তু উপন্যাসে সে ক্ষতি অন্য নানা উপায়ে পুষিয়ে দেওয়ার সুযোগ আছে। নাটকের উপর উপন্যাসের প্রধান্য সূচিত হওয়ার এটা অন্যতম কারণ।

মানব-রহস্য প্রকাশের সহজ মাধ্যম

গতির যুগে আবেগের সমাধি ঘটেছে। মানুষ বড়ো একা! একাধিক মানুষ এক জায়গায় আসারই সময় পান না। পারিবারিক পুর্নমিলনও স্মৃতি মাত্র। নাটক মঞ্চস্থ করতে গেলে প্রথম দরকার কুশী-লবদের একত্র সহাবস্থান---সময় দেওয়া। কলা-কুশলী নাট্য পরিচালক,কারীগরি সহায়ক---আরো কত কি! এ যুগে তাই বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে উপন্যাস। উপন্যাসের গুরুত্ব বাড়ার বড়ো কারণ হলো মানবমনের নানা রহস্য প্রকাশের তাগিদ। উপন্যাসে আমাদের জীবন সম্পর্কে জাগা কৌতূহলের নিরসন হয়। তাই সাহিত্যের অন্যান্য শাখা ক্রমশ পিছু হটছে। তার অভাব পূরণ করছে উপন্যাস। আরো একটা কারণ উপন্যাসের জনপ্রিয়তার পেছনে কাজ করে বলে মনে হয়-তা হল উপন্যাসের বিন্যাস নাটকের তুলনায় অনেক শিথিল। ভালো নাটক লিখতে নাট্যাঙ্গিক সম্পর্কে দীর্ঘকালীন প্রস্তুতি প্রয়োজন। আরো দরকার রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে হাতে কালি-কলম-কাগজ আর ধৈর্য থাকলে জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই চলনসই উপন্যাস লেখা হতে পারে। তাই পরে শুরু হয়েও উপন্যাস নাটকের চাইতেও সংখ্যায় অধিক এবং জনপ্রিয়তায় ঈর্ষণীয়।

নাটক লেখবার সুনির্দিষ্ট নিয়ম না মানলে মঞ্চ সাফল্য আসা মুশকিল। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে রীতিগত বা উৎকর্ষ নিরূপক সর্বজন স্বীকৃত কোনো মানদণ্ড নেই। তাই বলে যেমন খুশি লেখার মধ্যে কোনো বাধা নেই এমন কথা বলা যাবে না। আবার উপন্যাসের প্রকরণ সুনির্দিষ্ট নিয়মে-নীতিতে শাসিত নয়-একথাও সত্য। সৃষ্টিশীল সাহিত্যবিভাগের অন্য কোথাও এত স্বাধীনতা শিল্পী ভোগ করেন না। এখন উপন্যাস সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

উপন্যাসের গঠন-প্রকরণ

নাটক-উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য মূলত এক---একথা মনে রেখেই আমরা উপন্যাসের গঠন-প্রকরণ আলোচনায় অগ্রসর হব। নিচের সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলি লক্ষ করলেই বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে :

প্রথমত, উপন্যাস গড়ে ওঠে এমন কতকগুলি ঘটনা এবং সংঘাতকে নিয়ে বা এমন কোনো

বিষয়কে অবলম্বন করে যা জীবনসম্ভূত।

দ্বিতীয়ত, জীবন-যন্ত্রণা নেই এমন জীবন অনাটকীয়; নাটক বা উপন্যাসে তাই পরিত্যজ্য। উদ্ভূত জীবন সমস্যাই উপন্যাসের অবলম্বন। নিজেকে বাদ দিলে কোনো লেখাই সম্পূর্ণতা পায় না। যেমন :

> "... নিজের কথাও এসে পড়ে। চোখ দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, তা হয়ত রঙ-তুলি দিয়ে হুবহু আঁকা যায়। কিন্তু চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না তা যে দেখতে হয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে। সে ছবি রঙ-তুলিতে ফোটানো যায় কিনা, জানি না। কিন্তু কালি-কলমের সাহায্যে সে ছবি আঁকতে গেলে ঘটনা-গুলোকে যে অবিকৃত অবস্থায় ছকে যেতে হয়---সে সময় আমি নামক হতভাগ্যটিকে বাদ দিই কেমন করে?"[৩]

তৃতীয়ত, নাটকের মত সংলাপ উপন্যাসেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ কেননা শেষপর্যন্ত ঘটনার জট খোলে অথবা চরমে পৌঁছায় সংলাপকে আশ্রয় করেই। চতুর্থত, একরঙা জীবন চিত্রণ সার্থক উপন্যাসে হতে পারে না। সে জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ পাঠকের কিছু জানার থাকে না। তাই কোনো কৌতূহল নিবৃত্তির উপকরণ না হয়ে পরিতাপের কারণ হয়ে ওঠে। সার্থক উপন্যাসে বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে জীবন-সংঘাত দেখা দেবেই। পঞ্চমত, জীবন-দ্বন্দ্বকে উপন্যাসে রূপ দিতে হয় বিশেষ স্টাইলের আশ্রয়ে তা ঔপন্যাসিকের ব্যক্তি-অর্জন। ষষ্ঠত, জীবন সম্পর্কে লেখকের বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থাকে। কাহিনির অগ্রগমনে ও চরিত্রের পরিণামে পৌঁছানোর মাধ্যমে লেখকের জীবনদর্শন ফুটে ওঠে। যেমন 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' (১৯৫৬) উপন্যাসের সিঙ্গীমশায়ের পরিণতি-যদিও লেখকের সে জীবন ভাষ্য মোটা দাগে ধরা পড়াটা উপন্যাসের পক্ষে শৈল্পিক দৃষ্টিতে হানিকর।

মোটকথা উপন্যাসে আখ্যানভাগ, চরিত্র, সংলাপ, দ্বন্দ্ব, কাল, এবং লেখকের জীবন-দৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর সকল বিভাগের মত ঔপন্যাসিকের সার্থকতা অবশ্যই তার নিজস্ব স্টাইলের উপর নির্ভরশীল।

উপন্যাসের প্লট বা আখ্যানভাগ

উপন্যাসের আখ্যানভাগ এর মূল উপাদান বলে আজও স্বীকৃত। জীবন-আশ্রয়ী ঘটনা যে আখ্যান হবে এ বিষয়েও মোটামুটি সকলে একমত অর্থাৎ কাল্পনিক বিয়য় অবলম্বনে উপন্যাস রচিত হবে না। অবধূতের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি ব্যক্তিগত রাহী জীবনের অভিজ্ঞতাকেই উপন্যাসে জোর দিয়েছেন। হিংলাজ থেকে ফিরে তাঁর ভৈরবীসহ রুদ্রচণ্ডীর মঠে ঘরে বসে যাওয়ার জন্য জীবনের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে দুঃখও করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'টপ্পাঠুংরি' (১৯৬৯) বা 'পথে যেতে যেতে' (১৯৭৬) উপন্যাসের কথা মনে পড়ে।

উপন্যাসের 'raw material' বা কাঁচা মাল বলা হয় আখ্যানকে। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় আখ্যান মানবজীবনের অভিজ্ঞতায় নিগূঢ় ও ইঙ্গিতপূর্ণ না হলে তা উপন্যাসের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে

না। যে আখ্যান বা প্লট জীবনের উপরিতলে বিরাজ করে, তা খুঁটিনাটি বিষয় দেখালেও প্রকৃত মূল্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। যে অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তির বেগ, স্বার্থের নানামাত্রিক জটিল সমীকরণ জীবনের নানা বৈচিত্র্য থেকে জীবনের পাত্রে এসে জমে তাকে বিভিন্ন ঔপন্যাসিক তাঁদের প্রকাশ ক্ষমতার মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন। এটাই প্রত্যাশিত।

উপন্যাসের আকার মূলত আখ্যান-নির্ভর। উপন্যাসের বিস্তার সম্পর্কে সর্বজনমান্য কোনো সিদ্ধান্ত স্বীকৃত নয়। তবে মহৎ উপন্যাসের অবলম্বিত প্রধান চরিত্র সংগ্রামমুখর, জীবন-গভীরতা সন্ধানী এবং নৈতিক মূল্যে মহার্ঘ। উপন্যাস বিশেষে বৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবেশে যেমন বড়ো চরিত্র গড়ে ওঠে তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেও বেরিয়ে আসতে পারে অসাধারণ চরিত্র মাহাত্ম্য। এর জন্যে ঐতিহাসিক কোনো বিরাট চরিত্রের দ্বারস্থ হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। ইতিহাসের প্রবল আলোড়ন কিম্বা শৌর্যময় অতীত যুগের (Heroic age) রোমাঞ্চকর পরিবেশ যেমন এক দ্বন্দ্ব সঙ্কুল রাষ্ট্রীয় জীবনকে বিরাট আকারে তুলে ধরে তেমনি অত্যন্ত সাধারণ যে জীবন সেখানেও থাকতে পারে অনাবিস্কৃত-পূর্ব অনেক বৈশিষ্ট্য যা পাঠককে গভীর জীববনবোধের তৃপ্তি দিতে পারে। তাছাড়া কেবল বাইরের অভিজ্ঞতা নয় জীবনের অন্ত্যহীন মনন-গভীরতার পরিচয় যা অর্ন্তজীবনে জন্ম নিয়েও অনেক সময় অপ্রকাশিত থেকে কায়িক মৃত্যুতে শেষ হয় এমন অনেক ঘটনাও উপন্যাসের আধারে রূপ পেতে পারে। এ ধরনের উপন্যাসকে বলা যায় চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস। বস্তুতপক্ষে উপন্যাসের উৎকৃষ্টতার মাপকাঠি তার নৈতিক মূল্যবোধে। তবে উপন্যাস অবশ্যই জীবনের কথা বলে তাকে মানুষের সকল শ্রেণির কথা তুলে ধরার দায়কে স্বীকার করতে হয়। মানুষ কেবল বাইরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ নয় বরং অর্ন্তজীবনেই আছে আসল পরিচয়, তাই ঔপন্যাসিককে সেই অপরিচিত গহনে ডুবে তুলে আনতে হয় মণি-মাণিক্য আবার সে গভীর অতলতায় অনেকসময় শ্বাসরোধী অমানবিক ইতিবৃত্তকে অপরিচিত এমনকি অনাকাঙ্ক্ষিত মানব রূপকে উপন্যাসে তুলে ধরতে হয়। অবধূতের উপন্যাসে পঞ্চাশোর্ধ্ব পুরুষের বিকার ধরা পড়েছে‘ টপ্পা-ঠুংরি’[৪] (১৯৬৯) উপন্যাসে। সেই শৈল্পিক নির্লিপ্ততা জীবনে এড়ানো না গেলেও সামাজিক জীবনে কখনই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। এসে যায় তখন সাহিত্যে নৈতিকতার প্রসঙ্গ। ‘উপন্যাসের আকাশ’ তো কেবল ভালোর উপর চন্দ্রাতপ বিছানো নয়, তাই কালে কালে পুরোনো পরিত্যক্ত বিষয় পুনরায় আলোচনার আলোয় উঠে আসে। অবধূতের উপন্যাস প্রসঙ্গে সে কথা সত্য। আদিম প্রবৃত্তি উপন্যাসে উপেক্ষণীয় নয়। সে জীবনেরই অঙ্গ।

উপন্যাসে আমরা লক্ষ করি নৈতিক-মূল্যবোধসম্পন্ন না হলে যে উপন্যাস হয় না এমনটি নয় উপন্যাস আরো অনেক দায়িত্বপালন করে থাকে। উপন্যাস পাঠে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত মানুষ আনন্দ-সম্ভোগের সুযোগ পায়। সে আনন্দ যদি বিশুদ্ধ ও প্রাণবন্ত হয় আপত্তি নেই কিন্তু তার ঔপন্যাসিক-সিদ্ধি থাকতেই হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিন্যাস-কৌশল, নাটকীয় অভিব্যক্তি, চরিত্র-চিত্রণের সজীবতা, হাস্যরসের সমাবেশ, সর্বোপরি শিল্প নির্মিতির উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের যোগে একটি জীবনধর্মী রচনা যদি উপন্যাস বলে প্রতিষ্ঠা না পেত তবে এর সর্বস্ত

রিক প্রকাশ মাধ্যম হয়ে ওঠা কোনোভাবে সম্ভব হত না। উপন্যাস সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ ধারণা পোষণ করার আর সুযোগই নেই কেননা প্রায় বিংশোত্তর শতবর্ষে সার্থক উপন্যাস আরো বেশি জীবন-প্রকাশক বলে নিজেকে প্রমাণ করেছে। যদি চণ্ডিকামঙ্গলের কথায় আসি তবে মুকুন্দ চক্রবর্তীর হাতেই যথার্থ উপন্যাসের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তাহলে আজকের দিন পর্যন্ত তার নির্মাণ আর বিনির্মাণে কেটে গেল তিন শতাধিক বৎসর। এপার বাংলা ওপার বাংলার ঔপন্যাসিকের অবলম্বিত বিষয়ের যা বৈচিত্র্য তার বিশ্লেষণে আমাদের মানতেই হয় উপন্যাস সত্যিই জীবনের 'হোল্ড অল'। 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা' -এমন একটি বার্তা দিতেই যেন উপন্যাস এ যুগে লেখনি তুলে দিয়েছে ঔপন্যাসিকের হাতে। যা দেখা যায় তার চেয়ে বড় সত্য আছে জীবনের গভীরে তাকে চেনাই উপন্যাসের কাজ।---তাই বলে এ জীবনকে কী কেউ 'অবাস্তব' বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন? নাকি সম্ভব? রুচির দোহাই দিয়ে জীবনকে আমরা অস্বীকার যেমন করতে পারি না তেমনি সত্যকার জীবন উপলব্ধি---সে জীবন যদি আমাদের অপরিচিতও হয়, অথচ সত্য বলে বোঝা যায় তাকে সাময়িকভাবে অস্বীকার করলেও যুগের প্রবাহে সে চিরকাল ব্রাত্য হয়ে থাকবে না। প্রসঙ্গত স্মরণীয় অবধূতের 'টপ্পা-ঠুংরি', 'বিশ্বাসের বিষ', 'সাচ্চা দরবার' উল্লেখযোগ্য।

দেশে দেশে কতনা মানুষ ! তার লোকাচারও ভিন্ন, সাহিত্যে সর্বকাল ও সর্বদেশের মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য রূপ পায়। সে-সব সার্থক চরিত্র দেশ ও কালের বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। তার অবলম্বন মানব ধর্ম দেশাচার অনেকসময় সেই মানবধর্ম লঙ্ঘন করে বলেই 'গেল গেল' রব ওঠে। সাহিত্যিকরা তখন সঙ্কুচিত হন, কেউ নেন আড়াল আবার কেউ স্পষ্টভাবে জীবনকে তুলে ধরতে গিয়ে অনুচিত আক্রমণের শিকার হন। এ প্রসঙ্গে অবধূতের 'বিশ্বাসের বিষ' (১৯৭৪) উপন্যাসের পতিতা জীবনের কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মত মানুষকেও কি এই সমাজের কথা কখনো কখনো ভাবতে হয়নি? 'চোখের বালি' (১৯০৩)-র পরিণতি কি উপন্যাসের পক্ষে স্বাভাবিক? বিনোদিনীর পরিণতি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর[৫] সাথে এযুগে অনেকেই একমত। আমরা বুঝে নিতে চাই জীবনকে। সে তার স্বরূপকে উপন্যাসের আধারে প্রকাশ করবেই হয়ত কিছু দায়বদ্ধতা লেখককে মেনে নিতে হয়---সামাজিক কিম্বা ব্যক্তিক ---এ দায় মৌলবাদী হিংসা বা মধ্যযুগীয় অচলায়তনিক সীমাবদ্ধতা। প্রসঙ্গত স্মরণীয় সেই সব চিঠি যেগুলি পাঠকেরা অবধূতকে লিখত। বেশিরভাগ চিঠিতেই থাকত লেখকের হিত কামনা। তাঁদের পরামর্শ ছিল অশ্লীল বীভৎস আর কুরুচিকর লেখা না লিখে যাতে ভাল লেখা লিখতে পারেন, সেজন্য বহু সদুপদেশ দান করেন অনেকে। তাঁরা চান লিখে তিনি দেশের ও জাতির কল্যাণ করুন, এবং সেই সঙ্গে নিজের নামটাকেও কলঙ্কমুক্ত করুন---এ জাতের অশ্রাব্য অপাঠ্য অবোধ্য অসামাজিক অসম্বন্ধ প্রলাপ না লিখে ভাল কথা লিখুন।

> "আপনার নজর শকুনের মত কেন ? দুনিয়ায় কি হাসি নেই, আনন্দ নেই, প্রেম নেই, গান নেই, বিরহব্যথা কি দুনিয়া ছাড়া হয়ে উঠে গেছে? ছি ছি ছি, বরং আপনি কলম ত্যাগ করুন। কলমের অমর্যাদা হচ্ছে আপনার হাতে। কলম

> ছেড়ে স্যানিটারি ইন্‌সপেকক্টারের চাকরি একটি জুটিয়ে নিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করুন। নিজের দেশ নিজের জাতি তথা ভবিষ্যৎ বংশধরদের মাথাগুলি আর চিবিয়ে খাবেন না।"[৬]

সাধারণভাবে মনে হয় আখ্যানবস্তু বা প্লটই উপন্যাস রচনার মূল উপকরণ। উপন্যাসে আগে ছিল গল্পের প্রাধান্য, সেসময় সমালোচকেরাও উপন্যাসে গল্পাংশই বিচার করতেন উপন্যাসের সার্থকতার মাপকাঠি হিসাবে। আধুনিক কালে মানুষের ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা গুরুত্ব পায় বলে ব্যক্তি বিশেষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ---আজকের উপন্যাসের ক্ষেত্রে। অতি আধুনিক একশ্রেণির ঔপন্যাসিকের মতে কাহিনি সৃষ্টি বা মতবাদ প্রচার উপন্যাসের লক্ষ্য নয়। বাইরের ঘটনা সংঘাতে সচেতন অবচেতন মনের জগতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তার শিল্পসম্মত অভিব্যক্তিই উপন্যাস। ভার্জিনিয়া উল্ফ,জেমস জয়েস এ পর্যায়ের উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা আখ্যানবস্তুকে গুরুত্ব দিতে চান কিম্বা যাঁরা চরিত্রকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন, তাঁরা উভয়েই আংশিক সত্য। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন সুডৌল কাহিনি সৃষ্টি উপন্যাসের প্রাণ। এ মতকে যেমন উপেক্ষা করা চলে না, তেমনি একালে অনেকে যখন বলেন গল্প কোনোার কাল শেষ, উপন্যাসে আমরা চরিত্রবিকাশের শিল্পিত পরিণতি দেখতে চাই তখন তাকেও আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না। আসলে আখ্যানভাগ আর চরিত্র-পরস্পরের পরিপূরক। চরিত্র রূপ পায় আখ্যানের বৃন্তে আর চরিত্রকে বিকশিত করা আখ্যানের প্রধান লক্ষ্য। একটি বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া আংশিক দৃষ্টির পরিচয় বহন করে।

বিষয় নির্বাচনের উপর সার্থক ঔপন্যাসিক হয়ত নজর দেবেন---এটাই স্বাভাবিক তবে আখ্যানবস্তুকে শিল্পরূপ দেওয়াই প্রধান কাজ। ঔপন্যাসিক যদি তাঁর বক্তব্যকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে না পারেন তবে সব আয়োজন ব্যর্থ। সপ্রাণ ও সার্থক সৃষ্টিতে তাই সবার আগে দরকার লেখকের সৃষ্টিশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্য। জীবন সম্পর্কে ব্যাপক গভীর অভিজ্ঞতা থাকলে শিল্পনৈপুণ্য অনেক স্বাভাবিক ভাবে আসে নইলে শিল্পনৈপুণ্য থাকা সত্ত্বেও স্রষ্টার মনে সৃষ্টির কোনো প্রেরণা তেমনভাবে আসে না।

শিল্পনৈপুণ্য বলতে আমরা বুঝবো শব্দচয়ন, অলঙ্করণ, চিত্রধর্মিতা, রসদৃষ্টি, সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধতা প্রভৃতি গুণ। বাস্তবের উপলব্ধি থেকে কোনো বিষয়ের প্রতি ঔৎসুক্য জন্মালে তাকে সাহিত্যে পুনর্নির্মাণ করার বাসনা না জন্মালে সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব। প্রাচীন আলঙ্কারিকের রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গত স্মরণীয়। যে বিষয় বা ব্যক্তি-প্রসঙ্গ স্রষ্টার মনে বিশেষভাবে দাগ কাটলো সেই অবলম্বিত বিষয়-ই আলম্বন বিভাব তারপর পর্যায়ক্রমে উদ্দীপণ বিভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। এখানে অভিজ্ঞতার গুরুত্ব কবিতার ক্ষেত্রে 'আলম্বন বিভাব'- এই শব্দ-যুগলের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা। নিজের কাছে সৎ থেকে নিজের অভিজ্ঞতার ওপর কথা বলা সব সাহিত্যকর্মেরই মর্মসত্য। অবধূত নিজেই বলেছেন তাঁর লেখক হ'য়ে ওঠার প্রসঙ্গ।

অবধূত সেসময়ের সমাজ-জীবনের কথা বলেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে প্রেমে পড়বার উপায় ছিল না বলেই লোকে খপ করে বিয়ে করে ফেলত। বিয়ে করেই নিজের সেই কচি বউয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ত। তার ফলে জন্মাত ছেলেপুলে। আর তখন লোকে চাকরির চেষ্টায় লেগে যেত।

তেত্রিশ টাকায় তখন বি. এন. আর. অফিসে লোক নেওয়া হত। পঁয়তাল্লিশ টাকায় নেওয়া হত পোর্ট-কমিশনার অফিসে।'গর্মেন্ট'-এর অফিসে ঢুকত 'গর্মেন্ট'-এর লোকের ছেলে-পুলেরা, পুলিশে ঢুকত পুলিশের শালা-ভগ্নীপতি। পশ্চিমের মানুষ কলকাতায় আসত পোষ্ট অফিসের পিয়ন আর রাস্তার জমাদার সাহেব হবার জন্যে। অন্য সব অফিসের সাহেবেরা বড়বাবুদের কথায় লোক নিতেন। বড়বাবুদের নজর ছিল খুব বড়, তাঁদের দিয়ে সাহেবকে কিছু কোনোাতে হলে বড় ব্যাপার করতে হত। ছোট কিছু তাঁদের নজরে ধরত না।

> 'কোনোও দিকে কোনো কিছুর সুরাহা করতে পারত না যারা, তারা বার্ড কোম্পানীর অফিসে নাম লেখাত। তারপর খিদিরপুরের দিকে গিয়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজত।'[৭]

উপন্যাস যেহেতু কল্পনার সৃষ্টি তাই বস্তুনিষ্ঠা অনেকের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। আসলে হুবহু তুলে ধরা নয়, অভিজ্ঞতা উপন্যাসে অবলম্বিত সমধর্মী ভাবনাকে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্রষ্টাকে সাহায্য করে। আমাদের সেই বিষয়ে সৃষ্টির ক্ষমতা নেই যার সদৃশ কোনো বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা পূর্বাহ্ণে অবগত নই। তাই বস্তুনিষ্ঠার অভাবে মহৎ উপন্যাস তো দূরের কথা, ভালো উপন্যাস রচনাও অসম্ভব। যে বিষয়েই হোক না কেন উপন্যাস লিখতে হলে সে বিষয়ে পুরোপুরি ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ না হলেও সমীপবর্তী অভিজ্ঞতার অবশ্যই প্রয়োজন। বিষয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলেই কেবল প্লট রচনার ক্ষেত্রে সাফল্য আসতে পারে নইলে নয়। কোনো বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতি ঘনিষ্ঠ না হলে, তা এড়িয়ে যাওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। অজ্ঞাত রাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা ঔপন্যাসিকের পক্ষে বিপজ্জনক। অবধূত 'দুর্গমপন্থা' (১৯৬০) উপন্যাসে যে জগতের কথা বলেছেন সে তাঁর সাধনার জগৎ বলে স্বচ্ছন্দ অন্য কারো উপন্যাসে এ বিষয় এমন সার্থক হতে পারত কিনা সন্দেহ। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' (১৯৫৬) উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী (খন্তা, আগমবাগীশ, পঙ্কা, নিতাই, আমঅতন প্রমুখ) ও পরিবেশ (শ্মশান, ভৈরবের পোড়া মাংস খাওয়া) অবধূতের মানসভূমিতে সৃষ্ট নয় তিনি নিজে সে জীবনের শরিক বলেই এর মূল্য অসীম।

দ্বিতীয় শ্রেণির ঔপন্যাসিকেরা মোহান্ধ হয়ে অন্যের কাছে ভালো প্লটের সংগ্রহে নেমে কাঁচা উপন্যাস লিখে ফেলেন। অবধূত 'নেহাত নাচার' (১৯৬৪) গল্পে তার সরস ব্যাখ্যা করেছেন। এসব ক্ষেত্রে কাহিনি নিরুদ্দেশের দিকে ভেসে যায় স্রষ্টার হাতে নিয়ন্ত্রণের রাশ থাকে না। তাই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সার্থক উপন্যাস রচনা সম্ভব তবু অন্যের অভিজ্ঞতাকে নিজের বলে চালিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা না করাই ভালো; করলে মহৎ উপন্যাস রচনার প্রলোভনে পা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতে সফল সাহিত্য রচনা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া সাহিত্যিককে

নৈতিকতার দোহাই মেনেও চলতে হয়। পাঠক সে বিষয়ে সদুপদেশ দিতেও ছাড়ে না।

অবধূত ও উপন্যাসে বাস্তবতা

জীবনবাস্তবতা মানে জীবনধারণ সূত্রে পাওয়া অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতাই জ্ঞান। জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ধরনের জ্ঞান অর্জন সম্ভব। পরোক্ষ জ্ঞান আসে বই পড়ে বা অভিজ্ঞ লোকের সাথে কথা ব'লে। অভিজ্ঞ বলতে আমরা বুঝবো যাদের অভিজ্ঞতার জগৎ তুলনায় বেশি প্রসারিত। বিংশ শতাব্দীর এই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র লেখকের কাছ থেকে সাম্প্রতিক প্রয়োজন মেটানোর কোনো উপাদান মেলে কিনা, আর মিললে সেটি কী ধরনের তা এই আলোচনার মধ্যে আসতে পারে। অবধূতকে নিয়ে ভাবতে বসে প্রথমেই মনে রাখা দরকার কোনো সাহিত্যের শূচিবায়ুতার মত বিশেষ প্রচলিত মূল্যায়নের জগতে যেন আমরা আটকে না পড়ি। বস্তুত সেরকম জগৎকে ভাঙার জন্যই বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবধূত কলম ধরেছেন বলে মনে হয়। জীবন যেমন অবধূত সাহিত্যে তাকে রূপ দিয়েছেন জীবন যেমন হওয়া উচিত তার কল্পনা করতে বসেননি।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা যাঁদের আছে তাঁরা গৌণভাবে পাওয়া অভিজ্ঞতাকে সার্থক সৃষ্টির কাজে সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে কোনো বাস্তবধর্মী কল্পনা নয় সৃষ্টিমূলক প্রতিভা-ই কাজ করে থাকে---সে ক্ষেত্রে সেই প্রতিভাই প্রশংসার্হ।'রবিনসন ক্রুশো' (১৭১৯, Robinson Crusoe by Daniel Defoe-1st edition 25. 04. 1719)-র লেখক ডিফো (১৩. ০৯. ১৬৬০-২৪. ০৪. ১৭৩১)কখনো পরিত্যক্ত দ্বীপে বাস করেন নি এমন কি নিজের চোখে সমুদ্রও দেখেন নি। অথচ কল্পনার সৃষ্টিশীলতা এমন যে তাঁর রচনা পাঠ করলে এই সত্যটি বিশ্বাস করা অসম্ভব মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'-এর অমল কোনো দিন দইওয়ালাদের গ্রামে না গিয়েও যে কল্পনার কথা বলেছে তা শুনে দইওয়ালার মনে হয়েছে অমল নিশ্চয়ই গিয়েছিল কোনোদিন তাদের গাঁয়ে।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো সম্পর্কই কোনোদিন ছিল না তবু 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)-এর মত উপন্যাস তাঁর কলমে লেখা। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত যে 'চার অধ্যায়'(১৯৩৪)-এর মধ্যে কিছু কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়লেও রবিনসন ক্রুশোর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখককে বাধ্য হয়েই বর্ণনীয় বিষয়ের জন্য গৌণ তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। অতীত বর্ণনায় ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক যে-উপায় অবলম্বন করেন, প্রয়োজন হলে সমকালীন জীবন বর্ণনায়ও তেমনি নিজস্ব অভিজ্ঞতার বাইরের জগতকে লেখক সমান বিশ্বস্ততার সঙ্গে অঙ্কিত করতে পারেন। এই বিশ্বস্ততারও একটা নিয়ম আছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বহুমুখী ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকলে যে-কোনো উৎস থেকে প্রেরণামূলক উপাদান সংগ্রহ করে বাস্তব জীবনের মতই সজীব মানবিক গুণসম্পন্ন করে তুলতে সক্ষম হন। ঘটনার অংশ হয়েও সাধারণ মানুষ যা সামগ্রিকভাবে দেখতে অক্ষম সৃষ্টিশীল কল্পনার লেখক তাই স্বচ্ছভাবে দেখতে ও দেখাতে পারেন। অর্থাৎ বাস্তবনিষ্ঠ রূপায়ণ

উপন্যাসের সফলতার মূলে, আর তা ব্যক্তির সৃষ্টিক্ষম প্রজ্ঞার দ্বারাই সম্ভব।

প্লট বা আখ্যানভাগের কাহিনি

উপন্যাস কাহিনি ছাড়া অকল্পনীয়। কাহিনির সার্থকতা নির্ভর করে তা কতখানি সজীব, কৌতূহলপূর্ণ এবং বলার ভঙ্গিটি কতখানি উপযুক্ত তার উপর। এই কাহিনি শিল্পসম্মতরূপে বর্ণিত হয়েছে কি-না তার উপর উপন্যাসটির সার্থকতা নির্ভরশীল। সুবলয়িত কাহিনি ভারসাম্য ও পরিমিতির জনক, নইলে অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য থাকবেই। উৎস থেকে পরিণতি পর্যন্ত কাহিনির ঘটনাস্রোত যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয়, প্রয়োজনে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলেও শেষপর্যন্ত যেন এক স্রোতে মিলিত হয়। লেখকের প্রধান দায়িত্ব পাঠককে এমন বোধে উত্তীর্ণ করা যাতে মনে হয় কাহিনির পরিণতি পূর্ববর্তী ঘটনা সমূহের যুক্তিপূর্ণ এবং স্বাভাবিক পরিণাম। অবধূত তাঁর উপন্যাসে দক্ষতার সে পরিচয় রেখেছেন।

গুছিয়ে কাহিনি বলা ঔপন্যাসিকের কম ক্ষমতার পরিচয় নয়। মননযোগ্যতা আর কাহিনি বয়ন এক জিনিস নয়। মনন-দুর্বল এমন অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা চিরন্তন আবেদনসমৃদ্ধ শিল্প সৃষ্টি হয়ত করেন নি কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবলীলায় কাহিনির প্রতিটি স্তরে কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন বলে পাঠক সমাজে বন্দিত হয়েছেন। উল্টোটাও দেখা গেছে। বক্তব্যের চাপে অনেকের কাহিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। রলাঁ বার্ত-এর প্রথম বই-এর প্রথম অধ্যায় ছিল 'কে'স ক্য লেক্রিত্যুর'? অর্থাৎ লিখন কী? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নভাবে সারা জীবন ধরেই তিনি দিয়ে চলেছেন। কখনো লিখনের সূত্র ধরে আবার কখনো যা লেখেন সেই বিষয়কে কেন্দ্রে রেখে। তবে এই প্রশ্নের সঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন বার্তকে তাড়িয়ে বেড়ায় 'কলেজ দ্য ফ্রান্স'-এর সংকেততত্ত্বের অধ্যাপকের বিশিষ্ট সম্মান গ্রহণ করার সময় তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতা মালায় তিনি ভাষাকে 'ফ্যাসিস্ট' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই 'ফ্যাসিজম' হলো তাই---যা কথা বলতে বাধা দেয় না, বাধ্য করে কথা বলতে। বিশেষ রীতিতে ব্যক্ত হয়ে ভাষা বিশেষ অর্থ আরোপ করার দিকে নিয়ে যায় অথবা অন্য অর্থ আরোপ করতে দেয় না---অর্থাৎ সরাসরি নয় ব্যঞ্জনার আশ্রয় নেয়।

> 'বার্ত-এর মতে ভাষা এই জন্য 'ফ্যাসিস্ট' যে অন্য ভাষাকে অধিগ্রহণ করেই একটি ভাষার বয়ানের উপস্থিতি। ভাষা ব্যবহারের সূত্রে আমরা পৃথিবীকে খণ্ডিত করি, একটি ভাষাকে পেরিয়ে অপর ভাষায় পৌঁছাতে পারি না। ভাষা ব্যবহারের মধ্যে থাকে ক্ষমতার ব্যবহার। বার্তের বরাবরই যে প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে আসে তা হল এই যে ভাষার মধ্যে দিয়ে কি ভাষাকে অতিক্রম করা সম্ভব?'[৯]

বিশ্ব-সাহিত্যে ফরাসি ঔপন্যাসিক ডুমার (Alexandre Dumas : ২৪. ০৭. ১৮০২-০৫. ১২. ১৮৭০) উপন্যাসের সঙ্গে জর্জ এলিয়টের (English Novelist George Eliot was penname of Marry Ann Evans : 22. 11. 1819-22. 12. 1880), ব্যালজাক (Honore de Balzac:20.

05. 1799-18. 08. 1850) বা টলস্টয়ের (Leo Tolstoy : 09. 09. 1828-20. 11. 1910, Russia) উপন্যাসের তুলনা করা যেতে পারে। ডুমার (Alexandre Dumas) কাহিনির স্পষ্টতায় ও সাবলীলতায় পাঠক মুগ্ধ হয়ে যায় - পারম্পর্য অনুসরণে পাঠকের কোনো আয়াস স্বীকার করতে হয় না। অন্যদিকে জর্জ এলিয়ট, ব্যালজাক এবং টলস্টয়ের কাহিনি অনুসরণে আমাদের কিছুটা শ্রম স্বীকার করতে হয়। টলস্টয়ের দীর্ঘ উপন্যাসগুলি `War and Peace', Anna Karenina, Prisoner of the Mountains সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য হলেও ক্ষুদ্রাবয়ব কাহিনিগুলি সম্পর্কে একথা অবশ্য সত্য নয়। সত্য নয়, কারণ সেখানে কাহিনি স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও স্পষ্ট। আমাদের আলোচ্য অবধূতের উপন্যাস-প্রসঙ্গে বিষয়টি যথাস্থানে আলোচিত হবে।

কাহিনির সিচ্যুয়েশন (পরিস্থিতি) এবং পরিণাম সৃষ্টিতে কাহিনিকারের কি শক্তিমত্তার পরিচয় মেলে তার উপর ঔপন্যাসিকের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। যোগ্যতার অভাবে অনেকসময় উপযুক্ত নাটকীয় পরিস্থিতি ব'য়ে যায় উপস্থাপনার গুণে যেখানে নাটকীয়তা আসতে পারত সেখানে পাঠক বঞ্চিত হয়ে যান। শক্তির অভাব সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে। ছোট ছোট এমন অনেক মুহূর্ত আবার যোগ্য স্রষ্টার হাতে পড়লে প্রত্যেকটি সিচ্যুয়েশন রসপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং উপন্যাসের গুণগতমান বেড়ে যায়। যে কোনো সার্থক কাহিনিকার এমন শিল্পচেতনার স্বাক্ষর রেখে যান তাঁর সৃষ্টির বহুস্থানে। সুতরাং কাহিনির আকর্ষণীয় পরিণাম সৃষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন স্তরে সিচ্যুয়েশন সৃষ্টির সাহায্যে যাতে কাহিনি রসপরিণতি লাভ করে সেদিকে ঔপন্যাসিককে গভীরভাবে মনোযোগী হতে হবে। আমরা অবধূত-প্রসঙ্গে এবিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে বুঝে নেব।

প্লট বা আখ্যানভাগের প্রকারভেদ

কাহিনি উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন কিন্তু সব কাহিনি আবার একরকম নয়-শিথিলগ্রথিত এবং দৃঢ়বদ্ধ-এই দুইভাগে কাহিনিকে দেখা যায়।

১. **শিথিল প্লট** : অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা যখন একটি কাহিনিতে স্থান পায় তখন শিথিলগ্রন্থনা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। আখ্যানভাগে ঘটনার ঐক্য তখন প্রধান নয়। নায়ক বা নায়িকার সূত্রে বিভিন্ন ঘটনা গেঁথে তোলাই সেক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য। সাধারণত ঘটে যাওয়ার পরে স্মৃতি থেকে বিষয়গুলি উঠে আসে ব'লে পরপর সাজিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়না। আখ্যানের ধাঁচাতেই সেসব কাহিনি অনায়াসে যেকোন জায়গায় স্থান পেয়ে যায়। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক স্কট (Walter Scott :১৫. ০৪. ১৭৭১-২১. ০৭. ১৪৪২) - ড্যানিয়েল ডিফো-র 'রবিনসন ক্রুশো' (১৭১৯), উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে [William Makepeace Thakeray(1814-1832)]-র লেখা নায়কহীন উপন্যাস 'ভ্যানিটি ফেয়ার'(১৮৪৭-১৮৪৮), পিকউইক পেপার্স(১৯৫২, ডিকেন্স-এর প্রথম উপন্যাস), নিকোলাস নিকলবি (Nicholas Nickleby : 1838-39 by Charles Dickens Total page 952, 1st edition) প্রভৃতিকে এ শ্রেণির শিথিল এবং শৃঙ্খলাহীন উপন্যাসের উদাহরণ (loose and incoherent) হিসেবে দেখেছেন। বাংলায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫. ০৯. ১৮৭৬-১৬. ০১. ১৯৩৮)-র 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব-১৯১৭, দ্বিতীয় পর্ব-

১৯১৮, তৃতীয় পর্ব-১৯২৭, চতুর্থ পর্ব-১৯৩০)-এর সার্থক দৃষ্টান্ত। অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' (১৯৫৪), আমার চোখে দেখা' (জুন, ১৯৭৫), 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'(১৯৫৬), 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' (শতবার্ষিকী সংকলন)-ইত্যাদি এজাতীয়। এধরনের উপন্যাসে ঘটনা ও কাহিনি একই সাথে এগিয়ে যায় না যেন মনে হয় ঘটনাকে কাহিনি নিজের গুণে মানিয়ে নিল। এমন না হয়ে অন্যরকম হলেও বাধা ছিল না। কাহিনির নিজস্ব দৃঢ়বদ্ধতা থাকলে কোনো আপাত অস্বাভাবিক বিষয় আসতে পারে না।

২. **দৃঢ়বদ্ধ প্লট** : এজাতীয় গ্রন্থনায় লেখক কাহিনি শুরু করার আগে থেকেই ঘটনার গতি ও পরিণতি কী হবে তা স্থির করে ফেলেন প্রত্যেকটি বিষয়ের খুঁটিনাটি তুলে ধরা এখানে রীতি। যদিও চরিত্র আর ঘটনার বিকাশের ক্ষেত্রে তাকে অবিচ্ছেদ্য হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে অকারণ প্রগল্‌ভতায় নিন্দনীয় হয়ে যেতে পারে। নিঃসন্দেহে তা উপন্যাসের ক্রটি। প্রতিটি মুহূর্তকে চরিত্র আর কাহিনির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গড়ে তুলে ঔপন্যাসিক সুসমঞ্জস পরিণতিতে কাহিনিকে পৌঁছে দিলে তবেই দৃঢ়বদ্ধ উপন্যাস হতে পারে সার্থক। নইলে কাহিনিকার ব্যর্থ হতে বাধ্য। দৃঢ়বদ্ধ ও শিথিলবিন্যস্ত প্লট সম্পর্কে উক্ত মন্তব্যের ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, যে উপন্যাসে আখ্যান দৃঢ়সংবদ্ধ সেখানে কখনো কখনো এমন চরিত্র ও ঘটনা যুক্ত করা হয়েছে যার সঙ্গে মূল কাহিনি কোনোভাবে যুক্ত বলে মনে হয় না।

প্লটকে দৃঢ়সংবদ্ধ করতে গিয়ে অনেক সময় লেখক যান্ত্রিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেন। চাতুর্যময় আয়াসসাধ্য কৌহশল-তৎপরতা চোখে পড়ে যায় আর মহৎ সৃষ্টির মূল কথা যে স্বাভাবিকতা তা বিঘ্নিত হয়। কোনো সৃষ্টি তখন আর স্বতস্ফূর্ত থাকে না সাহিত্যের ধর্ম 'পরস্য ন পরস্যেতি, মমেতি ন মমেতি চ'-এই চিরন্তন স্বীকৃতি হারায়। সাহিত্য কষ্টকল্পিত নয় সে লেখকের পরিপূর্ণ উপলব্ধির সীমাতিক্রমী প্রকাশ। হৃদয়পাত্র ছাপিয়ে যা অন্যের হৃদয়কে ছোঁয়ার জন্য স্বতোৎসারিত সেই প্রাণবান উপলব্ধিটাই নষ্ট হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার কাহিনি এত সরলভাবে পরিবেশিত যে নাটকীয়তা আনার চেষ্টাও সেখানে দেখা যায় না। তা বলে তার মূল্য ক্ষুণ্ন হয়েছে এমনটি বলা যায় না। অতএব সবসময় একথা বলাও যাবে না যে দৃঢ়বদ্ধতাই শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হয়ে ওঠার শর্ত। অনেক উপন্যাস সার্থক হয়েছে যেখানে শিথিল বিন্যাস পদ্ধতিই অনুসৃত। আসলে ঔপন্যাসিককে জানতে হবে কোথায় থামতে হবে, প্লট সুসংহত আর সুসমঞ্জস হলেই উপন্যাস পাঠে রসিকের মনে তৃপ্তি আসে। তাই বলে এমন যেন না হয় লেখক সব আগে থেকে যা ঠিক করে রেখেছিলেন তা পরপর ঘটে যাচ্ছে ব্যতিক্রমহীনভাবে-তাহলে যান্ত্রিকতা প্রশ্রয় পায় এবং চরিত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। পাঠকের পীড়ার কারণ সেখানে সচেতন পাঠকের ঔচিত্যবোধে আঘাত। আর এ প্রসঙ্গে হয়ত বাস্তব জীবনের কথা আসতে পারে যেখানে উপন্যাসের ঘটনার সাথে মিল ঘটে গেছে। এমন ঘটনা-সন্নিপাত (Coincidence) যদি হয়েও থাকে তবু মনে রাখতে হবে সাহিত্যের সত্য বাস্তবের মত এমন আশ্চর্যজনক ও মানবিক ব্যাখ্যার অগোচরহতে পারবে না। অতএব ভালো প্লটের লক্ষণ দুটি :

ক. কাহিনির অগ্রগমন হবে স্বাভাবিক আর আচার-ব্যবহার অবশ্যই চরিত্রের স্বভাব-সঙ্গত---সর্বপ্রকার যান্ত্রিকতা-মুক্ত।

খ. ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যেন পাঠকের মনে কোনো সন্দেহ না আসে। পরিস্থিতি ও চরিত্রের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকে যেন পরিণতি কাম্য ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের আখ্যানভাগ প্রকৃতি বিচারে সরল ও মিশ্র (Simple or Compound)-দুই রকমই হতে পারে। অর্থাৎ একটি কাহিনি বা একাধিক কাহিনি একই উপন্যাসে অনুসৃত হতে পারে। নদীর বিভিন্ন স্রোতের মত উপন্যাসে একাধিক ধারায় কাহিনি পরিণামে পৌঁছাতে পারে, তবে নদীর মতই একটি ধারা প্রধান রূপে বহমান থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)-'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫)-'রাজসিংহ' (১৮৮২)-এ নানা কাহিনি থাকলেও উপকাহিনি গুলি নিগূঢ় ঐক্যে মিশে গেছে উপন্যাসের শেষে। এসব ক্ষেত্রে উপন্যাসের মূল কাহিনি পার্শ্বকাহিনির মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে কিন্তু হারিয়ে যায় না। বলা ভালো ঔপন্যাসিক এরকমের কাহিনি রচনা করে মূল কাহিনি ও চরিত্রকে বিস্তৃত প্রেক্ষিতে আরো সুস্পষ্ট করে তোলেন। অনেকসময় সে কৌশলে মুক্তি না ঘটে বিপর্যয় নেমে আসে। আসল কথাটা হারিয়ে যায় অন্য বক্তব্যের জৌলুসের কাছে। সার্থকভাবে ব্যবহারের জন্য লিও টলস্টয়ের (09. 09. 1824-20. 11. 1910, Russia) 'অ্যানা কারেনিনা' (The Russian Messenger-এ প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে 1475-1477 এর মধ্যে, পরে গ্রন্থবদ্ধ হয় ১৮৭৮ সালে)-য়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (২৭. ০৬. ১৮৩৮-০৮. ০৪. ১৮৯৪) 'রাজসিংহ' (১৮৮২), আনন্দ মঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) বা সীতারাম (মার্চ, ১৮৮৭) নাটকীয়তা ও বৈচিত্র্যের সমাবেশে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অবধূতের 'দুরিবৌদি' (১৩৬৫, ১৯৫৮), 'বশীকরণ' (সাধক জীবন সংগ্রহ ১৪১৮, ২০১১)-এ জাতীয় বিচিত্র ঘটনার সমাবেশেও সার্থক। এ পর্যন্ত আলোচনায় সার্থক উপন্যাসের যে বৈশিষ্ট্য ও গুণগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত হলো তার ভিত্তিতে অবধূতের উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এখন 'যা নয় তাই' (অজ্ঞাত), 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' (১৯৫৬), 'বশীকরণ' (সাধক জীবন সংগ্রহ ১৪১৮, ২০১১), 'শুভায় ভবতু' (১৩৬৪), 'বিশ্বাসের বিষ' (১৯৭৪) উপন্যাসগুলির আলোচনায় স্রষ্টার ঔপন্যাসিক সত্তার অনুসন্ধান করা যেতে পারে। উপন্যাসগুলির আলোচনা-সূত্রে বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণ করে মানুষের সৃষ্টি বৈচিত্রের কতখানি তাঁর রূপনির্মাণে বাস্তব হয়ে উঠেছে তার পরিচয় নেব।

তিন. বাংলা উপন্যাস ও অবধূত

উনিশ শতকের কবিতা নাটক, প্রবন্ধ সমালোচনা সাহিত্য-সব কিছুতেই পাশ্চাত্য প্রভাব। হয়ত ব্যতিক্রম প্রসঙ্গে মনে আসে আখ্যান সাহিত্য, ইংরেজদের আসার আগেই যা সম্পূর্ণতা পেয়েছিল। অনুবাদকাব্য, মঙ্গলকাব্য বিশেষকরে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং অতি অবশ্যই বিদ্যাসুন্দরের মত সার্থক উদাহরণ তো মনে পড়বেই। কিন্তু উপন্যাসের জন্ম আরো পরে। গদ্যরীতি উন্মেষের

অব্যবহিত পরে। একশ' বছরের মধ্যে এর সংখ্যা এবং উৎকৃষ্ট পরিণতি বিস্ময়কর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৭. ০৬. ১৮৩৮-০৮. ০৪. ১৯৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (০৭. ০৫. ১৮৬১-০৭. ০৮. ১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫. ০৯. ১৮৭৬-১৬. ০১. ১৯৩৮) এবং কল্লোল[৭]-কালিকলম[৮] যুগের ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টি সম্ভারে উপন্যাসের বিবিধ বিবর্তন লক্ষ করার মতো। সৃষ্টির বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে যে কথাটি বলবার প্রয়োজন তা হলো মানসিকতা ও প্রতিভা সকলের সমান থাকে না কিন্তু বিবর্তনের ধারাটি অব্যাহত থাকে। আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে অবধূতের উপন্যাসের বিষয়গত পার্থক্য নির্দেশ করবো সেই সাথে ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি, মানসিকতা, উপন্যাসে ধৃত সমস্যাবলী এবং অবশ্যই উপন্যাসের আঙ্গিকের বিশ্লেষণও আমরা করতে চেষ্টা করবো। আঙ্গিক বিশ্লেষণ বলতে উপন্যাসের প্লট নির্মাণের বৈশিষ্ট্য,উপস্থাপনার QK ev Pattern-এর বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ধরনের ভাষা-ব্যবহারের উদ্দেশ্য---এক কথায় উপন্যাসের কায়াকৃতি সম্পর্কে আলোচনা।

ইংরাজীতে যাকে craft বলে অবধূতের উপন্যাসে তার সম্পর্কে প্রথানুগত্য ও ব্যতিক্রমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করাই আমাদের লক্ষ্য। তাঁর উপন্যাসে বৃত্ত নির্মাণ, ভাষা ব্যবহার, উপস্থাপন কৌশল, ইত্যাদি সুস্পষ্ট করে জেনে নেব। এটা যে এখনো হয়নি তার কারণ সামগ্রিক ভাবেই বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের আলোচনা খুব বেশি নেই। এমন কি উপন্যাস দেহ নিয়ে আলোচনা ইংরাজী সাহিত্যেও সুপ্রচুর নয়। পাশ্চাত্য সমালোচনা সাহিত্যে এই জাতীয় আলোচনার পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট আলোচনা যে খুব কম,সমালোচক তা জানিয়েছেন-

> 'Literary theory and criticism concerned with the novel are much inferior in both quantity and quality to theory and criticism of poetry.'[১০]

ইংরাজী উপন্যাস সম্বন্ধে পাঠকের একটি গোড়ার কথা জানতে আগ্রহ হতেই পারে উপন্যাসের কি সত্যই কোনো art form হয়? এক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হলো উপন্যাসের কোনো অব্যর্থ সংজ্ঞা এখনও গড়ে ওঠেনি। শুধু বাংলা কেন ইংরাজীতেও কোনো সংজ্ঞা চোখে পড়েনি।

> "আসলে, এই সব আলোচনা-গ্রন্থের যে পরিচিত উক্তিগুলি আমরা স্মরণ করে থাকি, সেগুলি উপন্যাসের কিছু বিশিষ্ট লক্ষণকেই উদ্ভাসিত করে মাত্র। সম্ভবত এই কারণেই বিশ্রুত ফরাসী কথা-সাহিত্যিক মঁপাসা[১১] একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে এমন কুড়িটি উপন্যাসের তালিকা নির্মাণ করেন যেগুলি প্রকৃতিতে একেবারেই স্বতন্ত্র-এদের যেকোনো একটিকে উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি জানালে অন্য গুলির ঔপন্যাসিক স্বীকৃতি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি নিজেই উপন্যাসের প্রকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কে বিহ্বলতা প্রকাশ করেছেন। উইলিয়ম সমরসেট মম।"[১২]
>
> 'দশটি উপন্যাস এবং তাদের রচয়িতা সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেখানে উপন্যাসগুলির অসমতা এত স্পষ্ট নয়, তবুও এগুলির সাহায্যে উপন্যাসের সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি।'[১৩]

সাম্প্রতিক কালের এক বিদগ্ধ সমালোচক ও উপন্যাসের সঠিক সংজ্ঞার অভাবে পীড়িত হয়ে বলেছেন, সাহিত্যের অন্যান্য শাখা সমালোচনার নির্দিষ্ট পথ আছে, কিন্তু সমালোচনায় সমালোচক অসহায়। তাঁকে নির্ভর করতে হয় পঠিত উপন্যাসের বিগলিত স্মৃতি-র ওপর, কারণ' cluster of impressions[14] ছাড়া আর কিছুই তখন তাঁর কাছে অবশিষ্ট নেই।

বাস্তববাদী আন্দোলনের সাথে অবধূতের সম্পর্ক

বাস্তববাদী আন্দোলনপুষ্ট সাহিত্য অন্তত পঞ্চাশ ষাট বছর পৃথিবীর কথাসাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তারপর কালের নিয়মেই এই সাহিত্যধারার প্রতিক্রিয়া ও বিরোধিতা স্পষ্টভাবেই হতে শুরু করে। এই বিরোধিতার মূল কথা ছিল এই যে বাস্তববাদী সাহিত্যিকরা 'dullest details' নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামান। অবধূত-এর কথাসাহিত্য এই অভিযোগ থেকে মুক্ত। যদিও তিনি চেতনাপ্রবাহরীতি নিয়ে মাথা ঘামাননি তবু অকারণ বাহুল্য তাঁর উপন্যাসে দেখা যায় না। তাঁর উপন্যাস যে ক্ষীণ কলেবর---এটা তার অন্যতম কারণ।

বাস্তবতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের ত্রুটি থেকে পথ সন্ধান করতে গিয়ে এ কালে ভাবা হোল ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে এনে অন্তরমুখী করতে হবে। নতুন শিল্পাদর্শ এবং জীবনবোধ নিয়ে উদ্ভূত এই আন্দোলনে যে রচনাশৈলী বা যে পদ্ধতির শিল্পরীতি গড়ে উঠেছে ইংরেজি সাহিত্যে সাধারণভাবে তা 'stream of consciousness' পদ্ধতি নামে পরিচিত। বাংলায় তা নাম পেয়েছে 'চেতনাপ্রবাহমূলক পদ্ধতি।' কথাটি প্রথম এসেছে দার্শনিক জগতে। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকান দার্শনিক William James (11. 01. 1842-26. 08. 1910) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থতে 'The principles of Psychology' (১৮৯০) কথাটি ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ইংরেজি উপন্যাসে এই আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান পুরুষ Henry James (15. 04. 1843-28. 02. 1916)। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে 'The Younger Generation' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে তৎকালীন বিখ্যাত বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক H. G. Wells (21. 09. 1866-13. 08. 1946) Novel : War of The Worlds, The Time Machine, First Men in The Moon, Things To Come), Bennett (Enlish Actor, Dramatist, Writer), ১৯৩২ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক গলসওয়ার্দি[১৫] প্রমুখকে তাঁদের আবর্জনাময় সাহিত্যের জন্য প্রবল সমালোচনা করেন, কারণ তাঁদের রচনায় আছে শুধু `mere notations or signs of life' প্রায় এই সময়েই এই জীবনদর্শন ও শিল্পাদর্শ সমর্থন করে যে তিনটি শক্তিশালী উপন্যাস রচিত হয় (Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf) তাতেই এই রীতির প্রতিষ্ঠা ঘটে বলা যায়। অবশ্য প্রথম সার্থক 'চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাস 'পিলগ্রিমেজ' (১৯১৫) রচয়িতা স্যামুয়েল রিচার্ডসন (Samuel Richardson : 19. 08. 1689-04. 07. 1761)। যে অভিযোগ পাশ্চাত্যের উপন্যাস সম্পর্কে উঠেছিল বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেকথা বলা যায় না। অভিযোগ ওঠার আগেই বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া থেকে যেখানে থেমে যাওয়া দরকার অবধূত তা জানতেন। তাঁর উপন্যাসে বাস্তব আছে 'dullest details' নেই। অভিজ্ঞতার বাইরে যাননি।

সত্যনিষ্ঠ পথে জীবনদর্শনের যথার্থ কাজটিই উপন্যাসে করেছেন। তাই চেতনাপ্রবাহরীতির দিকে না গেলেও এ জাতীয় আবর্জনার কথা তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে বলাই যায় না।

যাইহোক বাস্তবতাবাদী উপন্যাসের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় জন্ম হোল এই তিনটি উপন্যাসের। ফরাসী ঔপন্যাসিক Marcel Proust-এর দুই খণ্ড 'Du Cote de Chez Swann' (১৯১৩) দ্বিতীয় ইংরেজ ঔপন্যাসিক Dorothy Richardson -এর বৃহৎ উপন্যাস 'Pilgrimage' -এর প্রথম খণ্ড 'Pointed Roofs' (১৯১৫) এবং তৃতীয়টি ইংরেজ ঔপন্যাসিক James Joyce বিরচিত 'A Portrait of the Artist as a Young Man' (১৯১৬)। এর মধ্যে Pointed Roofs-এর সমালোচনা করবার সময় লেখিকা May Sinclair সম্ভবত সর্বপ্রথম গ্রন্থটির রচনাপদ্ধতিকে 'stream of consciousness' রীতি বলে অভিহিত করেন। এই বিশেষ সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের আলোচ্য নয় কিন্তু পরিবর্তনগুলি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে পূর্বের উপন্যাস রচনার তুলনায় সমকালের উপন্যাসে ভাষারীতির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা এটা দেখা জরুরী। এই প্রসঙ্গে বলতে পারি সমালোচকেরা এই শ্রেণির উপন্যাসের ভাষারীতিকে অন্য ধরনের উপন্যাস থেকে আলাদা করেছেন। তাঁরা লক্ষ করেছেন চেতনাপ্রবাহমূলক রচনার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. তির্যক বাক্‌বিন্যাস Oblique writing
২. অনুচ্চ বচঃপ্রবৃত্তি বা Mentalprattle
৩. স্বগতোক্তি বা Soliloquy, এবং
৪. অনুচ্চারিত আত্মকথন বা Internal monologue

এইধারার প্রথম সচেতন সাহিত্যিক বোধহয় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সাধারণভাবে বুদ্ধিবাদী হিসাবে কথিত এই ঔপন্যাসিক 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' এবং 'মোহানা'---এই অবিচ্ছিন্ন কাহিনিস্রোত ও পাত্রপাত্রীদের অবলম্বন করে যে ত্রয়ী উপন্যাস রচনা করেছেন তাতে নায়কের অর্ন্তমুখী চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এখানে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে চেতনার প্রবাহমানতা বেশ স্পষ্টভাবেই অনুভব করা যায়। অবধূতের উপন্যাস মূলত ঘটনা প্রধান।এখন আমরা অবধূতের বিভিন্ন উপন্যাস সম্পর্কে বুঝে নেব।

চার. যা নয় তাই[১৬]: পিতৃসত্তার হাহাকার

এই উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ধুর্জটিপ্রসাদ সিংহরায়। বাঙালী সমাজে ইনি ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম নানা আঙ্গিকে ধরা পড়ে। প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর কপাট---বিশাল বুক ও দৃঢ় শরীর। খুন-খারাপিতে হাত কাঁপে না যার সেই মানুষটি আমূল বদলে গেল বাৎসল্যের কাছে হার মেনে। হৃদপিণ্ড যদি হার্দ্য ধর্মের আদৌ আধার হয় তবে তা থাকে একান্ত প্রহরায় লোকলোচনের অন্তরালে। বুকের দু'ডজন শক্ত হাড়ের খাঁচায়, তার কর্মপদ্ধতি যেমন অনুভব করা যায়, কিন্তু দেখা যায় না---তেমনি এই মানুষটির আচরণে স্নেহের প্রকাশ নেই কিন্তু

সকল ক্ষেত্রে সেই অমোঘ বাৎসল্য তথা পিতৃপরিচয়---কাঙাল সত্তাটিকে অনুভব করা যায়।

ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যক্তি চাওয়া একটি সত্তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাঁর স্নেহ পাহাড়ের বুকে ঝর্ণার মতো। লোপামুদ্রার বয়স এখন ২৬-২৭ বছর। আশৈশব বাবার একমাত্র সাথী সে। বাবা তার অস্থির-মতি, কিন্তু মেয়ে ছাড়া আর কোনো জগৎ তার আছে বলে মনে হয় না। মেয়েকে নিয়ে তার বাবা কেবলই বাড়ি বদলান। মাঝে মাঝে বিরক্ত হয় লোপামুদ্রা---আর কতবার স্থান বদল করা যায়? যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তার বাবারএই বাসাবদল। নিজের বাড়ি বিক্রি করে পরিচিত আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে প্রথম কবে লোপামুদ্রাকে নিয়ে তার বাবা আদি বাস ছেড়েছেন---লোপামুদ্রার তা জানার কথা নয়---কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে বুঝেছে স্থায়িত্ব তার বাবার জীবনে অসহ্য। বাবাকে সে পরিত্যাগ করতে পারে না বলেই তারও কোনো পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে পারে না-কারুর সঙ্গেই নয়। নতুন কারো সাথে পরিচয় জমে ওঠার আগেই বাবা তার স্থান পরিবর্তন করবেন-এটাই দস্তুর। উপন্যাসটির প্রথম পঞ্চাশ পাতা পার হলেও আমরা কিন্তু জানতে পারি না কেন এই ঠিকানা বদল।-পালিয়ে চলার এই অভ্যাস কি কেবল নেশা নাকি প্রয়োজন লেখক ধূর্জটিপ্রসাদের বাৎসল্যকে লঘুভাবে বাইরে আনেন নি বলেই আমরা তাকে বিশেষ ভাবে চিনলাম। না বলাতেই বোঝানোর কাজটি বেশী করে সেরেছেন লেখক। এই সংযম বড় লেখকেরই থাকে।

মানুষটা কেমন? ধূর্জটিপ্রসাদ সম্পর্কে এই উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথম যে কথাটি মনে হয় তা হলো তিনি মূর্তিমান ব্যতিক্রম।এই ব্যতিক্রমী চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর চারিত্রিক ব্যতিক্রমের বিপ্রতীপতায়। ইনি ভয়ংকর নিষ্ঠুরতায় চাবুক মারতে পারেন। মানুষ খুন করতে তাঁর হাত কাঁপে না। শরীরে তাঁর অমিত শক্তি ও মনে অফুরন্ত উদ্যম। এই মানুষটি কেমন ভাবে এমন গভীর অপত্য স্নেহ তাঁর বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দেন? অপ্রকাশিত হয়েও কেমনভাবেই বা তা সঞ্জীবিত থাকে---এমন স্থিরতায়?

ধূর্জটিপ্রসাদের মনে একটা ভয় কাজ করে- লোপামুদ্রা যদি জেনে ফেলে তার আসল পরিচয়? কী হারাতে পারেন এই লৌহকপাট বুকের দীর্ঘ মানুষটি? আমাদের মনে হয় তিনি হারাতে পারেন গোটা বিশ্ব। এই পিতৃত্বটাই ধূর্জটির জীবনে একমাত্র সত্য। বহু কষ্ট স্বীকারের পর এই সম্মানিত পদটি তিনি পেয়েছেন। বিহারের ভূমিকম্পে তলিয়ে গেছে লোপামুদ্রার জন্মলব্ধ পরিচয় কিন্তু তার সত্যকার পরিচয় তো আর সকলের কাছে হারিয়ে যায়নি! লোপার বাবা-মা তো থাকতেই পারেন এবং হতেই পারে যে তাঁরা লোপাকে সত্য-পরিচয় জানাতে চান ! ধূর্জটি তাই লোপার ভক্তি ভালোবাসা আর নিজের আকাঙ্ক্ষিত পিতৃপদ হারানোর ভয়ে পাগল হয়ে ওঠেন।

ঔপন্যাসিক ধূর্জটির হৃদয়ের ঝড়কে অসাধারণ তাৎপর্যে তুলে ধরেছেন। জলতরঙ্গের ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক ধ্বনি বুঝিয়ে দিল কী ভীষণ ভাঙা-গড়া চলছে তাঁর মন জুড়ে।[১৭] লোপামুদ্রাও অস্থির আশঙ্কায় আর নতুন কিছু অথচ অসাধারণ কিছু জানার আগ্রহাতিশয্যে 'বাবা'কে এই প্রথম গোপন করলেন কণ্ঠহারের কথা। রত্নখচিত হারটি তিনি পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছেন বলেও

তা অত্যন্ত সাবধানে রেখেছেন নিজের পাট্সের অতি গোপন প্রকোষ্ঠে। নিয়তি? নাকি স্বভাব? নাকি দূরদর্শিতা? কিসের প্রভাবে, বলা শক্ত কিন্তু লোপামুদ্রা এই প্রথম অনুভব করল এখন থেকে সে সব কথা তার বাবাকে বলতে পারবে না।

উপন্যাসটির মধ্যে সমান্তরালভাবে একটা ধারা প্রবাহিত। সে ধারাটির অবলম্বন শঙ্খচূড় ও লোপামুদ্রার ভালোবাসা। সহজভাবে সে সম্পর্ক এগোয়নি। এখানে পাঠক বরাবর একটি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে। বাবার ফোন পেয়ে লোপামুদ্রা ফিরছে ট্রেনে---শঙ্খচূড়কে লোপা সে কথা বলেছে। আবার দুজনকেই বিস্মিত করে একটি বিকলাঙ্গ লোক চিরকূট ধরিয়ে দিল যাতে লেখা আছে- লোপামুদ্রা যেন বাড়িতে না যান, কেননা বিপদ ঘরেই অপেক্ষা করে আছে। একটা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে এই পর্যায়ে। লোপামুদ্রা ভাবতে চেষ্টা করছে কী এর রহস্য কেনই বা এমন একটি চিঠি কেউ তাকে দিল কী এর মর্মার্থ? মহিলারা সাধারণত বাড়িটা জতুগৃহ জানলেও নিজের অভ্যস্ত ঘরে ফিরে যান। এই অবস্থায় লোপামুদ্রাও তাই স্থির করেছেন। এমন সময়ে যেটি বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ালো তা হলো লোপামুদ্রা এবং শঙ্খচূড় কাহিনি সংস্থাপনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল কি-না বা থাকলেও---কতটা?

বিপদে পড়লে বন্ধু চেনা যায়। অপরিচিত নরনারীর বন্ধুত্ব ক্রমশ বিশ্বস্ততার পথ পেরিয়ে ভালোবাসা খুঁজে পায়। এই সূত্র ধরেই অবধূত উভয়ের মিলিত পথচলার কাহিনি নির্মাণ করেছেন। এই অবসরে লোপামুদ্রাকে শঙ্খচূড়ের পারিবারিক পরিকাঠামোর মধ্যে এনে তার স্বাভাবিক নারীত্বের মিষ্টতা ও নির্মল হৃদয়বত্তার পরিচয় উদ্ঘাটিত করলেন তাছাড়া একটি আশ্রয় হারানোর আকস্মিকতা কাটানোর জন্যে এমন একটি পারিবারিক পটভূমি প্রয়োজন ছিল। বাবার সঙ্গে লোপার এই সন্দেহ-সম্পর্ক-সূত্রেই অসহায় হয়েই কেবল এমন অল্প পরিচয়ে ভদ্র-বাড়ির কোনো মেয়ের পক্ষে কোনো বয়স্থ বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় রাজসিংহ (১৮৮২) উপন্যাসে মানিকলাল-নির্মলকুমারীর কোর্টশিপ প্রসঙ্গ। কাহিনির অস্বাভাবিকতার কারণেই দেখানো সম্ভব হলো যে লোপামুদ্রা একদিনের পরিচয়েই শঙ্খচূড়কে কেন বিশ্বাস করে নিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজসিংহ (১৮৮২) উপন্যাসে মানিকলালের সঙ্গে নির্মল কুমারীর প্রণয় দেখাতে পেরেছিলেন এমনই এক জটিল পরিস্থিতিতে। প্রাণের দায় সামাজিক অভ্যস্থতাকে মুছে দেয়। সাধারণভাবে আমরা জানি উপন্যাসে বাস্তব জীবনের অনুসরণ থাকে, তবে বাস্ত ব জীবনে আকস্মিকতা থাকলেও অনুসৃত উপন্যাসে তারও একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। এখানে ঔপন্যাসিক সে ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

প্রথমত, মূল্যবান যে ব্যাগটি সাহেব শঙ্খচূড়কে দিয়েছেন সেটি নিরাপদ স্থানে রেখে আসতে গেলে বাড়িতেই যেতে হবে। কী পরিচয় দেবে লোপামুদ্রার এই বিষয়কে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের মানসিকতাকে তুলে ধরার অবকাশ পেয়েছেন লেখক আর সেটি কাজে লাগিয়েছেন সার্থকতার সঙ্গে। বাড়ির পরিবেশে ফেলার পর ফুটে উঠল লোপামুদ্রার আরেক মূর্তি। সে কতখানি স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল সে পরিবেশে! চরিত্র নির্মাণে অবধূত কতখানি দক্ষ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। শঙ্খচূড় লোপামুদ্রার কাছে হেরে গিয়ে সুখ অনুভব করছে আর

পাঠক তাদের মন দেওয়া-নেওয়াকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় মধুর পরাজয়ে ভরে উঠলো শঙ্খচূড়ের মন :

'এ মেয়ে তাকে কিনে বেচতে পারে যখন তখন।' এমন আনন্দজনক উপলব্ধি মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ শঙ্খচূড়ের মধ্যে যখন এলো তার চারপাশে ততক্ষণে তৈরী হয়ে গেছে পারিবারিক আবেষ্টনী-আনুসঙ্গিক আরো অনেক কিছু। সঞ্চারিত হয়েছে পারিবারিক রস। মায়ের ভূমিকা এখানে অগ্রগণ্য। তারই পাশাপাশি গৃহস্থালি সম্ভাবনা পরিপূর্ণ এক রমণীর কমনীয় নারী ব্যক্তিত্ব। কর্ম আর ঘর্মের দুনিয়ায় যে লোপার পরিচয় শঙ্খচূড় পেয়েছিল, আজ তার মধ্যে মিশে গেল মোহ। ভাই চন্দ্রচূড়ও তাই ভাবতে পেরেছে এ বৌদি না হয়ে যায় না। শঙ্খচূড়ের বাতিক-গ্রস্ত মায়ের পক্ষেও নিজের বিছানায় মেয়ের মত প্রসন্ন চিত্তে স্থান দিতে অসুবিধে হয়নি লোপাকে।

'যা নয় তাই' উপন্যাসে প্রধান চরিত্র লোপামুদ্রা সন্দেহ নেই। সক্রিয় চরিত্র অবশ্যই শঙ্খচূড়। মানসিক বিক্ষোভ আর বাহ্যিকভাবে শান্ত থাকার বৈপরীত্যে রহস্যময় চরিত্র ধূর্জটি প্রসাদ। অজ্ঞাত অথচ ঘটমান ক্রিয়াশীলতার নেপথ্যে রহস্য রসের যোগানে যাঁদের ভূমিকা আছে, তারাও স্মরণীয়। তবে এই রহস্যগুলি ঔপন্যাসিকের উপস্থাপন কৌশলে এসেছে। অনাবিস্কৃত থাকা খাঁটি রহস্য রসের মূল বৈশিষ্ট্য। শেষ পর্যন্ত এখানে কোনো কিছুই অনাবিস্কৃত থেকে যায় না। বরং বলা যেতে পারে সত্যসন্ধানী আলোয় অবশেষে যা আবিস্কৃত হলো তা অন্য কিছু নয়, একান্তভাবেই জীবনরস। এ উপন্যাসে লেখক দেখালেন :

১. অর্থ লোলুপতা মানুষের চরম বিপর্যয়ে স্বার্থ-সন্ধান করায়।
২. বাৎসল্য মানুষের প্রকৃতিকে আমূল বদলে দিতে পারে।
৩. সকল রসের শ্রেষ্ঠ মধুর রস।
৪. সব সম্পদের শ্রেষ্ঠ মানুষ---এই উপলব্ধিতে পৌঁছানো।
৫. মানুষের কাছে পৌঁছাতে প্রধানত চাই বিশ্বস্ততা।
৬. পরোপচিকীর্ষা মানুষকে শক্তিমান ও ঋদ্ধিমান করে তোলে।
৭. অর্থ গৃহী জীবনকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে।

তত্ত্বাকারে সব মানুষই 'চরৈবেতি'-র সংজ্ঞা বোঝেন। যিনি বাস্তবে বাসা-হীন রাহী তিনি এ তত্ত্বের অভ্যাস করেছেন জীবনে। তাঁর দেখার একটা স্বতন্ত্র দিক থাকবেই। মনে হবে পরিচিত জীবনের গভীরে ঢুকছেন না---কেবল দেখছেন পথ চলতি ব্যস্ততায়! চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়ে দেখা নৈশ অন্ধকারে জ্বলা কুঁড়ে ঘরের প্রদীপ কিম্বা অট্টালিকার জানালায় ক্ষণিকের দেখা জীবন আর বাকিটুকু কল্পনায় ভরিয়ে নেওয়া। জীবনের খুঁটিনাটি দেখার আগ্রহ ঔপন্যাসিকের নেই। এধরণের ঔপন্যাসিকের বিরুদ্ধে বাঁধা গতে অবাস্তবতার অভিযোগ তুলে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কথা। তাঁর রচনার বড় গুণ বাহুল্য বর্জন অবধূতের লেখার মধ্যে সেই বাহুল্য বর্জনের মহৎ গুণটি বিদ্যমান। পাশ্চাত্ত্যে একটি ধারণা প্রায় সকলেই পোষণ করেন যে উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা

খুবই জরুরী। আমরা অভিজ্ঞতার বাইরে কিছুই লিখতে পারি না। এর পাশাপাশি অবশ্য স্বীকার্য যে মনস্তাত্ত্বিক দুনিয়া যে অনন্ত বিশ্বের মত সুবিশাল সেখানে নানা ভাবোদয়ের মাধ্যমে লেখক হয়ে উঠতে পারেন সহস্র ধারার উৎস-তার জন্য অভিজ্ঞতা লাগে না। আমরা অবধূতের ক্ষেত্রে দুটি লক্ষণই পরম সার্থকতায় রূপ পেতে দেখি। আর একটি কথা মনে পড়ে পূর্ণব্রহ্মাবধূত দেবীদাস বাবাজীর পায়ে কপাল ঠেকিয়ে অবধূত প্রার্থনা করেন 'কয়েকটা বছরের জন্য এই ধরাধামে এসে পড়েছি। এখানে যেসব তাজ্জব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে, তাই দেখে মশগুল হয়ে থাকতে চাই।'[১৮] ষোলকলা পূর্ণ হওয়ার সে আশীর্বাদ সফল হয়েছে তাঁর লেখক জীবনে। তাছাড়া ভৈরবী মাকে নিয়ে তাঁর যে জীবন-যাপন সেখানে বাঙালি পরিবারের বিবাহ-সংস্কার গভীরভাবে কাজ করেছে। পুরুষ-প্রকৃতি যেখানে ছান্দিক পথ খুঁজে পান, সে শ্মশান কিম্বা জঙ্গল-যেখানেই হোক, তা জীবন-সম্পদে ঋদ্ধ হবেই। এখানেও তাই ধরে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে যে অবধূতের রনা জীবন-অভিজ্ঞতায় পূর্ণ ছিলো। স্রষ্টা অবধূতের অন্তর ছিলো জীবন-রসে আর্দ্র। সেই অভিজ্ঞতার পূর্ণপাত্র---সঞ্চিত জীবনরস পাঠকের জীবন রসপিপাসাকে তৃপ্ত করে। যে জীবন আমাদের নয় অথচ হতে পারত, সেই অপরিচিত জীবনের রূপকার অবধূত। তাই বলে সে জীবন-রসের সত্যতা কি অস্বীকার করা যায়? অন্ধকার হলে কি পানীয়জল তার তৃষ্ণাহর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে? তা যেমন সম্ভব নয় তেমনি অবধূতের জীবন সাধনা সাধারণ গ্রামীণ বা নাগরিক মানুষের অপরিচিত হলেও জীবন-রসের যোগানেই যে নির্মিত, তা আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না। সঙ্গত কারণেই অবধূতের রচনা তাই আজও প্রাসঙ্গিক।

স্বভাবতই বাঙালী গৃহকেন্দ্রিক। অবধূতের জীবন অনেকাংশে তার বিপরীত। ১৮ বছরের পথের জীবন। তাঁর জীবনের অনেক কিছুই জানা যায় না। তবে জানার ইচ্ছা অনেকটাই পুরণ হতে পারে যদি তাঁর রচনার মধ্যে কেউ ঢুকে যেতে পারেন। সে সব ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার মণিমঞ্জুষা ছড়িয়ে আছে 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'পথে যেতে যেতে', 'যা নয় তাই', 'কলিতীর্থ কালীঘাট' ইত্যাদি উপন্যাসে। এসব গ্রন্থ মনোযোগের সাথে পাঠ করলে দুলাল মুখোপাধ্যায় ওরফে অবধূতকে,তথা স্রষ্টার জীবন দর্শনকে, যথার্থভাবে চেনা যাবে। বিপরীতক্রমে ঔপন্যাসিক সত্তাকে বুঝে নেওয়া যাবে। 'কলিতীর্থ কালীঘাট'-এ গৃহস্থ মানুষের কথা মন্দিরের ধর্মচর্চার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তি জীবন-কথা গভীর একাত্মতায় মিশে গেছে। আর একটি কথা, এমন মানুষ কে আছেন যিনি জীবনের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বরকে স্বীকার না করে পেরেছেন? যদি গোটা বিশ্বের লোকসংখ্যা সাত বিলিয়ান হয় তবে সারাজীবন নিরীশ্বর ছিলেন এমন মানুষের সংখ্যা করাগ্রগণনীয়। সবাই যেকোন এক শক্তি, যে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তাকে মোটামুটি সকলেই মানেন। এর নাম ঈশ্বর, আল্লা---যাই হোক না কেন! স্বভাবতই এ ধারণা মনে আসে, কেননা গোটা বিশ্বের মানুষের যৌথ ক্ষমতাও তার কাছে নগণ্য। প্রকৃতির কাছে মানুষের সমগ্র সভ্যতার সর্বকালীন শক্তিও তুচ্ছ। তার এই শক্তির সীমাবদ্ধতা যাঁর কৃপায় পূরণ করতে চান তাঁকে শ্যাম বা শ্যামা যাই বলা হোক না কেন, তিনি সবুজ -প্রাণের প্রতীক -এই প্রাণময় সত্তা সৃষ্টির সব কিছুর মূলে সক্রিয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর আলোতেই প্রমথ চৌধুরী

বলেছেন যৌবনে দাও রাজটীকা। অতএব রসিকের দৃষ্টি নিয়ে অবধূতের রচনা পাঠে মনোযোগী হতে বাধা কোথায়? এখন এ প্রসঙ্গে অবধূতের 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসটি আলোচনা করা যেতে পারে।

পাঁচ. 'উদ্ধারণপুরের ঘাট': জীবনের বিচিত্র পরিণতি

'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে 'কথাসাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ভূমিকা লিখেছিলেন 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। এড্‌উইন ম্যুর যাকে বলেছেন 'Novel of Character' বা 'Dramatic Novel' 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' সেইরকম চরিত্র-বৈচিত্র্য এবং ঘাত-প্রতিঘাত মূলক ঘটনা নিয়ে গড়ে উঠেছে। থিম প্রধান উপন্যাস অবধূতের নেই বললেই হয়। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' পরবর্তী রচনায় প্লটের পরিবর্তে থিমকে আশ্রয় করেছিলেন। 'চতুরঙ্গ', 'চোখের বালি' জাতীয় রচনার যে প্রকৃতি অবধূতের স্বভাব-ধর্মের সঙ্গে তা মেলে না। বস্তুত এ উপন্যাসের কোনো চরিত্র বিচ্ছিন্ন দ্বীপখণ্ড রূপে গড়ে উঠতে পারে না। এ সম্পর্কে হার্ভের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'Novel. . . the characters do not develop along single and linear roads of destiny, but not are, so to speak human cross-roads'[১৯]

'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসে বিপ্রতীপ চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস অছে। আগমবাগীশ এবং গোঁসাইবাবা সেই 'Contrast Character'-এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে লেখক মাঝে-মধ্যে প্রধান চরিত্রের গভীরতা সৃষ্টি করেছেন। হার্ভে একে বলেছেন : 'Perspective of Depth' তাই বলে এ উপন্যাসে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চরিত্র হিসেবে কাউকে চিহ্নিত করা যায় না। 'গোরা' উপন্যাসে পরেশবাবু উদ্দেশ্য প্রণোদিত চরিত্র। হেনরী জেমসের ভাষায় 'Ficelle' জাতীয় চরিত্র। এর সাক্ষাৎ অবধূতের উপন্যাসে বড় একটা মেলে না---এখানেও নেই। অথচ এ উপন্যাসে তার প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। 'গোঁসাইবাবা' কিম্বা 'আগমবাগীশ' তেমন চরিত্র হয়ে উঠতে পারতেন কিন্তু হননি।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের লেখক জানিয়েছেন শচীশের আত্মবিহ্বল অবস্থার কথা :'অসীম তুমি আমার, তুমি আমার'এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।' আবার ৪র্থ পরিচ্ছেদে আছে, ভয়ংকর এক অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির রাত্রে শচীশ হঠাৎ ঘর ছেড়ে বাইরে ছুটে যায়। বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় দেখা যায় শচীশ নির্জন নদীর পাড়ে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। সে কেবল দামিনীকে বলেছিল : 'যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার আর কিছুতেই আমার দরকার নাই।' আমরা শ্মশানভৈরবকে এমন অবস্থায় দেখি না। অন্যদিকে আগমবাগীশের আচরণে কামলোলুপতা আছে সত্য নেই।

'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসে উল্লেখিত শ্মশানটির ভৌগোলিক অবস্থান ও তার গুরুত্বটি বুঝে নেওয়া দরকার। 'কাটোয়া ছাড়িয়ে গঙ্গার উজানে উঠতে থাকলে

> আসবে উদ্ধারণপুর। শ্রীশ্রী চৈতন্যদেবের পার্ষদ শ্রী উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর। তাঁরই নামের স্মৃতি বহন করছে উদ্ধারণপুর। কিন্তু সে কথা কারও মনে পড়ে না। উদ্ধারণপুর বলতে বোঝায় উদ্ধারণপুরের ঘাট।'[২০]

'যত মড়া উদ্ধারণপুরের ঘাটে'। এটা হচ্ছে ওদেশের একটা চলতি কথা। অবাঞ্ছিত কেউ এসে জ্বালাতে থাকলে বিরক্তি প্রকাশ করে এই কথাটা যখন তখন বলা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার যে অংশটুকু গঙ্গার পশ্চিম তীরে পড়েছে, সেখানকার আর বীরভূম জেলার প্রায় ষোল আনা মড়া আসে উদ্ধারণপুর ঘাটে। কাঁথা মাদুর চট জড়ানো, বাঁশে ঝোলানো মড়া দশ দিনের পথ পেরিয়ে আসে উদ্ধারণপুর ঘাটে পুড়তে। ওদেশের নিয়ম, স্বজাতিরা মড়া কাঁধে করে গ্রামের বাইরে একটা নির্দিষ্ট গাছতলায় নিয়ে গিয়ে মুখাগ্নি করবে। ব্রাহ্মণের মন্ত্র পড়া, পিণ্ড দেওয়া, এ সমস্ত শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান সেখানেই সেরে ফেলা হবে। তারপর মড়াটিকে নিয়ে যাওয়া হবে উদ্ধারণপুরে গঙ্গায় দিতে। গঙ্গায় দেওয়া যদি সামর্থ্যে না কুলোয় তাহলে আত্মীয়স্বজনের আর আক্ষেপের অন্ত থাকে না। দশ বছর আগে যে মরেছে তার জন্যেও শোক করতে কোনো যায় সেখানকার মানুষের মুখে।

শ্মশান গঙ্গার কিনারায়-দক্ষিণে উত্তরে লম্বা। পশ্চিমে বড় সড়ক। সড়ক থেকে নেমে শ্মশানে ঢুকলে দেখা যাবে গঙ্গার জল পর্যন্ত সমস্ত জায়গা জুড়ে ভাঙা হাঁড়ি কলসী, পোড়া কাঠ, বাঁশ চাটাই, মাদুর দড়ি আর হাড়-গোড় ছড়িয়ে পড়ে আছে। ইয়া হামদা হামদা শিয়ালগুলো আধপোড়া মড়া নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে। দিনের আলোয় সকলের চোখের উপরেই তাদের খেয়ো-খেয়ির বিরাম নেই।ওদের চক্ষুলজ্জা বলতে কোনো কিছুর বালাই নেই একেবারে। রক্ত-চক্ষু কেঁদো কেঁদো কুকুরগুলো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভালো করে দেখলে বোঝা যায়--একেবারে গঙ্গার কিনারায় জলের ধারে শকুনগুলো পাখা মেলে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যা খেয়েছে তা হজম না হওয়া পর্যন্ত ওরা পাখায় রোদ লাগাবে।শ্মশানের উত্তর দিকের শেষ সীমায়-একটি উঁচু ঢিবি। ঢিবির পেছনেই আকন্দগাছের জঙ্গল। সেই ঢিবির ওপরেই ছিল 'গোঁসাইবাবা'-র গদি। সে গদি নির্মিত হয়েছে মড়া পড়ানোর সময়। তোশকের ওপর তোশক, তার ওপর আরও তোশক, তারপর অগুনতি কাঁথা লেপ কম্বল চাপাতে চাপাতে 'গোঁসাইবাবা'র সেই সুখাসন মাটি থেকে দু'হাতের ওপর উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। ১৯৮২ সালে অঞ্জন দাস সিনেমা করার জন্য অবশ্য এই শ্মশানঘাট[২১] টিকে আর তেমন ভাবে পাননি। তিনি সিনেমার প্রয়োজনে বেছে নিয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সূর্যপুর গ্রামের একটি শ্মশান ঘাটকে।

বীরভূম আর মুর্শিদাবাদের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিমে পড়েছে সেখানকার লোকেরা এই কেঁধো পেশায় যুক্ত। গঙ্গায় মড়া নিয়ে যাবার জন্যে প্রতি গাঁয়ে দু-এক দল লোক আছে। মড়া বওয়া হচ্ছে তাদের পেশা। কে কোথায় মরো-মরো হয়েছে সে খোঁজ তারা রাখে। মানুষ মরার সঙ্গে সঙ্গে তারা জুটবে গিয়ে সেখানে। বাড়ির লোকের সাথে তখন দর কষাকষি চলবে। দাবি করবে নানারকম---এত বোতল কাঁচি মদ আর নগদ এত টাকা ইত্যাদি। আর যাওয়া-আসায় যে ক'দিন লাগবে সেই কদিনের জন্যে চাল ডাল নুন তেল তামাক মুড়ি গুড়! সব

জিনিস বুঝে পেলে মড়াটাকে কাঁথায় মাদুরে জড়িয়ে একটা বাঁশে ঝুলিয়ে হাঁটতে শুরু করবে উদ্ধারণপুরের দিকে। সাধারণ লোকের ভাষায় এরা হল কেঁধো।

> ''সব জাতের ঘর থেকেই কেঁধোর পেশার লোক জোটে। যে ছেলেটা বখে গিয়ে বাউণ্ডুলে হয়ে গেল, সে আর করবে কি? পরের পয়সায় মদটা ভাঙটা চলে এমন পেশা বলতে ঐ কেঁধোর পেশার তুল্য আর কোনো্ কাজটি আছে! টাকাটা সিকেটা জোটে। পেট ভরে খাওয়া ত ফাউ, তার উপর নেশাটা। গাঁয়ে ফিরে একটি ফলারও জোটে বরাতে। যেমন তেমন করে মৃতের পারলৌকিক কর্ম করলেও কেঁধোরা বাদ পড়ে না।''[২২]

অবধূত উদ্ধারণপুরের শ্মশানে রাত্রির যে রূপ বর্ণনা করেছেন যেন তার উল্টো চিত্র পাই রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'। আমরা দিনে দেখা পদ্মাচরের কিছুটা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করবো:

> ''সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম দিক থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে এক প্রকাণ্ড পাতা উল্টে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন আর এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর, আর ওই ছবির মতন পরপার, ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ, এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা! যাক, একথা গুলো রাজধানীতে অনেকটা 'পৈট্রি'র মতো শুনতে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাপ নয়।''[২৩]

অবধূত গঙ্গার তীরে এই শ্মশানে বসে নিস্তব্ধতার মধ্যে যে অনুভব করেছিলেন তা আমরা দেখে নেবো। এখানেও যেন সেই রবীন্দ্রকথিত 'পৈট্রি'-র মতই কোনোাচ্ছে। কিছুটা দীর্ঘ হলেও আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো স্থানটির মাহাত্ম্য যেখানে বাস্তববাদী অবধূতও 'উদ্ধারণপুরের ঘাটে'-র রাত্রি বর্ণনায় যেন মোহগ্রস্ত হয়ে যান :

> ''আঁখিতে স্বপন দেখার সুরমা পরে যে রজনীরা দুনিয়র বুকে আসে যায়, সেই ছলনাময়ী অভিসারিণীরা উদ্ধারণপুরের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। তিমির কেশজালে নিরাভরণ নগ্নকায়া আবৃত করে যে যামিনীরা নিঃশব্দে আবির্ভূতা হয় উদ্ধারণপুর শ্মশানে, তারা কামনার বিষ থেকে তিলে তিলে গড়ে ওঠা তিলোত্তমা। সূতিকাগারে জন্মলাভ করে কাম বুকে নিয়ে অনন্ত পিপাসা। কিছুতেই শান্তি হয়না সে পিপাসার। শেষপর্যন্ত এসে উপস্থিত হয় শ্মশানে। সবই ভস্মীভূত হয় এখানে, গঙ্গার জলে। শুধু পোড়ে না সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা। উদ্ধারণপুরের শর্বরীর চোখেও সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা, পীনোন্নত বক্ষে যুগ যুগান্তরের নির্লজ্জ লালসা। চুপে চুপে দাঁড়াত আমার পেছনে। উষ্ণ শ্বাস পড়ত আমার পিঠের ওপর স্পষ্ট শুনতে পেতাম তার প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। ঝলসানো মাংসের উৎকট গন্ধ ছাপিয়ে তার তনুর সুবাস আচ্ছন্ন করে ফেলত আমায়। সর্বেন্দ্রিয় অবসন্ন হয়ে পড়ত। পেছন থেকে ধীরে ধীরে জড়িয়ে ধরত সেই কামুকী নিশাচরী। তার নগ্ন বক্ষের নিস্পেষণে আমার দম বন্ধ

হয়ে আসত। কী তীব্র মাদকতা তার চক্ষু দুটির অতল চাহনিতে! তার হিমশীতল নগ্ন দেহের নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝে তলিয়ে যেতাম।"[২৪]

---প্রকৃতি বর্ণনায় অবধূত যেন কবি হয়ে যান। এমন পরিবেশ-নিপুণ বর্ণনার দক্ষতা প্রসঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র তার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> "প্রকাণ্ড চর---ধূ ধূ করছে---কোথাও শেষ দেখা যায় না- কেবল মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায় -আবার অনেক সময়ে বালি বলে নদীকে ভ্রম হয়। গ্রাম নেই লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই---বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল-ধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুকনো সাদা বালি। পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নীচে অনন্ত পাণ্ডুরতা। আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, নীচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা। এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ পশ্চিমে মুখ ফেরাবামাত্র দেখা যায় স্রোতোহীন ছোটো নদীর কোল, ও পারে উঁচু পাড়, গাছপালা, কুটীর, সন্ধ্যাসূর্যালোকে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো। ঠিক যেন এক পারে সৃষ্টি এবং আর-এক পারে প্রলয়। সন্ধ্যাসূর্যলোক বলবার তাৎপর্য এই---সন্ধ্যার সময়ই আমরা বেড়াতে বেরই এবং সেই ছবিটাই মনে অংকিত হয়ে আছে "[২৫]

এই প্রসঙ্গে অবধূতের আলোচ্য উপন্যাসের এই অংশ মনে আসবেই :

> "...গোধূলি-লগ্নে চটুলচরণে আসে সন্ধ্যা। রাত্রির জন্যে যত্ন করে বাসর সজ্জা সাজিয়ে দেয় ; তারপর করুণ নয়নে একবার আমার দিকে তাকিয়ে ত্রস্তপদে বিদায় নেয়। কিন্তু আসেনা রাত্রি। বৃথা প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে ঢুলতে থাকি। হঠাৎ গভীর নিশীথে তন্দ্রা ছুটে যায়। তখন যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সে সই উদ্ধারণপুরের উন্মত্তা শর্বরী নয় এ এক লোলচর্ম পক্বকেশ দন্তহীনা থুত্থুড়ে বুড়ি। এর বীভৎস মুখ -গহ্বরের মধ্যে কৃতান্তের কুটিল ইঙ্গিত। কোটরে-বসা দুই চোক্ষের হিংস্র দৃষ্টিতে নিয়তির নির্মম আহ্বান, শ্বাসপ্রশ্বাসে হারিয়ে যাওয়া অতীতের জন্যে কুৎসিত হাহাকার। কিছুই দিতে আসে না আজকের নিঃস্বা বিভাবরী। শুধু নিতেই আসে। সারা রাত এর সঙ্গে এক সজ্জায় কাটাবার মূল্য দিতে হয় একদিনের পরমায়ু।"[২৬]

অবধূতের পরিবেশ বর্ণনায় মানুষ ও প্রকৃতি একাকার। তাই চাঁদের ওপর ব্যক্তিত্বের আরোপ করে বলেন যে তখন আকাশে একখানা আস্ত চাঁদ ড্যাবড্যাব করে যেন চেয়ে আছে নেতাই বোষ্টমীর দিকে। গঙ্গায় জল যেন গলানো রুপো টলমল করে বয়ে যাচ্ছে। সেই দিকে চেয়ে একই মাদুরের একপাশে পা ছড়িয়ে বসে আছে নিতাই, ওপাশে শুয়ে আছে চরণ দাস। তার নাক ডাকছে---বোঝা গেলো এদের মধ্যে সহাবস্থান আছে---রোমান্স নেই। উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত অবধূত এই উপন্যাসের স্থানে স্থানে যেন গদ্যকাব্য রচনা করে চলেছেন। কুয়াশা

না কাটা সকাল বেলা কী অপরূপ প্রাণময় কাব্য হ'য়ে উঠেছে অবধূতের উপলব্ধিতে,বর্তমান প্রসঙ্গে তার কিছুটা উদ্ধৃত করা যায় :

> "গঙ্গার ওপারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটি মেয়ে। কপালে শুকতারার টিপ আঁকা, স্বচ্ছ কুহেলী ওড়নায় তনুখানি ঢাকা, বনহরিণীর চকিত চাহনি চোখে নিশার অভিসারিণী। ঊষা। অনিরুদ্ধ আনন্দের মূর্তিমতী প্রাণশক্তি। ঘুমভাঙানি গান শুনিয়ে ঝরা শিউলীর ওপর দিয়ে লঘু চরণে পালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাল কেটে গেল গানের, চরণে চরণ জড়িয়ে গেল, থমকে দাঁড়িয়ে ঘোমটার ভেতর থেকে চোখ মেলে চেয়ে রইল গঙ্গার এপারে।"[২৭]

প্রসঙ্গত মনে পড়ে রলাঁ বার্ত ভাষা, শৈলী ও লিখনের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তা স্মরণীয় :

> "ভাষা হচ্ছে একটি যুগের সমস্ত লেখকের জন্য বিভিন্ন নীতি ও অভ্যাসের সমবায়। লেখকের কাছে ভাষা একটা পরিসীমা, দিগন্ত। ভাষা হচ্ছে সাহিত্যের একটা দিক, শৈলী হচ্ছে তা পেরিয়ে অন্য একটি দিক। লেখকের জৈব অস্তিত্ব বা শরীর এবং অতীত থেকে জন্ম নেয় কিছু চিত্র, বাগভঙ্গি আর বিশেষ শব্দসম্ভার ---এটাই হল একজন লেখকের শৈলী। ভাষা ও শৈলীর মাঝখানে থাকে লিখন। ভাষা এবং শৈলীর নির্বাচনে লেখকের কোনো স্বাধীনতা থাকে না, অন্যদিকে লেখকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় থাকে তাঁর লিখনের নির্বাচনে।"[৩০]

উদ্ধারণপুরের ঘাট ও যোগী অবধূত

আলাদা করে ব্যক্তি জীবনের কথা লিখে যান নি অবধূত। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে সাধক জীবনের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। আমরা এখন 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাস আলোচনা করে তাঁর ব্যক্তিজীবনের সাধন-অভিজ্ঞতাকে বুঝে নেব। উপন্যাসে নির্মিত প্রধান চরিত্র 'শ্মশানভৈরব'-এর মাধ্যমে ব্যক্তি অবধূতের কথা জেনে নিতে পারি। আমরা জীবনী অংশে আগেই জেনে গেছি যে দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজেই ছিলেন শ্মশানভৈরব। উপন্যাসের নানা চরিত্রের মাধ্যমে লেখক যেন আপন জীবনানুভবকে জানিয়ে গেছেন মাত্র। কল্পনা করার প্রয়োজনটুকুও তাঁর হয়নি। এই সূত্রে অভিজ্ঞতা আর দার্শনিকতা জনক আর জাতকের ভূমিকায় দেখা গেছে অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন কিন্তু ব্যঞ্জনায় তা এক দর্শনকে আভাষিত করে।

> "শ্মশানে ঝিরঝিরে বাতাসে, গঙ্গার ঢেউয়ের কুল কুল ধ্বনিতে চিতার ওপর আগুনের আঁচে মানুষের মাথা ফাটবার ফট্ ফটাস আওয়াজে কোনো যায় সেই নিলামের ডাক। সপ্তগ্রামের বণিক-কুলপতি উদ্ধারণ দত্ত মশাই পাকা সওদাগর ছিলেন। নিক্তির তৌলে আজও জোর কারবার চলছে তাঁর ঘাটে। কড়াক্রান্তি এধার ওধার হবার জো নেই। যিনি নিলাম ডাকেন তাঁর কপালের

ওপর আছে তিন তিনটে চোখ। কার সাধ্য রেহাই পাবে সেই চোখ তিনটিকে ফাঁকি দিয়ে।"[২৮]

উদ্ধারণপুরের ঘাট। শ্মশানঘাট। বীরভূম মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা মরলে এই শ্মশানেই তারা পুড়তে চায়। একে'বিকিকিনির টাট।' বলার কারণ হলো এখানেই সব হিসাব শেষ। কেউ বাদ যায় না-মরতেই হয় আর পুড়তেও হয় এখানে। পাপী-পুণ্যবান ধড়িবাজ উপকারী, ধার্মিক আর ধর্মধ্বজী সব এক সঙ্গে সস্তা দরে নিলামে ওঠে সেখানে। নিলাম ডাকেন স্বয়ং মহাকাল ---ক্রেতা চার জন। ভবিতব্য, ভাগ্য, কর্মফল আর নিয়তি। অবধূতের এই ব্যাখ্যা পাঠককে নতুন দর্শনে পৌঁছে দেয়। এখানেও মানুষের চালাকি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন অবধূত। সেখানে দেখা গেলো মিথ্যা আড়ম্বর। চলছে নিশীথ রাতের গোপন অনুষ্ঠান---রহস্যপূজায় বসেছেন আগমবাগীশ শ্মশানের ঈশান কোণে। রক্তবস্ত্র পরে, জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে কপালে মস্ত বড় সিন্দুরের ফোঁটা লাগিয়ে তাঁর শক্তি আসন গ্রহণ করেছেন তাঁর বামে। সামনে শ্রীপাত্র গুরুপাত্র যোগিনীপাত্র ভোগপাত্র আর বলিপাত্র স্থাপন করা হয়েছে। আগমবাগীশ জানালেন এটি শুভ লগ্ন। কেননা একে কৃষ্ণাষ্টমী তায় মঙ্গলবার। ভাবটা এমন যেন মোক্ষম যোগাযোগ মিলে গেছে আগমবাগীশের। মন্ত্রপাঠ করছেন---তত্ত্বশুদ্ধি হবে মন্ত্রের অমোঘ শক্তিতে। এই বিশ্বাসে সমবেত উদ্ধারণপুরের শ্মশানে কয়েকজন নরনারী। তারা শুনছে :

"ওঁ প্রণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা।' আমার প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান শোধন হোক, রজোগুণশূন্য পাপশূন্যজ্যেতি:স্বরূপ হই যেন আমি।"

ফাঁকিবাজির চেহারা অবধূত অল্পে অল্পে আমাদের জানিয়েছেন। বলেছেন যে জ্যোতিস্বরূপ হবার প্রধান উপাচার আস্ত এক ভাঁটি কিনে ভরে এনে দিয়েছে রামহরি গোম। সাধক মানুষ সেও, বউকে একখানে রক্তবর্ণ কাপড় পরিয়ে নিয়ে এসেছে সঙ্গে। মেয়েটাকে রেখে এসেছে পঙ্কেশ্বরের কাছে। আজ রাতে পঙ্কাও ঢুকতে পাবে না শ্মশানে। কেন পঙ্কা ঢুকতে পারবে না তা পাঠক আন্দাজ করতে পারছেন। এরপর অবধূত জানালেন :

"আমারও শক্তি নেই সুতরাং অধিকার নেই রহস্যপূজায় বসবার। কিন্তু আগমবাগীশ আশা রাখেন যে একদিন আমার পশুত্ব ঘুচবে। বীরভাব জাগবে আমার প্রাণে, সেদিন আমিও একটি শক্তি জুটিয়ে নিয়ে লেগে যাব শোধন - ক্রিয়ায়। তাই আমাকে একরকম জোর করে এনে বসিয়েছেন আগমবাগীশ ওঁদের সামনের আসনে।"[২৯]

এ উপন্যাসের কোথাও কোথাও ভাষা হয়ে গেছে পাত্র-পাত্রীর মনের বাহ্যজ্ঞানহীনতার মতই সূক্ষ্ম। বিশেষভাবে মনে পড়ে আগমবাগীশের যজ্ঞানুষ্ঠান। সেখানে কারণবারি পান করায় নেশার আচ্ছন্নতায় জড়িমাগ্রস্ত দুজন নারী। একজন সিঙ্গি গিন্নি আর এক জন এসেছে সাধুবাবার কৃপা নিয়ে স্বামীকে সুস্থ করে নেওয়ার জন্য। শেষপর্যন্ত আগমবাগীশের কামলোলুপতার স্বার্থে এই অসহায়া নারীকেই জোর করে ধরে বসানো হয়েছে। এই মহিলা ধর্ম হারাবার ভয়ে কাকুতি-মিনতি করছে রেহাই পাওয়ার জন্য। সে তার অসুস্থ স্বামীর কাছে ফিরতে চায়। আগমবাগীশের ভণ্ডামো তার কাছে ধরা পড়ে গেছে। অন্যদিকে সিঙ্গি-গিন্নি ধরা দিতে চায়। তার অসম্পূর্ণ জীবন বাসনা চরিতার্থ করতে চায়। দুই বিপরীত জীবন বাসনা চমৎকার মিলেছে অবধূত সৃষ্ট এই মায়াময় ভাষার সঙ্গতে আর ব্যঞ্জনায়, যা প্রাণ পেয়েছে অপরিচিত নির্জন শ্মশান-পরিবেশের আলো আঁধারিতে।

> ''অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র মহাবেগে অবিরাম ঘুরে মরছে আপন আপন কক্ষপথে। কেন? কেন তা কেউ জানে না। কেউ বলতে পারবে না কিসের টানে ওরা ঘুরছে, কার কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে ওদের ওই নিরন্তর আবর্তনে।''[৩০]

এখানে আগম বাগীশের কাছে সিঙ্গী গিন্নির আত্ম সমর্পনের পটভূমি রচনা করেছেন লেখক।- এরপর আধ্যত্মিক প্রয়াসের পৌরাণিক প্রসঙ্গ এনে লেখক নিজের অবস্থা ও বিশ্বসংসারের যন্ত্রণাময় জীবনের চিত্রকল্প এঁকেছেন অনুপম দক্ষতায়। ধর্মশাস্ত্রের ইঙ্গিতময়তা সাধারণ মানুষ বোঝেন না। রক্ত-মাংসে গড়া এই শরীর আর আত্মা কেমনভাবে আলাদা তা সাধকরাই জানেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষ কেবল শুনতে পারেন। সম্যক বোঝা অসাধ্য। অবধূত এ উপন্যাসে কথকের মাধ্যমে নিজের উপলব্ধি আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি অনুভব করছেন যে সামনেই ক্ষীরোদ সাগর। নিস্তরঙ্গ অবিক্ষুব্ধ অচেতন। দেখতে পাচ্ছেন কল্পনায় যে শেষনাগ সহস্রফণা বিস্তার করে আসছে। অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত অনন্তদেব, তাঁর যাতে ঘুম না ভাঙে সেদিকে খেয়াল রেখে অতিসন্তর্পণে পদসেবা করছেন মহালক্ষ্মী । অন্যদিকে যেন দেখতে পাচ্ছেন সহস্র মুখে সহস্র ফনা দিয়ে বিষাক্ত শ্বাস ত্যাগ করছে নাগেশ নারায়ণের মুখের ওপর। তারই বিষক্রিয়ায় বিশ্বম্ভর আছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে আছেন। কালকূটের প্রমত্ত প্রভাবে সর্বাঙ্গ নীল হয়ে গেছে তাঁর। সেই নীলাভায় মহাব্যোম নীলে নীল হয়ে আছে। তার মাঝে উঠেছে প্রলয়ঙ্কর ঝড়। সেই ঝড়েও বাসুকির সহস্র ফণা-নিঃসৃত হলাহলের নিশ্বাস। কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র সেই বিষের মাঝে পড়ে বিষের নেশায় মত্ত হয়ে দুর্নিবার গতিতে অনন্তকাল আবর্তিত হচ্ছে। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে আকুল আকুতি। তাঁর এই আত্ম-কথন আমাদের বুঝিয়ে দেয় শিষ্যরা কেমনভাবে গুরুর নির্দেশে মনঃসংযোগ করেন। অবধূত এখানে গুরুগিরি করছেন না। বা আধ্যাত্মিক কোনো শিক্ষা দিচ্ছেন না। এ উপন্যাসে আগমবাগীশ একটি চরিত্র। তার যজ্ঞানুষ্ঠানে কীভাবে সকলের উপস্থিতিতে তিনি স্বীয় ইচ্ছাটি চরিতার্থ করতে চেষ্টা করছেন সেটাই এখানে উপজীব্য। তাই কথক গোঁসাইবাবার নেশার ঘোর একটু একটু ক'রেকেটে গেলো অস্ফুটে শুনতে পেলেন :

"ওগো আমায় ছেড়ে দাও। আমার যে ছেলেমেয়ে আছে গো ঘরে। সর্বনাশ করো না গো আমার, সর্বস্ব কেড়ে নিয়ো না। সব খুইয়ে এখান থেকে ফিরে গিয়ে কোন্ মুখ নিয়ে আমি মা হয়ে দাঁড়াব তাদের সামনে?"[৩১]

কথক প্রতিবাদ করার অবস্থাতে নেই । অর্ধচেতন অবস্থায় আছেন। তাঁর কানে ভেসে আসছে উদাত্ত সুরে উচ্চারিত এই মন্ত্রাংশ---

"ওঁ যোনিবিদ্যাং মহাবিদ্যাং কামাখ্যাং কামদায়িনীং।
তৎসুসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং কামবীজাত্মিকাং পরাং।"

---এই পটভূমির সঙ্গে একান্ত জীবন্ত শ্মশানভৈরবের কল্পনা। আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি গাল ফুলিয়ে তুবড়ি বাঁশিতে সুর তুলেছে সর্বনিয়ন্তা সাপুড়িয়া। তাঁর সুরের তালে তালে বাসুকির সহস্র ফণা দুলছে। ও ঘুমোলে ওর শ্বাসনালী রুদ্ধ হয়ে যাবে যে। তখন আর বইবে না বিষাক্ত ঝড়, নারায়ণের নেশা টুটে যাবে। স্তব্ধ হয়ে যাবে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবেগ। নিমেষে জেগে উঠবে সকলে,অগণিত গ্রহ---নক্ষত্রের সঙ্গে জেগে উঠবেন স্বয়ং চক্রপাণি। এই ভাবনার মধ্যে ছেদ পড়ছে যেন! মন নিবিষ্ট করতে গিয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন শ্মশানভৈরব। সন্দেহ জাগছে জাগতিক কোনো বিপর্যয়ের যেন আশঙ্কা মনকে বিব্রত করছে। মনকে সংযত করার চেষ্টা করছেন কিন্তু ক্রমাগত মর্মন্তুদ আর্তনাদ উঠছে যেন ধরণীর বুক থেকে। তাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে মহাকাব্যের মহাপ্রশান্তি। ছন্দপতন ঘটাচ্ছে অসহায়া নারীর আকুতি। সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে উঠল যজ্ঞের মন্ত্র ধ্বনি :

"ওঁ ক্লীঁ কামেশ্বরি মহামায়ে ক্লীঁ কালিকায়ৈ নমঃ।
কুলাকুলাদিবিজ্ঞানে কালীনামতর্য়োমিতে॥"

উপন্যাসের প্রয়োজনে লেখক লাগাম টেনে ধরলেন আধ্যাত্মিকতার জগৎ থেকে পাঠক নেমে এলেন বাস্তবে। দেখা গেলো যে কথক অনুভব করছেন তখনও কোথায় কে যেন দুমদুম করে মাথা খুঁড়ছে আর অবিরাম আর্তনাদ করছে। নারী কণ্ঠের আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে।

অবধূতের সংযম এখানে লক্ষ্যণীয়। কোনো অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করেননি কিম্বা কোনো অশ্লীল প্রসঙ্গ আনেননি। কোনো অসামাজিক ঘটনার বর্ণনা ছাড়াই 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাস-এ আগমবাগীশের মত ধর্মধ্বজীর পরিচয় উদ্ঘাটিত হলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অবধূত জানালেন যে শেষ পর্যন্ত স্থানমাহাত্ম্য বজায় রইল। মুখ রক্ষা হল উদ্ধারণপুর ঘাটের। অবধূতের কঠোর বাস্তবাদী ভাষায় এলো আবারও ব্যঞ্জনা উপমার স্থান দখল করলো উপমান। সিঙ্গি গিন্নির উল্লেখ না করে তার জায়গায় সরাসরি বললেন 'কালনাগিনী'। যেন দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে মাথা তুললে এক কালনাগিনী। নিজের বিষে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরছে সে! তাই সে চায় শান্তি, চায় বিস্মৃতি, বিষে ডুবে থেকে বিষের জ্বালা ভুলতে চায় সে। উদ্ধারণপুরের নিসর্গকে মানুষের সহমর্মি করে তুলেছেন অবধূত। তার এই চাওয়ার সাথে সাথে হিন্দুর পারিবারিক বিবাহ সংস্কার ধ্বসে যাচ্ছে। তাই কল্পনা করা যায় যে থরথর কেঁপে উঠল উদ্ধারণপুরের আকাশ। কথক জানিয়েছেনঅ বিবাহিত জীবনে অপমানিত ও সম্পূর্ণ ব্যর্থ এই সিঙ্গি গিন্নি স্বেচ্ছায় গলা

বাড়িয়ে দিচ্ছে বলি হিসেবে। তাকে নিলে যদি আগমবাগীশের কাজ চলে তাহলে সেটাই তার ইচ্ছা। পূর্ণ হোক আগমবাগীশের পূজা, আর তারও জন্ম সার্থক হোক। ও হতভাগীও বাঁচুক তাঁর অভিসম্পাতের হাত থেকে। ও ফিরে যাক ওর ছেলেমেয়ের কাছে। আর আগমবাগীশের পূজার প্রসাদে ওর স্বামী নীরোগ হয়ে উঠুক-এই প্রার্থনা জানায় সে। এ চরিত্রে অপূর্ণ জীবন-বাসনা চরিতার্থ করার লোভ যেমন আছে তেমনি মানবিক গুণগুলিও বর্তমান।

ঔপন্যাসিক অবধূতের বৈশিষ্ট্য

চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক অবধূতের যে বৈশিষ্ট্য আমরা পেলাম তা এই রকম :

১. তন্ত্রসাধনায় বিশ্বাস-সূত্রেই সত্যের সন্ধান করেছেন শ্মশানভৈরব তথা অবধূত। এ উপন্যাসের কথক ধর্মধ্বজী আগমবাগীশের সাধনায় সঙ্গী হ'য়ে শেষপর্যন্ত জেনে ফেলেছেন যে আগমবাগীশ কামলোলুপ এক ভণ্ড। বলাবাহুল্য অবধূত এ উপন্যাসে সিঙ্গি গিন্নির মাধ্যমে একই সঙ্গে শক্তি-সাধনা ও বিকৃত কাম-তৃষ্ণার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এ উপন্যাসে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো অবধূত সত্যকে সমাজ ও সাধারণের সামনে প্রকাশ করেছেন কিন্তু বাহবা নেওয়ার কোনো চেষ্টা সেখানে লক্ষ করা যায় না। অতি অবলীলায় ঘটনাগুলি চোখের সামনে এনে দেওয়াতেই যেন তাঁর কাজ শেষ---এমন একটা নির্লিপ্তি আমরা লক্ষ করি। আত্মপ্রচারের কোনো ইচ্ছাই নেই।

২. আগমবাগীশের প্রতি স্বতোপ্রণোদিত কোনো বিরুদ্ধাচারণ নেই---সবকিছুই ঘটনাক্রমের ফলহিসেবে দেখেছেন।

৩. অবধূত এ উপন্যাসে অনেকটাই নিস্পৃহ। সাধনার কারসাজি কিম্বা কামনার পূরণ-কোনোটাই প্রমাণ করার চেষ্টামাত্র নেই---কেবল ঘটনা-ক্রমের পরিণতি হিসেবে উপন্যাসের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

৪. মনন-চিন্তন-সংযম-এই তিনটি মানবিক-সূত্রেই শ্মশানভৈরব সকলের শ্রদ্ধা আর নির্ভরতা অর্জন করেছেন।

৫. এই উপন্যাসে শ্রেণিগত অবস্থানে নয় মূল্যবোধের মানদণ্ডে মানুষকে যাচাই করার মানসিকতা ঔপন্যসিকের মধ্যে কার্যকরী।

৬. উপন্যাসে অনেকগুলি চরিত্র আছে। বেশকিছু চরিত্র বাইরের পরিচয়কে ভুল প্রমাণ করেছে। পোশাকী পরিচয়ের অন্তরালে স্বরূপে আবিষ্কার করার চোখ ও তাকে স্বাভাবিক পরিবেশে রূপ দেওয়ার দক্ষতা ঔপন্যাসিক অবধূতের মজ্জাগত।

ছয়. কলিতীর্থ কালীঘাট ও ঔপন্যাসিকের দক্ষতা

কলিতীর্থ কালীঘাটে মন্দির কেন্দ্রিক জীবনযাত্রার নানা অপরিচিত কত বিষয় আমাদের জানা

হয়ে যায়। কালীঘাট মন্দিরের সেবাইত ছিল কোনো কালে এখনও তারা পুরুষানুক্রমে বসবাস করছে সেখানে। তাদের জীবন ও পারিবারিক সমস্য-সংকট এখানে রূপ পেয়েছে। সাধারণ মানুষ এসব কখনো ভেবে দেখার কথা হয়তো মনেও করেনি। অবধূত সে-সব কথা আমাদের শুনিয়েছেন। কত ভক্তি নিয়ে লোকসাধারণ কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে যায় বা আগে আরো বেশী যেত কিন্তু তারা কোনো কালে যা ভাবতে পারেনি এমন খুঁটিনাটি স্বার্থপরতা মন্দির চত্ত্বরেই ঘটে চলেছে। প্রতিযোগিতা উত্তরসুরিদের মধ্যে। মন্দিরে ভগবতীর সেবার জন্য এক একটি পরিবারের দায়িত্ব পড়ে এক-এক দিন। সেদিন মন্দিরে যত ভক্ত সমাগম হবে ততই লাভ কেননা মানসিকের (মানতের) যাবতীয় অর্থ তারাই পাবে সেদিন সেই পরিবারের সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মন্দির প্রাঙ্গণে কেউই বাদ যায়না। একদিনের উপার্জনে চালাতে হবে সপ্তাহের বাকী দিনগুলো। মন্দির-নির্ভর পারিবারিক জীবনে পেটের দায়ে ধর্মস্থানে এই প্রতিযোগিতা চলে। সাধারণ পাঠকের কাছে তা হয়তো অসহনীয় মনে হয় কিন্তু এটাই বাস্তব।

মেয়েদের মধ্যেও চলে অন্যরকমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কে কতবার সতী সাজতে পেরেছে তাই নিয়ে করে অহংকার। সতী সেজে পয়সা নেওয়াটা বড়দের কাছে লজ্জা হলেও ছোটরা এর মধ্যে আত্ম-শ্লাঘা অনুভব করে। সেবাইতদের অর্থকষ্ট থাকলেও মায়ের সেবক হিসেবে বংশ গৌরবে স্ফীতবক্ষ হয়ে থাকা নিত্যকার অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই।

যৌবন সর্বত্রই দুঃসাশনীয় মন্দির-কেন্দ্রিক উপন্যাসেও ব্যত্যয় হয় না। যে মেয়ে কোনো দিন মিথ্যা বলেনি, সেই ফিনকিও মাকে লুকিয়ে দেখা করতে যায় সমবয়সী যুবক ধনার সঙ্গে। ভয়ও করে। পরক্ষণেই ভাবে কেনই বা সে ভয় পেতে যাবে ওর মতো সামান্য একটা বেকার ছেলেকে? তাই সোনার কার্তিকের ঘাটে একলা দেখা করতে যায় সমবয়সী এই যুবকের সঙ্গে।

নির্জন গলি পেরিয়ে নদীর ঘাটে একান্ত জনশূন্য এই জায়গায় তার বুক কেঁপে যায় তবু মুখে সাহস বজায় রেখে একটি মেয়ে কেমন করে অতিক্রম করে তার একান্ত ভয়ের মুহূর্তগুলি, তার অনুপম বর্ণনা আছে আলোচ্য উপন্যাসে। ফিনকির চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখক বিশ্বস্ত তা অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। কোথাও গল্প জমিয়ে তোলার চেষ্টা নেই অথচ গল্প এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে। লেখকের অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকলে এমন সাবলীল লেখা সম্ভব নয় একথা উপন্যাসটি পড়তে পড়তে স্বতঃই মনে হবে।

ভক্তদের কাছে নিজের পূর্বতন সুখ্যাতি বজায় রাখার মরিয়া চেষ্টা লক্ষ করার মতো। পীঠস্থানে তাঁর উপস্থিতিতে তাঁরই যজমানের নববধূর গলার হার চুরি যাবে এ কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি কংসারি হালদার। এখন তিনি বৃদ্ধ পূর্বকার সেই যৌবনের দিনগুলি তিনি তো ফিরিয়ে আনতে পারবেন না ! নইলে তাঁর বাড়ীর বউ ঝিদের দেখিয়ে দিতেন তাঁর ক্ষমতা!

কালীঘাটের মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে আসে পাশে গড়ে উঠেছে বস্তি। সেখানে সঙ্গত ভাবেই আস্তানা গেড়েছে চোর গুণ্ডা বদমাইশের দল। এদের মধ্যকার মানবত্ব ও পশুত্বকে জীবন্ত তুলে ধরার নৈপুণ্য তিনি দেখিছেন গভীর প্রত্যয় ও সংযমের সঙ্গে। কত যে বৈচিত্র তার চরিত্র সৃষ্টির পরিকল্পনায়! বোধহয় ব্যাপক ও গভীর জীবনাভিজ্ঞতাই এর মূল কারণ। মন্দির

প্রাঙ্গণে যেসব সাধু ফকির, ভিখারীর যত্র তত্র অবস্থান লক্ষ করা যায় তা রাত্রিবেলায় হালদার মশায়ের শেষরাত্রে রাস্তায় নামার আগে, মন্দির চত্বরে সাবধানে এগোনোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। পাছে কাউকে না মাড়িয়ে ফেলেন তাই এ সতর্কতা। উপন্যাসের ঘটনাক্রম এমন ভাবে তিনি বলতে পেরেছেন যাতে কেবল বলার উদ্দেশ্যেই যে বলা হয়নি তা বোঝা যায়। অত্যন্ত প্রভাবশালী সেবাইত ছিলেন কংসারি হালদার। উপন্যাসের নানা কাহিনির সাথে তাঁর যোগ অন্যান্য সেবাইতদের থেকে আলাদা। পারিবারিক জটিলতার ঘটনাক্রমে কংসারি হালদারের সাথে এক যজমানের বিধবা পত্নীর ভালোবাসা তৈরী হয়। পঞ্চাশোর্ধ্ব এই প্রেমের অব্যক্ত যন্ত্রণা কীভাবে সার্থকতার সন্ধান পেলো তা দেখিয়েছেন অবধূত। আলোচ্য উপন্যাসে কংসারি হালদারের পরিবার তথা পুত্র-পুত্রবধূরা তাঁর মনের ইচ্ছাকে কীভাবে স্বীকার করে নিল। কীভাবে ফিনকির বাবা বনমালী হালদার মূল্যবান নীলায় গড়া পারিবারিক অমূল্য কালীযন্ত্র ফিরে পেল , পরিবারের সাথে মিলল,আর ফিনকি-ধনার ভালোবাসা সার্থক হলো তা বিশ্লেষণ করলে লেখকের মিলনাত্মক কাহিনি রচনার ক্ষমতা যে কারো চেয়ে কম ছিল না তা স্বীকার করতেই হয়।

'অবধূত' বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন সতেরো বছর অজ্ঞাত জীবন (১৯৩৪-১৯৫১) কাটানোর পরে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই 'মরুতীর্থ হিংলাজ'। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পর লেখকের প্রতি পাঠকের উৎসাহ অনেক লেখকের কাছে ঈর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাঁর জীবনটাই একটা গল্প, সংসারী মানুষের কাছে তার অনেকটাই বিশ্বাসের সীমার বাইরে। স্বভাবতই 'বানিয়ে তোলা গল্প হয়েছে' মনে হত অনেকেরই। এর ফলে সাহিত্যের আসরে বহুদিন অবধূত ছিলেন ব্রাত্য। তাঁর 'মরুতীর্থ হিংলাজ' এর জনপ্রিয়তা মনে করিয়ে দেয় বিভূতিভূষণের 'পথেরপাঁচালী', প্রবোধকুমার সান্যাল-এর 'মহাপ্রস্থানের পথে' অন্নদাশংকরের 'পথে-প্রবাসে' প্রভৃতির কথা।

'মরুতীর্থ হিংলাজ' প্রকাশের পরে চারিদিক থেকে অভিনন্দন আর জয়ধ্বনি লাভ করেন অবধূত। বাংলা সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেন ঔপন্যাসিক অবধূত। প্রায় প্রত্যেক লেখকের জীবনে অসংখ্য ব্যর্থতা ও হতাশা থাকে অবধূতের জীবনে তা ঘটেনি। আরো আশ্চর্যের কথা এই যে বহু বিরুদ্ধ বাদীদের ভবিষ্যদ্বাণী উপেক্ষা করেই বাংলার পাঠক সমাজ তাঁদের প্রিয় লেখককে মনে রেখেছেন। 'অবধূত যখন তাঁর 'মরুতীর্থ' নিয়ে পূর্ণ সততার সাথে বাংলাসাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেন তখন উভয় বাংলার বাঙালী পাঠক মাত্রই যে বিস্মিত হয়েছিলেন সে-কথা সত্য। ভেবেছিলেন এ তো মরুতীর্থ নয়, এ যে রসে ভরা 'রসতীর্থ'।'- এ প্রসঙ্গে সমকালীন লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী জানিয়েছেন তাঁর বিশ্বাসের কথা।'আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, অবধূত-মহারাজ সাধু ব্যক্তি; সে সাধুতা তিনি লেখক হিসেবেও রক্ষা করেছেন এবং তাঁর পুস্তকে তিনি অতিরঞ্জন করেননি।' তাই বলে একে গাইডবুক বলা যাবে না। অবধূতের ঔপন্যাসিক সত্তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এ উপন্যাসে।

অবধূতের স্রষ্টা ব্যক্তিত্বকে বুঝতে হলে জানা দরকার ব্যক্তি চরিত্র আর স্রষ্টা চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। এই প্রসঙ্গে বলতে হবে যে পৃথিবীর হাস্যরসিকদের ভিতর'পরশুরামের স্থান অতি উচ্চে। অথচ ব্যক্তি জীবনে তিনি বড়ো গম্ভীর। অবধূত প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর কথা

বিশেষভাবে মনে পড়ে। 'হাস্যরস ঠাট্টা মস্করা দিয়ে তিনি মজলিস না জমিয়ে বরঞ্চ সুযোগ করে দিতেন আমাদের মত রামা-শ্যামাকে।' অর্থাৎ রসিক লেখক হয়েও আড্ডার আসরে বা সাধারণ জীবন যাত্রায় নিজে হাস্য রসিকতায় অংশগ্রহণ করতেন না। লেখার মধ্যে ব্যক্তিকে খোঁজা তাই অনেক সময় পণ্ডশ্রম হতে বাধ্য।

একটা কথা ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে যে অবধূত সমাজ সংস্কারক নন। সৈয়দ মুজতবা আলীর মতে, 'ডন কুইক্সটের মত নাঙ্গা তলওয়ার দিয়ে বেপরোয়া বায়ুযন্ত্র (উইন্ড-মিল) আক্রমণ করা তাঁর 'ধর্মে নেই লোকটি বড়ই শান্তিপ্রিয়। শুধু যেখানে বর্বর পশুবল অত্যাচার করতে আসে, এবং সে পশুবল ফক্কুড়িতেও সিদ্ধহস্ত সেখানে অবধূত, ফক্কুড়ির মুষ্টিযোগ ফক্কুড়ি ছাড়া নান্যপন্থা বিদ্যতে বিলক্ষণ জানেন বলেই সেটা বীভৎস রুদ্র রূপে দেখাতে জানেন। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, শীলের দিক। লেখক হিসেবে 'হীরো' রূপে তিনি কস্মিনকালেও আত্মপ্রকাশ করতে চাননি।' ---এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'উদ্ধারণ পুরের ঘাট'উপন্যাসে দারোগা প্রসঙ্গ। শ্মশানভৈরবকে কলঙ্কিত করতে এসে লম্পট দারোগা ভয়েই মূর্ছা যান। এ প্রসঙ্গে অবধূত অত্যন্ত সংযতবাক।

অবধূতের ঔপন্যাসিক সত্তার বিশ্লেষণে বলতে হয় স্রষ্টা অবধূত যেন পরশুরামের উল্টো। তাঁর লেখাতে ব্যঙ্গ আছে বিদ্রূপ আছে, ---যেন হাসতে হাসতে তিনি বুজরুকির মুখোশ একটার পর একটা ছিঁড়ে ফেলছেন সে প্রমাণ পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। তা যদি না হতো তবে বইটি রসকষহীন মরুই থেকে যেত। বড় জোর হত একটা গাইডবুক। গাইডবুক প্রয়োজনীয় হলেও তা সাহিত্য নয়। মরুতীর্থের আলোচনা এইজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে যদি অবধূতের এমন কয়েকটি রচনাকে খুঁজে বার করতে হয় যেখানে ব্যক্তি মানুষটিকে বুঝে নিতে সাহায্য করবে তবে তার একটি নিঃসন্দেহে 'মরুতীর্থ হিংলাজ'। যদিও এ প্রসঙ্গে 'আমার চোখে দেখা'[২৩] 'যা নয় তাই' প্রভৃতির কথাও আমাদের মনে পড়বে। আমরা বাঙালী পাঠকেরা স্বভাবতই ঘরমুখো। তার পরিচিতির জগৎও ছোট । অবধূত সে বিষয়ে ব্যতিক্রমী। বাঙালী তার প্রকৃতিকে গ্রন্থপাঠের ক্ষেত্রেও বর্জন করতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে'পালামৌ'-এর পরে 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। যিনি দীর্ঘকাল সন্ন্যাসী জনোচিত প্রতিনিয়ত স্থান পরিবর্তন করেছেন তাঁর রচনায় নানা স্থান ও নানা পরিবেশের উল্লেখ থাকবেই। আসবে নানা ধরনের মানুষ। তার ফলে লেখা পরোক্ষভাবে ডাইনামিক হয়ে যায়। এটা সৎগুণ কিন্তু এক মাত্র গুণ তো নয়ই, প্রধান গুণও নয়।

কেউ কেউ মনে করেন সন্ন্যাসীদের যে নানা পথচারী ব্যক্তির রূপ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই উপন্যাসে জায়গা পেয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায় আর্ট ও জীবন নিয়ে গ্যেটে বিস্তর আলোচনা করেছেন। সে আলোচনা দুরূহ এবং বর্তমান প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয়। তবে আর্টের মধ্যে জীবন অনুসন্ধান কোনো কোনো স্থলে আছে। কোনো স্থলে সেই সুবাদে তিনি বাস্তবতার অনুরোধে বিশেষ বিশেষ চরিত্রের রূপায়ণে বিকট বীভৎস রসের অবতারণা করেছেন কিন্তু অকারণে হাস্যরস অবতারণা করতে তাঁকে বড় একটা দেখা যায়না। অথচ অন্তরঙ্গ জনের মধ্যে অবধূতের অন্যরূপ।

সাক্ষাৎ দ্রষ্টার (সৈয়দ মুজতবা আলী) মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। ব্যক্তি অবধূত জমাটি আড্ডা দিতেন। সেখানে তিনি অভিনয় সহ যে বিশুদ্ধ হাস্যরস উপস্থিত করতেন তা কেবল তাঁর অন্তরঙ্গরাই জানেন। সে হাস্য রসের ধারা যেন পার্বত্য নির্ঝরিণীর মত চপল আপন বেগে সে লাফিয়ে চলে ঠেলতে হয় না। ছবির মত পরিষ্কার আর জীবন্ত---যেন চলচ্চিত্র!

তুলনা প্রসঙ্গে মনে পড়ে এই পরিপূর্ণ বিধিদত্ত দক্ষতা অতি বাল্যকাল থেকেই ছিল চেকভের। পাঠশালে যাবার সময় থেকেই তিনি বাপ-কাকা পাড়া-প্রতিবেশী সক্কলের অনুকরণ করে অভিনয় করতে পারতেন-কেউ কেউ খুশী হয়ে তাঁকে লেবেনচুস্ লাট্টুটা উপহার দিতেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। নিচের এই মন্তব্যে অবধূতের স্রষ্টা ব্যক্তিত্বকে চিনতে সহজ হবে।

"এই অভিনয় দক্ষতা আপন কলমে স্থানান্তরিত করতে পারলেই লেখকের 'সকলং হস্ত তলং'-লেখা তখনই হয় convincing; তার বিগলিতার্থ, অভিনয় করার সময় যে রকম প্রত্যেকের আপন আপন ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা অপরিহার্য, লেখার বেলাও তাই। এখানে কর্মটি কঠিনতর। কারণ এখানে অঙ্গভঙ্গী করতে পারবেন না, চোখের জল ফেলে দেখাতে পারবেন না। অর্থাৎ টকি সিনেমার কাজ গ্রামোফোন রেকর্ড দিয়ে সারতে হচ্ছে। আসলে তার চেয়েও কঠিন, কারণ, কন্ঠস্বর দিয়ে বহুৎ বেশী ভেল্কিবাজী দেখানো যায়। অনেকের অনেক রকম ভাষা---কেউবা স্ল্যাং ব্যবহার করে, কারো বা ইডিয়মে জোরদার, কেউ কথায় কথায় প্রবাদ ছাড়ে, কেউ বা বাল ভশ্চাযের মত সংস্কৃত-ঘ্যাঁষা ভাষা, কেউ কিঞ্চিৎ যাবনিক-এ সব-কটা করায়ত্ত না থাকলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথাবার্তা convincing ধরণে প্রকাশ করা যায় না। এ বাবদে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ : মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)।

'আলাল', হুতোম, 'পরশুরাম' পেরিয়ে এ যুগে দুজন লেখক উল্লেখযোগ্য অবধূত এবং গজেন্দ্র মিত্র। এঁদের নানা ব্যক্তি-পরিচয় সূত্রে কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আছে।

> "অবধূত জানেন খাস কলকাত্তাই-কিন্তু এ কলকাত্তাই হুতোমের কলকাত্তাই নয়, কারণ এর থেকে বহু আরবী-ফার্সী শব্দ উধাও হয়ে গিয়েছে, ইংরিজি ও হিন্দী শব্দ ঢুকেছে এবং অভাব অনটনের ভিন্ন জীবন প্যাটার্ণ নির্মিত হওয়ার ফলে এক নতুন ইডিয়ম সৃষ্ট হচ্ছে।"[৩২]

ঔপন্যাসিক সত্তার বিশ্লেষণের সুবিধার্থে বলতে পারি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবধূত অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। চরিত্র গুলির উপযোগী ভাষার সন্ধানে তিনি বিচিত্র মানুষের সাথে নিবিড় পরিচয়ের সূত্রকেই ব্যবহার করেছেন। এই জন্যই হুতোমী ভাষা কিম্বা গজেন্দ্র মিত্রের কলকাতার মেয়েলি ভাষার থেকে অবধ তের ভাষাভঙ্গি ভিন্ন।

> "গজেন্দ্র মিত্র জানেন কোলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ঘরোয়া মেয়েলী ভাষা। যতদিন সাধুভাষা চালু ছিল ততদিন এ দুটোর অল্পই কদর ছিল, কিন্তু চলতি ভাষা - সেও প্রধানত কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা---কলকে

পেয়ে আসর জমানোর সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর চাহিদা বাড়বেই।"[৩৩]

উদ্ধারণপুরের ঘাট।/কান্না হাসির হাট। হিন্দুর শ্মশানঘাট তাই ছত্রিশজাতির মহা সমন্বয় ক্ষেত্র। এ উপন্যাস প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে গবেষণার মূলকথা কোনোবিষয়সম্পর্কেনতুন চিন্তা, বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা। পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক আবিষ্কার করার নামও গবেষণা। 'তথ্যগত কোনো তুচ্ছ ভ্রম সংশোধনের জন্য ব্যক্তিগত সময় ও উদ্যমের অপচয়ও গবেষকের উদ্দেশ্য নয়।' যে কোনো গবেষণার সাফল্য নির্ভর করে গবেষকের মৌলিক অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও গূঢ় বিশ্লেষণী প্রতিভার ওপর। 'John Grote : Each new particular of knowledge is not an adition to, but a newly observed part of a previously conceived whole'

গবেষণার মাধ্যমে অন্যের দেওয়া তথ্যকে যাচাই করে নেওয়া এবং প্রকৃত সত্যকে তুলে আনা আমাদের কাজ। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে অযৌক্তিকতা, ভিত্তিহীন আত্মবিশ্বাস এবং যথার্থ শৃঙ্খলার অভাব গবেষককে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। অতএব সচেতন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গবেষককে গবেষণার কাজে একথা মনে রেখে অগ্রসর হতে হবে।

১. Robert Ross : 'Research is essentially an investigation, a recording, and an analysis of evidence for the purpose of gaining knowledge'
২. 'Research involves, specifically, an investigation into a particular matter of problem'
৩. গবেষণার মান নির্ভর করে গবেষকের কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। প্রতিটি নিদর্শন ও তথ্যকে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সকল তথ্যের প্রাসঙ্গিক প্রয়োগের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসে শ্মশান অভিজ্ঞতা রূপায়িত। জাত-পাতের বিভেদ তখনকার হিন্দু সমাজে অত্যন্ত বেশি ছিলো। কিন্তু মৃত ব্যক্তির মুখাগ্নি হয়ে যাবার পর আর জাতি-বিচারের দরকার করে না। তখন বামুনের মড়াও এদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্য বর্ণের কথা বলা বাহুল্য। মাসে যদি দু'তিনটে মড়া পোড়ানো কপালে জুটে যায় তাহলে কেঁধোদের সচল বচল থাকে সব দিকে। কিন্তু সব সময় তো আর সেরকম চলে না। হুগলী জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কেঁধোরা শব বহন করে উদ্ধারণপুরের শ্মশানে নিয়ে আসে। মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে পৌঁছে দেবার জন্যে মুর্শিদাবাদ-বীরভূমে একদল মানুষ 'কেঁধো' নামে পরিচিত হ'য়ে ওঠে। এদের জীবনযাত্রার সমস্যা ও বাস্তবতার কথা উপন্যাসে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটা কথা স্মরণ করতে পারি। যেমন, মড়া কাঁধে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে মাঠের পর মাঠ ভাঙতে থাকে কেধোঁরা। রান্না খাওয়ার সব কিছু তাদের সঙ্গে থাকে। পথে কোথায় থেমে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে তার জন্যে এক-একটা আম জাম বট পাকুড় গাছ ঠিক করাই আছে। ঘন্টা পাঁচ-ছয় সমানে চলে---সেই গাছতলায় পৌঁছে প্রথমে মড়াটাকে টাঙানো হবে সেই গাছের ডালে। নিচে রাখা চলবে না। নয়ত ওরা যখন ব্যস্ত থাকবে খাওয়া-দাওয়ায়---তখন শেয়াল-কুকুর টানাটানি করবে যে! গাছের ডালে মড়াটা টাঙিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে

আশপাশের খানা ডোবা পুকুরে ডুব দিয়ে এসে সকলে রান্নাবান্নায় লেগে যাবে সেই গাছতলাতেই। রান্নার আয়োজনের সাথে সাথে চলতে থাকবে মদ গাঁজার শ্রাদ্ধ। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর সেই গাছতলাতে পড়ে লম্বা বেহুঁশ ঘুম। ঘুম ভাঙলে তবেই মড়া নামিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা। এভাবে দশ দিনের পথ ভেঙেও মড়া আনে উদ্ধারণপুরের ঘাটে। কেঁধোদের জীবনে বিড়ম্বনার শেষ নেই। শব বহনের মধ্যে অনেক রকমের গড়বড়ও হয়। হয়ত বর্ষার সময় বিবেচনা করে কেঁধোরা মাঠের মধ্যে কোনোও নালায় ফেলে দিলে মড়াটাকে। দিয়ে যে যার কুটুমবাড়ি চলে গেল দূর গাঁয়ে। কাটিয়ে এল কটা দিন। ফিরে মৃতের আত্মীয়দের থেকে প্রাপ্যটা ষোল আনাই মিলে গেল সমস্যায় না পড়ে। শব বহনকারীদের জীবনে

> ''আরও নানা রকমের কাণ্ডও ঘটে। তবে সে সমস্ত ব্যাপার হামেশা ঘটে না। উপযুক্ত শাস্ত্র-সঙ্গত আধার পেলে শুরু হয় 'মড়া-খেলানো'। মড়া-খেলানো অতি কঠিন, গুহ্য ব্যাপার।যার তার কর্মও নয়। পাকা লোক দলে থাকলে তবে এ খেলা চলে।''[৩৪]

উপন্যাস পাঠে আমরা বিশ্বাস করি কেঁধোদের মধ্যে এইসব অভিজ্ঞতা ঘটে থাকে। কিন্তু এসমস্ত ব্যাপার বড় একটা হতে পায়না। সব মড়াই তো আর কেঁধোদের হাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় না। আত্মীয়স্বজন সঙ্গে থাকেই। তারপর বড় ঘরের বড় কাণ্ড। খাটে করে মড়া যাবে। সঙ্গে লোকজন-আত্মীয়স্বজন একপাল। যেন বিয়ের বরযাত্রী চলেছে। এ সমস্ত ব্যাপারে কেঁধোদের যদি ডাকা হয়ও, তবে তাদের পাওনা শুধু ঐ টাকা কটাই। এক ঢোঁক মদ বা এক বেলার ফলারও নয়।

ব্যঞ্জিত ভাষা প্রয়োগ

সেই বিখ্যাত উদ্ধারণপুরের শ্মশানে যে ঘাট দিয়ে ও দেশের বাপ-ঠাকুরদার ঠাকুরদারাও পার হয়ে চলে গেছেন ওপারে, সেই ঘাটেই তখন অবধূত সাধ করে বাসা বেঁধেছিলেন। তিনি ছিলেনও কয়েকটা বছর বড় নির্ঝঞ্ঝাটে। ছিলেন একেবারে রাজার হালে আর আমিরী চালে। উদ্ধারণ পুরের এই শ্মশান প্রসঙ্গে মনে পড়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে কথকের জবানীতে লেখক জানিয়েছেন :

> ''আমার বহুদিনের দৃঢ়-বিশ্বাস, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না; এবং যদি বা বাঁচে, যে শ্মশানে তাহার পার্থিব দেহটাকে অশেষ প্রকারে নিপীড়িত করা হয়, সেইখানেই ফিরিয়া নিজের মাথাটায় লাথি মারিয়া মারিয়া গড়াইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, উচিতও নয়---অন্তত আমার পক্ষে ত নয়। তবে কিনা, মানুষের রুচি ভিন্ন। যদিবা কাহারও হয়, তাহা হইলে এমন একটা চমৎকার রাত্রে রাত্রি-জাগিয়া আমার এতদূরে আসাটা নিষ্ফল হইবে না। অথচ এমনই একটা গুরুতর আশাই আজিকার প্রবীণ ব্যক্তিটি দিয়াছিলেন।''[৩৫]

একাকী শ্রীকান্তের শ্মশান গমনের এটাই ছিলো কারণ। এরপর শ্মশানে শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতা

এই ভাবেই বর্ণিত হয়েছিল। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস কতক গুলো ধূলা-বালি উড়িয়ে গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল; এবং সেটা শেষ না হতেই, আর একটা এবং আর একটা বয়ে গেল। মনে হলো, এ আবার কি? এখন ত বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। কথক শ্রীকান্তের অনুভব তাঁর ভাষাতেই একটু দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃত হলো :

> "যতই কেন না বুঝি এবং বুঝাই, মরণের পরেও যে কিছু-একটা অজানাগোছের থাকে -এ সংস্কার হাড়ে-মাসে জড়ানো। যতক্ষণ হাড়-মাস আছে ততক্ষণ সেও আছে-তাহাকে স্বীকার করি, আর না করি। সুতরাং এই দমকা হাওয়াটা শুধু ধূলা-বালিই উড়াইল না, আমার মজ্জাগত সেই গোপন সংস্কারে গিয়াও ঘা দিল। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। অনেকেই হয়ত জানে না যে মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেলা গোছের শব্দ হয়। দেখিতে দেখিতে আশেপাশে, সুমুখে, পিছনে দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কতলোক যেন আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া, অবিশ্রাম হা-হুতাশ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে; এবং ইংরেজীতে যাহাকে বলে uncanny feeling ঠিক সেই ধরনের একটা অস্বস্তি সমস্ত শরীরটাকে যেন গোটা-দুই ঝাঁকানি দিয়া গেল। ...মনে হইতে লাগিল, একটা জীবন্ত বাঘ-ভালুক দেখিতে পাইলেও বুঝি বাঁচিয়া যাই। হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলিল। তাহা এমনি শীতল যে তুষারকণার মত সেইখানেই জমিয়া উঠিল। ঘাড় না তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এ নিশ্বাস যে নাকের মস্ত ফুটটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, একফোঁটা রক্তের সংস্রব পর্যন্ত নাই---কেবল হাড় আর গহ্বর। সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে অন্ধকার। স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আশেপাশে হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগতই যেন হাতের কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল। কানের উপর তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা নিশ্বাসের বিরাম নাই। এইটাই সর্বাপেক্ষা আমাকে অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেতলোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা দিয়াই বহিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে।
>
> এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু একথাটা ভুলি নাই যে, কোনোমতেই আমার চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। তাহা হইলে মরণ অনিবার্য। দেখি, ডান পা-টা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে থামাইতে গেলাম, থামিল না। সে যেন আমার পা নয়।'[৩৬]

ঠিক এই সময় রতন এবং আরও তিনজন লোক (তবলা বাদক ছট্টুলাল, পিয়ারীর দরোয়ান, গ্রামের চৌকিদার) গোটা-দুই লণ্ঠন ও লাঠিসোঁটা হাতে না পৌঁছালে কী হত বলা যায় না।

ভাষাশিল্পী অবধূত

অবধূতের ঔপন্যাসিক সত্তাকে বোঝার জন্য চরিত্র ও ঘটনা সংস্থাপন ছাড়াও ভাষা ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব সহ বিচার করতে হবে। যা ঘটে তা সাহিত্য নয় উপস্থাপনের ওপরে সাহিত্যিক ধর্মের সার্থকতা নির্ভরশীল। এ কাজটির সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে ভাষার সার্থক ব্যবহারের। প্রসঙ্গত একটি নিসর্গ বর্ণনার কথা স্মরণে আসে:

> "শ্মশানে ঝিরঝিরে বাতাসে, গঙ্গার ঢেউয়ের কুল কুল ধ্বনিতে চিতার ওপর আগুনের আঁচে মানুষের মাথা ফাটবার ফট্ ফটাস আওয়াজে কোনো যায় সেই নিলামের ডাক। সপ্তগ্রামের বণিক-কুলপতি উদ্ধারণ দত্ত মশাই পাকা সওদাগর ছিলেন। নিক্তির তৌলে আজও জোর কারবার চলছে তাঁর ঘাটে। কড়াক্রান্তি এআর ওধার হবার জো নেই। যিনি নিলাম ডাকেন তাঁর কপালের ওপর আছে তিন তিনটে চোখ। কার সাধ্য রেহাই পাবে সেই চোখ তিনটিকে ফাঁকি দিয়ে।"[৩৭]

ঘটমান ক্রিয়ানুগ ভাষা

'ইয়া হামদা হামদা শিয়ালগুলো আধপোড়া মড়া নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে। দিনের আলোয় সকলের চোখের উপরেই তাদের খেয়ো খেয়ির বিরাম নেই। ওদের চক্ষুলজ্জা বলতে কোনো কিছুর বালাই নেই একেবারে। রক্ত-চক্ষু কেঁদো কেঁদো কুকুরগুলো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারিক্কি চালের মুরুব্বী সব, ছোট দিকে নজর যায় না।'[৩৮] ভাষার এই ব্যবহার শ্মশানের পরিবেশকে সজীব করে তুলেছে।

অতীতচারিতার রীতি

স্মৃতিভিত্তিক উপন্যাস তাই উদ্ধারণপুরের ঘাট উপন্যাসটি অতীতচারিতার রীতিতে লেখা। এই রীতি অনুসরণ করলে ঘটনার অনুক্রম নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতে হয় না। যেকোনো প্রসঙ্গে কাহিনি শুরু করা যায়। যেমন :

> "আজ বড় বেশি করে মনে পড়ে উদ্ধারণপুর শ্মশানের সেই জমজমাট দিন গুলিকে। প্রতি রাতে আমার সেই রাজসিক শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে হিসেব খতিয়ে দেখতাম, কি কি জমা পড়ল সেদিন আমার জমা-খরচের খাতার পাতায়। কম কিছু নয়, আক্ষেপ করতে হত না কোনোও দিন। তখন সারা দিনের উপার্জন---অমূল্য মণি-রত্নগুলি সাজিয়ে তুলে রাখতাম আমার মনের গহন কোণের মণিকোঠায়। একটি পরম পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসত বুক খালি করে।"[৩৯]

একজন ঔপন্যাসিক বাস্তব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেন সবার উপরে। অতীতচারিতার এই

রীতি পাঠকের বিশ্বাসকে সহজেই আকর্ষণ করে নেয়। শ্মশানভৈরব নিজের কথা বলার সূত্রে লেখার উপাদান সংগ্রহের বিষয়কে স্পষ্ট করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে যখন শ্মশানে থাকতেন তখন দিন ছিল অন্যরকম। শবদাহের পরে নিশ্চিন্ত আরামে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়তেন এবং তখন বুক-ভরা আশা জেগে থাকতো এই ভেবে যে ঘুম ভাঙলেই এমন একটি দিনকে পাবেন যা রঙে রসে যেমন টইটম্বুর, আলোয় আঁধারে তেমনি রহস্যময়। পরবর্তী কালে ভেবেছেন এমন একটি দিনকে বরণ করবার বুক ভরা আশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়া লেখকের পক্ষে কম ভাগ্যের কথা ছিলো না। ঔপন্যাসিকের পক্ষে সাদামাটা নিশ্চিন্ত জীবন অভিশাপ। অবধূতের ঔপন্যাসিক সত্তার বিশেষ পরিচয় মেলে অতীত জীবনের সঙ্গে বর্তমানের তুলনায়। ঔপন্যাসিকের লেখক সত্তার উন্মেষ ও জীবন দর্শন খুঁজে পাওয়া যায় আলোচ্য উপন্যাসের চতুর্থ-পঞ্চম পৃষ্ঠায় এই অংশে :

> ‘‘এখন রাত পোহায় আঁটখুড়ো দিনের মুখ দর্শন করে---অর্থাৎ হাড় অযাত্রা। এখনকার এই দিন গুলোর কাছে কোনো কিছু প্রত্যাশা করা বৃথা। জীবনের জোয়ালখানা কাঁধে নিয়ে টেনে বেড়াবার এতটুকু অর্থ আছে নাকি এখন ! বহুবার পড়া পুরানো-পুঁথির পাতা ওল্টানো। না আছে তাতে চমক, না আছে উত্তেজনার রোমাঞ্চ। বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা ভোগ। এর নাম বেঁচে থাকা নয়, শুধু টিঁকে থাকা। মরা ফুল যেমন গাছের ডালে শুকনো বোঁটা আঁকড়ে ঝুলতে থাকে।’
> ‘মনে পড়ে’, ‘করতে হত না’, ‘তুলে রাখতাম ’, ‘আসত’ ঘুমিয়ে পড়তাম’, -এইসব ক্রিয়াপদের ব্যবহারে বোঝা যায় অবধূত কথক হিসেবে অতীতের কথাই বলছেন।

এরপরেই আবার চলে আসছেন বর্তমানে : ‘এখন রাত পোহায়’, ‘এখনকার এই দিনগুলোর, এর নাম বেঁচে থাকা নয়’---এসব বাক্যের ভগ্নাংশ বুঝিয়ে দিচ্ছে লেখক অতীতের আবছা দিন থেকে সরে আসলেন বর্তমানে। সেখানে শববাহী ও শবের সঙ্গীদের কথঅবার্তার আশ্রয়ে ফুটে ওঠে শ্মশানের পরিবেশ। ‘বোম্‌ কালী শ্মশানওয়ালী, যাকে নিলি তাকে পায়ে ঠাঁই দিস মা।’ পালবাবুর শালাবাবু ভাগ্নে-বউ এর মৃত্যুতে বলেছিল এই কথাটি। এছাড়া বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে আগমবাগীশের প্রসঙ্গ। আগমবাগীশের পূর্ণাহুতি দেওয়ার পরদিন সকাল হল। আলোয় আলোয় ছেয়ে গেছে উদ্ধারণপুরের শ্মশান। আলো হাসি চলকে চলেছে গঙ্গার স্রোতে। শেয়াল শকুন কুকুর---সকলের মুখে ছোঁয়াচ লেগেছে সেই হাসির। চিতাগুলো তখনও ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। মাল সব সাবাড়। অর্থাৎ শব শবদাহ হয়ে গেছে। বাসি পচা পড়ে থাকে না উদ্ধারণপুর ঘাটে। প্রতিদিন টাটকা নিয়ে কারবার। যা ছিল- তা আর নেই। থাকে না থাকতে পারে না। লেখক জানাচ্ছেন যে নতুন হচ্ছে জীবন, বাসি পচা যা কিছু তা হচ্ছে মৃত্যু। তা নিয়ে মাথা ঘামানো, মন খারাপ করা, হায় হায় করাও মৃত্যু। উদ্ধারণপুরের শ্মশানে মৃত্যুর প্রবেশ নিষেধ। নতুন জীবনের জয়গান উঠছে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। ভাঁয়রোয় শেষ টান দিচ্ছে কে খুব কাছ থেকে। ‘উঠ উঠ নন্দকিশোর।’এখানে অবধূত জানালেন এক নতুন জীবনভাষ্য। শ্মশান উদ্ধারণপুরকে বললেন জীবনের হাট যেখানে মৃত্যুর প্রবেশ নিষেধ। দিনে ও রাতে

ভিন্ন রূপ আঁকা হলো শ্মশানের।

আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার

অবধূতের অবলম্বিত ভাষাকে তার বক্তব্য পরিবেশনার ক্ষেত্র থেকে আলাদা করা যায় না। যে শ্রেণির মানুষ তার শিক্ষা ও অবস্থানের সাথে সে ভাষা গভীল প্রাণ-সত্তায় অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসে সিঙ্গী মশায় তাঁর গুরু-কন্যাকে ভোগ করার পরে গর্ভবতী অবস্থায় হত্যা করেন। তার ঠিক দু'বছর পরের ঘটনা। ছুটকে বাগদীর দল নামালে তাদের কাঁধের বোঝা উদ্ধারণপুরের ঘাটে। বিকট দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি মুচড়ে উঠে দম বন্ধ হবার উপক্রম। কপালের ঘাম মুছে বাঁশখানা খুলে নিয়ে পুঁতে দিতে এলো ছুটকে গোঁসাইয়ের গদির দেওয়ালে।

"পেন্নেম হনু গো গোসাঁইবাবা। এক ঢোঁক প্যাসাদ দ্যান।'

বল্লাম---'আজ ওটা কি আনলিরে ছুটকে---দম আটকে এল যে! আজকাল শুয়োর পচা বইচিছ নাকি তোরা?'

> 'হেই-শুয়োর কি গো! ক্ষ্যামা দাও গো বাবাঠাকুর---ক্ষ্যামা দাও ও কথায়। ও যে আমাদের বলরামপুরের সিঙ্গীমশাই গো। তিনদিন ধরে পচেছেন ঘরে শুয়ে। কেউ চাইলে না ছুঁতে মড়া। শেষে বট্‌ঠায়রেণ বেইরে এসে আমার হাত দু'খানা জইড়ে ধরে কাঁনতে লাগলেন। সে কি কান্না গো গোসাঁই বাবা ---বললেন---'ছুটকে, পেটের সন্তান নেই আমার, তোকেই আজ থেকে ছেলে বলে মান্নু, কত্তার হাড় কখানা গঙ্গায় নিয়ে যাবিনে বাবা?"[৪০]
>
> রামহরির বউয়ের বড়ো প্রাণ কাঁদে তার ভবিষ্যৎ জামাইয়ের জন্যে। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে বয়ে নিয়ে এল আমাকে আমার গদির ওপর। শুনতে পেলাম রামহরির বউ বলছে---'মুয়ে আগুন মাগীর, আজ সকালে শাঁখা সিঁদুর খোয়ালি, আর রাতটা পোয়াতে তর সইল না তোর, এর মধ্যে নুড়ো জ্বেলে দিলি নিজের মুখে!"[৪১]

অবধূত এখানে বাস্তব ও ভাষা বিচারে জীবনধর্মী।আমরা এ উপন্যাসের পরিণতিতে সিঙ্গী গিন্নির পচে গলে যাওয়া সারা শরীরে যে ব্যাধি আর মস্তিষ্ক বিকৃতির যে পরিচয় পাই তাকে Poetic justice বলা যায়।

> "ভেলকিই খেলিয়ে দেয় পঙ্কা ডোম। সকলের সব ট্যাঁক খালি হয়ে সব রেস্ত গিয়ে ঢোকে পঙ্কার ট্যাঁকে। তাতে যায় আসে না কিছুই। তখন ডাক পড়ে পঙ্কার দিদিকে। পাঁচ বছরের উদলা মেয়ে সীতাকে নিয়ে এসে দাঁড়ায় সে। পরনে শুধু কস্তা পেড়ে পাতলা একখানি শাড়ি। তার আঁচলখানা বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে শক্ত করে বাঁধা থাকে কোমরে। মাজায় জড়ানো থাকে আধ বিঘত চওড়া রুপোর বিছা। সামনে উবু হয়ে বসে সে টাকা গুণে দেয়। যাকে দেয় সে চেয়ে থাকে। চেয়েই থাকে শুধু ওর দিকে। পাতলা শাড়িখানা

> কিছুই ঢাকতে পারেনি।মাংস শুধু মাংস---টাটকা তাজা জ্যান্ত মাংস অনেকটা বয়ে বেড়াচ্ছে পঙ্কেশ্বরের দিদি।"[৪২]

গাজন তলার ঝুমরি মেয়ে : অসুবিধা হচ্ছে গাজনতলার ঝুমরী মেয়েদের। আমার দেওয়া মাদুলি না পরলে ওদের গতর ঠিক থাকে না। অবধূতের ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো 'দেব' এই শব্দ কে 'দোব' বলা। যেমন, রামহরির বউ উঠে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে---'এবার ক্ষ্যামা দাও জামাই।' কি রকম যেন কাকুতি ফুটে উঠল ওর গলায়। হাঁ---ক্ষ্যামাই দোব এবার। এই পাত্রটিকে শেষ করে---এই রাতের মত ক্ষ্যামা দোব।"[৪৩]

মড়ার মিছিল

উপন্যাসে একাধিক শবদাহন বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় মড়াটি এসেছিল বনকদমপুর থেকে। কুমার বাহাদুরের বুড়ি ঠাকুরমার গঙ্গালাভ হল মাঘ মাসে। নিরাসক্ত মনের পরিচয় ফুটে ওঠে এ বর্ণনায় : 'আধহাত চওড়া হাতের কাজ করা কাশ্মীরী শালখানা এসে চড়ল শ্মশানভৈরবের গদির ওপর। দিন কতক ঝুলতে লাগল তাঁর গদির দু-পাশে সেই অপূর্ব কারুকার্য করা পশমী শালের পাড়। তার ওপর শুয়ে শরীর মন মেজাজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে। তারপর কয়েকটা দিন কাটতে না কাটতেই এসে গেলেন গোঁসাই পাড়ার সপ্ততীর্থ ঠাকুর মশাই।' তাঁর শিষ্য-ভক্তরা প্রভুকে একখানা নতুন মটকা চাদর চাপা দিয়ে নিয়ে এল। শ্মশানভৈরব দিলেন চাপিয়ে সেই মোলায়েম মটকাখানা আগের দিনের কাশ্মীরী শালের ওপর। এই ভাবে শাল নিচে যেতে শুরু করলে। মটকার ওপর শুয়ে মন মেজাজ বেশ মোলায়েম হয়ে আসছে তাঁর ---এমন সময় এলেন পালবাবুদের বড় বৌমা। এটি ৪র্থ মড়া ইনি এলেন :

> "একখানি রক্তবর্ণ বেনারসী পরে। তা বলে বেনারসী পরে চিতায় ওঠা যায় না। বেনারসী ছাড়িয়ে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নতুন লালপাড় শাড়ি পরিয়ে সিন্দুরে চন্দনে আলতায় সাজিয়ে যখন তাঁকে চিতায় তোলা হল, তখন সেই বেনারসীও এসে গেছে গদির ওপর।"[৪৪]

চরিত্র বৈচিত্র্য : লিঙ্গ-শ্রেণি-বর্ণময়

পালবাবুর খোদ শালাবাবু আস্ত পূর্ণাভিসিক্ত তৌল। তাঁকে আমরা দেখতে পাই ভাগ্নে-বউ মারা গেলে এসেছেন, 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এ। সেখানে শ্মশান-ভৈরব-এর সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর সম্পর্কে যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে সে চরিত্রটির নেশাসক্তি দৈবভীতি -আত্মীয়তা সবকিছুই যেন পাঠক নিজের মত করে বুঝে নিতে পারে। অবধূতের ঔপন্যাসিক সত্তার সার্থক পরিচয় মেলে এ প্রসঙ্গে।

ব্যক্তিসত্তার আরোপ

হতভাগা শকুনগুলোই ছিল নেহাত ছোটলোক। কোথাও কিছু নেই আরম্ভ হল মড়া কান্না। টেনে টেনে নাকি সুরে করুণ বিলাপ। একজন যদি আরম্ভ করলে তা আর রক্ষে নেই। যে যেখানে আছে তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুর তুলবে। ওপারে তালগাছের মাথায় চড়ে বসে আছে যারা -তারাও সাড়া দেবে। সহজে সেই অশ্রাব্য গীত কিছুতেই থামবে না। এরকম বাস্তবোচিত বর্ণনার জোগান দিয়েছেন অবধূত। আমরা শ্মশানের নির্জীব পরিমণ্ডলকে পেয়ে যাই ঔপন্যাসিকের দক্ষ বর্ণনায়।

> 'মাঝে মাঝে মহাস্ফূর্তিতে আমার প্রজাবৃন্দ 'জয় জয়'করে উঠত। হঠাৎ আরম্ভ হল শ্মশানের ভেতর থেকে---ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া হুক্কা হুয়া -হুয়া হুয়া। গঙ্গার ওপার থেকে ওপারের ওরা সাড়া দিলে। তারপর চারিদিক থেকে সমবেত কণ্ঠে আরম্ভ হল -হুয়া-হুয়া-হুয়া-হুয়া। শেষে রেল লাইনের ওধারে বহুদূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল হুয়া-হুয়া-হুয়া-হুয়া।'[৪৫]

সিঙ্গী গিন্নি : গরল সাগরে সাঁতার

নারীর আশ্রয় ভাঙলে সে ভেসে যায়। বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা যে বিবাহ সংস্কারে লালিত হয় তাকে সহজে ত্যাগ করতে পারে না। সিঙ্গি গিন্নিও পারতেন না। কিন্তু তাকে পারতে হলো। তিনি বড়ো ঘরের মেয়ে আর বড়ো ঘরের বউ বলেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করে ভেসে গেলেন। লেখক তাঁর চরিত্রের মধ্যে অল্প কথায় যে রূপান্তর ও পরিণতি দেখিয়েছেন তা লেখকের ঔপন্যাসিক দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। নারীর বিবাহোত্তর জীবনের পরিচয় স্বামীর পরিবারের সঙ্গে একাকার হয়ে। তাকে পারিবারিক প্রধানের বিপরীতে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। এখনও অনেকে 'স্ত্রী' না বলে বলেন'আমার পরিবার'---অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা পরিবার-সর্বস্ব তাঁরা গৃহলক্ষ্মী রূপেও সম্বোধিত হন। এসব সত্ত্বেও স্বামীদের কাছে তাঁরা যে অবজ্ঞা ও অত্যাচারের শিকার হন তার সবিশেষ পরিচয় ফুটে উঠেছে 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসটিতে।

সিঙ্গীমশায়ের বহু বিবাহের পিছনে যাই থাক সিঙ্গী গিন্নি বুঝেছেন কামলোলুপতাই ---এখানে শেষ কথা। তার স্বামীর লালসার শেষ শিকার আপন গুরু কন্যা। বাইরের সামাজিক পরিচয়ের ভদ্রস্থ মুখোশের আড়ালে বেরিয়ে এসেছে প্রকৃত সত্য। গ্রামীণ পরিবেশে বহুদূর পর্যন্ত মানুষ মানুষের পরিচিত সে পরিচয়ের জোরটা অস্বীকার করা যায় না। বিবাহ-সম্বন্ধ থেকে শুরু করে সেই পরিচয়ের জোরে সামাজিক সম্মান ও অসম্মান অনেকখানি নির্ভর করে। সামাজিক জীবনে সে সম্মান লাভের লোভের কাছে আত্মজীবনও উপেক্ষিত হয় অনেক সময়। সিঙ্গী গিন্নি তাই নাম নয়,পারিবারিক পরিচয় ব্যক্তি -নাম চাপা পড়ে গেছে পারিবারিক পরিচয়ের আড়ালে। তিনি সিঙ্গি পরিবারের বধূ। সেই সম্মানটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

পাতিব্রত্যের সংস্কার শুধু মেয়েদের ভোলায় না পুরুষের মনেও সেসব নারীর জন্যে সম্ভ্রমের জায়গা তৈরী করে। চরিত্রহীন মহাপাপী সিঙ্গী মশায়ের পচা গলা শরীরের থেকে পোকা বার করার সময় সেই মেয়েটিকে আমরা পাঠকেরা সাধুবাদ জানাই; তার বোকামোকে নিন্দা করি না। অবোধ সরলতার প্রতি আমাদের করুণা হয় না কোথায় যেন তার এই সেবার আদর্শে আমাদের ব্যভিচার-জীর্ণ সমাজদেহের কলুষ-জর্জর পুরুষের প্রতি সহানুভূতি জাগায়। একে সর্বাত্মক ক্ষমার আদর্শ বলতে মন রাজী হয় না। মনে হয় কেবল চির অভ্যস্ত আত্মত্যাগে নারী শেষ হয়ে যাক আমরা তার মধ্যেই আদর্শ খুঁজি। নারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেও আমরা তাকে নিন্দা করতে ছাড়ি না।

যে সমাজে 'নারী' আর 'পুরুষ'---উভয়কেই মানুষ ভাবা হয় সেখানে নারীর নিজের মত করে বাঁচবার চেষ্টা নারী যখন করে তখন তাতে কারো আপত্তি থাকে না। অবধূত হিন্দু সমাজ-সংসারের ফাঁক ও ফাঁকির জায়গাকে দেখাতে দ্বিধা করেননি। তাঁর খোলা চোখে কোনো দায়ের পটি বাঁধা ছিল না বলেই তিনি সিঙ্গী গিন্নির ভেতরটাকে একজন মানুষের মত করে উপলব্ধি করলেন। সামাজিক দায়ের বাইরে বেরিয়ে এসেও যে একজন লেখক নিজের কাছে সৎ থাকতে পারেন তা আমরা দেখলাম। নৈতিকতার দোহাই পেড়ে মানুষের চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি অনেক সময় দেখানো হয়না আদর্শায়িত পথে ঘটনাক্রমকে নিয়ে যাওয়া উপন্যাস-জগতে একঘেঁয়ে হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক অবধূতকে সে দলে ফেলা যাবে না কিছুতেই--ঔপন্যাসিক অবধূত এখানেই সার্থক। উদ্ধারণপুরের আকাশ। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসে অবধূত যেন গদ্য কবিতা লিখেছেন :

> "গঙ্গার ওপারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটি মেয়ে। কপালে শুকতারার টিপ আঁকা, স্বচ্ছ কুহেলী ওড়নায় তনুখানি ঢাকা, বনহরিণীর চকিত চাহনি চোখে নিশার অভিসারিণী। ঊষা। অনিরুদ্ধ আনন্দের মূর্তিমতী প্রাণশক্তি। ঘুমভাঙানি গান শুনিয়ে ঝরা শিউলীর ওপর দিয়ে লঘু চরণে পালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাল কেটে গেল গানের, চরণে চরণ জড়িয়ে গেল, থমকে দাঁড়িয়ে ঘোমটার ভেতর থেকে চোখ মেলে চেয়ে রইল গঙ্গার এপারে।"[৪৬]

গোত্র নির্ণয়ের মাপকাঠি

'উপন্যাস কাকে বলে'---এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয় কিন্তু নানা ধরনের উপন্যাস যে আছে এ বিষয়ে কারো সন্দেহ মাত্র নেই। ঘটনাপ্রধান বা চরিত্রপ্রধান উপন্যাস যে যাই হোক না, গোত্র নির্ণয়ে কোনো কোনো উপন্যাসে ভাষা অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যঞ্জনাময় ভাষার প্রয়োগে 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসে যেন কাব্যধর্মিতা আর চেতনা প্রবাহ রীতি মিশে গেছে। আগমবাগীশের তথাকথিত হোমযজ্ঞ প্রসঙ্গে শ্মশানভৈরবের বাস্তবচেতনা আর আধ্যাত্মিক চেতনার দ্বন্দ্ব এখানে চমৎকার ফুটেছে। পরিবেশগতভাবে সিঙ্গি গিন্নির প্রতি আগমবাগীশের অচরণ গোঁসাইবাবা তথা কথক শ্মশানভৈরবের দ্বন্দ্বের কারণটি সুস্পষ্ট করে। আগমবাগীশের

শক্তিসাধনার মধ্যে ভণ্ডামো নাকি গুঢ় শাস্ত্রীয় নির্দেশনা কাজ করছে---সেই দ্বিধাই শ্মশান ভৈরবকে বিচলিত করেছে। নিজেকে তাই বিশ্বাসে অটল রাখতে নিম্নোক্ত ভাবনাকে গভীর চেষ্টায় আশ্রয় করেছেন :

> ‘‘ক্ষীরোদসাগরের নিস্তরঙ্গতা কিছুতেই বিক্ষুব্ধ হয় না। কোনো কিছুতেই পদসেবায় ছেদ পড়ে না মহালক্ষ্মীর। বিষে বিষে নীল হয়ে গেল বিশ্বচরাচর। মহাবিষ্ণু কিন্তু ঘুমে অচেতন। রামহরির বউ বললে ‘চল আমরা ঘরকে চলে যাই বউ। ঠাকুরের ধাষ্টামো আর সহ্যি হয় না।’ এরমধ্যে অর্ধচেতনায় গোঁসাই শুনতে পাচ্ছেন যে রামহরির বউ কাকে বললে---‘এখানে গোসাঁইয়ের কাছে বসে থাক গো ঠাক্‌রুণ। রাত পোহালে গোসাঁই তোমার ব্যবস্থা করবে’খন।’’[৪৭]

আগমবাগীশের অনুষ্ঠানে আর একটি প্রাণীও উপস্থিত রইল না, তাঁর তথাকথিত নবলব্ধ শক্তি অর্থাৎ সিঙ্গি গিন্নি ছাড়া। চিতা ছেড়ে উঠে গিয়ে যারা দাঁড়িয়েছিল অনুষ্ঠান দেখতে, মনে হলো তারা ফিরে গেল তাদের জ্বলন্ত চিতার ওপর। এরা যেন সকলেই বিরক্ত। থাক, যেমন আছে তেমনিই থাক ওদের অশোধিত চব্বিশ তত্ত্ব। আর কোনোও আক্ষেপ নেই ওদের মনে। মহাশান্তিতে চিতায় শুয়ে পুড়তে লাগল সকলে। এক্ষেত্রে বুজরুকিবাজ আগমবাগীশের প্রতি নীরব ঘৃণা শানিত হয়ে উঠেছে ঔপন্যাসিকের রূপদক্ষ কলমে।

ঔপন্যাসিক অবধূত ও Poetic Justice

আজকের এই জায়গাটি তে একদিনে আসেননি সিঙ্গী গিন্নি লেখক তার চরিত্র পরিণতির পর্যায়কে দেখাতে ভোলেন নি। বিষয়টি এ প্রসঙ্গে একবার স্মরণ করা দরকার। গুরুদেবের দেহান্তর ঘটলে সিঙ্গীমশাই গুরু কন্যাকে দিনের পর দিন ভোগের পর গর্ভাবস্থায় হত্যা করেন। তাতেও রেহাই পেয়েছিলেন। খোল কত্তাল বাজিয়ে ঘটা করে গঙ্গায় দিতে এনেছিলেন তিনি তাঁর বিধবা গুরুকন্যাকে। অবশেষে ধরা পড়েন। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছিল। ফলে বেশ কিছু জরিমানা হয়েছিল। এর কারণ ছিল আত্মীয় বিরোধ। সিঙ্গীমশাই-এর পরিচয় নেওয়া দরকার। ইনি জ্ঞানী লোক। এঁরা ধনে মানে লোকমান্য। তিনমহলা সিঙ্গী বাড়ি আছে বলরামপুরে, বাড়িতে সিংহবাহিনীর নিত্য সেবা হয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর গুরুদেবকেও সপরিবারে নিজের বাড়িতে বাস করিয়ে সেবা চালিয়ে ছিলেন সিঙ্গী মশায়। গুরু দেহ-রক্ষা করলেন, তার পরেও গুরুপত্নী আর বিধবা গুরুকন্যা রয়ে গেলেন তাঁর আশ্রয়ে। কোথায় ফেলবেন অসহায়া বিধবা দুটিকে সিঙ্গীমশায়? তাঁদের রক্ষা করাও ত তাঁর ধর্ম বটে। সাধারণ মানুষ এভাবেই বুঝতেন। এই ব্যবস্থায় বাইরের সমাজে সিঙ্গি মশায়ের মান বাড়লো। দুটি বিধবার গোপন মিলনের অভ্যস্ত ছিদ্রপথে ধ্বংসের বীজ মুকুলিত হলো।

ধর্মরক্ষা হল তবে শেষ রক্ষাটুকু হল না। এর পরের টুকু ইতিহাস। লোকলজ্জার হাত থেকে সিঙ্গী পরিবারকে বাঁচাবার দায়ে ভ্রূণ সহ গুরুকন্যাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করলেন। তারপর উদ্ধারণপুরের ঘাটে বহু আড়ম্বরে পুড়িয়ে শেষ করার চক্রান্ত। কিন্তু শেষপর্যন্ত সবকিছু ফাঁস

হয়ে গেল। ঘটনার উপস্থাপনকৌশলে যেন নাট্যরস সঞ্চারিত হয়েছে।

চিতায় আগুন দেবার পরমুহূর্তেই তাঁর জ্ঞাতি ভব সিঙ্গী পুলিসের দারগাকে সঙ্গে নিয়ে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়লেন শ্মশানে। পুলিস চিতার ওপর থেকে টান মেরে নামিয়ে নিলে শব। পাঁচ মাস গর্ভবতী ছিল মেয়েটি আর তার নরম তুলতুলে গলায় ছিল দাগ---বাঁশ দিয়ে নিষ্পেষণ করার স্পষ্ট দাগ ছিল তার গলায়। নতুন গরদের থান পরিয়ে, অজস্র শ্বেতপদ্মে ঢেকে, ধুপ চন্দন কাঠের গন্ধে চারিদিক মাত করে, খই-কড়ি-পয়সা ছড়াতে ছড়াতে, নাম সংকীর্তনের দল সঙ্গে নিয়ে, ঠিক যেভাবে গুরুকন্যাকে গঙ্গায় দিতে নিয়ে আসা উচিত, সেই ভাবেই এনেছিলেন সিঙ্গীমশায়। কোনোও দিকে এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় সে দিকে ছিল তাঁর কড়া নজর। কিন্তু তিনটে চোখ যে রয়েছে উদ্ধারণপুরের নিলামদ্বারের কপালের ওপর। কাজেই সব চাল গেল ভেস্তে। চাটাই জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবেই তারা সদরে সিঙ্গীমশায়ের অতসাধের গুরুকন্যাকে। সেখানে হবে চেরা-ফাড়া। তারপর---তারপর ভয়ানক চড়া ডাক দিলেন সিঙ্গীমশায়। যার ফলে তাঁর তিনখানা চারহাজারি মহাল হাতছাড়া হয়ে গেল উদ্ধারণপুরের নিলামদ্বার হল পরাভূত। কিন্তু গুরুকন্যা আর উঠল না চিতায়। গোলমাল চুকে গেলে কারও আর মনেই পড়ল না তার কথা। পড়ে রইল গুরুকন্যা উদ্ধারণপুরের ঘাটে, নরম সাদা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল শেয়াল-শকুনে। পেটটা ঠোট দিয়ে ফেড়ে ভেতরের পাঁচ মাসের ভ্রূণটাকেও তারা রেহাই দিলে না। উপন্যাসের বীভৎস রসের এমন সার্থক প্রয়োগ আগে দেখা যায়নি। জীবনের ন্যায় অন্যায় এই পৃথিবীর মাটিতে পুরস্কৃত-তিরস্কৃত হয়ে থাকে। সিঙ্গি মশায়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ঠিক দু-বছর পরে ছুটকে বাগদীর দল নামালে তাদের কাঁধের বোঝা উদ্ধারণপুরের ঘাটে। এই বোঝা মৃত সিঙ্গী মশায়ের গলিত শব। বিকট দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি মুচড়ে উঠে দম বন্ধ হবার উপক্রম। কপালের ঘাম মুছে বাঁশখানা খুলে নিয়ে পুঁতে দিতে এলো ছুটকে শ্মশানভৈরবের গদির দেওয়ালে। এই বর্ণনা উপন্যাসের বাস্তব পটভূমিকে তুলে ধরেছে। নাটকের যবনিকা উঠে গেলে যেমন দর্শক দেখতে পায় এখানেও তেমনি এসেছে সংলাপ-নির্মিত চিত্র:

'পেন্নেম হনু গো গোসাঁইবাবা। এক ঢোঁক প্যাসাদ দ্যান।' বল্লাম---' আজ ওটা কি আনলিরে ছুটকে---দম আটকে এল যে! আজকাল শুয়োর পচা বইছিস নাকি তোরা?' 'হেই-শুয়োর কি গো! ক্ষ্যামা দাও গো বাবাঠাকুর---ক্ষ্যামা দাও ও কথায়। ও যে আমাদের বলরামপুরের সিঙ্গীমশাই গো। তিনদিন ধরে পচেছেন ঘরে শুয়ে। কেউ চাইলে না ছুঁতে মড়া। শেষে বট্‌ঠায়রেণ বেইরে এসে আমার হাত দু-খানা জইড়ে ধরে কাঁনতে লাগলেন। সে কি কান্না গো গোসাঁই বাবা বললেন---'ছুটকে, পেটের সন্তান নেই আমার, তোকেই আজ থেকে ছেলে বলে মান্নু, কত্তার হাড় কখানা গঙ্গায় নিয়ে যাবিনে বাবা?'-- কী নিদারুণ অসহায়তা। সিঙ্গী গিন্নিও তাঁর স্বামীর কৃত পাপের ফল ভোগ করছেন। অতিনাটকীয়তা নেই আছে বাস্তবোচিত নাট্যরস। ঘটনাক্রম খুব স্বাভাবিক গতিতে এগিয়েছে বলে সহজ সরল জীবন প্রবাহের গাদ্যিক রূপ হতে পেরেছে---এ উপন্যাস। এখানকার সংলাপ আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে অত্যন্ত সজীব :

"সে কান্না দেখে আর থাকতে পান্নু না গো। মাল কাঁধে তুলে এই সাত কোশ মাটি এক ছুটে পার হয়ে এনু আমরা। নামাবার কি জো আছে কোথাও---এমন বাস বেরুচ্ছেন যে গগনের শকুন টেনে নামিয়ে ফেলবে।' ---ঔপন্যাসিক সফলভাবে জানিয়েছেন এই মড়া এসেছে সাত ক্রোশ দূর থেকে। শকুনের কথা বলায় সিঙ্গি মশায়ের প্রতি অশ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছে। সিঙ্গিমশায়ের সাধ্বী স্ত্রী পাগলের মত মাথা খুঁড়তে লাগলেন, 'বলে দাও---ওগো বলে দাও কেউ আমায়---কী করলে ওর প্রায়শ্চিত্ত করানো যায়।"[৪৮]

জানা নেই কারও প্রায়শ্চিত্তের বিধান। গুরুকন্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে তার গলায় বাঁশ দিয়ে ডলে মেরে ফেললে কী জাতের প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন, তার বিধান হয়ত এখনও কোনোও পণ্ডিত লিখে উঠতে পারেন নি কোনোও পুঁথিতে। পুরো দু-বছর বিছানায় শুয়ে যে প্রায়শ্চিত্ত চালাচ্ছিলেন সিঙ্গীমশায় তার ওপরেও আরও কিছু করবার আছে কিনা তাই জানবার জন্য তিনি সদাসর্বক্ষণ আকুলিবিকুলি করতেন। কিন্তু কেউ জানে না, কেউ বিধান বলে দিতে পারেনি তাঁকে।

হয়ত জানতে পারেন আমাদের সিধু ঠাকুর। তাঁকেই ডাকা হল। তিনি এসে দান করলেন প্রায়শ্চিত্তের শাস্ত্রীয় বিধান। একটি সবৎসা গাভী দান করতে হবে। সেই গাভীর ভাত খাবার জন্যে থালা গেলাস বাটি চাই। তাছাড়া গাভীর শয্যা বস্ত্র পাদুকা ছত্র সবই প্রয়োজন। মন্ত্র পড়ালেন সিধু কবরেজ সিঙ্গী গিন্নির হাতে তিল তুলসী গঙ্গাজল দিয়ে---'ইদং সালঙ্কারা সবৎসা ও সবস্ত্রা শয্যা পাদুকা ছত্র ভোজ্য গামছা সহিতং গাভীমূল্যং ব্রাহ্মণাহং দদামি।' তারপর স্বামীর জন্যে মস্তক মুণ্ডন করলেন সিঙ্গী গিন্নি, পঞ্চগব্য পান করলেন। কিন্তু চিতায় উঠল না সিঙ্গীমশায়ের পচা দেহখানি, গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হল। গোটাকতক কলাগাছ নিয়ে এল পঙ্কা। সেগুলো একসঙ্গে বেঁধে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল সিঙ্গী মশায়কে। গাভীর মূল্য আর বস্ত্র পাদুকা ছত্র শয্যা দক্ষিণা ইত্যাদি বাবদ মাত্র বিয়াল্লিশটি টাকা গ্রহণ করলেন সিধু কবরেজ। রাম হরি অবশ্য সম্পূর্ণ চিতার খরচই পেলে। জলে ভাসিয়ে দিলেও চিতার খরচ দিতে হয়। ওরা চারজন---নবাই গোক্‌লো ভূষণো আর ছুটকে। একটা আস্ত বোতল এগিয়ে দিলেন শ্মশানভৈরব। ওরা খায় পচুই আর এ হচ্ছে পাকী মাল। এক এক ঘটি জলের সঙ্গে খানিকটা করে মিশিয়ে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় ঢালতে লাগল। ---কায়িক পরিশ্রমীরা কেমন হয় তাদের নাম ও স্বভাবসুদ্ধ ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। অন্যদিকে সিঙ্গী পরিবারের আভিজাত্যের কথা মনে রেখে সিঙ্গী গিন্নি যে গোশকটে আসছেন তা জানাতে ভোলেননি লেখক। জানা গেলো তিনি এলে সিঙ্গি মশায়ের শব চিতেয় উঠবে। শ্মশানভৈরব তাই বললেন : 'তবে এখন সরিয়ে রেখে আয় ওটাকে। ওই উত্তর দিকের জাম গাছের ডালে লটকে রেখে আয়। দক্ষিণে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে গন্ধ। নয়ত টেঁকা যাবে না যে এখানে।' এই প্রসঙ্গে অবধূতের ঔপন্যাসিক বাকসংযম লক্ষ করার মতো। সিঙ্গি মশায়ের পাপের শাস্তি দিতে তিনি ব্যাকুলতার যেমন প্রকাশ ঘটাননি তেমনি পচে গলে মানুষের কাছে ঘৃণ্য হয়ে উঠেছেন এ বিষয়টিও জানাতেও

ভোলেননি।

নিতাই বোষ্টমী

বিস্তীর্ণ চারণভূমি ছিল নিতাইয়ের। জমিদার বাড়ির অন্দরমহল থেকে ধরম কলুর কুঁড়ে পর্যন্ত সর্বত্র ছিল তার অবারিত দ্বার। তার ভক্তসংখ্যা যে কত তা সে নিজেও বলতে পারত না। মুকুন্দপুর মালিপাড়ার কুমার বাহাদুর আর রামহরি ডোমের ছোট শালা-পঙ্কেশ্বর---সবাই তার চোখের ইশারায় সাপের মাথার মণি আনতে ছুটে যেত। আস্ত পূর্ণাভিষিক্ত কৌল পালবাবুর খোদ শালাবাবু আর বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষালের ছ-বারের পুঁচকে বউ বোষ্টমীকে দুটো মনের কথা কোনোবার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতেন। নিতাইয়ের ডবল লম্বা খন্তা ঘোষ ডাকত তাকে ছোড়দি বলে।

জয়দেব ঘোষাল

'উদ্ধারণ পুরের ঘাট' উপন্যাসে বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষাল এসেছেন শ্মশান 'উদ্ধারণপুরে' ---তাঁর পঞ্চম বারের মৃতা সহধর্মিণীকে নিয়ে। ইনি একজন কুলীন ব্রাহ্মণ। দৃশ্যটি এই রকম : 'জয়দেব তখনও উপর মুখ ঘষছে আর জড়িয়ে জড়িয়ে কাতরাচ্ছে-'হেই বাবা, তুমিই সাক্ষাৎ ভৈরব গো, জ্যান্ত কালভৈরব তুমি কিপা কর বাবা---এই অধম সন্তানের ওপর একটু কিপার চোখে চাও। তখন কী বলবেন তিনি? স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছেন গোঁসাইবাবা এই বিষ্ণুটিকুরির জয়দেব ঘোষালের দিকে। ওধারে কেঁধোরা ততক্ষণে দড়াদড়ি খুলে বাঁশ থেকে ছাড়িয়ে কাঁথা-মাদুরেরের ভেতর থেকে বার করে মাটির ওপর শুইয়েছে একটি মেয়েকে। সদ্য মৃতা মেয়েটির সারা কপাল মাথা সিঁথি ডগডগে সিন্দূরে লেপটা---লেপটি, পরণে একখানি লালপাড় কোরা শাড়ি, হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা, পরম সৌভাগ্যবতী সধবার সাজ। পাঁচ দিনের পথ ভেঙে এসেছে, তাই একটু ফোলা ফোলা মুখখানি। দুটি চোখ বোজা, অসীম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে আছে মেয়েটি। বিষ্ণুটিকুটির নৈকষ্য কুলীন জয়দেব ঘোষালের পঞ্চমবারের সহধর্মিণী। জয়দেব তখনও পায়ের উপর মুখ ঘষছে আর জড়িয়ে জড়িয়ে কাতরাচ্ছে--

> "হেই বাবা, তুমিই সাক্ষাত ভৈরব গো, জ্যান্ত কাল ভৈরব তুমি, কিপা কর বাবা---এই অধম সন্তানের উপর একটু কিপার চোখে চাও। তুমি না দয়া করলে আমার বংশ রক্ষে কিছুতেই হবে না গো, আমার বাপ---পিতামো জল পিণ্ডি না পেয়ে চিরটা কাল টা টা করে মরবে।"[৪৯]

এখানে কৌলিন্য প্রথা এবং বংশ রক্ষার বাসনা কীভাবে সমাজকে পরিচালিত করত প্রসঙ্গক্রমে সে ইঙ্গিত ঔপন্যাসিক রেখে গেছেন।ঔপন্যাসিকের চোখে জয়দেবের আন্তরিক যন্ত্রণা বোধটিও ধরা পড়েছে। স্ত্রীর বিয়োগে সে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছে :

> "পা ছেড়ে দিয়ে উঠে বসল জয়দেব। পাঁচদিন অবিরাম মদ গাঁজা টেনে ওর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ির ভেতর দুর্গন্ধ

> ময়লা শুকিয়ে রয়েছে। বোধহয় বমি করে তার ওপর মুখ রগড়েছিল জয়দেব। বউয়ের শোকের জ্বালায় মুখ ধুতে, স্নান করতেও ভুলে গেছে বেচারা। ব্রাহ্মণের ঘরের পাঁচ-পাঁচটি সতী- সাধ্বী স্ত্রীর পতিদেবতা নৈকষ্য কুলীন জয়দেব ঘোষাল আমার সামনে বসে বুক চেপে ধরে হিক্কা সামলাতে আর থুতু ফেলতে লাগল।''[৫০]

অবধূতের নজর এড়ায়নি যে এইসব কুলীনরা বউ মরার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বউ ঠিক করে ফেলে। তাই এই জিজ্ঞাসা : 'তা এবারে যিনি আসচেন তিনি কার ঘরের গো ঠাকুর মশাই?' বোষ্টমীর কথায় বিষের ঝাঁজ। অত খেয়াল করবার মত অবস্থা নয় ঠাকুর মশায়ের। এক ধেবড়া থুতু ফেলে হাতের পিঠে মুখ মুছে এক গাল হেসে সে আরম্ভ করলে---'তা তুমি চিনবে বৈকি গো রাঙাদিদি।' নিখুঁত দৃষ্টিতে অবধূত এদের দেখেছেন তাই চরিত্রগুলির আচরণ এমন বাস্তব সম্মত।

চরণদাস : বিধাতার অমনোযোগ

'আকাশে একখানা আস্ত চাঁদ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে বোষ্টমীর দিকে। গঙ্গায় গলানো রুপো টলমল করে বয়ে যাচ্ছে।' ---পরিবেশের এমন বর্ণনা উপন্যাসের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়।সেই দিকে চেয়ে একই মাদুরের একপাশে পা ছড়িয়ে বসে আছে নিতাই, ওপাশে শুয়ে আবলুস-কাঠের কুঁদো চরণ দাস নাক ডাকাচ্ছে। ঔপন্যাসিকের মনে হয় অত গাঁজা টেনেও কি করে স্বাস্থ্যটি বজায় রাখে তা একটা রহস্য বটে। চূড়ো বাঁধা শেষ করে নিতাই বললে:

> ''বাপ-মায়ের হাড় মাংস থেকে পাওয়া এই হাড়-মাংসের বোঝাটার লোভে সবাই ছোঁকছোঁক করে ঘোরে আমার পেছনে। কানের কাছে ফিসফিস করে ---সোনা-দানায় গা গতর মুড়ে দেবে, বাড়িঘর দাসী চাকর কোনো কিছুরই অভাব রাখবে না। খেংরা মারি সোনা-দানা বাড়ি-ঘরের মুখে-হ্যাংলা কুকুরের পাল।''[৫১]

এখানে নিতাই বোষ্টমীর মর্মবেদনা অপরূপ ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। তাই বলে নিতাই বোষ্টমীর চরিত্র আঁকতে বসে কবিত্ব করে ব্যর্থ হননি লেখক। রাস্তায় নেমে যে বোষ্টমী মনের দুঃখ ভুলতে চেয়েছিল তার প্রধান বাধা হয়ে উঠলো নিজের শরীরটাই। পথ আর নিরাপদ রইলো না কামাতুর মানুষ তার পিছু ছাড়লো না।

উপন্যাসের শেষে না পৌঁছালে বোঝা যায় না কেন নিতাই-এর সাথে গোঁসাই-এর কথা-বার্তায় প্রেমের আঁচ লাগলেও চরণ দাস গরম হয় না। বরং মিনতি করে তাদের সাথে থাকার জন্য। রহস্য ভেদ হতে সময় লাগে। উঠে এসে খপ্ করে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চরণদাস।

> ''তাই কর গোসাঁই, তাই কর। যাও তুমি নিতাইকে নিয়ে আমি থাকি তোমার ছাড়া গদির উপর। তাতে আমারও কোনোও দুঃখ হবে না। তবু যে তোমারয় এই লক্ষ্মীছাড়া গদির মায়া ছাড়াতে পেরেছি এ কি কম কথা আমাদের ! তোমাকে এখানে ফেলে রেখে গিয়ে আমরা কোথাও শান্তি পাই না। আমরা খেয়ে সুখ

পাই না, ঘুমিয়ে শান্তি পাইনা। অষ্টপ্রহর তোমার কথা মনে করে জ্বলেপুড়ে মরি। এখানেই আমাকে রেখে যাও গোসাঁই। আমি খুব শান্তিতে থাকব। তবু ত জানব কোথাও না কোথাও তুমি সুখে আছ নিতাইকে নিয়ে। তাতেই আমার মনের জ্বালা জুড়োবে।"[৫২]

কেমন করে চরণ দাস এমন কথা অন্তর থেকে বলতে পারলো---সে কথা জানা গেল- চরণদাস বাবাজী মারা যাওয়ার পরে। সে ছিল বিধাতার অপূর্ণ সৃষ্টি! একদিকে চরণদাস মিনতি করছে গোঁসাইকে তাদের সাথে থাকার জন্য অথবা নিতাইকে নিয়ে ঘর বাঁধার জন্য আর অন্য দিতে নিতাই বোষ্টমী তার ধরে অনুনয় করছে :

"উঠে এস গোসাঁই---আর তোমার একটি কথাও আমি শুনব না। এইমাত্র আমায় যে কথা দিয়েছ, আগে রাখ সেই কথা। নাও আমাকে, নাও এখনই। আমাকে নিয়ে যা খুশি হয় কর। তবু উঠে এস ওখান থেকে, নয় ত এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ব একটা চিতায়।"[৫৩]

এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরিত্ব ধরা পড়েছে। শশীকে কুসুম বলেছিল : 'তোমার সাথে চাঁদনী রাতে কোথাও চলে যেতে সাধ যায় ছোটবাবু'[৫৪] শশী তার ডাককে অপমান করেছিল বলেছিল, 'শরীর শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?'[৫৫] সেই অপমানের শোধ কুসুমের হয়ে ভাগ্যদেবতা নিয়েছিল শশী শেষপর্যন্ত তার হাত ধরে মিনতি করেও আর কুসুমকে পায়নি। তার অহংকার তার জীবনকে অর্থহীন করে তবেই তাকে ছাড়ে। আসলে বিশ্ববিধানে কোথাও প্রেমে অপরাধ স্বীকৃত নয় অপরাধ প্রেমের অমর্যাদায়। প্রেমাস্পদকে যে অপমান করে প্রত্যাখ্যান করে তাকে জীবন ভোর তার প্রায়শ্চিত্য করতে হয় অসুখী হয়ে। শ্মশানভৈরব নিতাই বোষ্টমীকে অপমান করেনি কেবল চরণদাসের কথা ভেবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, সেই চরণদাস যে নপুংসক তা জানার পরে আর কোনো দ্বিধা করেনি শ্মশানভৈরব। শ্মশানভৈরব তার গদি ছেড়ে বহু পরীক্ষিত ভালোবাসার হাত ধরে ঘর বাঁধতে চলে গেল। নিতাই মাংসলোলুপ পুরুষের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে শেষপর্যন্ত তার কাঙ্ক্ষিত মানুষকে সঙ্গী পেল।

'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসের কথক হলেন গোঁসাই। ইনি শ্মশানভৈরব নামেও সম্বোধিত। লেখক অবধূতের ইনি মুখপাত্র। তন্ত্রসাধক এবং সংযমী মানুষ ইনি। মিষ্টভাষী পরোপকারী এই মানুষটি চরণদাস ও নিতাই বোষ্টমীকে বুঝিয়ে বলেন,

"এখানে শুকনো ভষ্ম, এ গায়ে লাগালেও দাগ পড়ে না। ঝেড়ে ফেললেই ঝরে যায়। তোমাদের এত দামি সম্পত্তি এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ভিড়ের মাঝে রাখলে শেষে খোয়া যাবে যে। ...এখান থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে কদিন সামলে রাখতে পারবে ভাই? দেখতে দেখতে রঙ যাবে বদলে, তখন তোমরাই ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।"[৫৬]

---এইভাবে নিজেকে মুক্ত রাখেন। নিতাই-এর ভালোবাসা গোঁসাই বুঝতে পেরেও তাদের সংসার ভাঙতে চায়নি। তাই চরণদাসের ভালোবাসাকে গুরুত্ব দিয়ে বলেন :

> "এই দুনিয়ার একমাত্র খাঁটি জিনিস---বুকের আগুনে চুয়ানো ঐচোখের জল; সবচেয়ে দুর্লভ মদ। কেউ কারও জন্যে ও জিনিসের এক ফোঁটাও বাজে খরচ করতে চায় না। আমার ওপর ভেতর এই শ্মশানের ভস্মে ছেয়ে গেছে। এর ছোঁয়া লাগলে সব শুকিয়ে যাবে। জানি না, কি লোভে তুমি আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে চাও। কিন্তু আমার এই সবুজ লতাটিকে শুকিয়ে মেরে ফেলবার জন্যে আমি কোনো মতেই তোমার সঙ্গ নিতে রাজী হব না।"[৫৭]

তখন আঁচলে চোখ মুছে নিতাই উঠে দাঁড়াল। বললে---'তাই ত বলছিলাম গোসাঁই, পুড়ে কালো আঙার না হলে এই রক্ত-মাংসের ওপর তোমার কিছুতেই লোভ হবে না। অনর্থক সারাটা রাত মাথা খুঁড়ে মলাম।'[৫৮]---এই অনুশোচনা আর হতাশা নিতাইকে চিনিয়ে দেয়। সেইসাথে ঔপন্যাসিক অবধূতের সমাজকে প্রতিষ্ঠা দেয়। নিঃসন্দেহে শ্মশানভৈরবও প্রেমিক। তবে তখন্র প্রকৃত ঘটনা তাঁর জানা নেই। নপুংশক চরণদাসকে তিনি পরে জেনেছেন পরিশেষে এমন হলো যে নিতাই আর জোর করতে পারলো না ভাগ্যকে মেনে নিলো আর এই সূত্রে উপন্যাস কাঙ্ক্ষিত ভিন্নধারা যুক্ত হলো। সাড়ে তিন মণ ওজনের মোষের মত কালো রতন মোড়ল। নিজের নাম বলত অতন। চিৎ হয়ে মড়ার মত গঙ্গায় ভেসে থাকত ঘন্টার পর ঘন্টা। অতন মোড়ল দলে না থাকলে সহজে কেউ চাটাই কাঁথা খুলে মড়া বার করে নাচাতেও সাহস করত না। অতন কে কেঁধোরা সমীহ করে চলত। অতন মোড়ল কেউটে সাপের বিষে পোস্ত ভিজিয়ে তাই শোধন করে খেত নেশা করার জন্য। লোকটি ছিল চণ্ডীর দেয়াসি। তিন তুড়ি দিয়ে ডাকিনী নামাতে পারত।

> "অতন মোড়ল হাই তুলতে তুলতে হাতে তুড়ি দিয়ে বলে---এই ত সাক্ষাৎ কাশীক্ষেত গো। গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। এঁর তুল্য থান কি আর কোথাও আছেন?"[৫৯]

খন্তা ঘোষ

খন্তা ঘোষ দ্বিতীয়বার সামনে এল। লাল টকটকে চারখানা দাঁত বার করা খন্তা কালোয়াতি গান গায়। হয়ত বলে শ্মশান ভৈরবকে যে তাহলে সেও আজকাল ঘুমোচ্ছে---বলে দরাজ গলায় হা হা হা হা হাসতে থাকে খন্তা। একেবারে ষোল আনা জীবন্ত খন্তা ঘোষ---হাসার মত হাসতে পারে অনর্থক উদ্দেশ্যহীন হাসি। তারপর তার হাসি থামিয়ে লম্বা কোটের লম্বা পকেট থেকে হয়ত টেনে বার করে একটি চ্যাপটা বোতল। বোতলটির মুখ খোলা হয় নি তখনও, ভেতরে টল টল করছে সাদা জল। সে নিজে খায় না। লেখকের ভাষায়:

> "নেশার মধ্যে ওর আছে মাত্র দুটি নেশা। এক---টাকা রোজগার করা, আর দুই---টাকা ওড়ানো।"[৬০]

ওই দুটি কর্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করবার জন্যে ওর মগজে হাজার রকম ফন্দি ফিকির খেলা করে। যে কাজে ঝুঁকি কম সে রকম কাজে খন্তা সহজে হাত দিতে চায় না, মোটা

লাভের লোভেও না। তার মতে চুনোপুঁটি মেরে শুধু শুধু হাতে গন্ধ করে কে? বাঘা মাছ ঘাই দেবেই। নেহাত অচল হলে চুপচাপ শুয়ে থাকে গিয়ে ওর দিদির আখড়ার চরণদাস বাবাজীর পাশটিতে। সে সময় খন্তার মাথায় তেল পড়ে, অত লাল দেখায় না দাঁতগুলো, চোখের কোল অত কালো থাকে না আর মুখের চেহারাও বেশ বদলে যায়। 'কুছ পরোয়া নেই' তখন বেঁচে থাকে না ওর চোখে। নিতাই বোষ্টমীর সবুজ শিমগাছের দিকে ঠায় চেয়ে থাকার ফলেই বোধহয় ওর চোখেও সবুজের আভা দেখা যায়। তারপর একদিন আবার সংবাদ আসে। সুপারি নিয়ে কাটোয়া শিউড়ি কান্দি বেলডাঙা এমন কি কলকাতা পর্যন্ত ছুটতে হয় খন্তাকে। মস্তানের চুল পাকে না। শেষবার ওরা খন্তাকে নিয়ে আসে চাটাই জড়িয়ে বাঁশে ঝুলিয়ে। টপ টপ করে রক্ত ঝরছিল। চাটাই ফুঁড়ে। তার আগের দিন রাত্রে পাঁচুন্দির শীলেদের বাড়ির তিন তলার ছাদ থেকে নিচে শান বাঁধানো উঠোনের ওপর লাফিয়ে পড়ে পিন্ডি হয়ে এল খন্তা ঘোষ।

রামহরি ও রামহরির বউ

একমাথা কোঁকড়া চুল রামহরি ডোম আর আধ-বিঘত চওড়া রূপার বিছা কোমরে পরে রামহরির বউ। সঙ্গে নিয়ে আসত পাঁচ বছরের উলঙ্গ মেয়ে সীতাকে মেয়েটাকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে রামহরি বলত---

> "তোমার সেবায় দিলুম গোঁসাই। তোমার পেসাদী ফুল না হলে যে শালা একে ছোঁবে তাকে জ্যান্ত চিতেয় তুলে দোব।' নিজের সুপুষ্ট নিতম্বের ওপর হাতখানা ঘষে মুছে আঁচল থেকে এক খিলি পান খুলে দিয়ে রামহরির বউ বলত-'নাও জামাই, মুখে দাও।"[৬১]

দারোগা

টাট্টু চেপে দারোগা আসেন মদচালানকারীদের ধরতে। রামহরির ঘরে নারী সঙ্গ রাত কাটিয়ে যান। সেসময় বোঝা যায় এই পুলিশের লোকটি কেমন!ঔপন্যাসিক তার আচরণ, স্বভাব ও ব্যর্থতা দিয়ে নিখুঁতভাবে চরিত্রটিকে রূপ দিয়েছেন।

কৈচরের বামুন দিদি

পালা-পার্বণে তাঁর যজমানদের নিয়ে তিনি গঙ্গাস্নানে আসতেন। গোঁসাইবাবার কাছ থেকে নিয়ে যেতেন অনেকের জন্যে ছেলে হবার মাদুলি। আবার অনেক বড় ঘরের কুমারী আর বিধবাদের জন্যে অন্য জিনিস। তাদের সঙ্গে করে এনে গঙ্গাস্নান করাতেন বামুনদিদি, তখন শ্মশানভৈরবের পায়ে পড়ত পাঁচ সিকে করে দক্ষিণা। পার হয়ে গেলেন সিঙ্গীমশায় সিধু পুরুতের সজীব মন্ত্রের জোরে। যথা সময়ে কৈচরের বামুনদিদির শ্মরণাপন্ন হলে নির্বিঘ্নে পার হয়ে যেতেন অনেক আগেই। কাকে বকে টের পেত না কিছুই। অনেক বড় ঘরের বড় কথা জমা আছে বামুন দিদির পেটে। তাঁর বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না।

সিঙ্গী গিন্নি

সিঙ্গী গিন্নিও কম পাকা নন। সেদিন রাত্রে তাঁরও বুক ফেটেছিল কিন্তু মুখ ফোটেনি। নিজের বাড়ির অন্দর মহলে যে খেলা খেলছিলেন তাঁর স্বামী, তাতে তাঁর হাত ছিল না বটে তবে মুখ ফুটিয়ে তিনি বাধা দিতে যাননি। বরং তাঁর বুকের জ্বালা কিছুটা হয়ত জুড়িয়েছিল। চোর কুঠরিটার বাইরে দাঁড়িয়ে একবার তিনি সামান্য চাপা আর্তনাদও শুনেছিলেন। তারপর নিজের হাতেই সযত্নে ফুলে চন্দনে সাজিয়েছিলেন গুরুকন্যাকে, নিজের হাতেই গুরুঠাকরুণকে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিলেন সবই সেদিন করেছিলেন স্বামীর জন্যে, স্বামীর নাম মান বাঁচাবার জন্যে। আর তা করাও তাঁর কর্তব্য, নয় ত তিনি কেমন করে নিজেকে সিঙ্গীমশায়ের উপযুক্ত সহধর্মিনী বলে পরিচয় দেবেন।

তারপর তাঁর অতবড় বাড়ি- ভর্তি আত্মীয়-স্বজন আশ্রিত -আশ্রিতার দল যখন একে একে বিদায় নিলেন, সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করতে লাগল,তখনও তিনি মুখ বুজে পড়ে রইলেন সেই বাড়িতে। সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য করে গেলেন মশারীর ভেতর বসে- স্বামীর দেহ থেকে পোকা বেছে। আজ তাঁর সব কর্তব্যের শেষ হল এখানে, স্বামীর সঙ্গেই তিনি জন্মের ---শোধ বেরিয়ে এসেছেন সেই বাড়ি থেকে। আর ফিরবেন না সে বাড়িতে, ফেরবার উপায়ও নেই। এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখক দক্ষ হলেও সংযত থেকেছেন। এই সংযম একজন গতিবান দক্ষ ঔপন্যাসিকেরই আয়ত্ত্বাধীন।

শাঁখা সিন্দুর ঘুচিয়ে মাথা মুড়িয়ে থান পরে আবার সামনে এসে বসলেন তিনি। তাঁর দিকে চেয়ে মনে হল এবার জুড়িয়েছে তাঁর বুকের জ্বালা, নিভে গেছে যে চিতাটা তাঁর বুকের মধ্যে হু হু করে জ্বলছিল। দুঃখ শোক উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই তাঁর চোখে মুখে কোথাও। যেন মস্তবড় একটা দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এলেন। বড় ঘরের মেয়ে তিনি, বড় ঘরের বউ। বয়স ও এমন কিছু বেশী হয়নি তাঁর, শরীরের বাঁধুনিও নষ্ট হয়নি তেমন। যে বয়সে মেয়েরা মেয়ে জামাই ছেলে বউ নিয়ে জাঁকিয়ে সংসার করে সেই বয়স তাঁর।

কিন্তু কিচ্ছু নেই পেছন ফিরে তাকাবার মত কোনোও আকর্ষণ নেই তাঁর। তাই আর ফিরবেন না তিনি, এগিয়েই চলবেন সারা জীবন। লক্ষণীয় যে লেখক আগে থেকেই সিঙ্গী গিন্নির চরিত্রবৈশিষ্ট্য আমাদের জানিয়ে রাখলেন; নইলে পরবর্তী পরিণতি আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হত না। আগমবাগীশের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরোপিত বলে মনে হত। এ দূরদর্শিতা একজন সত্যকার ঔপন্যাসিকেরই থাকে।

গানের ব্যবহার

পেসাদ পাবার জন্যে জয়দেব পা ছেড়ে দিলে। বোতলটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন গোঁসাইবাবা। তার সঙ্গীরা চিৎকার করে উঠল--- ‘বোম্ বোম্ হরশঙ্করী মা।’ তারপর দু-হাতে নিজেদের

দু-কান আর নাকটা মুচড়ে গড় হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকালে। বড় সড়কের ওপর থেকে চরণদাসের গলা ভেসে এল---'গুরু বলে দাও মোরে কোনো্খানে সে মনের মানুষ বিরাজ করে।'[৬২] এটাই উপন্যাসের প্রথম গান। নিতাই এবং চরণদাসের গলায় এ উপন্যাসের গান গুলি তাদের অব্যক্ত বেদনাকে প্রকাশ করে কিন্তু সম্পর্ক স্পষ্ট হয় উপন্যাসের একেবারে শেষে পৌঁছে।

উদ্ধারণপুরের কর্মকাণ্ড

ঔপন্যাসিক দর্শন আর কাব্যকে গদ্যমাধ্যমে অসাধারণ রূপ দিয়েছেন। `Style is the man himself' ব্যুফোর এই বিখ্যাত উক্তির সত্যতা মেলে লেখক অবধূতের কলমে। তাঁর বক্তব্যে দার্শনিকতা খুব সহজভাবে জায়গা করে নেয়। বেশ বোঝা যায় অবধূত মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে মেনে নেননি। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তিও অসাধারণ। রূপদক্ষ শিল্পী এই ধরনের অন্ধবিশ্বাসী মানুষের চিত্র এঁকেছেন অসাধারণ দক্ষতার সাথে : 'অতন মোড়ল' হাই তুলতে তুলতে হাতে তুড়ি দিয়ে বলে---'এই ত সাক্ষাৎ কাশীক্ষেত গো। গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। এঁর তুল্য থান কি আর কোথাও আছেন?'[৬৩]

রামহরির বউ

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ সিদ্ধির চৌকস বন্দোবস্ত রয়েছে উদ্ধারণপুরের ঘাটে রক্তে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্যে রামহরির বউ এমন মাল জ্বাল দিয়ে নামায়---যা আর কোথাও মেলে না। আর যে দেহের রক্ত জমে শক্ত হয়ে গেছে তাতে আগুন ধরাবার জন্যে রামহরি কাঁধে করে বয়ে আনে মোটা মোটা তেঁতুল কাঠের কুঁদো। তারপর রামহরির শালা পঙ্কেশ্বরের পালা। তার আছে একটি রঙিন চৌকো ছক কাটা কাপড় আর তিনখানা হাড়ের পাশা। চাঁড়ালের পায়ের হাড় থেকে বানিয়েছে সে পাশা তিনখানা। পঙ্কা যখন তার ছক খানা গঙ্গার ধারে পেতে ডাক দেয় তখন না গিয়ে থাকতে পারে না কেউ সেখানে। আওয়াজ ওঠে সেখান থেকে---ব্যোম কালী নাচনেওয়ালী---চা বেটি একবার মুখ তুলে---শালার হাড়ে ভেলকি খেলিয়ে দি।

আগমবাগীশ

গমগম করতে লাগল উদ্ধারণপুরের রঙ্গমঞ্চ। দেখা গেলো রামহরি পঙ্কা বয়ে নিয়ে এল তাঁর মোটঘাট। শ্মশানের উত্তর দিকের বড় পাঁকুড় গাছের তলায় মস্ত মস্ত বাঘছাল বিছিয়ে বসলেন তিনি। উপস্থিত সকলে দেখলেন যে বাঁয়ে বসলেন তাঁর শক্তি, সামনে সিন্দুর মাখানো ত্রিশূল পুঁতে দেওয়া হলো। এই সময় সিঙ্গী গিন্নী একভাবে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেই রইলেন সেইখানে।

নিশীথ রাতের গোপন অনুষ্ঠান---রহস্যপূজায় বসেছেন আগমবাগীশ শ্মশানের ঈশান কোণে। রক্তবস্ত্র পরে, জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে কপালে মস্ত বড় সিন্দুরের ফোঁটা লাগিয়ে তাঁর শক্তি আসন গ্রহণ করেছেন তার বামে। সামনে শ্রীপাত্র গুরুপাত্র যোগিনীপাত্র ভোগপাত্র আর

বলিপাত্র স্থাপন করা হয়েছে।

পরিবেশগত স্বাতন্ত্র্য

উপন্যাসে ঘটনা সংস্থাপন ও পরিবেশ রচনার বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। সংস্কৃত মন্ত্রের গুরুগম্ভীর উচ্চারণ আর পাঁজি মিলিয়ে তিথি নক্ষত্রের বিচিত্র সমাবেশের কথা বলে আগমবাগীশ যজ্ঞের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছেন। একে কৃষ্ণাষ্টমী তায় মঙ্গলবার। মোক্ষম যোগাযোগ মিলে গেছে আগমবাগীশের। উপস্থিত ধর্মভীরু মানুষগুলি বিশ্বাস করেছেন যে আগম বাগীশ যে মন্ত্র পাঠ করছেন তার অমোঘ শক্তিতে তত্ত্বশুদ্ধি হবে। উদ্ধার পেয়ে যাবেন তাঁরা ইহলৌকিক জগতের দুঃখ ভোগের হাত থেকে। এই বিশ্বাস আছে মনে আর কানে ভেসে আসছে : 'ওঁ প্রণাপানব্যানোদানসমানা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা ভূয়াসং স্বাহা।' এর অর্থ আগমবাগীশ তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন। 'আমার প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান শোধন হোক, রজোগুণশূন্য পাপশূন্যজ্যেতিঃ স্বরূপ হই যেন আমি।' 'ভড়ং করতে অপারগ অবধূত। তাই সংক্ষেপে জানালেন

> "জ্যোতিস্বরূপ হবার প্রধান উপাচার আস্ত এক ভাঁটি কিনে ভরে এনে দিয়েছে রামহরি ডোম। সাধক মানুষ সেও, বউকে একখানে রক্তবর্ণ কাপড় পরিয়ে নিয়ে এসেছে সঙ্গে। মেয়েটাকে রেখে এসেছে পঙ্কেশ্বরের কাছে। আজ রাতে পঙ্কাও ঢুকতে পাবে না শ্মশানে। পঙ্কা হচ্ছে অনধিকারী শক্তিহীন পশু। অবশ্য আমিও তাই। আমারও শক্তিনেই সুতরাং অধিকার নেই রহস্য পূজায় বসবার। কিন্তু আগমবাগীশ আশা রাখেন যে একদিন আমার পশুত্ব ঘুচবে। বীরভাব জাগবে আমার প্রাণে, সেদিন আমিও একটি শক্তি জুটিয়ে নিয়ে লেগে যাব শোধন -ক্রিয়ায়। তাই আমাকে একরকম জোর করে এনে বসিয়েছেন আগমবাগীশ ওঁদের সামনের আসনে।"[৬৪]

আগমবাগীশের অভিমত লেখক রসিকতার মোড়কে পরিবেশন করেছেন। রামহরি ডোম সম্পর্কে 'সাধক মানুষ' এই শব্দযুগলের প্রয়োগে অবধূতের মুখের হাসিটি যেন পাঠক দেখতে পান। শ্মশান ভৈরব সম্পর্কে আগমবাগীশের অভিমতও লেখক রসিকতার মোড়কে পরিবেশন করেছেনতা সচেতন পাঠক মাত্রই অনুভব করেন। আগম বাগীশের যজ্ঞে সামিল সকলেই বসে আছেন আর বুঝতে পারছেন অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাঁদের। সেদিনের সন্ধ্যায় উদ্ধারণপুরে পৌঁছে চিতায় উঠে শুয়ে ছিল যারা, তারা চিতা থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁদের চারপাশে। দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে আগমবাগীশের শোধন করার মন্ত্রপাঠ আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে চিতাগুলো থেকে। দুনিয়ায় আলো-বাতাস আনন্দ ভালবাসা বিষাক্ত করে তুলেছিল ওদের পঞ্চপ্রাণ। শেষপর্যন্ত সেই অশোধিত নোংরা প্রাণের মায়া কাটিয়ে ওরা পালিয়ে এসেছে উদ্ধারণপুর শ্মশানে। পালিয়ে এসেছে এই আশা বুকে ভরে নিয়ে যে চিতার আগুনে সব শোধন হয়ে যাবে। আগমবাগীশ সাধারণ মানুষের

চোখে নিজেকে অনেক বড়ো মাপের সাধক রূপে তুলে ধরতে চায়। লোকঠকানোর এটাই তো দস্তুর! ভাবটা এমন যে তাঁকে আশ্রয় না করলে কারুরই মুক্তি নেই। আগমবাগীশের যজ্ঞ ভিন্ন কারুরই শোধন হবে না। চিতার আগুনে এই শোধন হতে পারে না। কি করে চব্বিশতত্ত্বের শোধন করা যায় তার গুহ্য তত্ত্ব জানেন কেবল আগমবাগীশ।

ব্যঞ্জনাময় ভাষা

ঔপন্যাসিক অবধূত একদিকে আত্মসন্ধানী সন্ন্যাসী অন্যদিকে সাহিত্য রসিক মানুষ। দুটি সত্তাই তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রভাব ফেলেছে। জন্ম-মৃত্যুর রহস্যময়তায় মগ্নচৈতন্য এই লেখকের কলমে ব্যঞ্জিত শব্দ অবলীলায় ব্যবহৃত হয়েছে। বলা যায় দার্শনিকতার প্রয়োগ অত্যন্ত সতর্কভাবেই তাঁর রচনায় বিশ্বস্ততার সাথে এসেছে। কয়েকটি প্রসঙ্গ উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাস থেকে স্মরণ করা যায় :

১. ''শ্মশানে ঝিরঝিরে বাতাসে, গঙ্গার ঢেউয়ের কুল কুল ধ্বনিতে চিতার ওপর আগুনের আঁচে মানুষের মাথা ফাটবার ফট্ ফটাস আওয়াজে কোনো৷ যায় সেই নিলামের ডাক। সপ্তগ্রামের বণিক-কুলপতি উদ্ধারণ দত্ত মশাই পাকা সওদাগর ছিলেন। নিক্তির তৌলে আজও জোর কারবার চলছে তাঁর ঘাটে। কড়াক্রান্তি এধার ওধার হবার জো নেই। যিনি নিলাম ডাকেন তাঁর কপালের ওপর আছে তিন তিনটে চোখ। কার সাধ্য রেহাই পাবে সেই চোখ তিনটিকে ফাঁকি দিয়ে।''[৬৫] 'উদ্ধারণপুরের ঘাট। বিকিকিনির টাট। পাপ-পুণ্য চরিত্র মনুষ্যত্ব জ্যান্ত ধড়িবাজ আর ধর্মধ্বজী সব এক সঙ্গে সস্তা দরে নিলামে ওঠে সেখানে। নিলাম ডাকেন স্বয়ং মহাকাল---ক্রেতা চার জন। ভবিতব্য, ভাগ্য, কর্মফল আর নিয়তি।
   ---এই বর্ণনায় ইতিহাস, দর্শন এবং সাহিত্য অসাধারণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দুদর্শন মেনে এখানে বোঝানো হয়েছে যে নিলামদার আর কেউ নন স্বয়ং মহাকাল। সওদাগর হলেন এই শ্মশানের প্রতিষ্ঠাতা ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী উদ্ধারণ দত্ত।

২. ''শিপ্রানদীর তীরে মহাকালের বিরাট ঘন্টাটা বাজছে। চিতাভস্মে স্নান হচ্ছে এখন মহাকালের। প্রত্যহ একটি শব পুড়বেই উজ্জয়িণীর শ্মশানে। সেই ভস্ম এনে প্রত্যহ মাখানো হয় মহাকালকে। ঘি গঙ্গাজল চন্দন---কিছু লাগে না তাঁর স্থানে, লাগে মানুষ- পোড়া ছাই কেউ জানে না সেই স্থানের মন্ত্র।''[৬৬]---এখানে ব্যঞ্জিত অর্থের প্রয়োগ ঘটেছে 'মহাকালের বিরাট ঘণ্টা', 'চিতাভস্মে স্নান'-ইত্যাদি শব্দবন্ধে।

৩. 'গঙ্গার কিনারায় গোটা চার পাঁচ চুলোয় ভিয়ান চড়েছে। সব সময় রস পাক হচ্ছে ওখানে---নবরসের রসায়ন তৈরি হচ্ছে। মাথায় গামছা জড়িয়ে ভিয়ানকররা চুলায় খোঁচাখুঁচি করছে বাঁশ দিয়ে। উদ্ধারণপুরের সূয্যি ঠাকুর ঐ ওপরে এসে দাঁড়িয়ে হাঁ করে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন ভিয়ানের দিকে। এখানকার যাদুকর চালিয়ে

যাচ্ছে তার ভেলকি-বাজির চাল। বোতল বেরুচ্ছে, আগুন চড়ছে বার বার কলকের মাথায় আর কাঠ বইছে রামহরি আর পঙ্কেশ্বর। বল হরি---হরি বোল, হরি হরি বল। হরি বোল দিয়ে আসছে---হরিবোল দিয়ে চলে যাচ্ছে।'[৬৬] এখানে 'চুলোয় ভিয়ান' বলতে 'শবদাহ' বোঝাচ্ছে। ভিয়ানকার হলো মড়াপোড়ানো ডোম।

৪. 'উদ্ধারণপুরের আকাশ।
ছায়পথে ঘুরে ফেরেন মায়বিনী দুই যমজ ভগিনী।'

বাসনা আর বঞ্চনা---দুই চিরজাগ্রতা দেবী উদ্ধারণপুর শ্মশানের। গঙ্গার কাকচক্ষু জলে ধরা পড়ে তাঁদের প্রতিবিম্ব, যা দেখে ওঁরা নিজেরাই সভয়ে শিউরে ওঠেন। অবিরাম চিতার ধোঁয়া লেগে লেগে কালোয় কালো হয়ে গেছে ওঁদের মুখ। সেই পোড়া মুখ নিয়ে কেমন করে আর লোকের মন ভোলাবেন তাঁরা!'[৬৭]

---এই অংশে যেন গদ্য কবিতা রচনা করেছেন অবধূত। আমৃত্যু মানুষ ভোগবাসনার শিকার। মুখোশধারী মানুষ কি মৃত্যুর পরেও রূপসচেতন! 'মন ভোলানো' শব্দযুগলে তার ইঙ্গিত আছে।

৫. 'হাঁ--- ক্ষ্যামাই দোব এবার। এই পাত্রটিকে শেষ করে ---এই রাতের মত ক্ষ্যামা দোব। এই শোধন করা পাত্রটি শেষ করলেই শোধন হয়ে যাবে আমার চব্বিশতত্ত্ব। তখন ঘুমিয়েপড়ব। ঢলে পড়ব বিস্মৃতির কোলে। বিস্মৃতি উদ্ধারণপুরের কুহকিনী নিশাচরী।'[৬৮] ---এখানে লেখক বোঝাতে চাইছেন মদ খেলে মানুষ যেমন আর সব কিছুকে ভুলে যায় সেই সময়ের জন্য তেমনি উদ্ধারণপুরের রাত ও এক মায়া জানে আর সে প্রভাব তিনি কোনো মতেই ভুলতে পারেন না। নিদ্রাই একমাত্র নিস্কৃতি তথা বিস্মৃতির রাস্তা।

৬. ব্যঞ্জনায় শরীরী সম্পর্ক গুলি বুঝিয়ে দিতেই তাঁর আগ্রহ অকারণ সস্তা আদি রসের পরিবেশন তিনি করতে চাননি।
'জল কাদা বাঁচিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রেলের বুকিং অফিসের সামনে গাড়ি-বারান্দার নিচে। দুপুরবেলা প্রকাশ্য রাস্তার ওপর মানে সেই গাড়ি বারান্দার নিচে। কতকগুলো স্ত্রী পুরুষ শুয়ে ঘুমুচ্ছে।ঐ জায়গাটাই ওদের ঘর বাড়ি। কাজেই শালীনতার প্রশ্ন উঠতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়েছে এবং ঘুমুলে মানুষের হুঁস থকে না।'[৬৯]

---কোথাও কোথাও ভাষা মনের বাহ্যজ্ঞানহীনতার মতই সূক্ষ্ম-সচেতন-আচ্ছন্নতায় জড়িমাগ্রস্ত। লেখক দেখালেন দুটি চরিত্র। প্রকৃতি আর প্রয়োজন তাদের আলাদা। আগমবাগীশের কাছে জোর করে ধরে আনা কোনো মহিলার আপত্তি আর নিজে থেকে এগিয়ে আসা সিঙ্গী গিন্নির। এখানে এক নারীর অসহায়তা আর অন্য জনের অসম্পূর্ণ জীবন বাসনা দুই-ই চমৎকার মিলেছে এই ভাষার সঙ্গতে। আর অপরিচিত পরিবেশের আলো আঁধারিতে---এখানে আগম বাগীশের কাছে সিঙ্গী গিন্নির আত্ম সমর্পণের পটভূমি রচনা করেছেন লেখক। এরপর আধ্যাত্মিক

প্রয়াসের পৌরাণিক প্রসঙ্গ এনে লেখক নিজের অবস্থা ও বিশ্বসংসারের যন্ত্রণাময় জীবনের চিত্রকল্প এঁকেছেন অনুপম দক্ষতায়। পরিবেশ রচনার জন্যই কালো হয়ে উঠেছে আকাশের কালো চোখ। কিম্বা 'গুমরে গুমরে কাঁদছেন তাঁরা,'---এই সব ব্যক্তিত্বের আরোপ ঘটানো হয়েছে। সেই সূত্রে লেখক বললেন'কাঁদছেন উদ্ধারণপুরের দুই চিরজাগ্রতা দেবী---বাসনা আর বঞ্চনা।' দেখা গেলো তিথি বার নক্ষত্র সবই মেলবার মতো মিলেছিল দৈবাৎ। তবু সম্পূর্ণ হল না ওদের পূজা। বলিদানে বাধা পড়ল। আগমবাগীশের শোধনক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে গেল। এরই নাম বোধ হয় দৈববিড়ম্বনা।

কিন্তু না, অত সহজে ব্যর্থ হয়না কিছুই উদ্ধারণপুর শ্মশানে। সারা দুনিয়া উজাড় হয়ে ব্যর্থতা এসে জমা হয় যেখানে আগুনে পুড়ে চরিতার্থ হবার আশায়, সেখানে বসে কিছু করলে তা ব্যর্থ হয় কি করে! তাহলে দৈব হবে জয়ী, আর যার তুবড়ি বাঁশির সুরের তালে দৈব নাচে মাথা দুলিয়ে, সেই সর্বনিয়ন্তা সাপুড়িয়ার বাঁশি বাজানো হবে নিষ্ফল। শেষ পর্যন্ত স্থানমাহাত্ম্য বজায় রাইল। মুখ রক্ষা হল উদ্ধারণপুর ঘাটের।ধীরে ধীরে মাথা তুললে এক কালনাগিনী। নিজের বিষের নিজেই জ্বলে পুড়ে মরছে সে! তাই সে চায় শান্তি, চায় বিস্মৃতি, বিষে ডুবে থেকে বিষের জ্বালা ভুলতে চায়। থরথর কেঁপে উঠল উদ্ধারণপুরের আকাশ। স্বেচ্ছায় গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে বলি। এই বলি আর কেউ নয় সিঙ্গী গিন্নি। সে বলেছে :

> "আমায় নাও ঠাকুর। আমায় নিলে যদি তোমার চলে তাহলে নাও আমায়। পূর্ণ হোক তোমার পূজা, আমারও জন্ম সার্থক হোক। ও হতভাগীকে আর অভিসম্পাত দিও না ঠাকুর, ও ফিরে যাক ওর ছেলেমেয়ের কাছে। তোমার পূজার প্রসাদে ওর স্বামী নীরোগ হয়ে উঠুক।"*

এদিকে অচেতন হয়ে পড়েছেন শ্মশানভৈরব। তাকে গদিতে ফিরিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলোরামহরির বউ। সে আর সময় নষ্ট করবে না। আগমবাগীশের 'ধ্যাষ্টামো' দেখতে। সাথে করে নিয়ে গেল সেই স্ত্রীলোকটিকে।

সাত. বশীকরণ ও ঔপন্যাসিকের মনস্তত্ত্ব

'বশীকরণ' (১৪১৮)উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে জেলখানা থেকে। প্রথম দিন জিনিসপত্র সমস্ত বুঝে দিয়ে ছোট জেলারবাবু তোরাব আলির সঙ্গে কথকের পরিচয় করিয়েছিলেন এই ভাবে : 'বড় বিশ্বাসী লোক এ, আর এ জানে কি করে সম্মানী লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়।'[৭০] ---কথক জানালেন তারপর থেকে ন-মাস তিনি ছিলেন তোরাব আলির 'হেপাজতে'।

তোরাব আলী

এ উপন্যাসে তোরাব আলী একটি সক্রিয় চরিত্র। লেখক তথা কথকের সাথে আলাপের পর থেকে তার জীবনের নানা ঘটনা এ উপন্যাসে কথকের মুখে রূপ পেয়েছে। তার কাহিনি অন্তত একশ

পাদটীকা: *অবধূত,উদ্ধারণপুরের ঘাট, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৫৬

বার কোনো৷ হয়ে গেছে। তোরাব বড় লাঠিয়াল। তোরাব জেলে বসে তার নিজের পরিবারের জন্য কষ্ট পায়। সে প্রায়শই স্মৃতিচারণার মত করে বলে তার মেয়ে সাকিনার বয়স হল এই সম্ভবত বারো, ছেলে নুরুর এই দশ, আর ছোটটার বয়স অন্তত আট তো বটেই। সে ভেবে পায় না যে ওদের মা নিজের পেট চালিয়ে আরও তিনটে পেট কি করে চালাবে? তাই সে আশঙ্কা করে যে মেয়েটাকে হয়ত কারো ঘরে কাজে দিয়েছে। তোরাব ভাবে তার দুই ছেলেও হয়তো কারও গরু বাছুর রাখে। সে বেদনার্ত হয়। এমনও ভাবে যে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে না তো! সে ভয় পেয়ে যায়। সান্ত্বনা দিয়ে কথক বলতেন :

> "দূর, না খেয়ে মরে নাকি কেউ কোথাও? তোমার যেমন মাথা খারাপ। দেশে কি মানুষ নেই নাকি, কেউ না কেউ ওদের দেখাশুনো করছেই।"[৭১]

আমরা জানতে পারি তাদের দুঃখের কোনো শেষ নেই একজনের অপরাধে ভুগছে কতজন নিরপরাধ! জেলের মধ্যে বি ক্লাসের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। কথকের জন্য ফাঁসির আসামীর সেল একটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দশ হাত লম্বা আর পাঁচ হাত চওড়া একটি ঘর যার একমাত্র প্রবেশ এবং নির্গমন পথে দু-ইঞ্চি মোটা লোহার গরাদের গায়ে শক্ত লোহার জাল। হাওয়া আলো বৃষ্টির ছাট এ সকলের জন্য অবারিত দ্বার।

ঔপন্যাসিকের বাস্তবদৃষ্টি ও অবধূত

তোরাবের যন্ত্রণা বড়ো গভীর। সে তারা যদি কারও কাছে আশ্রয় পেয়েও থাকে, তার বদলে দিতে হয়েছে ইজ্জৎ। তোরাবের এই কথায় অবধূত নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত মুসলিম সমাজের হৃদয়হীনতার বাস্তব চেহারাটাই তুলে ধরেছেন। তবে বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বেশি উদাহরণ থাকলেও এই লালসার শিকার আজ বহু মানুষ! তাই তোরাব যখন বলে যে তার স্ত্রীর কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই মিলবে না, যদি সে কারও সঙ্গে নিকেয় না বসে থাকে, তখন আমরা বাস্তবটাকে যেন দেখতে পাই। নিজের বলতে যা কিছু তার সবটুকু ধুয়ে মুছে না ফেললে কারও দরজায় আশ্রয় নেই। তোরাবের মেয়ে সাকিনা তোরাবের ছেলে নুরু, তোরাবের বাচ্চারা যতক্ষণ না আর একজনকে 'বাপজান' বলে ডাকবে, যতক্ষণ না তাদের মা আর এক জনের সন্তানকে পেটে ধরতে রাজী হবে, ততক্ষণ তাদের মুখে দানা পানিও কেউ দেবে না। এসব চিন্তায় তার ভিতরের মানুষটা অসীম যন্ত্রণায় ছটফট করত জেলের মধ্যে আর দিন গুণত কবে সে তার পরিবারের কাছে যেতে পারবে। কথকের মুখে লেখক তোরাবের সেই অসহায়তার কথা বলেছেন :

> 'আর কথা যোগাত না তোরাবের। তার সেই কটা চোখের চাহনি তখন বাকি টুকু বলে দিত। কোনোও পশুকে বেঁধে খাঁড়ার তলায় গলাটা টেনে ধরলে যে ভাষা তার চোখে ফুটে ওঠে, সেই মর্মান্তিক অসহায় ভাষা মুখর হয়ে উঠত তোরাব আলির দুই চোখে। 'আমার সাকিনা আমার নুরু হায় আল্লা,কে জানে

আজ তারা কোথায়! আর কি কখনও আমি তাদের ফিরে পাব?"[৭২]

---এই উপন্যাসে জেলখানার কয়েদীদের ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণার কথা বাস্তবতার সাথে উঠে এসেছে। জেলের মধ্যে জেল, তার মধ্যে সেল। বিচার কর্তা বাইরে থেকে লিখে দিলেন, যে কথক বি ক্লাসের বন্দী। সি ক্লাস হলে সকলের সঙ্গে থাকতে পেতেন। বি ক্লাসের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা। দাগী আসামীকে আলাদা করে রাখতে হবে তো! কাজেই ফাঁসির আসামীর সেল একটা তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দশ হাত লম্বা আর পাঁচ হাত চওড়া একটি ঘর যার একমাত্র প্রবেশ এবং নির্গমন পথে দু' ইঞ্চি মোটা লোহার গরাদের গায়ে শক্ত লোহার জাল। হাওয়া আলো বৃষ্টির ছাট এ সকলের জন্য অবারিত দ্বার। সেই ঘরের মধ্যে সি ক্লাসের মত কম্বল একখানি আর থালা মগ নিয়ে থাকতে পারলেও স্বস্তি পাওয়া যেতে পারত কিন্তু ইচ্ছামত তো হওয়ার নয়। ঘরের মধ্যে জমা হয়ে আছে একরাশ বি ক্লাসের অস্থাবর সম্পত্তি, তার ফলে ভেতরটা আরো ছোট হয়ে গেছে। চার হাত লম্বা দু-হাত চওড়া লোহার খাট একখানি আছে এ ঘরে। তার ওপর ছোবড়ার গদি আর মোটা মোটা ছোবড়ার বালিশ। নারকেলের থেকে ছোবড়া ছাড়িয়ে নিয়ে সদ্য সদ্য একটা চটের থলেয় পুরে দেওয়া হয়েছে। ছোবড়া গুলোকে পেটানো বা পেঁজা হয়নি। তারপর মশারি, যার চারদিকের ঝুল চার রকমের। একদিকের একহাত একদিকের দু-হাত, একদিকের তিন হাত আর এক দিকের চার হাত। লেখকের ঔপন্যাসিক সুলভ দৃষ্টির পরিচয় এখানে মেলে। আর একটি জিনিসও ছিল তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে। তান্ত্রিক সাধকরা পূজায় বসতে হলে আসনের পিছনে হাত ধুয়ে জল-টল ফেলবার জন্যে একটি পাত্র রাখেন। ওটির নাম ক্ষেপণী-পাত্র। কথকের সেই দশ হাত পাঁচ হাত ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টার জন্যে দেওয়া হত একটি ক্ষেপণী-পাত্র। চার সের আন্দাজ জল ধরে এই রকমের গোল একটি আলকাতরা মাখানো ঢাকনা ওয়ালা জিনিস। বেহিসেবী হলে রক্ষে নেই। ঘর ভাসতে থাকবে নিজের অন্তরের অন্তরতম মালমসলায়। তারই মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা কাটিয়ে পরদিন সকালে অকথ্য গালাগালি উপরি পাওনা।

সেলের মাপের সমান এক টুকরো উঠান আছে সেলের সামনে। উঠানটি তিন মানুষ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উঠান থেকে বাইরে বেরুবার দরজাটি সেলের দরজার সামনা-সামনি। সেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলে পাওয়া যাবে তিন হাত চওড়া একটা গলি। গলিটা সব কটা সেলের সামনে দিয়ে গেছে। তারপরই হচ্ছে লাল ইটের ছ-মানুষ উঁচু পাঁচিল। সেই গলি দিয়ে দিবারাত্র ওয়ার্ডাররা রুল হাতে এ-ধার থেকে ও ধার আর ও-ধার থেকে এ-ধার খট খট মস মস করে টহল দেয়। উঠানের দরজা দিয়ে নজর রাখে, সেলের মধ্যের জীবটি কিছু করছে কিনা! সেলে বন্দী থেকে করবার অবশ্য কিছুই থাকে না, ওঁদের শ্রীবপু কতবার উঠানের দরজা দিয়ে দেখা যায় তাই কেবল চোখে পড়ে। প্রতিদিন কথকের কাজ ছিল সেল থেকে বেরিয়ে এসে তোরাবের সঙ্গে উঠানের দরজা পার হওয়া। তারপর সেই তিন হাত চওড়া গলিটার একপ্রান্তে পৌঁছে কলের নিচে মাথা পেতে বসে থাকতেন। সকালের ছুটির পুরো আধ ঘন্টাই থাকতেন কলের নিচে। কথক বি ক্লাসের বন্দী হিসেবে এই সুবিধাটুকু

পেতেন। বি ক্লাসের ওই টুকুই সুবিধা! নয়ত সারা রাত ক্ষেপণী-পাত্রের দুর্গন্ধের সঙ্গে কাটিয়ে কার সাধ্য সকালে এক ঢোঁক জল গেলে!

শৈল্পিক প্রয়োজন মেটাতেই তিনি ব্যঞ্জনায় শরীরী সম্পর্ক গুলি বুঝিয়ে দিয়েছেন অকারণ আদি রসের পরিবেশন তিনি করেননি। যেমন :

> "জল কাদা বাঁচিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রেলের বুকিং অফিসের সামনে গাড়ি-বারান্দার নিচে। দুপুরবেলা প্রকাশ্য রাস্তার ওপর মানে সেই গাড়ি বারান্দার নিচে। কতকগুলো স্ত্রী পুরুষ শুয়ে ঘুমুচ্ছে।ঐ জায়গাটাই ওদের ঘর বাড়ি। কাজেই শালীনতার প্রশ্ন উঠতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়েছে এবং ঘুমুলে মানুষের হুঁস থকে না।" [৭৩]

আট. শুভায় ভবতু: সৃষ্টিতে শিল্পীর অপরিহার্যতা

'শুভায় ভবতু' উপন্যাসে নিজের জন্ম-সময়ের কথা (ছ-দিন বয়সের কথা) বলেছেন অবধূত :

> "আরম্ভটা নাকি হয়েছিল মহাসমারোহে। তিন দিনের নৌকায়, সেখানে মানুষ পাঠিয়ে পায়ের ধূলো আনানো হয়েছিল সার্বভৌম ঠাকুরের। ইঁদুরে তোলা মাটি পাঠিয়ে সেই মাটি পায়ে ছুঁইয়ে আনা হয়েছিল। শুধু সার্বভৌমের নয়, আরও একাদশ জন বাছা বাছা ব্রাহ্মণের পদধূলি যোগাড় করা হয়েছিল। সেই ধূলি ঠেকানো হয়েছিল নবজাতকের কপালে। বড় আশায় এই সমস্ত করা হয়েছিল। দ্বাদশটি বাঘা ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ কিছুতেই বিফল হবে না, এ সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না তাঁদের মনে, যাঁরা এতকাণ্ড করেছিলেন ষেটেরা পূজোর দিন।"[৭৪]

এসব কথা কথকের জানার কথা নয়। ছদিন বয়সে কি হয়েছিল, না হয়েছিল তা আর কে মনে রাখতে পারে? ছদিন বয়সে মন জন্মেছিল কিনা তা-ই এখন মনে নেই। কিন্তু দ্বাদশজন ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ যে লেখক গোল্লায় পাঠিয়েছেন, এ কথাটি তাঁকে দ্বাদশ লক্ষবার শুনতে হয়েছে গুরুজনদের মুখে। শুনে শুনে ওটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে তাঁর এক রকম বিশ্বাসই হয়ে গেছে কথকের। এক রকম বিশ্বাসই হয়ে গেছে যে, তাঁর যা হওয়া উচিৎ ছিল তা যে হতে পারেননি, এজন্যে একমাত্র তিনিই দায়ী। এ উপন্যাসে নিজের কথা লিখতে বসে কথক বেশ দ্বিধা অনুভব করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়তে পারে। 'শুভায় ভবতু' উপন্যাসটি যে অনেকখানি আত্মজীবনী নির্ভর তা তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়।

এ জাতীয় রচনা বড়ো একটা দেখা যায় না। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এটি ব্যতিক্রমী পদ্ধতি বলা যায়। মনে হচ্ছে যেন লেখক একটি প্রবন্ধ লিখবার মুখবন্ধ রচনা করছেন! যেন তাত্ত্বিক কথা বলার অবসরে জানাচ্ছেন যে নিজেকে বাদ দিলে কোনো লেখাই সম্পূর্ণতা পায় না। অবধূত এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে যথার্থই বলেছেন :

> "যাঁরা বলেন, নিজের কাহিনি আর শুনিও না বাপু, তাঁদের জন্যে একটা জবাব মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি। কিন্তু বলতে সাহস হয় না। বললে বলতে পারতাম, কই এ পর্যন্ত নিজের কাহিনি ত, একটুও কোনোাই নি কোথাও। অপরের কথাই ত বলতে চেয়েছি, বলতে চেষ্টা করেছি তাদের কাহিনি, যাদের আমি স্বচক্ষে দেখেছি;দেখার মত দেখার সুযোগ মিলেছে যাদের এ জীবনে। ...তাদের কথাই ত কোনোাতে চেয়েছি এ পর্যন্ত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে নিজেকে বাদ দিয়ে কারও কথাই যে কোনোাতে পারি না।"[৭৫]

---বোঝাই যাচ্ছে এ উপন্যাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মজীবনীমূলক রচনা। তারপর উপন্যাসটি শেষ করে যে কথাটি মনে হয় তা হলো লেখক হিসেবে অবধূত বিশেষ সাবলীল ও দক্ষ। আজকের কলকাতার তুলনায় দিন অলাদা ছিল এতো বলাই বাহুল্য! লেখক জানিয়েছেন প্রেমে পড়বার উপায় ছিল না বলেই লোকে খপ করে বিয়ে করে ফেলত। বিয়ে করেই নিজের সেই কচি বউয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ত। তার ফলে জন্মাত ছেলেপুলে। আর তখন লোকে চাকরির চেষ্টায় লেগে যেত। উপন্যাসে লেখক সেকালের সমাজকাঠামোকে তুলে ধরেছেন। মেয়েদের সেকালে স্বাধীনতা খুবই কম ছিলো। লেখক সহজেই সেকথা বলেছেন। তথ্য আছে কিন্তু তা 'শুভায় ভবতু'উপন্যাসের কাহিনির প্রয়োজনেই এসেছে।

তেত্রিশ টাকায় তখন বি. এন. আর. অফিসে লোক নেওয়া হত। পঁয়তাল্লিশ টাকায় নেওয়া হত পোর্ট-কমিশনার অফিসে। লেখকের বলতে ভুল হয়নি যে 'গর্মেন্ট'-এর অফিসে ঢুকত 'গর্মেন্ট'-এর লোকের ছেলে-পুলেরা, পুলিশে ঢুকত পুলিশের শালা-ভগ্নীপতি। পশ্চিমের মানুষ কলকাতায় আসত পোষ্ট অফিসের পিয়ন আর রাস্তার জমাদার সাহেব হবার জন্যে। অন্য সব অফিসের সাহেবেরা বড়বাবুদের কথায় লোক নিতেন। বড়বাবুদের নজর ছিল খুব বড়, তাঁদের দিয়ে সাহেবকে কিছু কোনোাতে হলে বড় ব্যাপার করতে হত। ছোট কিছু তাঁদের নজরে ধরত না। অর্থাৎ তারা মোটা টাকা ঘুষ খেতো এ সব বিষয় অবধূতের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাঁর লেখনিতে প্রবল বেকারত্বের কথাও উঠে এসেছে। অত্যন্ত অসহায় অবস্থার কথা এখানে আমরা জেনে গেছি।

> "কোনোও দিকে কোনো কিছুর সুরাহা করতে পারত না যারা, তারা বার্ড কোম্পানীর অফিসে নাম লেখাত। তারপর খিদিরপুরের দিকে গিয়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজত।"[৭৬]

---এসব কথা অবধূত তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছেন। প্রথম কাহিনিঃ'কথকের দূর সম্পর্কের এক দাদা লাহোরে চাকরী করতেন। মাইনেও যেমন পেতেন উপরিও মিলত তেমনি। তাঁর জন্য পাত্রী দেখার দায়িত্ব পড়ল সেই মেয়েকে দেখতে এসে ঘটল বিপদ মাথায় ঘোমটা দিয়ে জানিয়ে গেল 'এ মেয়ের পেটে বাচ্চা আছে।'

যে মেয়েটি কান ভাঙানি দিল সে ই মেয়েটির বাঁ -গালের নীচের দিকে একটি তিল ছিল। কনের মুখেও সেই রকম তিল। এ রকম কানভাঙানি সত্ত্বেও খুব ধূমধাম করে বিয়ে হয়ে

গেল। যথা নিয়মে দাদা তার বউ নিয়ে লাহোর চলে গেলেন। বছর খানেক ধরে খোঁজ রাখলেন কথক কোনো বাচ্চা হয়েছে কি-না। হয়নি শুনে নিশ্চিতভাবে কথক বুঝলেন ওটা ছিল নিছক কানভাঙানি। এদিকে দাদা চাকরি ছেড়ে সন্ন্যাসী হলেন কারণ কথকের বৌদি আত্মহত্যা করার আগে চিঠিখানি দাদাকে লিখে গেছেন। লিখেছেন যে, বিয়ের আগেই তিনি জানতে পারেন যে দাদা মদ খান। জেনেছিলেন বলেই যে ছোকরা পাত্রী দেখতে গিয়েছিল তাকে বলেন যে পাত্রী গর্ভবতী তাতেও বিয়ে বন্ধ হল না। বৌদির মা বাপ জামাইয়ের টাকা দেখলেন কিন্তু মাতাল স্বামী কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না তিনি। শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা ছাড়া পরিত্রাণ পাবার অন্য কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না। ---এই কাহিনি শুনিয়ে পাঠকের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন যে নিজেকে বাদ দিয়ে কোনো কথাই জমে না। এই কাহিনির শেষ হল অন্য চমক দিয়ে। বৌদি মরেন নি মিথ্যা রটিয়েছেন দাদা। পরে সব জেনেছেন কথক। কথক তখন সন্ন্যাসী; হরিদ্বারে তাঁকে প্রণাম করেছিলেন সেই বৌদি। একজন পাঞ্জাবীকে বিয়ে করেছেন, কয়েকটি ছেলে মেয়েও হয়েছে। উপন্যাসে এটা মুখবন্ধ। মুখবন্ধের এই সামান্য কথাকে বাদ দিলে মূল কাহিনি লেখকের সংসার ছাড়ার কথা কোনোানোর জন্য লিখেছেন।

দ্বিতীয় কাহিনির আরম্ভে শহর কলকাতার কথা আছে। বাস্তবদৃষ্টি ছাড়া কারো পক্ষে উপন্যাস রচনা অসম্ভব।ঔপন্যাসিক অবধূত কলকাতা শহরের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি এঁকেছেন কথাসাহিত্যিকের খুঁটিনাটি দেখানোর ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। অবধূত সে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শুভায় ভবতু' উপন্যাসের কয়েকটি প্রসঙ্গ এনে উনিশ শতকের কোলকাতাকে একবার দেখে নিতে পারি।

১. 'তখন শহর জুড়ে অনবরত সভা সম্মেলন বসত না।
২. কোথাও একটা কিছু ঘটাতে পারলেই লাখ লাখ লোক জুটত না।
৩. ''একজনকে প্রধান-অতিথি হিসেবে ডেকে এনে সভাস্থ করে অন্য সকলকে অপ্রধান প্রতিপন্ন করবার রেওয়াজটি চালু হয়নি তখনও। এবং সকলের অল্পবিস্তর চৈতন্য ছিল বলে, চেতনা সঞ্চার করার জন্যে উদ্বোধক ডাকার প্রয়োজনই হত না।''[৭৭] ---এই বক্তব্যের মধ্যে তির্যক শব্দের প্রয়োগ করে বর্তমান কোলকাতার সাংস্কৃতিক সচেতনতার নিন্দাও করেছেন। জনসাধারণকে বোকা বানাবার কৌশলকে তিনি ভালো চোখে দেখতেন না।
৪. পাঞ্জাবীরা রাস্তার অপ্সরাদের[৭৮] চালনা করতেন। তাদের অবোধ্য ভাষার কলহ কচকচিতে কলকাতার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠত।
৫. পাঞ্জাবীরা মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকান খুলেছেন।'মস্ত বড় কড়ায় আধ ইঞ্চি পুরু সর পড়েছে দুধের ওপর। সেই দুধ আর সর দেওয়া চা এক গেলাস বা আধপোয়া দই আধপোয়া চিনি ঘোঁটা লস্যি এক ভাঁড় খেয়ে শহরের মানুষ ওঁদের গালমন্দ চোখরাঙানি হাসিমুখে সহ্য করছে।'
৬. অপ্সরারা আড়াই ঘন্টায় শ্যামবাজার থেকে খিদিরপুর পৌঁছাত। প্রতিবাদে অতি-

বিনীতভাবে কিছু নিবেদন করতে গেলে শুনতে হত---'ট্যাক্সিতে চলে যাও।'কিন্তু ট্যাঁকের সঙ্গে ট্যাক্সির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটুকু চিন্তা করে সত্যিই কেউ ট্যাক্সি চেপে বসত না।' এই উদ্ধৃতাংশে অবধূতের রসিকতাবোধ গোপন থাকে না।

৭. মাত্র সাড়ে তিন টাকা ট্যাঁক থেকে বার করতে পারলেই এক মণ বাঁকতুলসী বা চামরমণি ঘরে গিয়ে পৌঁছত---এখানে সেকালের ইতিহাস এবং আজকের বাজার দরের পার্থক্য তুলনার মাধ্যমে সহজেই প্রকাশ পেয়েছে।

৮. সাত সিকে দিয়ে এক জোড়া লাট্টু পাড় কিনলেই লজ্জা-নিবারণের কাজটা চলে যেত---এই মন্তব্যে ঔপন্যাসিক আজকের বিলাসিতা ও ভোগ-আরামের জীবনকে বিদ্ধ করেছেন।

৯. 'চাঁদনীর চাঁদমার্কা জামা শুধু চোদ্দ আনায় মিলত।' এটিও সেকালের সাথে একালের বাজার দরের পার্থক্য ও সাধারণ মানুষের বর্তমান অবস্থাকে বুঝতে সাহায্য করে।

১০. 'চীনদেশে তখন আমরা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-কলা-কৃষ্টি দেখাবার জন্যে দলে দলে মানুষ পাঠাতে আরম্ভ করিনি বলে চীনেবাড়ির জুতোর জন্যে 'লে আও আলাই লুপেয়া' শুনতে পাওয়া যেত।'[৭৯]

১১. সে সময়ে লোককে দেখাবার জন্যে বা বক্তৃতা দেবার জন্যে কেউ সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্য ইত্যাদি জিনিসগুলোকে ব্যবহার করত না। সমাজে মেলামেশা করার সময় ব্যবহার করত। ---এখনকার মুখোশধারী মানুষকে বিদ্ধ করেছেন লেখক।নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ঔপন্যাসিকের বড় গুণ। এ গুণ অবধূতের ছিল।

১২. পাড়ায় পাড়ায় তখন দশটা সার্বজনীন পূজো গজায় নি। কাজেই প্রতি দশজনের জন্যে একটি সমাজ গড়ে ওঠেনি। পাড়াশুদ্ধ মানুষ তখন একে অপরকে চিনত, পরস্পরের সুখ-দুঃখের সংবাদ রাখত। কারও বাড়িতে কেউ ম'লে না-ডাকতেই দশ জনে গিয়ে জুটত। মড়া নিয়ে যাবার জন্যে হিন্দু সৎকার সমিতির অফিস খোলে নি তখনও। ---এইসব খুঁটিনাটি খবর অবধূতের ঔপন্যাসিক সত্তাকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

১৩. 'শ্মশানে মাত্র চোদ্দ সিকে খরচা হত। কিন্তু অত সস্তাতেও এখনকার মত এত মড়া পুড়ত না!'[৮০] ---খরচ বাড়ছে এই খবরটুকু দেওয়া এখানে লেখকের উদ্দেশ্য নয়, লেখকের সরস মনের সজীব রসিকতাবোধ এই তথ্যের আধারে প্রকাশ পেয়েছে।

১৪. 'মড়া বেশী পুড়ত না-কারণ মাইক তখনও বাজারে ওঠে নি। বেঁচে থাকলে মাইকের গান, মাইকের বক্তৃতা শুনতেই হবে, এ ভয় ছিল না তখন। মাইক না থাকার দরুণ লোকে দুর্গা-সরস্বতী পূজোটুজো গুলো নিজেদের ঠাকুর দালানে বা ঘরের ভেতর সেরে ফেলত। রাস্তার নর্দমার ধারে বা পোড়ো মাঠে ন্যাকড়া-কানি টানিয়ে

পূজোরও ফাঁদ ফাঁদত না।'[৮১] ---খোলা মনে হাল্কা চালে উপন্যাসের কাহিনি এগিয়ে নেওয়ার দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে অবধূত সার্থকতার সাথে পরিবেশন করেছেন।

১৫. বিসর্জনের শোকযাত্রায় ধেই ধেই করে কেউ স্ফূর্তিতে নাচত না। কারণ বিসর্জনের বাজনায় বিষাদের সুর কোনোা যেত, হিন্দী সিনেমার সুর কোনোা যেত না।'[৮২]

---এখানে ইতিবাচক কথার পাশেই নেতিবাচক বাক্যের ব্যবহারে প্রকাশের অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়। অবধূত এ উপন্যাসে বহুক্ষেত্রেই সফলভাবে এ ধরনের বাক্য নির্মাণ করেছেন।

নয়. বিশ্বাসের বিষ[৮৩] : অসহায়া নারীর জীবন-যন্ত্রণা

বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে লেখক রচনার মধ্যে সরাসরি নিজের নাম ব্যবহার করেছেন : 'কেউ কেউ হয়ত বিশেষ রকম ক্ষুণ্ন হবেন এই ভেবে যে, অবধূত লোকটার চিত্তে তেমন শ্রদ্ধা নেই পাঠক-পাঠিকাদের সহৃদয়তার ওপর।'[৮৪]

বছর ছয়ের লেখক জীবনের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন অবধূত। প্রত্যেকদিন কিছু কিছু চিঠি আসে দূর দূরান্তর থেকে। এমন সমস্ত স্থান থেকে আসে যার নাম পর্যন্ত কখনও কোনোা যায় না।

- 'সে-রকম স্থানে বাঙলা দেশের মানুষ আছেন, তাদের কাছে আমার লেখা বই পৌঁছে গেছে, তাঁরা বই খানি পড়ে চিঠি লিখেছেন, এটা যে কতবড় উত্তেজনাকর কাণ্ড, তা' সবাই আন্দাজ করতে পারবেন না।'[৮৫]---আবার নিন্দাও শুনেছেন :
- 'কলম ছেড়ে স্যানিটারি ইন্‌সপেক্টারের চাকরি একটি জুটিয়ে নিয়েে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করুন। নিজের দেশ নিজের জাতি তথা ভবিষ্যৎ বংশধরদের মাথাগুলি আর চিবিয়ে খাবেন না।'[৮৬]

'বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের কাহিনিতে একটি চিঠির ঢঙে জানানো হয়েছে কেন লেখক অবধূত পূজা সংখ্যার লেখা দিতে পারেননি তার কারণ ব্যাখ্যামূলক সত্য জবাব। পনেরই আষাঢ় পত্রিকা অফিস থেকে তাঁর অগ্রিম নেওয়ার কথা ছিল, তিনি তার তিন মাস পরে উপস্থিত হয়ে কেন সেদিন হাজির হতে পারেননি সেই কারণ গুলি জানাচ্ছেন সেই সূত্রেই রচিত হচ্ছে এ অংশের কাহিনি। হ্যারিসন রোড-চিৎপুর রোড জংশনে একখানা ডবল ডেকার এমন একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসল যে ট্রাম গেল বন্ধ হয়ে এবং লেখক তিন মাসের জন্য অন্য কাহিনিতে ডুবে গেলেন। মাটির তলার জুতোর গোডাউনে আত্ম রক্ষা করে কীভাবে এলেন চোয়ালচাপা গ্রামে। আর তারপর মাখন লাল বসু ওরফে বাসের ড্রাইভারকে ফেলে তিনি ঢুকে পড়লেন চৌধুরী বাড়ির অন্দর মহলে। জানা গেল বেণু আসলে সতী। অনন্ত চৌধুরীর ছেলের মেয়ে নয় নিজের ঔরসজাত এবং অবিনাশ আসলে লেখক অবধূত। অনন্ত চৌধুরীর মেয়ে শেষপর্যন্ত বাবার শ্রাদ্ধ করতে পারল। চোয়ালচাপার অনন্ত চৌধুরী শেষপর্যন্ত শান্তিতে মরলেন তাঁর গোপন কথা তাঁর জীবদ্দশায় কেউ জানতে পারে নি-এমন কি পুরোহিত হরিশ ভট্‌চাযও নয়। এদিকে মাথার গোলমাল হয়ে গেছে কেষ্ট তথা মাখনলাল বসুর সে চোয়ালচাপার ছোট্ট মেয়েটিকে গলা টিপে মারতে যাচ্ছিল লোকেরা তাকে পুলিশে হস্তান্তর করেছে।

এ কাহিনির তৃতীয় পর্বটি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব থেকে আলাদা। ১৫০ তম পৃষ্ঠা থেকে এর বিস্তার ২১৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। পাঠকদের লেখা চিঠি ও তাকে গুরুত্ব দিয়ে লেখক নতুন ভাবে নিজেকে তৈরী করবার চেষ্টা করেছেন এই রচনার মধ্যে। শ্রীকাঞ্চনকুমারের চিঠি আর কাঁকন নামক একটি মেয়ের আত্মপরিচয় জানার একাগ্র বাসনা থেকে এ কাহিনি নির্মিত হচ্ছে। বাংলা দেশ থেকে পাঞ্জাব বোম্বে পর্যন্ত গড়াল। একজন বাঙালিবাবু অপরিচিত পাঞ্জাবী ড্রাইভারের হাতে স্ত্রীর চোখের সামনে নিহত হল। সেই ড্রাইভারের গোটা পরিববার মারা গেল সেই বাঙালি মহিলার প্রতিশোধ পরায়ণতার জন্য। কাহিনি যথেষ্ট লোমহর্ষক।

দশ. চরিত্র-বৈচিত্র্যে অন্যান্য উপন্যাস-কল্প রচনা

'তাহার দুই তারা'(এপ্রিল, ১৯৫৯) ---গ্রন্থের 'সাহানা' গল্পে পারিবারিক কাহিনি প্রকাশ পেয়েছে। পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে উল্লেখ্য---প্রদ্যুম্ন ঘোষাল, স্ত্রী অনুরাধা ও কন্যা সাহানা। এখানে কাহিনি বর্ণনার মুন্সীয়ানা আছে কিন্তু কোনো গভীর ও সত্যানুসারী জীবন কোধের পরিচয় নেই। এ গল্পে প্রদ্যুম্ন ঘোষালের মোটর বাইকে ঝড়ের বেগে ছুটে বেড়ানোটা প্রধান হয়ে চোখে পড়ে। বেপরোয়া উৎকেন্দ্রিক জীবন প্রদ্যুম্নের। তার লক্ষহীন ছোটাকে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এরপরে আকস্মিক পরিবর্তন আসে। অভাবনীয় সে পরিবর্তন যেন অনেকটাই অসম্ভব। তার মোটর বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় মেয়ে ও তার স্ত্রী সে তখন উর্ধ্বশ্বাস গতিবেগে উধাও। এই দুর্ঘটনার জেরে পরিবর্তন আসে। নির্জনে সে জীবন কাটায়। বহুদিন বাদে সে জানতে পারে তার স্ত্রী অনুরাধা আর কন্যা সাহানা জীবিত। তার একাকীত্বের নির্জনবাসের সাধনা শেষ হয় জীবনে স্থিতি আসে। উৎকেন্দ্রিক বাউণ্ডুলেপনার অন্ত্য হয়। বেপরোয়া জীবনের ভারসাম্য খুঁজে পায়। অবিমিশ্রকারিতার ভোগান্তি কী হতে পারে এ গল্পে তার পরিচয় মেলে। কাহিনি বর্ণনা ও অসম্ভব বিষয়ের বিশ্বাস্যরূপে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে মুন্সীয়ানা অস্বীকার করা যায় না। তবে এর সামাজিক সত্যতা বিষয়ে দ্বিধা থেকে যায়। একে---বড়জোর বিরল ঘটনাকেন্দ্রিক গল্প বলে স্বীকার করা যায়।

'একা জেগে থাকি' (১৯৬৭)

এই উপন্যাসে উপন্যাসে ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের নানা রুঢ় ও বাস্তব স্মৃতি জড়িয়ে আছে। চাল যাতে পাচার না হতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ভয়াবহ অত্যাচার করত সাধারণ মানুষের ওপর। তখন ট্রেনে ট্রেনে চলত অত্যাচার। চাল নামিয়ে নেওয়া এবং মারধোর করা। অত্যাচারের প্রতিবাদ সবসময় নিয়ন্ত্রণে থাকত না। পুলিশকে ট্রেন থেকে ফেলেও দিয়েছিল---সাধারণ মানুষ। এমন ঘটনার ছবি এঁকেছেন অবধূত। তবে এই খাদ্য আন্দোলন পটভূমি হিসেবে এসেছে, প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠেনি। একইভাবে নানা রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এখানে এসেছে কিন্তু তা উপন্যাসের ভর নয়। পারিপার্শ্বিক বিষয় হিসেবে এসেছে।

'কান পেতে রই' (১৯৬৭)

উপন্যাসে অবধূত দরবেশবাবার কাহিনি শুনিয়েছেন। স্মৃতিভ্রষ্টা আতর বা বাউরী ঘরের মেয়ের দীর্ঘ গল্প একটু অগোছালো মনে হয় কিন্তু তাঁর রচনাশৈলীর দক্ষতা অনস্বীকার্য।

ভূমিকালিপি পূর্ববৎ (১৩৭০)

ভূমিকলিপি পূর্ববৎ ১৯৬০ সালে গ্রন্থাকারে মিত্র ও ঘোষ থেকে প্রকাশিত হয় এর প্রথম প্রকাশ নবকল্লোল পত্রিকায়। এই গ্রন্থের অবলম্বন বীভৎস রস।এর সাথে অসাধারণ মুন্সীয়ানায় লেখক মিশিয়ে দিয়েছেন ডিটেকটিভ উপন্যাসের রোমান্স। মামল মোকদ্দমা আছে বলে নানা কূটনৈতিক মারপ্যাচ এ কাহিনিতে স্বাভাবিক ভাবে এসেছে। নানা উটকো ঘটনা এর আর দুসাধ্য পরিণতি দুরূহ কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত হয়েছে। ফলে পাঠক যেন ঘটনার নানাবিধ ঝড়ো হাওয়ায় দিশাহারা হয়ে যান। দিগম্বরচন্দ্র কাঁঠাল যেমন চেহারায় উদ্ভট ও বিকৃত তেমনি তার কাজকর্মখেয়ালিপনায় পূর্ণ। তাঁর শরণে এলে তাকে যেভাবে হোক রক্ষা করবার জন্য তিনি যা করতে হয় করেন। মানুষটি সহানুভূতি সম্পন্ন, অতিথিপরায়ণ, ভক্তিমান,এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রূপে এ কাহিনিতে শোরগোল তুলেছেন। সমালোচকের ভাষায় :

> '...মহাদেবের অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো মোটামুটি হিতকর উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই উপন্যাস-মধ্যে লম্ফঝম্প করিয়া বেড়াইয়াছে।'[৮৭]

অবধূত, বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য

মুনি ঋষিরা যোগভ্রষ্ট হন। অনেক যোগীকে আবার মানুষের মঙ্গলে যোগভ্রষ্ট করতে হয় (শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে) ---নইলে বসুন্ধরা নিঃস্ব-রিক্ত হন, ভ্রূণ নষ্ট হয় মাতৃগর্ভে, গাভীর বাঁট যায় শুকিয়ে, মাচায় শুকিয়ে মরে ফসল---রাজ্য জুড়ে নামে হাহাকার। বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে তাই আহ্বান করেন সুন্দরী শ্রেষ্ঠা লোলাপাঙ্গী-কন্যা তরঙ্গিনী। এই সমগ্র প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে হয় রাজ-গুরু থেকে রাজা, মন্ত্রী, মন্ত্রী-পুত্র, রাজকন্যা-প্রায় সকলকে। এক কথায় সামিল হন রাজ্যের প্রধান মানুষেরা। দেশ-রক্ষার মহান যজ্ঞে ছোট-খাঁটো ব্যক্তি-যন্ত্রণা হলো উপেক্ষিত। যেমন রাজকন্যা শান্তা, মন্ত্রীপুত্রের বাগদত্তা জেনেও স্বয়ং মন্ত্রীই বাধ্য করলেন রাজ-কন্যাকে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের অঙ্কশায়িনী হতে। সাহিত্যে এভাবেই মানব জীবনের সাথে নানা সূত্রে গাঁথা পড়েছে আধ্যাত্মিকতা। অথবা বলা চলে জীবনের সমাধান এমন পথে এসেছে যে পথ আমাদের নীতিজ্ঞান ও সমাজ নীতিকে সমর্থন করে না। 'বশীকরণ' উপন্যাসের প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে। শিল্পীর মূল্যায়ন সব সময় যথার্থ নাও হতে পারে কালের অপেক্ষা করতেই হয়---এমনকি সুকুমার সেনের মত বিশিষ্ট সমালোচকের পক্ষেও তা সত্য। তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে নিছকই ছেলে-ভুলানো কাহিনিকার ও রূপকথার জগতের কারবারি ভেবেছেন।

পরবর্তীকালে ত্রৈলোক্যনাথের রচনার নব-মূল্যায়ন হয়েছে। তাঁর ফ্যান্টাসির জগৎ নির্মাণের কারণ ছেলেখেলা নয়। তা হলো প্রকাশিত বিষয় বাজেয়াপ্ত হওয়ার ভয়। পরাধীন ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায়ের চোখে ধূলো দেওয়ার এ হেন কৌশল বঙ্কিমের 'কাকাতুয়া'। এই কারণেই কঙ্কাবতী নতুন শৈলীর দৃষ্টান্তস্বরূপ। বাস্তবতা প্রকাশের নতুন পথ-সন্ধান করেছে---এ রচনা। অথচ বিশ্বসাহিত্যে জাদুবাস্তবতার কোনো লক্ষণ-ই তখন ছিল না। কিন্তু সে প্রতিধ্বনি তখনই কোনো৷ যায়। আজকে ল্যাটিন-আমেরিকার সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়ালিজ্‌ম বা জাদুবাস্তবতা নিয়ে সমগ্র পৃথিবী তোলপাড় হচ্ছে। গাব্রিয়েল গাসিয়া মার্কেস, এমোস টুটুওলা, আলহো কাপেন্তিয়ের প্রমুখ এই জাদু-বাস্তবতার লেখক। Philip Thomson-এর The Grotesque গ্রন্থে বলা হয়েছে Grotesque হলো অসঙ্গতির শিল্পরূপ। এর দুটি ভাগ Playful Grotesque এবং Stire Grotesque মুখোশ খুলে দিতে Stire Grotesque রচিত হয়। ---এ বিষয়ে 'আলাল', হুতোম, 'পরশুরাম' পেরিয়ে এ যুগে দুজন লেখক উল্লেখযোগ্য অবধূত এবং গজেন্দ্র মিত্র।

বঙ্কিমের এই পটভূমিতে আমরা অবধূতের রচনার প্রকৃতি ব্যাখ্যায় বলতে পারি তিনি অকারণ বিস্তার পছন্দ করতেন না। স্বল্পাবকাশে তিনি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেন বেশি কথার অপচয় পছন্দ করেন না। এ প্রসঙ্গে মতি নন্দীর তুলনা মনে আসে। দেশপত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ মশাই বহুবার বহুভাবে মতি নন্দীকে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার জন্য বলেছিলেন যেমনটি সুনীল, শীর্ষেন্দু, সমরেশ মজুমদার অনর্গল লেখে। কিন্তু মতি সে প্রস্তাবে রাজী হননি। খেলিয়ে খেলিয়ে গল্প রচনা করা ওঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তা ছাড়া উনি কম লেখার মানুষ। কম লেখায় কাজ সারতে অভ্যস্ত। ওর লেখার কোনো ফেনা নেই। ওর লেখার কোনো অংশ বাদ দেওয়া যাবে না। কবিতার মতো? তাও না বিশুদ্ধ গদ্য, ভাবাবেগ বর্জিত, কাটা কাটা কথা, নির্মম নির্দয়, রোমান্টিক মালমশলা একদম নেই। ওর গল্প আধুনিক। সাম্প্রতিক সমস্যানির্ভর, মধ্যবিত্তের জীবন ছুঁয়ে যাওয়া কিন্তু যাকে বলে ফ্যান্টাসি বা ম্যাজিক রিয়েলিটি তা নেই। গল্পকে ঘুলিয়ে দেবার কোনো চেষ্টা নেই ওর। চিরাচরিত নিয়মে মতি সমস্যার মাঝখানে ঢুকে গল্প শুরু করেন। একটা দৃশ্য বা একটা সংলাপ।একটা ফাটল তৈরী করেন। তারপর সেই ফাটলের ফাঁক দিয়ে গভীরে ঢোকেন। ঢুকতেই থাকেন, যতক্ষণ না সেই নরম জায়গায় হাত লাগে ওর, যেটা খুবই গোপন, খুব নিরীহ। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। ভূমিকাটি একসঙ্গে বইতেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। মতির গল্পের চরিত্রদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন, 'বায়বীয় নয় এই মানুষেরা বাস্তব, মাংস-মজ্জা-চামড়ার। ভৌতিক নয়, ছায়া পড়ে, তাদের ফটো তোলা যায়। মতি তাদের দেখেছে।' তিনি মতির সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক চেহারার মিল লক্ষ করেছেন। বাস্তব-অবাস্তবের কথা ভাবলে মতি অবশ্যই মানিকবাবুর কাছের লোক। ওঁর বিচরণক্ষেত্র শক্ত জমির ওপর। অবধূতের সঙ্গে এখানেই সাদৃশ্য। ওর চরিত্রদের স্পর্শ করা যায় তাদের সমস্যার শরিক হওয়া যায়। কিন্তু আরাম পাওয়া যায় না। এদিক থেকে অবধূত-মানিক-মতি সকলেরই তাই। সেকারণে যখন বন্দ্যোপাধ্যায়ত্রয়ীর কথা ওঠে তারাশংকর আর বিভূতিকে নিয়ে, যখন ভোট নেওয়া হয়,

তখন মানিকবাবুর নাম থাকে তিন নম্বরে। তিনি তত জনপ্রিয় নন। আর দু-জনের লেখায় যে ভাবালুতা, যে হার্দিক টান, নিসর্গের সংগে মানবজীবনের যে মেশামেশি আমরা দেখি- এক কথায় যে মায়া ছড়ানো থাকে, সেটা মানিকবাবুতে নেই, মতির মধ্যে আরো নেই। ---একথা অবধূতের ক্ষেত্রে বেশি করে প্রযোজ্য। চোখের দেখার বাইরে তিনি অন্তর বিশ্লেষণে যেন অনাগ্রহী। মনের কথা কে বুঝতে পারে? অবধূত তাঁর কাহিনেতে চরিত্রের আচরণ ব্যাখ্যা করেছেন মনোবিশ্লেষণে আগ্রহ দেখাননি।

মানিকবাবু গ্রামবাংলা নিয়ে গল্প লিখেছেন, মতির গল্প মূলত কলকাতা শহর, তার ইট কাঠ, তার গলিনর্দমা, আর ঘেঁষাঘেষিগলি নর্দমা, আর ঘেঁষাঘেষি বসবাস করা মানুষজনকে নিয়ে। সমরেশ বসুও এই জায়গা থেকে শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরে সরে যান। নরেন্দ্র মিত্র কলকাতার গল্পে মন দিয়েছেন কিন্তু তাঁর নরনারী অপেক্ষাকৃত নরম মনের। একটুকুতেই তাঁদের চোখে জল এসে যায়, দুঃখকে বহন করার ক্ষমতা তাদের কম। সন্তোষ কুমার ঘোষ তাঁর সেই ১৯৭১ সালের ভূমিকায় মতিকে বলেছিলেন,

> ''কাটাছেঁড়ার নির্মম ছুরি, প্রলেপের মলম, দরকার এই দুই-ই।ঝকঝকে ছুরি দেখতে পাচ্ছি মতির হাতে কিন্তু এখন আর একটু ভালোবাসাও চাই।''[৮৮]

---অবধূত তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে তাদের কার্যকলাপের ভিত্তিতে শাস্তি বা পুরস্কার তাদের প্রাপ্য হিসেবে দিয়েছেন।

অবধূত খুব বেশি লেখেননি। আর খুব দীর্ঘ লেখাও তাঁর পছন্দ নয়। অবধূতের লেখা নিজের নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে কিছুই নয়। বাংলাসাহিত্যে রমাপদ চৌধুরীর সাথে আমরা অবধূতের বিভিন্ন বিষয়ে মিল খুঁজে পাই। অবধূত দীর্ঘ উপন্যাস লিখতেন না। রমাপদ চৌধুরীও তাই। এখন আমরা রমাপদ চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার কিছুটা উদ্ধৃত করবো।

> ''১৯৫৫ থেকে ১৯৬৯ এই চোদ্দ বছরে মাত্র ৬টি কি সাতটি উপন্যাস লিখেছি। ...যেখানে হাজার দুহাজার পৃষ্ঠার কম আজকাল উপন্যাস হয় না সেখানে আমার বড় উপন্যাস ৩০০ পৃষ্ঠাও পার করতে পারেনি। কিন্তু উপন্যাস লিখি বা না লিখি ছোট গল্প ঠিকই লিখে এসেছি -তাও পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে লিখে মাত্র ১২৫টি গল্প।''

প্রশ্ন : ছোটগল্প কেন লেখেন না?

''... অনেকেই হয়তো জানেন না, রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে নোবেল পুরস্কার পেলেও বিচারকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জুটেছিল তাঁর ছোটগল্পের জন্য। তারপর তো ছোটগল্প অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। অথচ বলতে পারেন আজ পর্যন্ত একটিও গল্পের বই কোনো পুরস্কার পেলনা কেন? কারণ সকলেরই ধারণা ছোটগল্প তো ছোট ব্যাপার। উপন্যাস লিখলেই, তা সে দ্বিতীয় শ্রেণির হলেও, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও লেখককে কিছুটা স্বীকৃতি দেন আর বেশ মোটা উপন্যাস হলে আরো বেশি। যত মোটা হবে এবং যত ভারি হবে, সাহিত্য যেন তত উচ্চস্তরের। না সুনীল গাঙ্গুলী বা শীর্ষেন্দুর কথা ভেবে

বলছি না, এমন কি বিমল মিত্র সম্পর্কেও না। কিন্তু বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে আমার ধারণা কোনো কালেই ভালো ছিল না। আজও নেই। আমি দেখেছি তাঁরা বৃহৎকেই মহৎ মনে করেন। আমাদের দেশে 'দ্য ফল 'বা' দ্য ওল্ডম্যান এ্যান্ড দ্য সি' লেখা হলে লেখকদের ভাগ্যে কি জুটত অনুমান করতে পারি। ঐ বই দু'খানা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করতেন এবং একদা আবিষ্কার করতেন বোদ্ধা সাহিত্যরসিক পাঠকদের চাপে পড়েই স্বীকার করতেন, ঐ লেখক দুজন নিতান্ত উপেক্ষনীয় নয়, কিছু একটা করা দরকার। অতএব ওরা যদি তখন 'বাড়ি বদলে যায়' ধরনের কিছু লিখে ফেলে থাকতেন সেটাকেই পুরস্কার দিয়ে মান বাঁচাতেন বিচারকরা। সে জন্যই গল্প লেখকরা লেখক হবার জন্যই উপন্যাস লেখেন।

প্রশ্ন : শৈশব থেকে এ পর্যন্ত আপনার যে জীবনধারা তার রেখাপাত সাহিত্যে কতটা পড়েছে? উত্তর : আমার সমস্ত লেখাই তো আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। একমাত্র রোমান্টিক দুটি উপন্যাস বাদ দিলে---'লালবাঈ'ও 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ'। এমন কি এখনই উপন্যাস আমার জীবন অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া।''[৮৯]

অবশেষে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বলতে চাই অবধূত নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছেন। বিস্তর জায়গায় ঘুরেছেন এবং নানা ধরনের মানুষকে দেখেছেন। বেড়াতে বেরুলে ঘরে ফেরার তাগিদ থাকে তাই প্রয়োজন মত সময় দিয়ে বিস্তৃত জীবনের খবর নেওয়া যায় না। 'রাহী' অবধূতেরও সে সমস্যা ছিল না। তিনি নিজের জীবনকে যুক্ত করেই---এসব মানুষের সঙ্গে থেকেছেন জাহাজের ডগে কাজ করা, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যোগ দেওয়া ,সন্ন্যাসীদের সাথে সময় কাটানো, জ্যোতিষের চর্চা করা, নিষিদ্ধপল্লীর কাছাকাছি থাকা, হিমালয়ের বরফে কিম্বা মরুভূমির রুক্ষতায় জীবন কাটানো, শ্মশানে তান্ত্রিকের সঙ্গ পাওয়া, বিকৃত কামাচারীদের সাথে পরিচিত হওয়া---সবটাই তাঁর ব্যক্তি সত্তার অর্জন। পথই তাঁকে জীবন চিনিয়েছে তাই জীবনের গভীরে মনস্তাত্বিক আলোচনা কীভাবে একটি উপন্যাসকে চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসে বদলে দিতে পারে সে চেষ্টা তিনি একেবারেই করেননি। তান্ত্রিক নিষ্ঠুরতা তাঁর জীবন থেকে পাওয়া বলে তিনি কাহিনির পরিণতিতে প্রয়োজনে তুলনামূলকভাবে কঠোর। কথাসাহিত্যের তুলনামূলক বিচারে তিনি অনেক বেশি সংযতবাক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবধূতের ঔপন্যাসিক সত্তার অনুসন্ধানের এটাই প্রধানতম কথা যে অবধূত নিজের জীবনকে ছাড়া কিছুই কল্পনা করে বলেননি। বরং ভৌতিক গল্প বা জাদুবাস্তবতার গল্প হিসেবে যেগুলিকে আমরা গ্রহণ করি সেগুলিও তাঁর অভিজ্ঞতারই ফসল। তিনি সত্যকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন---একথা যদি সত্য হয় তবে বলবো সেই ক্ষেত্রেও তিনি সংযম রক্ষা করেছেন। ইঙ্গিতে যা বলবার তা বলেছেন পাশ কাটিয়ে যাননি। অশ্লীলতা যদি থেকে থাকে তবে সে তাঁর বাস্তব জীবনেরই অভিজ্ঞতা! বরং সেই অশ্লীলতাকে তিনি রূপদক্ষ শিল্পীর তুলিতে পাঠকের কল্পনা উস্কে দিয়ে নির্মাণ করেছেন তবে সে কেবল দায় সারা কাজ নয় শৈলীর দিক দিয়ে খুবই প্রশংসনীয়। দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনে অবধূতের ঔপন্যাসিক সত্তার শিকড় যে বাস্ত

বের মাটিতে প্রোথিত হয়ে আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর কথাসাহিত্য যেন চরিত্রের মিছিল সবাই চলতি পথে অভিনয় করে গেলো---উপন্যাসে হয়তো তাদের জায়গা আর গুরুত্ব কম কিন্তু কাউকেই অবাস্তব বলার উপায় নেই সবাই ভীষণ ভাবে জীবন্ত। তাঁর লেখায় আবেগ আর অসংযম নেই বলে তার মূল্যও অনস্বীকার্য। ব্যক্তি জীবনে সাধক হওয়াতে জীবনকে হাল্কা করে দেখার একটা প্রবণতা সবসময়ই আছে। ঔপন্যাসিক অবধূতের ঘটনা বিন্যাস আর চরিত্র-চিত্রণ তাই যেন পাঠকের কাছে বৈঠকী মেজাজে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করা-একথা অবধূতের পাঠক মাত্রই বুঝতে পারেন। আমরা তাই সমালোচকের সাথে একমত নই যে, অবধূত বিকারোন্মত্ত কল্পনার সত্য মিথ্যা অতি রঞ্জিত বিবরণ দিয়ে এবং খানিকটা নিষিদ্ধ জিনিসের বেআব্রু বর্ণনা ও কিছুটা ছদ্মবেশী বৈরাগ্যকে অবলম্বন করে কথাসাহিত্যিক হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। বরং তাঁর ঔপন্যাসিক দক্ষতাই আমরা তাঁর রচিত কথাসাহিত্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার রূপায়ণ এবং নানা ধরণের চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হতে দেখি।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি 'মরুতীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন সজনীকান্ত দাস। আমরা পরিশিষ্টে তার কিছুটা উল্লেখ করেছি। উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসটির প্রশংসা করেছিলেন রাজশেখর বসু,অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,সজনীকান্ত দাস, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। (দ্রষ্টব্য:পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৯৪) 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' উপন্যাসটির সিনেমা করতে শুরু করেছিলে অঞ্জন দাস। খন্তার ভূমিকায় ছিলেন তরুণকুমার।(দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৯০)'মরুতীর্থ হিংলাজ' সিনেমা হয়েছিল। উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায় অভিনয় করেছিলেন। (দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৯০) এখনো ইউটিউবে আমরা অবধূত রচিত 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতে' সিনেমা রূপে সহজেই দেখতে পারি। অতএব অবধূত যুগোত্তীর্ণ---সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য

১. উপন্যাস এবং ছোটগল্পের বই নাটক কিম্বা কবিতার তুলনায় অনেক বেশি জনপ্রিয়।

২. দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, সাহিত্যপ্রকাশ : সাহিত্যের রূপমূর্তি, সাহিত্যের আকাশ পুথিপত্র,কলকাতা,১৯৮১,পৃ.২০৫

৩. অবধূত, শুভায় ভবতু, সুখ শান্তি ভালবাসা, তুলি-কলম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৭৮, পৃ. ৩

৪. অবধূত রচিত 'টপ্পাঠুংরি' উপন্যাসটি 'আমার চোখে দেখা'-এই নামে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট ৩২

৫. বিনোদিনী ত্যাগব্রতী বৌঠানে রূপান্তরিত হয়েছে---এই পরিণতি বুদ্ধদেব বসু মেনে নিতে পারেননি।

৬. অবধূত,শুভায় ভবতু, সুখ শান্তি ভালবাসা, তুলি-কলম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৭৮,পৃ. ১৩

৭. ঐ, পৃ. ১৫

৮. অবধূত, বিশ্বাসের বিষ, তৃতীয় পর্ব,তুলি-কলম,কলকাতা,১৯৭৪, পৃ. ১৫২
৯. রলাঁ বার্ত সংখ্যা (সম্পাদকীয়), এবং মুশায়েরা, সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১৮
১০. ইনি একজন আমেরিকান সমালোচক।
১১. মঁপাসা (05. 08. 1850-06. 07. 1893, Henri Rene Albert Guy De Maupassant
১২. উইলিয়ম সমরসেট মম (25. 01. 1874-16. 12. 1965, William Somerset Maugham
১৩. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, উপন্যাসের রূপরীতি, দে'জ পাব্লিশিং, কলকাতা,মে ২০১১, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, পৃ. ১৫
১৪. Cluster of impressions : Bennett: English Actor, Dramatist,Writer
১৫. Jhon Galsworthy :14. 08. 1867-31. 01. 1933, The man of Property, (1906), The Country House(1907) Justice (1910) In Chancery (1920), To Let (1921), The Silver Spoon (1926), The Forsyte Saga, Loyalities (1922)
১৬. অবধূতের 'যা নয় তাই' উপন্যাসের প্রকাশকাল অজ্ঞাত।
১৭. ধূর্জটিপ্রসাদ বুঝতে পেরেছেন যে মেয়ে আজ তাকে কিছু গোপন করছে। তাই মনের দুঃখে জলতরঙ্গ হাতে তুলে নিয়েছেন।
১৮. 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসে দেবীদাস বাবার কাছে এই আশীর্বাদ কথক অবধূত চেয়ে নেন। অবধূত ভ্রমণ কাহিনি সমগ্র,'নীলকণ্ঠ হিমালয়',মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স, ১৯৭৯, পৃ. ৪৬৩
১৯. W. J. Harvey,Character and the Novel- 1965, pp 69
দ্রষ্টব্য :গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প,দে'জ পাবলিশিং কলকাতা,ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪,পৃ. ১০৭
২০. অবধূত, উদ্ধারণপুরের ঘাট, তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৫৬,পৃ. ৮
২১. দ্রষ্টব্য:অঞ্জন দাসের সাক্ষাৎকার, জাগরণ পত্রিকা, পৃ ৩৪,পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৯০, চিত্র নং ২৭
২২. অবধূত, উদ্ধারণপুরের ঘাট, তুলি কলম, কলকাতা,১৯৫৬, পৃ. ৫
২৩. ছিন্নপত্র-সংখ্যা ১০, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৮৮৮
২৪. অবধূত, উদ্ধারণপুরের ঘাট, তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৫৬,পৃ. ৯
২৫. ছিন্নপত্র-সংখ্যা ১০, রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৮৮৮
২৬. অবধূত, উদ্ধারণপুরের ঘাট, তুলি-কলম,১৯৫৬, কলকাতা, পৃ. ৯
২৭. ঐ, পৃ. ২০
২৮. ঐ, পৃ. ২২
২৯. ঐ, পৃ. ৩৩

৩০. রলাঁ বার্ত, সম্পাদকীয়, এবং মুশায়েরা,কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১৭, পৃ. ১৯
৩১. অবধূত, উদ্ধারণপুরের ঘাট, তুলি-কলম, কলকাতা, ৩৬-৩৭
৩২. অবধূত,'নীলকণ্ঠ হিমালয়' ভূমিকা, সৈয়দ মুজতবা আলী, মিত্র ও ঘোষ,১৯৬৫
৩৩. ঐ
৩৪. অবধূত, উদ্ধারণপুরের ঘাট, তুলি কলম, কলকাতা, ১৯৫৬,পৃ. ১৭.
৩৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব, কামিনী প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৯, পৃ. ৪০২-৪০৩
৩৬. ঐ, পৃ. ৪০৫
৩৭. অবধূত, উদ্ধারণপুরের ঘাট, তুলি কলম, কলকাতা, পৃ. ২৯
৩৮. ঐ, পৃ. ১৭
৩৯. ঐ, পৃ. ১৭
৪০. ঐ, পৃ. ১৭
৪১. ঐ, পৃ. ১৮
৪২. ঐ, পৃ. ১৮
৪৩. ঐ, পৃ. ১৩
৪৪. ঐ, পৃ. ১৪
৪৫. ঐ, পৃ. ১৫
৪৬. ঐ, পৃ. ৭
৪৭. এই মহিলা তার রুগ্ন স্বামীর সুস্থতা কামনা করে মহাত্মা যোগী ভ্রমে আগমবাগীশের কাছে এসেছিলেন। আগমবাগীশ এই মহিলার প্রতি লালসাপরায়ণ হন। মহিলাটি নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিল। সিঙ্গী গিন্নি আগম বাগীশের লালসার সাথে নিজের নিরর্থক জীবনকে যুক্ত করেছিলেন বলেই আগমবাগীশ এই অসহায়া মহিলাকে ছেড়ে দেন।
৪৮. অবধূত, উদ্ধারণপুরের ঘাট, তুলি-কলম, কলকাতা,১৯৫৬, পৃ. ১৫-১৬
৪৯. ঐ, পৃ. ১৬
৫০. ঐ, পৃ. ১৬
৫১ ঐ, পৃ. ২১
৫২. ঐ, পৃ. ২১
৫৩. ঐ, পৃ. ১৯-২০
৫৪. পুতুলনাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,প্রকাশভবন,প্রথম সংস্করণ ২১ মে ১৯৩৬, পঞ্চশৎ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৫, পৃ. ৯৪
৫৫. ঐ, পৃ. ৯৪
৫৬. অবধূত, উদ্ধারণপুরের ঘাট, তুলি-কলম, কলকাতা,১৯৫৬, পৃ. ১০

৫৭. ঐ, পৃ. ৩৩
৫৮. ঐ, পৃ. ৩৩
৫৯, ঐ, পৃ. ১০
৬০ ঐ, পৃ. ২৩
৬১ ঐ, পৃ. ২৪
৬২ ঐ, পৃ. ২৪
৬৩ ঐ, পৃ. ২৩
৬৪ ঐ, পৃ. ২৫
৬৫. ঐ, পৃ. ২৪
৬৬. ঐ, পৃ. ২৫
৬৭. ঐ, পৃ. ১৯-২০
৬৮. ঐ, পৃ ১০
৬৯. কাকবন্ধ্যা, বহুব্রীহি, অবধূত, পৃ. ৩৭
৭০. বশীকরণ, অবধূত, সাধক জীবন সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, পঞ্চম মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৮, পৃ. ১৩৫
৭১. ঐ, পৃ. ১৩৬
৭২. ঐ, পৃ. ১৩৮
৭৩. কাকবন্ধ্যা, বহুব্রীহি, অবধূত, পৃ. ৩৭
৭৪. অবধূত, সুখ শান্তি ভালবাসা, শুভায় ভবতু, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১
৭৫. ঐ, পৃ. ৩
৭৬. ঐ, ১৩
৭৭. ঐ, পৃ. ৪
৭৮. 'অপ্সরা' বলতে লেখক অবধূত 'শুভায় ভবতু'(১৯৫৭)উপন্যাসে তখনকার রাস্তায় চলা দোতলা 'বাস গাড়ি' কে বুঝিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'তুতুল' নামক গ্রন্থে এই সময়ের কলকাতার কথা। 'সময়টা কি ১৯৪৬? ২ নং বাস তখনও এখনকার লেকের মোড়ে আসত। ...বড় বড় দোতলা বা, শিখরা মালিক ছিলেন। তখন বাস বা ট্যাক্সি শিখরাই চালাতেন।' (মহাশ্বেতা দেবী, তুতুল, স্বর্ণাক্ষর,কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৫)
৭৯. অবধূত, সুখ শান্তি ভালবাসা, শুভায় ভবতু, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৬
৮০. অবধূত,বশীকরণ, সাধক জীবন সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৮, পৃ. ১৩৭
৮১. অবধূত, সুখ শান্তি ভালবাসা, শুভায় ভবতু, তুলি-কলম, কলকাতা,প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৭৮, পৃ. ১০
৮২. অবধূত,বশীকরণ, সাধক জীবন সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, পঞ্চম মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১৮,

পৃ. ১৩৫

৮৩. অবধূতের 'ফক্কড়তন্ত্রম' (১৯৬৮) উপন্যাসটি ছয় বছর বাদে 'বিশ্বাসের বিষ' (১৯৭৪) নামে তুলি-কলম থেকে প্রকাশিহত হয়।

৮৪. অবধূত, বিশ্বাসের বিষ, তৃতীয় পর্ব, পৃ. ১৫১

৮৫. ঐ, পৃ. ১৫২

৮৬ অবধূত, বিশ্বাসের বিষ, দ্বিতীয় পর্ব, সবিনয় নিবেদন, ১৯৭৪,পৃ. ১৩৬

৮৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২-২০১৩, পৃ. ৪২৮

৮৮. রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা, সম্পাদক পুরকাইত উত্তম, একাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪২০, উজাগর, কলকাতা। পৃ. ৩১ -৩২

৮৯. জনমন-জনমত, বৃহস্পতিবার ১৮ মে ১৯৮৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত, পৃ. ৩৪

তৃ তী য় অ ধ্যা য়

বড়ো গল্প বা উপন্যাস-কল্প রচনার বিষয়ানুসন্ধান : বীভৎসতা, বিচিত্র নরনারী ও অশ্লীলতা প্রসঙ্গে অবধূত

পৃষ্ঠা

এক. 'ভোরের গোধূলি': জীবনের বিষন্নতাময় পরিণতি	১৫৬
দুই. 'টপ্পা-ঠুংরি' বা 'আমার চোখে দেখা'---একের মধ্যে চার	১৬২
তিন. 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী'---যেন উপন্যাস-কল্প রচনার জীবনের গোত্রান্তর	১৭২
চার. অসামাজিক বিষয়ের অশ্লীলতা-মুক্ত বর্ণনা	১৮২
পাঁচ. স্রষ্টার নয় বিষয়-নির্দিষ্ট ভাষাঃ অবলম্বন উপন্যাস-কল্প রচনা	১৮৭
ছয়. 'কৌশিকী কানাড়া' : মহাকালের ডাক, নির্ভয় আত্মাহুতি	১৯১
সাত. প্রসঙ্গ : বীভৎস রস	১৯৭
'আট. 'বিশ্বাসের বিষ' বা 'ফক্কড়তন্ত্রম': জীবনবৈচিত্র্য সন্ধান	২০৮
নয়. উপন্যাস-কল্প রচনাঃ বিশ্বাসঘাতিনী নারী ও বিকৃতকামা পুরুষ	২১৭
দশ. 'সাচ্চা দরবার': বিচিত্র নরনারী	২৩১
এগারো.অশ্লীল প্রসঙ্গ আর শৈল্পিক রূপায়ণঃ	২৩২
বারো. 'শুভায় ভবতু' : মৃত্যু যেখানে পায়ে পায়ে	২৪৪

তৃ তী য় অ ধ্যা য়

বড়ো গল্প বা উপন্যাস-কল্প রচনার বিষয়ানুসন্ধান : বীভৎসতা, বিচিত্র নরনারী ও অশ্লীলতা প্রসঙ্গে অবধূত

ভূমিকা

অবধূত জীবনে ও সাহিত্যে---উভয় সত্তায় সত্যকার 'রাহী' অর্থাৎ পথিক। তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে সমুদ্রে, পর্বতে এবং মরুভূমিতে। তাই অচেনা রাস্তায় ও নির্জন জঙ্গলে গৃহত্যাগী অবধূত যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার তুলনা নেই। পুলিশের গ্রেপ্তারী এড়াতে তাঁকে ধরতে হয়েছে নানা ছদ্মবেশ। কখনো ধরেছেন সন্ন্যাসীর ভেক। কখনো সাধারণ পুণ্যার্থীর মত তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনো বা তিনি সম্পূর্ণভাবে একজন 'ফক্কড়'। এভাবে কেটে গেছে অজ্ঞাতবাসের আঠারোটা বছর। সবমিলিয়ে মুসাফিরির জীবন ছিল ত্রিশ বছর। তারপর চুঁচুড়ায় জোড়াঘাটে নিজের বাড়িতে বসে অতীত বেওয়ারিশ জীবনের স্মৃতি নিয়ে লিখলেন ত্রিশটি উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস 'মরুতীর্থ হিংলাজ' প্রকাশিত হল ১৯৫৪ সালে। উপন্যাসের সংজ্ঞায় আজো আমরা সকলে সহমত নই, তবু উপন্যাসের মত কিম্বা বড় গল্পের মত যেসব রচনা অবধূত করেছেন বাংলাসাহিত্যে তার জনপ্রিয়তা আজও ফুরিয়ে যায়নি। আমরা বক্ষ্যমাণ গবেষণা অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে সেই রচনার বিষয়গুলি জেনে নেব। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় কাজটি হলো এইসব উপন্যাস-কল্প রচনার রসবিচার। এই সূত্রে আমরা অবধূতের কথাসাহিত্যের অবলম্বিত রস প্রধানত 'বীভৎস' নামক রস কি-না তা বিশ্লেষণ করে দেখবো।

অবধূতের ছোট ছোট উপন্যাস বা উপন্যাস-কল্প* রচনা আমাদের মুগ্ধ করে মূলত অবলম্বিত বিষয়ের বৈচিত্র্যের জন্য। এছাড়া আমাদের ভালো লাগার কারণ হলো অবধূত নানা ভাষাভাষী আর নানা রাজ্যের লোকজনদের তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। আমরা এই অধ্যায়ে দেখবো অবধূত সাহিত্যে অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন নাকি ঘটনাকে অস্বীকার না করে অশ্লীল ঘটনাকে শৈল্পিক সংযম দিয়ে পাঠককে সত্যের রস গ্রহণে সহায়তা করেছেন।

---

*এদের 'নভেলা' বলা যেতে পারে। ছোটগল্প ও উপন্যাসের মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের এসব নভেলা থেকে ছোটগল্প সার্থকভাবে গড়ে উঠেছে বলে মনে করেন স্পেনের সাহিত্য-সমালোচকেরা। সার্ভান্তাসের Novelas Ejemplarers(1613)প্রকাশিত হবার পরে স্পেনে সার্থক ছোটগল্প দ্রুত জন্মলাভ করে। ইতালি,ইল্যাণ্ড,ফরাসি–সব দেশেই ছোটগল্পের পূর্ব প্রস্তুতি এর মধ্যেই হয়েছিল।

দুর্গম মরুভূমি, দুস্তর সমুদ্র (‘নীলকণ্ঠ হিমালয়), অলজ্ঘ্য হিমালয় (হিংলাজের পরে) ইত্যাদি তাঁর রচনায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে এসেছে। সমাজ বিরোধী, সমাজ সেবী, ছদ্ম ভদ্রলোক, দেশদ্রোহী, লম্পট, বিকৃত মানসিকতার মানুষ, ডাক্তার, বেকার, ড্রাইভার, বিপ্লবী প্রভৃতি ---নানা চরিত্রের ভিড়। নারী চরিত্রের মধ্যে এসেছে লাস্যময়ী নারী, চরিত্রহীনা নারী, ব্যক্তিত্বময়ী নারী, অফিস-কর্ত্রী নারী,নিয়তি -নিহত নারী, খাণ্ডারণী নারী, দেহপশারিণী নারী, এয়ার হোস্টেস, বাড়ি-উলি, প্রভৃতি। এসেছে নানা পেশার মানুষ যেমন : স্বর্ণব্যবসায়ী, হোটেল মালিক, ব্যবসাদার, মাড়োয়ার ব্যবসায়ী, মরুভূমিতে কুয়োর মালিক, মন্দিরের পাণ্ডা, ডালাধরা, সেবাইত, ছড়িদার, এঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানিক, ম্যাজিসিয়ান, ট্রেনের ওয়াগান-ব্রেকার,পেশাদার খুনী, মড়া-পোড়ানো ডোম, মড়া-বহা কেঁধো পেশার মানুষ, ব্যারিস্টার, পুলিশ ইত্যাদি। তাঁর রচিত কথাসাহিত্যে বাংলা ভাষাভাষির ভৌগোলিক সীমা অনেকখানি বেড়ে গেছে। তাঁর কথাসাহিত্যে এসেছে করাচী, লাসবেলা স্টেট, ব্রহ্মদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, কেরালা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, দিল্লী, ইত্যাদি। নর্মদা তীরের সাধু, কৈলাসের নানা সাধু-সঙ্গ অবধূতের রচনাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। আমরা বিষয়-ভিত্তিক আলোচনায় প্রবেশ করার আগে অবধূতের উপর তাঁর পূর্ব-সূরিদের অবদান জেনে নেবো।

রবীন্দ্র-শরৎ সাহিত্যের পরে বা সমকালে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কথাসাহিত্যে নতুন পথসন্ধানের একটা গোষ্ঠীগত প্রেরণা দেখা দিয়েছিল---এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কল্লোল (প্রথম প্রকাশ -১৩৩১) কালিকলম (প্রথম প্রকাশ -১৩৩৩) এবং প্রগতি(১৩৩৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে রবীন্দ্র-উত্তর যুগ প্রবর্তনের সংকল্প করেছিলেন একদল লেখক । তাঁদের মনে কথাসাহিত্যের কোনো সুস্পষ্ট আদর্শ ছিল না। এঁদের সাথে ভাবগত সাদৃশ্য ছিল ‘উত্তরা’ ‘আত্মশক্তি’, ‘ধূপছায়া’, সংহতি’---ইত্যাদি পত্রিকার। এসব পত্রিকার মধ্যে পুরোধা পত্রিকা নিঃসন্দেহে ‘কল্লোল’। অনেকেই হাতিয়ার করলেন ফ্রয়েড[১] ও হ্যাভ্লক এলিসের[২] অবচেতন যৌন মনস্তত্ত্ব, মার্কস ও রুশ বিপ্লব-বাহিত সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা। সমাজের নীচু তলার মানুষের আদিম প্রাণ-পিপাসা স্থান পেলো সাহিত্যে। অন্যদিকে বন্ধন-অসহিষ্ণু, ব্যক্তিচেতনা সর্বস্ব ও বোহেমীয় জীবনবোধ-আশ্রিত ভাবনা স্থান করে নিল কোনো কোনো কথা সাহিত্যে। মণীন্দ্রলাল বসু, গোকুল নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল এই সময়ের কয়েকটি বিশিষ্ট নাম।

এঁদের সাহিত্য-বক্তব্য মুখ্যত নগরকেন্দ্রিক। এঁরাই কথাসাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে আসার সূত্রে প্রবলভাবে রবীন্দ্র-বিদ্রোহী। বলা ভালো এঁরা কথাসাহিত্যকে জীবন-বাস্তবতায় সজীব করে তুলতে বিশেষ আগ্রহী হলেন। কিন্তু আগ্রহের প্রাবল্যে দেখা দিল আতিশয্য। যৌন মনস্তত্ত্বের ছবি আঁকতে গিয়ে দুঃসাহসী হবার আগ্রহ যত প্রকাশ পেল, শিল্প-সংযম রক্ষা করে যথার্থ বাস্তবনিষ্ঠ হবার প্রেরণা তত জোরালো বলে মনে হল না। দরিদ্র, দুর্গত মানুষের যে ছবি ফুটল, তা কেবল শহরের বস্তি অঞ্চলের। তেমনভাবে গ্রাম জীবনের কথা এলো না। আরও দেখা গেল শহরের গ্লানিময় সে ছবিতে একপেশে উগ্রতা ও অতিরেকের ছাপ।

> "... তা অনেকটাই 'stark realist' জীবনের নগ্ন ক্রূর ছবি, সেখানে ফুটে ওঠে জীবন সম্পর্কে এক সংশয়ী, সিনিক্যাল তির্যক দৃষ্টি। নরনারীর অবচেতনায় তামস রহস্যকে নির্লিপ্ত মনন জিজ্ঞাসা নিয়ে এঁরা উন্মোচনের প্রয়াসী হন। প্রাক্-কল্লোল পর্বের কথাশিল্পী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও তাঁর পরবর্তী লেখক জগদীশ গুপ্ত এবং এঁদেরই উত্তরসূরি হিসেবে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।"[৩]

---অবধূতের উপর এ প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। আভিধানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে সুচিন্তিত ও সুসংবদ্ধ অনুশীলন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিশেষ সত্য বা তত্ত্বে উপনীত হওয়ার নামই গবেষণা। এখানে গল্পের বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তার বহুমাত্রিক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকা আমাদের প্রথম কাজ। মনে রাখা প্রয়োজনীয় যে বড়োগল্প, গল্প, ছোটগল্প, অণুগল্প এবং উপন্যাস-কল্প রচনা কী---এই সূত্রে তার গোত্রবিচার ও কাহিনির চরিত্র সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। কাহিনিতে রূপায়িত সেই সব চরিত্রের সমাজগত অবস্থান শিক্ষা-সংস্কৃতি ভাষা ও আচরণ সন্ধান করে সার্থকতা বিচার আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রধান কাজ। অবধূতের উপন্যাস-কল্প রচনায় 'বীভৎস রস' ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। যেমন 'ভূমিকালিপি পূর্ববৎ'[৪]। নরনারীর বিচিত্র স্বভাব রূপায়িত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন রূপদক্ষ সৃষ্টির নানা ক্ষেত্রে। অতিরিক্ত লাভ এই যে তাঁর রচনা ও বক্তব্য স্পষ্ট, প্রাঞ্জল, ও সর্বজনবোধ্য। অবশ্য কারো কারো কাছে তাঁর কোনো কোনো লেখা অশ্লীল বলে মনে হয়েছে। আমরা নির্দিষ্ট অংশে সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি তাঁর শিল্পিত সংযম 'মরুতীর্থ হিংলাজ'(১৯৫৪)-এর অত্যাচারিতা কুন্তী প্রসঙ্গে, 'শুভায় ভবতু'(১৯৫৭) উপন্যাসে শুক্তিসুন্দরীর মানসিক বিকার প্রসঙ্গে, বন্দিনী দুরি বৌদির অপমান বিষয়ে, 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী'(প্রকাশকাল অজ্ঞাত)তে লাস্যময়ী মিনতি মিত্র প্রসঙ্গে আমাদের বিস্মিত করে। সেক্ষেত্রে লেখকের অতি বড়ো শত্রুও স্বীকার করবেন যে অবধূতের মধ্যে বড়ো লেখকের চরিত্র-ধর্মই প্রকাশ পেয়েছে।

সার্থক গবেষণামাত্রই গবেষকের মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে। কোনো বিষয়ের সমালোচনা মূলক বিচার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অথবা অন্যকৃত তথ্যের সঙ্গে তার আবিষ্কৃত তথ্য বা ভাবনার তুলনামূলক সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে সত্যে পৌঁছানোই গবেষকের একমাত্র লক্ষ্য। -অর্থাৎ গবেষণা হলো মূলত জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান-আর সে অনুসন্ধান চলবে অবশ্যই নির্দিষ্ট একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। 'Research involves, specifically, an investigation into a particular matter of problem.'[৫] অবধূত সম্বন্ধে বলা হয় তিনি কেবল বীভৎস রসের লেখক। আমরা তা সবক্ষেত্রে সত্য বলে মানি না। 'পথভুলে'(১৯৬২), 'ভোরের গোধূলি'(১৯৬৯),'কলিতীর্থ কালীঘাট'(১৯৬৫),'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে','রূপকথার মত', 'নেহাত নাচর' ইত্যাদি উপন্যাস ও গল্পে কোনোভাবেই বীভৎস রস আছে বলা যাবে না। কী নির্ভার চটুল গতিতে এর কাহিনি এগিয়ে চলেছে পরিণতির দিকে যে পাঠকের মন হাল্কা আনন্দে ভেসে যেতে বাধ্য।

গবেষণার উপরি-উক্ত বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে যা পেয়েছি তা নথিভুক্ত করেছি। বক্তব্যের প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমত তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক যুক্তি প্রদর্শন করেছি। এভাবে আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতি স্থির বিশ্বাস এসেছে। নির্দিষ্ট-বিষয়- কেন্দ্রিক গবেষণার ফলকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সিদ্ধান্ত হিসেবে এ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছি।

সংজ্ঞা : Robert Ross-এর মতে 'Research is essentially an investigation, a recording, and an analysis of evidence for the purpose of gaining knowledge'[৬] 'গবেষণা' শব্দটি বাংলায় এসেছে ইংরাজী `research' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে। যার অর্থ পুনরনুসন্ধান। উপযুক্ত সমার্থক শব্দের অভাবে প্রচলিত হলেও 'গবেষণা' শব্দটির মধ্যে 'research' শব্দের ব্যাপক তাৎপর্য ধরা পড়েনি। 'অনুসন্ধান' বা 'এষণা' যাই বলা হোক না গবেষণার উদ্দেশ্য সত্যকে আবিষ্কার করা। অতএব অনুসন্ধান বলতে সত্যের অনুসন্ধান বোঝায়। কোন বিষয়ে নবতর ও নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য প্রগাঢ় অনুসন্ধানই গবেষণার মূল কথা, সংক্ষেপে, কোনো বিষয় সম্পর্কে নতুন চিন্তা, অজ্ঞাত বিষয়ে আলোকপাত করা, বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা করা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করার নামও গবেষণা। স্বীয় অস্তিত্বের ক্রম প্রসারণের সম্ভাবনাতেই মানুষ তার মননবৃত্তির অনুশীলনে প্রয়াসী হয়। জ্ঞানের রহস্য-রাজ্যে তার নিত্যনতুন অনুসন্ধানের আগ্রহ-ই গবেষণা, আর তার যুক্তিনিয়ন্ত্রিত অনুশীলন ও সিদ্ধান্তের সাধারণীকরণ থেকেই সার্থক রূপ নেয় গবেষণাপত্র। আর সে রূপকে লিপিবদ্ধ করে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলা গবেষণার শেষতম ও প্রধানতম কাজ।

স্বরূপ : প্রাচীন নিদর্শন বা তথ্যের সংগ্রহ করাই গবেষকের একমাত্র কাজ নয়। কোনো তুচ্ছ ভুল সংশোধনের জন্য ব্যক্তিগত সময় ও উদ্যমের অপচয় করাও গবেষকের উদ্দেশ্য নয়। যে-কোনো গবেষণার সাফল্য নির্ভর করে গবেষকের মৌলিক অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও গুঢ় নিরপেক্ষ বিশ্লেষণী প্রতিভার উপর। Jhon Grote -এর ভাষায় ':Each new particular of knowledge is not an addition to, but a newly observed part of a previously conceived whole'[৭]গবেষকের উদ্দেশ্য তথ্য সংগ্রহ করা নয়, নতুন কোনো তথ্যে আলোক -সম্পাত;এখানে আরও স্মরণ রাখতে হবে গবেষণার ক্ষেত্রে অযৌক্তিকতা, ভিত্তিহীন আত্মবিশ্বাস এবং যথার্থ শৃঙ্খলার অভাব গবেষককে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে, অতএব সচেতন ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গবেষককে গবেষণা কার্যে অগ্রসর হতে হবে। সে ক্ষেত্রে নিচের কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে :

১. গবেষণা হলো একটি মৌলিক কাজ। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অবধূতের বিভিন্ন রচনা বিশ্লেষণ করে গবেষণা-অভিসন্দর্ভের অধ্যায়-পরিকল্পনানুসারে রূপ দেওয়া হয়েছে।
২. সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করেই গবেষণার কাজ এগিয়ে চলে। এখানে অবধূতের অজ্ঞাত জীবন ও রচনাকর্ম কীভাবে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে তা দেখানো হয়েছে। এর মধ্য থেকে তথ্য যেমন তুলে আনা হয়েছে তেমনি যুক্তিসম্মত

ভাবে তাঁর রচনার বিশ্লেষণও করা হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর সকল সৃষ্টিই নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রূপ পেয়েছে।

৩. আবার পূর্ব-আলোচিত ও পূর্ব-জ্ঞাত বিষয়ের উপর অভিনব নতুন তথ্য বা দৃষ্টির আলোকপাতও অবশ্যই সার্থক সাহিত্যিক গবেষণার বিষয় হতে পারে---'If it supplies a demand or deficiency that other minds have already revealed'[৮].

৪. কোনো বিশেষ দর্শন, কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে খোলা মনে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। সেকথা মনে রেখে ব্যক্তি অবধূতের মুদ্রাদোষ,অতিরিক্ত আত্মপ্রক্ষেপ, বীভৎস রসের বাড়াবাড়ি ইত্যাদি কীভাবে ত্রুটিযুক্ত কিম্বা উপন্যাসের পরিবেশ রচনার অঙ্গ হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অবশেষে বলতে হয় নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে সুতীব্র সচেতন সংযোগ জনিত ব্যক্তিগত অস্থিরতা থেকে সমস্যা সমাধানের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। তখনই সেই আন্তরিক প্রযত্ন জন্ম দেয় গবেষণা-কর্মের। অতএব গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রথম কাজ হলো নির্দিষ্ট একটি সমস্যা সম্পর্কে পর্যালোচনা ও তার বিষয়ে সর্বস্তরিক সচেতনতার জাগরণ। অতঃপর দ্বিতীয় কাজ হলো নানা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে নব নব অনুমান করা, আর বিশ্লেষণের মাধ্যমে, সে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সাহিত্য বিষয়ে গবেষকেরা উপরি পান। তা হলো নান্দনিক প্রাপ্তি । তবে গবেষণাকর্ম জ্ঞানমার্গের বিষয়, নান্দনিকতার প্রতি তার আগ্রহ সামান্যই। বেট্সনের ভাষায়'...a work of literature is an object of knowledge, and the proper subject as such of academic study rather than as a source of entertainment or emotional excitement.'[৯] এক বা একাধিক সাহিত্যিকের কোনো বিশেষ রচনাধারা বা সাহিত্যচেতনার বিচার সমকাল বা ভিন্নকালের সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা, বিভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলনের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা সাহিত্যিক গবেষণার ক্ষেত্রভুক্ত হতে পারে। আবার বিশেষ যুগের প্রেক্ষিতে সাহিত্যের বিশ্লেষণই শুধু নয়, যুগ লক্ষণও সাহিত্যিক গবেষকের বিচার্য হতে পারে।

এক. ভোরের গোধূলিঃ জীবনের বিষন্নতাময় পরিণতি

'ভোরের গোধূলি'[১০] (১৯৬৯) অবধূতের লেখা একটি নভেলেট বা উপন্যাস-কল্প রচনা। সুদূর বর্মার প্রোম শহর থেকে কলকাতা পর্যন্ত এর কাহিনির বিস্তার। ভৌগোলিক সীমার এই বিস্তার অবধূতের রাহী সত্তার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। শৈশবে একটি মেয়ে বোমাতঙ্কে ট্রমাগ্রস্ত হয়ে সব কিছু ভুলে গেছে। তার মনের বিকাশ ঠিকমত হয়নি। এক সাহেবের কাছ থেকে খবর পেয়ে সেই মেয়েটিকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন তার পিতৃবন্ধু মৃত্যুঞ্জয় সোম। সে মানুষ হয় তাঁর নিজের মেয়ের সঙ্গে নিজের মেয়ের মতই। এখন দেবযানী আর মৌরী যেন

সহোদরা দুই বোন । তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সৌহার্দ্য বিশ্বাস ---আত্মত্যাগ সবটাই অত্যন্ত যত্নের সাথে রূপ দিয়েছেন অবধূত। এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৌরী আবার হারিয়ে গেলো। তার চিন্তায় বিছানা নিল তার দিদি দেবযানী । তাকে তার জামাইবাবু বহু চেষ্টা করেও খুঁজে বার করতে পারেনি। অনাহারে দুশ্চিন্তায় দেবযানী মুমূর্ষু। এমন সময় ফিরে এলো মৌরী। তার কাছেই মেয়েকে রেখে চোখ বুজলো দেবযানী। তার স্বামী অভিমন্যু সংসারে বাধা পড়তে চাইলো না। মৌরী আটকা রইলো দেবযানীর মেয়েকে মানুষ করার জন্য জীবনের শুরুতেই অপরাহ্নের ম্লান আলো নেমে এলো। দায়িত্বের জালে আটকা পড়লো মৌরী।

কোলকাতার অভিজাত শ্রেণির মানুষকে নিয়ে এ উপন্যাসের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। তাদের বাড়ির তিনতলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ট্রামের ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। বিদেশী একটি রাস্তার নামে এই স্থানটির নামকরণ করা হয়েছে। কলকাতার এই বাড়িটি মৃত্যুঞ্জয় সোমের। এই বাড়িতে ধনঞ্জয় মল্লিকের মেয়ে মৌরীকে নিজের মেয়ে দেবযানীর সাথে সমান স্নেহে বড় করেছেন মৃত্যুঞ্জয় সোম। মৃত্যুঞ্জয় ছেলে নেই বলে দুঃখ করতেন না। বলতেন তাঁর বড় মেয়ে ছেলের কাজ করবে বাইরে সামলাবে আর অন্তঃপুর সামলাবে ছোট মেয়ে। ঘটনা চক্রে মৌরী বাড়ি ছেড়ে পালালো আর দেবযানী তার অভাগা এই বোনটির জন্য না খেয়ে না ঘুমিয়ে নিজের প্রতি অত্যাচার করে শেষ হয়ে গেল তাতে কাহিনিটি আবেগ-আশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। লক্ষ্যণীয় যে নিজের ছোট মেয়েটির জন্যও সে একবারও ভাবেনি! চরিত্রের মধ্যে বিপরীত ভাবের সমাবেশ ঘটানো অবধূতের একটি বহু চর্চিত অভ্যাস। দেবযানীর ভয়ে তার অফিসের সবাই কম্পমান অথচ সে নিজে কতখানি স্নেহ-দুর্বল তা-কি কেউ ভাবতে পেরেছিল?

বড়মেয়ে দেবযানী লেখাপড়া শিখে মস্ত বড় এক কোম্পানীর কর্তৃব্যক্তি। অফিসের সকলেই তাকে সিংহীর মতন ভয় পায় সে সকলের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। মৃত্যুঞ্জয় সোমের ছোট মেয়ে মৌরী তাঁর পালিতা কন্যা । বর্মায় প্রোম বলে একটা শহর আছে, সেখানেই তার জন্ম। মৌরীর বাবার নাম ধনঞ্জয় মল্লিক। ছোটবেলায় নিষ্ঠুর বর্বরতায় বহু মানুষের রক্তস্রোত তার চোখের সামনে বয়ে যেতে দেখে জড়বৎ হয়ে গিয়েছিল। সেই ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে। প্রায়ই স্মৃতিপটে সে দেখতে পেত বহু আগের বীভৎস এক ঘটনা। ওটা একটা বিদঘুটে স্বপ্ন, স্বপ্নটা এখনও মুছে যায়নি মন থেকে। একলা পেলেই টুঁটি টিপে ধরে। অনেকটা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের মতন আরম্ভ। অন্ধকারে সিঁড়ির মাথায় বসে মৌরী আগাগোড়া সমস্ত স্বপ্নটা দেখতে লাগল :

> ''হঠাৎ চলতে লাগল দোলায় চেপে দুলতে দুলতে দেখতে লাগল একটা পিঠ,মানুষের পিঠ। একটা মানুষের ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত শুধু দেখা যাচ্ছে ঐ পিঠখানা দেখতে দেখতে আর দোলা খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ল।''[১১]---
> এটা স্বপ্ন নয় তার জীবনের ঘটনা এখন স্বপ্নবৎ।

যে বিশ্বস্ত চাকরটি তাকে সাহেবের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল, সেও নিতান্ত জখম ছিল। তার শরীর আগুনে ঝলসানো ছিল। ঝোলার এই মেয়েটিই আজকের মৌরী। সে কর্ম-তৎপরতার

দিক থেকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। এই উপন্যাসের প্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করেছে জাপান-ইংরেজ যুদ্ধ। তা অবশ্য বড় হয়ে ওঠেনি। মৌরীর জীবনে তার প্রভাব সুগভীর কিন্তু সেদিকে লেখক আগ্রহী নন। সবকিছুই আবছা এখন মৌরীর । তার মনে হয় কোথায় নাকি একটা দেশ আছে, দেশটার নাম বর্মা, সেই বর্মায় প্রোম বলে একটা শহর আছে---তারআবছা মনে পড়ে। স্মৃতিতে ভেসে ওঠে ইরাবতী নামের একটা নদী বয়ে যাচ্ছে শহরের গা ঘেঁষে। সেই শহরে থাকতেন ধনঞ্জয় মল্লিক সেখানে তিনি ঠিকাদারি করতেন। প্রচুর টাকা কড়ি ছিল তাঁর, স্ত্রী ছিল, একটা পাঁচ বছরের মেয়ে ছিল।

লাগল লড়াই আকাশ থেকে বোমা পড়তে লাগল সেই দেশে। একটা বোমা উড়িয়ে দিলে ধনঞ্জয়ের ঘরবাড়ি। ধনঞ্জয় মল্লিক আর তাঁর স্ত্রীও উড়ে গেলেন। পাঁচ বছরের মেয়েটা কিন্তু রইল। ধনঞ্জয়ের এক চাকর কাঁধে বাঁক নিয়ে বাঁকের একদিকের ঝোলায় সেই মেয়েটাকে পুরে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল বর্মা থেকে চাটগাঁয়। চাটগাঁ পৌঁছে মেয়েটাকে জমা দিল এক সাহেবের কাছে। দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সে মরল। সাহেব মেয়েটির আত্মীয়দের খোঁজ করে বিজ্ঞাপন দিলেন। সাহেবের বিজ্ঞাপন দেখে ছুটে গেলেন ধনঞ্জয়ের বন্ধু মৃত্যুঞ্জয় সোম। মেয়ে নিয়ে এলেন। বড় বড় ডাক্তার ডাকলেন, মেয়েকে সারিয়ে তুলতে হবে। মেয়ে হাসে না, খায় না, ঘুমোয় না। শুধু তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। ডাক্তাররা বলে গেলেন -মেয়েটার মন ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুম ভাঙতে সময় লাগবে। কাহিনি বিস্তৃত হলো আপাতত বর্মার প্রোম[১২] নামক শহর থেকে কোলকাতা পর্যন্ত। উনিশ শতকের শহর কোলকাতার বেশ কয়েকটি বিস্মৃতপ্রায় প্রসঙ্গ এখানে আছে। ভাড়াটেরা কেমন ছিল তার স্বভাব ও সামাজিকতার কয়েকটা নমুনা পেয়ে যাই আমরা। এখানে ঔপন্যাসিক তাদের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে অবধূতের ঔপন্যাসিক সত্তা প্রশংসনীয়।

তিন তলা বাড়িটির মধ্যে সোমেদের পরিবারের সাথে ভাড়াটিয়া মাদ্রাজী আর পাঞ্জাবী পরিবারের লোকেদের কথা আছে। এরা কোন বিষয়ে অকারণ উৎসাহী নয়। ভাড়ার টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঠিক সময়ে ঢুকিয়ে দিতে ভুল হয়না এদের। বাজার সরকার বিশ্বাসী, তার উপর নির্ভর করে গল্পের নায়িকা দেবযানী ছ'মাসের ছুটিতে বাড়ি খালি করে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে পেরেছিল। বাড়িতে অতগুলো ভাড়াটে থাকা সত্ত্বেও বাঙালি পরিবারের মেয়ে দেবযানীর পক্ষে অসুস্থ প্রেমিক অভিমন্যুকে নিজের বাড়ি এনে তুলতে কোন দুশ্চিন্তা হয়নি। পাঞ্জাবী পরিবারের লোকেরা যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল অনাবশ্যক কৌতূহল দেখায়নি। মাদ্রাজীরা আবার মুশাফির স্বভাবের। এ পরিবারে কে আসে কে যায় তার হিসাব রাখা ভার প্রথম যিনি এসেছিলেন তিনি এখন কোথায় বলা মুশকিল কিন্তু তার নামেই ভাড়ার রসিদ কাটা চলছে। এঁরা থাকেন মৃত্যুঞ্জয় সোম তথা দেবযানী সোমের তিনতলা বাড়ির নীচের তলায়।

সেকালের কোলকাতায় প্রায়ই ট্রামের নীচে লোক চাপা পড়ত। গল্পের মধ্যে তার নমুনা পাওয়া যায় মৌরীর স্বগতোক্তিতে। লেখক জানাতে ভোলেন না গোয়ালাদের অমানবিক আচরণের কথা । ইতর প্রাণীর সঙ্গে সমপ্রাণতা ঈষৎ তির্যকতায় প্রকাশিত। আহীরী লোকেরা পরম ধার্মিক;

গোমাতার সেবার জন্যে তারা বিখ্যাত অথচ সেই গোমাতার সন্তানের জন্য এতটুকু দুধও আর অবশিষ্ট রাখে না। না খেয়ে তারা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়। পায়ে পা জড়িয়ে যায়। আহীরীদের ঠেলায় চলতে চলতে একদিন যখন তারা মরে যায় তখন তাদের হাড় কখানা বের করে খড় ঢুকিয়ে দেয়। দেখতে বাছুরের মতো লাগে, তাতেই গরুর দুধ ক্ষরিত হয়। এই নৃশংস গো-হত্যা লেখকের মনকে ব্যথিত করে। উপায় নেই এর হাত থেকে বেরোনোর তাই রসিকতার মোড়কে জানিয়ে লেখক বোধহয় কষ্টটা ভাগ করে নেন পাঠকের সাথে :

> 'শেষপর্যন্ত ছালের ভেতর থেকে হাড়কখানা বার করে নিয়ে তার বদলে খড় ভরতি করা হয়। তখন ওরা আসে বগলের মধ্যে, যার বগল তার কাঁধের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে।...সেই ছাল চেটেই গো-মাতা খাঁটী দুধ দেয়। সন্তানের ছাল খানাকেই সন্তান বলে ভুল করে, ওটুকু ভেজাল মোটে ধরতেই পারে না। হাজার হলেও গরু গরুই, মানুষের চালাকি গরুতে ধরতে পারবে কেন!'[১৩]

---অন্যদিকে লেখকের চোখ এড়ায় না যে আহীরী রমণীরা দুধ দোহানোর জন্য নিযুক্ত হয় কিন্তু দুধ তারা খেতে পায় না। এদের জীবন বড়ো কষ্টের। তারা দুধে চুমুক দেওয়ার স্বপ্নও দেখে না। ওই পদার্থ তাদের গিলতে নেই। তারা জন্মেছে মাইনে নিয়ে চাকরি করার জন্যে, দুধ খাওয়ার জন্যে তারা জন্মায় নি। দরিদ্র মানুষরা কীভাবে শোষিত হয় তার কিছু নমুনা এ উপন্যাসে দিয়েছেন লেখক। বাঁচবার জন্য এসব মহিলাদের রাতের ঘুমটাও নষ্ট হয় পরকে খুশী করার জন্য। বাড়িউলির ঘর ভাড়ার পয়সা এভাবে রোজগার করতে হয় তাদের।

কাজের লোকেদের সঙ্গে মালিক সম্পর্কের নমুনা দিয়েছেন লেখক। এসব মহিলাদের অসহায় জীবনের কথা কেউ জানতে চায় না। এরা দিনের আলো ফুটতেই গৃহস্থ বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর-দুয়োর পরিষ্কার করার কাজে লেগে থাকে। এক বাড়ি থেকে এক বাড়ি ছুটতে থাকে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। রাতের বেলা কোথায় যে থাকে কে তার খবর নিতে আগ্রহী? এদের নেই মাথার উপর আশ্রয়, নেই ঘর ভাড়া দিয়ে থাকার সামর্থ্য কাজেই বাড়ি-উলির কথা শুনে রাত্রির সময়টা বেচে দিতে হয় খরিদ্দারের কাছে। সইতে হয় শারীরিক অত্যাচার। একসঙ্গে একাধিকের দাবী মেটাতে অক্ষম হলে পিঠে চাবুক মারতেও দ্বিধা করে না এরা। নীচুতলার হা-অন্ন মহিলার কথা যেমন আছে তেমনি চাকুরীজীবী দেবযানী সোমের কথাও এখানে আছে।

অফিসের কাজে যে সব মহিলারা বেরোন, সেই সব শিক্ষিতা মহিলারা পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে হোটেল রেস্তোরাতে অনেক রাত জেগে হুল্লোড় করে বাড়ি ফেরেন তার নমুনা আমরা পেয়ে যাই স্বয়ং দেবযানীর চরিত্রে। দেবযানী সোম আর অভিমন্যুর ভালোবাসার উত্তেজিত অধ্যায়ের সাক্ষী স্বয়ং ধনঞ্জয় মল্লিকের মেয়ে মৌরী। এখন মৌরী মৃত্যুঞ্জয় সোমের পালিত কন্যা। সে এখন দেবযানীর ছোট বোন। এখানে ছোট গল্পের সুমিতিকে ছাড়িয়ে যান। কিন্তু উপন্যাসের মত খুঁটি নাটি বর্ণনা নেই,বা জীবনের সমগ্রতার সন্ধান নেই। তাই একে উপন্যাস-কল্প রচনা বলে গ্রহণ করা যায়।

বিচিত্র চরিত্র এ উপন্যাসে এসেছে। এসেছে খবর-কাগজ বিক্রেতার জীবনের কথা। কাগজ-

ওলা ধীরেন ঘোষ সংসার চালাতে হিমসিম খায়, তাই রাতেও হোটেলের কাজ করে। রাতে ফেরার সময় নিয়ে আসে বাড়তি খাবার -দাবার। তার পোয়াতি বৌদিকে সে-সব খাবার খেতে দেয়। করুণ দারিদ্র্যের ছবি আছে আলোচ্য উপন্যাসে। তার দাদা কারখানায় কাজ করে অবসর সময় কাটায় তাসের আসরে চায়ের দোকানে, তার মত নির্বিরোধ মানুষ আর নেই। কাজের মাসিমা ছাড়াও বাজার সরকার, রান্নার মাসি সবার ব্যক্তিজীবন,স্বভাব বৈশিষ্ট্য- খুবই সার্থকভাবে স্বল্প কথায় জানিয়েছেন এ উপন্যাসে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে রমাপদ চৌধুরীর সঙ্গে অবধূতের অনেক মিল আছে। তিনিও খুব ছোট আকারের উপন্যাস লেখেন এবং ছোটগল্পও খুব কমই লিখেছেন। আর এক সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে আছে তা হলো নিজের অভিজ্ঞতাকেই এঁরা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

অবধূতের ব্যাপ্ত জীবনাভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই সব উপন্যাসে ঘুরে ফিরে আসে। রাস্তার কথা বাড়ির অন্দরে এসে ধাক্কা দেয়। 'ভোরের গোধূলি' উপন্যাসেও দিয়েছে। হাতকাটা হরিরাম মস্তানীর পথ ধরে ডাকাবুকো স্বভাবের অভিমন্যুর সাথে জড়িত হয়ে গেছে। এসে গেছে আন্তজার্তিক স্মাগলার প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গ উপন্যাসের নায়িকা মৌরীর [১৪]মনস্তত্ত্ব তুলে ধরেছে। ঘর যার শৈশবেই ভেঙে গেল, তার ঘর যে পথের উপর নির্দিষ্ট তা বেশ স্বাভাবিক নৈপুণ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন লেখক। এ বিষয়ে লেখকের আশ্রিত কাহিনি গ্রন্থনা-কৌশলটি তাঁর অন্যান্য রচনায় অনুসৃত পথ ধরেই এগিয়েছে। বোমা পড়ে ঘর ভেঙেছিল সেই ট্রমা কাটিয়ে উঠতে পারে না যে মেয়ে সে ঘরের বাইরে যাবে কী করে? এপ্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। তাই হোটেলের অবতারণা করে উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরী করা হোলো। মুখে কাচের গ্লাস ছুঁড়ে পুলিশের ভয়ে একলা পথে নামাটা আর অসঙ্গত মনে হোলো না। এরপর মৌরী হারিয়ে গেল ---ধীরেন ঘোষ এ কাজের জন্য নিজেকে দায়ী করে হলো গৃহত্যাগী। তার চরিত্র পরিণতির যথাযোগ্য ব্যাখ্যা মিললো এইসূত্রে। সে তার দায়িত্বহীন দাদার গর্ভবতী স্ত্রীকে স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করত, এখানেও পরোপকারের সেই ধারা অব্যাহত।

একই ভাবে এলো প্রফেসর মন্ময় পালিত তিনি বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর। তালিম দেওয়ার সময় মেয়েদের সাথে তার সম্পর্ক কোন পর্যায়ে পৌঁছায় তা নিয়ে কেউ প্রশ্নও করে না। বিচিত্র ধরনের মানুষের সাথে পরিচয় থাকায় অবধূতের প্রায় সব উপন্যাসেই নানা চরিত্রের ভিড়। এখানেও তার অন্যথা হয়নি। অবধূতের ঔপন্যাসিক-দৃষ্টির পরিচয় নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়ও তাঁর মনে নানা তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। রান্নার মাসি, কাগজ বিক্রেতা, প্রমুখের চরিত্রাঙ্কনে উপন্যাসকার সদৃশ নিঁখুত পর্যবেক্ষণ-পটুতার পরিচয় আছে---এ উপন্যাসে।

দেবযানী নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। তার মনে হয় সে যদি এত বাড়াবাড়ি না করত তাহলে এই অসহায় বোনটি ঘরছাড়া হোত না। মৌরীকে ফিরিয়ে আনার জন্য অভিমন্যুর চেষ্টা কম নয়। তারিফযোগ্য অবশ্যই। তার চরিত্রের মধ্যে না হারার জেদ তাকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। মৌরীকে ফিরিয়ে আনবেই অভিমন্যু এমনটি আশা করা গিয়েছিল কিন্তু তা যখন

অসম্ভব প্রমাণ করে মৌরী নিরুদ্দিষ্ট হয়ে রইল, তখন দেবযানী খাওয়া ঘুম সবই ত্যাগ করল। পেটের বাচ্চাটির দিকেও তাকালো না। এই সূত্রে অভিমন্যুর সেবা তাকে হৃদয়বান মানুষ হিসেবে চিনিয়ে দিল। দেবযানীর মধ্যকার সরল ভালোমানুষটাকেও চিনিয়ে দিল।

মৌরীর জীবনে কম মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা ঘটেনি-তবে সে হৃদয়হীন খারাপ মানুষ ছিল না। নিয়তি-নির্দেশিত পথেই যেন সে ফিরে এল, কিন্তু তার জন্য দুটি করুণ মৃত্যু ঘটল। একজন কাগজবিক্রেতা ধীরেন ঘোষ আর একজন ---দেবযানী সোম। উপন্যাসটিতে ট্রাজেটির বেদনা ছড়িয়ে আছে কিন্তু মূল ধারার সাথে তার যোগ অনিবার্য না হওয়ায় একে ট্রাজিক উপন্যাস বলা যায় না। এ উপন্যাসে বেদনার অনুভব নিয়তি-নির্ধারিত পথেই ঘটেছে বলে একে নিয়তি-নির্ভর উপন্যাসও বলা যেতে পারে। এর সম্পর্কের বিন্যাস একটু অন্য ধরনের। যাঁরা অবধূতকে শৃঙ্গার রসের প্রতি ঝোঁক বিশিষ্ট বলে মনে করেছেন তাঁরা এ উপন্যাসটি পড়লে বুঝতে পারবেন এ মূল্যায়ন বহুলাংশে অন্যায়-আরোপিত। অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও লেখক ইন্দ্রিয়গত অসংযমের ছিঁটে ফোঁটাও ব্যবহার করেননি।

যখন মৌরী ফিরে এল তখন তার দিদি রোগশয্যায়। সেবা-চিকিৎসা কোনো কিছুর ক্রুটি হয়নি কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। তার মেয়েটিকে মৌরীর জিম্মায় রেখে অভিমন্যু চলে গেলেন ---মৌরী বাঁধা পড়ল তার দিদির বিষয় আর সন্তানকে দেখার কাজে। 'ভোরের গোধূলি' নামের আড়ালে লেখক অনেক ব্যঞ্জনা ধরে দিয়েছেন। অভিমন্যু- দেবযানীর জীবন-পরিণতি, কাগজ-ওয়ালা ধীরেনের অকাল মৃত্যু,মৌরীর জীবনে বিবাহ বা সংসার না হতেই অভিমন্যু-দেবযানীর সন্তানের দায়িত্ব নেওয়া এবং সেই সূত্রে সারাজীবন আটকে পড়া ইত্যাদি সূত্রে তা সার্থক হয়ে উঠেছে। এ যেন জীবন প্রত্যূষেই জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে ওঠার গল্প, সেই সাথে জীবন-প্রবাহ যে থেমে থাকে না সে ইঙ্গিত দিতেও লেখক ভোলেননি। দেবযানী ও অভিমন্যুর সন্তান যে সুন্দরভাবে দায়িত্ব সহকারে নিজের করেই মৌরী মানুষ করবে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশই লেখক রাখেননি। দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে মৌরীর অনবদ্য যোগ্যতা সবক্ষেত্রেই বজায় রেখেছেন লেখক। গল্পের মধ্যে বহুমুখিনতা আছে। জীবন যেমন একধারায় বয় না তেমনি এ উপন্যাসের গতি বিচিত্রগামী। মৌরী যেন এক অতি বড় গৃহিণী বলেই তার সত্যকার ঘর জুটল না কিন্তু ঘর-কন্না সে সব সময়ই করেছে।

অকারণে যৌবন অনেক সময় নিজেকে বলি দেয় ---ব্যাখ্যার যথেষ্ট কারণ না রেখে। ধীরেন ঘোষও তাই করেছে এ যেন তেমন উপকরণেই তৈরী । আগেই দেখা গেছে দাদা নিজের গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি উদাসীন ভালোমানুষির লোক বলে ধীরেন তার বৌদির জন্য যথেষ্ট করেছে। এই ধারা মেনে ধীরেন সারাজীবন চলেছে। মৌরীর মন না জেনেও সে তার জন্য সব-কিছু বাজি রেখেছে এমন কি নিজের জীবনটাও। তার মনের গঠনটাই অন্যরকম। যে সব মানুষ জীবনের যেকোনো অপচয়ে নিজেকে দায়ী করে, ধীরেন ঘোষ সেই ধারার এক চরিত্র। তার ভালোবাসা সামান্য প্রশ্রয় পেয়েছে অথচ ভালোবাসা প্রত্যয়ী হয়ে ওঠার আগেই সর্বস্ব খুইয়ে দিয়ে বসে আছে।

মৌরীর চরিত্রটি এমনভাবে পাঠকের মনে জায়গা করে নিয়েছে যাতে তার সব আচরণই তার মানসিকতা আর জীবনেতিহাসের প্রেক্ষিতে মানিয়ে যায়। অস্ফুট ও অব্যক্ত-হৃদয় এক নারী সে। তার সরল বিশ্বাসভরা চাহনি আর নিরীহ আচরণ সকলকেই আকৃষ্ট করে। তার জীবনের ট্রমা আর নিদারুণ অতীতের প্রেক্ষিতে যেকোনো রূপেই সে উপন্যাসের চরিত্র কিম্বা পাঠকের সহানুভূতি পেয়ে যায়।

দুই.টপ্পা-ঠুংরি[১৫] বা 'আমার চোখে দেখা'---একের মধ্যে চার

'ভদ্র, সংযত,উন্নত ভাবসাধনায় অভিনিবিষ্ট, জনসমাজে ধার্মিক বলিয়া অভিনন্দিত মানুষের যে ভয়াবহ স্বরূপ লেখক আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ধর্মাদর্শের অন্তরালবর্তী বস্তু-কঙ্কাল আমাদের মনে যুগপৎ ভীতি ও জুগুপ্সার সঞ্চার করে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অবধূতের ইহাই বিশিষ্ট সুর-সংযোজন।'[১৬]

উপন্যাসটির শুরু হয়েছে এমন ভাবে যে মনে হবে যেন লেখক একটি প্রবন্ধে বলতে চান যে সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে একান্তভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সেখানে সিদ্ধান্ত হিসেবে উঠে এসেছে যে সাহিত্য রচনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভিন্ন অসম্ভব। প্রসঙ্গত আমরা জানিয়ে রাখি যে এই অভিজ্ঞতা একজন সাহিত্যকারকে সার্থক হতে বিশেষ সাহায্য করে। এ উপন্যাসে দেখা গেলো কাহিনির অগ্রগতিতে যেন কোন সাহিত্য-তাত্ত্বিকের আলোচনা হঠাৎ বদলে গেলো উপন্যাসকারের অভিনব মুখবন্ধ রচনায়। সাবলীলতার ছোঁয়া লেখকের রচনা শক্তির পরিচয় বহন করে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের ১৯১ পৃষ্ঠায় 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' -এ এজাতীয় সূচনা পেয়ে যাই।

বৈঠকী ধরনের এই লেখা যেন রক্তমাংসে গড়া চরিত্রকেই আমাদের সামনে হাজির করে দেয়। এখানে পৃথক কাহিনির সহাবস্থানে গড়ে উঠেছে একটি উপন্যাস । আপাত এক হলেও বিচ্ছিন্ন ঘটনার গাঁথা মালা। আমরা যেন চারটি কাহিনিতে বর্ণিত ঘটনা গুলিকে চোখের সামনে দ্রুত ঘটে যেতে দেখি। বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করার ফুরসৎ পাইনা।

পাঠকই কখন চলতে শুরু করেছেন লেখক-কথকের সঙ্গে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের এ গুণ আয়ত্ব করেছিলেন বলে অবধূতের পক্ষে নানা বিষয়কে অবলম্বন করে কম বেশি ত্রিশটি গ্রন্থ[১৭] রচনা করা সম্ভব হয়েছিলো।

লেখকের কবে কোথায় কোন বয়েসে গল্প লেখার শুরু এ প্রশ্নটি আসতে পারে। কিন্তু অবধূত কোনো কালে স্বপ্নও দেখেননি গল্প লিখবেন বলে। 'মরুতীর্থ হিংলাজ'(১৯৫৪) লেখার আগে ঝাড়া ত্রিশটা বছর বেওয়ারিশ জীবন-যাপন করেছেন। পথে পথে ঘুরে যাঁর দিন গুজরান হয়, তিনি কোথায় বসে গল্প লেখার তালিম নেবেন?

তবে এ কথাটা স্বীকার্য যে প্রচুর জলজ্যান্ত ঘটনা দিনের পর দিন গল্পের মত তাঁর চোখের সামনে ঘটতো। তাঁর পাথেয় ছিল ত্রিশ বছরের মুসাফিরির জীবন। তেমনি প্রভাব ছিল পরম বন্ধু সহজিয়া রাইচাঁদ দাসের। ইনি তাঁকে চোখ মেলে জলজ্যান্ত গল্প দেখতে শিখিয়েছিলেন।

বাস্তব জীবন তো ভবের হাট। রাইচাঁদ ভবের হাটখানা চোখ মেলে দেখে নিতে বলতেন। হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি নায়ক, নায়িকা। দিনের পর দিন অগুনতি গল্প ঘটে যাচ্ছে নাকের ডগায়। কেউ তা খেয়াল করে না। কালকের পর পরশু যেমন আসবেই তেমনি পরশু দিনের গল্প পরশু দিন ঘটবেই। পথিকের মত আজ কাল পরশু ---এইসব দিনগুলো যেন এক একজন রাহী, আসছে আর চলে যাচ্ছে। আজ কাল পরশুদের সঙ্গে পা ফেলে চলতে থাকলে জলজ্যান্ত গল্প দেখতে দেখতে মনটা উদাস উদাস হয়ে যাবে---এই ছিল রাইচাঁদের শিক্ষা। অবধূত মনের আনন্দে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। অজানা অচেনা দৃশ্য দেখে বিস্মিত হতেন। এভাবে চিনেছিলেন জীবনকে। ---খেয়াল না করলেও পাঠক বুঝতে পারবেন :

১. ভাব এবং উপলব্ধিকে প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে অবধূতের মধ্যে কোন সচেতন গোত্র (Genre)সন্ধান নেই।
২. ভাষার কৌলিন্য সচেতনতা নয় উপলব্ধির সত্যতাই পাঠকের হৃদয় জয় করে নেয়। চরিত্র স্পষ্ট আর ঘটনাক্রম স্বচ্ছ।
৩. 'টপ্পাঠুংরি'-র সাড়ে চার পৃষ্ঠা (১ম-৫ম পৃষ্ঠার শুরুর অনুচ্ছেদ)জুড়ে সাহিত্যে প্রত্যক্ষতার মূল্য আলোচনায় আমরা ক্লান্ত হতে পারিনা যে বিশেষ গুণটির জন্য তা হলো মুখোমুখি বসে কথা বলার সজীব অনুভব। স্বীকার্য যে এ গ্রন্থটি পাঠের সময় পাঠকে সর্বদাই আবিষ্ট হয়ে থাকতে হয়। অন্যমনস্ক হওয়া চলে না।

কেননা কথককে যেন সামনে দেখতে পাওয়া যায়। লেখক অত্যন্ত আড্ডা প্রিয় বলেই উপযুক্ত শব্দও এসেছে কথা বলার স্বাভাবিক বেগে। 'মার্জিত শব্দ প্রয়োগ করবো শৈল্পিক চেতনা নিয়ে' ---এরকম ভাব অনেক সময় প্রকাশকে আড়ষ্ট করে---সে সব চিহ্ন তো নেই-ই উল্টে কথার স্বচ্ছন্দতায় জীবনের সপ্রাণতায় একটুও সংকোচ না করে পথে ঘাটে শোনা জীবনের স্রোতে ভেসে আসা শব্দও অবলীলায় ভূমিকাপূর্ণ স্থান দখল করেছে : 'ভোরের গোধূলি' উপন্যাসের বেওয়ারিস, ভাশুর ভাদ্রবউ সম্পর্ক, মুসাফিরি, নিমকহারামি, রগড়, (১পৃষ্ঠা) বিলকুল, গাড়ল, হক, (পৃষ্ঠা-২) 'আমার চোখে দেখা' উপন্যাসের :ঝুট ঝামেলা, টহল, নিত্যি নতুন, মাল উগরে, চিজ, বাসটে মড়া (পৃ.৩) 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'-এ : রেগে কাঁই, রামছাগলে (মানুষ অর্থে) বলাৎকার, জান, পিলে চমকানো। জীবনের কথা উপন্যাস গল্পে রূপ দিয়েছেন অবধূত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাবৈচিত্র্যে ভরপুর তাঁর জীবন-পাত্র।

৪. অবধূত চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের কথা বলেছেন যে পথের ঘটনা আর তিনি জানতে পারছেন না। বসে পড়ার দরুণ সত্যিকারের জ্যান্ত গল্প পড়ার পাঠ একদম চুকে গেছে। আজ কাল পরশুরা আসছে আর চলে যাচ্ছে। আজ কাল পরশুদের সাক্ষী রেখে কত জায়গায় কত গল্প ঘটে যাচ্ছে, .লেখক তাদের নাগাল পাচ্ছেন না।

লেখক হিসেবে অগত্যা মনগড়া গল্পের পরিবেশন করছেন। তার মন-বুদ্ধিতে ছাড়া দুনিয়ার কোথাও তাদের সত্যকার অস্তিত্ব নেই। তারা লেখকের হাতের পুতুল। লেখক যাকে দিয়ে খুন করাবেন বা বলাৎকার করাবেন বলে মনে মনে ঠিক করবেন সে সঠিক সময়ে খুন বা

বলাৎকার করবেই। যাকে দিয়ে পরের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করাবেন বলে মতলব ভেজে রেখেছিলেন, জোচ্চর হলেও সে শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করে দেবে। রোগ শোক প্রেম ভক্তি ভালোবাসা এ সব হচ্ছে রঙ, নানা জাতের রঙ ভাঁড় খুরিতে সাজিয়ে নিয়ে বসে থাকা। যখন যে রঙটি যার মুখে খাপ খাবে তখন সেই রঙটি কাজে লাগানো। বেশ ফলাও করে মাখাতে পারলেই হল, যা দেখে পাঠকের চোখ ঝলসে যাবে।

পথে না নামলেও তিনি লক্ষ করেছেন কিছু না কিছু ঘটছেই প্রতিবেশিদের সংসারে, সে খবর আসেই কানে আর তার ফলে লেখকের মন-বুদ্ধির ওপর তার প্রভাব পড়ে। রঘুদয়ালের বড় মেয়ে ঝুনু গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। প্রতিবেশীদের বাড়ির ঘটনা কীভাবে তাঁকে প্রভাবিত করছে তাই যেন বলছেন এইভাবে শুরু হলো উপন্যাস। লেখকের অভিজ্ঞতা-সূত্রে এগিয়ে চললো গল্প লেখক বা কথক গল্পের মধ্যে এভাবে ঢুকে পড়ছেন চরিত্র হয়ে উঠছেন। আবারও সত্য হলো যে অভিজ্ঞতা ভিন্ন সত্যকার উপন্যাস লেখা যায় না। কথক উপলব্ধি করছেন'বাড়ি খানা জঘন্য, কোন কালে বানানো হয়েছে কে জানে। কড়ি বরগা দেওয়া ছাত আছে কোথাও আজ কাল? যত সব'---দেখা গেল নিজের প্রতিক্রিয়া চলে আসছে।

লক্ষ্যণীয় যে জীবন বৈচিত্র্য আর নানা অভিজ্ঞতার রসদে পূর্ণ -অবধূতের টান সেই জীবনের প্রতি। এই ভাবে নানা আপাত স্বতন্ত্র কাহিনীর আধারে গড়ে উঠল 'টপ্পা ঠুংরি' নামক উপন্যাস। এ উপন্যাসের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো :

- আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে পৃথক চারটি কাহিনীকে সহজে পরস্পর সম্পর্কিত বলে প্রমাণ করা সহজ নয় আবার তা যখন অনুভূত হয় তখন 'বেশ নতুন রকমের হয়েছে' বলে স্বীকার করতে চায় সাধারণ পাঠক-সমালোচকের মন।
- বৈঠকী ধরনের এই লেখা জীবন্ত চরিত্রকেই আমাদের সামনে হাজির করে দেয়। আমরা যেন কাহিনি-অন্তর্গত চরিত্রগুলির জীবনে ঘটনা গুলিকে দ্রুত ঘটে যেতে দেখি। বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস করার ফুরসৎ পাইনা। লেখকের সাথে যেন পাঠকই কখন চলতে শুরু করেছেন এবং কাহিনি-বর্ণিত ঘটনার সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন এইভাবে অবধূতের সৃষ্টি পাঠকের অভিজ্ঞতার ভূবনে নবীন জীবন লাভ করে নবরূপে নির্মিত হয়।

অবধূত রচিত 'টপ্পাঠুংরি' সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় উপন্যাস-কল্প রচনা, বাংলাসাহিত্যে এর জুড়ি উপন্যাস মেলা ভার। মধ্য চল্লিশের জটিল জীবন তৃষ্ণা বিকৃত মানসিকতার রহস্য উন্মোচনের কাজে উৎসাহী লেখকের কলমে লেখা হয়ে গেল চার-চারটি আপাত সম্পর্কহীন কাহিনী। ইংরাজী সহিত্যে যাকে 'পার্ল ইন স্ট্রিং' নভেল বলে, তার সঙ্গে একপ্রকার সাদৃশ্য খোঁজা যেতে পারে। এ জাতীয় কাহিনির স্রষ্টা হিসেবে উল্লেখ করা যায় প্রমথ চৌধুরীর ' চার ইয়ারি কথা'-র নাম। এই ধরনের রচনায় আপাত সংযোগহীন কতক গুলি কাহিনী গ্রথিত হয়ে থাকে, যেন মালার মধ্যে মুক্তো, লাল নীল সবুজের বর্ণাঢ্য সে সহাবস্থানের মূলে যেমন অদৃশ্য একটি সূত্রের বন্ধন কাজ করে যায় তেমনি এখানেও গভীর পর্যবেক্ষণে মূলগত ভাবটিকে আবিষ্কার করতে হয়। কখনো একটি ভাবগত ঐক্য কখনো কখনো একটি চরিত্রের অভিজ্ঞতার সূত্রে গাঁথা পড়ে কাহিনী।

গঠন বৈচিত্রের কারণেই তাই ‘আমার চোখে দেখা’(জুন, ১৯৭৫) বা ‘টপ্পা ঠুংরি’-র অভিনবত্ব স্বীকার করতেই হবে।

প্রথম কাহিনিতে কথকের জবানীতে শুরু হয়েছে গল্প বলা। একেবারে প্রত্যক্ষ করা জীবন সত্যের উপস্থাপনা। প্রতিবেশীর একমাত্র কন্যার হঠাৎ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার সঙ্গে জড়িয়ে গেল বদন বাগচীর নাম। লাহিড়ি পরিবারের মামা পরিচয়ে ঢুকে সে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে সন্তর্পণে মিটিয়ে চলেছিল তার জৈবিক ক্ষুধা। অবশেষে আত্মগ্লানিতে যখন অসহায় মৃত্যু বরণ করলো রঘুদয়াল লাহিড়ির মেয়ে ঝুনু, তখনও তার স্বরূপ বোঝা পুলিশের অসাধ্য। তারপর কাহিনির অগ্রগমনের সাথে সাথে একটু একটু করে খুলে গেল রহস্যের জট-ঠিক যেন একটা ডিটেকটিভ বড় গল্প।

সেবা সোমের ছোঁড়া অ্যাসিড বাল্বে মুখ আর সর্ব শরীর ঝলসে গেল বদন বাগচী আর কথকের সামনে খুলে গেল এক নতুন বিশ্ব। যৌনতার বীভৎস রূপ। বদন বাগচী যার বুদ্ধিদাতা সেই লোকটিই আসল। তার নাম ক্ষেত্র চাটুয্যে। তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন :

> “ক্ষেত্র চাটুজ্যে অন্ধকারের অন্তরে বাস করেন। অন্ধকারের জীবটি কি করছেন এখন কে বলতে পারে।” [১৮]

মানুষের প্রবৃত্তিকে দমন করা দেবতারও অসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধনার মাধ্যমে এর সংযম হয়ত সম্ভব কিন্তু তা বড় কঠিন। প্রসঙ্গত নীতিবিজ্ঞানের কথা স্মরণে আসে : “The subjection of the individual, impulsive,sentiment self to the order of reason is a Herculean task.”[১৯]

প্রথম কাহিনীতে প্রতিবেশী কন্যার হঠাৎ আত্মহত্যার সংবাদে বিমূঢ় কথক কিছুতেই ভাবতে পারেননি যে এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর ভক্ত পাঠক রুচিশীল মধ্যবয়স্ক বদনবাবু কোনোভাবে যুক্ত হতে পারেন, অথচ তাঁকে অবাক করে বদন বাবুর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলো আসল ভিলেন শুধু তাই নয় একটি অতি সাধারণ মেয়ে সেবা সোম তার নিজের সতীত্ব বিসর্জন দিয়েও বান্ধবীর অকালবিনষ্টির মূল পাণ্ডা বদন বাগচীকে তারই বাথরুমে নিজের হাতে হত্যা করে চরমতম ঘৃণার প্রকাশ ঘটালো এবং যুগপৎ প্রতিশোধের আনন্দ অনুভব করলো। খুলে গেলো লেখকের চোখ। লেখক যেন ঘুম ভেঙে দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে হিপক্রিটের মুখোশ খুলতে কিম্বা প্রতিশোধের ইচ্ছায় অথবা আরো ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার সন্ধানে নেমে পড়লেন। আর তারই সূত্র ধরে একেএকে লিখে ফেললেন অতিরিক্ত তিনটি কাহিনী মূল সূত্র ধরা রইলো কথকের হাতে।

এবার দ্বিতীয় কাহিনীতে এক নারী প্রধান ভূমিকায় সে ভাগ্যের হাতে খেলনা নাকি নিজেই আপন ভাগ্য বিধাতৃ, তা নিয়ে সংশয় হতেও পারে, কেবল এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, এ নারী সংস্কার মুক্ত -পুরুষের হাতের ক্রীড়ানক নয় সে তাই করেছে, যা বাস্তবসম্মত এবং নিজের ইচ্ছা-প্রসূত। তার ব্যক্তিত্ব স্বতোপ্রকাশিত। আধুনিক নারী জীবনের ছবি এখানে এঁকেছেন লেখক। সংক্ষেপে তা জেনে নেব। গোপেশ্বর বাবুর পরিবারে ‘সানুদির’ বিয়ে হয়েছিল

২০ বছর বয়সে। তখনকার সমাজব্যবস্থায় বাঙালি সমাজে প্রায় বিয়ে না হওয়ার মত বয়সে পৌঁছেই বিয়ে হয়-বিবাহকারীর উদ্দেশ্যও তেমনি। বাতের রুগী জ্যাঠা-শ্বশুরের বাতের তেল গরম করে দিত এই নব বধূ। আর বাইরে চাকুরি করা স্বামী গোপেশ্বর বাবুর বাড়ি পাহারা দিত। অর্থাৎ দুঃখের রাত জেগেই কেটে যেত। দাম্পত্যজীবন বলতে কিছুই সে পায়নি। বলাবাহুল্য তার নিঃসঙ্গ অবহেলিত জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো বাঙালী পরিবারে নিতান্ত অবহেলার জীবন উপেক্ষা করে সংস্কারের গণ্ডী পেরিয়ে ব্যতিক্রমী এই নারী এক প্রৌঢ় মাড়োয়ারী বড়োলোক শ্রীকিষণ কুন্দন ভট্টজীর পিয়ারী বধূ শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্ট হিসেবে নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছে। তাঁর স্বামী শ্রীকিষণ কুন্দন ভট্ট খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে বক্তা হিসেবে উপস্থিত কথকের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন উদ্যোক্তারা। সেই ব্যবস্থা মতে পশ্চিমের এক শহরে প্রবাসী বাঙালিদের আয়োজিত বাঙালি সংস্কৃতির সম্মেলনে দু'ঘন্টা বক্তৃতা করে কথক গিয়েছিলেন শ্রীকিষণ কুন্দনজী-র বাড়িতে। অবশেষে জানা গেল এই নারী কথকের পরিচিত সানুদি। এখানেই গল্পটির শেষ হয়নি লেখক -কথক জানিয়ে দিয়েছেন তার স্বভাব ও কর্তৃত্ব সমেত এই ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে মহিমময়ীর আসন লাভ করেছে সে। তিন ছেলের বিয়ে দিয়েছে ছেলেরা একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনীয়ার, একজন উকিল ওদের বউয়েরা শান্তিনিকেতন থেকে নাচ-গান শিখেছেন। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা। লেখিকা হিসেবে অধুনা শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্ট ওরফে সানুদির দুচারটি গল্প হিন্দি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কথক সেদিন যে গল্পটি বাড়ির সবার সামনে বসে শুনলেন সেটি সানুদির নিজের জীবনের কথা। লেখক-কথকের সাথে দ্বিতীয় দফায় দেখা হওয়ার মধ্যে কেটে গেছে অনেকটা বছর এবং অতিক্রম করে এসেছেন অনেক ভৌগোলিক সীমা। ঘটনা বিন্যাস এইরকম। শ্রীকিষণ কুন্দন ভট্ট খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর বাড়িতে লেখক-কথকের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন কমিটির উদ্যোক্তারা। সেই ব্যবস্থা মতে পশ্চিমের এক শহরে প্রবাসী বাঙালিদের আয়োজিত বাঙালি সংস্কৃতির সম্মেলনে দু'ঘন্টা বক্তৃতা করে কথক গিয়েছিলেন শ্রীকিষণ কুন্দনজীর বাড়িতে।

দ্বিতীয় কাহিনির গল্পটির শেষাংশে পৌঁছে কথক কেবল অনুভব করেছে তার পরিচিত সদা হাস্যময়ী ও লাস্যময়ী এই রমণীটিকে, যে সম্পূর্ণ জড়তামুক্ত এক নারীব্যক্তিত্ব -যার মধ্যে আত্ম প্রকাশের কোন দ্বিধা নেই। কথকের এনে দেওয়া বই, মূলত যা তার নিঃসঙ্গ সময়ে অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থতার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই বোধকরি তার সতেজ মনের খোরাক হিসেবে তাকে উজ্জীবিত করে রাখত। বলা যায় একদা তার গৃহশিক্ষা তাকে বাঁচতে শিখিয়েছে, নতুন জীবন খুঁজে নেওয়ার তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার সাহস যুগিয়েছে এমন কি স্বীয় বাসনা চরিতার্থতার উপায় শিখিয়েছে, কেবল তাই নয়---সেই প্রৌঢ়ার কাছে কথককেও শিখতে হয়েছে যে, নিজের চাওয়া কোন দিনই ফলপ্রসূ হয়না, নিজের মধ্যের দ্বিধা না কাটাতে পারলে। স্বামী গোপেশ্বর সানুদিকে বিয়ে করে ফুলশয্যার দিন যা বলেছিলেন তা এই রকম :

> "ঐ সব কাপড়-চোপড় পরে শুলে ঘুমুতে পারবে না। ওসব ছেড়ে পাতলা কিছু পরে নিয়ে শুয়ে পড়। বিয়ের হাঙ্গামায় নিশ্চয় পাঁচ-সাতদিন ঘুমুতে পারোনি।

এবার নিশ্চিন্ত বিয়ে তো হয়ে গেল। বিয়ে নিয়ে তো আর মাথা ঘামাতে হবে না। নাও, শুয়ে পড় কাপড় জামা পাল্টে। আমার একটু কাজ আছে এ ক'দিন বন্ধ দিতে হয়েছে। বন্ধ দিলে ক্ষতি হয়।"[২০]

---অর্থাৎ সানুদি ফুলশজ্জার রাতেও স্বামীর সঙ্গ পাননি। লোক দেখানো বিয়ে হয়েছিল, সার্থক হয়নি বিবাহিত জীবনের সোহাগ রাতটাও। ---এই বার্তা পাঠকের কাছে পৌঁছানো মাত্র সানুদি সহজেই সহমর্মিতা পান পাঠকের। গল্পের শেষে পৌঁছে জানা যায় সানুদির জীবনের বাকী কথা তার লেখা গল্পে পাঠক ও কথক উভয়েই জানতে পারেন কী হয়েছিল সানুদির জীবনে। অর্থাৎ সানুদি নিজের জীবনের গল্পটিই রচনা করেছেন। এ গল্প সার্থক না হলে আর কীভাবে হবে? এ গল্পের ঘটনায় জানা যায় নায়িকার এক বাতিক-গ্রস্ত স্বামী ছিল। সে লোকটি যোগাভ্যাস করত। ফুল শয্যার রাতেই মালকোঁচা মেরে নতুন বউয়ের সামনে শীর্ষাসন করেছিল। আসলে সে ছিল তার ভণ্ডামো। জানা গেলো কয়েকদিন পরে। তারপর এলো চরম মুহূর্ত। এক গুরু ভগ্নীর ঘরে অর্ধেক রাত্রে ধরা পড়ে, বেদম মার খেয়ে হাসপাতালে যায়। হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া পায় তখন বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। নায়িকা বেচারী তখন একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করে। লক্ষ্যণীয় যে স্বল্প পরিসরে 'সানুদি'-র সমগ্র জীবনের পরিক্রমা হয়েছে-প্রকৃতিতে তাই একে ছোটগল্প বলা যাবে না। উপন্যাস-কল্প রচনার বৈশিষ্ট্য এখানে আছে। ব্যাপ্তি আছে ব্যাখ্যা নেই। তাই এটি উপন্যাস না হলেও উপন্যাসকল্প রচনা হিসেবে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হলো।

কাহিনীর কথক মনে মনে ভেবেছেন নিজে পুরুষ হয়েও যা পারেন নি, নারী হয়ে সানুদি তা পেরেছেন, সরস মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে এ নারী বাংলা উপন্যাসে বেশ কয়েকটি ব্যতিক্রমী নারী চরিত্রের মধ্যে থেকেও অগ্রণী।'সঙ্কোচের বিহ্বলতায়' ম্রিয়মাণ কথককে এ নারী পরোক্ষে লজ্জা দিতেও ছাড়েনি। লেখক ছোটগল্পের মেজাজে সানুদির প্রতি যথেষ্ট সময় দেননি তবু স্বল্প রেখার আঁচড়ে এ নারী যে উপেক্ষণীয়া নন তা বুঝে নিতে কষ্ট হয়না। বহু বছর পরে প্রৌঢ়ার এই চরিত্র প্রসঙ্গে লেখকের আবিষ্কার যেন:'এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে' যুবযানীর প্রেমরসরসিকতার পাশাপাশি প্রৌঢ়ার সরস মনোভূমির আবিষ্কার এ কাহিনিকে বাংলা ছোটগল্পের আসরে বিশিষ্টতা দিয়েছে সন্দেহ নেই। হতচকিত কথক বিহ্বলতার রেশ কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক হতে পারেন নি। একটা অসমাপ্ততার আঘাতে এ কাহিনী পাঠকের মনে কতকগুলি অনিবার্য জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়---এখানেই এ কাহিনীর গঠন-নৈপুণ্যই প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই। একে কখনোই উপন্যাস বলে সকলে মেনে নেবেন না। বড়জোর একে উপন্যাস-কল্প রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

গল্পটির মধ্যে গল্প আছে দুই-এ মিলে গল্পের আখ্যানভাগ সমাপ্ত হয়েছে। সানুদি ওরফে শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্টের গল্পে নায়িকার মাধ্যমে সানুদির প্রথম বিবাহোত্তর জীবনের কথা জানা যায় আর বিখ্যাত এক জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে গিয়ে শ্রীকিষাণ কুন্দনজী বলেন বাকী জীবনের কথা। গল্পের স্বাদ ও অবধূতের মুন্সীয়ানা ভোলার নয়।

'কিষণ কুন্দনজী খুবই দামী আতর ব্যবহার করেন পাশে বসে বুনো ফুলের গন্ধ পাচ্ছি। উনি শোনাচ্ছেন ওঁর বিবাহের কাহিনী। ওঁর পুত্র তিনটির যিনি জননী তিনি একদা যাত্রার দলে অভিনয় করতেন। যাত্রাওয়ালারা এসেছিল ওঁর কোলিয়ারীতে। প্রথম রজনীর তারা তাদের সুখ্যাত নায়িকাটিকে খোয়াল। অবশ্য বেশকিছু অর্থদণ্ড দিতে হয়েছিল ভট্টজীকে। তা হোক, জিতে গেছেন তো তিনি। অমন পরিবার কটা লোকের ভাগ্যে জোটে।'[২১] --এ বর্ণনার মধ্যে যে স্বল্পভাষিতা আছে তা ছোটগল্পের মেজাজকেই তুলে ধরে।

তৃতীয় কাহিনি : মনে রাখতে হবে আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হলেও একজনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে উঠেছে এই ত্রিপর্বিক গল্প। অনেক সময় দাম্পত্য সম্পর্কের সামাজিক চেহারার মধ্যে থাকে আপাত বিশ্বস্ততার । বাহ্যিক সুস্থতার আড়ালে কঙ্কালময় বাস্তবতা লুকানো থাকে। সহজ সামাজিক জীবন ছন্দের মধ্যে ডুবে থাকা পাহাড়ের মত জীবন-যন্ত্রণা এ গল্পের চালিকা শক্তি। নিশ্চিন্ত বয়ে চলার পথে অতর্কিত স্থানে ডুবো পাহাড়ের সংঘাতে তলিয়ে যাওয়া জাহাজের মত নিশ্চিন্ত মধ্যবিত্ত জীবনও ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এ গল্পে লেখক সেই জীবনের ছবি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে এঁকেছেন।

'টপ্পাঠুংরি' বা 'আমার চোখে দেখা'[২২] -র তৃতীয় কাহিনি -তান্ত্রিকের প্রতিশোধ । তৃতীয় কাহিনি গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে তৃতীয় পুরুষ বর্ণিত প্রথাগত ভঙ্গিতে। তারপর তা হঠাৎই ডায়েরি -নির্ভর উপন্যাস-কল্প রচনা হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে একটি চরিত্রের লেখা ডায়ারিটাই এই কাহিনি। অতএব শৈলী বিচারে অভিনব। এর চরিত্রগুলিও সাধারণ গল্প উপন্যাসের চরিত্রের মত নয়। প্রেমিক তান্ত্রিক নিশিকান্তদার জীবনোপলব্ধি, যন্ত্রণার বোধ, মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা গোপন প্রতিশোধস্পৃহা, সাধনার আপাত অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েও শেষ পর্যন্ত কীভাবে তা চিরন্তন মানবের চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে নিশিকান্তদার ডায়েরির পাতায় ধরা পড়েছে।

নারীর প্রতি দখলদারিত্বের প্রশ্নে কেবল যুব মনের অস্থিরতা নয় পঞ্চাশোর্ধ্ব মানব সম্পর্ককে, তার আদিম হিংসার জায়গাটিকে নতুন ভাবে চিনিয়ে দিয়ে গেছে 'টপ্পাঠুংরি'-র তৃতীয় কাহিনী। এমন কি এই মানুষটি সাধক হয়েও সংযম হারিয়েছেন। এই আদিম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিশোধের পথ বদল হলেও মত বদল হওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকে। এই কাহিনীটির শেষ পর্বে পৌঁছে সে কথাই উপলব্ধ হয়। ভীমা চতুর্দশীর রাত্রে পুণ্য তিথিতে মায়ের পায়ে সর্বাঙ্গসুন্দর অনুপম কে বলি দিয়ে নিশিকান্তদার পলায়ন। আমেরিকায় গুরু গিরির ঘটনা সেই প্রতিশোধ স্পৃহ মনের পরিচয়কে তুলে ধরে সাধারণের অপরিচিত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে দেখালেও মানবচরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারেই যে ঘটেছে এ কথা অস্বীকার করবে কে? তবে স্বীকার করতেই হবে তান্ত্রিক মতে অনুপমের বলি চড়ানো যতই ধর্মীয় আচার হোক তবু এটি প্রতিশোধ গ্রহণ। অবধূত বাংলাসাহিত্যে 'বীভৎস' রসের সার্থক ব্যবহার করেছেন একথা অনস্বীকার্য।

তান্ত্রিক মানুষ ছিলেন বলেই তাঁর প্রতিশোধের ধরণটা কেবল আমাদের অপরিচিত ঠেকছে। মধ্য চল্লিশের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, বিকৃতকামা নরনারী, তাদের প্রেম ও প্রতিহিংসার গল্প হিসেবেই

যেন পৃথক তিনটি পার্ল 'টপ্পা ঠুংরি'র কাহিনীসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ কাহিনি আত্মকথার অন্তরালে চতুর্থ কাহিনিতে দেখা যাচ্ছে কথক নিজের জীবনী অন্যকে দিয়ে লেখাতে চান। অবধূতের অন্যান্য উপন্যাসের মত মধ্য বয়স্কের আরেক খেয়ালকে অবলম্বন করে, নিজেকে প্রকাশের চেষ্টায় -এ কাহিনীর ভূমিকা তৈরী হয়েছে।

লেখক বন্ধুর সঙ্গে আত্মজীবনী লেখানোর বাসনা ব্যক্ত করেছেন লেখকেরই অতি সাধারণ এক বন্ধু। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে যার কোন পার্থক্যই নেই তার আবার নিজের জীবনী প্রকাশ করার ইচ্ছা ! সাধারণভাবে এ জীবনী রচনা অত্যন্ত সাদামাটা ও বিশেষত্বহীন হওয়ার কথা কিন্তু কাহিনির অগ্রগমনের সাথে সাথে আমরা দেখলাম যে মানুষ কখনো কখনো কেবল ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েও হতে পারে বিস্ময়কর ব্যতিক্রমী। নিষ্ক্রিয় থাকলেও জীবন সব সময় থেমে থাকে না। নিয়তির অনির্দ্দেশ্য ইঙ্গিতে যেকোনো মানুষেরই বিস্ময়কর জীবনাভিজ্ঞতা হতে পারে---এ কাহিনি যেন সে কথাই শোনায়। দেখা গেলো নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে চলে যে জীবন সে জীবনের নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির হাতে থাকে না। এখানেও আমরা অবধূতের রচনার স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যটি পেয়ে যাই। অবধূত কোথাও গিয়ে যেন ঘটনা-পরিণতির পেছনে নিয়তির প্রভাব লক্ষ করে থাকেন।

সামান্য রিক্সাওয়ালার জীবন হলো ঘটনাসূত্রে ক্রমাগ্রসরমান। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় যেমন সাহেবের প্রসঙ্গ জড়িয়ে গেল তেমনি এ কাহিনী দেশের সীমা ছাড়িয়ে গেল। ভৌগোলিক সীমা ও নানা কাহিনীর বৈচিত্র্য লেখকের জীবন রসরসিকতার পরিচয়বাহী । বোঝা গেল যে জীবন নানা বৈচিত্র্য আর নানা অভিজ্ঞতার রসদে পূর্ণ---অবধূতের টান সেই জীবনের প্রতি।

বলাবাহুল্য অবধূতের রচনা আমাদের বাস্তবতা-কেন্দ্রিক গোপন-অনালোকিত অভিজ্ঞতার বিশ্বকে অবশ্যই সম্প্রসারিত করেছে । অভ্যস্থ ভ্রমণ কাহিনী পাঠের সাধারণ অভিজ্ঞতা অবশ্যই নতুনের স্বাদ পাবে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' কিম্বা 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' পড়লে। আসলে নিছক ভ্রমণ কাহিনী না লিখে অবধূত আমাদের এমন বাস্তব জীবনের সন্ধান দিলেন যে জীবন মানুষের হলেও সাধারণ বাঙালী পাঠকের অজানা ছিল। এ জীবন রাহী জীবন। অথচ অনস্বীকার্য যে এ সবই মানুষেরই জীবন। ভোটাধিকারী না হলেও এঁরা মানুষ এবং অনেক সময় সমাজবদ্ধ মানুষও শিখতে পারে এমন জীবনাভিজ্ঞতায় এঁরা সমৃদ্ধ।

প্রেমপ্রীতি হিংসা, লালসা, সম্ভোগ---বাসনা কোন কিছুতেই এঁরা কম যান না। শুধু এঁদের সঙ্গে অপরিচয়ের কিম্বা অল্প পরিচয়ের ব্যবধানই এই শ্রেণীর গ্রন্থভাবনাকে নিরুৎসাহিত করে দেয় -এবিষয়ে আমাদের অবহিত থাকতে হবে। একটা কথা ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে যে অবধূত সমাজ সংস্কারক নন। সৈয়দ মুজতবা আলীর[২৩] মতে,

> ''ডন কুইক্সটের মত নাঙ্গা তলওয়ার দিয়ে বেপরোয়া বায়ুযন্ত্র (উইন্ড-মিল) আক্রমণ করা তার ধর্মে নেই লোকটি বড়ই শান্তিপ্রিয়। শুধু যেখানে বর্বর পশুবল অত্যাচার করতে আসে, এবং সে পশুবল ফক্কুড়িতেও সিদ্ধহস্ত সেখানে অবধূত, ফক্কুড়ির মুষ্টিযোগ ফক্কুড়ি ছাড়া নান্যপন্থা বিদ্যতে বিলক্ষণ জানেন বলেই সেটা বীভৎস

রুদ্র রূপে দেখাতে জানেন। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, শীলের দিক। লেখক হিসেবে 'হিরো' রূপে তিনি কস্মিনকালেও আত্মপ্রকাশ করতে চাননি।''

কলিতীর্থ কালীঘাট : মানুষের বুকেই জাগবেন মহামায়া

কালীঘাটের কুষ্ঠরোগীর ছদ্মবেশ ধারী এক মহাসাধকের দুই শিষ্য---কংসারি হালদার আর বনমালী ঠাকুর। বনমালী ঠাকুর সংসার ছেড়েছেন। ঘরে তাঁর স্ত্রী আর দুই শিশু সন্তান---ফনা আর ফিনকি। বনমালী ঠাকুর বারো বছর পরে সিদ্ধ হয়ে ফিরবেন। তখন কালী জাগবেন কালীঘাটে। কংসারি হালদার 'কালীযন্ত্র'-র নিত্য পূজার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই কালীযন্ত্রটির নিত্য পূজা হয় বনমালীর বাড়িতে পুরুষানুক্রমে এই যন্ত্র পূজিতা হন। এই কালীযন্ত্রটি একটি দামী নীলা। অন্ধকারে এর থেকে আলো বের হয়। কংসারি হালদারের হ্ত থেকে ফিনকির হাতে কীভাবে এ পাথর ধনার হাত দিয়ে পৌঁছে গেল সে এক বিচিত্র ঘটনা। কালীঘাটে ঘটে যাওয়া সব ঘটনার মধ্যেই আছেন কংসারি হালদার। ভিড়ের মাঝে যজমানের সোনা চুরি গেলে তিনিই উদ্ধার করেন। আবার পুলিশী ঝামেলাও তিনি মেটান অতি সহজে। তিনি যে মহাপুরুষের আশীর্বাদ ধন্য। সবাই তাঁকে জানেন মান্য করেন। কালীঘাটের তিনিই শেষ কথা। এখন তিনি অসুস্থ যেকোনো সময়ে চলে যেতে পারেন। তাঁর রোগশয্যায় বনমালী এলেন। বনমালী ঠাকুর ফিরলেন একবারে শেষ সময়ে। লজ্জায় পড়ে গেলেন কংসারি। তিনি সে যন্ত্রটি ধনাকে দিয়েছিলেন। যদি তাঁর মৃত্যুর পরে বনমালী ফিরে আসে ---তাই ধনার হাত দিয়ে এই যন্ত্রটি পাঠাতে চেয়েছিলেন তাঁর যজমানের কাছে। বনমালী ফিরে এলে সে যন্ত্র তাই তিনি দিতে পারলেন না। এই লজ্জায় তিনি একেবারে পাষাণ হয়ে গেলেন। ঔপন্যাসিক সব সমষ্যার সমাধান করে দিলেন। বনমাল ফিরে পেলেন তাঁর পরিবারকে। ঘোষণা দিলেন মা কালী জাগবেন মানুষের বুকের মধ্যেই।

উপন্যাসের চরিত্র, ভাষা, কাহিনি সজ্জা এতটাই সার্থক যে এ উপন্যাস বা উপন্যাস-কল্প রচনাটি পুণ্যার্থী বা সাধারণ মানুষ সকলেরই মন কাড়ে। তীর্থস্থানের কথা বললেও এ রচনাটি অবশ্যই মানুষের কথাতেই পূর্ণ। বনমালী ঠাকুরের পরিবার---অসহায়া এক নারী কেমনভাবে বংশের মুখে কালি না দিয়ে সন্তান দুটিকে বুকের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল সে কাহিনি ---সম্পূর্ণভাবে মানুষের কথা। ফিনকির চরিত্র নিয়ে কানাকানি, অভাবের দায়ে ফিনকির বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা ফনার রোজগার বাড়ানোর চেষ্টা---সব মিলিয়ে এ কাহিনি মানুষেরই কাহিনি।

উপন্যাস-কল্প রচনা 'কলিতীর্থ কালীঘাট'। 'কলিতীর্থ কালীঘাট'-এ মন্দির কেন্দ্রিক জীবনযাত্রার নানা অপরিচিত কত বিষয় যে আমাদের জানা হয়ে যায়! মন্দিরের সেবাইত ছিল কোন কালে

এখনও তারা পুরুষানুক্রমে বসবাস করছে সেখানে। কত ভক্তি নিয়ে লোকসাধারণ সেখানে যায়। আগে হয়তো আরো বেশী যেত ভক্তরা। তারা কোনো কালে যা ভাবতে পারেনি এমন খুঁটিনাটি স্বার্থপরতা মন্দির চত্বরেই ঘটে চলেছে। প্রতিযোগিতা উত্তরসুরিদের মধ্যে। এক একটি পরিবারের দায়িত্ব পড়ে এক-এক দিন সেদিন মন্দিরে যত ভক্ত সমাগম হবে ততই লাভ কেননা মানসিকের (মানতের) যাবতীয় অর্থ তারাই পাবে সেদিন সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মন্দির প্রাঙ্গণে সেই পরিবারের কেউই বাদ যায়না। একদিনের উপার্জনে চালাতে হবে বাকী দিনগুলো। পেটের দায়ে ধর্মস্থানের এই প্রতিযোগিতা ভক্ত ও সাধারণ পাঠকের কাছে অসহনীয় মনে হয় কিন্তু এটাই বাস্তব। সংসারের প্রধান কর্তা ব্যক্তি যদি আবার সংসার-উদাসীন হন তবে তো আর কথাই নেই।

কিশোর বয়স্ক পুত্র-কন্যাকে নিয়ে একজন মহিলা কেমন করে সংসার অতিবাহিত করেন? এই সূত্রে উপন্যাস-কাহিনিতে জীবন -যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন অবধূত। ফলে এ উপন্যাসে পীঠস্থান হয়ে ওঠে সেবাইত পরিবারের জীবন কাহিনি। লেখক জানিয়েছেন সেবাইত পরিবারের মেয়েদের মধ্যেও চলে অন্যরকমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কে কতবার সতী সাজতে পেরেছে তাই নিয়ে করে অহংকার। সতী সেজে পয়সা নেওয়াটা বড়দের কাছে লজ্জা হলেও ছোটরা এর মধ্যে শ্লাঘা অনুভব করে। সেবাইতদের অর্থকষ্ট থাকলেও বংশ গৌরবে স্ফীতবক্ষ হয়ে থাকা নিত্যকার অভিজ্ঞতা সন্দেহ নেই।

'কলিতীর্থ কালীঘাট' ধর্মীয় কথা শোনাবার জন্য রচিত হয়নি। ধর্ম-আশ্রিত যে জীবন সেই পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার এবং দুঃখ বেদনার কথাই এখানে উপজীব্য। ধর্মভাব আর অর্থাভাব ঈশ্বর সন্ধান আর সংসার যাপন---সেবাইতদের ধর্ম আর মানবধর্ম এখানে সুচিত্রিত। এ উপন্যাসে দেখা যায় জীবনের নানা রূপ। দেবী কালিকার পীঠস্থানকে ঘিরে পরিবেশ আর মূল ভক্তিভাবকে বজায় রেখে অবধূত কিশোর-কিশোরীর প্রেম, দরিদ্র জীবনের সমস্যা, এমনকি পরিবর্তমান পৃথিবীর সাথে চিরন্তন মানব সম্বন্ধকে যুক্ত করতে পেরেছেন। তাই কংসারি হালদারের গোপন প্রণয়কে স্বীকৃতি দেন তাঁর পুত্র-পুত্রবধূরা। অবধূত জীবনের সত্য সন্ধানে এ উপন্যাসেও নির্ভীক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ফিনকি ও ধনার প্রণয় সম্পর্ককে আমরা উপলব্ধি করি। যৌবন সর্বত্রই দুঃসাশনীয় এখানেও ব্যত্যয় হয় না। যে কোনোদিন মিথ্যা বলেনি, সেও মাকে লুকিয়ে দেখা করতে যায় সমবয়সী যুবকের সঙ্গে। ভয়ও করে। পরক্ষণেই ভাবে কেনই বা সে ভয় পেতে যাবে ধনার মতো সামান্য একটা বেকার ছেলেকে?

নির্জন গলি পেরিয়ে নদীর ঘাটে একান্ত জনশূন্য এই জায়গায় তার বুক কেঁপে যায় তবু মুখে সাহস বজায় রেখেএকটি মেয়ে কেমন করে অতিক্রম করে তার একান্ত ভয়ের মুহূর্তগুলি, তার অনুপম বর্ণনা আছে আলোচ্য উপন্যাসে। ফিনকির চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখক বিশ্বস্ত তা অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। কোথাও গল্প জমিয়ে তোলার চেষ্টা নেই অথচ গল্প চলেছে আপন গতিতে। লেখকের অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকলে এমন সাবলীল লেখা সম্ভব নয় একথা উপন্যাসটি পড়তে পড়তে স্বতঃই মনে হবে।

ভক্তদের কাছে কংসারি হালদার নিজের পূর্বতন সুখ্যাতি বজায় রাখার মরিয়া চেষ্টা লক্ষ করার মতো। পীঠস্থানে তাঁর উপস্থিতিতে তাঁরই যজমানের নববধূর গলার হার চুরি যাবে এ কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি কংসারি হালদার। এখন তিনি বৃদ্ধ পূর্বকার সেই যৌবনের দিনগুলি তিনি তো ফিরিয়ে আনতে পারবেন না ! নইলে তাঁর বাড়ীর বউ ঝিদের দেখিয়ে দিতেন তাঁর ক্ষমতা!

মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে আসে পাশে গড়ে উঠেছে বস্তি সেখানে সঙ্গত ভাবেই আস্তানা গেড়েছে চোর গুণ্ডা বদমাইশের দল। এদের মধ্যকার মানবত্ব ও পশুত্বকে জীবন্ত তুলে ধরার নৈপুণ্য তিনি দেখিছেন গভীর প্রত্যয় ও সংযমের সঙ্গে। কত যে বৈচিত্র্য তার চরিত্র সৃষ্টির পরিকল্পনায়! বোধহয় ব্যাপক ও গভীর জীবনাভিজ্ঞতাই এর মূল কারণ। মন্দির প্রাঙ্গণে রাতের বেলায় অধিকাংশ সাধু ফকির এবং ভিখারীরা যত্র তত্র অবস্থান করেন। লক্ষ করা যায় তাই সেবাইত কংসারি হালদার মশায় যখন শেষরাত্রে রাস্তায় নামেন তখন মন্দির চত্বরে লাঠি ঠুকে খুব সাবধানে চলেছেন,পাছে কাউকে না মাড়িয়ে ফেলেন! তাই এ সতর্কতা। বৃদ্ধ বয়সে কংসারি হালদারের এই অভিসার এমন ভাবে লেখক বলতে পেরেছেন যাতে বলার উদ্দেশ্যেই যে বলা হয়নি তা অনস্বীকার্য। বৃদ্ধ বয়সে নিঃসঙ্গ কংসারি হালদারের পরিবার তাঁর মনের ইচ্ছাকে কীভাবে স্বীকার করে নিল-তা উপভোগ্য হয়েছে। কীভাবে যজমান পত্নীর অসহায়তা আর বাৎসল্যের পথ ধরে কংসারি হালদারের বয়স্থ পুত্র-পুত্রবধূদের স্বীকৃতি পেলো তা অবধূত যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সাথে দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে কীভাবে ফিনকির ভালবাসা সার্থক হলো তা বিশ্লেষণ করলে লেখকের প্রচলিত মিলনাত্মক কাহিনি রচনার ক্ষমতা যে কারো চেয়ে কম ছিল না তা বোঝা যায়।

তিন.সপ্তস্বরা পিনাকিনী---যেন উপন্যাস-কল্প রচনায় জীবনের গোত্রান্তর

'সপ্তস্বরা পিনাকিনী 'বইটি উৎসর্গ করেছিলেন বিচারপতি চুনিলাল ঘোষকে। এটি সামাজিক কলুষ নিয়ে রচিত ১২২ পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস। বইটির গুরুত্ব এখানে যে শেষপর্যন্ত লেখক সেই কলুষ কাটিয়ে মিলনের আলো ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। গল্পটিতে উপন্যাসের সম্ভাবনা থাকলেও শেষপর্যন্ত একে আমরা বড় গল্প বলে অভিহিত করতে পারি। এর মধ্যে উপন্যাসের ধর্ম যাঁরা খোঁজেন তাঁরা এ গল্পে উপকাহিনিকে মূল কাহিনি থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন। এখানে মান্য-গণ্যদের কথা যেমন আছে তেমনি আছে কামলোলুপতার প্রসঙ্গ---বেশ ছড়ানো নানা চরিত্রের ভিড় এই উপন্যাস কল্প রচনায়---আবার তাদের প্রতি যথেষ্ট সময় না দিয়ে ব্যঞ্জনায় শেষ করেছেন পাঠকের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে। এখানে নানা ঘটনার সমাবেশে একে উপন্যাস বলে ভুল করারও যথেষ্ট কারণ আছে। যে বিষয়টি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় তা হোল এর নানা বিষয় ও চরিত্র গুলি বড় দ্রুত এগিয়ে চলেছে কোথাও কাঙ্ক্ষিত বিশ্লেষণ লেখক করেননি। এ বইটির আকার উপন্যাসের কিন্তু মেজাজ বড় গল্পের-ই। এর চরিত্র গুলি এক কথায় ' Type Character'---এদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। টাইপ চরিত্র সম্পর্কে ই. এম. ফস্টার

তাঁর ' Aspects of Novel' -এ বলেছিলেন এখানে থাকবে 'a single idea or quality..'.এবং স্বভাবতই টাইপ চরিত্রের ক্ষেত্রে 'idividualizing detail' থাকে। এই কাহিনীতে প্রতিটি চরিত্রে আমরা তার প্রমাণ পাবো।

অবধূত লক্ষ করেছেন সমাজে অপরাধ মূলক কাজের পিছনে তথাকথিত ভদ্রলোকদেরই হাত। তাই লেখকের সত্যানুসন্ধানী মন সমাজবিরোধীদের দায়ী না করে মুখোশধারী ভদ্রলোকেদের দায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। অপরাধী পিনাকীর নিজের মায়ের কথা মনে নেই। ভুলে গেছে নিজের ছোটোবেলার নামটাও। নাম পাল্টাতে পাল্টাতে এমন হয়েছে। অপরাধ জগতের মানুষের নিজের অতীত পরিচয় মনে থাকে না। ভুলে না গেলে বহুরূপের কারবার চলে কী করে? এখানে মনুষ্যত্বের প্রকাশ তিনি দেখেছেন সমাজবিরোধীদের মধ্যে। যেমন:

> "বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে রইল ক্যাঙ্গারু, পিনাকী দেখল তার দুচোখের কোণ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। পিনাকী বলল -'কেঁদ না ক্যাঙ্গারু। বড়মানুষদের খিদমত খাটতে গিয়ে এইভাবেই আমরা বেঘোরে প্রাণ দি। নিমকহারাম বড়মানুষ জাত, এইমাত্র ঐ লোকটা বললে কি জান, বললে ও তোমাকে চেনেই না। মরতে মরতে উঠে গিয়ে তুমি ওকে ফোন করেছ,ও এসে তোমায় মরতে দেখে বললে যে তোমাকে চেনেই না।"[২৩]

এই লোকটা পরশুরাম মিত্র মিনতি মিত্রর স্বামী । সে ক্যাঙ্গারুকে লাগিয়েছিল চণ্ডীর পিছনে। ---এই ভাষাতে আরবী-ফারসির মিশেলে হুতোমী কলকাত্তাই উঠে এসেছে। বড় গল্পের স্বভাব মেনে এখানে ঘটনা পরিবর্তনের আকস্মিকতা আর নাটকীয় সংলাপ এসেছে। ফলে উপন্যাসের তুলনায় কাহিনিকে বড় গতিশীল করে তুলেছে। খুব দ্রুত এগিয়েছেন লেখক একথা মানতেই হবে। গল্পের শুরুতেই দেখি একটি লোক বাসে পিষে গেছে। লোকটির একটি পা থেঁতলে মাংস আর রক্ত প্যান্টের সাথে একাকার। হাসপাতালে কাচি দিয়ে কেটে তবে আলাদা করতে হয়েছে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার কিছুতেই এ রোগীর গায়ে হাত দিতেই চাইছিলেন না। কিন্তু সিস্টার মেট্রনের মিনতিতে সার্জন অপারেশন করেছেন। এই মেট্রন সাধারণের মত নন। সবাই তাকে সমীহ করে থাকেন। রোগীর সেবায় সততায় এঁর জুড়ি মেলে না। দাদু সদাশিবের কাছ থেকে জানা যায় এর নাম চণ্ডী। চামুণ্ডা হলে ভালো হত। সে অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করে। মারামারির ক্ষেত্রে ছেলেদেরও বাদ দেয় না কেবল রোগীর সেবায় সে মমতাময়ী। তেজস্বিনী শ্যামা মায়ের আদলেই যেন এই নায়িকার নির্মাণ। এক তেজস্বিনী নারীর ঘটনা-নির্ভর জীবন এ গল্পের উপজীব্য। তবে মনস্তত্ত্ব-নিপুণ স্রষ্টার পরিচয়ও যথাস্থানে মেলে।

যেখানে কৌতূহল জমে ওঠে সেখানেই চণ্ডী। তার স্বভাবের পথ ধরেই পাঠক গল্পের কেন্দ্রে পৌঁছে যান। অচৈতন্য রোগীর পকেটের মণিব্যাগে টাকা আর যে চিঠিটা পেয়েছিলেন চণ্ডী, তা থেকে অনেক বিষয় নিজের মত ভেবে নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে কাহিনি ছড়িয়ে পড়ল নানা পার্শ্ব কাহিনিতে। এসব কিছুই হতে পারে গল্পের উপকরণ,উপন্যাসের নয়। জীবন-আলোচনার

সাথে চরিত্র-গুলির জীবন-দর্শন ব্যাখ্যাত হয়নি। তাদের আচরণে কিম্বা বক্তব্যে যেটুকু উঠে এসেছে তাতে একে উপন্যাস-কল্প রচনাই বড় জোর বলা যেতে পারে। ছোট হয়েও অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মহিষকুড়ার উপাখ্যান' যেমন সার্থক উপন্যাস এটি তেমন নয়। এ গল্পের স্বাদ আমাদের ঠিক সত্যান্বেষী গল্পের চরিত্রকে মনে করায়। এর ঘটনাবলী যেন চোখের সামনে দেখার মত স্পষ্ট। সে নিঃসন্দেহে লেখকের বড় গুণ।

সিনেমার ফোকাসের মত আলো এসে পড়ল একটি খোঁড়া লোকের উপর। সে নিজের এই আকস্মিক আঘাতে অনেকটাই বিমর্ষ। নানা কথা সঙ্গতভাবেই তার মনে আসছে। গল্প এখানে মনস্তাত্ত্বিক পথে চলেছে। নিজের এ হেন অসহায়তার সময় তেজস্বী ও সমর্থ লোকের মাথায়ও ভিক্ষে করে খাওয়ার মত ভাবনা আসতেই পারে। তার সদ্য একখানা পা কাটা গেছে। প্রাণ বেঁচেছে কিন্তু এই অসহায়তা তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ করেছে। মনের জোর তার অসাধারণ তাই এ অবস্থায় সে নিজেকে নিয়ে তামাশা করতেও পারছে। নির্লিপ্ত মনের পরিচয়ে তাকে পাঠক একটু অসাধারণ ভাবতে পারে---কিন্তু ঐ পর্যন্ত-ই। কলকাতার জনবহুল রাস্তায় চলার সময় নানাজনের সাথে ধাক্কা খেতে হচ্ছে তাকে। এমন সময় যিনি এগিয়ে এলেন তিনিই চণ্ডী ব্যানার্জি। হসপিটালের খাতায় তাঁর নাম আলো ব্যানার্জি। রোগীর প্রতি, কাজের প্রতি আগাগোড়া দায়িত্বশীলা এক রমণী।

কাহিনির মধ্যে চণ্ডী ওরফে আলো ব্যানার্জির সংযোগ নাটকীয় কিন্তু আকস্মিক মনে হয় না লেখকের গ্রন্থনার মুন্সিয়ানা পাঠককে মুগ্ধ করে। বিশ্লেষণী আলোয় আর পরহিতব্রতী ভাবনায় আবেগবর্জিতা এই নারীর দয়া-প্রেমপূর্ণ হৃদয়টি পাঠককে আকৃষ্ট করে। আলো ব্যানার্জি হস্‌পিটালের থেকে আগেই ছুটি নিয়েছে। এ ছুটি সে এই রোগীর জন্যই নিয়েছে। তার মনে হয়েছে রোগী যে নামটি লিখিয়েছে সেটি নকল। কিন্তু হাসপাতালের কাউকে জানতে দেয়নি। রহস্যের গন্ধ পেয়েই চণ্ডী নিজেকে যুক্ত করেছে এর সাথে। সেও কি জ্যোতিষে পারদর্শী তার দাদুর মত এই লোকটির মুখ দেখে তার অসাধারণত্ব বুঝতে পেরেছিল? গল্পের ধর্ম মেনে লেখক বিশ্লেষণে সে সময় দেন নি, দিলে এর প্রকৃতি উপন্যাসের দিকে গড়াতে পারত। এর দ্রুততা একে বড়জোর উপন্যাসকল্প রচনা বা বড়গল্পের স্বভাবে চেনায়। চণ্ডী অত্যন্ত আপনজনের মত এ রোগীর সাথে সে ব্যবহার করেছে। তার স্বভাব কঠোর রূপের অন্তরালে কোমল প্রাণরসধারা প্রবাহিত। সে যাই হোক এক্ষেত্রে চণ্ডী ব্যানার্জী যা অনুমান করেছিল তা সত্য সে বাঁকড়োর কেষ্টধন বটব্যাল নয়। তবে ঐ পর্যন্তই। তার মণিব্যাগ সংক্রান্ত অনুমান সত্য নয়। সে লোকনাথ রায়ও নয় - সে দাসুভাই। তার পকেটে যে ব্যাগটা ছিল সেটা লোকনাথ রায়ের। ঠিকানা লেখা ছিল পি সাতাশ / ডি, কুবের স্ট্রিট। পরে জানা গেল লোকনাথ সমাজে প্রভাবশালী গুণিব্যক্তি। আলাদা মানুষ। বিদেশে তাঁর ছেলে ডাক্তার । সমাজ সেবী হিসেবে লোকনাথ রায় পরিচিত। সে ধনকুবের। নারীর প্রতি তার আসক্তি তাঁর যশে কালি ছিটাতে পারে বলে তিনি নিজের প্রকৃত স্বরূপকে ঢেকে রাখতে বড় সতর্ক। অথচ তেমন কাজটি তিনি করে ফেলেছেন। মিনতি মিত্র-র সাথে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া সেই দুর্বল জায়গাটি।

তাই লোকনাথ চান বিষয়টি যেন জানাজানি না হয়।

মিনতি মিত্রকে কাজে লাগিয়ে রোজগার করতে চায় তার স্বামী -পরশুরাম মিত্র। স্বামীর ইচ্ছাতে সে নেমেছে ধনী-মানী পুরুষ ধরার কাজে। ব্লাকমেল করে কোটিকোটি রোজগার করছে তার স্বামী । নানা ভদ্রবেশির মুখোশ এই গল্পে খুলেছেন অবধূত। লোকনাথ রায় তেমনই এক ভদ্রবেশী সমাজ-সেবক। পরশুরাম মিত্তিরের সে একজন শিকার। পরশুরাম মিত্তির জানে:

> "মান সম্মান খোয়াবার ভয়ে লোকনাথ এখন টাকা ঢালবে। বিলেত ফেরৎ ডাক্তার ছেলে, বিলেত ফেরত এঞ্জিনিয়ার জামাই, মস্তবড় লোকের ঘরে বিয়ে দিয়েছে ছেলের, সেই বড়লোক কুটুমরা, আর ওর ব্যবসা, সমস্ত ঘুচে যাবার ভয়ে টাকা ঢালবে। খবরের কাগজে ওর নাম ছাপা হয়, সভাপতি হোয়ে মালা গলায় দেয়, ধর্ম সমাজ ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দেয়। নারীকল্যাণ সমিতিকে কয়েক হাজার দান করেছে। আশা করে আছে যে ম'লে ওকে বিরাট শোকযাত্রা করে নিয়ে যাবে, ওর নামে রাস্তার নাম হবে।"[২৪]

সমাজসেবীর আবরণ ভেদ করে তাঁকে অবধূত বিনা আড়ম্বরে বাইরে এনেছেন। লেখক হিসেবে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্তি বজায় রেখেছেন। ব্যক্তির ওপর রাগ নয় দুষ্কর্মের সত্য স্বরূপ তুলে ধরেছেন বিনা আড়ম্বরে।

সমাজবিরোধীরা বড়লোক মানুষেরই সৃষ্টি- এমনই এ গল্পে লেখক জানিয়েছেন। পরশুরাম তথাকথিত মানী লোক বটেই। ক্যাঙারুকে মিনতি মিত্রর পিছনে লাগিয়েছিল তার স্বামী নজরদারি করতে। পিনাকী ওরফে দাসুভাই ক্যাঙারুকে যা বলেছে তা লেখকের নিজেরই কথা। বুঝতে সবার সুবিধে হবে বলে পরিবেশ পরিস্থিতি সহ একটু বিস্তৃত রূপে বলা হোল :

> "ব্রান্ডি আর জল সাবধানে ঢালতে লাগল পিনাকী ক্যাঙ্গারুর ঠোঁটের মধ্যে। কয়েক ঢোঁক গিলে ক্যাঙ্গারু প্রায় চুপি চুপি বললে---'বুকে লেগেছে শ্বাস নিতে পারছি না।' পিনাকী তার মুখের ওপর মুখ নিয়ে বলল -'ভয় কি ভাই। আমরা রয়েছি তোমার কাছে, এভাবে তোমাকে মরতে দোব না।' বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে রইল ক্যাঙ্গারু, পিনাকী দেখল তার দুচোখের কোণ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। পিনাকী বলল -'কেঁদ না ক্যাঙ্গারু। বড়মানুষদের খিদমত খাটতে গিয়ে এইভাবেই আমরা বেঘোরে প্রাণ দি। নিমকহারাম বড়মানুষ জাত, এইমাত্র ঐ লোকটা বললে কি জান, বললে ও তোমাকে চেনেই না। মরতে মরতে উঠে গিয়ে তুমি ওকে ফোন করেছ, ও এসে তোমায় মরতে দেখে বললে যে তোমাকে চেনেই না।"[২৫]

এই লোকটা পরশুরাম মিত্র মিনতি মিত্রর স্বামী । সে ক্যাঙ্গারুকে লাগিয়েছিল মেট্রন আলো ব্যানার্জী তথা চণ্ডীর পিছনে।--- এই উপন্যাসে নানা শ্রেণির মানুষ আছে তাই সার্থকভাবেই ভাষাতে আরবী-ফারসির মিশেলে হুতোমী কলকাত্তাই উঠে এসেছে।

এ গল্পে এসেছে প্রিন্সিপালের মত এক নারী। যে কোনো কলেজের প্রিন্সিপাল নয় নিজের প্রিন্সিপ্‌ল মেনে চলে বলে অন্যের কাছে এই নামে সমীহ আদায় করে নিয়েছে। স্বামী তাঁর

ছিলেন আদর্শ স্কুল শিক্ষক। ছেলে সৎ সাহসী ও কর্মানুরক্ত হয়েও বিনা দোষে প্রতিবেশির হিংসার শিকার হোল। তারপর সে হয়ে গেল সমাজবিরোধী। নাম তার কাইজার লেখক তার চরিত্র উদ্ঘাটনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী নন। বড়গল্পের ক্ষেত্রে চরিত্রের বিবর্তনের জন্য উপন্যাসের মতো মনোযোগ দেওয়া সম্ভবও নয়। তাই বিন্দুবাসিনী ও তার ছেলে নিখিলেশ বা নিখিল কীভাবে পাল্টে গেল সেই সমাজ-প্রেক্ষিত ও মানসিক দ্বন্দ্ব কিম্বা চরিত্রে তার কাঙ্ক্ষিত পূর্ব-সূত্র কিছু ছিল না। এইজন্য সপ্তস্বরা পিনাকিনী ’ কে উপন্যাসকল্প রচনা বলেই আমরা মনে করি। সদাশিব শিক্ষিত এবং স্থিতধী বৃদ্ধ। যেন বৃদ্ধবয়সে গৃহসন্ন্যাসী। তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি দাসুভাই ওরফে পিনাকীকে মুগ্ধ করে। চরিত্রগুলির মধ্যকার জট খোলার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অসামান্য।

> “অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল পিনাকী, তাকিয়ে রইল জ্যান্ত শ্বেতপাথরে গড়া অপরূপ মূর্তিটির পানে। ভবিষ্যৎ জানার বাসনাটা তখন তার মনের কোনেও উঁকি দিল না।”[২৬]

মানুষের ভবিষ্যৎ দর্শনে পারদর্শী এই বৃদ্ধ চণ্ডীর দাদু হওয়াতে কাহিনির অগ্রগমন তথা চণ্ডী ও পিনাকীর সম্পর্কের দ্রুত পরিণতি সম্ভব হয়েছে। দাদু সুলভ রসিকতা আর পিনাকীর সদগুণ আবিষ্কার করার জ্যোতিষ-জ্ঞান খুব স্বাভাবিকতায় কাজে লেগে গেল, নইলে চণ্ডীর সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠার বিষয়টি উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়াই অত্যন্ত দ্রুততায় ঘটেছে বলে মনে হত। তা মনে করার সুযোগ নেই কেননা এটি বড়গল্প; উপন্যাস নয় কিম্বা উপন্যাস-কল্প রচনা। দাদুর কাছেই জানা হয়ে গেছে যে পিনাকী নারী ঘটিত কোনো দুর্বলতার শিকার নয়। নারী নির্যাতন-জাতীয় কোন অপরাধ সে করেনি। অজ্ঞাত কুলশীলকে আপন করে নেওয়ার স্বাভাবিক বাধা এভাবে বড় গল্পের মেজাজে অপসৃত হয়ে গেল নিঃসংশয়ে। খুব অল্প পরিসরে আলো ব্যানার্জি পিনাকীকে নিজের জীবন সাথী বেছে নিলো। অনবদ্য সেই মুহূর্তটি :

> “নড়ে উঠল সদাশিবের ঠোঁট, চোখ না মেলে তিনি বলতে লাগলেন ---‘নারী বিদ্বেষী, কখনও নারীর পানে ফিরে তাকায় না, বহু কুকর্ম করলেও নারী স্পর্শ করে না কখনও কুপ্রবৃত্তি বশে। মহামায়া আগলে আছেন।”[২৭]

পিনাকী ব্যানার্জী ওরফে দাসু তার নিজের কাছে সে পরিষ্কার। চণ্ডীর মনে আর কোন সংশয় নেই তার সততা নিয়ে। লোকনাথের নামাঙ্কিত ব্যাগ তার হাতে এসেছিল লোকনাথের চরিত্রহীনতার মূল্য হিসেবে ওস্তাদের হাত থেকে দাসু ওরফে পিনাকীর হাতে । এই ভাবে লেখক বিনা আড়ম্বরে পিনাকীকে চণ্ডীর কাছে প্রিয় করে তুললেন। বিশ্বস্ততার জায়গা তৈরী হলো গল্পের আরো নানা ক্ষেত্র থেকে ভালোবাসতে আর বাধা কোথায়? তাছাড়া চণ্ডী ওরফে চামুণ্ডার ভালোবাসা আর দশটি বাঙালি মেয়ের মত হবেই বা কেমন করে? তাই একে একটা অসম্ভবের শিল্পরূপ না বলে চণ্ডীর জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলেই এ গল্পের উপসংহার গ্রহণীয়।চণ্ডী ওরফে আলোর দাদুপিনাকী ওরফে দাসুর সাথে আলোর মিলন ঘটালেন।

> “খোঁড়া তটস্থ হোয়ে হাতখানা বাড়িয়ে ধরল। পুরু কাঁচের চশমাটা ভাল করে

মুছে নিলেন ভদ্রলোক চাদরের খুঁটে, ঠিক করে বসালেন সেটা নাকে, তারপর হাতখানি ধরে মাথা হেঁট করে চোখ বুজলেন।''[২৮]

--- এই দাদুই অভয় দিয়ে পিনাকীকে বলেছেন :

''তুমি পিনাকী, পিনাকপাণি তোমার সহায় ফলাফল চিন্তা করে কখনও কোনও কাজ করেছ! পিনাকী, পিনাকপাণি যার সহায়, তার গলাটা বেশ কেঁপে উঠল। কাঁপুনে গলায় উত্তর করল...'কিন্তু চণ্ডী...' প্রশান্তকণ্ঠে বৃদ্ধ জবাব দিলেন...'তোমার ছিল, তোমার আছে, তোমার থাকবে। ঐ শক্তিতে তুমি সর্বত্র জয়লাভ করবে। যাও কাজ আরম্ভ করো। শত্রু বলি না দিলে কি চণ্ডীকে...সাক্ষাৎ চামুণ্ডাকে তুষ্ট করা যায়।''[২৯]

এখন ব্যক্তিগত আলাপে ও সহাবস্থানে পিনাকী-চণ্ডীর কোনো বাধা রইলো না। এবার সব জানলো আলো। বাসে চাপা পড়ে বেহুঁশ হয়ে গেছিল পিনাকী। তাই সে জানে না, পরের ঘটনা কী ঘটেছিল। আলো বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে চণ্ডী সে কথা জানিয়েছে :

''সেগুলো তাহলে খুলে নিয়েছে ওরা। ঐ রকম কাণ্ডই ওরা করে। বেহুঁশ বেওয়ারিশ রুগী অ্যাম্বিউল্যান্সে তুলে দিলে অ্যাম্বিউল্যান্সেই সব হাতিয়ে নেয়। পিষে যাওয়া ঠ্যাংটার সঙ্গে যে ঐ ব্যাগটা মিশে ছিল তা ওরা জানতে পারে নি, জানতে পারলে ওটাও যেত। আমি কিন্তু সেই ব্যাগটা থেকে কয়েকটা টাকা সরিয়ে ফেলেছি। তখন কি জানতাম ওটা আপনার নয়।''[৩০]

মানুষের সেবকেরা মানুষের অসহায়তায় কী করে তা লেখক বলেছেন এই সূত্রে। সমাজকে সংশোধনের মানসিকতাও রূপায়িত হয়েছে লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে। লোকনাথের আভিজাত্য ভেঙে যেতে বসেছে 'ওটা যে আমায় ফিরে পেতেই হবে সিস্‌টার, যে-কোনও উপায়ে চিঠিটা আমায় ফিরে পেতে হবে। তার জন্যে দু-একশ'যদি দিতে হয়-'[৩১] ' টপ্পা ঠুংরি ' বা 'আমার চোখে দেখা' উপন্যাস-কল্প রচনার বদন বাগচির* মতই ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়েছে লোকনাথের।

পিনাকীর মনে হয়েছিল : 'অদ্ভুত জীব!' এ কথাটি শুনে চণ্ডী নিজে বলেছিল ' এতক্ষণ লাগল আপনার বুঝতে---আশ্চর্য!'[৩২] পেশায় সরকারি হাসপাতালের মেট্রন সিসটার। তার শৈশব কৈশোরে লুকিয়ে আছে তার চরিত্রের ভবিতব্য। সদাশিব বাবু জ্যোতিশ গণনা প্রসঙ্গে পিনাকীকে বলেছেন চণ্ডীর কথা। চণ্ডী ছোটো থেকেই অ্যাডভেঞ্চার খ্যাপা। ছোটবেলায় ওর ঠিকুজী বানাবার সময় ব্যাপারটা বুঝতে পারেন সদাশিব। তাই তিনি নাতনীর নাম রাখেন চণ্ডী। চামুণ্ডা রাখলেই ভালো হত। ছোটবেলাতেই বোঝা গিয়েছিল, মেয়ে কি রকম জেদি হবে। যত জেদ তত সাহস। সদাশিব বাবুর জামাই,মানে চণ্ডীর বাবা চাকরি করতেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। ঐ মেয়ে জন্মায় আসামের জঙ্গলে, সেখানেই বড় হয়। ছ'বছর বয়স যখন তখন সদাশিব নাতনীকে নিজের কাছে এনে স্কুলে ভরতি করে দেন। সাত দিনের দিন স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়। চণ্ডী নাকি এমন মারপিট শুরু করে দিয়েছিল যে ওকে না তাড়ালে স্কুলসুদ্ধ

মেয়ে পালিয়ে যেত।

তাড়িয়ে দেবার দরুন চণ্ডী গেল ক্ষেপে। ক্ষেপে গিয়ে এমন পড়াশুনা করতে লাগল যে ওর ক্লাসের মেয়েরা যখন ক্লাস সেভেনে পড়ছে,তখন ও ম্যাট্রিক দিয়ে ফেললে। তারপর গেল কলেজে, সেখানেও মারপিট। এবার আর মেয়েদের সঙ্গে নয়, ছেলেদের মঙ্গে খুনোখুনি করতে লাগল। অগত্যা কলেজ থেকেও ছাড়িয়ে আনা হোল। হঠাৎ খেয়াল হোল নার্স হোতে হবে। ওর দাদা তখন ডাক্তারি পড়ছিল ও গেল নার্সিং শিখতে। দেখা গেল, ঐ একটি জায়গায় চণ্ডী শান্ত হোয়ে থাকে। রুগীদের প্রাণ দিয়ে সেবা -যত্ন করে, রুগীর মুখে হাসি ফুটে উঠলে ও যেন কৃতার্থ হোয়ে যায়। তাড়াতাড়ি খুব সুনাম হোয়ে গেল। নার্সিং পাশ করার পরে হাসপাতালেই চাকরি পেল। বড় বড় সার্জনরা শক্ত অপারেশন করতে গেলে সর্বপ্রথম ওকে খোঁজেন। সিস্টার ব্যানার্জিকে চাই, সিস্টার ব্যানার্জি যদি অপারেশনের সময় থাকে তাহলে রুগীর জীবন রক্ষা হবেই। সিস্টার ব্যানার্জির ছোঁয়া রুগী কিছুতেই মরে না।সদাশিব নাতনি গর্বে দস্তুরমত উত্তেজিত হোয়ে বললেন :

> "সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কি জান বাবাজী, সার্জন হয়তো বললেন অপারেশন করে লাভ নেই, রুগী বাঁচবে না। চণ্ডী জেদ ধরে বসল, অপারেশন করতেই হবে, রুগী বাঁচবেই। এই রকমের ব্যাপার বহু ঘটেছে। তাই নামজাদা ডাক্তাররা ওকে ভয়ানক খাতির করেন।"

রোগীকে রোগমুক্ত করার জন্য সরকার হাসপাতাল করেছেন। সেই হাসপাতালে নারকীয় কাণ্ড চলে। রোগীরা তাঁদের ব্যবসায়ের উপকরণ। 'পিশাচেও বোধ হয় পারবে না এ রকম কাজ করতে'[৩৪]---সিস্টার বললেন। অবধূত অত্যন্ত নির্লিপ্ততার সাথে তা জানিয়েছেন। হসপিটালের মেট্রন সিস্টার আলো ব্যানার্জির মুখ থেকে সরকারি হাসপাতালের খবর দিয়েছেন লেখক :

> "শুনুন তাহলে। রাত ন'টার সময় এক বউ অপারেশন টেবিলে মারা গেল। ভোর বেলা তার আত্মীয়রা এল সংবাদ নিতে। ডাক্তার-বাবু অম্লান বদনে বললেন তাদের, এই ইনজেক্শন আর এই সমস্ত ওষুধ এখনই কিনে দিতে হবে। অবস্থা ভাল নয়। ছুটল তারা ওষুধপত্র আনতে। এনে দিল ডাক্তার-বাবুকে । সেগুলো তিনি হজম করে ফেললেন। ওধারে তারা বসে আছে। ডাক্তারবাবু ব্যস্ত মানুষ, তাঁর তো একটা রুগী নয়। দৌড়াদৌড়ি করছেন। ঘন্টা দুয়েক পরে ডাক্তার তাদের জানিয়ে দিলেন, সর্বরকম চেষ্টা করেও বউটি মারা গেল। আরও এক ঘন্টা পরে খাটিয়া এনে মুর্দফরাসকে বকশিশ দিয়ে ঠাণ্ডা ঘর থেকে তারা লাশ পেলে।"[৩৫]

এখন তো আরো বেশি জানা যায়। দৈনিক সংবাদ-পত্রে হাসপাতালের অমানবিক মুখ প্রায়ই দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপও সে লালসার কাছে ব্যর্থ। হাসপাতালের অপকীর্তি দূর করতে বিচারপতিকেও নির্দেশ দিতে হয় কবরস্থ শিশুকে তুলে এনে পোস্ট মর্টেম করার! অবধূত তার

ইঙ্গিত দিয়েছেন এই পর্বে। পরশুরাম চরিত্রটির চেহারা ও মানসিকতা ---দুইই কদর্য। ভদ্রলোকের পোশাকে সবই ঢেকে নেয় সে। সে সুন্দরী স্ত্রী মিনতিকে দিয়ে মানী আর ধনী ঘরের লোকেদের ব্লাকমেইল করে।

> ''কড়া চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরখানা বোঝাই হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের সামনে উপস্থিত হোয়ে সিস্টার বেশ ঘাবড়ে গেলেন। একজন পাক্কা সাহেব, দামী স্যুট পরে আছেন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি মোটা চুরুট অস্বাভাবিক মোটা ফ্রেমের চশমা মাথা জোড়া চকচকে টাক চারচৌকো মুখ ঘাড়ে গর্দানে দশাসই পুরুষ, অমন মানুষকে সমীহ না করে থাকা যায় না।''[৩৬]

এই মানুষটি লোকনাথ রায়কে পাকড়াও করে টাকা কামাতে চায়; সাহায্য চায় চণ্ডীর। তার কথায় :

> ''সোজা কথা হোল লোকনাথ এখন টাকা দেবে, আপনার মুখ বন্ধ করবার জন্য টাকা দেবে, আমার মুখ বন্ধ করবার জন্যে টাকা দেবে। নয়ত আমি তাকে আদালতে টেনে নিয়ে যাব। ব্যভিচারের মামলা, মান সম্মান খোয়াবার ভয়ে লোকনাথ এখন টাকা ঢালবে।''[৩৭]

পরশুরাম মিত্তির মিনতির স্বামী, সে হসপিটালেই এসেছে চণ্ডীর লেখা চিঠি পেয়ে। চণ্ডীর মুখে রা নেই,স্তম্ভিত হোয়ে সে তাকিয়ে রইল মিত্তির সাহেবের অত্যধিক পুরু চশমার পানে। লোকটার চোখও দেখা যায় না। খুব ঘোলাটে দুটো বড় বড় ডেলা দেখা যায় পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে। চণ্ডী ভাবছে কে জানে শয়তানের চাউনি কেমন ! শয়তানের চোখ দুটো কি ওই রকম ঘোলাটে ! ধূর্ত পরশুরাম মিত্তিরের স্বভাব তার চেহারার মধ্যে দেখে নিয়েছে চণ্ডী ওরফে সিস্টার আলো বন্দ্যোপাধ্যায়। পরশুরাম দুপা গিয়েই থামলেন, তেরছা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন---

> ''আর একটা কথাও ভেবে দেখবেন, এই চিঠিখানার জন্যে আপনার অনিষ্ট হোতে পারে। চাকরি তো যাবেই, তারপর বদনাম। যাক মন খারাপ করবেন না। আমি আপনার শত্রু নই, এইটুকু মনে রাখবেন।''[৩৮]

অবধূতের লেখায় সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে পরিমিতি বোধ। মানুষের জীবনকে তিনি রূপ দিয়েছেন, হতে পারে সে জীবন তথাকথিত ভদ্রসমাজে নোংরা-জীবন বলে অনেকের কাছে পরিত্যক্ত। অবধূত সে জীবনকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন কিন্তু তার মধ্যে লেখকের তরফে ভোগীর লোলুপতা নেই আছে নিস্পৃহতা যা থেকে তাঁর সাধুত্বকে চিনে নেওয়া যায়। একজন ছদ্মবেশী দেহ-ব্যবসায়ীকে তিনি কোনরকম অশ্লীল বর্ণনা ছাড়াই সাহিত্যে জায়গা দিয়েছেন। ছোটগল্প বা উপন্যাস সব ক্ষেত্রেই বিশেষ এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

এ গল্পটির কোনো ঘটনাকে জোর করে চাপিয়ে দেন নি। কাহিনিটি এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে সবকিছুরই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক। পরশুরাম মিটার তার স্ত্রীকে নিজের কাজে লাগায় কিন্তু তাকে বিশ্বাস করতে পারে না---ওস্তাদ নামে একটি চরিত্র তার কারণ ব্যাখ্যা

করেছে :

> "মিটার ওয়াইফকে দিয়ে তার বাছাই -করা লোকগুলোকে ফাঁদে ফেলত। বাট ওয়াইফকে এই ফ্রিডম্ দেয়নি যে সেই পুওর গার্ল নিজের মর্জিমাফিক চলবে। অ্যাণ্ড ইউ নো, নোবডি ক্যান্ ট্রাস্ট এ ওয়াইফ, যদি জানতে পারে যে ওয়াইফটি করাপ্‌শন্ ব্যাপারটাকে পরোয়া করে না। হাজব্যাণ্ডের কন্‌সেন্ট নিয়ে করাপ্‌শন্ করলেও করাপ্‌শন্ ইজ করাপ্‌শন্। করাপ্টেড্ ওয়াইফ আর কারও হাতে পড়ে বেহাত হোয়ে যেতে পারে। তাই ওয়াচ্ রাখতে হয়।"[৩৯]

---বলা বাহুল্য লেখক এ কাহিনি রূপ দিতে গিয়ে ক্রিমিনাল -সাইকোলজি বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। স্রষ্টার এই সর্বজন-চরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতা না থাকলে চলে না। অনুভূতি-লোকে সব সৃষ্টির মনোলোক ছায়া ফেলে। অবধূতের বেলাতেও তা সত্য এবং স্বাভাবিক।

চরিত্র বর্ণনায় অবধূত যেন চিত্রকর! 'হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এল এক ফিরিঙ্গি সাহেব। একদম আবলুস কাঠ। আর সেই চলন্ত আবলুসের গুঁড়িটির ওজন কম-সে কম মণ পাঁচেক। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার,যা সর্বপ্রথম মানুষের নজরে পড়ে,তা হোল দাঁত। প্রত্যেকটি একজন সাধারণ মানুষের পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের মত চওড়া। সেই দাঁত আবার এমন ফরসা যে মনে হয় খাঁটি চাঁদি দিয়ে বানানো, সদ্য যেন পালিশ হোয়ে এসেছে সেকরা বাড়ি থেকে। সেই জাতের ডজন দুয়েক দাঁত মেলে যিনি এসে পৌঁছলেন গাড়ির পাশে, তিনি এক মুহর্ত দেরি করার মানুষ নন।

> "...দিলেন দুখানা হাত চালিয়ে পিনাকীর পেছন দিয়ে। আলতো করে তুলে বার করে ফেললেন ট্যাক্সির ভেতর থেকে। ঠিক যেন ছোট্ট একটি খোকা, ছোট খোকাকে বুকে তুলে নিয়েছেন তিনি। সেই অবস্থায় পিনাকী ওরফে দাশুভাই বলল -'আমার কাজিন গাড়িতে রয়েছে ওস্তাদ।"[৪০]

জিজ্ঞাসাবাদের সময় দেখা গেলো ওস্তাদ তাঁর পাঁচ নম্বর ফুটবল সাইজের কদমছাঁটা মাথাটা বার বার দু'পাশে দোলাতে লাগলেন। মুখে বললেন:-'আই সি, আই আন্ডারস্ট্যাণ্ড। আমি সব সাফ সাফ বলবে।'[৪১] আরম্ভ করলেন ওস্তাদ সাহেব তিনি স্বীকার করলেন তাঁর বাড়িটা একটা সরাইখানা গোছের ব্যাপার। কয়েকজন গণ্যমান্য মানুষ মাঝে মাঝে আসেন। সাজানো ঘর আছে রাত্রিবাস করে যান। অবশ্য সবই যথাসম্ভব আব্রু বাঁচিয়ে চলতে হয়। মানে খদ্দেরদের মান-সম্মান যাতে বজায় থাকে, সেদিকে ওস্তাদ সাহেবের সতর্ক নজর থাকে। তিনি জানালেন মিস্টার লোকনাথ রায়ও আসেন।

> "একলা আসেন না, বান্ধবী সঙ্গে নিয়ে আসেন। খুবই রেসপেকট্যাবল পার্‌সন কিনা মিস্টার রয়, হোটেলে তো আর যেতে পারেন না।"[৪২]

কোনো কোনো সমালোচক বলেন অবধূত কামের বিকৃত রূপ দেখিয়েছেন। সে রূপ অবাস্তব কল্পনা। নিবিষ্ট পাঠক অবধূতের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ মেনে নিতে পারেন না। যেসব জীবনে প্রচলিত সমাজ বিশ্বাসের পথ অচেনা তাদের কথা অবধূত বলেছেন কিন্তু সে জীবনের

যথার্থ রূপ আঁকতে বসে তিনি নিজের অকারণ কামপ্রবৃত্তির বর্ণনা দিয়েছেন এমনটি কোনো মতে সত্য নয়। তিনি সমাজ-বিগর্হিত জীবন-পিপাসার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি এঁকেছেন। কাজল গুপ্ত এবং মিনতি মিত্র-র মধ্যকার সম্পর্ককে তিনি সুখের করেননি। আদর্শায়িত করার কোনো চেষ্টাও করেননি।'সপ্তস্বরা পিনাকিনী'-তে মিনতি মিত্র একটি সম্ভাবনাময় জীবনের ব্যর্থ পরিণামকে সূচিত করেছে। যাঁরা মনে করেন একটা বিশেষ বয়েস পার হোলে যৌবন-নাটকের যবনিকা পতন হয়,তাঁরা জিভ কাটতে বাধ্য হবেন শ্রীমতী মিত্তিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হোলে। শ্রীমতী যেন সর্বশরীর দিয়ে কথা বলেন। ওঁর চলা দাঁড়ানো ওঠা বসা হাত নাড়া পা দোলানো দেহের প্রত্যেকটি আলোড়ন মুখর। মুখর অর্থে সাংঘাতিক রকম সাংকেতিক। মিনতি মিত্তিরের মুখের পানে বড় একটা কেউ তাকায় না। তাকাবার দরকার করে না। অনেকে হয়ত বলতেই পারবে না ওঁর চক্ষু দুটি কেমন, ওঁর কপাল নাক চিবুক গাল কি রঙে রঙানো থাকে, অনেকেই তা জানে না।

> "লোকের দৃষ্টি পড়ে ওঁর চরণ থেকে গ্রীবা পর্যন্ত জায়গাটুকুতে তার ওপর আর কারও দৃষ্টি পৌঁছয় না। বরং আশ্চর্য হোয়ে সবাই ভাবে যে মিনতি মিত্তিরের গ্রীবা থেকে চরণ অংশটুকু নাম-না জানা কোনও স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরী, যার ভেতর দিয়ে আসল মিনতি মিত্তিরকে অস্পষ্ট দেখা যায়।"[৪৩]

এই বর্ণনা যেন রূপদক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া প্রতিমা দর্শন। যেন গদ্যে লেখা কবিতা ---চোখের দেখায় না উপলব্ধির ভাষায় এ ছবি রূপময়। এখানে গদ্যভাষায় কবির কলমের আঁচ মেলে। ব্যারিস্টারের ছেলে কাজল গুপ্ত। সেও মিনতির প্রেমের ছলনায় মৃত্যু-ফাঁদে আবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে শিল্পী কাজলের মুগ্ধতার কথা লেখক যেভাবে বলেছেন তা আমরা স্মরণ করতে পারি:

> "কাজল গুপ্ত দেখতে লাগল একটি সাকার ছন্দ,ছন্দে ছন্দে আন্দোলিত হোয়ে চরণ দুখানি এক সিঁড়ি থেকে আর এক সিঁড়িতে আবির্ভূত হচ্ছে। সঠিক কথাটা হোল, কাজল গুপ্ত সঠিক কথাটা হঠাৎ খুঁজে পেল, ফুটে ফুটে উঠছে। হ্যাঁ, অদ্ভুত জাতের স্বপ্ন যেন, স্বপ্নের ফুল ফুটে উঠছে সিঁড়ির ওপর। সেই চরণের ওপর থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত নজর পৌঁছল কাজল গুপ্তের, এমন কাপড় পরে আছেন শ্রীমতী মিত্তির যে তাঁর হাঁটুর নিচে পর্যন্ত খুবই ভালো করে দেখা যাচ্ছে। স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে গড়া দুটি পা, সাংকেতিক ভাষায় সাংঘাতিক রকম মুখর তারপর খানিকটা অংশ ঢাকা রয়েছে বেগুনী রঙের একটা ঘাগরা জাতীয় বস্তু দ্বারা। এরপর থেকে শুধু রেখা রেখা আর রেখা, আলো-আঁধারির খেলা। গ্রীবা পর্যন্ত নজর পৌঁছল যখন কাজল গুপ্তের তখন সে দুচোখ বুজে গুনগুন করতে শুরু করেছে।"[৪৪]

এই কাজল গুপ্ত মিনতির মোহে গিয়ে উঠল ডায়মণ্ড হারবারে এদিকে তার স্বামী পরশুরাম ক্যাঙারুর সাহায্যে সেখানে মস্তান লাগিয়ে বেদম মার খাওয়ালো কাজল গুপ্তকে। তার মাশুল গুনতে হোল মিনতিকে কাজলের হাতে গুলি খেয়ে।

চার . অসামাজিক বিষয়ের অশ্লীলতা-মুক্ত বর্ণনা

পরশুরাম মিত্তির তার ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটাতে স্ত্রী মিনতির দেহ- সৌন্দর্যকে কাজে লাগান। মিনতি তার স্বামীর ইচ্ছাকে কাজে লাগায় কিন্তু নিজে কোনো স্বাধীনতা ভোগ করে না। মিনতির উপর পাহারা বসানো আছে। এমন একটি নারীর বর্ণনার ক্ষেত্রেও অবধূত শিল্পীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেননি। মিনতি তার অর্থ পিশাচ স্বামী পরশুরামকে বলেছে :

> "মাথা খারাপ হোয়েছে বলে তুমি আমায় পাগলা গারদেও পাঠাতে পারো, তোমায় বিশ্বাস নেই। সতর বছর ধরে তুমি আমাকে ভাড়া খাটাচ্ছ, বহু বড় লোকের ছেলের মাথা চিবিয়েছ তুমি আমাকে ভাড়া খাটিয়ে। তোমার খিদে কিছুতেই মিটল না। টাকা টাকা আর টাকা, তোমার ঐ রাক্ষুসে খিদের জন্যে দুনিয়ার সব জাতের সব রকমের পুরুষকে আমি ঐ দেহ দিয়েছি। আর নয়, আমার প্রাপ্য আমাকে মিটিয়ে দাও, এবার আমি ছুটি চাই।"[৪৫]

এই বিরক্তির সরাসরি যে কারণ ঘটেছিল তা জানা যায় ওস্তাদের কাছে :

> "দ্যাট গার্ল মিনটি মিটার একবার আমায় বলেছিল ওকে খতম করে দিতে । তার হাজব্যাণ্ড ওকে লাগিয়েছিল ওয়াইফের ওপর নজর রাখবার জন্যে। ওয়াইফ কোথায় যায়, কার সঙ্গে মিট্ করে সব এ গিয়ে রিপোর্ট করত। টোটালি মিজার্য্যাবল্ করে তুলেছিল এ মিনটি মিটারের লাইফটা।"[৪৬]

ওস্তাদ পরশুরামের ভাড়া করা গুণ্ডা অচেতন ক্যাঙারুর সম্বন্ধে একথা গুলি বলেছে পিনাকীকে। ক্যাঙারুকে ব্যবহার করেছে পরশুরাম মিত্তির তাই ক্যাঙারুকে মারতে চেয়েছিল মিনতি মিত্র। ব্যারিস্টার বাদল গুপ্তের ছেলে কাজল গুপ্ত মিনতি মিত্রের ফাঁদে ধরা পড়েছিল। সে মিনতিকে সত্যিই ভালোবেসেছিল। তাকে নিয়ে ডায়মণ্ড হারবারে বেড়াতে গিয়ে ক্যাঙারুর হাতে যখন মার খেলো তখন তার ধারণা হয়েছিল মিনতি মিত্রই এই ষড়যন্ত্রের মূলে। তাই তাকে সুবিধামত গুলি মারতেও পিছপা হয়নি। পরে নিজের ভুল বুঝতে পারে । পরশুরামই টাকার লালসায় নিজের বৌকে এ কাজে লাগিয়েছে অথচ শাস্তি পেলো মিনতি মিত্র। মিনতি এই কদর্য জীবন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আগেই বিষ খেয়ে নিয়েছিল। সব জানার পরে অনুশোচনাবিদ্ধ কাজল গুপ্ত আত্মগ্লানিতে ভুগেছে অনুশোচনায় পাগল হয়ে গেছে। শিল্পী কাজল গুপ্তের মধ্যে মিনতির প্রতি সত্যকার প্রেম জেগেছিল। সে একজন শিল্পী অথচ সে হয়ে উঠলো ঘাতক---প্রিয় জনকে সে হত্যা করেছে। কাজল তাই নিজেকেও শেষ করে দিয়েছে। এখানে প্রেমের বিচিত্র গতি যেমন উপলব্ধ হয়েছে তেমনি অবধূতের প্রবণতা যে বীভৎস রসের দিকেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

শিল্পী কাজল গুপ্তের বাবা বাদল গুপ্ত ব্যারিস্টার । ছেলের কলঙ্কজনক আত্মহত্যার গ্লানিতে মাথা নুইয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কোর্টের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন। মানুষভেদে মূল্যবোধ আলাদা হয় কিনা সেকথা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের বিবেকের

কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েই তবে অকর্ম-কুকর্ম-যাই করুক না কেন করে। অপরাধ-দুনিয়ায়ও মানুষের নিজের কাছে এমনি বোঝাপড়া থাকে জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় । ওস্তাদ-সাহেব, হিরু ড্রাইভার ওরফে শোভান, ক্যাঙারু, কাইজার প্রত্যেকের আছে সেই ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায়ের সংবিধান। তার ধারা মিলিয়ে ঘটে শত্রু নির্বাচন ও শাস্তি প্রদান।

মিনতি মিত্র অর্থবান ঘরের কচি-কাঁচাদের প্রেমের ফাঁসে জড়িয়ে বর্তমানে অপরাধবোধে নিমজ্জিত। তাই বিষ খেয়ে আত্মহননের রাস্তা বেছে নেন। আয়নার ড্রয়ার খুলে কলম কাগজ বার করে আনলেন। বিছানার ওপর বসে কোলের ওপর সেই কাগজ রেখে লিখলেন সামান্য দু-চারটি কথা। লিখে কাগজখানি ভাঁজ করে মাথার বালিশের তলায় রেখে দিলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে টুলের ওপর থেকে গেলাসটি তুলে নিলেন, একটি ছোট্ট শিশিও তুলে নিলেন। শিশিটির মুখ খুলে উপুড় করে ধরলেন সেই গেলাসের উপর। অনেকগুলো ছোট ছোট কালচে রঙের বড়ি পড়ল গেলাসে। আবার আয়নার সামনে। আয়নার শ্রীমতীর পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাসলেন। হাসলেন মিনতি মিত্তিরের হাসি। হাসি ঝরে পড়তে লাগল মেঝেয়। সেই অদ্ভুত হাসির মাঝখানেই গেলাসটা মুখে তুলে ঢক ঢক করে সমস্ত পদার্থটা গিলে ফেললেন। অর্ধচেতন প্রায় অসাড় হাত থেকে খালি গেলাসটা হাত থেকে খসে পড়ল।

> "...তারপর শুরু হোল আবার হাসি, শ্রীমতী মিনতি মিত্তির দুহাতে নিজের বুক চেপে ধরে আয়নার মিনতি মিত্তিরের পানে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন, আসল মিনতি মিত্তিরের হাসি। সেই হাসির মাঝখানেই আস্তে আস্তে দরজাটা ফাঁক হোতে লাগল। একটা মানুষ গলতে পারে এই টুকু ফাঁক হোল মাত্র। সেই ফাঁক দিয়ে গলে একজন ঘরে ঢুকে দরজায় পিঠ দিয়ে চেপে দাঁড়ালো।"[৪৭]

আয়নায় তার ছায়া দেখতে পেলেন শ্রীমতী মিত্তির। ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন---

> "এলে কাজল ? কাজল, দুষ্টু ছেলে, ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। আর একটু দেরি হোলে -' শ্রীমতীর হিক্কা শুরু হোল। এর উপর কাজল গুপ্তের পিস্তল থেকে এলো দুটি গুলি। ' পিট পিট করে সামান্য দুবার আওয়াজ হোল। সামান্য একটু আর্তনাদ করে শ্রীমতী মিত্তির মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লেন।"[৪৮]

---আত্মহত্যা করতেই যাচ্ছিলেন বিষ-বড়ি খেয়ে। হিক্কা উঠতে শুরু করেছিল তার অনিবার্য ফল হিসেবে। তার স্বামীর অন্যায় খেলায় যখন রহস্য কমে এসেছে তখন জমেছে আত্মগ্লানি। কাজলকে ওরকম মারধোর করার জন্যই কি মিনতির আত্মহত্যার চেষ্টা? হতেও পারে। কিন্তু বিধিলিপি এমনই সেই কাজলই তাকে হত্যা করল ! বিবেকাহত হয়ে নিজেও ঝাঁপ দিল উঁচু বিল্ডিং থেকে। মারা গেল। বড়ো গল্প এই কারণে এক বলব যে উপন্যাসের মত অনেক চরিত্র অনেক ঘটনা থাকলেও চরিত্র ও ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো চেষ্টা এখানে নেই। 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' তাই বড়ো গল্প বা উপন্যাস-কল্প রচনা কিন্তু একে উপন্যাস বলে দাবি করা চলে না।

পিনাকী সাহসী, স্বাবলম্বী এবং রসিক মানুষ। পথভ্রষ্ট হলেও নারী-সম্পর্ক সম্বন্ধে সে নষ্ট চরিত্রের মানুষ নয়। মিনতির স্বামী পরশুরাম এবং লোকনাথ মিলে যখন চণ্ডীর নিরপরাধ জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছিল। তখন নিয়তির সমাধানের মত অকাল মৃত্যু হলো মিনতির। অবসাদ আর আক্রোশ দুই-ই আছে এ মৃত্যুর পেছনে। অবসাদে মিনতি মিত্র খেয়েছিল ঘুমের বড়ি আর কাজল গুপ্ত। ভুল বুঝে করেছিল গুলি। মিনতির মৃত্যু প্রসঙ্গে চণ্ডী যখন দুঃখ প্রকাশ করছিল তখন সেই আপাত-অসঙ্গত বেদনায় পিনাকীর প্রকাশভঙ্গি জীবন-জাত অভিজ্ঞতায় ভারি সুন্দর :

> "মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে শান্ত করলে বকে, ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি বহে সাপের চোখে।"[৪৯]

---পিনাকীকে দেখেই ভালো লেগেছিল চণ্ডীর। কেবল নার্সের সেবা নয় প্রিয়জনের শুশ্রুষায় সেরে উঠেছিল পিনাকী। পিনাকী চণ্ডীর দাদু সদাশিবের কাছে এবং প্রিন্সিপ্যালের কাছে প্রথম দর্শনেই নিজের লোক হয়ে উঠেছিল। তার আত্মসম্মানবোধ,স্বাবলম্বিতা, সাহস উপস্থিত বুদ্ধি -সবমিলিয়ে এ গল্পের নায়ক। ভাগ্য-প্রতিকূলতায় সে রাস্তার জীবনে এসে দাঁড়ায় কিন্তু সেখানেও সে প্রিয় মানুষ। জেল থেকে ফিরে যার সাথে দেখা হয়েছে সেই-ই তাকে কাছে টেনে নিয়েছে। প্রিয়জনের মত দাদার মত, গুরুর মত সে যথাযোগ্য সম্মান পেয়েছে। তার হৃদয়ের উচ্চতায় আলো ব্যানার্জি তাকে তার জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে। তাই আকস্মিক আঘাতে একটি পা হারিয়ে সে তিনটি পায়ের মালিক হয়ে আছে। আলো ওরফে চণ্ডী তার জীবনের সাথে যুক্ত হয়েছে অভিন্ন হৃদয়বত্তায়। স্বামীর সেবা করেই এই চামুণ্ডা সদৃশ দেবী-মানবী নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে এমন আভাস এ গল্পে রেখে এ কাহিনির সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন লেখক। তাদের মধ্যের মধুর রসিকতার সংলাপ গুলি এ কাহিনির সম্পদ। এ গল্পে মানব জীবনের দুই ধারা প্রবাহিত। একটি উচ্চ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের জীবনের ধারা অন্যটি সমাজের নীচু শ্রেণির মানুষের কথা যারা রাতের শহরের বাসিন্দা। অন্ধকারের জীব। কিন্তু তাদের শ্রেণি-চরিত্রের আচরণগত বিপ্রতীপতা লক্ষ করা গেছে। মিত্তির পরিবার কিম্বা বিচারকের পরিবার অন্ধ কামনার আগুনে পথভ্রষ্ট। নামকরা বিচারকের ছেলে কাজল গুপ্ত পরস্ত্রীর প্রেমে প্রহৃত হয়ে লজ্জায়-ঘৃণায় আত্মহত্যা করেছে। লোকনাথ সম্মানীয় ব্যক্তি হয়ে পরস্ত্রী লোলুপ। নিজের স্ত্রীকে ব্যবসার স্বার্থে পরপুরুষের হাতে তুলে দিয়েছে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পরশুরাম মিত্তির। সে মস্তবড় এঞ্জিনওয়ালা বলে সারা দেশে পরিচিত। অথচ শৈশবস্মৃতি হীন বালক রাস্তায় পরিত্যক্ত পিনাকী নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। নিষ্কলঙ্ক শোভান, কাইজারও। এই কাইজার আসলে বিন্দুবাসিনী দেবী ওরফে প্রিন্সিপ্যালের ছেলে নিখিলেশ---নিখিল। অবধূত এই উপন্যাস-কল্প রচনায় দেখিয়েছেন তথাকথিত 'ভদ্রসমাজ' কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত। অথচ অনেক তথাকথিত সমাজ বিরোধী হয়েও হতে পারে পবিত্র জীবনের অধিকারী।

কাজল গুপ্ত আত্মহত্যা করলে পুলিশের প্রসঙ্গ উঠে আসে। লেখক এখানে অনবদ্য রূপে তাদের চরিত্রধর্ম তুলে ধরেছেন। চাঁদ ডুবল, সূর্য উদয় হোলেন। স্পোর্টস-কারটার চারিদিকে

ভিড় জমতে লাগল। তারপর সমুপস্থিত হোলেন সরকারী উর্দিপরা আইন রক্ষকরা। গাড়ি দেখে এবং গাড়ির মালিককে দেখে তাঁরা সর্বপ্রথম আবরু বাঁচাবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বড় ঘরের ছেলে, দস্তুর মত বড় ব্যাপার। কিন্তু সর্বাগ্রে আবরু বাঁচানো চাই। অতি সংক্ষেপে এবং আভিজাত্য টা ষোলো আনা বজায় রেখে একখানি অ্যাম্বিউল্যান্স আর একখানি পুলিসের গাড়ি গেটের মধ্যে ঢুকে বাদল গুপ্তের ছেলে কাজল গুপ্তের দেহটা তুলে নিয়ে চলে গেল। তদন্ত, সে পরে হবে। কেননা,বাদল গুপ্ত মানুষটি বস্তিতে বাস করেন না এবং সরকারকে বছরে যা ইন্‌কাম ট্যাক্স দেন তাতে সরকার আড়াইটে মন্ত্রী পুষতে পারেন। সুতরাং তদন্ত ক্যান ওয়েট্ বাট্ ব্যারিস্টার বি. গুপ্ত ক্যান্ নট । কারণ তাঁর সময়ের দাম আছে। সরকারের তরফে যখন তিনি খাড়া হন হাইকোর্টে তখন সরকারকে কত ফি দিতে হয় জান! মিনিটে বিশ এবং ঘন্টায় বারোশো। সরকারের পুলিস তদন্ত করতে গিয়ে যদি বাদল গুপ্তের অতি মূল্যবান সময় খানিকটা খরচা করে তা-হলে ফি-টা কে গুনবে? অবধূত অত্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যে বড়লোকের নিয়ম আলাদা। আড়াইশ টাকা মাইনের ছোট দারোগা দিতে পারবে মিস্টার গুপ্তের সময়ের মূল্য ! অতএব সবাই মনে মনে স্থির করলেন :

> ‘‘আইন উচ্ছন্নে যাক। বড় ঘরের ব্যাপারে বিনা হুকুমে নাক গলাতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়বে কে! গাড়ি এবং গাড়ির বেহুঁশ মালিকটিকে চটপট সরিয়ে ফেললেন তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে। খবরের কাগজের শকুনরা সদাজাগ্রত, তাদের দৃষ্টি শুধু ভাগাড়ের ওপর। তাই আগে ভাগাড় সাফ হোয়ে গেল।’’[৫০]

চণ্ডীর মুখে শোনা যাক সরকারি হাসপাতালের খবর। একটা পান মুখে দিয়ে সে শুরু করল সরকারি হাসপাতালে মাইনে নিচ্ছে গুনে গুনে অথচ কাজ করবে না, ফাঁকি দেবে। সেটা যদিবা সহ্য করা যায় কিন্তু ঐ চুরি করা আর ছ্যাঁচড়ামো করাটা বরদাস্ত করা যায় না। হাসপাতাল গুলো সব চোরের আড্ডা- যে যা পারে সরায়---অভ্যাসে করে কাজে লাগুক চাই না লাগুক।

ইনি একজন মহিলা। জীবনে নিজের প্রিন্সিপ্‌ল মেনে চলেন বলে তাঁর ভক্তরা নাম দিয়েছে প্রিন্সিপ্যাল। ইনিও অত্যাচারের স্বীকার। তাঁর স্বামী-পুত্র নিয়ে শ্বশুরের ভিটায় তিনি বাস করতেন। এক জেলা শহরে। স্বামী স্কুল-শিক্ষক। আয় অল্প তাই ছেলেটিকে মাধ্যমিক পাশ করিয়ে কাজে লাগিয়ে দিলেন। সংসারের হাল ভেবে এমন সিদ্ধান্ত খুবই সাধারণ। নাম করা এক মিলে অ্যাপ্রেন্টিস হোয়ে ঢুকল। ছেলের বাবা বললেন কী হবে এম. এ. বি-এ পাশ করে, হয় স্কুলমাস্টার নয় কেরানী। তার চেয়ে হাতের কাজ শিখুক। এ-তো সমাজের বাস্তব চিত্র। বাবা সান্ত্বনা পেলেন এই ভেবে যে যতদিনে বি-এ এম-এ পাশ করে চাকরির উমেদারি শুরু করবে ততদিনে মিলের ফোরম্যান হোয়ে যাবে, যদি মন দিয়ে কাজ করে। তাই হোল ছেলে কাজে লেগে গেল দেখতে দেখতে তার চেহারা ফিরে গেল। বুকের ছাতি হাতের কব্জি মুখের রঙ সবই পালটে গেল। তাকে দেখে কে তখন বলবে যে সে একটা গোবেচারা স্কুলমাস্টারের সন্তান। ছেলে দানবের মত খাটে মিলে ওর খাটবার শক্তি দেখে বিদেশী সাহেবরাও স্তম্ভিত হোয়ে যান। সে যাই হোক ঔপন্যাসিক তার ‘দানবের’ মত সামর্থ্যের খবরটা সন্তর্পণে দিয়ে

দিলেন যাতে নিখিলেশ থেকে কাইজার হওয়াটা বেমানান না হয়। এবার জানা গেলো সেই খাটুনির পর বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। কারও সঙ্গে মেশে না, আড্ডা দেয় না, দল পাকায় না। কারণ শক্তিতে কুলায় না। ফল হোল বিপরীত, পাড়ার লোকে বুঝল ডাঁট হোয়েছে। অতএব ডাঁট ভাঙতে হবে। এখানে অবধূত সাধারণ মানুষের ঈর্ষাকাতরতার নির্ভেজাল চিত্র আঁকলেন। নিজের কাজে তৎপরতা থাকলেই হলো না। মানুষকে অন্যের সাথে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। নইলে সাংঘাতিক হিংসার কারণ হয়ে যেতে হয় লেখক তা দেখালেন।

ডাঁট ভাঙার সুযোগ যেন মুখিয়ে ছিল। সে সময় পাড়ায় এক হুজুর এসে বাস করতে লাগলেন। জেলা শহর। আদালত আছে, পঞ্চাশটা সরকারী অফিস আছে, হরদম পুরনো হুজুর বদলী হচ্ছেন, নতুন হুজুর আসছেন। কে যে কখন আসছেন, কে যে কোথায় যাচ্ছেন, তা সাধারণ মানুষ জানবে কেমন করে। তা সেই হুজুর এসে পাড়াসুদ্ধ লোককে বশ করে ফেললেন। দিবা রাত্র তাঁর বৈঠকখানা খোলা রইল। চা-বিস্কুট পান-সিগারেট দাবা-পাশা-তাস কোনও কিছুরই অভাব নেই। বেকার ছেলেরা না চাইতে স্বর্গ হাতে পেল। প্রায় প্রত্যেককেই তিনি কথা দিলেন যে চাকরি করে দেবেন। কারণ অমুক মন্ত্রী তাঁর দাদা আর অমুক উপমন্ত্রী তাঁর শালা। দু-একটা নিতান্ত বেয়াড়া ছেলেকে করেও দিলেন চাকরি। সে চাকরি করে দেবার জন্যে অবশ্য মন্ত্রী -উপমন্ত্রীর সাহায্য লাগে না। এমনিই হয়, বিশেষত জেলা আদালতের হোমরা চোমরা হুজুর যদি একটু অনুরোধ করেন তা হলে তো হবেই। জলে বাস করে কে আর কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে? আজ-কালকার দিনে মিল-ফ্যাক্টরি খুলে কারবার করতে হোলে যেখানে মিল চলছে সেখানকার সবকটি সরকারী হুজুরকে ঠাণ্ডা রাখতে হয়।

'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' উপন্যাসে প্রিন্সিপ্যালের ছেলের আগেই চাকরী হোয়ে গিয়েছিল। এমন চাকরী করত সে যে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে ঘুমানো ছাড়া অন্য কিছু করার সামর্থ্য থাকত না। এমন সময় পাড়ায় তৈরী হোল আর. জি . পার্টি। চোর ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল, পাড়ার ছেলেরা রাত্রে পাহারা দিতে শুরু করলে পালা করে। সবাইকে পালা করে পাহারা দিতে হবে, প্রিন্সিপ্যালের ছেলেও সবায়ের মধে পড়ে গেল। দু-চারটে পালা করলেও সে, তারপর আর পারলে না। আর-জি পার্টির মাথা হোলেন সেই হুজুর, ছেলের বাপ তাঁর কাছে গিয়ে ধরনা দিলেন। হুজুর বললেন, তা কি হয়, পাঁচজনের কাজ যে। অতঃপর ওরা একঘরে হোয়ে গেলেন।

> "কিছুদিন পরে পোপনে থানায় নানা অভিযোগ করে তাকে গ্রেপ্তার করালো। সে নাকি একজন পহেলা নম্বরের সমাজবিরোধী। ছেলের বাপ শয্যা নিলেন। উকিল মোক্তার লাগিয়ে ছেলের জামিন করালেন প্রিন্সিপ্যাল কিন্তু বিচার আর হয় না। বারবার টালাতে থাকে। এরপর কাটতে থাকে বছরের পর বছর। ছেলে একদিন মুরুব্বী মশায়ের বাড়ি যায়, জানতে চায় আর কতদিন তাকে ভুগতে হবে । 'চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিলেন তিনি, যতদিন না তেল মরবে।"[৫১]

---সেই তাঁর শেষকথা ধরা ধামে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলে তাঁর ওপর। উলটে পড়লেন তিনি

চেয়ার নিয়ে। মরবার আগে টুঁ শব্দ করতে পারলেন না। নিখিলেশ যখন এ কাজটি করেছিল সেসময় সেখানে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা কেউ ছিল না। সাঙ্গপাঙ্গরা একটু পরে চা-পান-সিগারেট খাবার জন্য জুটল। তারা দেখল তাদের মুরুব্বী পড়ে আছেন মেঝেয়, তাঁর গলা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, নাক নেই, চোখ নেই, এক কথায় মুখখানাকে আর চেনাই যাচ্ছে না। নিখিল বা কাইজার সেই হুজুরকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানে অবধূত নৃশংসভাবে 'হুজুর'কে তার বৈঠকখানায় হত্যা র কাহিনি জানিয়েছেন। অথচ পাঠক যেন নিখিলের হাতে তার মৃত্যু কে কাম্য বলেই মনে করেন। দেশের আইন নিশ্চয়ই একে সমর্থন করে না। এর নৃশংসতা এবং অশ্লীলতা অস্বীকার করা না গেলেও হুজুরের দুর্ব্যবহারের শাস্তি হিসেবে তা প্রাপ্য বলেই মেনে নিতে হয়। আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে বীভৎস রসের ব্যবহার এখানে সার্থকভাবে ঘটেছে।

এই ছেলেই এখন কাইজার। বিন্দুবাসিনী দেবীর ছেলে নিখিলেশ[৫২] এখন বড় মস্তান – যার ডেরায় কেউ এগোতে ভয় পায়। বিন্দুবাসিনী দেবী এখন প্রিন্সিপ্যাল পিনাকী তার সম্পর্কে ভেবেছে :

> "কিন্তু মহিলা আর মেয়েমানুষ বাদে আর এক জাতের নারী আছেন, যাঁর বা যাঁদের পানে তাকালে নিজে থেকে মন বুদ্ধি জুড়িয়ে শীতল হয়। মনে হয়, ইনি পরম আপনজন, এঁর সঙ্গে সমীহ করে কথা বলতে হবে না, হিংস্র দুনিয়ায় খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য জাতেরও সম্বন্ধ আছে। সেটা কি সম্বন্ধ? পিনাকী মাথা হেঁট করে বসে ভাবতে লাগল, ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে যাবার মত অবস্থা হোল তার।"[৫৩]

---এ প্রসঙ্গে অবধূত কোনো ব্যাখ্যামূলক কথার আশ্রয় নিলেন না। কেবল বাইরের মানুষের প্রতিক্রিয়াকে তুলে ধরে বিচারের ভার পাঠকের ওপর ছেড়ে দিলেন। পাঠক প্রিন্সিপ্যালের শ্রেণি নির্ণয় করুন তাঁদের বিচার আর অনুভূতি কাজে লাগান। পাঠকের সিদ্ধান্ত যে লেখকের ভাবনার অনুকূলে যাবে সে পথ তিনি প্রস্তুত করেছেন অবলীলায়।

পাঁচ. স্রষ্টার নয় বিষয়-নির্দিষ্ট ভাষা: অবলম্বন উপন্যাস-কল্প রচনা

বড়গল্পের মেজাজ 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী'-তে যেভাবে ফুটে উঠেছে তা একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়। এ গল্পটিতে প্রধানত দুটি স্রোত। একটি চণ্ডীকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত আর একটি তথাকথিত সাধারণ মানুষের অন্ধকার জগতে নেমে যাওয়ার ইতিবৃত্ত। প্রথম ধারায় একটি পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা এক দুরন্ত স্বভাবের নারী যার অন্তর কোমল কিন্তু বাইরেটা শক্ত। এই বিষয়টিতে লেখক যে গতি ও ভাষার ব্যবহার করেছেন অন্য অংশে তেমনটি সঙ্গত কারণেই হয়নি। প্রথমাংশে আছে দাদু- দিদার আশ্রয়ে এক রমনীয় বাল্য ও শৈশবের স্মৃতি। তার ভাষা ও ভাব শান্ত। এই অপরাধ জগতের পাশাপাশি অভিজাত সমাজের আপাত পরিশীলিত রূপ ফুটে উঠেছে পরশুরামের কথা-বার্তায়। সর্বত্রই লেখকের ভাষার শক্তি কিন্তু গ্রানাইটের উজ্জ্বলতায় ঝিকমিক করছে। কোনো বাহুল্য নেই।

> "আর একখানা বেশ শক্ত-সমর্থ গাড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে এসে স্পোর্টস-কারটার পাশে দাঁড়ালো। গাড়িখানা এল চোখ বুজে, মানে, তার অঙ্গে এতটুকু আলো নেই। থামবার সঙ্গে সঙ্গে চারমূর্তি নামল সেই গাড়ি থেকে। চাঁদের আলোয় তাদের মুখ দেখা গেল না। লম্বা প্যান্ট পরে আছে তারা, কোমরে ঝুলছে রিভলবারের খাপ, মাথায় টুপি আছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে নিঃশব্দে উপস্থিত হোল তারা সেই ঝোলার পাশে। একজন হাত তুলে কি যেন ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন গিয়ে দাঁড়াল ঝোলাটার এ মাথায় ও মাথায়। তারপর তারা ঝোলার দড়িতে কি যেন ঘষতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পরেই পড়ল ঝোলাটা আছড়ে। কিম্ভূত কিমাকার আওয়াজ করে লাফিয়ে উঠল একজন ঝোলার ভেতর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটি কথা উচ্চারিত হোল-'চুপ'। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল আর এক মূর্তি। এবং তৎক্ষণাৎ ঠাস্ করে চড় পড়ল তার গালে। তারপর আর সেখানে বিশেষ কিছুই ঘটল না। স্পোর্ট্স-কারখানা সেখানেই পড়ে রইল, যার গাড়ি সে পড়ে রইল গাড়ির মধ্যে। শুধু আণ্ডারওয়্যারটি ছাড়া অঙ্গে তার কিছুই রইল না। আর রইল না হুঁশ, একটি-দুটি তিনটি পর পর তিনটি-চড়েই বেচারা হুঁশ হারিয়ে ফেলল।"[৫৪]

এ ভাষার যেন কেবল চোখে দেখাবার দায়িত্ব । বিশেষ কোনো ব্যক্তি পরিচয় নয় সাধারণ পরিচয় দিলেই যেখানে কাজ মিটে যায় সেখানে সবিশেষ পরিচয় তো বাহুল্য -কাহিনিতে গতি আনার জন্য লেখক তাই নির্বিশেষ ভাষা ব্যবহার করেছেন। বাহুল্যবর্জন এমন বাহুল্য বর্জিত ভাষা তীব্র গতিশীল কাহিনি বয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেষ পরিণতি জানার জন্য পাঠকের মন ছুটছে ভাষা সেখানে নির্মেদ ও ইঙ্গিতময় হবে---এটাই স্বাভাবিক।

'কাইজার,[৫৫] তাড়াতাড়ি তুলে আনো ওকে যে অবস্থায় পাও, পুলিস আসবার আগেই আমাদের ভাগতে হবে।'[৫৬] গতি পেল 'ভাগতে' এই শব্দটি ব্যবহার করার জন্য। -অকুস্থলে কাহিনি ছুটে চলেছে। তাই সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রয়োগ।

'ক্রাচে ঝুলন্ত দেহটা দুলতে দুলতে দালান থেকে অন্তর্ধান করলে।'[৫৭]এই বর্ণনায় চলচ্চিত্রের আবেদন কী অস্বীকার করা যায়? মনে হচ্ছে নাকি যে বিপদের আঁচ পেয়ে একটি মানুষ ক্রাচ নিয়ে সচল হয়ে উঠল! আমরা তাকে যেন নিজের নিজের চোখেই পালাতে দেখলাম।

ব্যঞ্জিত ভাষা

Samuel Johnson বলেছিলেন, `Language is the dress of thought.' অবধূতের সাহিত্য প্রসঙ্গে বিষয় বারবার মনে আসে। অশ্লীল বলতে যদি অসামাজিক প্রবৃত্তির রূপচিত্রণ বুঝি তবে অবধূতকে বলা যায় অশ্লীলতার দ্রষ্টা। যা দেখেছেন তাই রূপ দিয়েছেন। অতএব রূপকার কিন্তু তার ভাষা সর্বপ্রকাশক হয়েও সংযমী। এখানে প্রকৃত শিল্পীর পরিচয়। তিনি নিজে সেসব ঘটনায় নিরাসক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিকের দৃষ্টিতে সেটা তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের গৌরব

বটে, তবে সাহিত্যিক গৌরবের ক্ষেত্র আলাদা। ভাষা যত ইঙ্গিতধর্মী হয় তত কৌলিন্য যায় বেড়ে। ব্যাখ্যা না করে ভাবের পূর্ণতম সঞ্চারণেই ভাষার শক্তি প্রকাশ পায়। অবধূত তাই প্রশংসার যোগ্য ভাষাশিল্পী। এভাষা সৃষ্টিশীল কেননা এর অনুসরণ আজকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আদর্শ। একটি সমাজ-নিন্দিত-প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে নির্বাচন করা যায় যেখানে শিল্পীর ওপর সামাজিকের নিষেধ দুর্বল হয় প্রকাশের পিছনে শিল্পীর নিয়ন্ত্রণ থাকার জন্য। স্রষ্টা অবধূতের শিল্প নির্মাণে কোনো অশ্লীলতা নেই। উল্টে কোথাও একটা অবহেলিত জীবন-সত্যকে সাহিত্যে তুলে আনতে পেরেছেন বলে অবধূতের সঙ্গে সহৃদয়-সামাজিকের হৃদয়ভারও হাল্কা হয়। যেমন:

১. ''কিন্তু মহিলা আর মেয়েমানুষ বাদে আর এক জাতের নারী আছেন, যাঁর বা যাঁদের পানে তাকালে নিজে থেকে মন বুদ্ধি জুড়িয়ে শীতল হয়। মনে হয়, ইনি পরম আপনজন, এঁর সঙ্গে সমীহ করে কথা বলতে হবে না, হিংস্র দুনিয়ায় খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য জাতেরও সম্বন্ধ আছে। সেটা কি সম্বন্ধ ? পিনাকী মাথা হেঁট করে বসে ভাবতে লাগল, ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে যাবার মত অবস্থা হোল তার।''[৫৮]

---অত্যাচারিতা এক গৃহবধূ যাঁর ছেলে নির্দোষ হ'য়েও জেল খাটছে এবং ছেলের দুঃসংবাদে স্কুল শিক্ষক স্বামী অকালে হার্ট ফেল করে মারা গেছে তাঁর প্রতি সমাজ কোনো সুবিচার দেয়নি। অবধূত তাঁর জীবনের লড়াইকে সাফল্য দিয়েছেন তাঁকে সম্মান দিয়েছেন। এরফলে পাঠক যেন বুক ভ'রে প্রশ্বাস নিতে পেরেছেন।

২. ''যাঁরা মনে করেন একটা বিশেষ বয়েস পার হোলে যৌবন-নাটকের যবনিকা পতন হয়, তাঁরা জিভ কাটতে বাধ্য হবেন শ্রীমতী মিত্তিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হোলে। শ্রীমতী যেন সর্বশরীর দিয়ে কথা বলেন। ওঁর চলা দাঁড়ানো ওঠা বসা হাত নাড়া পা দোলানো দেহের প্রত্যেকটি আলোড়ন মুখর। মুখর অর্থে সাংঘাতিক রকম সাংকেতিক। মিনতি মিত্তিরের মুখের পানে বড় একটা কেউ তাকায় না। তাকাবার দরকার করে না। অনেকে হয়ত বলতেই পারবে না ওঁর চক্ষু দুটি কেমন, ওঁর কপাল নাক চিবুক গাল কি রঙে রঙানো থাকে, অনেকেই তা জানে না। লোকের দৃষ্টি পড়ে ওঁর চরণ থেকে গ্রীবা পর্যন্ত জায়গাটুকুতে তার ওপর আর কারও দৃষ্টি পৌঁছয় না। বরং আশ্চর্য হোয়ে সবাই ভাবে যে মিনতি মিত্তিরের গ্রীবা থেকে চরণ অংশটুকু নাম-না জানা কোনও স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরী, যার ভেতর দিয়ে আসল মিনতি মিত্তিরকে অস্পষ্ট দেখা যায়।''[৫৯]

-এই বর্ণনায় মিনতি মিত্তিরের শরীরী আবেদনকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ব্যাখ্যা করেননি যে মিনতি মিত্র ভাগ্যদোষে পরশুরাম মিত্তিরের স্ত্রী তার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে সে বহু পরিবারের ধ্বংসের কারণ হ'য়ে উঠেছে। এখন সে আত্মগ্লানিতে ভুগছে। সে অবসাদগ্রস্ত – লেখকের এই শব্দ-সচেতনাকে নিম্নোক্ত রূপে আলোচনা করা যায় :

১. চোখ মনের আয়না : মুখ গোত্র-নির্দেশক

মানুষের ভালোবাসার দৃষ্টি তার চোখ দিয়ে শুরু হয় চোখের মধ্যে দিয়ে মনে প্রবেশ করে। মন উদ্বুদ্ধ হয়। এখানে দেহের ফাঁদে ফেলে তার ধনসম্পত্তির নির্যাসটুকু নিঙড়ে নেওয়ার চেষ্টা। তাই মিনতি দেহের ফাঁদে মায়ার সঞ্চার করেছেন। তার চোখের দিকে কেউ তাকায় না। লেখকের ভাষা তাই গুঢ়ার্থবহ । মুখে বলার দরকার হয়না---শ্রীমতী যেন সর্বশরীর দিয়ে কথা বলেন। 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' তে অবধূত মিনতি মিত্র সম্পর্কে বলেন 'ওঁর চলা দাঁড়ানো ওঠা বসা হাত নাড়া পা দোলানো দেহের প্রত্যেকটি আলোড়ন মুখর। মুখর অর্থে সাংঘাতিক রকম সাংকেতিক।' -এ বাক্যটি লক্ষ করার মত। প্রেম নয় প্রতারণার জন্য মিনতি নিজেকে ব্যবহার করছেন, তাই চোখ তথা মনের দরজা -জানালা যেন বন্ধ সেগুলি যেন ছুটি নিয়ে বসে আছে- ঝাঁপ বন্ধ করে।

২. আগুনে পতঙ্গ : কামান্ধ শিকার

যারা আসে তারা তাই 'মিনতি মিত্তিরের মুখের পানে বড় একটা কেউ তাকায় না। তাকাবার দরকার করে না। অনেকে হয়ত বলতেই পারবে না ওঁর চক্ষু দুটি কেমন, ওঁর কপাল নাক চিবুক গাল কি রঙে রঙানো থাকে, ...।' এখানে ঘটনা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, তাই বক্তব্য অকাট্য ও সুস্পষ্ট। ভুক্তভোগীরা জানেন, তাই এর ভাব ও ভাষা জীবনের; অভিধান-খোঁজা নয়।

৩. পেটুকতার ভোজে : বেরসিক সমাজ

যারা আসে তারা মিনতি মিত্রকে চেনে তার দেহের মধ্যে দিয়েই, তাই লোকের দৃষ্টি পড়ে ওঁর চরণ থেকে গ্রীবা পর্যন্ত জায়গাটুকুতে । দেহসম্ভোগকারীদের কারও দৃষ্টি আর তার ওপর পৌঁছয় না। বরং আশ্চর্য হোয়ে সবাই ভাবে যে মিনতি মিত্তিরের গ্রীবা থেকে চরণ অংশটুকু নাম-না জানা কোনও স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরী, যার ভেতর দিয়ে আসল মিনতি মিত্তিরকে অস্পষ্ট দেখা যায়।

অপরাধ জগতের ভাষা

ক. 'হ্যাঁ, আজ ক্যাঙারুর মাংস রোস্ট করে খাব আমি, অনেকদিনের শখটা মিটবে -' কাইজারের দাঁত কড়মড় করে উঠল।'[৬০]

খ. কাইজার বলল 'সাতটা বাজে প্রায়, এক ঘন্টা হোতে চলল, সারাদিন ভিটকিলিমি করে পড়ে থাকবে নাকি?'[৬১]

গ. 'কিন্তু দাসুদা, সবাই বলে যে এই হাতে তুমি বহু লোককে ওপারে পাঠিয়েছ।

তোমার নাম শুনলেই সবাই ভয়ে কাঁপে, তোমার ঐ ধানী লঙ্কার নিশানা নাকি অব্যর্থ। খ্যাঁদা সেখ বলে, একবার ছোরা ছুঁড়ে মেরে তুমি নাকি এক ঘুঘুকে।'[৬২]

ঘ. পিনাকী ইশারা করল কাইজারকে। কাইজার বর্তে গেল হাত লাগাবার হুকুম পেয়ে। মিত্তির সাহেবের কোমরের কাছে একটিবার কাইজারের ডান হাতখানি স্পর্শ করল :

''ঘোঁক্ একটা অদ্ভুত জাতের শব্দ করে উঠলেন মিত্তির মশাই, ওস্তাদকে ছেড়ে দিয়ে কোমর চেপে ধরে টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন।''[৬৩]

ঙ. আলো বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে চণ্ডী হাসপাতালের কথা জানিয়েছে যে কর্মচারীরা বেহুঁশ বেওয়ারিশ রুগী অ্যাম্বিউল্যান্সে তুলে দিলে অ্যাম্বিউল্যান্সেই সব হাতিয়ে নেয়। পিষে যাওয়া ঠ্যাংটার সঙ্গে যে পিনাকীর ঐ ব্যাগটা মিশে ছিল তা ওরা জানতে পারে নি, জানতে পারলে ওটাও যেত। ---মানুষের সেবকেরা মানুষের অসহায়তায় কী করে তা লেখক বলেছেন এই সূত্রে।

লেখক যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাতে হৃদয়হীনতার প্রকাশ ঘটেছে। 'পা' না বলে 'ঠ্যাং', 'নিয়ে নেওয়া'---না বলে 'হাতিয়ে' নেওয়া -ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার তাই তাৎপর্যপূর্ণ। ভুলে গেলে চলবে না হাসপাতালে চাকরী করলেও তারা অপরাধী-তাদের ভাষাকে আমরা চণ্ডীর মুখে তাদের মনের দোসর হিসেবেই শুনলাম। একে সচেতন ভাবে তাই অপরাধ জগতের ভাষা হিসেবেই ব্যবহার করা হোল।

ছয়. কৌশিকী কানাড়া : মহাকালের ডাক, নির্ভয় আত্মাহুতি

এ বইটিকে সপ্তস্বরা পিনাকিনীর পরের প্রস্তুতি বলে মনে হয়। অঙ্কুর হিসেবে সপ্তস্বরা পিনাকিনীতে প্রিন্সিপ্যাল, চণ্ডী, পিনাকীকে আমরা পেয়েছি ব্যক্তিগত সমস্যার ক্ষেত্রে, বাঁচার তাগিদে। সাহসিক পদক্ষেপ নিয়ে ব্যক্তি জীবনের পথে হেঁটে তাঁরা আমাদের মনে জায়গা পেয়েছেন। 'কৌশিকী কানাড়া'[৬৪] (মিত্র ও ঘোষ,কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০)-এ বইটিতে তাঁরাই যেন ভাবছেন সমাজগত কলুষ নিয়ে। বীজপত্র পেয়েছে পত্রপল্লবে শাখা-প্রশাখার বিস্তার। তার ছায়াতে কারো কারো জায়গাও হোতে পারে এমনি আশ্বাস সেখানে নিরুচ্চারে ঘোষিত হচ্ছে। এই আশ্রয়ের আর বাঁচার রসধারা ঐতিহাসিক অঙ্গনে উপ্ত হোতে পারত। হোলে অবধূত আরো বিশেষভাবে সার্থক হোতেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কৌশিকী কানাড়া' সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন :

'এ বইকে 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী'-র পরিপূরক গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।' প্রিন্সিপ্যাল গীতার ভাষ্য দিয়ে বলেছেন ঈশ্বরের নির্দেশ কেবল শিষ্টের পালন নয় দুষ্টের বিনাশ। দুষ্ট চরিত্রের মানুষ সংশোধিত হয় না। দুষ্টের শাস্তি বিধানের মত কাজ করতে হলে মৃত্যু ভয়কে

উপেক্ষা করতে হয়। পিনাকেশের মধ্যে সেই নির্লিপ্ততা উপলব্ধি করেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল ওরফে বিন্দুবাসিনী দেবী। কৌশিকী কানাড়াতে সে কথার বিস্তার আর সত্যকার রূপায়ণ। 'জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু পুনর্জন্ম মৃতস্য চ' ---এই উপলব্ধির প্রস্তুতি চলছিল সপ্তস্বরা পিনাকিনীতে আর কৌশিকী কানাড়ায় যশোদা যোগজীবনের মধ্যে তা রূপ পেল। দেশের বড় স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের বলিদান দিতে হয়েছে। 'কৌশিক কানাড়া'য় ইতিহাসের ঘূর্ণি দেখা দিয়েছে। ব্যক্তি জীবনের ছোট খাটো বিপন্নতা নয় তাই অনেকেই বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে। ঘরের সন্ধানে ফিরে শেষপর্যন্ত ক্লান্ত ও বিপথগামী হ'য়ে শোচনীয় ভাবে মরেছে যশোদার পিসি কৃষ্ণা। তাঁর শোচনীয় মৃত্যু হয়েছে ইতিহাসের অন্ধকার পৈশাচিক কানা গলিতে। এসব ইতিহাস নয় কিন্তু ইতিহাসের মশলা। মূল লক্ষ্যের সাফল্যের পিছনে এসব মশলার প্রয়োজন আছে বৈকি। কেননা ইতিহাসের সাথে এরা না মিশলে ইতিহাস রসটারই যে পাক হয় না।

ইতিহাস তথ্য সংগ্রহ করে। সমাজ-পরিবর্তনের মোটা ধারা উত্তরকালের মানুষের কাছে কালোত্তীর্ণ হয়ে সুদূর ভবিষ্যতেও টিঁকে থাকে। নথিবদ্ধ মূল ধারা যেসব চূর্ণ প্রবাহের শীর্ণ ধারায় পুষ্টি লাভ করে তারা অনেক সময় গল্পে-উপন্যাসে জায়গা পায়। হৃদয়ের উচ্চতায় তারা ইতিহাসের বৃহৎ চরিত্রকে টপকায় না উপেক্ষাও সহ্য করে কিন্তু অনেক সময় প্রীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ গল্পে আমরা সে পরিচয়ের একটা নমুনা পেয়ে যাই।

ইতিহাস যখন লেখা হয় তখন বিজিত আর বিজয়ী---দুই জাতির কথাই আসে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন দুই স্বচ্ছ ধারা ইতিহাসের পাতায় জায়গা পায় না। বিজিত জাতের মধ্যে থাকে বিশ্বাস ঘাতকতা, আত্মকলহ মিশ্রিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। বিজিত জাতের আন্দোলনে খারাপ মানুষের মধ্যে থাকে কাম-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা কিম্বা অর্থলোলুপতা নিয়ে চলে অরাজকতা। এর মধ্যে ফুলে ফেঁপে ওঠে নানা শক্তি বলয়---যেন কেয়ারি করা বাগিজায় জন্মায় অবাঞ্ছিত আগাছা। এদের কথা যখন গল্পে উপন্যাসে উঠে আসে তখন 'সু' আর 'কু' -এর সুস্পষ্ট পরিচয় ঘটে যায় পাঠক মনে। ভেসে চলা আগাছার জঙ্গলে ফুল ফোটে । তাকে তীরে শিকড়ে গেঁথে সযত্নে পূর্ণ রূপে দেখার জন্য হয়তো কোনো জীবন-রসিকের মন কাঁদে। কৌশিকী কানাড়া-য় সেরকম চরিত্র আমাদের গৃহবাসী মনকে আপ্লুত করে। বেদনা জাগায়। সহৃদয়-হৃদয়-সম্বাদীর কাছে এই আবেদন অনায়াসে পৌঁছে যায় বলে এ বইটির সম্বন্ধে কিছু কথা বলা দরকার।

গোপিকারমণ দস্তিদার সশস্ত্র বিপ্লবের একজন হৃদয়বান অধিনায়ক। সপরিবারে তিনি রাজনৈতিক অত্যাচারের আবহ পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের পথে চলেছেন। তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় মেলে পারিবারিক সূত্রে। নিজের একমাত্র মেয়ের পরিচয়ও বিপ্লবী। মেয়ের নাম যশোদা। নিজে সে গোলা-বারুদ আর মৃত্যু নিয়ে আছে। একদিন তার মৃত্যুও হোল এই পথের সম্ভাব্য পরিণতি যেমনটি হওয়ার ছিল---সেই ভাবেই। এ উপন্যাসে লেখক বলতে চান বিপ্লব কখনো মরে না। আত্ম-পর বলে কিছু নেই। শহীদের মৃত্যু স্রোত থেমে থাকে না। কোন পরাধীন দেশ এমনি এমনি মুক্ত হয় না। অত্যাচারীরা শেষ কথা বলে না। মানবিকতার কারণে কোন বিজয়ী জাত বিজিতদের স্বাধীনতা দেয় না। উপন্যাসের শেষ হয়েছে এইভাবে –

> "বিষাণ[৬৫] বাজছে -জাগো জাগো। সদা সর্বক্ষণ সজাগ থাক। ঈশান কোণে পীতঝঞ্ঝা দেখা দিয়েছে। ফেরাও, ফেরাও, মরণপণ করে পীতঝঞ্ঝাকে বিদায় কর। ইঙ্গিত-বিষাণে[৬৬] ঈশানের ইঙ্গিত।"[৬৭]

এখন আমরা উপন্যাসটিকে ফিরে দেখবো। এই উপন্যাষের বিষয় বীভৎসতা এবং বিচিত্র নরনারী সম্পর্কে আমরা অবহিত হবো।

কৌশিকী কানাড়া উপন্যাসে বিপ্লবীদের আস্তানা

এই সভ্য যুগে সভ্যতার ভ্রূকুটিকে ফাঁকি দিয়ে কয়েকটি প্রাণী সেই বম্বেটেদের বানানো অট্টালিকার নীচের তলার নীচের তলায় জমা হয়েছে। নিঃশব্দে অবস্থান করছে তারা ঘন্টার পর ঘন্টা, আর শুনছে সেই আওয়াজ। কারাগারের সামনে মহাকালের কপালে ঘন্টায় ঘন্টায় গুনে গুনে ঘা মারা হচ্ছে।-এই অট্টালিকার ইতিহাস শুনিয়েছেন লেখক। এটি কারাগার থেকে বেশি দূরে নয়। নদীর কাছে মান্ধাতার আমলে বানানো এক অট্টালিকা। বোম্বেটেরা বানিয়েছিল। একসময় এই শহরটা বম্বেটেদের রাজধানী ছিল। দূরদূরান্তের শহর গাঁ লুট করে শত শত মানুষ মেয়েমানুষ ধরে আনত তারা পালতোলা জাহাজ বোঝাই করে, সেই জাহাজ এসে ভিড়ত নদীর কূলে। এরপর :

> "লুটের মাল নামিয়ে জমা করা হোত ঐ অট্টালিকার নীচের তলায়। চমৎকার ব্যবস্থা আছে, একতলার নীচে আর একটা তলা আছে, নদীর দিকে ফোকড় কাটা আছে, সেই ফোকড়ের ভেতর দিয়ে সেই মাল ঢোকানো হোত পাতাল গর্ভে ! কেনা বেচা যা হবার সব হোত সেখানেই। তারপর আবার সেই পথেই তাদের বার করে নিয়ে দেশদেশান্তরে চালান দেওয়া হোত জাহাজে তুলে, শহরবাসী কেউ কিছু জানতেও পারত না। বর্তমানকালে অট্টালিকাটিতে সরকারের দপ্তরখানা চলে। দিনের বেলা শত শত বাবু বড়বাবু সাহেব বড়সাহেব পিয়ন পেয়াদার ভিড়ে গম গম করতে থাকে জায়গাটা, সন্ধ্যার পরেই খাঁ -খাঁ ! তখন একটি মাত্র বুড়ো দরোয়ান চারপাইয়ার ওপর চিৎপাত হোয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে পাহারা দেয়।"[৬৮]

দেশকে ভালোবাসার মূল্য বড় বেশি। তাই যারা এখানে মিলিত হোয়েছে তারা সংকল্পে অটল সবাই নিজেকে নিজে চোখ রাঙিয়ে শুনিয়ে দেয় একটা চরম কথা :

> "মনে থাকে যেন, তোমার অভিধানে 'হয়তো' বলে কোনও কথা নেই। তোমার অভিধানের প্রতিটি বাক্য 'অনিবার্য'। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বসে আছ তা সফল হবেই। রাত পোয়াবার আগে হবে, কিছুতেই কথার নড়চড় হবে না।"[৬৯]

এখনকার বম্বেটেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বাসনা হলে শেয়ার মার্কেটে যেতে হবে। অথবা সরকারের দরবারে যারা টেণ্ডার দেয়, টেণ্ডার দিয়ে ঠিকাদারি যোগাড় করে তাদের সঙ্গে মেলা

মেশা করতে হবে। এই সভ্য যুগে বম্বেটেরাও সভ্য হয়ে পড়েছে। তারা এই দপ্তরখানার অন্তরে ঘুরঘুর করে।করুণাকেতন ওরফে ড্যাট হপকিন্স অ্যাণ্ড হিলারী কোম্পানীর ছোট সাহেব। ড্যাট সাহেব কেবল কোম্পানীর ম্যনেজার নন। অভিজাত সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি। মিস্টার সিংহরায়, মিস্টার গুহা, মিস অসিতা ঠাকুর,মিস গোমা কাপুর, শ্রীমতী রুবি মুস্তাফি এবং আরো অনেকের ঘনিষ্ঠ। একসাথে পিকনিক করতে যান কখনো কখনো শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে।প্রায় প্রতি রাতেই আকণ্ঠ হুইস্কি বোঝাই করে, ঐ হুইস্কি বোঝাই একটা বা দুটো নারীদেহ নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ওঠেন করুণাকেতন। নারী দেহ তাঁর কাছে অভিনব পদার্থ নয়। তিনি জানেন যে টাকা খরচ করলে ও বস্তু কেনা যায় এবং যদৃচ্ছা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সেই হুল্লোড়ের অন্তে অতৃপ্তির হলাহল তাঁর মনমেজাজ বিষিয়ে তোলে, অবসাদ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। অথচ :

"... এই এক নারী দেহ, বহু ভাবে বহু রকমে দেহটিকে নিয়ে খেপে উঠেছেন তিনি, কিছুতেই পুরোনো হয়নি। শুধু রহস্য, অজানা অচেনা জগতে তলিয়ে যাবার মত একটা অদ্ভুত চেতনা, আর তৃপ্তি, এই তিন বস্তু দিয়ে তৈরী কৃষ্ণার শরীর। করুণাকেত ন ঐ দেহ-দেউলে পূজা দিয়ে প্রতিবার নবজীবন লাভ করেন যেন, অসীম তৃপ্তিতে তাঁর ওপর ভেতর পরিপূর্ণ হোয়ে যায়। কিছু একটা পাওয়ার মত পাওয়ার পর যে রকম মেজাজ হয়, সেই রকম মেজাজ নিয়ে সদ্য ঘুম থেকে জেগে উঠলেন যেন তিনি। বসে রইলেন চুপ করে, ভবিষ্যতের চিন্তাটা মনের কোণেও উদয় হোল না।"[৭০]

এর পর আরো খুশি হ'য়ে করুণাকেতন সিদ্ধান্তও নিয়েছে যে আর খানিক পরেই তারা পালাচ্ছে। এমন জায়গায় পালাবে, এমন ভাবে লুকিয়ে থাকবে যে কেউ পাত্তাই পাবে না। খুশি কৃষ্ণা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে কুমকুম লাগাতে লাগাতে বললে :

"সে আর ক'দিনের জন্যে। যে ক'দিন না উত্তেজনাটা জুড়োয়। তারপর আবার এই শহর, আবার সেই নিশাসঙ্গিনীদের সঙ্গে বোতল বোতল...।"[৭১]

যোগজীবনের স্বগত চিন্তায় পাঠক জেনেছে যে হপকিন্স অ্যাণ্ড হিলারী কোম্পানীর ছোট সাহেব মুঠে মুঠো টাকা দিতেন। কখনো কোনো কাজের জন্য তাড়াহুড়ো করতেন না। 'দু' একটা লোকের ওপর নজর রাখা, তারা কোথায় যায় কার সঙ্গে মেশে, এই সব সন্ধান নেওয়া। আর মাঝে মাঝে মনিবের জন্য এটা ওটা কিনে আনা। খুবই শৌখিন মানুষ মনিবটি, পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে ভয়ানক খুঁতখুঁত করেন। দামী পোশাক নামী দোকান থেকে কাচিয়ে এনে পরেন। শহরের অনেক গুলো নামী দোকানে তাঁর পোশাক কাচানো হয়। এক পোশাক একবেলার বেশী পরবেন না, জুতোও হরদম পাল্টাবেন। সকালের জুতো বিকেলে চলবে না, বিকেলের জুতো পরদিন অচল। হরদম জুতো কিনে যাচ্ছেন, মাসে দু'তিন জোড়া কিনছেনই। ঐ জুতো আর পোশাক নিয়েই জোগজীবনকে প্রায় ব্যস্ত থাকতে হোত।

"জুতোর নম্বর বলে নামকরা দোকান থেকে যোগজীবনকে জুতো আনতে হোত।

> পছন্দ হোল না, যাও পাল্টে আন। তিন চার বার পালটাপালটি করে তবে পছন্দ হবে। আশ্চর্য ব্যাপার হোচ্ছে, নিজে যাবেন না কখনও জুতোর দোকানে, কারণ সময় নেই। কাপড় কাচানোর দোকানে দোকানেও ঘুরতে হোত যোগজীবনকে, ও কাজটাই বা কে করে। শহরসুদ্ধ কাপড় কাচার দোকান চষে বেড়াবার সময় আছে কার!"[৭২]

-এই বর্ণনার মধ্যে একজন খেয়ালী ও সৌখিন মানুষের কথা ছাড়া কোন অভিপ্রায় আছে বলে মনে হয় না। পরে কাহিনির শেষে বুঝে নিতে হয় এই স্বভাবের অন্তরালে করুণাকেতন চীনাদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।সমাজে স্বাভাবিক জীবনের আড়ালে চোরা স্রোতে বয়ে যায় সমাজবিরোধীরা। বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না। এখানেও লেখার মধ্যে একটা আপাত নিরীহতা সবখানে বজায় রেখেছেন লেখক। খল চরিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রেও কোন বিভীষিকাময় কল্পনা কাজ করেনি। ভিলেনকে ভয়ংকর গোছের মানুষ হতে হবে একথা অবধূত স্বীকার করতেন না। ধীর শিক্ষিত যোগজীবনের মাধ্যমে আমরা করুণাকেতনকেজেনে নিতে পারি । যারা যোগজীবনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা চোর ডাকাতের দল যে নয়, এটুকু শুধু বোঝা গেল। চোর ডাকাত নয় কেন, তা'বলে বোঝাতে পারবে না যোগজীবন। কিন্তু সে মরে গেলেও মানবে না যে এ পক্ষ চোর ডাকাত। চুরি ডাকাতি ছ্যাঁচড়ামো করার মানুষ ওরা হোতেই পারে না। করুণাকেতন যখন জানল যোগজীবন গোপিকারমণ দস্তিদারের হাতে ধরা পড়েছে তখন চেয়েছিল মেরে ফেলতে। দুটো চিনাকে নিয়োগ করেছিল সেজন্য। এদের দোকান থেকে সে জুতো কিনত, তাই যোগজীবন দেখামাত্র চিনেছিল। গোপিকারমণের নির্দেশমত রাত আড়াইটায় কিষণগঞ্জে নেমে গেল যোগজীবন সবার অলক্ষ্যে। ভাগ্যবশে যোগজীবন বেঁচে যায়, উল্টে তারাই ধরা প'ড়ে মরণাপন্ন হলো। যারা খুন করতে এসেছিল সেই চিনা দুটোকে সঙ্গে নিল যোগজীবনরা। নেওয়ার আগে তার সঙ্গীদের প্রস্তাব শুনে যোগজীবন বলেছিল 'সঙ্গে নিতে হবে! কেমন করে! তারা যদি না যেতে চায়---

> "তখন সঙ্গী জানাল 'মতামত প্রকাশ করার মত অবস্থা থাকবে না তাদের তখন। আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব, ঠিকানায় পৌঁছে তারা যত খুশি প্রতিবাদ জানাতে পারে। আমরা বাধা দোব না।"[৭৩]

যোগজীবন এখন নিজের চোখে দেখতে পেলো কীভাবে তারা ট্যাক্সিতে পায়ের নিচে অচেতন হ'য়ে পড়ে আছে। এ প্রসঙ্গে অবধূতের বর্ণনায় বিশেষ কোনো শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি। তার বর্ণনা কৌশল যেন মৌনতার মধ্যে মুখর। করুণাকেতন প্রেরিত চিনা গুণ্ডারা এখন অচেতন। তাদের সঙ্গেই নেওয়া হলো :

> "সীটের ওপর তাদের স্থান হোল না, পা রাখবার জায়গায় একটার উপর আর একটাকে চাপানো হোল। তাদের পা গুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ভেতরে দিয়ে দেওয়া হোল, নয়ত গাড়ির দরজা বন্ধ করা যায় না। তারপর ওরা তিনজন পাশাপাশি বসল তাদের উপর পা রেখে।"[৭৪]

চোখের সামনে যে ঘটনা গুলোকে সে ঘটতে দেখলো, ঐ টুকুটুকু ছোকরা দুইজন নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে যে কর্মগুলো সম্পাদন করে ফেললে, তা' মনে করতে গেলেও তার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায়। দু'পাশে দুজন বসে আছে, একান্ত নিরীহ শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকের ছেলে দুটি নেহাত গোবেচারার মত চুপ করে বসে আছে, দুজনের শরীরের মাঝখানে তার শরীরটা চেপে রয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ওরা এতটুকু উত্তেজিত হয়নি। এখানে লেখকের নিস্পৃহতা আগে চোখে পড়ে। মনে হচ্ছে তিনি মনে মনে বলছেন :

> ''ঈশাণের বিষাণ মুর্হুমুহুঃ ফুকরে উঠছে---জাগো জাগো--- উত্তরপুব কোণায় ঝঞ্ঝা উঠেছে, অতি বিষাক্ত পীত ঝঞ্ঝা। সেই অশুচি ঝঞ্ঝার স্পর্শে আসমুদ্র হিমাচল পীতবর্ণ ধারণ করবে। স্বদেশ বলছে ফেরাও, ফেরাও ওখান থেকেই বিদেয় কর ঐ আপদকে। 'জাগো জাগো---কেঁদে ফিরছেন ঈশানী। মায়ের কান্না আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভুখা ভবানী বলি চান। ঘরভেদী বিভীষণদের রুধিরে মায়ের তর্পণ করতে হবে। ঐ [৭৫]রক্তবীজদের রক্ত পান না করা পর্যন্ত করালীর করাল তৃষ্ণা নিবারণ করা হবে না। ওদের হৃৎপিণ্ড উপড়ে মায়ের বলিপাত্র সাজাতে হবে। নিশ্চিহ্ন করতে হবে ঐ পাপ দেশের বুক থেকে। বলি দাও, বলি দাও- ঈশানী কেঁদে ফিরছেন। মহাকাল ঘুমতে পান না। দিনরাত অষ্টপ্রহর জেগে আছেন মহাকাল, তাকিয়ে আছেন ঈশান কোণে, আর ঈশানীর কান্না শুনছেন।''[৭৬]

প্রলয়কালে মহাদেবের বিষাণ বাজে। বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল বলেছেন : 'বাজা তোর প্রলয় বিষাণ'। এখানে লেখক বিপ্লবের পটভূমি আঁকতে এই ধ্বংসের দেবতাকে পরিস্থিতির সাথে সমীকৃত করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ এক প্রবল আবেগও বটে-বিশেষ করে তরুণদের ক্ষেত্রে তাই অবধূতের কলম সেই আবেগকে ফোটাতে সার্থকভাবেই কবিতার জন্ম দিয়েছে। রাধিকারমণ ভাবছেন 'ভুখা ভবানী বলি চান। ঘরভেদী বিভীষণদের রুধিরে মায়ের তর্পণ করতে হবে। ঐ রক্ত বীজদের রক্ত পান না করা পর্যন্ত করালীর করাল তৃষ্ণা নিবারণ করা হবে না। ওদের হৃৎপিণ্ড উপড়ে মায়ের বলিপাত্র সাজাতে হবে। নিশ্চিহ্ন করতে হবে ঐ পাপ দেশের বুক থেকে।' -এই অংশে অবধূত ব্যঞ্জনায় বলেছেন এ উপন্যাস -কল্প রচনাটির উদ্দেশ্য ও প্রতিস্থাপ্য বিষয় কী।

বিপ্লব মানেই রক্ত! পরের যেমন তেমনি নিজের রক্তও ঝরতে পারে যেকোন সময়ে। বিপ্লব মানেই 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন' লেখক এদের মানসিক দৃঢ়তার কথা বলেছেন : 'অনেকের মনে অনেক রকমের 'হয়তো' জেগে উঠতে গিয়েও জাগতে পেল না। সবাই নিজেকে নিজে চোখ রাঙিয়ে শুনিয়ে দিলে একটা চরম কথা -'মনে থাকে যেন, তোমার অভিধানে 'হয়তো' বলে কোনও কথা নেই। তোমার অভিধানের প্রতিটি বাক্য 'অনিবার্য'। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বসে আছ তা সফল হবেই। রাত পোয়াবার আগেই হবে, কিছুতেই কথার নড়চড় হবে না ন।'[৭৭] যোগজীবনকে যে দুটো চীনে মারতে এসেছিল তাদের বেঁধে নিয়ে চলেছিল ডেরায় কিন্তু নদী পার হাতে যে সময়টুকু তার মধ্যে চলল গুলির লড়াই।

"মিনিটখানেক চলল সেই ফট ফট শব্দ। তারপর দূরে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হোল। একসঙ্গে একশটা ছুটন্ত লরির টায়ার ফাটল যেন। রাশি রাশি পাথরের টুকরো আর বালির বৃষ্টি হোল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর একদম সব নিস্তব্ধ হোয়ে গেল।"[৭৮]

সাত . প্রসঙ্গ : বীভৎস রস

একটু তফাতে একটা চীনে উপুড় হোয়ে পড়ে আছে, তার শরীরের তলা থেকে ফিকে রক্তবর্ণ জল বয়ে চলেছে। আর একটা চীনে বসে আছে তার পাশে, কপালের ওপর চোখবাঁধা কাপড়টা নেই। তার মুখপানে তাকিয়ে শিউরে উঠল যোগজীবন, অমন বীভৎস মুখ আর কখনও সে দেখেনি। লোকটার চোখ দুটো আর নাকটা যেখানে ছিল সেখানটা হাঁ হাঁ করছে। কপালের নীচে থেকে ঠোঁটের ওপর পর্যন্ত সবটুকু খাবলা মেরে কে যেন উঠিয়ে ফেলেছে। আর তিন জন গেল কোথায়! চারিদিকে তাকিয়ে আর কাউকে দেখতে পেল না যোগজীবন। পাশে দাঁড়ানো জেলে ভদ্রলোকটিকে কি যেন জিজ্ঞাসা করবার জন্য হাঁ করল। তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন---

"গেল ভিজে চুরুট টা। শান্তিতে একটা চুরুট আগাগোড়া খাব আশা করেছিলাম। ভোরবেলাই দিলে মেজাজ খিচড়ে। এরকম জ্বালাতন করলে ক'দিন মানুষ মাথার ঠিক রাখতে পারে![৭০] এরপর জঙ্গী পোশাক-পরা লোকটি নিরুত্তরে জানিয়ে গেল সাথের দুজনও মারা গেছে।

তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন চীনেটার দিকে। 'সযত্নে তাকে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলেন। ... দিয়ে আরও কয়েক মুহূর্ত স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তাদের পানে তাকিয়ে। শেষে সেই আধঘুমন্ত এলিয়ে পড়া সুরে বললেন -'চলহে রায়, পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা অনেকটা হবে। ডেরায় না পৌঁছনো পর্যন্ত একটু চাও আমরা পাব না।"[৭৯]

পঞ্চম বাহিনী---বিশ্বাসঘাতক দেশবাসী

অনেক পরে আমরা যশোদার মুখে জানলাম গোপিকারমণ দস্তিদার বা তার দলের উদ্দেশ্য :

'শত্রুর মর্মস্থানে আঘাত হানতে হবে।' যশোদা বোঝাচ্ছিল যোগজীবনকে -'শত্রুর মর্মস্থান হোল তার পঞ্চম বাহিনী, এই দেশের লোক এই দেশে বসে আছে, কিন্তু সর্বনাশ করছে দেশের, শত্রুকে সব সংবাদ দিচ্ছে, কিম্বা দেশের লোকের মন বিষিয়ে তুলছে। এই পঞ্চম বাহিনীকে ধ্বংস করা আমাদের ব্রত। এদের ধ্বংস করতে পারলে শত্রুর মর্মস্থানে আঘাত লাগবে। তারপর আর বেশী ক্ষণ তাদের হাত পা চালাতে

হবে না। আমাদের জোয়ানদের সামনে তারা ঠুঁটো হোয়ে পড়বে।'[৮০]

স্বাভাবিক ভাবে একাজ সরকারের বলেই দেশের লোক নিষ্ক্রিয় হোয়ে বসে যায়। তাতে যা হয় সেকথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে যশোদার মুখে :

> ''সরকারের শক্তি অসীম নয়। হাজার হাজার কর্মচারী দিয়ে সরকার তাঁর হুকুম কার্যে পরিণত করেন। হুকুমটা কাগজে লিখে ফেললেই হুকুমমত কাজ হয় না। যারা কাজ করবে, তাদের মধ্যে মজা লোটবার লোকই বেশী। পঞ্চম বাহিনী সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও আছে। সবচেয়ে বড় কথা, দেশ যখন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত, তখন দেশের লোকের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে দেশের সরকার কিছুই করতে পারে না। আমরা ঠুঁটো নই, আমরা জানোয়ার নই, আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে।''[৮১]

একাজের সমস্যা দুদিকে বাইরের শত্রু এবং সরকারী দৃষ্টিতে আইনের চোখে অপরাধ। যোগজীবন বলেছে যে অথচ সরকারের কাজে সাহায্য হলেও সরকারের আইনে এ সমস্তই অন্যায়। বিপ্লবীদের ধরতে পারলে সরকারও ছেড়ে কথা বলবে না। এদের শেষতম যুক্তি হোল আশেপাশে চতুর্দিকে ঘাঁটি পেতে বসেছে শত্রুর চর, সুযোগ পেলে সময় আসলে এরা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। তখন সরকারের সেই আইনের বই খুলে চিৎকার করে পড়তে আরম্ভ করলে সাধারণ মানুষ বাঁচবে না। আত্মরক্ষা করার অধিকার সবায়ের আছে। কোনও আইন কারো আত্মরক্ষার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এরপরে আমরা গোপিকারমণ দস্তিদারকে সক্রিয় হতে দেখলাম। করুণাকেতনের লোকেরা যোগজীবনকে ট্রেনের মধ্যে খুনের ছক কষেছে। তাকে বাঁচাতে এসেছে বিপ্লবীদের কয়েকজন। কীভাবে তাকে সতর্ক করবে! অবধূত সে বিষয়টি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। একটা বুড়ো লোক যাত্রীর আসনে বসে ছিল তার ডান পাশে। বুড়ো ঢুলছিল অনেকক্ষণ থেকে, ঢুলতে ঢুলতে তার মাথাটা এসে পড়ছিল যোগজীবনের কাঁধের ওপর। কয়েকবার সে মাথাটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে,নেই আঁকড়া বুড়ো ছাড়বার পাত্র নয়। পাশের লোকের কাঁধে মাথা রেখে সে ঘুমোবেই। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বুড়োর মাথাটা কাঁধের ওপর নিয়েই যোগজীবন চক্ষু বুজে বসে রইল। হঠাৎ তার মনে হোল, কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিস ফিস করে কি যেন বলছে বুড়োটা। স্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করছে হয়ত, এইভেবে প্রথমদিকে যোগজীবন বুড়োর কথায় কান দিলে না। একটু পরে তার মনে হোল বুড়োটা তার নাম উচ্চারণ করছে বার বার, আর বলছে -সাবধান, চমকে উঠ না, নোড় না, যা বলছি শোন। কৌশিকী কানাড়ায় এমন লোমহর্ষক পরিবেশ বারে বারে তৈরী হয়েছে সে যাই হোক । বার দু'তিন ঐ কথা শোনবার পরে যোগজীবন নিজের মাথাটা ডানপাশে হেলিয়ে বুড়োর মাথার ওপর একটু চাপ দিল।

বুড়ো বলতে লাগল -'রাত আড়াইটে হোল প্রায়, কিষণগঞ্জে দশ মিনিট থামবে। সেই দশ মিনিট এইভাবে বসে বসে ঘুমবে। গাড়ি ছাড়লে উঠে দরজার দিকে যাবে। দরজার সামনে যে বসে আছে সে দরজা খুলে রাখবে। প্লাটফরমের শেষ মাথায় যখন পৌঁছবে তখন নেমে

যাবে টুপ করে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে দুজন, তারা তোমাকে মোটর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবে। একটিবার চোখ মেলে বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখে নাও। একেবারে কোণায় দুটো চীনে বসে আছে। চিনতে পারবে ওকে নিশ্চয়ই, ওদের দোকান থেকে বহুবার তোমার মনিবের কাপড় কাচিয়ে এনেছ। কায়দা করে ওদের পানে একবার তাকিয়ে চোখ বুজে ঘুমতে থাক। কিষণগঞ্জ থেকে গাড়ি না ছাড়লে চোখ মেলবে না। নামবার সময় ওদের পানে তাকাবে না। তোমার বিছানা বাক্স ঠিক জায়গায় পৌঁছবে। সাবধান, খুব সাবধান। ওদের চোখে ধূলো দিয়ে পালাও। ওরা তোমাকে খুন করতে পারে।'[৮২]

'কৌশিকী কানাড়া' ডিটেকটিভ গল্পের মেজাজে এক অসাধারণ উপন্যাস-কল্প রচনা । এর বেশ কিছু চরিত্রের উপস্থাপন কৌশল রহস্যময়। এই বুড়োটিকে আদ্যন্ত অন্ধকারে রেখেছেন লেখক। তার কথা শোনা যাচ্ছে তার কাজ দেখা যাচ্ছে কিন্তু আলোয় তার ঠিক পরিচয়টি জানা যাচ্ছে না। এভাবেই গোপিকারমণ দস্তিদার বৈপ্লবিক দলকে পরিচালনা করেন। 'সামনে যারা বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন বললেন -' লাইট এখন নিভিয়ে দিতে পার পাণ্ডা, বেশ দেখা যাচ্ছে।' গলা চেনা। ভয়ানক চমকে উঠল যোগজীবন সাথে সাথে নির্দেশ :

> "মুখ বুজে থাক রায়। যখন তখন ঘুম পেয়ে যায় আমার, ঘুম পেলেই ঐরকম এলিয়ে পড়ে কথা আর একবার তোমার খুব কাছে বসে হাই তুলতে তুলতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর তুমি আমাকে আর খুঁজে পাওনি। তাই ও রকম চমকে উঠেছ। বেশ করেছ, এখন মুখ বুজে বসে থাক।তোমার পাশে বসে তোমার কাঁধ মাথা রেখে প্রায় অর্ধেক রাত কাটালাম, আমার ঘুমের বহর তুমি দেখলে। ঐটেই আসল রোগ আমার, যখন তখন যেখানে সেখানে নিদ্রাটি আছে সাধা"[৮৩]

গোপিকারমণ অসাধারণ মানুষ । তিনি বিনা আড়ম্বরে কাজ করেন। পেছন থেকে 'খিকখিক' হাসির শব্দ শুনে আবার বলতে লাগলেন : 'আর ওদের ঐ হাসি '-সামনে থেকে আবার শোনা যেতে লাগল ঘুমে জড়ানো এলিয়ে পড়া সুর :

> "আমার ঘুম আর ওদের ঐ হাসি। এককথায় অতি যাচ্ছেতাই বেহদ্দ আকখুটে অভ্যাস। হাঁ অভ্যাস। হ্যাবিট হোল সেকেণ্ড নেচার। সুতরাং প্রকৃতি মানে স্বভাব। স্বভাব যায় মলে, কথাটি খাঁটি সত্যি। এই যে বাপু তোমরা দুজন দুটি জ্যান্ত লোককে বেহুঁশ করে ফেললে, ওরা দুজন যদি সুযোগ পেত, তাহলে এতক্ষণে তোমরা কোথায় থাকতে? নীচু হোয়ে ওদের শরীর হাঁটকে দেখ, ছোরা পাবে দু'খানি, আশা করি ছোট্ট দুটি রিভলবারও পাবে। আচমকা পেছন থেকে ঠিক টিপ করে ওদের মাথায় রড ঝাড়তে পেরেছিলে বলে এখন খিক খিক করে হাসছ। নয়ত এতক্ষণে তোমাদের ঐ বদ স্বভাব ঘুচত। আর আমাকেও এই গাড়িতে চেপে ঢুলতে ঢুলতে যেতে হোত না।"[৮৪]

ডিটেকটিভ গল্পের অসাধারণ হাত ছিল অবধূতের সাধারণ কথার মধ্য দিয়ে কাহিনিকে এগিয়ে নিতে তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষ।এবার বেশ আরামের হাই তুলে আকখুটে ঘুমে

আচ্ছন্ন সুরে হুকুম হোল---'সাবধানে রাখ, পিস্তল গুলো লোড করা আছে, সাবধান।' এই লোকটির বর্ণনা করেছে যোগজীবন :

> "দিনের আলো ফুটে উঠতে যোগজীবন দেখল সেই জেলেটিকে,যে সেদিন ভোরবেলা হাঁটুসমান জলে দাঁড়িয়ে জাল টানছিল। সেদিন পরে ছিল নোঙরা নেকড়া, মাথায় একখানা ময়লা গামছা জড়ানো ছিল। আজ পরে আছে একখানা খাটো ধুতি আর একটা হাতা কাটা কামিজ, তার ওপর জড়িয়েছে একখানা অতি খেলো আলোয়ান। ঐ পোশাকটি ছাড়া সমস্ত একরকম। সেই অসম্ভব কালো রঙ, সেই হাড়বারকরা চেহারা, সেই অসম্ভব খাড়া নাক। কোনও তফাত নেই। সেদিন জাল টানছিল এক নদীর ধারে হাঁটুসমান জলে দাঁড়িয়ে, আজ আর এক নদীর শুখনো বালির ওপর দিয়ে ঢুলতে ঢুলতে হাঁটছে।"[৮৫]

বোঝাই যাচ্ছে এমন চেহারার লোকে যে বীভৎস কাজে যুক্ত থাকতে পারে তা অনুমান করা কঠিন। এদের আর একটি অভিযান হোল ক্লাব ক্লাসিকে। বাগান পুকুর টেনিস কোর্ট সুদ্ধ কয়েক বিঘা জমির মাঝখানে ক্লাসিক ক্লাব, উঁচু মেজাজ এবং উঁচু দরের পছন্দ যাঁদের তাঁরাই ক্লাসিক ক্লাবে বাস করেন। শুধু পয়সার জোর থাকলেই ঐ ক্লাবে স্থান পাওয়া যায় না। অবধূত কেবল স্বগতোক্তির মাধ্যমে ঘটনার বিবৃতি দিয়েছেন। ড্যাট সাহেব তাঁর প্রিয় ক্লাবটির কথাও ভেবে দেখলেন, একটা কেলেঙ্কারি হোয়ে গেছে চোর ঢুকে ক্লাসিক ক্লাব থেকে এক মেম্বারের যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে, এরকমের একটা তৃতীয় শ্রেণীর সংবাদ রটলে ক্লাবের মর্যাদা থাকবে না। তাই থানা পুলিশ হলো না।

বীভৎস রসের নতুন ব্যবহার : নিস্পৃহতা ও মৃত্যু

যোগজীবনকে যে দুটো চীনে মারতে এসেছিল। গোপিকারমণের সৌজন্যে উল্টে তাদেরই বেঁধে নিয়ে চলেছিল ডেরায় কিন্তু নদী পার হাতে যে সময়টুকু তার মধ্যে চলল গুলির লড়াই। চীনাদের পোষা মানুষেরা এ লড়াইটা করলো :

> "মিনিট খানেক চলল সেই ফট ফট শব্দ। তারপর দূরে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হোল। একসঙ্গে একশটা ছুটন্ত লরির টায়ার ফাটল যেন। রাশি রাশি পাথরের টুকরো আর বালির বৃষ্টি হোল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর একদম সব নিস্তব্ধ হোয়ে গেল।"[৮৬]

একটু তফাতে একটা চীনে উপুড় হোয়ে পড়ে আছে, তার শরীরের তলা থেকে ফিকে রক্তবর্ণ জল বয়ে চলেছে। আর একটা চীনে বসে আছে তার পাশে, কপালের ওপর চোখবাঁধা কাপড়টা নেই। তার মুখপানে তাকিয়ে শিউরে উঠল যোগজীবন, অমন বীভৎস মুখ আর কখনও সে দেখেনি। লোকটার চোখ দুটো আর নাকটা যেখানে ছিল সেখানটা হাঁ হাঁ করছে। কপালের নীচে থেকে ছোঁটের ওপর পর্যন্ত সবটুকু খাবলা মেরে কে যেন উঠিয়ে ফেলেছে। আর তিন জন গেল কোথায় ! চারিদিকে তাকিয়ে আর কাউকে দেখতে পেল না যোগজীবন। পাশে দাঁড়ানো জেলে ভদ্রলোকটিকে কি যেন জিজ্ঞাসা করবার জন্য হাঁ করল। তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস

ত্যাগ করে বললেন অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় যে তাঁর চুরুট টা ভিজে গেল। শান্তিতে একটা চুরুট আগাগোড়া খাবেন আশা করেছিলেন কিন্তু তা আর হলো না বলে তাঁর মেজাজটাই বিগড়ে গেছে।

এরপর জঙ্গী পোশাক-পরা লোকটি নিরুত্তরে জানিয়ে গেল সাথের দুজনও মারা গেছে। পরে যশোদার কাছে নিশ্চিত হেয়েছেন যোগজীবন 'টুকরো টুকরো হোয়ে উড়ে গেছে।'-নিতান্ত নিস্পৃহের মত জবাব দিয়েছিল যশোদা। মুক্তি ফৌজের সমর্থনের মিটিং শুনে আসার পথে এমনই এক সম্ভাবনার কথা নিয়ে ভাবতে গিয়ে এসেছিল সেদিনের প্রসঙ্গ। কৃষ্ণার সাথে করুণাকেতনের ভালোবাস। এজন্য বিয়ের আগে থেকে নিজের পদবী পর্যন্ত দত্ত হরে নিয়েছে। করুণাকেতন দত্তের সাথে মিলিয়ে। খুবই ভালো। তাঁর ঠাকুর্দা প্রচুর সম্পত্তি তাকে দিয়ে গেছেন। সেই টাকা খরচ করে যেমনভাবে বেঁচে থাকতে মর্জি হয়, বাঁচতে পারে কৃষ্ণা। ইচ্ছে করলে টাকা দিয়ে করুণাকেতনকেও কিনতে পারে।' কৃষ্ণা গোপিকারমণ দস্তিদারের বোন। অতএব যথেষ্ট ধনী--- সেই সাথে অপরূপ লাবণ্যময়ী এক সুন্দরী।

এ হেন কৃষ্ণা করুণাকেতনকে ভালোবাসে। সে পছন্দ করে না যে সাহেবী পোশাক পরুক, তাই ধুতি পাঞ্জাবীতে তাকে সাজাতে চায়, তখন অগত্যা সে দাবি মেনেও নেয় ড্যাট সাহেব। কিন্তু চরিত্র বদলানো অত সহজ নয়। সে বহু নারীর সাথে মেশে তাই কৃষ্ণাকে ভালোবেসে ঘর বাঁধার কথা ভেবেও শেষ পর্যন্ত হোয়ে ওঠে না। বিপদে পড়লে কৃষ্ণার কথা মনে পড়ে। কৃষ্ণাও তাকে অপমান -অস্বীকার করে না। ক্লাসিক ক্লাবে সর্বস্ব হারিয়ে ড্যাট সাহেব ভাবছেন সর্বাগ্রে তাঁর এক প্রস্থ পোশাক চাই। বাইরে একটি বার বেরতে পালেই বিলকুল ব্যবস্থা করে ফেলবেন তিনি। হতভাগা চোরগুলো একটা পোশাকও যে রেখে যায়নি।

করুণাকেতন দেশের শত্রু। কৃষ্ণা দেশভক্ত। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব। কৃষ্ণা চায় সংসার পাততে। দস্তিদার বদলে সে পদবী লেখে দত্ত। করুণাকেতন দত্ত তবু তাকে বিয়ে করে উঠতে পারেনি। বিপন্ন করুণাকেতন দত্ত এবার কৃষ্ণার কথা ভাবতে লাগলো। পোশাক সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে কৃষ্ণার কথা ভাবলেন :

> ''চারিদিক থেকে যেরকম দুর্বিপাক ঘনিয়ে উঠছে, তাতে এখন কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়াই উচিত। এমন একজনকে চাই, যার কাছে থাকলে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তিনি। সেরকম ব্যক্তি একমাত্র কৃষ্ণা ছাড়া আর কে আছে।''[৮৭]

উপন্যাস-কল্প এই রচনাটি ডিটেকটিভ গল্পের মত বেশ ধোঁয়াশা ও সত্য আবিষ্কার---এই শৈলীতে এগিয়েছে। যশোদার কাছে যোগজীবন জেনেছে তার পিসির কথা।

> 'কৃষ্ণা দস্তিদার। দস্তিদার উপাধিটা বদলে ফেলেছে। দত্ত হোয়ে পড়েছে। বিয়েই হোলনা সেই দত্ত সাহেবের সঙ্গে, কানও কালে তিনি বিয়ে করবেন কিনা পিসীকে তার ঠিক নেই, আগে থাকতে পিসী নিজের নামের সঙ্গে দত্ত জুড়ে নিয়েছে। আদিখ্যেতার চূড়ান্ত।'[৮৮]

এই কৃষ্ণাই কেতনকে বাঁচাবার জন্যে রুবি মুস্তাফি সেজে ঠকায়। সে কথা পরে সে স্বীকার

করেছে :

> "হঠাৎ তার ওপর এক বিরাট দায়িত্ব এসে পড়ল। দায়িত্বটা হোল, যে কোনও উপায়ে হোক করুণাকেতনকে বাঁচাতে হবে। কে সেই দায়িত্ব দিল তা' কৃষ্ণা প্রাণ গেলেও বলবে না, বলতে পারবে না। যেই দিয়ে থাকুক, সে সমস্ত জানে। করুণাকেতন কি উপায়ে রাশি রাশি টাকা উপার্জন করেন তা' সে জানে।"[৮৯]

ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে মালপত্র নিয়ে হাজির হোল কৃষ্ণা। ঘরের পর্দা ঠিক করতে শুরু করেছে কৃষ্ণা। করুণাকেতন তাকিয়ে রইলেন সৌন্দর্যময়ী কৃষ্ণার দিকে :

> "তাঁর মনে হোল কৃষ্ণার বডিটা অত্যন্ত বেশী পরিমাণ সজীব। সজীব না বলে সজাগও বলা যায়। ইংরেজী কথাটা হোল রিস্পন্‌সিভ্, করুণাকেতন ওই রিস্পনসিভ্ কথাটার সঠিক বাংলা কি হবে বুঝতে পারলেন না। ওই রকমের শরীর খুব কম মেয়েরই আছে। শরীরের মধ্যে যেন রহস্যময় একটা চুম্বক শক্তি সদাসর্বক্ষণ জেগে রয়েছে, আকর্ষণ করবেই। সে আকর্ষণকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।"[৯০]

কৃষ্ণা তাকে ঠকিয়েছে---তার সবকিছু নিয়ে পালিয়েছে---এটা জানতে পারার পরে করুণাকেতন ভেবেছেন যে অনেকগুলো টাকা গুনে দিয়ে হাওয়াই জাহাজের টিকিট কিনে উড়ে এসেছেন তিনি ওকে সঙ্গে নিয়ে। পাহাড়ের ঠাণ্ডায় শরীর মন জুড়িয়ে যাবে এই আশায় এসেছেন। সে আশায় ছাই পড়বে। যদি জানতে পারে কৃষ্ণা যে তার সেই চালাকিটা তিনি জানেন, তাহলে রুবি মুস্তাফি ওরফে কৃষ্ণা আর এক মুহূর্তও তিষ্ঠবে না যেকোনও উপায়ে হোক, পরের প্লেনেই উড়বে। না, অমন বোকামিটা নিশ্চয়ই তিনি করতে যাবেন না। ব্যাপারটা ভাবতে গিয়েই করুণাকেতন কেমন যেন অসহায় বোধ করলেন। কৃষ্ণা চলে গেছে তাঁকে একলা ফেলে রেখে, এই চিন্তাটাই তাঁকে বেশ মুষড়ে ফেললে। ঠকাক সে যত পারে, আরও কয়েক হাজার টাকা যদি চায় তো খুশী মনে তিনি দিয়ে দেবেন। টাকার জন্যে তিনি মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু আর তাঁর একলা থাকবার সাহস নেই। মুখে রবারের নল পুরে দিয়ে মুখ হাত পা বেঁধে তাঁকে উলঙ্গ করে রেখে গেছে যারা,তাদেরই জ্ঞাতিগুষ্টিরা হয়তো আবার এসে চড়াও হবে।

অসহায় করুণাকেতনের পাশে একজন কেউ থাকা চাই। চিন্তা করতেই দল বেঁধে একপাল নারী তাঁর নিমীলিত চোখ দুটোর সামনে উপস্থিত হোল---অবধূত দেখিয়েছেন বহুভোগ্যা হলে মানুষের মনে এক ধরনের বিভ্রম জাগে। ভালোবাসার জায়গায় একঘেঁয়েমি এস পড়ে। একে একে কমতে লাগল তারা দল থেকে। তাদের চোখ মুখ সর্বদেহ মানসনেত্রে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন ফল হোল এই যে হঠাৎ তাঁর পেটের ভেতর যেন মোচড় দিয়ে উঠল। এক ঝলক থুথু উঠে এল তাঁর মুখের মধ্যে, প্রায় বমি করার মত অবস্থা---অর্থাৎ এই সব নারীরা কেউ-ই করুণাকেতনের মনের শান্তি দিতে পারেনি। কৃষ্ণাই তাঁর পরম আশ্রয়। তাই কৃষ্ণার শরীরের ওপর আলতোভাবে একখানি হাত রেখে পাশ ফিরে শুলেন। রহস্যময় একটা গন্ধ পেলেন শ্বাসের সঙ্গে। ঐ গন্ধটা কৃষ্ণা ব্যবহার করে। ভয়ানক দামী সেন্ট, বোম্বেতে এক

নাম করা পার্শীর দোকানে পাওয়া যায়। অন্যত্র নাকি জিনিসটা মেলেই না। ---অবধূত পুরুষের এমন নির্ভরতার ছবি এঁকেছেন যে তাতে বর্ণনা নেই আছে কেবল আচরণ---তা দিয়ে ভালোবাসার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

কৃষ্ণা আর করুণাকেতন ঘর বাঁধতে পারেনি। চীনাদের হাতে নির্মম ভাবে মরতে হলো। পরে জানা গেছে তাদের পরিচয়। পুরুষ কমরেডটি বললে :

> ‘‘আপনি এখনি আপনার মুক্তি কিনে নিতে পারেন । আমি কাজের কথা বলছি। আপনার দাদা গোপিকারমণ দস্তিদার আপনার থ্রু দিয়ে ঐ দত্তটাকে হাত করেছিল। সে আমাদের ধাপ্পা দিয়েছিল। আমরা জানতাম সে আমাদের কাজ করছে, আমরা তাকে রাশি রাশি টাকা দিয়েছি। আর ওধারে সে আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু জানতে পেরেছে, সমস্ত আপনার দাদাকে জানিয়েছে আপনার থ্রু দিয়ে। বলুন সত্যি কি না?’’[৯১]

চিনারা ভুল বুঝেছে করুণাকেতন দত্তকে, কৃষ্ণাকেও। তাতে বিপদ কমে না। সন্দেহ বশে তারা হত্যা করতে পিছপা হয়না। শেষপর্যন্ত ওদের ইচ্ছা পূরণ হোতে দেয়নি। বাচ্চা সিং আর ওরা দুজন কোলকাতার উদ্দেশ্যে নামছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হোল না।

> ‘‘ও রাস্তায় প্রচুর গাড়ি আসা যাওয়া করে। এমন গরুও থাকে যারা মোটর গাড়ির আওয়াজ পেলে ভড়কে যায়। করুণাকেতন দেখলেন,অনেক আগে একখানি গোরুর গাড়ি চলেছে রাস্তার বাঁ ধার দিয়ে। তার কাছাকাছি পৌঁছতেই হঠাৎ গাড়িখানা ডান ধার ঘুরে রাস্তার মাঝখানে চলে এল। অগত্যা তিনি গাড়ি থামালেন।’’[৯২]

---এখানেই বাচ্চা সিংকে খুন করলে,ওরা করুণাকেতনও মারা পড়ল। কৃষ্ণা শেষবার যখন ওকে দেখেছিল :

> ‘‘নাকটা থেবড়ে গেছে, দুই ভুরুর ওপর থেকে চামড়া ঝুলে পড়ে দু’চোখ ঢেকে ফেলেছে, একটা কান নেই। তখন তার হুঁশ ছিল কিনা বোঝা যায়নি। তারা তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, তার সামনেই কৃষ্ণার গা থেকে কাপড়গুলো ছিঁড়ে নিয়েছিল। করুণাকেতনের পায়ের কাছে ফেলে প্রথমে কয়েকজন তার শরীরটা নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছিল। তারপর তারা করুণাকেতনকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। তখন ছেলে বুড়ো সবাই মিলে তাকে ছিঁড়ে খেতে লাগল। আর মেয়েগুলো বাচ্চাকাচ্চা কোলে করে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে।’’[৯৩]

এরপর করুণাকেতনকে সনাক্ত করতে গেছিল যোগজীবন। হাঁ, দেখেই চিনতে পারলে যোগজীবন, দস্তুরমত চিনতে পারবেই তো। নিত্য সঙ্গী ছিল সে তাই ঐ চুল ঐ কপাল রঙ গড়ন কিছুতেই ভুল হবার নয়। দেখলো করুণাকেতনের ডান হাতের অনামিকার মাথায় কালো তিলটি পর্যন্ত ঠিক আছে। কপালের নীচে থেকে থুতনি পর্যন্ত বীভৎসভাবে থেতলে খাবলে উপড়ে নেওয়া হোয়েছে,মুখে দাঁত একখানিও নেই। বোধহয় গুলি করেছিল পিঠে, তাই বুকের ওপর দেখা যাচ্ছে মস্ত বড় এক ছেঁদা। দুটো চীনার কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল তা সে দেখেছে

নিজের চোখে। তাই বুলেটের ক্ষমতা যোগজীবনের মনে পড়ে গেল।

বিচিত্র চেহারা ও চরিত্র : বীভৎস রস

এরপর যারা কৃষ্ণাকে ভোগ করতে এল তাদের ওজন আড়াই-তিন মণ হবে। ‘ভয়ংকর দাঁত বার করে বীভৎস হাসি হাসছে তারা নি:শব্দে। চোখ তাদের নেই বললেই চলে, কপালের নীচে চোখের জায়গায় দুটো চেরা দাগ, তার ভেতর নীল আলো জ্বলছে। নাকও নেই বললেই চলে। চাকার মত থেবড়া মুখে শুধু সেই দাঁতের সারি ই দেখল কৃষ্ণা। নি:শব্দে তারা এগোতে লাগল ওর পানে। আর সহ্য করতে পারলে না। ‘বাবাগো ’ বলে একটা মর্মভেদী চিৎকার করে সেখানেই লুটিয়ে পড়ল।[৯৪]

এরপর লেখক নির্লিপ্তভাবে জানালেন গাড়ি কেবল তার নাম্বার প্লেট বদলে চলে গেল স্বস্থানে। বাচ্চা সিং-এর ছেলে কুলদীপ প্রতিশোধ চায় এটা ধর্ম সঙ্গত। ‘কিন্তু কেন বাচ্চাকে খুন করা হোল? সে তো কখনও কারো সঙ্গে দুশমনি করেনি।’ বাচ্চা সিং প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল। বাচ্চা সিং একটি আওরতের ধর্ম বাঁচাতে গিয়েছিল।’ --একথা বলে নিস্তব্ধ হোয়ে গেলেন বৃদ্ধ গুরু। আর কয়েক বার পাক খেলেন আস্তে আস্তে। তারপর স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন -চীনেদের হাতে সেই ‘আওরতটি’ গেল কেমন করে ? অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিলেন চেলা। এরা চীনেদের ‘নোকর’। টাকা খেয়ে এরা দেশের সঙ্গে বেইমানি করছে। চীনেদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে এরা নিজেদের মা বোনকে পর্যন্ত বলি দিতে পারে। তখন ওপর দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে অন্তরীক্ষে অদৃশ্য লেখা পড়ে গেলেন বৃদ্ধ---

> “এরা জাহান্নামে যাক। দেশের সঙ্গে যারা বেইমানি করে তাদের দয়া করা পাপ। সেই আওরতকে বাঁচাবার চেষ্টা করা উচিত। ফৌজী লোক যারা গেছে কুলদীপের সঙ্গে, আশা করি তারা চীনেদের সঙ্গে মোকাবিলা করে তাকে উদ্ধার করে আনবে। সেই মেয়েকে আমার কাছে নিয়ে যেও।”[৯৫]

দুজন চিনাকে কুকরি দিয়ে হত্যা করেছিল পাণ্ডা। নইলে যোগজীবনকে যারা খুন করতে গিয়েছিল সেই চিনা দুজনকে মেরে ফেরার পথে যোগজীবন আর গোপিকারমণও মারা যেতেন এই লুকিয়ে থাকা আততায়ীর হাতে। পরে আমরা জানতে পেরেছি যশোদার মুখে । তার আশঙ্কা ছিল যে ওদের গুষ্টির কেউ হয়তো এই অন্ধকারে ওত পেতে থাকতে পারে। সে দিন যেমন হোয়েছিল। চীনে দুটো যাতে মুখ খুলে কিছু বলতে না পারে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন এঁরা। ‘বাবা আর আপনি যে বেঁচে ফিরতে পেরেছিলেন এজন্যে’ (কৌশিকী কানাড়া, অবধূত, পৃ. ৮৫)।

অর্থাৎ পাণ্ডার হাতে তারা মারা যাওয়ার জন্য। পাণ্ডা বাঙলোয় গাড়ি তুলে দিয়ে ওপর থেকে নীচে নামছিল। পেছন থেকে তাঁদের দুজনকে দেখতে পায়। পাণ্ডার হাতের কুকরিতে

তাঁরা কচু কাটা হন। টু শব্দ করার সুযোগ পান নি। আরও কয়েকটা হাতবোমা পাওয়া গেছিল তাঁদের কাছে। পাণ্ডা সেগুলোকে নিয়ে এসেছিল। সেদিনের কথা মনে আছে যোগজীবনের। এ সবের পরে গোপিকারমনকে নিরুদ্বেগ দেখা গেল :

> ''তারপর দস্তিদার সাহেব আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন চীনেটার দিকে। সযত্নে তাকে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলেন। দিয়ে আরও কয়েক মুহূর্ত স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তাদের পানে তাকিয়ে। শেষে সেই আধঘুমন্ত এলিয়ে পড়া সুরে বললেন---'চলহে রায়, পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা অনেকটা হবে। ডেরায় না পৌঁছনো পর্যন্ত একটু চাও আমরা পাব না।''[৯৬]

---ভয়ংকর রকম নির্লিপ্ত না হোলে এমনটি সম্ভব নয়। দেখা গেলো মুখে সিটি বাজাতেই ছুটে এলো দুটি কুকুর। যোগজীবনের মনে হোল যেন যশোদার কুকুর দুটো বুঝতে পারল তাঁর কথা। তাঁর বুক থেকে থাবা নামিয়ে তাই মাটির ওপর পড়ল তারা, পড়েই ফিরে দিলেঅ দৌড়। অসম্ভব খাড়াই ভেঙ্গে ঐ রকমের বিশাল বপু নিয়ে চক্ষের নিমেষে তারা উঠে গেল ওপরে। ওপর থেকে আবার আওয়াজ ভেসে এল---ভৌ ভৌ ভৌ। যোগজীবন দেখলেন জেলে ভদ্রলোক খুশী হোয়ে উঠলেন।

বললেন---'যাক,যশোদা তাহলে চায়ের জল চাপিয়ে দেবে।'[৯৭]

ডেরায় এসেছে যোগজীবন। উঠে যোগজীবনের নজরে পড়ল যেন এই মেয়েটি একটি আশ্চর্য জীব। আসলে বিচিত্রবেশিনী যশোদা ঠিক সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার মাথা থেকে চরণ, ছোটখাটো দেহটিতে ভাগে ভাগে জড়ানো হয়েছে খণ্ড খণ্ড নানা রঙের কাপড়ের টুকরো। মাথায় জড়িয়েছে সোনালী রঙের এক রুমাল, গলায় জড়িয়েছে আসমানী রঙের খুব পাতলা এক টুকরো কাপড়। অতি সংক্ষিপ্ত এক জামা পরে আছে যার রঙ ঘোর বাদামী। জামা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে অতি মসৃণ খানিকটা সাদা চামড়া। তারপর পায়ের গোছ পর্যন্ত নেমে গেছে এক ঘাগরা। ঘাগরার রঙ কচি কলাপাতার মত। সেই ঘাগরা যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে পেঁচানো হয়েছে ভয়ংকর লাল এক টুকরো কাপড়, সেটা কোমর বন্ধের কাজ করছে। ঐ সামান্য সাজে সজ্জিত শরীরে গয়না আছে এক রাশ। দু'হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত ভারী ভারী পেতলের গয়না,দুইকানে চেনসুদ্ধ বড় বড় দুই রুপোর ফুল, দুই পায়ের গোছে বাঁধা হয়েছে রাশীকৃত ঘুঙুর। সত্যিই সঙ, ঠোঁটে গালে রঙ, দুই চোখে অস্বাভাবিক লম্বা করে কাজল টানা হয়েছে, কপালে নানারকম অলকা তিলকা তো আছেই। সত্যিই সঙ, সেই অদ্ভুত সঙ্ দেখে মানুষ না হেসে পারে না। যশোদার বাবা গোপিকারমণ দস্তিদার যোগজীবনের সঙ্গে ছিলেন তিনি বললেন 'হেস না রায়, খবরদার হেস না। হাসলে যশোদার মাথায় খুন চেপে যাবে। মেয়ে আমার নাচ শিখছে,নাচ শেখা ব্যাপারটা হালকা ব্যাপার নয়। এ নাচটা কোথাকার নাচ রে যশোদা? কোন্ দেশের নাচ শিখতে হলে এই রকম সাজতে হয়?'গম্ভীর কণ্ঠে মেয়ে জবাব দিল--- ' উপজাতীয় নৃত্য, উত্তর পূর্ব ভারতের আদিম অধিবাসীরা এই রকম সাজপোশাক পরে নাচে।'[৯৮]

এ মেয়ে নানা বিদ্যায় পারদর্শী। তার বাবা যোগজীবনে দেখিয়ে দিয়ে বললেন যে রাইফেল পিস্তল কেমন করে চালাতে হয়,তা যেন ওকে শিখিয়ে দেয় । আরো বললেন জিনিসগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও আড়ষ্টতা ভাঙবে। যেন আত্মগতভাবে বললেন যে আজ কালকার দিনে অস্ত্রশস্ত্র[৯৯] চালাতে না জানা একটা অপরাধ! শিখে রাখা ভাল, বলা যায় না কখন কোন্‌টে কাজে লাগে।

কিন্তু রাইফেল চালানোর জন্য এ পরিবেশ ঠিক নয় চারিদিক থেকে লোক ছুটে আসবে। স্থির হলো আসামে গিয়ে যত খুশি ফায়ার করবে রায়। এখন শুধু ওগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করুক। কলকবজা গুলো কোন্‌টে কি কাজ করে জেনে নিক। খুলতে শিখুক দু'চারবার ফায়ার করেও দেখুক। ফায়ার করলে একটা ধাক্কা লাগে, সেই ধাক্কাটার সঙ্গে পরিচয় হোক।

এদেশে বাস করেও কিছু মানুষ আগ্রাসী চিনাদের পক্ষাবলম্বী। এদের পঞ্চমবাহিনী বলা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে পথে যেতে যেতে যশোদা যোগজীবনকে বলেছে যে চীনারা এদেশের লোকেদের সাথে সাধারণত রাত বারোটার পরে মিটিং-এ দেখা করে,রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত মিটিং চলে। তাদের পৌঁছতে পৌঁছতে দেড়টা হবে। সবটুকু তাই হয়তো শুনতে পাবে না। যশোদা চলেছে উপজাতিদের পোশাকে। যশোদাকে দেখলে উদ্ভট দর্শনের জন্য হাসি আসবেই কিন্তু এই যশোদাই আবার যখন গোপিকারমণের মেয়ে হিসেবে সম্ভ্রান্ত সাজ পরেছে এবং যোগজীবনকে বানিয়েছে বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারি তখন তার বেশভুষা দেখে যোগজীবনের মনে হয়েছে :

> "শহর কোলকাতার মহাসম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েও মানানসই সাজপোশাক মানানসই করে পরা কর্মটি তার ছাত্রীর কাছে শিখে নিতে পারে।"[১০০]

---অর্থাৎ রুচিশীলতায় যশোদা অনন্যা। অবধূত রাতের অন্ধকারে বিশ্বাসঘাতকদের সাথে চিনা বাহিনীর কর্মচারীদের মিটিংকে বিশ্বস্ত রূপ দান করেছেন। বর্ণনার গুণে তা বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে পাঠকের কাছে :

> "মিটিং বসেছে রেল লাইনের ধারে একটা ভাঙা টিনের চালার তলায়। ... রেললাইনের তলায় যে কাঠ পাতা থাকে তাই খাড়া করে পুঁতে দেওয়াল বানান হয়েছে, চাল বানানো হোয়েছে টিন পেতে। দেওয়াল চাল সবই ঝাঁজরা, এমন যে খুলে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র কাজে লাগানো যাবে না। সেই ঘরের মধ্যে পঁচিশ ত্রিশ জন লোক ঠাসাঠাসি করে বসেছে। ওরা দুজন যখন পৌঁছল তখন বক্তৃতা শুরু হোয়েছে। ঘরখানির চারপাশে পাহারা আছে। এক পাহারাদার সামনে পড়ে গেল। যশোদা কোমরে জড়ানো কাপড়ের ভেতর থেকে দু'টুকরো কাগজ বার করে তার হাতে দিল। টর্চের আলোয় সে একবার দেখে নিলে টুকরো দুটো। দেখে ফেরৎ দিয়ে হাত নেড়ে হুকুম দিলে এগিয়ে যাবার। ওরা দরজার সামনে গিয়ে উবু হোয়ে বসে পড়ল।"[১০১]

---বলা বাহুল্য যশোদা চাঁদার লাল টুকরো কাগজগুলি গ্রামবাসীর কাছ থেকে গোপন সূত্রে

সংগ্রহ করেছিল। এখন তারা পৌঁছে গেলো অকুস্থলে। সেখানে আলো যেমনই হোক বক্তৃতাটা সবই শোনা গেল। ধোঁয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট আলোয় বক্তা হিন্দী বাঙলা মেশান যে ভয়ঙ্কর কথা গুলি বলছিল তার মূল কথাটা হলো :

> "ভারত মাতা ঝাঁজরা হো গিয়া হায়। মিত্র লোক আগিয়া হায়। নেপাল ভূটানমে আদমী কায়েম হো গিয়া হায়। লেও এক এক লাল রসিদ, রাখ দেও আপনা পাস, যব মিত্রলোক পৌঁছায়গা ইধার, ঐ রসিদ দেখলাও। ইয়ে রসিদ যিসকা পাস রহেগা, উসকো সব কুছ মিলেগা। আউর নজর রাখ হারামজাদা মালিক লোক কোই চিজ লেকর ভাগনে নেই শেকে। সব কুছ তুম লোক বানায়া, বাগিচা ফ্যাক্টরী, গাড়ী লরি যো কুছ হায় হিঁয়া পর, সবকুছকা মালিক কোন হায়? তুম লোক মালিক হায়। হুঁশিয়ার রহো, হারামজাদা মালিক লোক কই চিজ লেকে নেহি ভাগনে শেকে।"[১০২]

---এইভাবে কারখানার মানুষদের প্রলোভন দেখিয়ে চিনা আগ্রাসী বাহিনী সুকৌশলে ভারত ভূখণ্ডেই নিজেদের শক্ত ঘাঁটি করতে সচেষ্ট। এদের অদ্ভুত ভাষা, আশ্চর্য বলার কায়দা এবং অতি সাংঘাতিক বক্তব্য। বলতে বলতে বক্তা বলেই ফেললেন যে :

> "যারা আজ মালিক সেজে বসে আছে, তাদের ঘরে যে খুবসুরত আওরতরা রয়েছে, যারা সেজেগুজে ভাল কাপড় জামা পরে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়, সেগুলোও তোমাদের সম্পত্তি। তিব্বত নেপাল ভূটানকে আজাদী দিয়ে যে মিত্ররা আসছেন, তাঁরা সর্বাগ্রে তোমাদের অধিকার দেবেন মালিকদের সেই আওরত গুলোকে ইচ্ছামত ব্যবহার করবার। তোমাদের আওরতরা খেটে খেটে যে টাকা বানিয়েছে সেই টাকায় ঐ আওরাতরা আরামে খেয়ে দেয়ে মোটর চড়ে বেড়িয়ে খবসুরত হোয়েছে। অতএব সেই সমস্ত সম্পত্তিও তোমাদের। মুক্তিফৌজের জন্য চাঁদা তোল, বেদম চাঁদা তোল,আর চাঁদার লাল রসিদখানি রেখে দাও। এসে পড়ল বলে মুক্তিফৌজ পৌঁছে গেছে বললেও হয়। কয়েকদিন পরে আর খেটে খেতে হবে না। হরদম গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়াবে, মালিকদের খুবসুরত লেড়কি একটি পাশে বসিয়ে নিয়ে ঘুরবে। কোনও চিন্তা নেই। চাঁদার রসিদখানি দেখালেই মুক্তিফৌজ তোমাদের মিত্র বলে চিনতে পারবে।"[১০৩]

এভাবে চিনারা গরীব ভারতীয়দের কাছে প্রিয় হতে চেয়েছে। মিটিং-এর সমস্ত খবর যশোদা জেনে নিয়েছে। এসব কাজ করতে গিয়ে যশোদা রাত-বিরেতে একলা চলে। তার যেকোন সময়ে বিপদ হোতে পারে যোগজীবন তাই আতঙ্কিত। তার আশঙ্কায় যশোদা হেসে উঠল। হাসিটা যোগজীবনের কানে খুব মিষ্টি লাগল না। হাসির কারণ বোঝাগেল পরে। যশোদা একটা সিটি বাজাতেই বিকট আওয়াজ উঠল খুবই কাছ থেকে। যোগজীবন বুঝল এই কুকুর দুটি সবসময় পাশেই ছিল। যশোদা বললে :

> "ওরা সঙ্গে না থাকলে কি রাত্রে বেরুতে পারি আমি! ওদের চোখ দিয়ে আমি

দেখি, ওদের কান দিয়ে শুনি। সব চেয়ে দামী অস্ত্র হচ্ছে ওদের নাক। ধারে কাছে কেউ থাকলে ওরা হাওয়ায় গন্ধ পেত। ওরা আছে বলেই তো।''[১০৪]

যোগজীবন বললে 'আমি কিন্তু একেবারেই টের পাইনি।' যশোদা বললে 'সেই টুকুই ওদের সত্যিকারের বাহাদুরি।'[১০৫] 'কৌশিকী কানাড়া' নানা ষড়যন্ত্র গোপন হিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা, জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা-নানা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করা ইত্যাদিতে পূর্ণ ।

শেষপর্যন্ত যশোদাও ধরা পড়ে। তবে তার পিসির মত তার দেহ নিয়ে সর্বহারারা ফূর্তি করতে পারেনি। নিজেই জলের গ্লাস দিয়ে একটিকে খুন করে আর যোগজীবনের হাতে মরে পাঁচটি। শেষ গুলিতে সে যশোদাকে মেরে তাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচায়। গল্পের শেষে ইঙ্গিত আছে রাধিকারমণ ধরা পড়েছেন বহু খুনের অপরাধে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছে কিন্তু তিনি ঘুমিয়েই কাটাচ্ছেন যেন মৃত্যু বিষয়টিকে আমল দিতেই তিনি রাজী নন।

এ উপন্যাসের শেষটি লক্ষণীয়। খুব সামান্য কথাতে রাধিকারমণের মনটি কী ধাতুতে গড়া তা চিনে নেওয়া যায় :

''জেলখানার গেটের দরজায় ঝুলছে মহাকালের কপাল। কপালে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। মহাকাল জেগে আছে। ফাঁসির আসামী ঘুমচ্ছে। মহাকালকে সে পরোয়া করে না। হতভাগ্য মহাকাল।''[১০৬]

---বোধহয় গীতার প্রসঙ্গ অবধূতকে প্রভাবিত করেছে। রাধিকারমণ মানব- দেহধারীর অন্ত রে যে আত্মার বাস---সেই অবিনশ্বর আত্মার পূর্ণ স্বরূপকে চিনেছেন। তাই দেহের পরিণতি নিয়ে তিনি ভাবিত নন। এই গীতার ধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলে ক্ষুদিরামেরও ফাঁসির আগে ওজন বেড়েছিল। মহান বিপ্লবীদের জীবন থেকেই আমরা শিখে যাই :

''বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নর-অপরানি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যানি সংজাতি নবানী দেহা ॥''

'আট. বিশ্বাসের বিষ' বা 'ফক্কড়তন্ত্রম': জীবনবৈচিত্র্য সন্ধান

'বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসটির প্রথম কাহিনিতে দীননাথকে কেন্দ্র করে তার এক মোহগ্রস্ত জীবনে আটকে পড়ার কাহিনি। একজন গুণিনের শিষ্যত্ব নিয়ে নিজেও সেই জীবনে দীননাথের চিরকালের জন্য আটকে পড়া ও শেষপর্যন্ত এই চক্রে শেষ হওয়ার নানা লোমহর্ষক কাহিনি। কিভাবে দেহব্যবসা আর গুণিনের গুণজ্ঞান এক হয়ে যায় তা আমরা জানতে পারি এ উপন্যাসে। এই প্রথম কাহিনিটিই 'ফক্কড়তন্ত্রম' [১০৭]নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ফ্লাশব্যাক রীতিতে লেখা খানিকটা রহস্যময়তায় ঘেরা উপন্যাস 'বিশ্বাসের বিষ'। উপন্যাসের ১৮ পৃষ্ঠায় লেখক জানাচ্ছেন :

ফক্কড়ধর্মের গোড়ার কথাই হচ্ছে, সর্বত্র সমভাবে অবস্থান করতে হবে। তা' না হয় করছি, কিন্তু দীনুদা' গুণিনপাড়ার গেরস্তবাড়িতে এসে জুটল কেমন করে! কবে এল! কি সূত্রে এল।

আর ঐ মেয়ে মৌরী-অমন একটা মেয়েই বা পেল কোথায়!'[১০৮]

গুণীন পাড়ার ইতিহাস জানা যায় মাস্টারদার কাছ থেকে। গুণিন পাড়া মানে বিগত চল্লিশ বছরের ইতিহাস খুন-জখম, সম্পত্তি ঠকিয়ে নেওয়া। অধিকাংশ সময়ে যা ঘটেছে তা হলে শত্রুতা করার জন্যে ভদ্রঘরের ভালো ছেলেটিকে ছলে বলে কৌশলে গুণিনপাড়ায় টেনে এনে তার মাথা খাওয়া। এর বাইরে হাজার রকম স্বার্থসিদ্ধির জন্যে গুণিনপাড়া টিঁকে আছে। কথকের শুনতে শুনতে মনে হোল, গুণিনপাড়াটা হচ্ছে হাইকোর্টের এটর্নি পাড়া,সব রকম মামলার শেষ হয় গুণিনপাড়ায়। মাস্টারদার মুখেই জানা গেল যে ধম্ম গয়লার ধম্মবোনই এ পাড়ায় সর্বপ্রথম গেরস্তবাড়ি লেখা টিন দরজার মাথায় সেঁটে দেন। বাইরে এই ছদ্মবেশের আড়ালে চলে দেহ ব্যবসায়। এ ব্যবসার রমরমা দেখে একই কাজের জন্য একই রকম বিজ্ঞাপন দরজায় লটকায় জটাধারী জেলে পরিবার। সর্বশেষে আসে কোহিনূর। এখন গুণিন পাড়ার দোর গোড়া থেকে গেরস্তবাড়ির শুরু। 'দোর গোড়া' মানে স্টেশন থেকে গুণিন পাড়ায় আসার পথের শুরু কে বোঝানো হচ্ছে। কেননা কোহিনূরের বাড়ি একেবারে গুণিনপাড়ার শুরুতেই। শৌখিন মানুষ ছিল কোহিনুর, এখন এই প্যাঁচোয়া ব্যবসা ধরেছে।

গেরস্ত বাড়ির সাথে ফক্কড় জীবনের যোগটাই এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনার প্রাথমিক লক্ষ্য। উপন্যাসটির শুরু হয়েছে এইভাবে :

> ''চির-বশীভূতা জননী মাটির ধরণী। ঘৃণা সন্দেহ করে না কখনও ফক্কড়কে। মাটির সন্তান ফক্কড়। মাটির বুকে ঘুরে বেড়ায় চিরকাল ঘোরা শেষ হলে মাটির বুকেই লুটিয়ে পড়ে একদিন।''[১০৯]

---আত্ম জীবনের একাকীত্বের যন্ত্রণা এখানে অপ্রকাশিত থাকে না। অবধূতের লেখা তার জীবনাভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া বলেই তিনি বলতে পারেন 'ঘোরার শেষ কিন্তু আজও হলো না। তাই কাহিনীরও শেষ নেই। দাঁড়িটি কোনখানে টানলে মোক্ষম টানা হবে, আজও ঠিক করতে পারলাম না।'

দার্শনিকতা

'ফক্কড়তন্ত্রম্ যেন এক আদি-অন্তহীন শাস্ত্র। যাঁরা ঘর বাঁধেন তাঁদের শুরু আছে। ঘরে মরলেই শেষ বোঝা যায়। মৃত্যুর পরে আর নেই শুরু করার মত। ফক্কড় জীবনে সে-সব বালাই নেই। অবধূত ফক্কড়তন্ত্রের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন :

> ''মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ার দিনটি সশরীরে সমুপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমার এই ফক্কড়-জীবনের জের মিটবে না। ফক্কড়তন্ত্রম চলতেই থাকবে।''[১১০]

এ উপন্যাসের প্রথম পৃষ্ঠায় দীননাথ গুণিনের একটি চিঠির উল্লেখ আছে। লেখক কথক কালীও একদা দীননাথের সঙ্গী ছিল। এখন পাল্টে গেছে সব পরিচয়। কালীর পরিবর্তিত লেখক সত্তার অন্তরালে ফক্কড় মানুষটি এখনও বেঁচে আছে-এই বিশ্বাস আজও দীননাথ করে। এখানে বাঁচা মরার প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় 'নীললোহিত'[১১১]-র কথা। এখানে লেখক বক্তব্যকে স্পষ্ট

করেছেন :

> "দীনুদা ডেকেছে সেই ফক্কড়টিকে ...একদা মাটি-মায়ের সন্তান পরিচয় ছিল আমাদের দু'জনের একমাত্র পরিচয়। তাই সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল,এক মায়ের সন্তানদের ভেতর যে সম্বন্ধ থাকে। সেই সম্বন্ধের ফাঁস থেকে মাথা গলিয়ে পালিয়ে এসে আর একটা পরিচয়ের আড়ালে[১১২] ... পড়ে রইল কাগজ কলম জামা জুতো দাঁত মাজার বুরুশ। বেঁচে থাকার সাড়ে নিরেনব্বই প্রস্থ উপাচারের নটখটি গুছিয়ে দেবার জন্যে কোমরে আঁচল বেঁধে কাউকে ছুটে বেড়াতে হোল না। চুপি চুপি একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে পথে নামলাম।"[১১৩]

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে সওয়া পাঁচটার আগেই ধোঁয়ার মাথায় কুয়াশা চেপে বসেছে। সময়টা বোঝা যায় শীতকাল। বলা হয়েছে যে দীনুদার চিঠিতে খুব ভালো করে পথ নির্দেশ দেওয়া আছে।

> "স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডান দিকের রাস্তায় আধ মাইল আসলে বাজার। বাজারের পশ্চিমে গুণিনপাড়া। রিক্‌শাওয়ালাকে বলতে হবে, সিদ্ধেশ্বর গুণিনের বাড়িতে নিয়ে চল।সব রিক্‌শাওয়ালা বাড়ি চেনে, ঠিক নিয়ে আসবে।"[১১৪]

---এসব কথা কোনো কাজে এলো না। শীতকালে রাত সাড়ে এগারোটার সময় কোথায় রিক্‌শা? 'সুতরাং এক দুই করে একশ' পর্যন্ত গুণলেন কথক তথা কালি তার পায়ের দিকে তাকিয়ে। ক্রমেই চোখ পরিষ্কার হোয়ে উঠল, নিজের পা দেখা যেতে লাগল। পায়ের সামনেই পথের দাগ, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হাত চারেক সামনে পর্যন্ত। অতঃপর আর পায় কে, পা চালালেন। ফক্কড় জীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগলো।

> "বহু বছর যে চক্ষুদুটো ফক্কড়কে অন্ধকারে পথ দেখিয়েছে, তারা এখনও বিশেষরকম বিশ্বস্ত রয়েছে। বরং বলা চলে, অনেকদিন পরে অন্ধকারে শিকার খোঁজবার সুযোগ পেয়ে হন্যে কুকুরের মত মুখিয়ে উঠেছে।"[১১৫]

খুঁটিনাটি বর্ণনা লেখকের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে--স্বাভাবিকভাবেই এ উপন্যাস পাঠকের বিশ্বস্ততা অর্জনে সমর্থ। ফক্কড়ের জীবন যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি স্বাধীন। নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া উপন্যাস লেখা অসম্ভব।

এ উপন্যাসে যেন পাঠক চোখের সামনে নাটকের অভিনয় হতে দেখছেন। 'আধ ঘন্টা সময় আর কতটুকু, সে আন্দাজ ছিল। আন্দাজ বহু পেছনে পড়ে রইল, তখনও হাঁটছি। কোথায়ই বা বাজার, কোথায়ই বা দোকান। দু'পাশে শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, ঘর বাড়ি গাছপালা কোথাও কিছুর চিহ্নমাত্র নেই। কি ফ্যাসাদ রে বাপু! সারারাত হাঁটলে ফের যে নৈহাটী পৌঁছে যাবেন -এ বিষয়ে সন্দেহ রইলো না। অর্থাৎ কথককে বহুপথ হাঁটতে হলো। এমন সময় তিনি দেখলেন যে তাঁকে নৈহাটি আর পৌছাতেহোল না। হঠাৎ একেবারে ঘাড়ের কাছে এক হুঙ্কার -'কে তুই?' তখন তড়াক করে মারলেন এক লাফ। সেই মুহূর্তে কানে গেল -'ধনা, ধর -ধর শালাকে!' ---এরা গ্রাম রক্ষীবাহিনী। গুণিনপাড়ায় এত রাতে

যাওয়া ঠিক নয় কেন সেটা জানা গেল পরে। অন্ধকারে দুজনের কথা শোনা গেলো। কথকের আড়ালে[১১৬] অবধূতের যেন মনে হোল বুড়ো মানুষের গলা, মেয়েও হতে পারে আবার পুরুষও হোতে পারে। বলা হোল কারা দুজনে কথা বলছে। কোনও এক মৌরীর ঘরে লোক আছে তাই তাকে এখন চলে যেতে বলছে অন্যজন। বেলা থাকেতে এসে সে যেন পরে দেখা করে যায়।

এই পাড়াতেই যে গুণিন দীনুদা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই আর কথকের---এটা বোঝানোর জন্য অবধূত পরিবেশ আর সংলাপের সাহায্য নিয়েছেন। ধম্ম গয়লার ধম্ম বোনটির কাছে শোনা গেল যে বাঁ দিকে একেবারে কোণের ঘরে 'সে মড়া' ধুঁকছে আজ তিন বছর ধরে। আর মেয়ের রোজগার গিলে বেঁচে রয়েছে। সতর্ক করে বললেন যেন আগন্তুক আবার অন্য দরজা ঠেলে না বসেন। এখন এই শেষ রাতে অন্য কারো দরজা ঠেললে রক্ষে থাকবে না! ধম্ম বোনের কথায় 'রাত পুয়োলেই মুখের আগল খুলে গাল পাড়তে থাকবে ভাড়াটে।' অবশ্য সে সাফাই গায়। তার বক্তব্য তার নিজের বাড়িতে 'হাঁড়াই-ডোমাই' নেই। পাঁচটা 'ভদ্দর নোক' আসে যায়। জানে কিনা সবাই এ বাড়িতে রাত কাটানোও যা, নিজের ঘরে রাত কাটানোও তাই। এটা হোল গেরস্তবাড়ি, এ বাড়ির দরজা ডিঙিয়ে কেউ রাত বিরেতে ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারে না। লেখক স্পষ্ট করে বলেন নি কিন্তু পাঠক যা বোঝার তা তার কথা থেকে বুঝে নিলেন।

তবু এক অদৃশ্য টানে তিনি এগোলেন। অবশেষে দেখা হলো 'দীনুদার' সাথে। তিনি বললেন যে কালীকে আনার জন্য তাকে অনেক তোড়জোড় করতে হোল। গুণগান শিখে নেবে ব'লে একটা ছোকরা মাঝে মাঝে আসে এ বাড়িতে। সেই ছোকরাকে দিয়ে তাকে চিঠি দেওয়া গেল। তাকে বলেছিল, কালীও অনেক জ্ঞানগুণ জানে তাই তাকে চিঠি লিখতে সে রাজী হোল। কিন্তু চিঠি পেয়েই সে যে এসে পড়বে,এমন সৌভাগ্য সে কল্পনাও করতে পারেনি। এখন দীনুদা মিনতি করে : 'এখান থেকে জ্যান্ত থাকতে বার করে নিয়ে চল ভাই আমাকে। এখানে কিছুতেই মরতে দিসনি।'[১১৭]

বিচিত্র চরিত্র

গুণিন পাড়া আসলে নানা চরিত্রের যাতায়াতে সরগরম। এখানে যারা আসে না এলে তাদের চলে না। তাদের প্রয়োজন আগে আলাদা থাকলেও এখন তারা খাঁচায় আফিং খাওয়া পাখি। গুণিন পাড়ার নতুন পরিচয় শুরু হয়েছে ধম্মগোয়ালার বোনকে দিয়ে। যেভাবে কথক বা কালী দেখেছেন তাতে অবধূতের চরিত্র নির্মাণের ক্ষমতাকে প্রশংসা না করে পারা যায়না। ধম্ম গয়লার ধম্মবোনটি সাধারণ মানুষের পায়ের পাতার মত পুরু একখানি জিভ বার করে ফেললেন। জিভের বহর দেখেই কালি ভাবলেন তাঁর নিজের জিভ যেন শুকিয়ে গেল। জিভ খানি কে ভেতর টেনে নেবার সময় অদ্ভুত একটা আওয়াজ করলেন এই মহিলা। আওয়াজটা ঠিক হুলো বেড়ালের দুধ খাওয়ার মত---লোভী আর নির্লজ্জ মহিলার এমন ছবি বাংলাসাহিত্যে দুর্লভ। ছবির সাথে ধ্বনির ঘটলো মিলন---চক্ চক্ চক্ চক্ বার পাঁচ সাত আওয়াজটা হোল।

ধৈর্য বেশী ধরতে হোল না, আগন্তুক সাহিত্যিক কালী পেয়ে গেলেন ধীরুকে। ধীরু বললে, তার নাম শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ বসু রায়। সে এখানে নবীন। তার উদ্দেশ্য ঘুণগান শেখা। সে একদম শ্রী দিয়ে শুরু করে রায় পর্যন্ত বলে তবে থামল। কালী বললেন যে এখানে পৌছেই তার কথা তিনি শুনেছেন। তাতে লজ্জায় শ্রীধীরেন্দ্রনারয়ণ একটু বেশীরকম বেগুনী হোয়ে উঠল। খাটো শার্টখানাকে আরও খানিক সামনের দিকে নামাবার জন্যে দু'হাতে ধরে টানাটানি করতে করতে বললে -'আজ্ঞে, এমন আর কি লিখেছি! বাঙলা ভাষায় আপনাদের মত লোককে কিছু লিখতে গেলে বড্ড ভয় করে।' তখন অবধূত ওরফে কালী বললেন :

> ''তা' হলে হিন্দীতে লিখলে না কেন? আমাদের রাষ্ট্রভাষা ওটা, ও ভাষায় যা খুশি লেখা যায়। গালাগালিও যদি রাষ্ট্রভাষায় দাও, কোনও ভয় নেই। রাষ্ট্র তোমার পেছনে রয়েছে।''[১১৮]

---রসিক অবধূত স্বল্প পরিসরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেন। বিশ্বাস করার শক্তি তার এমন যে কোন কিছুতেই সে পিছপা হয়না। তার বিশ্বাস করার শক্তি অপরিসীম--- সে দীননাথকে গুরু মানে। সিদ্ধেশ্বর গুণিনের সে শিষ্য যে! এই সিদ্ধেশ্বর গুণিন নাকি এই বাড়ি থেকে বেরতেনই না কখনও। যা করার এই বাড়িতে বসেই করতেন। খুন খারাপি করত তাঁর পুতুলে। এবার অবাক হওয়ার পালা। কালী ভাবছেন কী করে এই ছেলেটি বিশ্বাস করে এ কথা! সিদ্ধেশ্বর নাকি মাটির পুতুল নিজে গড়তেন।

> ''ছটা দ্রব্য থাকত তাতে। কাল পেঁচার খুলি, বেজির লোম, কেউটের খোলস, বনবেড়ালের হাত, পাতিশেয়ালের নখ আর বামুনের সধবা পোড়া ছাই, -এই ছ' রকমের জিনিস ধোপার ভাঁটিতে গাধার দুধে ফোটালে যে ক্ষীর হবে, সেই ক্ষীরের পুতুল বানাতেন।সেই পুতুলকে ছুঁচোর রক্তে স্নান করিয়ে দেশদেশান্তরে চালান দিতেন বাড়িতে বসেই। যথাস্থানে গিয়ে যথাকর্তব্য সম্পাদন করে পুতুল আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরত।''[১১৯]

মা কামাক্ষার সাক্ষাৎ কোলের সন্তান ছিলেন কিনা গুণিন, কে তাঁকে ঠেকাবে? ---এই ছিল ধীরুর বিশ্বাস। বলে দু'চক্ষু বুজে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো ধীরু। কালী দেখলেন যে তার মুখ খানিতে একটি অপার্থিব আভা ফুটে উঠল। অকপট বিশ্বাস দিয়ে গড়া খাঁটি মনের কায়িক অভিব্যক্তি। সে বস্তুর সামনে বেহদ্দ বাচালের ও বাকরোধ হোয়ে যায়। সিদ্ধেশ্বর গুণিনের শিরদাঁড়া আর হাড় ভেঙেছিল কীভাবে- সে কথাও ধীরু বলেছে একান্ত বিশ্বাস নিয়ে। সে বছর নাকি দেশে আকাল লেগেছিল, আর তার ঢেউ গুণিন পাড়াতেও এসে পৌঁছেছিল। ঘরে ঘরে হাহাকার, বগলাচণ্ডীর তলায় সন্ধ্যেদীপ পর্যন্ত জ্বলে না। সিদ্ধেশ্বরের কাছে তখন এল এক ডাক সেই পুব দেশ থেকে। তারা সে দেশে মস্ত বড়লোক। তাদের খান দশ-বিশ চা-বাগান আছে। তাদের মালিক এক সেন বাবু। তাদের বংশের একমাত্র বংশধর মরতে বসেছে। ডাক্তার বদ্যি ফেল মেরে গিয়েছে, তাবিজ কবচ হোম যজ্ঞ শান্তি-স্বস্তেন সব সমাপ্ত হয়ে হোয়ে গেছে, বাকী শুধু তুকতাক আর গুণ-জ্ঞান। বংশধরের বাপ জেঠার পিসী স্বয়ং

এসে উপস্থিত হোলেন। নৌকা বোঝাই করে টাকা এনেছিলেন তিনি, সে টাকায় গুণিন পাড়ার ঘরে ঘরে আবার উনুন জ্বলে উঠল। অসময়ে মোষ পড়ল বগলাচণ্ডীর সামনে। খুব ঘটা করে মায়ের পূজো হলো। সিদ্ধেশ্বর গুণিন পুতুল চাললেন। সেই চা-বাগানের পিসীকে বলে দিলেন :

> "একজন অনিষ্ট করছিল। ঐ বংশধরটি মারা গেলে তার পথের কাঁটা সরে। সেই চেষ্টাই করছিল সে, কাটান হোয়ে গেল। এইবার ছেলে বাঁচবে। যাও, বাড়ি গিয়ে বগলাচণ্ডীর ফোঁটা ছেলের কপালে লাগাওগে।"[১২০]

---এখানে অবধূত সাধারণ মানুষের মন্ত্রশক্তিতে কেমন অন্ধবিশ্বাস কাজ করে তা দেখিয়েছেন। একটি যুবক এই শক্তিকে আয়ত্ত্ব করবার জন্য পড়ে আছে নিষিদ্ধপল্লীতে। এ উপন্যাসে আরও একটি কাহিনি শুনিয়েছেন অবধূত। তা হলো খড়ম পাদুকা।

অন্ত্যজ সমাজ ও মৌরীঃ

মৌরী বলে তার বাবার নামে এখনও বিস্তর টাকা পাওয়া যায়। গুণিনপাড়ার গুণজ্ঞান এখন সবই ঐ বাবার কাছে,এখানকার লোকের এই বিশ্বাস। তার বাবা গেলে গুণজ্ঞানে বিশ্বাসটাও যাবে। তখন এ পাড়ার কোন জারিজুরি থাকবে না। এ হেন মৌরীর চরিত্র নির্মাণের প্রধান সার্থকতা তার সরলতায়। এত ক্ষমতাবান দীনুদার কষ্টকর মৃত্যু ছিল নিয়তি । বিনা চিকিৎসায় দীনুদার মরতে বসার কারণ ব্যাখ্যা করেছে মৌরী সেই সরল বিশ্বাস থেকে। সে মনে করে ওরা ওভাবেই মরে। লোক ঠকাতে ঠকাতে একদিন অরুচি ধরে যায় ঠকানো ব্যবসার ওপর। সেই সঙ্গে মনের সামনে এসে খাড়া হয় সারা জীবনের অন্যায়কর্মের ফলগুলো। মৌরী বিশ্বাস করে গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়েমানুষরা যে গুণিনপাড়ায় নরকে পচছে তার মূলে ঐ গুণ-জ্ঞান আর তুক-তাক। ব্যবসাটার রমরমা হওয়ার কারণ আছে। কেউ কোথাও কারও সঙ্গে গোলমাল বাধালে হয় এ পক্ষ নয় ও পক্ষ ছুটে আসে গুণিন পাড়ায় তুক-তাক করবার জন্যে। মৌরী বললো :

> "...এসে বললে, মনের মানুষকে পাইয়ে দাও, যা নেবে নাও। গাড়ুলে বুদ্ধি আর কাকে বলে ! একবারও ভাবলে না যে গুণিন যদি জ্ঞান গুণ কিছু জানেই, তা'হলে তোর মাথাটাই আগে খাবে। তোকে আগে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলবে যে তুই আর জীবনে গুণিন-পাড়ার গণ্ডি ছাড়াতে পারবিনে। পারেও না, তারপর তার মনের মানুষকে এনে তোলে এই পাড়ায়। ঘর ত' খালি আছেই। ঢুকল খোপে পায়রা, করুক না বকবকম্ জীবনভোর। মড়াদের নিয়ে জীবনভোর সুখে থাক। গুণিনপাড়ার জয়-জয়কার!"[১২১]

অবধূত জানতেন এইসব গুণজ্ঞান টিঁকে থাকে মানুষের অন্ধবিশ্বাস আর অশিক্ষার গভীরে। এখানে তা সার্থকভাবে রূপায়িত। মৌরীর কথায় পাঠক তার মর্ম পর্যন্ত যেন স্পষ্ট দেখতে পান---এখানেই এই চরিত্রটির নির্মাণ-সার্থকতা!

কালীকে নিজের কাকার মত ভেবে মৌরীর নিজের জীবনের কথা জানায়। সে বলে যে সিদ্ধেশ্বর গুণিনের সব থেকে বড় সাগরেদ ছিল তার বাবা। ব্যবসা চলছিল খুব ভালোই, বাদ সাধলে মৌরীর মা। মৌরীর বয়েস তখন পাঁচ ছ' বছর হবে। তাদের গ্রামে জরিপ এল। জরিপের হাকিম বাবু এই গুণিনপাড়া থেকে গুণ-জ্ঞান করিয়ে মৌরীর মাকে এখানে তুললেন। মৌরীর বাপ মরেছিল যখন সে আঁতুর ঘরে। পাঁচ বছর মা তার মামাদের কাছে ছিলেন। ছিলেন মানে বিনা পয়সায় দাসী বাঁদী হোয়ে ছিলেন। মৌরীর কথায় :

> ''জরিপের হাকিম নিয়ে এল আমাদের, কিন্তু সে লোকটার কপালই মন্দ। তার মাথা খারাপ হোয়ে গেল। তখন এই দীননাথ গুণিন মাকে কি এক অদ্ভুত মতে বিয়ে করলেন। এখানকার সবাই জানে মৌরীর মা মারা গেছেন কিন্তু তাও সত্য নয়। ঐ যে ছোঁড়া ধীরু, ওর কাকা তাকে নিয়ে গেছে। মৌরী শুনেছে,কালীঘাটে না চেতলায় দোতলা বাড়ি কিনে দিয়েছে। বড় মানুষ সে, বড় মানুষের সঙ্গে কি পারবার জো আছে?''[১২২]

---ঔপন্যাসিক ব্যক্তি পরিচয়ে আগ্রহী নন তাই অনেক পরে ৩৭ পৃষ্ঠায় জানা যায় মৌরীর মাকে প্রথম যিনি নিয়ে এসেছিলেন,সেই হাকিমের নাম ছিল হিমাংশু হালদার। যেকোনো নাম হতে পারত। আসলে এই শ্রেণিটার পরিচয়ই এখানে বড় কথা নাম নয়। জানা গেল কথকের নাম কালী। 'বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসে কালী ওরফে লেখক দীনদার সাথেই থাকতেন।

> ''হাত দিয়ে খলটা ঠেলে সরিয়ে দীনুদা' জিজ্ঞাসা করলে -'কালী, মরে যাবার পরে মানুষের কি দশা হয় বলতে পারিস?''[১২৩]

---কে এই কালী? আমাদের মনে হয় ইনি স্বয়ং কালিকানন্দ অবধূত। এইভাবে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রেই ঘটেছে লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ। এঁর সাথে দীনুদার বহু কথা হয়। দীনুদা বলছেন :

> ''ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় জানিস কালী?' বোঝাতে লাগল দীনুদা' ---যে লোকটা বেঁচে থাকতে ভয়ানক মদ খেত, মরার পরে সে শুঁড়িখানায় পড়ে থাকে। ...দেহহীন মাতাল দিবারাত্র অষ্টপ্রহর পড়ে আছে শুঁড়িখানায়, শুকছে মদের গন্ধ, বোতলগুলোকে ছুঁতে পারছে। পয়সাও লাগবে না তখন, যত খুশি গলায় ঢাললেই পারে। ঢালবে কোথায়, গলা নেই। ঢালবার আধারটি গেছে।''[১২৪]

দীনুদা বিশ্বাস করে মানুষের আত্মা মরে না। দীনুদা জীবনের অনেকটা সময় বেশ্যাখানায় থেকেছে। এইসব জায়গার অভিজ্ঞতা তাই তাঁর কোনো অংশে কম নয়। কালীকে তার অনুভূতির কথা শুনিয়েছে এইভাবে :

> ''শুড়িখানায় বেশ্যালয়ে নাকি প্রেত কিলবিল করে। জ্যান্ত মানুষ এই সব জায়গায় গেলে তাদের ওপরেও খানিকটা প্রেতের প্রভাব পড়ে। তা ছাড়া সব থেকে বড় ব্যাপার হোল, প্রেতসিদ্ধ করবার জন্যে শ্মশানে বসে সাধনা করলে যত তাড়াড়াড়ি ফল পাওয়া যায়, তার চেয়ে ঢের তাড়াতাড়ি কার্য উদ্ধার হয় বেশ্যালয়ে

> বা শুঁড়িখানায় গিয়ে সাধনা করলে। প্রেতেদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা খুবই সহজ গুণিনপাড়ায়। গুণিনপাড়ায় যাবতীয় গুণজ্ঞান সবই ঐ প্রেতেরা করে। গুণিনের হুকুম মেনে চলে প্রেত, যে গুণিন খুব ক্ষমতাশালী তার বশে অনেক জাতের অনেকগুলো প্রেত থাকে।"[১২৫]

ঔপন্যাসিক দৃষ্টির এই অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ আলোচ্য উপন্যাসে সার্থকতার সাথে স্থান পেয়েছে। গুণিনপাড়ার মুরুব্বীগণ সকলেই বড় মানুষ। এঁরা নানাভাবে দুর্বল মনের মানুষ । আমরা সেই স্বতন্ত্র বিষয়টি বাদ দিয়ে বলবো এরা বাবু সম্প্রদায়ের লোক। এঁদের সবার থেকে বড় মানুষ হলেন ও পাড়ার 'মাষ্টারদা'। ইনি সোনালী রঙের চামড়ার জুতো পায়ে দেন। জুতোর নাম নাকি সেলিম সু। মাস্টারদার বিশেষত্ব সর্বাঙ্গে।সেই জুতোর গায়ে লুটিয়ে থাকে গিলে করা কোঁচার ফুলটি। ধুতির ওপর সিল্কের শার্ট, শার্টের রঙ ফিকে কমলা। কমলা রঙের ওপর ছোট ছোট চৌকো খোপ তৈরী হয়েছে কালো লাইন দিয়ে।

সহজেই চোখে পড়ে যে জিনিসটা তা হলো শার্টের হাতা হোল ডবল করা, তাতে সোনার বেতাম লাগানো। বোতামের ওপর লাল অক্ষরে নিজের নাম বাঙলায় মিনে করা আছে- 'মাস্টারদা'। ইনি গলাতেও সোনার বোতাম পরেন। তাতে সবুজ রঙে লেখা আছে ইংরাজি এম্ অক্ষরটি। সিল্কের শার্টের ওপর চাপানো থাকে কোট, কোটও সিল্কজাতীয় কাপড়ের। কোটের রঙ ফিকে বাদামী। কোট শার্ট ধুতি জুতো এবং একগাছি খুব সরু কালো ছড়ি, এই সব আসবাবপত্র সহ বিশেষত্ব মণ্ডিত মাষ্টারদা গুণিনপাড়ায় হারমোনিয়াম বাজান আর গান করেন। মানে অনেককে তিনি গান-বাজনা শেখান। প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে তিনি একখানি গান নিজে রপ্ত করে ফেলেছিলেন, সেই গানের গোড়ার লাইন দুটি হোল---

> "বাঁধ না তরীখানি আমারও নদীকূলে।
> একা যে দাঁড়ায়ে আছি লহ না আমারে তুলে।'---এই লাইন দুটি মাত্র শোনান মাস্টারদা তাঁর ছাত্রীদের। ওই দুই লাইন 'সড়গড় হোয়ে গেলেই ছাত্রী লায়েক হোয়ে পড়ে।' তখন আর মাস্টারদাকে শেখাতে হয় না ছাত্রীই মাস্টারকে শেখাতে শুরু করে।"[১২৬]

---লেখকের টিপ্পনী লক্ষ্যণীয় মৌরী আর মাস্টারদার পারস্পরিক কথা-বার্তায় সেখানকার পরিবেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'বিশ্বাসের বিষ' নামকরণের সার্থকতা বোঝা যায়। মৌরী আবার চলতে শুরু করলো মাস্টারদাকে লক্ষ করে সে বলতে বলতে গেল :

> 'দিস্ মন্থ দশ মাস ধরে চলছে। জোঁক-রক্তচোষা...।'[১২৭]

---আসলে মৌরীর কাছ থেকে সে ধার করেছে-এই মাসে (দিস্ মন্থ) দেবে বলাটা তার কথার কথা। ধারের পরিমাণ পনের টাকা কিন্তু অনেকদিন ধরে সে দিয়েছে আট টাকা- মৌরী জানিয়ে দেয় যে এখনো সাত টাকা সে পাবে। তবে তার মত কঞ্জুষের কাছে সে আর

তা চায় না কেননা সে টাকা আদায় করতে তার সারা জীবন লেগে যাবে। ---পরিবেশ গুণে মানুষ বদলায় মাস্টারদাও কম যায় না। সেখানকার পরিবেশ বাঁচার তীব্র লড়াইয়ে রসকষহীন-তাই মৌরীকে ঠকাতেও তার বিবেক-দংশন হয়না। এ উপন্যাসে লেখক দেখালেন 'গেরস্ত বাড়ি'-এই নামের আড়ালে দেহ ব্যবসার কারবার চালানো হয়। লেখক উপন্যাসের বিষয় এবং পাত্র-পাত্রীর মুখে লাগসই ভাষার ব্যবহার করেছেন।

> "ধম্ম গয়লার ধম্ম বোনের গেরস্তবাড়িতে মণিমালাই হচ্ছে সব থেকে পয়মন্ত ভাড়াটে। ওর দৌলতে তিনটে আড়ত আর দুটো ধান কলের মালিক আশি বছরের কুণ্ডু মশাই ও বাড়ির মুরুব্বী হোয়েছেন।"[১২৮]

সরস রসিকতা

'সরকার সর্বজাতের কুটির শিল্পকে প্রাণপণে সাহায্যদান করেন, শুধু ঐ একটি ছাড়া। ঘরে ঘরে টাকা তৈরীর কারখানা গড়ে উঠুক, এটা তাঁরা চান না। টাকার কারবারটিকে ওঁরা একেবারে একচেটিয়া করে রাখতে চান। ফলে সেই সরকারী টাকাকে নানা রকমের বেসরকারী পথ অতিক্রম করে লোকের ঘরে আসতে হয়।'[১২৯] দেহব্যবসার পথে নারী অর্থকষ্টেই পা বাড়ান---এই কথাটাই রসিকতার মোড়কে পরিবেশন করলেন। মৌরী বাধ্য হয়ে এসেছে---এই ভাবটি এখানে সঞ্চরিত হলো। সমাজের রূপ সর্বত্র এক নয় এখানে লেখক তাঁদের স্বভাব ব্যাখ্যা করেছেন। জনতা চরিত্র যাতে নিজের সুনাম হয় সেদিকে এগিয়ে যায়। আর কোনো অবলম্বন পেলে তাকে অনুসরণ করে---গুণিন পাড়ায় সেটাই হয়েছে :

- 'উঠে পড়ে লেগে গেলেন গুণিন পাড়ার মুরুব্বীগণ। লাগবেন-ই, এটা ত' প্রমাণ হওয়া আবশ্যক যে গুণিনপাড়াটা মুরুব্বীবিহীন পাড়া নয়। সত্যিই তা' নয়। বরং বলা উচিত, ও পাড়ার মুরুব্বীর সংখ্যা কত তার হিসাব রাখাও দু:সাধ্য।'[১৩০]
- "যখন জানতে পারলেন সকলে যে ছাপানো বইতে মলাটের ওপর যার নাম ছাপা হয়, এমন দরের একটা লোক গুণিন পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছে, তখন তাঁদের চক্ষুলজ্জার বালাইটুকু ঘুচে গেল। অপ্রকাশ্যে অথচ তাবৎ জীবের জ্ঞাতসারে গুণিনপাড়ায় ঢোকার বেফয়দা কারসাজি টুকু আর করতে হোল না। সবাই সোৎসাহে এসে যথেষ্ট শোরগোল তুলে দীনুদার শেষকৃত্যে আত্মনিয়োগ করলেন।"[১৩১]

নয়. উপন্যাস-কল্প রচনা : বিশ্বাসঘাতিনী নারী ও বিকৃতকামা পুরুষ

পিয়ারী দুটি বড় গল্পের সংকলন। প্রথম গল্পের নামেই গন্থের নামকরণ করেছেন লেখক ---'পিয়ারী' অন্য বড় গল্পটির নাম 'দাবানল'---'পিয়ারী'৭৯ পৃষ্ঠার উপন্যাস-কল্প রচনা। একে

বড় গল্পও বলা যেতে পারে। তবে এতে ঔপন্যাসিক-সুলভ বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট রেখায় আঁকা হোয়েছে তাই উপন্যাস-কল্প রচনা বলাই সঙ্গত। গল্পের কথক একজন মোহান্ত তিনি এ কাহিনির চরিত্রও । ইনি নায়কের গুরুদেব। এঁর মুখ থেকে অবধূত গুরু-সম্প্রদায়ের কু-কীর্তিকে পাঠকের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি শান্তি প্রিয় একজন সাধারণ সাধু। তিনি অপ্রয়োজনীয় কারো প্রতি বিশেষ মনোযোগী নন। সমাজে অনেক অনাচার হয়ে থাকে । গা বঁচিয়ে নিজের কাজে মগ্ন থেকে শান্তিতে থাকতে চান তিনি। তাঁর শিষ্য জগমোহন আবার এর উল্টো। সে অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করে। তার গুরুর প্রতি ভক্তি অচলা তবে ন্যায়বোধ আর প্রতিবাদের সাহস তার প্রবল। গুরুদেব তাকে বিশেষ স্নেহ করেন।

শিষ্যের সাহস ও শক্তির একত্র সমাবেশে প্রতিবাদ বড় তীব্র আকার ধারণ করে। পাঠক দেখলেন যে উজ্জয়িনীতে একজন বড় সাধু মহারাজ এসেছিলেন তাঁর খুব নামডাক। আড়ম্বরে আর বাকচাতুর্য দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস আর ভয় জাগাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর প্রচুর শিষ্য। ভিড় দেখে সাধারণ মানুষের মনে ভক্তি জাগে আর সেই সুযোগের অসদ্ব্যবহার করে ভণ্ড সাধুরা। দর্শনার্থীদের মধ্যে এক অসাধারণ সুন্দরী এলেন। তাঁকে দেখে শ্রী চরণে আশ্রয় দেওয়ার বাসনা জাগলো ঐ মহারাজের। ইনি হঠযোগ করতেন। জগমোহন তাঁর অভিসন্ধি বুঝে ফেললেন। গুরুকে সবিস্তারে বলেই মেয়েটিকে উদ্ধার করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করলেন। গুরুদেব তাঁর শিষ্যের বিপদের কথা আঁচ করতে পেরে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। জগমোহন শোনার পাত্র নয়। সে একাই অদম্য সাহসের সাথে ভণ্ড সাধুর তাঁবুতে হানা দিয়ে তাঁর নাক কেটে নিয়ে এলেন। ভণ্ড সাধুকে পাপের দণ্ড দিতে জগমোহন এতটুকু বিলম্ব করলো না।

হঠকারিতা জগমোহনের চরিত্রবৈশিষ্ট। মনে তার ভক্তির অভাব নেই কিন্তু পরের বিপদে গা বাঁচিয়ে চলার মানসিকতাকে সে কিছুতেই আয়ত্ত্ব করতে পারে না। গুরু তাকে বোঝান যে মায়াময় সংসারের বাঁধন কেটে সন্ন্যাসীরা বেরিয়ে আসেন। তুচ্ছ সুখ-দুঃখের মধ্যে সাধুরা নিজেকে কেন জড়াবেন? তাতেও কোনো ফল হলো না। জগমোহন শ্রী ক্ষেত্রে আগুন লাগা নুলিয়া পল্লীতে এক শিশুকে উদ্ধার করতে গিয়ে বিপদে পড়লো। নিজে কালিঝুলি তো মাখলো এবং আগুনের ছ্যাঁকাও খেল। তারপর পড়লো শিশু কন্যা চুরির দায়ে। কোনোরকমে সে যাত্রা সে উদ্ধার পেল।

গুরুর একটাই ভয় এমন বিশ্বস্ত সেবাপরায়ণ শিষ্যকে এ বয়সে না হারাতে হয়। দ্বারভাঙ্গার এক জমিদার-মাতা তাকে দেখেন গঙ্গায় পুণ্যস্নানের সময়। তাঁর মনে হয় জগমোহন তাঁর হারানো নাতজামাই। তিনি তাঁর বিরহ-তাপিত নাতনীর জন্য ব্যাকুল হলেন। জগমোহনকে তার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য জোর করে বসলেন। শিষ্যের এ জাতীয় সৌভাগ্যে গুরুদেব ভিতরে ভিতরে প্রীত হলেন কিন্তু মুখে বললেন যে সাধুকে কেন বিষয়-বাসনার রাজ্যে নিয়ে যাওয়া! মুখে বিরক্তির বুলি আর ভিতরে নিশ্চিন্ততার আশা নিয়ে শিষ্যের সাথে হাতির পিঠে রওনা হলেন। বড়লোক শিষ্য হলে সাধুদের জীবনের অনিশ্চয়তা কেটে যায় সে আশা মনে নিয়ে

তিনি বাইরে তাঁবুতে আশ্রয় নিলেন। এলেন দ্বারভাঙ্গার রাজবাড়িতে।

এদিকে কুলটা রাজকন্যা স্বামীর আসায় খুশি হলেন না। ভালো করে না তাকিয়েই তার মুখে নিজের হাতে বিষের বাটি তুলে দিল। সে এই ভয় দেখালো যে জগমোহন যদি এ বিষ না খায় তবে সে নিজেই সে বিষ পান করে আত্মহত্যা করবে। উচ্চবংশীয়া কুলবধূর মান রক্ষার জন্য জগমোহন নিজেই বিষ খেয়ে গুরুর পা ছুঁয়ে হেলায় নিজের জীবন বিসর্জন দিল। পূর্বাপর বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এ উপন্যাসে হীন ষড়যন্ত্র কীভাবে তরুণ-তরুণীর জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়। আবেগের স্ফুরণে এবং গঠন বিন্যাসে এ কাহিনি সার্থক। আধ্যাত্মিকতার অভিমান, আরামের মোহ, আর ভক্তিভাব জাগানোর জন্য নানা বুজরুকি---কথকের শ্লেষে বিদ্ধ হয়ে উপন্যাসে সত্যর মুখরক্ষা করেছে। বিচিত্র চরিত্রের রূপায়ণ ও বিভিন্ন কাহিনির মধ্যে সংযোগ রক্ষা---এসব বিষয়ে লেখক অবধূত এ নভেলেটে নিঃসন্দেহে সার্থক।

'দাবানল': মুখোশের আড়ালে

> "ভদ্র, সংযত,উন্নত ভাবসাধনায় অভিনিবিষ্ট, জনসমাজে ধার্মিক বলিয়া অভিনন্দিত মানুষের যে ভয়াবহ স্বরূপ লেখক আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ধর্মাদর্শের অন্তরালবর্তী বস্তু-কঙ্কাল আমাদের মনে যুগপৎ ভীতি ও জুগুপ্সার সঞ্চার করে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অবধূতের ইহাই বিশিষ্ট সুর-সংযোজন।"[১৩২]

পণ্ডিত চর্তুভুজ ত্রিবেদী অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানী। ইনি সপরিবারে পূর্ব বাংলায় সাত পুরুষের বাস্তু ত্যাগ[১৩৩] করে এসেছেন বারানসীতে। নিজের পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে ইনি সংসার করার সময় পাননি। ভাই ভাই-বৌরাও তাঁর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা রাখেন। বাড়িতে এবং সমাজে তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তি! বাইরে এই মানুষটি এত শান্ত ও ভদ্র যে ভাবাই যায়না। উপন্যাসের পটভূমিতে যখন তাঁর মনের দেউলিয়া ভাব ধরা পড়ে তখন এঁর জীবন পরিণতি আমাদের শঙ্কিত করে। এ উপন্যাসে লেখক ঠাট্টার সুরে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বেদনার কথা জানিয়েছেন :

> "বিস্তর মানুষ দিবারাত্র অষ্টপ্রহর দরজায় দরজায় চেঁচাতে লাগল---একটু ফেন দাও গো মা। হাহাকারের জ্বালায় ইংরেজ আর এ দেশে তিষ্ঠোতে পারল না। বাঙ্লার পুব দিকটাকে মক্কা মদিনার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তল্পি গোটালে। ফলে শাস্ত্র মেনে চলবার আশায় রাশি রাশি গৃহস্থ পুব দিক ছেড়ে পশ্চিমে চলে এসে পথের ওপর আশ্রয় নিলে। শাস্ত্র যা করতে পারলে না পথ তাই করলে। পথ তাদের বেমালুম গ্রাস করে ফেলে ধর্ম নষ্টের দায় থেকে বাঁচালে।"[১৩৪]

---দেশছাড়া হওয়া শরণার্থী-সমস্যার কথা অবধূতের রচনায় ছায়া ফেলেছে। নেহেরু আইয়ুবখান চুক্তির ফলে এভাবে হিন্দু-মুসলমান জনগণের যে দেশবদল হয়েছিল অবধূত তা উল্লেখ করেছেন।

'দাবানল' গল্পের প্রধান চরিত্র চতুর্ভুজ ত্রিবেদী। পরিবারের সবাই তঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা

করে। তিনি একান্তভাবে আচার নিষ্ঠ, নিত্য বিগ্রহ পূজায় নিবিষ্টচিত্ত। এ হেন ব্যক্তির মনে গভীর কামনার কাল সাপ বাসা বেঁধেছে। তিনি বিকৃত কামনার শিকার। যৌন বুভুক্ষায় জর্জরিত। ধর্মসাধনার গভীরে তাঁর মনে এই যে বিকৃত যৌন কামনা বাসা বেঁধেছে তা তিনিই কি জানতেন? সাধারণভাবে ভুক্তভোগীরা জানেন সহস্র সংযমের আড়াল থেকে এই কামনার সরীসৃপ কীভাবে অতর্কিতভাবে এসে হাজির হয় আর জীবনের সবকিছুকে ধূলায় টেনে নামায়। অনেক সময় মানুষের গোপন মনের অন্তস্তল থেকে এই বিকৃত কামতৃষ্ণা প্রেরণা পেয়ে বেড়ে ওঠে। চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর অবদমিত প্রবৃত্তির শুখনো কাঠে এই আগুন যেন লেলিহান হয়ে উঠেছে। বোধহয় ভাইদের প্রতি কর্তব্য করার সময় নিজের মনকেই বুঝতে পারেন নি এই মানুষটি। মধ্য বয়স পর্যন্ত কৌমার্য রক্ষার কারণে ইন্দ্রিদ্বার নিরোধের অসহ্য গুমোটটাই ইন্দ্রিয় বিকার রূপে আত্মপ্রকাশ করলো!

অবধূত গল্পের বক্তব্যের সাথে নিসর্গ পরিবেশের একটা সহযোগী রূপ নির্মাণ করেছেন। বাড়ির পাশে গঙ্গাস্রোতে মৃত গলিত পশুর শব ভেসে যায়। বাড়ির ছাদে থাকে শকুনের দল। রূপক ব্যঞ্জনার সাথে ত্রিবেদীর আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে কামনা পঙ্কিল মনকে সংকেতিত করেছে।ত্রিবেদী নিজের মৃত্যুর পরে যে কাঠ লাগবে তার জোগাড় করে রেখেছেন। পবিত্র চন্দনকাঠ আর বেলকাঠে তাঁর একটি ঘর ভর্তি আছে। প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই কাঠেই লাগলো আগুন। তাঁর জীবন্ত দেহের চিতা-শয্যা রচনা করলো তাঁরই সংগৃহিত কাঠ! মুক্তার প্রতি হয়ত তাঁর আকর্ষণ অজ্ঞাতসারেই ঘটেছিল। পাশের ঘরে ভাই-ভাই বৌ-এর প্রেমের কথাবার্তা তাঁর কানে রোমান্টিক প্রেমের তৃষ্ণা হয়ত বা জাগিয়ে দিয়েছিল বলেই মুক্তার প্রতি তাঁর মন ধাবিত হয়!এক অদ্ভুত নেশায় যেন তিনি আবিষ্ট হয়ে রইলেন। তিনি প্রতিদিন রাত্রে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভরদ্বাজ ও ভরদ্বাজ-গিন্নির দাম্পত্য-সম্ভোগ লীলা দেখতেন। দেখে তৃপ্তি পেতেন। এই দরিদ্র দম্পতির ভরণ পোষণের দায়িত্বও নিয়েছিলেন নিজের পাপ ইচ্ছা চরিতার্থ করতেন আর ওপরে ভান করতেন পরোপকারের। একসময় ভরদ্বাজ গিন্নির করা অপমানের পর মুক্তার প্রতি ধাবিত হন। তাঁকে নিজের করে নেওয়ার কথা ভাবেন। কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে গেছে। মুক্তা এখন অন্যের বাগদত্তা। সমালোচক যথার্থই বলেছেন:

রাষ্ট্রবিপ্লবে[১৩৫] পণ্ডিত ত্রিবেদীর ঠিকানা-হীরামন হাভেলী : শকুনবাড়ি

নবাবী আমলের তৈরী হীরামন হাভেলীতে সপরিবারে উঠেছেন মহাজ্ঞানী চতুর্ভুজ ত্রিবেদী। হীরামন হাবেলীর ছাত বুক সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে দুহাত অন্তর একটি থাম, থামের মাথায় নিরেট গম্বুজ। প্রতিটি গম্বুজের মাঝখান থেকে এক হাত উঁচু লোহার শিক একটি খাড়া হয়ে রয়েছে। নবাবী আমলের শিক গুলোর সঙ্গে বোধ হয় নিশান বাঁধা হোত।

হাল আমলে এক একটি শকুন বসে থাকে প্রত্যেকটি শিক ঘেঁষে। বসে থাকে এমন ভাবে

যেন ওরাও চুন-বালির তৈরী, এতটুকু নড়ন-চড়ন নাস্তি। নজর কিন্তু ঠিক আছে, গঙ্গার এধারে ওধারে যত দূর দৃষ্টি পৌঁছয় ততদূর পাহারা দিচ্ছে। খাবার মত কিছু ভেসে যেতে দেখলেই একজন উড়ল। আকাশে একটা চক্কর দিয়ে পৌঁছে গেল ঠিক জায়গায়,ঝপ করে নেমে পড়ল খাবারের ওপর। তার পর টাল সামলে ঠিকঠাক হয়ে বসে মন দিলে খাওয়ায়, খেতে খেতে মহা আরামে ভেসে চলল।

আরামটুকু দশ হাতও এগাতে পেল না, একজনকে উড়তে দেখেই বাকি সবাই গলা উঁচিয়ে দেখে নিলে ব্যাপারটা। তারপর দল বেঁধে ঝাঁপ দিলে গঙ্গায়। গঙ্গার জলে কিন্তু পড়ল না, কয়েকহাত ওপর দিয়ে সোজা এগিয়ে গেল। ধরে ফেললে ঠিক তাকে, যে মহা আরামে ভেলায় চেপে খেতে খেতে চলেছে। তখন আরম্ভ হল ছোঁ মারা, ছোঁ মেরে এক খাবলা ঠোঁটে নিয়ে আকাশে ওঠে। সেটুকু শেষ হলে আবার ঝাঁপ দেয়। তখন আর কারো পক্ষেই আহার্যের ওপর বসে শান্তিতে খাওয়া সম্ভব নয়। এইভাবে ছোঁ দিতে দিতে খাদ্যের সঙ্গে উধাও হয়ে গেল সবাই, আকাশে জলে কোথাও এক প্রাণীর চিহ্ন নেই। ঘন্টাখানেক পরে একে একে সবাই ফিরে সে বসল ত্রিবেদীর ছাতে। উদর তখন পূর্ণ হয়ে গেছে।---বাংলা উপন্যাসে বা গল্পে শকুনের কথা এভাবে এসেছে কি-না তা নিশ্চয় ভাবববার বিষয়।

শকুনদের জন্যে ত্রিবেদীর কানাকড়ি খরচা নেই। তবে ছাত বোঝাই শকুনের জন্যেই বোধ হয় ঐ বাড়িতে চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর কাছে বিধান নেবার জন্যে যেত না কেউ। শকুনরা ত্রিবেদীদের পসার জমতে দিলে না। শকুনের সাথে চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর একটা তুলনার পরিবেশ লেখক খুব স্বাভাবিকতার মধ্যে রেখে গেছেন। ত্রিবেদীর নারী মাংস লোলুপতা আর শকুনের পচা মাংস খাওয়া প্রায় সমার্থক হ’য়ে গেছে।

শাস্ত্র-সম্মত চিন্তার কোনও কারণ সত্যি ছিল না -শকুনগুলোও নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের বংশ বৃদ্ধি করছিল। কলুষনাষিনী গঙ্গা ওদের সহায় ওদের ভাবনা নেই। এখন কীভাবে পূর্ব বঙ্গ থেকে এপার বাংলায় চর্তুভুজ ত্রিবেদী সপরিবারে চলে এলেন তার একটা ইতিহাস আছে। অবধূত ১৯৫০-৫৫ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের ঠিকানা বদলানোর ইতিহাস[১৩৬] আবছাভাবে তুলে ধরেছেন। পণ্ডিতের এক শিষ্য, অনেকদূরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে তাঁর বাড়ি। তিনি দুঁদে জাতের উকিল।

> “তাঁর এক মক্কেল কোন এক নামজাদা নবাবের বংশধর। সেই সময় ফৌত হয়ে পড়লেন মামলা-মোকদ্দমার প্যাঁচে পড়ে। উকিলবাবুর পরামর্শে তিনি চলে গেলেন বাঙ্‌লার পুবে ত্রিবেদীদের বাস্তুভিটায়। তাঁর বাড়িখানি নিলেন ত্রিবেদীরা। সুশৃঙ্খলে সব কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল। উকিলবাবু তাঁর মক্কেলের মঙ্গল করলেন এবং গুরু বংশকে গঙ্গাতীরে স্থাপন করলেন। একঢিলে দুই পাখি বধ হল।”[১৩৭]

‘বারানসী সমতুল গঙ্গার পশ্চিম কূলে বাস করছেন এখন ত্রিবেদীরা শকুনদের আশ্রয়ে। বাড়িখানি শকুনগুলো সমেতই নিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই। নিয়েছিলেন মানে দাঁও মত পেয়ে গিয়েছিলেন। ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে এই বাড়িখানি পাবার, সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে আসার

উপযুক্ত হেতু আছে। সে সব হোল সেই সাবেককালের কথা। তখন ইংরেজরা ছিল এই দেশে, তারা আবার তাদের জ্ঞাতি-গুষ্ঠির সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছিল তখন। লড়াইটা চলছিল দুনিয়ার অন্য প্রান্তে, তার ছোঁয়াচ এসে পৌঁছে গেল বাঙলার পূব দিকটায়। ওলট-পালট হয়ে গেল অনেক রকম, জাগ্রত দেব-দেবীর মন্দিরের দরজায় রাতের অন্ধকারে শিঙ্ সুদ্ধ গরুর মাথা আবির্ভূত হতে লাগল। মাথা-গুলোই এল শুধু ধড়গুলোর পাত্তা নেই। ধড়ের খোলসটাকে খাবার জলের পুকুরে ভাসতে দেখা গেল। আরও নানাজাতের বিদকুটে বিপত্তি ঘটতে শুরু করল একে একে। মাতৃশ্রাদ্ধে ঘটা করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাচ্ছিলেন চাটুয্যেরা, অনাহূত একদল অতিথি এসে রৈ রৈ করে বসে পড়ল পঙক্তিতে। কন্যা সম্প্রদান করতে বসেছেন প্রসন্ন বিশ্বাস, গ্রামেরই চেনাজানা ছেলেরা উপস্থিত হল রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে। কন্যাটিকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল সকলের নাকের ডগা থেকে। আরও কত কি! ত্রিবেদী মশাই শাস্ত্র ঘেঁটে দেখলেন, দুর্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।'তারপরেই তাঁর বারানসী আগমন।

চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর ছোট ভায়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে মুক্তা এসেছে প্রায় এক বছর। সে ছোট ভায়ের বউয়ের কি রকম এক সম্পর্কের দিদি। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। স্বামী রেলে চাকরি করত।

> "চাঁদপুর থেকে যে লাইনটা চলে গেছে আখাউড়ার দিকে, ---সেই লাইনের কোনও স্টেশনে টরে টক্কার কল ঠুকত। কোয়ার্টার পেলে বউ নিয়ে যাবে, এই আশায় ছিল। হঠাৎ একদিন বিস্তর লোক দা টাঙি নিয়ে ঢুকে পড়ল স্টেশনে। মাস্টারবাবু, টরেটক্কা বাবু, টিকিট বাবু মায় যে লোটটা ঘন্টা বাজাত গাড়ি ছাড়বার সময়, সকলকে কুপিয়ে কেটে রেখে চলে গেল তারা। যাবার সময় মাস্টারবাবু আর টিকিট বাবুর কোয়ার্টার থেকে তাঁদের বউ ছেলে -মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গেল। টরেটক্কা বাবুর নতুন বিয়ে করা পরিবার বাপের বাড়ি ছিল, তাই রক্ষা পেলে। রক্ষা পেয়ে বাপ ভায়েরা একদা পুব ছেড়ে পশ্চিমে চলে এল। বাপ ভাই তখন নিজেদেরই সামলাতে পারে না। অগত্যা তাকে নিজের ভার নিজে নেবার জন্যে তৈরী হতে হল।"[১৩৮]

তৈরীই হয়ে ছিল যেন সব তার জন্যে। ত্রিবেদী মশায় মহা পণ্ডিত ব্যক্তি। আজন্ম ব্রহ্মচারী। তাঁর সেবায় নিযুক্তা হোল মুক্তা। ত্রিবেদী মশায়কে হাত ধরে এঘর ওঘর নিয়ে বেড়ানো তার কাজ। পূজার যোগাড় করে দেওয়া, জলের গেলাস হাতে তুলে দেওয়া, কাপড় গামছা গুছিয়ে দেওয়া, হাতে ধরে পাতের সামনে আসনে বসানো তারপর খাওয়া হলে হাতে জল ঢেলে পা ধুইয়ে দিয়ে খাটের ওপর তুলে দেওয়া -সব করে মুক্তা ; সে অন্ধের যষ্ঠি। অন্ধ ত্রিবেদী মশাইয়ের একমাত্র অবলম্বন। বাংলা সে সুন্দর পড়তে পারে। সংবাদ পড়ে শোনায়। শাস্ত্র পড়তে না পারলেও বই পড়ে শোনায়।

> "এতকাল অবশ্য ত্রিবেদী মশাই শুধু শাস্ত্রই পড়েছেন, এবার অনেক কিছু পড়তে লাগলেন মুক্তার চোখ দিয়ে। ...দৃষ্টি হারিয়ে দৃষ্টি খুলে যেতে লাগল ত্রিবেদী মশায়ের, তিনি একটু অন্য রকম ভাবে বেঁচে থাকার স্বাদটা পেতে লাগলেন।

ভারি মজা!"[১৩৯]

মুক্তা সিনেমা দেখতে যাবে। কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয়কে সে মনের ইচ্ছা গোপন করে জানায় যে সে যেতে বাধ্য হচ্ছে---

> "আমার কিন্তু একটুও ইচ্ছা করছে না যেতে---কি মুশকিলেই যে পড়েছি ! দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ফিরতে সেই এগারোটা।"[১৪০]

মেয়েরা সব বোঝে। মহাপণ্ডিত হলেও পুরুষমানুষ চতুর্ভজ ত্রিবেদী যে মুক্তার সঙ্গ চান তা মুক্তা বোঝে। তাই তাকে প্রবোধ দেওয়া! স্বগতোক্তিতে চতুর্ভুজ মশাইয়ের মনের বিশ্লেষণ করেছেন লেখক :

> "খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসেই রইলেন ত্রিবেদী মশাই, তাঁর রক্তবর্ণ শূন্য আঁখি -গহ্বর দুটিতে বিচিত্র ধরণের দৃষ্টি ফুটে উঠল। সে দৃষ্টিতে বাইরের কিছু ধরা পড়ল না, অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছল সেই দৃষ্টি, নিজের ভেতরটা তিনি ভয়ানক স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন, আর এক চতুর্ভুজ ত্রিবেদী কখন কোন্ ফাঁকে তাঁর বুকের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সে লোকটার মুখখানায় হাসি নেই, চাপা অভিমানে সেই মুখখানা থম থম করছে। ত্রিবেদী মশাই কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। ঠিক খুঁজে পেলেন না, সেই আর একজন চতুর্ভুজের অভিমানের কারণটা। কার ওপর অভিমান তাও ঠিক ধরতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, বিষম রকম ঠকে গেছেন তিনি, নিজের কাছে নিজে গোবেড়ন পিটুনি খেয়েছেন। খেয়ে মুখ আর তুলতে পারছেন না।"[১৪১]

---এইভাবে অবধূত তাঁর মনস্তাত্ত্বিক কাহিনি রচনার মুন্সীয়ানা প্রকাশ করার অবকাশ পেলেন। ইচ্ছা করলে মনস্তাত্ত্বিক কাহিনি যে তিনি সার্থকতার সাতে রচনা করতে পারতেন পাঠক মাত্রই তা স্বীকার করবেন। এদিকে চতুর্ভুজ ত্রিবেদীকে নিয়ে সবাই চিন্তিত! মুক্তা আসবার পরে সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছে। মুক্তার হাতে সঁপে দিয়ে তাঁর ভায়েরা বর্তে গেছে। আগে ছোট ভাইটা আসত অফিস থেকে ফিরে। এখন আসে না। মুক্তা সবটাই দখল করে আছে যেন। 'এবং তিনিও ভুলে থাকেন, মজে থাকেন মুক্তার সঙ্গে গল্প করায়। একটু খেয়ালও করেন না, অপরে কি ভাবলে। কে কি ভাবছে!

অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে আন্দাজ করার চেষ্টা করতে লাগলেন ত্রিবেদী মশাই---কে কি ভাবছে ! এইসূত্রে লেখক ইঙ্গিত দিলেন এ গল্পের মধ্যে যে ত্রিবেদীর সংযম ভেঙে গেছে। তিনি কামাসক্ত। ত্রিবেদীর অবস্থা এখন শোচনীয়। যিনি ব্রহ্মচর্য পালনের সম্মান পেয়ে এসেছেন প্রমাণ দিয়েছেন পারিবারিক নিষ্ঠার তিনি সহজে কি মনের ইচ্ছায় সাড়া দিতে পারেন? তাই অন্তরে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছেন। বার বার ভাবছেন নিজেকে নিয়ে। পরিবেশ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে আর একটু ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন। আর একটি ধারাল জিজ্ঞাসা উদয় হল তাঁর মনে---মুক্তাই বা কি ভাবছে! ---অর্থাৎ তাঁর এই বৃদ্ধ বয়সের প্রেমতৃষ্ণা কি মুক্তার সমর্থন পাবে? অন্ধ ত্রিবেদী মশাই মুক্তার একটি রূপ কল্পনা করে নিয়েছেন।

"একটি বেঁটে খাঁটো মানুষ, একটু মাজা রঙ। আর গড়ন টুকুও নেহাত হাড়গোড় বার করা নয়। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, মুক্তার চুল কি রকম, তা তিনি একদম আন্দাজই করে ফেলেছিলেন। অপর্যাপ্ত চুল ফেঁপে ফুলে মেঘের মত ঢেউ তুলেছে, চুলের ঢল নেমেছে পিঠে। পিঠ ছাপিয়ে কোমর ছাড়িয়ে পৌঁছেছে চুলের রাশি পায়ের গোছ পর্যন্ত। পথ হারিয়ে ফেলতেন ত্রিবেদী মশাই সেই চুলের অরণ্যে, ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়তেন চুলের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে। তখন স্পষ্ট দেখতে পেতেন তাঁর মনগড়া মুক্তার মনোময়ী আঁখি দুটিকে। যে কথা তলিয়ে আছে সেই আঁখি দুটির অতল গহ্বরে, তা যেন তিনি স্পষ্ট ধরতে পারতেন। বুকের ভেতরটা তাঁর মুচড়ে উঠত। আহা বেচারী, কি নিরুপায় ! তাঁর মতই একান্ত নিরুপায়। তাঁর গেছে দেখবার শক্তি, তাই জগৎটা তাঁর নিবিড় আঁধারে ভরে গেছে। মুক্তার দেখবার শক্তি কিন্তু যায়নি, তবু আমৃত্যু কোনও দিকে কোথাও এতটুকু আলোর ছিটে দেখবার অধিকার নেই ওর। ওর জীবনেও সব সাধ-আহ্লাদ ফুরিয়ে গেছে।"[১৪২]

চিন্তা পরম্পরায় তাঁর মনে হলো :

১. 'মুক্তার বুকের মধ্যে কি জাতের বোবা বেদনা কাঁদে, তা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কে বুঝবে !' [১৪৩]

২. 'আশ্রয় যখন পেয়েছে বরাত জোরে, তখন একটু সদয় ব্যবহার পেতেই বা বাধা কি !

৩. '... তাছাড়া কুটুমের মেয়ে সজাতি স-ঘর, তার সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কখনও ![১৪৪]

৪. অষ্টপ্রহর যার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তার সঙ্গে নীচু দরের ব্যবহার করবেন, এতটা ছোট নিশ্চয়ই চর্তুভুজ ত্রিবেদী নন।

৫. "কৃপা অনুকম্পা দিয়ে তৈরী মস্ত একটা ফানুস উড়ছিল ত্রিবেদী মশায়ের মন-আকাশে। 'ফানুষের তলায় ভারি মিষ্টি চোখ জুড়নো একটু আলো জ্বলছিল। হঠাৎ উল্টো টানের হাওয়া লেগে ফানুসটা একধারে একটু হেলে পড়ল, আগুন লেগে গেল কৃপা আবরণে, ত্রিবেদী মশাই মনে মনে একটি আছাড় খেলেন। বসে বসে ভাবতে লাগলেন, কৃপাটুকু আসল না মেকী। কৃপা বা অনুকম্পা কে পাচ্ছে আর কে দিচ্ছে, এটা একটা সমস্যা বটে! "[১৪৫]

---এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই। রাত্রে কখন যে সিনেমা থেকে ফিরে মুক্তা মশারী টাঙিয়ে দিয়েছিল কে জানে ! মাধুর্যে মন ভরে গেল তাঁর। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের মত এখানে অন্ধ ত্রিবেদী মশাই যেভাবে নিজের মনে অনুভব করেছেন তাতে লেখকের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার দক্ষতাই প্রমাণিত হয়।

‘পথভুলে’ (১৯৬২)

তিনটি উপকাহিনির সহাবস্থানে গড়ে উঠেছে ‘পথভুলে নামক হাস্যরসাত্মক বড় গল্প প্রকারে উপন্যাস-কল্প রচনা। এখানে প্রচুর সংলাপ, দৃশ্যাত্মক বর্ণনা,ও নানা চরিত্রের ঘটেছে সমাবেশ। এছাড়া লেখক এখানে নানা মুহূর্তের নির্মাণ করেছেন। প্রতিটি মুহূর্তই নাট্যদৃশ্যের মত উজ্জ্বল ও উপভোগ্য। পাঠক যেন ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। অবধূতের দক্ষতা এখানে প্রশংসার যোগ্য। তিনটি কাহিনি ‘পথভুলে’-র উপজীব্য। রায়বাহাদুর অধরনাথ রঙপুর স্টেশন থেকে ডাক্তারভ্রমে সুজিত চক্রবর্তী নামে একজন হৃদয়বান, শিক্ষিত বেকার যুবককে সসম্মানে বাড়িতে স্থান দিয়েছেন। তারপর অন্তঃপুরে রাজলক্ষ্মী, রমা এবং মঞ্জুকে নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি উপকাহিনি। অন্যদিকে দাঁতের ডাক্তার রায়কে নটবর লাহিড়ি ভ্রমে থিয়েটারের অভিনয়ে স্টেজে তুলে দিয়েছেপূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজার নকড়িবাবু। আসল অভিনেতা নটবর লাহিড়ি ফিরে এসে বিলেত-ফেরৎ ডাক্তার রায়কে মুক্ত করলেন। নানা আপাতবিরোধী আচরণ ও ছোটখাঁটো বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্য দিয়ে মূলত হাসির ধারায় কাহিনি সমাপ্ত করেছেন লেখক। উপন্যাস-কল্প এই রচনার শুরুতে আড়ম্বরের সাথে বিলেতফেরৎ দাঁতের ডাক্তার ড. রায় কে নিতে এসেছেন রায়বাহাদুর অধরনাথ ও তাঁর অনুগামীরা। তাঁরা পোস্টার নিয়ে এসেছেন :

> “পোস্টারগুলির মধ্যে সকলের আগে চোখ পড়ে প্রকাণ্ড দুপাটি দাঁত সংযুক্ত পোস্টারটির ওপর।”[১৪৬]

গদ্যমাধ্যমে লেখা যায় প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রভৃতি। ‘পথভুলে’-র মধ্যে কেবল প্রবন্ধ-সুলভ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। নাটক ও রম্যরচনার বৈশিষ্ট এ গল্পে বিলক্ষণ উপস্থিত। আকার আর প্রকৃতি বিচার করে একে বলা যেতে পারে বড়ো গল্প। প্রকৃতিতে ‘পথভুলে’ হলো উপন্যাস-কল্প রচনা। দৃশ্যময়-সংলাপময় নাট্যগুণান্বিত এই বড়োগল্পটি পাঠকের কাছে আরম্ভ থেকে শেষপর্যন্ত কৌতূহল বজায় রাখে। এর ভাষা উপস্থাপনা, নির্ভার রচনাভঙ্গি এবং মিলনাত্মক পরিণতি রম্যরচনার স্বাদও এনে দেয়। গল্পটি পড়লে অবধূতের লেখা এবিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না বিশেষ করে যখন তাঁর হাস্যরসোপলব্ধির ফাঁকে ফাঁকে দার্শনিকতার উপলব্ধি স্থান দখল করে। পথিক অবধূতের রচনার প্রধান লক্ষণ এখানে প্রকাশিত। গোটা উপন্যাস-কল্প কাহিনিটি বা বড়ো গল্পটি প্রধানত, বাইরের ঘটনা-কেন্দ্রিক। রংপুর স্টেশনে এ গ্রন্থের তিনটি কাহিনির দুটি ঘটনার শুরু। একই ট্রেনে নামবার কথা ছিল নাট্যকার নটবর লাহিড়ির ও বিলাতফেরৎ ডঃ রায়ের। সেই একই ট্রেনে এসেছিলেন বেকার যুবক সুজিৎ চক্রবর্তী আর তার সাকরেদ। রংপুর স্টেশনে নটবর লাহিড়ি নামেন নি। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সদলবলে তাঁরা রাতভোর ট্রেনে চেপে চলে গেছেন বহুদূরে। ঘুম ভেঙেছে টিকিট - চেকারের তলবে।

বিখ্যাত এক গায়কের পরিবর্তে ভুল করে ডাঃ রায়কে তুলে নিয়ে গেছে পূর্ণিমা থিয়েটারে।

থিয়েটারে অনভ্যস্থ দাঁতের ডাক্তারকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে মজা। এদিকে বেকার সুজিৎ চক্রবর্তী ডঃ রায়ের জায়গায় মহা সমারোহে স্থান পেয়েছেন রাজাবাহাদুরের অন্দর মহলে। এই পর্বে জানা গেলো রায়বাহাদুর অধরনাথ বিপত্নীক। তাঁর দুটি কন্যা বড়টি মঞ্জু এবং ছোটটি মায়া। এরা বাবার নয়নের মণি। ছোট বেলায় মা মারা যাওয়ার ফলে রায়বাহাদুর অধরনাথ তাদের প্রতি বড়ো স্নেহ-দুর্বল। এই পরিবারে বলাবাহুল্য সম্পদের অভাব নেই। প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি। এ বাড়ির অন্দরে আরো দুজন মহিলা। রায়বাহাদুরের বিধবা বোন রাজলক্ষ্মী আর তার কন্যা রমা। রমা মঞ্জুরই সমবয়সী। এই অংশে কিছুটা উপন্যাস-সুলভ বিশ্লেষণে লেখক আগ্রহী। লেখকের সূক্ষ্মদর্শন এবং ভাবাবেগের কিছুটা গুরুত্ব আছে এখানে। তাই বলে একে উপন্যাস বলে দাবি করার মতো জীবন-মথিত হার্দ্য-উপলব্ধি মনস্তাত্ত্বিক কাটাছেঁড়া---এসব নেই। উপন্যাসের প্রধান গুণ যে জীবন-দর্শন-তাও এখানে অনুপস্থিত।

কলকাতার বিখ্যাত গাইয়ে নটবর লাহিড়ীকে পূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজার নকড়িবাবু অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিতে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল তার সহকারী ফ্যালারাম। তার হাতে ছিল ---লাল শালুর উপর তুলো দিয়ে নটবর লাহিড়ীর নাম লেখা একটি পোস্টার। গোটা বিষয়টিতে যথেষ্ট পরিমাণে হাস্যরস উপলব্ধ হয়।

বিষয়বস্তু : অত্যন্ত হাল্কা চালে জীবনের কথা বলেছেন অবধূত। তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টির মতোই এর বিষয়বস্তু পথকেন্দ্রিক। পার্থক্য হচ্ছে এই যে অধিকাংশ রচনা দার্শনিকতা-সমন্বিত। 'পথভুলে' তার ব্যতিক্রম। রসিক মনের প্রকাশে এই কাহিনি অনন্য। রাস্তা-বিভ্রাটের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে-এর তিনটি উপকাহিনি। পূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজার নকড়িবাবু আর তার সহকারী ফ্যালারাম অভিনেতা নটবর লাহিড়ির পরিবর্তে ভুল করে নিয়ে এলেন দাঁতের ডাক্তারকে। ড. রায় মুক্তি পেলেন অনেক কাণ্ড করে। তার আগেই ডাক্তারের জায়গায় স্থান পেয়েছে সুজিত নামে এক বেকার যুবক। এদিকে নটবর লাহিড়ি নেশার ঝোঁকে আচ্ছন্ন হয়ে রাত সাবাড় করে আর কেনা টিকিট পরের দিনে অচল করে ফাইন দিয়ে শেষমেষ পৌঁছালো পূর্ণিমা থিয়েটারে। আর ডাক্তার সেই নির্যাতনের হাত থেকে পালিয়ে যখন নিজের পরিচয়ে রায়বাহাদুরের বাড়িতে পৌঁছালেন তখন জল গড়িয়ে গেছে অনেক দূর। তাঁর জায়গায় অভিষিক্ত সুজিতকে মাতৃহারা কন্যা মঞ্জুর সাথে বিয়ে দিতে মনস্থ করেছেন রায়বাহাদুর অধরনাথ। তাঁর ভগিনী নিজের মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে আরো বেশি উৎসাহী। ডাক্তার সবই বুঝলেন তিনি নিজে ভিলেন সেজে মিল ঘটিয়ে দিলেন মঞ্জু ও সুজিতের সাথে। গল্প পাঠক অনুমান করে নিতে পারেন রায়বাহাদুরের বিধবা বোন রাজলক্ষ্মীর মেয়ে রমার সাথে ডা. রায়ের বিয়ে হবে এবং কাহিনিটি আগাগোড়া মিলনাত্মক হবে।

ভাষাশৈলী

'পথভুলে' [১৪৭] একটি উপন্যাস-কল্প রচনা। এখান থেকে দুটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে :

১. 'দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর সম্বর্ধনা সমিতির একজন সদস্য একটি পতাকা হাতে নিয়ে এই দিকে আসছিলেন, ফ্যালারামের কথাটা তাঁর কানে গেল। তিনি বললেন, অভিনেতা আবার কে? ডেন্টিস্ট কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ডাক্তার ডাক্তার রায় আসছেন। ম্যানেজার তার কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে ব্যঙ্গ কণ্ঠে বললেন, আসছেন নাকি! তাই বুঝি ষ্টেশনে এমন দাঁত কপাটি লেগেছে! কিন্তু তিনি তো আর গোটা ট্রেনটা কামড়ে আসছেন না, ট্রেনে অন্য দু-চারজন লোকও আছে।'

---এখানে একটি নাট্যদৃশ্য যেন চোখের সামনে অভিনীত হলো। বাদানুবাদের মধ্যেই সৃষ্টি হলো হাস্যরস। 'দাঁতকপাটি' এবং 'ট্রেনটা কামড়ে' আসা--এই শব্দবন্ধ গুলি লক্ষ্যণীয়।

২. রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকে বললেন, ' আহা দিব্যি ছেলেটি! অত বড় ডাক্তার কে বলবে! দেমক নেই, কেবল হাসি খুশী।রমা বললে, এরি মধ্যে তোমার মায়া পড়ে গেল মা? ---তা পড়েছে বৈকিএকটু! অমনি একটি জামাই যদি পেতাম। রাজলক্ষ্মী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। রমার মুখে মুহূর্তের জন্যে বুঝি লজ্জার আভা লাগলো, তারপরই সে লিপস্টিকটা নামিয়ে রেখে বললে : ওসব আশা করো না মা।'

---বিধবা মা ও মেয়ের এই বাক্যালাপে উভয়ের পরিচয় আশা-বেদনা অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু অধিক মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে সময় দেননি লেখক। তাই এটি উপন্যাস না হয়ে উপন্যাস-কল্প রচনা বলে গৃহীত হতে পারে।

> ''পথভুলে' কখনোই ছোটগল্পের সীমায় নামে না। এখানে তিনটি উপকাহিনি আছে। এর মূল অবলম্বন হাস্যরস। এই হাস্যরসের প্রধান অবলম্বন অসঙ্গতি।। প্রতিটি চরিত্রই তার নির্দিষ্ট চরিত্রের বাইরে অসঙ্গত ভূমিকায় কাজ করে চলেছে আর তাতেই কাহিনি ভেসে গেছে হাস্যরসের ধারায়। ডঃ রায়ের সাথে এসেছে গোবিন্দ। ডঃ রায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা খুবই কম। ডাক্তার রায় এ-সব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি, সুটকেস গুছোতে গিয়ে যতই অগোছাল করে ফেলছেন এবং ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠছেন ততই তিনি অপ্রসন্ন হয়ে উঠছেন গোবিন্দর উপর। অবশেষে তিনি হতাশ হয়ে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ে বললেন, 'তুমি একটা হাঁদা গোবিন্দ। সব ছড়িয়ে পড়ে রইলো, এদিকে ষ্টেশন এসে গেল।''[১৪৮]

---ডাক্তারকে নিয়ে বহুঘটনা ঘটতে চলেছে তাই লেখক আগে থাকতে তার অপটুতা সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। চরিত্র সৃষ্টির এটাই প্রধানতম দক্ষতা! নইলে একজন দক্ষ বাস্তব-সচেতন মানুষকে নিয়ে ম্যানেজার জুলুম করে মঞ্চে তোলার সুযোগ পেতনা। গোড়াতেই তাহলে নাকচ হয়ে যেত কাহিনি রচনার পরিকল্পনা!

সংলাপ-প্রাধান্য

'পথভুলে' অবধূতের প্রসন্ন মনের হাস্যরসিকতাময় সৃষ্টি। অনাবিল শুভ্র সংযত হাস্যের আদ্যন্ত

প্রবাহে এর পাঠক স্নাত হয়ে ভাবতে থাকেন বীভৎস রসের সৃষ্টি এঁর লেখনিতে কীভাবে সম্ভব হয়? সত্য কথাটি হলো যে বিষয়ের ওপর লেখা হয় তার কাঙ্ক্ষিত রসটাই দক্ষ লেখকেরা সৃষ্টি ক'রে থাকেন। অবধূত এখানে সেটাই করেছেন। এই কাহিনির প্রতিটি চরিত্রই জীবনের উপরিতলের রস সংগ্রহ করেছে। এখানে জীবন উদ্যানে কথার ফুলচাষ হয়েছে ফলের সন্ধানে জীবন পণ করেনি বলে এর হাস্যরসের প্রবাহ অমলিন থেকেছে। নাট্য ধর্মে বজায় রেখে এই উপন্যাস-কল্প রচনাটি পাঠকের সামনে যেন অভিনীত হয়ে চলেছে। এই গ্রন্থের ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠা থেকে কয়েকটি প্রসঙ্গ আমরা এখানে তুলে ধরতে পারি এই সূত্রে রচনাটি পাঠের প্রত্যক্ষ ফলও মিলবে।

১.'সুজিৎ জিজ্ঞাসা করলে, কিহে ফকির চাঁদ, কি দেখছো? রংপুর আসতে আর কত বাকী?

ফকির জবাব দিলে : দেখতে দেখতে চাপা পড়ে গেল যে।

---চাপা পড়ে গেল! সে কি হে? চেন্ টানবো নাকি?

না, না, চাপা কেউ পড়েনি, ওই কাগজটা।---বলেই জানালা দিয়ে আর একবার মুখ বার করে বললে, নাও তৈরী হয়ে নাও, রংপুর এসে পড়লো।' ---এই অংশটি স্বভাবতই কোনো নাটক থেকে নেওয়া বলে মনে হবে।

২. ফকির বললে, তোমার ও সব হেঁয়ালী আমার ভাল লাগে না। শুধু বখেয়া সেলাই নিয়ে এমন বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়িয়ে কি হবে?

সুজিত তেমনি নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, তুমি বুঝতে পারছো না ফকিরচাঁদ, বঙ্গীয় বেকার-সঙ্ঘের অবৈতনিক সেক্রেটারীর একটা কর্তব্য আছে তো!---এখানে বৈঠকী মেজাজের সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. রাজলক্ষ্মী বললেন, মনে নিশ্চয় করেছেন। এতবড় মেয়ের একটা জ্ঞানগম্যি নেই, তোমার বেশী প্রশ্রয় পেয়েই তো এই রকম হয়েছে। রায়বাহাদুর সুজিতের দিকে চেয়ে বললেন, দেখুন, প্রশ্রয় আমি ঠিক দিই না। তবে কি জানেন...সুজিত বললে, আপনি লজ্জিত হবেন না রায়বাহাদুর। ছেলেরা তো চিরদিন প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে, এখন মেয়েদের একটু প্রশ্রয় দিলে ক্ষতি কি!' সুজিতের কথায় সবাই হেসে উঠলো। রায়বাহাদুর বললেন, চলুন, চলুন, ভিতরে চলুন। এতটা ট্রেনে এসে নিশ্চয় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, বিশ্রাম করে একটু সুস্থ হয়ে নিন।'

অবধূত 'পথভুলে' রচনাটিতে অসাধারণ হাস্যরসিক লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ব্যক্তি অবধূত যে অত্যন্ত রসিক মানুষ ছিলেন---লেখায় তা স্পষ্ট। তবু তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষ নিজের ভবিতব্য নিজেই বুঝে নেয়।---হয়ত সচেতন থাকে না তবু এ ক্ষমতা তার থাকে। আত্মা-পরমাত্মার প্রসঙ্গ না এনেও এই ব্যক্তিধর্মের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল। মানুষের ষড়েন্দ্রিয় সব বুঝতে পারে নিজের ওপর বিশ্বাস হারানো অন্যায়। উপন্যাসের এই বার্তাটুকু আমরা স্বীকার ক'রে নিতে পারি। একে দার্শনিকতাও বলা যায়। এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে আমরা উপন্যাস-কল্প রচনা 'পথভুলে'-র আলোচনা সমাপ্ত করবো। এখন প্রসঙ্গটি সুজিত ও

তার সাকরেদকে কেন্দ্র করে বুঝে নেবো। সে বলেছিল যে সুজিত বেকার-সঙ্ঘের সেক্রেটারী হয়ে এত ঘোরাঘুরি করেও তো একটা কাজ জোটাতে পারলো না---তাহলে এসব করে কী হবে? সুজিত তাতেও দমেনি,বলেছিল কোথায় কাজের কি ভরসা হঠাৎ মিলে যেতে পারে কে জানে! তারপর ধীরে সুস্থে সুট্‌কেসটা বন্ধ করতে করতে আবৃত্তির সুরে আওড়াতে শুরু করেছিল:

'এবার তবে খুঁজে দেখি

অকূলেতে কূল মেলে কি দ্বীপ আছে কি ভব সাগরে।' শেষপর্যন্ত সেটাই ঘটেছে। রাজ্য-রাজকন্যা---দুই-ই জুটেছে। অর্থাৎ সুজিত আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল ভাগ্যকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। অবধূত প্রকারান্তরে ভবিতব্যের শক্তিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

'সাচ্চা দরবার'

'সাচ্চা দরবার' মানে 'তারকেশ্বর'-হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ।'তারকেশ্বর' কথাটি গ্রন্থে একবারই উল্লেখিত হয়েছে ৯০ পৃষ্ঠায়। উপন্যাসের গোটা বিষয়টি তারকেশ্বরের মেলা প্রাঙ্গণে ঘটেছে। সবাই এখানে এসেছে নিজের নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করতে। আর সেখানে সহাবস্থান সূত্রে পৃথক পরিবারের কাহিনি গুলি একত্র গ্রথিত হয়েছে। মহাদেবের দরবার হলো 'ন্যায্য বিচারালয়'-এই অর্থে ' সাচ্চা দরবার ' কথাটি ব্যবহৃত।ধর্মের আড়ালে মানুষ আপন প্রবৃত্তির লালন করে। কয়লা শতবার ধুলেও তার কালো যাওয়ার নয়। 'তীর্থ' মানে পাণ্ডা গুণ্ডা রাঁড় ষাঁড় বাঁদর চোর আর গলাকাটা ঠগ্- জোচ্চরের আড্ডা। সাচ্চা দরবারে ঐ সমস্ত উপকরণের একটিও নেই। পাণ্ডা অবশ্য আছেন কিছু, অত্যাচার জুলুম করা দূরে থাক্, কোনও যাত্রীর সঙ্গে তাঁরা গলা উঁচু করে কথাই বলেন না। বাকী উপকরণের কিছুই নেই। সন্ধ্যা হল তো একদম নিঝুম হয়ে পড়ল। ব্যাঙ ডাকছে, শেয়াল ডাকছে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। পল্লীবাংলার আসল রূপ দেখার যার বাসনা আছে, সেই রূপ দেখে বুঁদ হয়ে যাবার শক্তি আছে যার, তার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে সাচ্চা দরবার। মনে রাখতে হবে এখনকার তারকেশ্বর ধাম নয়, প্রায় আশি বছর আগের তারকেশ্বর এখানে চিত্রিত হয়েছে।

তিনি নিজের চোখে দেখেছেন দিনের বেলায় ভক্ত সেজে ঘুরে বেড়ায় আর রাতে নিজের মেয়ের ঘরে লোক ঢোকায়,শুধু তাই নয় ধরা পড়ে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয়ও দেয়। ধর্মস্থানে বিচিত্র মানুষ তার নিজস্ব স্বভাবের অনুবতী হয়ে মনস্কামনা জানায়। লেখকের মনে হয় ভোলা মহেশ্বর সব ভুলে গেছেন মানুষের এ জাতীয় নীচতায়।

অবধূত 'সাচ্চা দরবার' নামটি ব্যবহার করেছেন ব্যঞ্জিত অর্থে। 'সত্য' বা 'সাচ্চা' কী ? সত্য মানুষের প্রকৃতি। নিজের প্রকৃতি অনুসারেই ন্যায়-অন্যায় বিচার করে মানুষ। যদি বলি মহাদেব ন্যায় বিচার করেন তবে সে---তো মানুষের প্রকৃতি অনুসারেই হয়ে থাকে। কারণ মানুষ তো নিজের প্রকৃতির অনুবর্তী হয়েই প্রার্থনা করে। আর মহাদেব মানুষের প্রকৃতি

অনুসারে সকল মানুষের মনোবাসনা পূর্ণ করেন ---তাই মানুষের নীচতাই ঈশ্বরের সাম্রাজ্যকে কলুষিত করে! এখন আমরা এই উপন্যাসে চিত্রিত নানা ধরনের মানুষের স্বভাব ও আচরণ -এর পরিচয় নেব।

ত্রিশ বছর এজলাসে বসে পেনাল্ কোডে লেখা ক্রাইমগুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল বড়ুয়া সাহেবের। বড়ুয়া সাহেব পুলিশ কেসে ধরা পড়া আসামীর বিচার করেছেন। তাদের অপরাধের সাথে তাঁর বর্তমানের অভিজ্ঞতা মেলে না। সম্ভাব্য সকল প্রকার অপরাধকে ছাড়িয়ে গেছে 'সাচ্চা দরবার'-এ থাকা বেশ কিছু নরপিশাচ কিম্বা নারী পিশাচিনী। সাধারণ মানুষ যেকোনো অপরাধীকে দেখে বিস্মিত হতে পারেন কিন্তু বড়ুয়া সাহেব অপরাধ ও অপরাধীদের নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। তিনি দেখেছেন বিস্তর অপরাধীকে। আর পিনাল কোডের ধারা মিলিয়ে শাস্তি দিয়েছেন দীর্ঘ চাকুরি জীবনে। তাই তাঁর বিস্ময় ছেলেখেলা নয়। পেনাল কোডের নাগালের বাইরে মানুষের শয়তানী বুদ্ধি কী খেলা খেলতে পারে তা স্বচক্ষে দেখলেন তিনি। তিনিই বিস্মিত এসব শয়তানীর সামনে দাঁড়িয়ে! এই চরিত্রটির অবতারণা শিল্পী অবধূতের বিশ্লেষণী বুদ্ধিকে স্মরণ করায়।

এ কাহিনিতে অবধূতের দৃষ্টির স্বচ্ছতা আর বক্তব্যের সত্যতা ফুটে বেরুচ্ছে। তিনি সত্যকে কোনো কারণেই ত্যাগ করেননি। নোংরা মনের লোকের কথা যেমন ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন তেমন সাধু সজ্জনের আচরণও তাঁর চোখ এড়ায়নি। কপট সাধুর দলে যেমন সন্তর্পণ, কুলতিলক, আছে তেমনি আছেন ভবানীশঙ্কর, উমাশঙ্কর এবং সর্বোপরি নিষ্ঠাবান পার্বতীশঙ্করের মত সজ্জন পাণ্ডাও। কৌশিক -জয়ার মত কিশোরেরাও আছে, যারা সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছে একটা নতুন দিন আনবার সাধনায়। অহিভূষণ সান্যালের মত কঠিন সংগ্রামে ব্রতী মানুষের কথা বলেছেন এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের উপন্যাসে। অবধূতের সবচেয়ে উল্লেখ্য তাঁর সত্য-সন্ধানী দৃষ্টি শক্তি ---কোথাও তার ব্যত্যয় হয় না। তিনি দেখেছেন যে দু:খী মানুষরাই আসছে। শহরের পথে যারা রিক্‌শা টানে, মাল টানে, ইঁটের নৌকায় যারা ইঁট বোঝাই করে, যারা হাটে বাজারে রেলস্টেশনে মোট বয়, যারা ফিরিওয়ালা,যারা গরুর গাড়ি মোষের গাড়ি চালায়, যারা ফুটপাথ শুয়ে রাত কাটায় তারা সবাই আসছে তাদের অনন্ত দুঃখের পসরা নিয়ে। গঙ্গাজলের সঙ্গে বুকভাঙা হাহাকার মিশিয়ে তারা আশুতোষকে স্নান করাবে।

কণ্ঠে যিনি হলাহল ধারণ করে আছেন, তিনিই পারেন মানুষের অনন্ত দুঃখ মাথা পেতে নিতে। দুঃখের বোঝা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে যাবে সবাই। ফিরে গিয়ে নব উদ্যমে আবার দুঃখের সঙ্গে লড়বে। রেশন দোকানের কুকীর্তির কথাও বলেছেন চাল বা গমের সাথে কাঁকর মেশানো চিনির বস্তায় একমগ করে জল ঢালা এসব প্রসঙ্গ এসেছে বলে এর মধ্যে উপন্যাসের নিখুঁত দৃষ্টিশক্তির পরিচয় মেলে। মাঝে মাঝে সরস মন্তব্য অবধূতের রসিক মনের পরিচয়বাহী :

> "এখন মাসে দশটা দিনও দোকানে যেতে পারেন না, বিঘোষণ দোকান চালায়। ভালোই চালায়। ভালই চালাচ্ছে। ভালভাবে না চালালে মুরলী দেবী এবং তাঁর দুই বোনের অত শাড়ী ব্লাউজ জুতোর দাম আসছে কোথা থেকে? অত টাকা

চাঁদাই বা দেন কি করে মুরলী দেবী অ্যামেচার ক্লাবে।''[১৪৯]

অবধূত অকারণে অশ্লীল প্রসঙ্গ আনেননি বরং সত্য নির্মম ও কঠিন বলে তিনি এড়িয়ে যাননি। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। 'সাচ্চা দরবার'-এর কাহিনি বিন্যাস এই রকম:

১ম অধ্যায়ে এসেছে শ্রী চৌহানের ধর্মীয় মোড়কে ভোগলিপ্সার কথা। এসেছে অসাধু অসাধু ধর্মব্যবসায়ী সন্তর্পণের কথা।

২য় অধ্যায়ে বলেছেন সাচ্চাদরবারে মেলার কথা। সার্কাস যাত্রা হোটেল পানওয়ালা ভক্তদের ভিড়, রূপোন্মত্তদের আনাগোনা---ব্যভিচার।

৩য় অধ্যায়ে বিচারপতি বড়ুয়া সাহেবের অভিজ্ঞতায় এসেছে ভক্তের ছদ্মবেশে দেহব্যবসার কথা। এখানে এসেছে বিচারকের সামনে আর-এক অভিনব বিচারের ঘটনা। জংলা চেয়ারম্যানদের কথা।

৪র্থ অধ্যায়ে সজ্জনব্যক্তি হিসাবে এসেছে বনমালী লস্কর, চন্দ্রচূড় ও সাধুব্যক্তি বাবা জটিলেশ্বরের কথা।

৫ম অধ্যায়ে কলেজ শিক্ষিতা তরুণীর সাথে দুজন সাহেবের বেলাল্লাপনার মাধ্যমে সেকালের সাহেব ভীতির ছবি উঠে এসেছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে অহিভূষণ (অহিদা), স্বস্তিক (স্বস্তিকদা), কৌশিক (ড্রাইভার)বিজয়া, বিজয়ার ছোট বো জয়া আর মৌসমের কথা এসেছে তারা পদব্রজে চলেছে বাবার মাথায় জল ঢালতে।

৭ম পরিচ্ছেদে এসেছে অহিভূষণ সান্যাল বিজয়া ও তাদের ছেলে মৌসমের কথা। প্রতিবাদী আন্দোলনের এক ঝলক এখানে বিশ্বস্ততার সাথে উঠে এসেছে।

৮ম পরিচ্ছেদে আছে শ্রাবণী পূর্ণিমায় দু:খী মানুষদের জল ঢালার কথা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভুজঙ্গসরকার-মুরলী দেবী কাহিনি। তাদের ব্যভিচার অবধূত সংযমী কলমে পরিবেশন করেছেন।

৯ম পরিচ্ছেদে মুরলী-প্লাটিনাম সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা আছে ঝর্ঝরি ও শিঞ্জিনীকে নিয়ে সুজয় আর বিভাসের বেলেল্লাপনার কথা আছে।

১০ম পরিচ্ছেদকে বলা যায় পরিশিষ্ট । গ্রন্থের ৭৭পৃ. থেকে ১৩০ পৃ. পর্যন্ত এর বিস্তার। সবচেয়ে দীর্ঘ। অনেক বিষয়ের অর্পূর্ণতা এখানে পরিণতি পেয়েছে। বীভৎস ব্যাপারের ইঙ্গিত আছে। প্লাটিনামের মৃত্যুর কারণ কেউ বোঝেনি ভেবেছে চির ব্রহ্মচারী হওয়ার জন্যে নিজের লিঙ্গ কেটে মারা গেছে। নরপিশাচ বকরাক্ষস কামড়ে খেয়েছে প্লাটিনামের পুরুষাঙ্গ। আর বেদম মার খেয়ে পরে নিজে পালিয়েছে। পুলিশের হাত এড়াতে মুরলী দেবী,ঝর্ঝরি, শিঞ্জিনী, সুজয়, বিভাস-সবাই পলাতক। বলা বাহুল্য এখানে বীভৎস রসকে অবধূত সংযতভাবে ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহারে সঙ্কেতময়তা আর সংক্ষিপ্ততা কাজ করেছে। বীভৎস রসেই রচনাটি সমাপ্ত হয়েছে।

দশ. সাচ্চা দরবার : বিচিত্র নরনারী

'সাচ্চা দরবার' অবধূতের অন্যান্য রচনার মত বহু বিচিত্র চরিত্রে চিত্রিত। ১৩০ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে পঞ্চাশটি চরিত্র স্বল্প রেখায় নির্মাণ করেছেন লেখক। উপন্যাস-কল্প এই রচনাটি উপন্যাস হ'য়ে উঠতে পারত যেকোনো সময়েই। লেখক সে চেষ্টা করেন নি। ইচ্ছা করেই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে চরিত্রের বিশ্লেষণ ও তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা তিনি দেননি। আমরা বর্তমান আলোচনার প্রারম্ভে এ রচনায় যে চরিত্রগুলি আছে তাদের নামগুলি জেনে নেব:শ্রীচৌহান, মাকড়া, বৈতাল, বোলতা, কুলতিলক, ল্যালা, যোগিয়া, মেয়ে লয়লা, হরতন, সন্তর্পণ ঠাকুর,বালাই,বৃহন্নলা, নাগা বাবা, ভোলানাথ, বিব্‌ভুল ঠাকুর, চন্দ্রচূড় ভৌমিক (বনমালীর হিসাবরক্ষক), বনমালী লস্কর (বালি খাদানের মালিক), বনমালীর দুই মেয়ে মিছরি ও মৌ, প্রেমজী ভাই দোসানি, যমুনাপ্রসাদজী ভাই, হরসুখ লালজী ভাই, ডার্লিং ডুটি (দ্যুতি) আমেরিকান দুজন সাহেব (বয়স ত্রিশের নিচে), দালাল কংসনিসূদন (ঠাকুর মশাই), বিড়ি ও মাল ব্যবসায়ী কোঁতকা, ভুজঙ্গ সরকার(সরকার মশাই), দিদি ষষ্ঠী ঠাকরুণ, সরকার মশায়ের তৃতীয় পরিবার মুরলী দেবী, তার দুই বোন : ঝর্ঝরি আর শিঞ্জিনী, সুজয়, বিভাস, প্লাটিনাম (প্লাটিনামের মত রঙ), বকরাক্ষস, বিঘোষণ (মুরলী দেবীর ম্যানেজার), মান্ধাতা ঠাকুর (সরকার মশাইয়ের পুরোহিত), সঙ্কটমোচন ঠাকুর (এঁর ভাই। এখন যজমান সামলান) ভোঁতা ভাদুড়ী (কোল্ড স্টোরের মালিক), বালাখানা (আগে পান পরে মদ বেচে), বাড়িউলি ও তার মেয়ে রোহিলা (এখন বালাখানার দোকানে মদ বেচে), মালসী (অত মদ যে 'কোথা থেকে জোটাচ্ছে মালসী তা শুঁড়ীদের ভগবান শুঁড়ওয়ালা গণেশ ঠাকুরই জানেন ৭২ পৃ.) হার্ট স্পেশালিস্ট রুদ্র(বড়ুয়া সাহেব প্রসঙ্গে, পরে ভিয়েনায় নিয়ে যাবেন মণিকুন্তলা দেবী), বাচ্চু ঘড়াই (লটারী টিকিট বিক্রেতা), সারকাসের তাঁবু জলের দরে কিনল। তাঁবু খাটিয়ে টিকিট বিক্রী করবে বলে। 'চণ্ডেশ্বর'-এর যাত্রী নিবাসে বৃহন্নলা কাজ পেল,অনেকটা এয়ার হোস্টেসের মত। দুটো পাচকানীও আছে), বাঘে খেকো, শ্রীচৌহান শেঠজী, অন্যান্য ধনী ভক্ত।

অবধূত শেঠ সমাজের মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই চৌহান শেঠের মাধ্যমে। এরা ধর্ম পরায়ণ অথচ আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষম। এরা হিংসুক নয় প্রতিবাদীও নয় দেব-দ্বিজে ভক্তিও অসামান্য ! এদের সমাজে দান-ধ্যানের বহু দৃষ্টান্তও আছে। অবধূতের ভাষাভঙ্গি এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র।

> "শেঠানীকে সাথে নিয়ে শ্রীচৌহান বদরীনারায়ণ কেদারনাথ দর্শন করে এলেন। হরিদ্বারের সাধুরা মস্ত সভা করে শ্রী চৌহানকে ধর্মরক্ষক উপাধি দান করেন। দিল্লীর বড় বড় পত্রিকায় ছবিসুদ্ধ সেই সভার বিবরণ ছাপা হয়েছিল। সেই ছবিতেও বোলতা মাকড়া আর বৈতালকে চেনা যাবে।"[১৫০]

লেখক যেমন তার নামডাকের কথাও বলেছেন তেমনি তার স্বভাবের পরিচয় দিতে উল্লেখ করেছেন বোলতা, মাকড়া আর বৈতালের কথাও। অবশেষে শ্লেষ মিশ্রিত আত্মগত ভঙ্গিতে

লেখক বলে যান যে কি আর করা যাবে, শ্রীচৌহানের সমাজে এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে একটি বা দুটি কালো কুচকুচে আট-ন-দশ বছরের মেয়ে পেলে নিজের শরীরের বিষটা নামিয়ে ফেলা যায়। ঐ বিষ নামাতে গিয়েই না প্রথমবার শ্রীচৌহান বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন! অর্থাৎ সাদামাটা ভঙ্গিতে ভয়ংকর সংবাদ পরিবেশন করেন সত্যের খাতিরে! তবে গলাবাজি করে মিথ্যা নাটক করতে তিনি অসমর্থ।

> "সে-বছর অবশ্য সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি যোগিয়াকে আর যোগিয়ার ন'বছরের মেয়ে লয়লাকে। উঠেছিলেন বাজারে গুঞ্জরি বাড়িউলির ঘরে। সাচ্চা দরবারের কৃপায় সবই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হল। মেয়ের মুখ চেপে ধরে রইল যোগিয়া, শ্রীচৌহান তাঁর শরীরের বিষ নামালেন। কিন্তু তারপর সামলানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা বেহুঁশ হয়ে পড়ল, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তখন যোগিয়ার জামাকাপড় পর্যন্ত, মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে যোগিয়া পাগল হয়ে উঠল। যাইহোক কেলেঙ্কারি করেনি যোগিয়া। তারপর তো সন্তর্পণ ঠাকুর শ্রীচৌহানের সম্মান রক্ষা করলেন!"[১৫১]

এগারো. অশ্লীল প্রসঙ্গ আর শৈল্পিক রূপায়ণঃ

শেঠজীর আরেক পরিচয় আছে এ উপন্যাসে। সেবার শেঠানীকে নিয়ে শ্রীচৌহান বদরীনারায়ণ কেদারনাথ দর্শন করে এলেন। হরিদ্বারের সাধুরা মস্ত সভা করে শ্রীচৌহানকে ধর্মরক্ষক উপাধি দান করেন। মাকড়া, বোলতা বৈতাল কুলতিলক, ল্যালা---এরা সকলে শ্রী চৌহানের দলভুক্ত দয়াজীবী অনুচর। মাকড়া বৈতাল আর বোলতার জিম্মায় শ্রীচৌহানের মান ইজ্জৎ সব কিছু 'সমর্পিতং'। ওরা সঙ্গে না গেলে যাবে কে? কুলতিলক যান শ্রীচৌহানের সঙ্গে ওর ধর্ম রক্ষা করতে। মানে কুলতিলক হচ্ছেন শ্রীচৌহানের কুলপুরোহিত। উনি শ্রী চৌহানের সঙ্গে শেয়ার মার্কেটে বা রেস গ্রাউণ্ডে বা কোনও সভা সমিতিতে যান না। যান তীর্থস্থানে। যেখানে শ্রীচৌহান দানধ্যান করেন। কুলতিলক শ্রীচৌহানের ঐ দানধ্যানের দিকটা সামলান। ল্যালাকে পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। একদম উলঙ্গ সাজোয়ান এক ছোকরা আঁস্তাকুড় হাতড়ে কি যেন খাচ্ছিল। ধরে নিয়ে এলেন তাকে শ্রী চৌহান। ভালো ভালো পোশাক পরিয়ে সভ্য করে তুলেছেন ল্যালাকে।

কুলতিলক চৌহনের শ্রীধাম যাওয়ার ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষাকারী। শ্রী চৌহানের ইহলৌকিক পারলৌকিক সর্ববিধ মঙ্গল অমঙ্গলের দায় তাঁর। সন্তর্পণ ঠাকুর হলেন শ্রী চৌহানের পুরোহিত। খাঁদু, একজন দেহাতি মহিলা। সন্তর্পণ ঠাকুরের যাত্রী-ওঠা কোটরগুলির দেখভাল করে। সাচ্চা দরবারে খাঁদু বিশেষ পরিচিত। 'এন্তার বোনঝি আর ভাইঝি আছে খাঁদুর, কালো কুচকুচে নধর কচি দেহাতি মাল, আট থেকে আটচল্লিশ যা চাও পাবে। আয়ের ছ'আনা সে পায়। দশ আনা সন্তর্পণ ঠাকুরের।সন্তর্পণের পায়ের গোদ থেকে পচা গন্ধ বেরোয়। সে পালাতে চায়। ভয়ে পারেনা। ব্রহ্মশাপে শিরে সর্প দংশন হতে পারে যে!

বর্ষা পড়লেই খাঁদু নিয়ে আসে সবাইকে সাচ্চা দরবারের মেলা দেখাতে, মেলার পর তারা

গাঁয়ে-ঘরে ফিরে যায়। নিয়ে যায় সঙ্গে করে আধুনিক ফ্যাসানের জুতো-জামা-কাপড়, গিলটি-করা গহনা আর ঘা। হ্যাঁ, ঐ আর এক বিপত্তি। কচি কচি মেয়েগুলো ঘা নিয়ে ঘরে ফেরে। অবশ্য সাচ্চা দরবারের কৃপায় সে ঘা বয়েস হলে চাপা পড়ে যায়। কুলতিলক সন্তর্পণ ঠাকুরের খোঁজ নেন সাচ্চা দরবারে যখন শ্রীচৌহান যান। সর্ন্তপণ ঠাকুরের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এই ভাবে যে ঠাকুরমশাই বহাল তবিয়তে আছেন, একটু মোটা হয়েছেন, একটু ভুঁড়ি বেড়েছে, আর বাঁ পায়ের সেই গোদটার ওপর দগদগে ঘা হয়েছে। চৌহান-সন্তর্পণ সম্পর্কটি নাটকীয় আকারে প্রায় তুলে ধরেছেন লেখক । সর্ন্তপণ বাড়ি থেকে খেয়ে এসে বিশ্রাম করছেন যাত্রী-ওঠা বাড়িতে। খাঁদু মানে ঐ বাড়ির ঝি তাঁর চরণে ‘ত্যাল’ দিয়ে দিচ্ছে। হেনকালে বাইরে ডাক শোনা গেল। কাপড়-চোপড় সামলে বেরিয়ে এলেন ঠাকুর। আর অমনি বাবার কৃপায় কপাল ফিরতে শুরু হল। শ্রী চৌহান খপ করে ঠাকুরের হাতে একগোছা নোট গুঁজে দিয়ে বিপদটা বললেন। ঠাকুর সেটা জানালেন খাঁদুকে। আধ ঘন্টার ভেতর প্রায় অচৈতন্য একটা দশ এগার বছরের মেয়েকে নিয়ে দুখানা কোটর দখল করে বসলেন ওঁরা।

সর্ন্তপণ রটিয়ে দিলেন,এক শেঠজী এসেছেন তাঁর সঙ্গে রুগ্না মেয়ে নিয়ে, বাবার কৃপায় মেয়ে সারবে তবে শেঠজী যাবেন খেঁকীকুত্তার মত খাঁদু লোক তাড়াতে লাগল, কাউকে শেঠজীদের কাছে ঘেঁষতে দিল না। রক্তমাখা ন্যাকড়াকানি সব সামলাতে লাগল খাঁদু, দেখতে দেখতে মেয়ে সেরে উঠল। আটদিনের দিন শ্রী চৌহান বিদায় হলেন সাচ্চা দরবার থেকে। পুরস্কার স্বরূপ খাঁদুর দুই কনুইয়ে দু'গাছা মোটা মোটা অনন্ত শোভা পেতে লাগল আর সন্তর্পণ ঠাকুর খোলার চাল বজায় রেখে দেওয়াল গুলো পাকা করে নিলেন। উঠোন সারা বাড়ির মেঝেও সিমেন্ট করে দিলেন। তারপর আর দেখতে হল না। শ্রী চৌহানের সমাজে রটে গেল সন্ত র্পণ ঠাকুরের নাম। বড়ই বিশ্বাসী মানুষ সন্তর্পণ, বেমক্কা কোনও ফ্যাসাদে পড়ে গেলে ঠাকুর উদ্ধার করে দেন। ---সেই থেকে শ্রীচৌহান এবং তাঁর সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সন্তর্পণ ঠাকুরের সম্মান রক্ষা করছেন ওঁর নিজের থাকবার বাড়ি দোতলা হয়েছে। যাত্রী ওঠা বাড়ি তিনতলা হয়ে গেছে। তবে খান তিনেক খোলার চালের ঘর রাখতে হয়েছে ঠাকুরকে তিনতলার পেছন দিকে। বছর বছর মেলার সময় খাঁদু তার দেশ থেকে গণ্ডা গণ্ডা ভাইঝি বোনঝি আনে কিনা। তাদের রাখবে কোথায়! খাঁদুর জন্যেই সন্তর্পণ খোলার চালের ঘর ক'খানা বজায় রেখেছেন।শেঠজীর রক্ষিতা যোগিয়া। যোগিয়ার মেয়ে লয়লা।

> ‘‘লয়লা এখন সেয়ানা হয়েছে। যোগিয়া ফুলতে ফুলতে এমন বেঢপ হয়ে উঠেছে যে শ্রীচৌহান তাকে স্পর্শ করেন না।’’[১৫২]

---তখন সে ভেবেছে ভাগ্যে মেয়েটা তাড়াতাড়ি সেয়ানা হয়ে উঠল নয়ত পথে দাঁড়াতে হোত।

শ্রীচৌহান যেখানে যান যোগিয়া সেখানে যাবে। ‘হাতের কাছে যোগিয়া না থাকলে ওঁর মেজাজ বিগড়ে যায়। যোগিয়া জানে শ্রী চৌহানকে,ষোল বছর বয়েস যখন ওঁর, তখন থেকে যোগিয়া ওঁকে সেবা করছে। আজ না-হয় বেঢপ হয়ে উঠেছে নিজে, কিন্তু ছুকরী-গুলোকে

তালিম দেবে কে!

তাদের তালিম দিতে হবে, ল্যালার ওপর নজর রাখতে হবে : বিটকেল শখ চাপে কিনা শ্রীচৌহানের মগজে, ল্যালাকে লেলিয়ে দিয়ে তিনি খেল দেখতে ভালোবাসেন ল্যালা কুকুরের মত জিভ দিয়ে চাটে। চাটতে চাটতে কামড়ে বসল হয়তো। যাকে কামড়ালো সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল, দেখে শ্রী চৌহান পরমাননন্দ লাভ করলেন। ঐ সব বিটকেল সখের জন্যেই ল্যালাকে পুষছেন শ্রীচৌহান। ভাল ভাল সাজ পোশাক পরিয়ে সভ্য করে তুলছেন ল্যালাকে। পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ওকে, একদম উলঙ্গ সাজোয়ান এক ছোকরা আঁস্তাকুড় হাতড়ে কি যেন খাচ্ছিল। ধরে নিয়ে এলেন তাকে শ্রী চৌহান, স্নান করিয়ে জামা-কাপড় পরিয়ে ঘরে বন্ধ করলেন। পাঁঠার মত চিৎকার করত তখন ল্যালা, একদম কথা বলতে পারত না। তারপর ল্যালার আসল গুণটি টের পেলেন শ্রীচৌহান। লেখক অবধূত যেন এখানে শিল্পীর সামাজিক দায় ভুলে গেলেন যেমনটি শুনেছেন তেমনটি বলেছেন। যেমনটি দেখেছেন তেমনটিই দেখিয়েছেন। এ রসের রসিক তিনি নন। এখানে অবধূত বিকৃতির রূপকার অথচ নিজে অবিকৃত। প্রসঙ্গটি হলো--বেশ বড় একটা দোঁ-আশলা কুত্তী ছিল শ্রীচৌহানের। কুত্তীটা পরিত্রাহি চিৎকার করছে কেন দেখতে গেলেন শ্রী চৌহান একদিন রাত্রে। দেখলেন, ল্যালা তাকে পাকড়াও করেছে। আড়ালে দাঁড়িয়ে উনি দেখলেন, ল্যালার কাণ্ডকারখানা। তারপর থেকে ল্যালার কদর বাড়ল।। যোগিয়ার ঘরে ল্যালাকে আনতে শুরু করলেন।

> "যোগিয়া থাকবে, যোগিয়ার মেয়ে লয়লা থাকবে আর ল্যালাও থাকবে এক ঘরে। মানতে হোল মেয়েকে শ্রীচৌহানের আবদার। এখন অবশ্য লয়লা ল্যালাকে পছন্দ করে। সময় নেই অসময় নেই ল্যালাকে নিয়ে ঘরে দরজা দেয়।"[১৫৩]

---এই বর্ণনার বক্তব্য পরিণত পাঠক বুঝবেন অপরিণতরা আভিধানিক অর্থ বুঝে ভুলে যাবেন। অবধূত এইভাবে অশ্লীল বিষয়ের বর্ণনা অত্যন্ত শ্লীলতার সাথে সেরেছেন। অবধূতের উপলব্ধ সত্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে কোনো সমস্যা যে হয়নি -এটাই তাঁর যোগ্যতার সবচেয়ে বড় পরিচায়ক। লয়লা হলো যোগিয়ার মেয়ে। মাকড়া বৈতাল আর বোলতা -এরা শেয়ার মার্কেটে শ্রী চৌহানের সাথী। তারকেশ্বরের হোটেলওয়ালা হরতন । হোটেলে দুটো মেয়েমানুষ লাগাবার দরুন হরতনকে দুখানা টেবিল বাড়াতে হয়েছে। দুখানা টেবিল মানে বারোখানা চেয়ার। বারোখানা চেয়ার বাড়িয়েও ঠেলা সামলাতে পারছে না হরতন। ভেঙে পড়ছে মানুষ ওর হোটেলে।কি করে যেন রটে গিয়েছে যে কলেজ-গার্ল দুজন হরতনের হোটেলে পরিবেশন করে। কলেজ-গার্ল দুটিকে জুটিয়েছে হরতন চন্দননগরের বাজার থেকে। সাচ্চা দরবারের মানুষগুলো জীবন-যুদ্ধে বিক্ষত। উদরপূর্তির প্রয়োজনে ওরা আর সবই ভুলতে বসেছে। তাই পানের দোকানদার বালাখানা হোটেলওয়ালা হরতনকে বলেছে, সামনের মেলার একমাস একটা মেয়েমানুষ ভাড়া করবে, যেমন হোটেলওয়ালা হরতন করেছে। অর্থাৎ তারকেশ্বর মেলার মূল আকর্ষণ মেয়েমানুষ।

হোটেলওয়ালা হরতনের নিজস্ব চাকর বালাই। তার কাজ হোটেলের খদ্দের জুটিয়ে আনা।

বালাই অবশ্য বলে সে হোটেলের সরকার বাবু। তার কাজ হোটেলের খদ্দের জুটিয়ে আনা। সে এখন তাস পেটায় যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে, আর যাত্রাদলের একটি মেয়ের কাছে গান শেখে ---গোলেমালে গোলেমালে পীরিত কোর না। সে হোটেল থেকে রান্না করা মুরগীর মাংস যাত্রাওয়ালাদের সবাইকে পেটভরে খাইয়েছে। যাকে বলে ভুরিভোজ। পরপর কয়েকদিন মুরগী না খেতে পেলে বৃহন্নলার নাকি গা ম্যাজম্যাজ করে। যাত্রাদলের মেয়ে বৃহন্নলার দৌলতে যাত্রাদলের লোকেরা হরতনের হোটেল থেকে ভাল-মন্দ খেতে পারে। স্মরণীয় সেকালে হোটেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা ! 'সাচ্চা দরবারে কোনো হোটেলে মুরগী রান্না করার হুকুম নেই।' তখনই শুরু হয়েছে অন্তরালে নিয়মভঙ্গ।

বীভৎসতা ও নাগাবাবা

মেলার ওধারে প্রকাণ্ড বটগাছটার তলায় কয়েকটি নাগা বাবা এসে ধুনি লাগিয়েছেন। ভিড় জমে আছে তাঁদের ঘিরে। ভক্তরা গাঁজা চড়াচ্ছে আর প্রসাদ পাচ্ছে।' আনাড়ী মানুষের সাধ্য কি যে তাঁদের কাছে যাবে। গেলে যে দম আটকে যাবে না তাই বা কে বলতে পারে। বড় তামাকের কড়া ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে গাছতলা। মাঝে মাঝে গগনভেদী চিৎকার উঠছে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে--- 'ভোলে বোম্, বোম্ ভোলে, সাচ্চা দরবার---', জয়ধ্বনিটা শোনা যাচ্ছে না, সাচ্চা দরবার বলার সঙ্গে সঙ্গে এক নাগা বাবা শিঙা ফুঁকছেন। বাঁক কাঁধে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কোনও কোনও ভক্ত মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। কেউ কেউ বা খেপে উঠে মন্দিরের গায়ে জলের কলসী ছুঁড়ে মেরে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে লাইন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সাচ্চা দরবারে সবাই সমান :

> "বলার কিছুই নেই। সাচ্চা দরবারের আইন আলাদা। ওখানকার মারপিটের জন্য কেউ কাউকে দায়ী করে না। পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের মোটরগাড়ি করে যাঁরা এসেছেন, আর পায়ে হেঁটে যাঁরা গিয়েছেন---দু'পক্ষই বরদাস্ত করছেন দু'পক্ষকে। সাচ্চা দরবারের দরবারী কায়দা কিছু সময়ের তরে অন্ততঃ মানুষের মন থেকে মানুষকে ঘেন্না করার নিঘিন্নে প্রবৃত্তিটাকে ঘুচিয়ে ছেড়েছে।"[১৫৪]

সবায়ের জল ঢালা শেষ হবে যখন, তা সে বেলা চারটেই বাজুক আর পাঁচটাই বাজুক, জল ঢালা শেষ হলে পর রেহাই পাবেন ভোলানাথ, তখন ভোগরাগ হবে। ফুলের মালা পরে বিশ্রাম করবেন তখন থেকে ভোর না হওয়া পর্যন্ত, আর কেউ বিরক্ত করতে পারবে না। অবধূত সরস ভঙ্গিতে বলেছেনকেন তারকেশ্বরে নৈশবাস প্রয়োজন। তাঁর মতে সাচ্চা দরবারে আরজি পেশ করতে হলে রাত্রে থাকতে হয়। দিনের বেলা কে কার কথা শোনে! মাথায় অবিশ্রান্ত ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে থাকলে কেউ কিছু শুনতে পায় কি?

> "ভোলে বোম্ সকলের কামনা-বাসনা পূর্ণ করেন, যদি ওঁর কানে আরজিটা পৌঁছতে পারা যায়। আশুতোষ কিছুতেই রুষ্ট হন না, কারও কোনও অপরাধই ওঁর কাছে অপরাধ নয়। মহাপাপী আর মহাপুণ্যবান দুজনেরই সমান মূল্য সাচ্চা দরবারে।

বিশ্বপিতা পরমেশ্বর যিনি, বিশ্বসুদ্ধ মানুষ যাঁকে বাবা বলে ডেকে বুকের জ্বালা জুড়োয়, তিনি কি কোনও কারণে রুষ্ট হতে পারেন। বরং মহাকাল সর্বদ্রষ্টা, অনন্ত কোটি সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র সাক্ষী, কার সাধ্য ওঁর নজর এড়িয়ে কোনও কিছু করবে।”[১৫৫]

অশ্লীল অন্যায় আর বড়ুয়া সাহেব

একটানা ত্রিশ বছর শহরে শহরে ঘুরেছেন বড়ুয়া সাহেব। ত্রিশ বছর স্রেফ আসামী দেখেছেন আর ফরিয়াদী দেখেছেন শুনেছেন । এখন দেখছেন হাসি-কান্নায় গড়া সংসার। তখন যেন শুনতেন সাক্ষী নামক এক শ্রেণির যন্ত্রের প্রলাপ, আর উকিল নামক আর এক যন্ত্রের বিলাপ। সে যাই হোক ত্রিশ বছর এজলাসে বসে পেনাল্ কোডে লেখা ক্রাইমগুলো মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল বড়ুয়া সাহেবের। পেনাল কোডের নাগালের বাইরে মানুষের শয়তানী বুদ্ধি কি খেলা খেলতে পারে তা এখন স্বচক্ষে দেখলেন তিনি। সেসব দেখে তাঁর মনে হয় পকেটমারটাকে পেলে তিনি তাকে কাছ ছাড়া করতেন না, অষ্টপ্রহর তাকে সঙ্গে রেখে বুঝতে চেষ্টা করতেন কেন সে পকেট মারে। পকেটমারা ছাড়া উপার্জনের অন্য কোনও পন্থা পেলে কি সে পকেটমারার মত ঝুঁকির কাজ করতে যাবে? বড়ুয়া সাহেবের মনে এখন দয়া-মায়া যেন একটু বেশিই অনুভূত হয়। বড় বড় হুজুরদের সঙ্গে হরদম খানাপিনা করেছেন, আদবকায়দা বজায় রাখতে রাখতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে। এখন উনি চান স্বস্তি সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। এটাই তাঁর চরম অভিজ্ঞতা।

একটা ছোট্ট বিছানা আর পত্নীকে নিয়ে বিব্ভুল ঠাকুরের ঘরে আশ্রয় নেন। পুকুরে স্নান তেলেভাজা আর গরম মুড়ি খান টিফিনে। লাঞ্চ করেনই না। বাবার প্রসাদ খান রাত্রে দুধ মিষ্টে খেলেই চলে যায়। বড়ুয়া সাহেব দর্শন স্পর্শন পূজা ইত্যাদির ধার ধারেন না। সকালে ঘুম ভাঙলে মাটির ভাঁড়ে চা খান দোকানী একটা মাটির ভাঁড় আর এক কেটলি চা দিয়ে যায়। চা খেয়ে একপাক ঘুরে আসেন ভিড়ের মধ্যে। মানুষ দেখতে ওঁর ভালো লাগে।

রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপচাপ যান মন্দিরে। ধন্নায় থাকা মানুষদের দেখে তিনি ভোলানাথের কাছে আকুল প্রার্থনা করেন :

> “হে করুণাময়, আর দুঃখ দিওনা এদের। হে দয়াল, রোগমুক্তি করে এদের রক্ষা কর। তাঁর মনে হোত ‘কোন্ দু:খে যে মানুষ ঘরের পাশের মহাতীর্থ ছেড়ে নাজেহাল হবার জন্যে কাশী গয়া বৃন্দাবন ছোটে, তা উনি ভেবে পান না।”[১৫৬]

একদিন বড়ুয়া সাহেব মানুষের কুকীর্তির স্বরূপ টের পেয়ে গেলেন। ভোলানাথ কেন যে মানুষের এত কষ্ট দেন বোধহয় সেই দুঃখী মানুষটাই তা বোঝে। ভগবানের বিচার সূক্ষ্ম বাইরে দেখে বোঝা যায় না। সে রাতের ঘটনাটা এইরকম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখন। সরু গলিটা পার হয়ে আর একটু চওড়া গলিতে পড়লেন। দু’পাশে দোকানঘর, সব বন্ধ। রাত প্রায় দুটো

তখন। দোকানগুলো পার হয়ে বাঁ দিকে ঘুরতে হবে। তারপর খানিক গেলে বাবার নাটমন্দির। চলেছেন নিশ্চিন্ত -সাচ্চা দরবারে আবার ভয় কী? আর দু ঘন্টা পরে খুলে যাবে মন্দির। বোম ভোলের মঙ্গল আরতি শুরু হবে। ইতিমধ্যে হয়ত বাঁক নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ভক্তরা ! দুটো দোকানের মাঝখানে একটি মানুষ যেতে পারে এমন একটু সরু পথে দোকানের পেছনের বাড়িতে যাওয়া আসা চলে। খানিকটা দূর থেকে দেখলেন বড়ুয়া সাহেব,ওধার থেকে দুটো মানুষ ধরাধরি করে কি যেন বয়ে নিয়ে এসে সেই গলিতে ঢুকে পড়ল। পা থেমে গেল বড়ু য়া সাহেবের, এ সময় ওটা কি নিয়ে গেল ওরা। বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন বড়ু য়া সাহেব যা ওরা বয়ে নিয়ে গেল। বুঝতে পারলেও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না যেন। তীর্থভূমিতে এ বিশ্বাস করাই তো কষ্ট!

> ‘‘জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে বেশ বোঝা গেল। খুব সম্ভব ওর মুখ বেঁধে ফেলেছে, তাই চেঁচাতে পারছে না! কি মতলব? খুন করে ফেলবে নাকি?’’[১৫৭]

এই ঘটনায় যুক্ত আছে জঙলা। তীর্থের পাপ কাজ রোধ করার দলে সে নেতার আজ্ঞাবহ। বড়ুয়া সাহেব সেখানে পৌঁছে গেলেন। এটাও ভাবছেন যদি তাকে দেখে ফেলে তো ছেড়ে দেবে না। কিন্তু সে চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। বিদ্যুতের আলোয় দেখা কাঠের সিঁড়ির সামনে এসে বুঝলেন আলো আসছে দোতলা থেকে। বড়ুয়া সাহেব উঠে গেলেন ওপরে। একটু চেষ্টা করার পর ধরতে পারলেন কয়েকটা কথা ধরে আনা লোকটির সাথে মেয়েটির সম্পর্ক কী---এটা জানতে চাইলো---কিন্তু ওরা কোনো কথা বলতে নারাজ। তখন জংলা নামের কাউকে ছুঁড়ির জামা কাপড় খুলে নিতে বলা হলো। সে বাধা দিচ্ছে বোঝা যাচ্ছে---অল্প একটু হুটোপুটির শব্দ শুনতে পেলেন বড়ুয়া সাহেব। অস্পষ্ট একটু গোঁঙানিও যেন কানে গেল। তারপর শোনা গেল সেই গলার আওয়াজ---জানতে চাওয়া হলো সে কি তার পরিবারকে ভাড়া খাটাতে নিয়ে এসেছে? ধরে আনা পুরুষ লোকটি বললো সে ওসব কাজ করেনি---মিছিমিছি তাকে ধরে আনা হয়েছে। এখন আমরা ‘সাচ্চা দরবার’ থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করছি :

> ‘‘মিছিমিছি তোমাদের ধরে আনা হয়েছে ? তিনজন মেড়োকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে বসে পাহারা দিচ্ছিলি আজই সন্ধ্যেবেলা। আজ কদিন ধরেই এই কম্ম করছিস। দিনের বেলা পরম ভক্তটি সেজে ঘুরে বেড়াস। মনে করেছিস আমাদের চোখে ধুলো দিবি কেমন?
>
> ও পক্ষ থেকে আর জবাব পাওয়া গেল না। তার বদলে আর একজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল ‘চেয়ারম্যান, পরীক্ষা করে দেখ না এ --- ওর কি ধরনের পরিবার।’’
>
> ‘জবাব হোল---‘হ্যাঁ আমার বিয়ে করা পরিবার, মিথ্যে বলব কেন?’

‘ঠিক আছে পরীক্ষা দে ছেড়ে দিচ্ছি। এই জঙলা,ওকেও ন্যাংটা করে ফেল।’ তার আদেশ প্রতিপালিত হল। লোকটা বোধহয় বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। চেয়ারম্যান তখন চরম আদেশটি দান করলেন---

> "ওকে ধরে ঐ ছুঁড়ীর ওপর চড়া, পরিবারকে যা করে লোকে, তাই ও করবে আমাদের সামনে। তা'হলে বুঝব যে একটা সত্যি কথা অন্তত বলেছে। তারপর ওকে আর ওর পরিবারকে দূর করে দেওয়া হবে এই রাত্রেই। নে, যা বলছি তাড়াতাড়ি কর, ভোর হ'য়ে এল।"[১৫৮]

আবার খানিকটা ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল। সেই সঙ্গে গোঙানিও শোনা গেল যেন একটু মেয়েটির মুখের বাঁধন খুলে দিতে সে কাঁদতে কাঁদতে দুবার বললে যে সে তার বাবা। অর্থাৎ ও মেয়েকে নিয়ে এসেছে পয়সা রোজগার করতে। আর পরিচয় দিলে নিজের পরিবার বলে। পরিবার প্রমাণ করার জন্যে যা করতে গেল,তার শাস্তি হিসেবে জংলা তার মুখে প্রস্রাব করে দেবে---এই আদেশ ঘোষিত হলো।

> "বড়ুয়া সাহেব আর শুনতে পারলেন না। পা টিপে-টিপে নেমে এলেন নিচে। সাবধানে পার হলেন সরু গলিটা, তারপর পড়ি তো মরি করে দে ছুট। ছুটে গিয়ে বাবার মন্দিরের দরজায় আছড়ে পড়ে কপাল ঠুকতে লাগলেন। তাঁর অন্ত রের অন্তস্তল থেকে একটি মাত্র কামনা শব্দহীন ভাষায় নিবেদিত হল ভোলনাথের দরবারে--- 'ভুলিয়ে দাও, যা শুনলাম সমস্ত ভুলিয়ে দাও দয়াময়, বিস্মৃতি দাও, নয়ত পাগল হয়ে যাব।"[১৫৯]

বড়ুয়া সাহেবের সূত্রে এঁর সাথে পরিচয়। ইনি সাচ্চাদরবারে একটি ঘর ভাড়া হিসেবে দেন বড়ুয়া সাহেবকে ভাড়া দিনে রাতে তিন টাকা। মণিকুন্তলা দেবী বড়ুয়া সাহেবের স্ত্রী। আগাপাস্তলা একটি আস্ত মেমসাহেব হয়ে সারা জীবন যাঁর কেটেছে এবং বাথটব ছাড়া স্নান করতে পারতেন না তিনি এখন সকাল- সন্ধ্যা দুবেলা পুকুরে ডুব দিচ্ছেন। ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঘন্টার পর ঘন্টা বাবাকে স্পর্শ করবেন বলে। সাধু খুঁজে বেড়াচ্ছেন মেলায় রাত্রদিন। রাত্রে বিনা মশারিতে মাদুরের ওপর শুয়ে তালপাতার পাখা চালাতে চালাতে শিবমন্ত্র জপ করছেন। গরদের শাড়ী পরেন। রাত চারটেয় পুকুরে ডুব দিয়ে তৈরী হয়ে গিয়ে দাঁড়ান বাবার দরাজার পাশে। বিব্‌ভুল ঠাকুর কোনও রকমে তাঁকে সেই সময় একটিবার মন্দিরে ঢুকিয়ে বাবাকে স্পর্শ করিয়ে নিয়ে আসেন। বাবাকে স্পর্শ না করে বাবার মাথায় জল না দিয়ে মণিকুন্ত লা নিজে জলগ্রহণ করবেন না। রসিকতা ক'রে লেখক বললেন বড়ুয়া সাহেব জানতেনই না যে পত্নীটির পেটে এতখানি ভক্তি জমা আছে।

চন্দ্রচূড় ভৌমিক এজন সাধুপ্রকৃতির ধনবান ব্যক্তি । লেখক তার কথা বলেছেন এ ভাবে। টাকা ধরে টাকাকে পোষ মানাতে পারে যে, পোষা টাকা যার ঘর থেকে উড়ে যায় না, সেই তো মানুষ--- যেমন শ্রীচন্দ্রচূড় ভৌমিক। এই চন্দ্রচূড় হলেন বনমালী লস্করের গদিতে হিসাব রক্ষক। চন্দ্রচূড় ভৌমিক বনমালী লস্করের দুই মেয়ে মেয়েকে তাদের বাপের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে নিজে একখানি ছোট্ট মুদির দোকান খুললেন। লাখ লাখ টাকা যে হাতে ঘরে তুলেছেন ফি বছর সেই হাতে সাড়ে তিন পয়সার তেল ছ'পয়সার গুড় মেপে দিতেন।

> "মুদির দোকানখানিতে বসে 'স্বহস্তে তেল, নুন, মশলা, বিক্রী করেন। লোকে দেখে বাহবা দেয়, সত্যিই আদর্শ ব্যক্তি। নিরহঙ্কার, নিরীহ মানুষ কাকে বলে যদি দেখতে চাও তাহলে দেখে এস সাচ্চা দরবারে গিয়ে চন্দ্রচূড় ভৌমিককে।"[১৬০]

চন্দ্রচূড় জানেন টাকাকে পোষ মানাতে। ধান, চাল পাট, আলু সব কিছুতেই টাকা আসে ওঁর ঘরে। বড় বড় কয়েকটা গুদোম আছে চন্দ্রচূড়ের। বছরে অন্তত পঞ্চাশ হাজার আয়। 'বাবার চরণামৃত মুখে না দিয়ে কোনও দিন এক কাপ চা পর্যন্ত খান না। বাবা জটিলেশ্বর চন্দ্রচূড়ের গুরুদেব।

যোল বছর বয়সে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বাবার কৃপালাভ করেন চন্দ্রচূড়। বাবা আশীর্বাদ করে বলেছিলেন--- ' যাও বেটা, এক রোজ তোর হো যায় গা।' ভক্তদের মুখে সংবাদ এল গুরুদেব জটিলেশ্বর স্বয়ং আসছেন সাচ্চা দরবারে। সাড়ে তিনশ-চারশ শিষ্য তাঁর সঙ্গে আসছেন। দশখানা বাস পঞ্চাশখানা মোটরগাড়ী, আর পাঁচখানা লরি আসছে। তাঁবু, সামিয়ানা,বাসন কোসন,আলো -কী নয়! লাউড স্পীকার আসছে দুটো। যজ্ঞ হবে আহুতির মন্ত্র ছড়িয়ে পড়বে আকাশে বাতাসে। অষ্টপ্রহর রামনাম গান হবে। হবে কাঙালী ভোজন। প্রতিদিন হবে কাঙালি ভোজন বাবা যতদিন থাকবেন। ওটার নাম 'ভোগ চড়ানো '। লাখ লাখ ভুখা ভগবানকে না খাইয়ে বাবা নিজের মুখে কিছু দেন না। বহুবার বহুতীর্থে গিয়ে চন্দ্রচূড় দেখে এসেছে তাঁর ভক্তরা কীভাবে তাঁর সেবা করেন। এবার তার নিজের দায়িত্ব ! এই দায়িত্ব পালন করতে তিনি বড়োরকম উদ্যোগও নিয়েছেন।

১. গোটা তিনেক গুদোম উপড়ে ফেললেন চন্দ্রচূড়। টিনের দেওয়াল টিনের চাল খুলে সব সরিয়ে ফেলা হল। সিমেন্ট বাঁধানো মেঝের ওপর তাঁবু পড়বে, জলবৃষ্টিতে কাদা হওয়ার উপায় নেই। ভক্তের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য ব্যবসায়িক ক্ষতিকেও এভাবে স্বীকার করে নিলেন।
২. বহু লোক সমাগমের কথা ভেবে গোটা দশেক টিউবওয়েল পোঁতার ব্যবস্থা করলেন। পঞ্চাশজন ধাঙ্গড়-মেথর সপরিবারে নিযুক্ত হোল বাথরুম পায়খানা বানাতে।
৩. তারপর কিনলেন টিন টিন ঘি, বস্তা-বস্তা কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম, ডাল, সুজি, চিনি, ডাব নারকেল, আলু কুমড়ো, সর্বস্ব চলে এল শহর থেকে।
৪. তিনটে ব্যান্ড পার্টি, তিনটে তাসা পার্টি আর দু'দল সানাই চলে এল।
৫. উঁচু উঁচু তোরণ বানিয়ে শানাইওয়ালাদের তার ওপর স্থাপন করলেন চন্দ্রচূড়। তিনদিন আগে থেকেই সানাই বাজতে লাগল।
৬. পাঁচমাইল আগে ব্যাণ্ডপার্টি আর তাসাপার্টি নিয়ে তৈরী হয়ে রইলেন চন্দ্রচূড়, শোভাযাত্রা করে গুরুদেবকে আনতে হবে। দেশ ঝেঁটিয়ে হাজার হাজার বাঙালি জমা হতে লাগল জটিলেশ্বর বাবাকে দর্শন করতে। মেলা জমে গেল।

বাঙালী ভক্ত চন্দ্রচূড়কে বাবার অন্য ভক্তরা এবার চিনতে বাধ্য হল। কেউ যা পারেনি চন্দ্রচূড় তা পেরেছে। বাবার দায়িত্ব আগে কেউ একা নিতে পারেনি। চন্দ্রচূড় তা ক'রে

দেখিয়েছে।

জটিলেশ্বরের বহু ধনী ভক্ত। এক কাপড়ের কলওয়ালা শিষ্য প্রেমজী ভাই দোসানি--- ইনি নতুন বস্ত্র দান করলেন। যমুনাপ্রসাদজী ভাই যেসব ভক্ত বাঁক কাঁধে করে আসে তাদের মেওয়া দান করার জন্য খুলে ফেলেন সেওয়াসদন। হরসুখ লালজী ভাই এই যজ্ঞে দুজন চোখের ডাক্তার আরেক জন দাঁতের ডাক্তার এনে দাঁত তোলা আর চশমা দেওয়া করালেন বিনা খরজে। লেখক রসিকতা করে বলেছেন : 'সাচ্চা দরবারের ভোলে বাবা বোম্ বাবা জটিলেশ্বর বাবার প্রতাপ দেখে বোধ হয় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।'

সর্বশেষ তুলাব্রত সমাপন করলেন চন্দ্রচূড়। অতি ক্ষীণদেহী বাবাকে বসানো হল রুপোর চেনে বাঁধা থালার ওপর। আরেকটিতে দেওয়া সাড়ে বাইশ সের সোনা আর সাড়ে বাইশ সের রুপো এবার বাবার সমান হোলো সেই রুপোর তুলাদণ্ড সুদ্ধ সোনারুপোর বাটগুলো শ্রীগুরু চরণে দক্ষিণা স্বরূপ অর্পণ করা হোল। এত সোনা রুপো রাখা বেআইনী কিনা সে প্রশ্ন উঠল না জটিলেশ্বর বাবা সমস্ত সোনা -রুপো দিয়ে দিলেন সরকারের হাতে। সরকার অন্ধদের হিতার্থে ঐ সম্পদ খরচা করবেন যুদ্ধের কাজে লাগানো যাবে না। দিন পনের পরে বিদায় হলেন জটিলেশ্বর বাবা। সঙ্গে সঙ্গে লোকে জানতে পারল চন্দ্রচূড় একদম ফতুর হয়ে গেছেন। মায় সেই মুদিখানাটাও বিক্রী হয়ে গেছে।

বনমালী লস্কর : প্রকৃত ধার্মিক

অগুণতি উপার্জন করেছেন বালিখাদানের মালিক বনমালী লস্কর। শহরে অফিস খুলেছেন হাজার হাজার বালি ভর্তি লরি পাঠিয়েছেন শহরে আর সিন্দুকে ঢুকেছে সীমাহীন অর্থ। মানুষের কষ্ট সইতে পারতেন না। সব দুস্থ মানুষকে নিজের পরিবার ভুক্ত জেনে পাশে দাঁড়াতেন। মন্দির পূজা -এসবের ধার ধারতেন না। দান করবার কথা শুনলে উনি খেপে উঠতেন। দান করার মত র্নিলজ্জ স্পর্ধা ছিল না তাঁর, কিন্তু কখন কার কি দরকার পড়ে তার খোঁজ রাখবার গরজ ছিল। দরকার পড়লেই হল, লস্কর মশাই তৎক্ষণাৎ টের পেয়ে যেতেন দরকারটি, এবং সেই দরকারটিকে নিজের দরকার বলে জ্ঞান করতেন। আশপাশের দশ বিশটা গ্রামের সব মানুষের আপদে বিপদে নিজেই যুক্ত হয়ে যেতেন। দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। ফলে দান করা আর হয়ে উঠত না। একদম দান-ধ্যান না করে বিশখানা গাঁয়ের যাবতীয় মানুষকে কাঁদিয়ে সজ্ঞানে শিবলোকপ্রাপ্তি হল যেদিন লস্কর মশায়ের, সেদিন ওঁর বড় বড় লোহার সিন্দুকগুলোয় কি ছিল কত ছিল কেউ জানতেও পারল না।

কোঁতকা : বিড়ি ও মাদক ব্যবসায়ী

ডজন দুয়েক মানুষকে দিয়ে বিড়ি বাঁধায় কোঁতকা। ওর ফ্যাক্টরিজাত বিড়ির নামডাক আছে। বিড়ি বেঁধেই দোতালা বানিয়েছে। মওকা পেলে ওপরের ঘর ভাড়া দেয়। তিনখানা ঘর আছে দোতলায়। প্রতি ঘরের ভাড়া রাত পিছু পাঁচ থেকে দশ টাকা। বিভভুল ঠাকুর যেখানে ৩

টাকা নিয়ে ঘর ভাড়া দিয়েছেন বড়ুয়া সাহেব ও মণিকুন্তলা দেবীকে সেখানে এই ভাড়া অনেক বেশি। অসৎ উপার্জন বেশিই হয়। লেখক অবধূত ব্যঞ্জনায় সেকথা বলেছেন। আদিম পিপাসার চরিতার্থতা ঘটাতে আসে যারা তারাই এখানে আসে :

> ''সাধারণ যাত্রীরা অত ভাড়ায় ঘর নেয় না। অসাধারণরা নেয়। ঘর নিয়ে রাত কাটাতে গেলে যেসব সরঞ্জাম লাগে কোঁতকা সাপ্লাই করে। বিছানা, বালিশ, জল জলের বালতি, আহার্য পানীয় যা চাইবে পাবে। গুড় থেকে তৈরী খাঁটি, জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ধরালে দপ করে জ্বলে উঠবে এমন জাতের মাল একমাত্র কোঁতকাই সাপ্লাই করতে পারে।''[১৬১]

ভয়ংকর রক,জৌলুস ওয়ালা একটি বঙ্গবালা সাহেবদের সাথে মেলায় ঘুরছেন। তিনি অনর্গল ইংরেজী বলছেন আর চকচকে দাঁত বার করে অনর্গল হাসছেন, শাড়ীতে পেঁচানো দেহটির প্রতিটি রেখাকে এমনভাবে সঞ্চারিত করছেন যে সাহেব দুটি তাঁকে বার বার দুপাশ থেকে ঠেসে ধরছে। ভয়ঙ্কর ভিড়ের দরুনই ঘটছে ঐ দুর্ঘটনাটা, ঘটছে বলে মহিলাটি খুবই মজা পাচ্ছেন। অবধূত ব্যঙ্গ-নিপুণ শিল্পী ---যত্রতত্র তার প্রমাণ মেলে:

''হেসে -গলে পড়ছেন একেবারে । সাহেবরাই তাঁকে সামলাচ্ছেন। হাজার হোক লেডি তো, ভিড়ের মধ্যে লেডিটিকে সাহায্য করা জেন্ট মানুষের পবিত্র কর্তব্য '' [১৬২]

এই মেয়েটিকে আরেকবার দেখা গেল চায়ের ট্রে নিয়ে কোঁতকা যখন উপরে গেল এর শুধু বক্ষ-বন্ধনীটি রয়েছে । মহিলাটির নিম্নাঙ্গে রয়েছে শুধু সায়া। হাত বাড়ালেন মহিলাটি, বললেন, চা দিতে আর এখন যেন কেউ বিরক্ত না করে---সে বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন। চায়ের ট্রে ওঁর হাতে দিয়ে কোঁতকা খুবই বিনীতভাবে বলল---

> ''কিন্তু গোলমাল হচ্ছে যে। নিচে লোক জমে যাচ্ছে। তীর্থ স্থান কিনা, গোলমাল বাধতে পারে। ' 'কেন ?' ফোঁস করে উঠলেন মহিলাটি--- ' আমরা ঘর ভাড়া নিয়েছি, এক ঘন্টার জন্যে দশ টাকা দোব।''[১৬৩]

এরপর দুই সাহেব যখন মারপিঠ করে দুজনেই ছুটে বেরিয়ে গেল তখন সে চুপি চুপি হাওয়া। কোঁতকা সাহেবদের ঠেলা খেয়ে পাঁচ হাত দূরে দেওয়ালে ছিটকে পড়েছিল অজ্ঞান হয়ে। আধঘন্টা পরে জ্ঞান ফেরে। মনে মনে সে ফুঁসছিল যদি পেত সেই দ্যুতিকে ! চরিত্রটির মুখে যে ভাষা অবধূত ব্যবহার করেছেন তা অত্যন্ত জীবন্ত। যদি ওঠবার শক্তি থাকত তার তাহলে খুঁজে বার করত সেই মাগীকে। এ ধরণের মানুষের কাছে মহিলাদের আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই। সে কথা লেখকের জানা। লেখক যখন ভদ্রসমাজের শিক্ষিত মনন-চিন্তনের কথা বলেন তখন এই ভাষা স্বভাবতই বদলে যায়। এমনই প্রসঙ্গ অহিভূষণ সান্যাল।

অহিভূষণ সান্যাল : কৃষক আন্দোলনের নেতা

সাত বছর জেল হয়েছিল কৃষক আন্দোলনের নেতা অহিভূষণের। সরকারের বক্তব্য সে নাকি চাষীদের খেপিয়ে দিয়ে বড় লোকেদের ঘর জ্বালাত। সরকার অনেক কষ্টে তাকে ধরে জেলে

দিয়েছিল। জেলে ঢুকে লোকটা এমন ই ভালো মানুষ সাজল যে সব কটা ওয়ার্ডারকে ভেড়া বানিয়ে ছাড়লে। আসলে কী করে বুঝবে যে জেল থেকে পালানোর ছক কষে ফেলেছেন অহিভূষণ সান্যাল! পরিকল্পনা মত এসে গেল শ্রাবণী মেলা বাবার মাথায় জল ঢালার জন্যে পাগল হয়ে উঠল লোকটা। শেষপর্যন্ত বড় জমাদার সাহেব ওকে সাচ্চা দরবারে ভেজবার একটা মতলব ঠাওরালেন। সেই পরিকল্পনা মত সতের জন ওয়ার্ডার চলেছে সাচ্চা দরবারে, বড় জমাদার বহুত তোড়জোড় করে এক রাত্তিরের জন্য বার করে দিলেন। সবার মাঝখান থেকে কীভাবে অহিভূষণ পালালেন এবং কিভাবে দেখা করলেন তাঁর স্ত্রী -পুত্রের সাথে সে এক অদ্ভুত পরিকল্পনা। অবধূতের মুন্সীয়ানায় সম্ভব হয়েছে। কাহিনি বয়নের অসামান্য দক্ষতা এখানে প্রকাশিত। অবধূতের প্রধান গুণ এই যে পথের ওপর নানা জনের সংস্রবে তাঁর কাহিনি গতি পায় জীবনকে তিনি বিস্তৃত জায়গায় সন্ধান করেন। একটি পরিবার আর তার গুটি কয়েক লোকজন নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে একই বিষয়কে বার বার ফিরিয়ে আনেন না। এখানেও তাই ঘটেছে।

অহিভূষণ সম্পর্কে বিজয়া বলেছে তার ছেলেকে যে তার বাপ জঙ্গলের বাঘ, তাকে খাঁচায় আটকে রাখলে বাঁচবে কেন ? কিছুতেই ওরা ঐ জঙ্গলের বাঘকে আটকে রাখতে পারবে না।

ছেলের সাথে শেষ পর্যন্ত দেখা হল বাবার । দেখা হোল স্ত্রী বিজয়ার । পুলিশের চোখ এড়িয়ে একটা ছাগলের খোঁয়াড়ে রাতের অন্ধকারে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের জীবনের এই ঘটনা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে এসেছে। এরজন্য তাঁকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি।

> "অহিভূষণ সান্যাল, যার নামে দুটো জেলার যাবতীয় চোর বাটপাড়, কালোবাজারী আর রক্তচোষা জোতদার থরথর করে কাঁপে, সেই ব্যক্তি নিজে তখন ছেলেকে বুকে চেপে ধরে কাঁপছে। বেচারী বিজয়া ওদের বাপ ছেলের পায়ের কাছে ছাগল-নাদির উপরেই বসে পড়ল। মানুষের শরীর তো।"[১৬৪]

বিপ্লবী জীবনের আঁচ কেবল বিপ্লবীকেই ছুঁয়ে যায় না। পরিবারের সবাই তার আঁচ পায়। অহিভূষণের ছেলে মৌসম আর স্ত্রী বিজয়ার মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে তা জানা যায়। তারা ভাবছে আর মাত্র দুটো দিন, তারপরেই মেলা শেষ। এক লাখ মানুষ জেগে আছে সাচ্চা দরবারে, দোকান পসার সব খোলা। এই তিনটে রাত ভোলে ব্যোম ঘুমোবেন না। রাতে খোলা থাকবে মন্দির, রাজ-রাজেশ্বর সেজে সারা রাত ভক্তদের দর্শন দেবেন ভোলা দিগম্বর। শেষ রাত থেকে জল চড়বে তাঁর মাথায়। একটি ভক্তও জল না চড়িয়ে ফিরে যাবে না। আকাশে চাঁদ হাসছে, একফোঁটা মেঘ নেই। বিশ্বেশ্বরের সামনে ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়া, দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। এখনো তো দেখা মিললো না! চরিত্র দুটি খুবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ভবানীশঙ্করকে রাত্রে বাবাকে তামাক সেজে দিতে হয়। খাট বিছানা, খড়ম, জলের জায়গা সমস্ত বাবার ঘরে সাজিয়ে দিয়ে হাতে তালি দিয়ে গাইতে শুরু করলেন ভবানীশঙ্কর---হর-হর-হর-মহাদেও। ওঁর সুরে সুর মিলিয়ে হাজার কণ্ঠে গেয়ে চলল --- হর হর -হর মহাদেও।

পাষাণ দেবতা নিজেও যেন সেই সুরের তালে তালে দুলতে লাগলেন। প্রত্যেকটি মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে ঐ স্তব কেউ একটুও নড়ছে না।

ভবানীশঙ্করের দাদা পার্বতী শঙ্কর ভিড়ের ভেতর অতি কষ্টে ঘুরছেন। কাকে যেন খুঁজছেন উনি।, প্রতিটি মহিলার মুখপানে ভালকরে নজর দিচ্ছেন অন্য কারও পক্ষে ঐ কর্মটি করা দস্তুরমত বিপদ্‌জনক হয়ে দাঁড়াত। পার্বতীশঙ্করের পক্ষেই সম্ভব ঐ ভাবে মহিলাদের মুখ নিরীক্ষণ করা। ওঁকে চেনে সবাই, যারা চেনে না তাঁরাও ওঁর পানে তাকিয়ে মাথা নত করে-ব্যক্তিত্বের সাথে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা এমন একটা জায়গা এনে দিয়েছে পার্বতীশঙ্করের জন্যে। পার্বতীশঙ্করকে সকলেই জানে। দিনরাত অষ্টপ্রহর জপ-তপ নিয়ে থাকেন। দরবারে ক্বচিৎ আসেন। সকাল-সন্ধ্যে দুবার বাবাকে স্পর্শ করে আবার জপে বসেন। যাত্রী -যজমানের পরোয়া করেন না।

> "সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে পার্বতীশঙ্করের মুখ-চোখ দেখে, যে মানুষটি একটু অন্য জাতের। মেটে- মেটে রঙের পার্বতীশঙ্কর, কিন্তু সেই মেটে রঙের ভেতর থেকেও কেমন যেন একটু স্নিগ্ধ আলো ফুটে বেরুচ্ছে।"[১৬৫]

আদেশ নয়, অনুরোধও নয়। পার্বতীশঙ্করের সেই আহ্বানে কেমন যেন একটু আলাদা ধরনের সুর ফুটে উঠল। সেই সুরটিকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি বিজয়া। ছেলের হাত ধরে ঠাকুর মশায়ের পেছন পেছন মন্দির এলাকা থেকে বেরিয়ে এল। বোঝা গেলো অনেক পরে যে পার্বতীশঙ্কর বিপ্লবী দলের সাথে যুক্ত। আমরা স্বামীজী এবং নিবেদিতাকে জানি এঁরা বিপ্লবী আন্দোলনকে পরোক্ষে সাহায্য করেছিলেন। দুর্নীতি পরায়ণ রেশন ডিলার ভুজঙ্গ সরকারের স্ত্রী 'দেবী ' হলেন কী করে লেখক এর উত্তর দিয়েছেন ঈষৎ ব্যঙ্গ করে।

> "মুরলী সরকার যেদিন থিয়েটারে নামলেন সেদিন হয়ে গেলেন দেবী। দেব-দেবী ছাড়া সাধারণ জীব কি থিয়েটারে নামতে পারে!"[১৬৬]

লেখক-এ মন্তব্যটি করেছেন স্বভাব-সিদ্ধ রসিকতায়। মুরলী দেবীর নামে একটা রেশনের দোকান চলে। বিঘোষণ এখন সে-ই দোকানের ম্যানেজার। সে মুরলী দেবীর নির্দেশবাহী। যদিও সেই দোকানের আসল মালিক ভুজঙ্গ সরকার তবু সে স্ত্রীর নির্দেশে চলতে বাধ্য। তাই চাঁদা দেওয়ার ক্ষমতা মুরলীদেবীর মত অনেকেরই নেই।

অশ্লীল বিষয়ের সংযমী প্রকাশ

বকরাক্ষস রেশন ডিলার অসৎ ব্যবসায়ী ভুজঙ্গ সরকারের চাকর। বক জাতে বাগ্দী । এই লোকটি জ্যান্ত পাঁঠা কামড়ে খেতে পারে। এক ফাঙ্‌শন্ ওয়ালা বক রাক্ষসকে দিয়ে ঐ বীভৎস শো-টি দেখাতে গিয়েছিল, এরফলে মাসখানেক বককে জেল খেটে আসতে হয়। তারপর থেকে জ্যান্ত পাঁঠা খাওয়া সে ছেড়ে দিয়েছে । তবে সুবিধে পেলে কেজিখানেক কাঁচা মাংস সে খেয়ে ফেলে। দরকার পড়লে লাঠি হাঁকড়ে বিশ-পঞ্চাশটি লোককে সে খতম করে দিতে পারে।

অত্যধিক পরিমাণে ধুলো বালি-কাঁকর মেশানো চাল গম দেওয়ার দরুন একবার শতখানেক মানুষ সরকার মশায়ের দোকান লুঠ করতে এসেছিল। তারা বকের সাহস আর বীভৎস শক্তির

জন্য কিছুই করতে পারেনি। বকের লাথি খেয়ে জনা-দশেককে যেতে হয় হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ঢোকে জেলে কেননা সরকার মশায় তাঁর দোকান লুট হয়েছে বলে নালিশ ঠোকেন। প্রশাসন টাকার বশ। অবধূত তা জানতেন।

ডিলার পরিবারে এসে বক আরো একটা কাজ বরাবর করে এসেছে । সে সরকার মশায়ের পরিবারদের সরকার মশায়ের হুকুমে পেটাত। সরকার মশাই তখন সামনে বসে মজা দেখতেন। পিটুনির চোটে এক পরিবার ভাগল আর-একজন গলায় দড়ি দিল। এখন মুরলী দেবীর নির্দেশেই বক তার মণিবকে ধরে পেটায়। বক এখন মণিব-পত্নীর থেকে অন্য নেশার ছোঁয়া পেয়েছে। তাই মণিবের নির্দেশ সে মানে না।

'সাচ্চা দরবার' উপন্যাসে লেখক ধর্মপালনের আড়ালে জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়কেই ব্যক্ত করেছেন। ভক্তির ধারার পাশাপাশি লোভ-লালসা পরিকীর্ণ যে পঙ্কিল স্রোত বয়ে চলেছে তার পরিচয় আমরা পাই এ উপন্যাসে। একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী জীবনের কী গভীর অভিজ্ঞতার কথাই না শুনিয়েছেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

বারো. শুভায় ভবতু : মৃত্যু যেখানে পায়ে পায়ে

'শুভায় ভবতু' উপন্যাসে ব্রিটিশ শাসনাধীন অত্যাচার আর সেই অত্যারের প্রতিবাদ রূপায়িত হয়েছে। এই প্রতিবাদ নানা ধারায় প্রবাহিত। সেই নানা ধারার পরিচয়ও লেখক এখানে দিয়েছেন। শৈলীর দিক থেকে এ উপন্যাস ব্যতিক্রমী। তিনশ' পাতার এই উপন্যাসে প্রথমভাগে প্রায় দুশো পাতা লেখা হয়েছে কথকের মুখে । কিন্তু ১৯৭ থেকে ২৯৬ পর্যন্ত প্রায় একশ পাতা একটি খাতায় লেখা কাহিনি। এই খাতাটি আলোচ্য উপন্যাসের এক বিশিষ্ট সক্রিয় চরিত্র দুরি বৌদির লেখা। অনেকটা ডায়ারি লেখার মত। এই ডায়ারিটা অবশ্য পত্রাকারে রচিত। এই পত্রটি লেখা হয়েছে এই উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র ব্রজমাধব চৌধুরীকে। ইনি পুলিশের বড় কর্তা। ব্রজমাধবের গুরুদেব 'দুরি বৌদি'-র বাবা। ইনি গীতার নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন ব্রজমাধবকে। তাঁর পুত্র-কন্যাও বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত। বড় মেয়ে মারা গেছে কৈশোরেই। ছোট মেয়ে দুরি ও তার দাদা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গীকৃত। দেশে চলছে ইংরেজ শাসন।

গোটা উপন্যাসে ব্রজমাধব দাপটের সাথে পুলিশের চাকরি করেছেন। পদোন্নতি হয়েছে। আর সেই পদোন্নতির প্রতিটি বাঁকে হাত রয়েছে 'দুরি বৌদি'-র। দুরি বৌদি, তাঁর দাদা এমন কি তাঁর বাবাও দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত। দাদার আন্দামান দ্বীপে জেল হয়েছে। আবার ফেরৎ এসেও তিনি স্বাধীনতার কাজে লেগে পড়েছেন। এ উপন্যাসে গীতার নিষ্কাম ধর্মের কথা প্রচার করা হয়েছে। বস্তুত, ব্রজমাধবের শালা শচীনের স্কুল-বন্ধু উপন্যাসের কথককে দেখাও গিয়েছে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' বইটি হাতে নিয়ে পড়তে।

দুরির সাথে বিবাহ হয়েছে তার জামাইবাবুর। দিদিকে গৌরীদান করেছিলেন তাঁর বাবা। এই মানুষটিও বিপ্লবী। নেপেন দা গোমেশ আর কথককে বাঁচানোর মাধ্যমে দুরি বৌদির অভিনয়-

কুশলতা এবং সাহসিকতার যথেষ্ট পরিচয় আছে---এ উপন্যাসে তখন অবশ্য দুরির স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করে আত্মগোপন করেছিলেন দুরির দাদা। এই উপন্যাসের প্রথম অংশের দুশো পাতায় আমরা কেবল ঘটনা ঘটে যেতে দেখি আর পরবর্তী একশ' পাতার একটি চিঠি বা খাতা থেকে সকল ঘটনাকে এবং তার পরম্পর্যকে বুঝে নিতে পারি।

'শুভায় ভবতু' উপন্যাসে সমকালীন কলকাতার ছবি পাই। পাশাপাশি উঠে এসেছে পূর্ববাংলায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতার লড়াই। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাঁধিয়ে মজা লুটেছে ইংরেজ শাসকেরা। বাংলার উচ্চশিক্ষিত এবং উদারচেতা মানুষেরা দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁদের আহ্বানে বুঝে না বুঝে এসেছে প্রচুর দেশবাসী যুবক-যুবতীরা। ইংরেজ বিতাড়নের পরে দেশটা যাদের হাতে পড়বে তারা যদি নিজেকে উপযুক্ত করে গড়তে না পারে তাহলে দেশের মানুষ অনুশোচনা করবে কেন ইংরেজ বিতাড়ন করা হলো। এমন ভাবনার কথাও উপন্যাসে এসেছে। সরকারের পক্ষে যারা লড়ছে তারা সকলেই যে ইংরেজ তা তো নয়! এ দেশের মানুষই সরকারী কর্মচারী । কেউ পুলিশ কেউ পুলিশের খবর সংগ্রহকারী চর বা স্পাই। আবার যাঁরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা একভাবে ভাবছেন না। কেউ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আনতে আগ্রহী আবার কেউ আলোচনার পথে দেশকে স্বাধীন করতে চান। যাঁরা দেশের স্বাধীনতা আনতে ইংরেজদের বিতাড়নের স্বপ্ন দেখেন তাঁদের কাছে যে কেবল ইংরেজরা মরবে এমন তো নয়। দেশের মানুষও মরবে। দেশবাসী সবাই যে শত্রু তা নয়---এমন কি সরকারি কর্মচারিরাও নয়। তাঁরা বোঝেন সরকারি মাইনে নিয়ে তাঁরা চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। তাই পুলিশের পদস্থ অফিসার হওয়ায় ব্রজমাধব নিজের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের না গ্রেপ্তার করে পারেন না।

নানা সমস্যা এ উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। এ উপন্যাসে বিজয়ী ইংরেজদের বর্বরোচিত ব্যবহারও উঠে এসেছে। সাহেবদের আজ্ঞাবাহী হয়ে ব্রজমাধব জেলেদের মেয়েকে তুলে নিয়ে এলো আর সাহেবরা তাকে ছিবড়ে করে ফেরৎ দিয়ে এলো। এই ঘটনার পরে ব্রজমাধবের স্ত্রী ও ছেলের ঘটলো মৃত্যু--- দোষ গেলো দুরি বৌদির ওপর আসলে সে এ কাজ করেনি। করেছে ঐ অত্যাচারিতের পরিবার। লেখক এভাবে আরো বহু সামাজিক অত্যাচারের প্রতিশোধকে 'দুরি বৌদি'-র নামে চালিয়ে দিলেন। এদিকে দলে দলে তরুণ-তরুণীরা অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছে আর হত্যায় নেমে পড়ছে। লেখক এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

> "আন্দামান ফেরৎ দাদা আর দাদার দাদারা প্লান করতে লাগলেন। রেজোলিউশন তারপর এক্শন।---মানুষ-মারাটা আর মানুষ মারা রইল না তখন। রেজোলিউশন অনুযায়ী সাকসেসফুলি মুভমেন্ট পরিচালনা করা হয়ে দাঁড়ালো।"[১৬৭]

দুরি বৌদির নামে সবই চাপানো হতে লাগলো। ফলে ইংরেজদের পুলিশ বাহিনীর একটা বড় অংশ দুরি বৌদির পিছনে লেগে রইল। একদিকে ইংরেজ পুলিশ কর্তার পরিকল্পনা অন্যদিকে 'দুরি বৌদি'-র স্বামীর ফন্দি---দু'দিক থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে গেল 'দুরি বৌদি' নামের বিভীষিকা! দেশের ঘরে ঘরে পূজিতা হচ্ছেন দুরি বৌদি আর সরকারি পুলিশের ঘুম ছুটে যাচ্ছে এই

দুরি বৌদির নাম শুনলে। দুরি বৌদি শেষপর্যন্ত হতাশার শিকার হলেন তুলে নিলেন কাগজ কলম লিখলেন ডায়ারি। এখন তিনি সংসার জীবনে এসেছেন---অবশ্য তাঁর মহান দেশপ্রেমিক স্বামী দেশের বাইরে! দেশে রটে গেছে তাঁর মৃত্যু সংবাদ---আসলে একটি সাধারণ নারীর মৃত্যুকে 'দুরি'-র মৃত্যু বলে চালিয়ে দিয়েছে ব্রজমাধব চৌধুরী। দুরির নামে মিথ্যা এক মৃত্যুর ঘটনা রটিয়ে আসল দুরিকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা করেছে সরকার। যখন সবাই দেখবে একটি নক্কার জনক মৃত্যুকে দুরির মৃত্যু বলে চালানো হচ্ছে তখন দেশের লোকই আসল খবর ফাঁস করে দুরিকে ধরিয়ে দেবে। এমনকি নিজের অহং বোধ থেকে নিজেও ধরা দিতে পারে 'দুরি বৌদি'---এমন একটা পরিকল্পনা ছিল পুলিশ কর্তা ব্রজমাধবের মাথায় ---এসব কথা আমরা উপন্যাসের শেষভাগে দুরির খাতা থেকে জানতে পারি।

এই উপন্যাসের মধ্যে তিনটি উপকাহিনি যুক্ত হয়ে একটি প্রবাহে মিশেছে। বেকার সমস্যা ---পরম দৈন্য আর খাদ্যাভাবের তাড়নায় গোমেশ,নেপেন এবং কথক মিলেছে বার্ড কোম্পানীতে কাজের সূত্রে---একই ডেরায় থাকে সস্তা থাকা খাওয়ার আশায়। সপ্তাহে দু'রাত বা দু'দিনের বেশি কাজ জুটত না কারো। সেখানে ঘটেছে ইংরেজ হত্যা! গোমেশ ধরা পড়েছে। বাকিরা পালিয়েছে । দুরি বৌদির সাহায্যে কথকও পালিয়ে এসেছে শিয়ালদহে। পথে দেখা হয়েছে কালিগঞ্জের স্কুলের সহপাঠী শচীন্দ্র সিংহের সাথে। শচীনের বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। তিনি মেয়ে নেলিকে ব্রজমাধব চৌধুরীর সাথে বিয়ে দেন ইনিই পুলিশের বড়কর্তা। আর ছেলে শচীনের সাথে বিবাহ দেন বিপুল সম্পত্তির মালিক জগত্তারণ ঘোষের একমাত্র মেয়ের সাথে। মেয়ের নাম শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী, তাঁদের কলকাতায় অনেকগুলি বাড়ি আছে---সাহেব পাড়ায়। পার্ক স্ট্রীটে, ধর্মতলায়,আর চৌরঙ্গী এলাকায়। কোনোটায় মদের দোকান ও সাহেবদের আড্ডা, কোনোটায় সাহেবরা ভাড়া আছে। আবার কোনোটায় মেমসাহেবরা ভাড়া নিয়েছেন এবং নিজেরাও ভাড়া খাটেন।---কথক এই জমিদারী দেখাশোনার কাজে ম্যানেজার পদে মাসিক ৭৫ টাকায় বহাল হলেন।

এ সময় কথকের বাবা মারা গেছেন এবং বোনকে নিয়ে মা খুবই অসহায়। মুসলিম হিন্দু বিরোধ তখন দানা বাঁধতে শুরু করেছে।---বরিশালে সেখানে তাঁরা আর থাকতে পারছেন না। এমতাবস্থায় কথক এ অনিচ্ছার চাকরিতে বহাল হলেন। এই জমিদারী কাজের সূত্রে তিনি কলকাতায় এলেন এবার তাঁকে যেতে হলো ব্রজমাধবের বাড়িতে। ইনি পুলিশের বড়কর্তা । বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। এমন সময় নিজেই বেরিয়ে আসার মুখে সৌভাগ্যবশত দেখা হলো কথকের সাথে। কথক শচীনের দেওয়া চিঠি তাঁর হাতেই সমর্পণ করলেন। অতঃপর কথকের স্থান হলো অন্দর মহলে । পুলিশের বড় কর্তার আত্মীয়কে সবাই সমীহ করতে হবে ---এটা বুঝে নিয়েছে। ব্রজমাধব কড়া প্রহরায় আছেন। তাঁকে বিপ্লবীরা মারতে চায়। তিনিও দুরি বৌদিকে ধরতে চান। যেকোনো উপায়ে । কথক সবই জানতে পারছেন। তিনি ভাবলেন দুরি বৌদিকে যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে। অথচ তিনি জানেন না দলের লোকের কাছে তিনি কতবড় অপরাধী ! সবাই সন্দেহ করছে ব্রজমাধবকে গোপনে সব খবর তিনি সরবরাহ করেছেন।

নেপেন দাকে আটকে রাখা হয়েছে। নেপেদা পরিষ্কার সেকথা বলছে আর ওয়াচ কামরা থেকে জিজ্ঞাসাবাদের সব শুনছে কথক। তারপরে ব্রজমাধবের কথা তার বিশ্বাস হলো।

এই সূত্রে লেখক জানালেন এই ধরনের বিপ্লবী আন্দোলনে পারস্পরিক সন্দেহ এত বেশি থাকে যে পরস্পরকে আড় চোখে দেখাই প্রধান কাজ হয় তখন। একদিন দুরি বৌদিকেই তাঁর দলের লোকে সন্দেহ করে তাঁকেই মৃত্যু দণ্ড দিল। তাঁর স্বামী মেদিনীপুরের শালের জঙ্গলে মিথ্যে মিথ্যে দুটি গুলি করে মৃত্যুর ঘটনা প্রমাণ করলো আর বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনলো নতুন জীবনে। দুরি বৌদি এখন আর এসবের মধ্যে নেই। তবে এর আগে পর্যন্ত তাঁকে আগুন জ্বলা পথে চলতে হয়েছে। ঘটনা চক্রে নানা ভুল বোঝাবুঝির কথা জানিয়েছেন অবধূত। ফলে উপন্যাসের মধ্যে নানা ধরনের টেনশন তৈরী হয়েছে। ব্রজমাধব ভাবছেন দুরিবৌদির দলের লোক তুলে নিয়ে গেছে কথককে আর তাই খবর আদায় করার জন্য তাকে তুলে দিয়েছেন শুক্তি সুন্দরীর হাতে। শুক্তি সুন্দরী জ্ঞানী, লজ্জাশীলা সুন্দরী এক নারী । ভগবান তাঁর সৃষ্টি করেছেন অকৃপণ হাতে। কিন্তু পূর্বপুরুষের পাপ পঙ্কিল জীবনের মধ্যে বড় হয়েছেন বলে এক ভয়ঙ্কর নেশায় আসক্ত। নগ্ন মহিলাদের বিকৃত রুচির পৈশাচিক কাণ্ড না দেখলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিকে দুরির বাবা যখন জানতে পারলেন যে তাঁর মেয়েকে পাঠানো হয়েছে ব্রজমাধবের শালাবৌ-এর কাছে তখন তিনি কথককে মুক্ত করে দিলেন তাঁকে উদ্ধার করার জন্য।

শচীন ভগবানের মত । সে জানত তার স্ত্রী যতদিন বঁচবে এই নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে না। বিবাহের দিন থেকে সে শুক্তিসুন্দরীকে ক্ষমা করে এসেছেন। এখন তার আর সংশোধনের আশা নেই জেনে মুক্তি দিলেন। শেষপর্যন্ত নিজের হাতে গুলি করে মারলেন। এরপরের ঘটনা আমরা জানতে পারি দুরির ডায়ারি থেকে। আসলে শুক্তিসুন্দরী জীবনে শচীনের কাছে সেই কথা শোনেনি যা তার পঙ্কলিপ্ত জীবন থেকে তাকে সুস্থ জীবনে টেনে তুলতে পারে। কথক তাকে সেকথা শুনিয়েছিলেন। গঙ্গার ঘাটে তাঁকে তিনি শুকতারা নামে ডেকে ছিলেন। এই ডাকটি শুক্তি সুন্দরী শুনতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বামী শচীনের মুখে। কথককে অনুরোধ করেছিলেন যেন তাঁর বন্ধু এই নামে তাঁকে ডাকে।

'দুরি বৌদি'-র খাতা বা ব্রজমাধবকে লেখা চিঠি থেকে জানতে পারি শুক্তি সুন্দরী দুরিকে চাবুক মেরেছিলেন কথককে ফিরে পাওয়ার জন্যে। সে মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিল কথকের মহার্ঘ স্বীকৃতি পেয়ে। তার মধ্যে জেগে উঠেছিল সেই শিশু যে সব নারীর মধ্যেই থাকে। নারীত্বের জাগরণ না ঘটিয়ে পুরুষ স্ত্রীলোকের কাছে দাবি ক'রে ঠকে। দুরি বৌদি নিজের অবকাশ মত সেকথা তার নিঃসঙ্গ শান্তির জীবনে লিখে রেখে গেছে। দুরি নিজের জীবনেও কিছু পায়নি । সব পেয়েছি বলে সে আসলে তলিয়ে গেছে পাঁকের মধ্যে। রক্ত ঝরানো পথ মানুষের পথ নয়। দুরি বুঝেছে অন্যের ইচ্ছার দাসত্ব করতেই কেটে গেছে তার জীবন। সে ভুলতে বসেছিল যে সে একজন নারী কথকই তাঁকে বুঝিয়ে দেয় লজ্জা ব'লে একটা জিনিস থাকা সব নারীর পক্ষেই কাম্য। কথক দুরির অনুচিত বেশকে লজ্জাকর বলে

ধিক্কার দেন। কথকের এই দৃষ্টির মধ্যে কোনো কামনা ছিল না। দুরি সেই প্রথম বুঝলো লজ্জা পাওয়ার জন্য যে চেতনা দরকার সেটাই তার ছিল না। সে তার পোশাক আর সাজসজ্জা বদলে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে।

তার স্বামী বিশ্বের মানুষের মঙ্গল কামনা করতে গিয়ে মিশর এমনকী ইউরোপেও গেছে। অথচ দুরির মনের শান্তি দিতে সে অক্ষম। তার বিভিন্ন দেশে দুরির মত বউ রয়েছে। যেখানে যত হত্যার ঘটনা ঘটে সব দুরির নামে যায়। দুরি জানতে পেরেছে তার প্রতি তার স্বামীর কোনো অনুভবই নেই কেবল সংকল্প পূরণের মাধ্যম সে। দুরির বাবাও জেনেছেন বিপদে তাঁর জামাই বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন আর সামনে এগিয়ে দিয়েছেন তাঁর ছেলে আর মেয়েকে। তাই দাদা আন্দামান জেল থেকে ফিরে আবার লাহোর জেলে আর মেয়ে ব্রজমাধবের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এখন শুক্তি সুন্দরীর বিকৃত রোগের শিকার হিসেবে অত্যাচারিতা। দুরি এখন একা! তার স্বামী বিদেশে আরো অনেকের মঙ্গল কামনা করতে গিয়ে তাদের সাথেই উড়ে গেছেন বোমার আঘাতে। এখন সে শান্তিতে বাঁচতে চায় আর আশা করে সংসার ত্যাগী হিমালয়বাসী ব্রজমাধবও যেন শান্তি পায়। তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণ যেন ব্যর্থ না হয়। এই প্রত্যাশাতেই উপন্যাসের ইতি এবং ব্রজমাধবকে লেখা পত্রেরও ইতি। এখন আমরা ঔপন্যাসিক অবধূতের দক্ষতার পরিচয় নেব।

শুভায় ভবতু উপন্যাসটি শেষ হয়েছে দুরি বৌদির খাতায়। দুরি বৌদির খাতা ১৯৭-২৯৬---এই একশ পৃষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃত। এই চিঠির মাধ্যমে উপন্যাসের সমস্ত জট খোলা হয়েছে। গোটা উপন্যাস যেখানে ঘটনার বিবৃতি 'দুরি বৌদির খাতাটা সেখানে প্রতিটি ঘটনার পরিচয়। উপন্যাসের গঠনশিল্পে এটি অবশ্যই বৈচিত্র্য সঞ্চার করে। দুরি বৌদি ঘোরের মধ্যে ছিলেন। তাঁর নিজের কথায় :

> "আন্দামান ফেরৎ দাদা আর দাদার দাদারা প্লান করতে লাগলেন। রেজোলিউশন তারপর এক্‌শন।---মানুষ-মারাটা আর মানুষ মারা রইল না তখন। রেজোলিউশন অনুযায়ী সাকসেসফুলি মুভমেন্ট পরিচালনা করা হয়ে দাঁড়ালো।"[১৬৮]

সশস্ত্র বিপ্লবের ত্রুটির কথা বলেছেন অবধূত। এ উপন্যাসের ১২৮ পৃষ্ঠায় বিপ্লবীদের রক্ত-নেশার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে শুভায় ভবতু উপন্যাসের পুলিশের বড় কর্তা ব্রজমাধব চৌধুরী গুরু দেবের মেয়েকে অপরাধী জেনেও ছেড়ে দিলেন (১৭৫---১৭৬পৃ. দ্রষ্টব্য)---এভাবে গুরুর ঋণ এবং দেশের প্রতি কর্তব্য করলেন। সশস্ত্র বিপ্লবী দলের আন্তর্জাতিক নেতা দুরির স্বামী। তার জামাইবাবু---তিনি নিজে বিপদ থেকে দূরে সরে থাকেন। বিভিন্ন জায়গায় তাঁর দুরির মত স্ত্রী আছে। আরো অনেক চরিত্র এ উপন্যাসের কাহিনীতে ছড়িয়ে আছে। যেমন: শচীন (বহরমপুরের ঘোষ ভিলার বাসিন্দা),নেলী--- শচীনের বোন, দুরি বৌদি, শুকতারা, নেপেন দা গোমেশ(গোমেশের ঠাকুরদাদা মাদারিপুরের লোক), ছোলেমান ইত্যাদি। ঔপন্যাসিকের চোখে খুঁটিনাটিও ধরা পড়েছে। হাওড়ার পুল তখন ত্রিশ বছরে পা দিয়েছে; উপন্যাসের ১০৩ পৃষ্ঠায় সে কথা বলা হয়েছে। রাস্তায় ফিটন গাড়ি---ইত্যাদির উল্লেখে তা বোঝা যায়।

উপন্যাস একরৈখিক কাহিনি নয়। নানা কথা উপন্যাসে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে আসে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে সবই পড়ে---শচীশের শ্বশুর জমিদার মানুষ। জগত্তারণ ঘোষ বাহাদুরের একমাত্র কন্যা শুক্তিসুন্দরী দেবী। তাঁর রূপ স্বভাব এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া রোগ---সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রচুর কর্মচারী ---হরিহর কাকা, উকিল কাকা,দাস-দাসী ম্যানেজার,ঘোড়ার গাড়ি বন্দুক---সবকিছুর কথাই বলেছেন। তাঁদের সম্পত্তি প্রচুর। জিয়াগঞ্জের বাগান বাড়ি এবং কলকাতায় অনেকগুলি পাকা বাড়ি আছে। শচীনের শ্বশুরের বাড়ি কটি ছিল সাহেব পাড়ায়, পার্ক স্ট্রীটে, ধর্মতলায়,আর চৌরঙ্গী এলাকায়। কোনোটায় মদের আড্ডা কোনোটায় সাহেবরা ভাড়া আছে। মেমসাহেবরা নিজেরাও ভাড়া খাটে(দ্রষ্টব্য-১১১পৃ.)। মালিক-ভাড়াটে সম্পর্ক আজকের মত খারাপ ছিল না। ছিল বোঝাপড়ার মত সম্পর্ক। মালিক -ভাড়াটে সম্পর্কের মধ্যে উভয় পক্ষই মানবিকতা দেখাতো। আজকের ভাড়াটে আইন নিয়ে রসিকতা করেছেন অবধূত(১১০ পৃ. দ্রষ্টব্য) প্রসঙ্গত মনে পড়ে এই মানবিক উপকারী ভাড়াটের কথা আছে ভোরের গোধূলি তেও। ব্রজমাধবের বাড়িতে কথকের প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি ১১৭ পৃষ্ঠায় আনন্দমঠের উল্লেখ আছে । পড়ছিলেন কথক। স্মৃতিচারণায় এসেছে স্কুলের কথা (৭২-৭৩ পৃ.দ্রষ্টব্য)সেই সূত্রে ক্লাসে নভেল পড়ার অপরাধে এক ছাত্রকে নিষ্ঠুরভাবে মারার কথা আছে। তখনকার ছাত্রদের কথা মনে এলো---শচীন সিঙ্গী, আহমদ, গোবিন্দ সেন ---এরা স্কুল ফ্রেণ্ড। এখানে ছাত্রদের প্রতিবাদের পদ্ধতি আর দৃঢ়তা লক্ষ করার মত। শচীন সিঙ্গীর বাবা ছিলেন কালিগঞ্জ থানার দারোগা। তাঁকে হস্তক্ষেপ করতে হলো না। শেষপর্যন্ত হেড মাস্টারমশাই ব্রজেন বাবু ন্যায় বিচার করলেন। মাস্টারমশাই যশোদানন্দন ঘাঁটিকে চাকরি ছাড়িয়ে দেন । এছাড়া শুক্তিসুন্দরীর মানসিক রোগের প্রসঙ্গে কুৎসিত ঝি-এর বর্ণনা এবং প্রতীকী কথাবার্তার মধ্যে ঔপন্যাসিকের দক্ষতা (৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রমাণিত হয়। ৮৭ পৃষ্ঠায় লেখক দাঙ্গার ছবি এঁকেছেন। হিন্দুদের উপর অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে---অত্যন্ত সংক্ষেপে আর নিরাবেগ ভাষায়---তাই ঔপন্যাসিকের বক্তব্যের সত্যতায় পাঠকের কোনো সন্দেহ থাকে না। এসব বিষয়গুলি একটি উপন্যাসের পটভূমিতে সাধারণভাবে উঠে আসে।

স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কথকতা---দেবারীগণ

'দেবারীগণ 'উপন্যাসটি ফ্লাস ব্যাক রীতিতে লেখা। এর বিষয় অলীক এক স্বপ্ন কিন্তু এর পাত্র-পাত্রীরা বাস্তব। তাঁদের জীবনের সংগ্রাম আর পরিপার্শ্ব আমাদের চেনা। পারস্পরিক সম্পর্কের মাধুর্য কিম্বা বিশ্বাস আকাশের আলো আর মাটির ধূলো-মাখা। চিরন্তন মানব-মানবীর সম্পর্ক নিয়ে গড়া। দক্ষ শিল্পীর হাতে পড়লে কী-না সম্ভব---এই কথাটিই সবার আগে মনে হয়।

অসম্ভব বলে কী কিছু আর আছে? মানব-সভ্যতা কী না আবিষ্কার করেছে! রোবট থেকে রকেট---কিছুতেই যেন মানুষ হার মানতে চায়না। শুধু সে হার মেনেছে নিজের কাছে। মানুষ জানে না তার নিজের মনকে! যদি কোনোদিন সেই মানুষের মন কী ও তার ছবি তোলা

যেত ! এই স্বপ্ন এ উপন্যাসে সত্য হয়েছে। তারপরে মানুষকে বুঝতে হয়েছে যে এই কাজটি স্বপ্ন পূলণ নয় দুঃস্বপ্নকে ডেকে আনা। এমন এক যন্ত্র মানুষের হাতে এসেছে যাতে গোটা দেশজুড়ে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে চলেছে। সেই ঘটনাগুলো এতটাই বাস্তবসম্মত আর চরিত্রগুলি এতটাই জীবন্ত যে কোনোভাবে তাদের মনস্তত্ত্ব বা জীবন যুদ্ধকে অস্বীকার করা যায় না। আর এর পরিচয় যেভাবে অবধূত দিয়েছেন তাকে ঠিক কথাসাহিত্য হিসেবেই মানতে হয়! অবধূত বাংলা ভাষার শক্তি কতখানি তা প্রমাণ করেছেন। ‘নীলকণ্ঠ হিমালয়’ উপন্যাসের ভূমিকায় সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছিলেন যে ভাষার ওপর দখল থাকলে হাতিকে দিয়েও কথা বলানো যায়! ‘দেবারীগণ উপন্যাস পড়লে বোঝা যায় অলীক বিষয়কে কেমন করে সাক্ষাৎ দর্শনের স্পর্শে সত্য করে তোলা যায়। ঔপন্যাসিক অবধূত এখানে তা পাঠকে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ উপন্যাসের শুরু হয়েছে মাঝখান থেকে আনেকটা ফ্লাশব্যাক রীতি মেনে। কিছুদূর যেতে না যেতে এর কাহিনি আর ঘটনা পাশাপাশি বা সমান তালে চলেছে। অবধূতের মূল বৈশিষ্ট্য এখানেও একরকম ভাবে বজায় রয়েছে। কাহিনির পাত্রপাত্রীরা কলকাতা থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত গেছে। ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতা থেকে দার্জিলিং, এমনকি নেপাল পর্যন্ত। এর চরিত্রবৈচিত্রও তেমনি। সুদূর স্কটল্যাণ্ড থেকে দার্জিলিং এবং মন্ত্রী-আমলা থেকে বিখ্যাত লেখক সঙ্গীত শিল্পী ব্যবসায়ী আমীর ব্যক্তি---নিরাশ্রয় ব্যক্তি কে নেই।

উপন্যাসে কাহিনি আর চরিত্র সমান গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির নাম মনে করতে পারি। এ উপন্যাসে তিনটি পরিবারের কথা এসেছে। রুদ্র পরিবার, ব্যানার্জি পরিবার আর চৌধুরী পরিবার। আর মানুষ এসেছে নানা স্বভাব আর নানা পেশার! মধ্যবয়স্ক বিখ্যাত লেখক শান্তনু রুদ্র । তাঁর স্ত্রী ইন্দুমতী রুদ্র, মেধাবী ছাত্র তাপস রুদ্র তাঁদের একমাত্র ছেলে। নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়---শান্তনু রুদ্রের বন্ধু ও বেহাই মশাই,তাঁর কন্যা হিয়া রুদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখন কিন্নরী কণ্ঠী গায়িকা, তিনি ছোটবেলা থেকে রুদ্র পরিবারে মানুষ এখন এই পরিবারের বধূমাতা। গুলাব প্রধান---একজন বিচারক। দার্জিলিং-এ এঁর একটি বাড়ি আছে। ভাস্বতী চৌধুরী হিয়ার বন্ধু, ইনি মিসেস আদুরি চৌধুরীর কন্যা, মিসেস আদুরি চৌধুরীর আসল নাম এডোর । বিকৃত উচ্চারণে এডোরে। তার থেকে আদুরি হয়েছে। ইনি আদতে স্কটল্যাণ্ডের বাসিন্দা। ইনি ডিভোর্সী। দার্জিলিং-এ তাঁর একটি বাড়ি আছে তার নাম ‘অশরণ অলীকভিলা’, ভাস্বতী সুশিক্ষিতা এবং অসাধারণ নৃত্য শিল্পী---১৯৮ পৃষ্ঠায় এঁকে উর্বশীর সাথে তুলনা করা গৌরীশৃঙ্গের অভিজাতদের হলে নৃত্যের বিজ্ঞাপনে এরই ছবির নিচে লেখা হয়েছিল---রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতার লাইন:অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষ মাঝে চিত্ত আত্মহারা নাচে রক্তধারা’ তাঁর স্বামী আখেরী পন্থ, মি. খাঁ বা কুবলয় সরকারি ঘুষখোর অফিসার। নেপালের মোহান্ত মহারাজ,খাগড়াজোলের দি গ্রেট প্রিন্স বা ইনি একশটার বেশি ম্যান-ঈটার হিট করেছেন, লর্ড অফ মিয়ে বেড়--- মোটর রেসে অলিম্পিক ছুঁয়েছেন, মিসেস সিন্হা---নাগা হিল্স নিয়ে রিসার্চ করেছেন এঁর স্বামী, মিস্টার মালহোত্রা---এঁর স্ত্রী বিউটি কনটেস্টে প্রাইজ পেয়ে হলিউড গেছেন।

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপন্যাস-কল্প রচনার বিষয়বস্তু, বীভৎস

বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বিচার,বিচিত্র মানুষের পরিচয় গ্রহণ এবং অশ্লীল বিষয়ের সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ আমরা বিয়য়-ভিত্তিক আলোচনা সূত্রে জেনে নিলাম। এখন আমরা অবধূতের গ্রন্থগুলির বিষয় এবং সার্থকতা বিষয়ে অবগত। অতএব অবধূত রচিত কথাসাহিত্যের একটি বিষয়ানুসারী বর্গীকরণ করা যায় :

- ভ্রমণ সাহিত্য:
  'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়', 'হিংলাজের পরে'
- ধর্মাচার ও বীভৎস রসাশ্রিত :
  'উদ্ধারণ পুরের ঘাট', 'বশীকরণ', 'ফক্কড়তন্ত্রম', 'কলিতীর্থ কালীঘাট', 'দুর্গমপন্থা', 'সাচ্চা দরবার', 'বিশ্বাসের বিষ', 'দুর্গমপন্থা', 'দাবানল'
- রাজনীতি আশ্রিত:
  'সপ্তস্বরা পিনাকিনী ', 'কৌশিকী কানাড়া','শুভায়ভবতু', 'বশীকরণ', 'দুরি বৌদি',
- সামাজিক /পারিবারিক:
  'মায়ামাধুরী',টপ্পাঠুংরি' 'যা নয় তাই', 'ভোরের গোধূলি', 'দুরি বৌদি', 'সুমেরু কুমেরু', 'পথভুলে','যা নয় তাই', 'স্বামীঘাতিনী'
- বিচিত্র বিষয়ক:
  'দেবারীগণ', 'মিড় গমক মূর্ছনা', ','উত্তর রাম চরিত'(১৯৬০), 'সাধনা একা জেগে থাকি' (অনেকটাই আত্মজীবনীমূলক)
- গল্পগ্রন্থ:
  'পিয়ারী'(১৯৬১), 'বহুব্রীহি',(১৯৬০) 'নিরাকারের নিয়তি'

এই অধ্যায়ে আলোচিত উপন্যাস কল্প রচনার বিচিত্র চরিত্র :

- ভোরের গোধূলি --- ধনঞ্জয় মল্লিক, ধনঞ্জয় মল্লিকের মেয়ে মৌরী, মৃত্যুঞ্জয় সোম, মৃত্যুঞ্জয় সোমের মেয়ে দেবযানী পালিতা কন্যা মৌরী, জাদুকর মন্ময় পালিত, নীরব প্রেমের বলি ধীরেন ঘোষ,অভিমন্যু,
- টপ্পা ঠুংরি বা আমার চোখে দেখা--- রাইচাঁদ, সেবা সোম, বদন বাগচী, রঘুদয়াল লাহিড়ী, ঝুনু ঝুনু লাহিড়ি, ক্ষেত্র চাটুজ্যে, গোপেশ্বর বাবু, সানুদি, বা শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্ট, শ্রীকিষণ কুন্দন ভট্টজী, নিশিকান্ত দা, অনুপম
- কলিতীর্থ কালীঘাট--- কংসারি হালদার, বনমালী ঠাকুর, ফিনকি, ফনা, ধনঞ্জয় বা ধনা
- সপ্তস্বরা পিনাকিনী--- পিনাকী ব্যানার্জি বা দাশুভাই, বিন্দুবাসিনী দেবী বা প্রিন্সিপ্যাল,নিখিলেশ বা কাইজার, শোভান,ক্যাঙারু, পাঁচমণ ওজনের ওস্তাদ,খ্যাঁদা সেখ, পরশুরাম মিত্র/মিত্তির, মিনতি মিত্র, কাজল গুপ্ত, বার এ্যাট ল বাদল গুপ্ত, লোকনাথ রায়, দাদু সদাশিব, আলো বন্দ্যোপাধ্যায় বা চণ্ডী

- কৌশিকী কানাড়া--- গোপিকারমণ দস্তিদার, কৃষ্ণা, করুণাকেতন দত্ত, যশোদা,মিস্টার সিংহরায়, মিস্টার গুহা, মিস অসিতা ঠাকুর,মিস গোমা কাপুর, শ্রীমতী রুবি মুস্তাফি
- বিশ্বাসের বিষ--- সিদ্ধেশ্বর গুণিন, দীননাথ গুণিন, কালীনাথ, জমিমাপা হাকিম হিমাংশু হালদার, গেরস্তবাড়ি চালায় তিন জন :ধম্মগোয়ালার ধম্মবোন, জটাধারী জেলের পরিবার, এবং কোহিনূর, ধীরেন্দ্রনাথ বসু রায় বা ধীরু, ধীরুর কাকা চেতলায় বা কালীঘাটে মৌরীর মা
- পিয়ারী --- চতুর্ভুজ ত্রিবেদী,মুক্তা,
- পথভুলে--- রায়বাহাদূর অধরনাথ,মঞ্জু, রাজলক্ষ্মী, রমা, সুজিৎ চক্রবর্তী, ফকির, পূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজার নকড়ি বাবু,অভিনেতা নটবর লাহিড়ি, দাঁতের ডাক্তার ড. রায়,সহকারী গোবিন্দ
- সাচ্চা দরবার--- বড়ুয়া সাহেব, মণিকুন্তলা দেবী, বিভ্ভুল ঠাকুর, পার্বতীশঙ্কর, উমাশঙ্কর ভবানীশঙ্কর, চেয়ারম্যান, জঙলা, অহিভূষণ সান্যাল,বিজয়া, মৌসম, জয়, কপটসাধু সন্তর্পণ কুলতিলক, শ্রী চৌহান শেঠজী, যোগিয়া ল্যালা, মুরলীদেবী, বকরাক্ষস, প্লাটিনাম, ঝর্ঝরি, শিঞ্জিনী, বালাই, ভোলানাথ, কোতকা, দ্যুতি, দুজন সাহেব,চন্দ্রচূড় ভৌমিক, জটিলেশ্বর বাবা।
- দুরি বৌদি বা শুভায় ভবতু--- ব্রজমাধব চৌধুরী, ব্রজমাধব চৌধুরীর গুরু,গুরুদেবের মেয়ে দুরি বৌদি,দুরির বর,নেপেন দা গোমেশ,ছোলেমান নেলী---ব্রজমাধবের স্ত্রী ও শচীনের বোন, শচীন সিঙ্গী, হেড মাস্টার ব্রজেন বাবু। যশোদানন্দন ঘাঁটি--- মাস্টারমশাই,আহমদ স্কুল ফ্রেণ্ড, গোবিন্দ সেন, শচীনের বোন,জগত্তারণ ঘোষ বাহাদুরের একমাত্র কন্যা শুক্তিসুন্দরী দেবী,প্রচুর কর্মচারী হরিহর কাকা, উকিল কাকা।
- দেবারীগণ--- মধ্যবয়স্ক বিখ্যাত লেখক শান্তনু রুদ্র তাঁর স্ত্রী ইন্দুমতী রুদ্র, মেধাবী ছাত্র তাপস রুদ্র তাঁর একমাত্র ছেলে। কল্যাণ গুপ্ত---শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন এক যুবক। নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় ---শান্তনু রুদ্রের বন্ধু ও বেহাই মশাই তাঁর কন্যা হিয়া রুদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখন কিন্নরী কণ্ঠী গায়িকা, তিথি ছোটবেলা থেকে রুদ্র পরিবারে মানুষ এখন এই পরিবারের বধূমাতা। গুলাব প্রধান---একজন বিচারক। দার্জিলিং-এ এঁর একটি বাড়ি আছে। ভাস্বতী চৌধুরী হিয়ার বন্ধু, ইনি মিসেস আদুরি চৌধুরীর কন্যা, সুশিক্ষিতা এবং অসাধারণ নৃত্য শিল্পী, মিসেস আদুরি চৌধুরীর আসল নাম এডোর । বিকৃত উচ্চারণে এডোরে । তার থেকে আদুরি (এডোর>এডোরী>আদুরী) হয়েছে। ইনি আদতে স্কটল্যাণ্ডের বাসিন্দা ইনি ডিভোর্সী। দার্জিলিং---এ তাঁর একটি বাড়ি আছে তার নাম 'অশরণ অলীক ভিলা', মিসেস আদুরি চৌধুরী, কন্যা---ভাস্বতী চৌধুরী, স্বামী জ্যোতিষী নাম---আখেরি পন্থ, মিস্টার খাঁ,বা উবলয় খাঁ আখেরি পন্থের সহযোগী। নেপালের মোহান্ত মহারাজ, খাগড়াজোলের দি গ্রেট প্রিন্স বা ইনি একশটার বেশি ম্যান-ঈটার হিট করেছেন, লর্ড অফ মিয়ে বেড়--- ইনি মোটর রেসে অলিম্পিক ছুঁয়েছেন,মিসেস

সিন্‌হা---নাগা হিল্‌স নিয়ে রিসার্স করেছেন এঁর স্বামী, মিস্টার মালহোত্রা---এঁর স্ত্রী বিউটি কনটেস্টে প্রাইজ পেয়ে হলিউড গেছেন। নেপালের মঠের মোহান্ত মহারাজ--- একটি বিশেষ যন্ত্রের আবিষ্কারক। এই যন্ত্রটি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে। এটি চুরি যাওয়ায় বাগমতী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

উপন্যাসকল্প রচনার বিষয়ানুসন্ধানে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি অবধূত বিচিত্র জীবনের সংস্পর্শে এসেছেন। অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত সে-সব মানুষের অনেকেই যে কঠিন জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে আমাদের কাছে তা বিস্ময়কর। তাদের জীবন নানা বীভৎস অভিজ্ঞতা আর তথাকথিত অশ্লীলতার মধ্যেও কোথায় যেন মানবতাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্ষা করে চলেছে । অবধূত সমাজের নানা শ্রেণির মানুষকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। আমাদের পরিচিত জীবন থেকে নেওয়া কাহিনিতে কিশোর-কিশোরীর প্রেম যেমন আছে তেমনি পঞ্চাশোর্ধ্ব মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও রূপ পেয়েছে। তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্যে বিকৃতকামা পুরুষ-নারী যেমন রয়েছে তেমনি শান্ত সৌম্য উদারচেতা স্নেহশীল মানুষও আছেন।

রাজনীতি তাঁর সাহিত্যে যেখানে পটভূমি রচনা করেছে---সেখানে অল্পমাত্রায় পরিস্ফুট কিছু রাজনৈতিক চরিত্র আছে। দেশের স্বাধীনতায় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সেখানে নারী পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। নারী চরিত্রে শক্তিময়ী রূপে তারা কখনো আন্দোলন ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন কখনো বা তাঁরা প্রতিবাদী স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বৈপ্লবিক কাজে তাঁদের অভিনয়-কুশলতা নির্ভিকতা আমাদের বিস্মিত করে।

সানুদির মত সাধারণ মহিলা লেখিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্টরূপে সম্মানিতা। কোনো ক্ষেত্রে অবধূতের কলম যেন ডিটেকটিভ গল্প রচনা করেছে। কখনো বা তা রোমান্টিক প্রণয়গাথায় পাঠকের আনন্দ কিম্বা বেদনাকে জাগ্রত করেছে। বড় গল্প বা উপন্যাস-কল্প রচনাগুলিতে এত বর্ণময় চরিত্র এসেছে যে স্বীকার করতেই হয় প্রায় দেড়যুগ রাহী বা পথিক না হলে এ হেন বিচিত্র মানুষকে রূপ দেওয়া সম্ভব হত না। বাংলা ভাষায় বিশ শতকের পাঁচের দশক থেকে সাতের দশক পর্যন্ত অবধূত যেসব কথাসাহিত্য রচনা করেছেন তাতে ভারতবর্ষের নানা ভাষাভাষি, নানা ধর্মাবলম্বী, পেশাবলম্বী, এবং নানা ভৌগোলিক অঞ্চলের বিচিত্র মানুষ স্থান পেয়েছে। মরুভূমি, বরফে ঢাকা হিমালয়, সমুদ্রবক্ষ---সর্বত্র কাহিনিকার অবধূতের গতাগতি। ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট, বাস, ট্যাক্সি, স্টীমার, উট, ইত্যাদি যেমন যানবাহন হিসেবে এসেছে তেমনি এসেছে পাহাড়ে মোট বওয়া নির্লোভ মানুষেরা। এঁদের তিনি মাল বওয়া 'রামছাগল'-এর সাদৃশ্যে 'লক্ষ্মণ মানুষ' বলে চিহ্নিত করেছেন। অত্যাচারের ডগঘাট বা জাহাজঘাটি, রাস্তায় বোমাবাজি, স্টীমারে দাদাগিরি, এসব যেমন এসেছে তেমনি ধর্মস্থানে ইংরেজ সাহেবদের অসভ্যতা ও ঔদ্ধত্য স্থান পেয়েছে।

বিচিত্র জীবিকার কথা তাঁর লেখনির মুখে রূপময় হ'য়ে উঠেছে। 'গেরস্তবাড়ী'-র আড়ালে বাড়িউলি চালাচ্ছে দেহব্যবসা, তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে গৃহহীনা স্বামীহীনা অসহায় দরিদ্রা নারীরা।

এসব ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি অবধূত কেবল কালো -দিককে তুলে ধরেননি। মনুষ্যত্বের অমল আলোয় অসামাজিক চরিত্রের মধ্যে বিচিত্র মানুষকে আবিষ্কার করেছেন। বাইরের চোখে ভদ্রসভ্য সমাজের যে রূপ দেখা যায় তার মিথ্যাচারকে তুলে ধরেছেন। তাঁর একটি বিশেষ অভ্যস্ত পদ্ধতি হলো বিপরীতমুখী ধারায় উপন্যাস বা উপন্যাস-কল্প রচনার কাহিনিকে পরিচালিত করা। তথাকথিত অপরাধ জগৎ ও সামাজিক বিশুদ্ধ জীবনস্রোত এই উভয়ের মধ্যে কাম্য আদান-প্রদান ঘটিয়েছেন তাঁর অধিকাংশ কথাসাহিত্যে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে আমরা বলতে চাই : অবধূতের রুচি,সংযম, অতিথিপরায়ণতা, কোমল-কঠোর রূপ,ইত্যাদি এই সূত্রে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এরফলে অতিরিক্ত পাওনা ঘটেছে এই যে গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি কেবল তথ্যভারাক্রান্ত না হয়ে জীবন্ত ও মাঝে মাঝে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে। অবধূত-গবেষণার প্রতিটি অধ্যায়ের মত এখানেও প্রতিপাদ্য বিষয়-সংক্রান্তপ্রয়োজনীয় প্রতিটি নিদর্শন ও তথ্যকে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই সকল তথ্যের প্রাসঙ্গিক প্রয়োগের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে পাদটীকা,বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থতালিকা এবং পরিশিষ্ট নির্মাণ করা হয়েছে। কোনো বিষয়ে নতুন কোনো নীতি বা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সেই সিদ্ধান্তের সাধারণীকরণই হলো গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। বিচার-বিশ্লেষণ শেষে অবধূত সম্পর্কে এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভে বেশকিছু সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ভাষার ক্ষেত্রে শূচিবায়ুতা তাঁর ছিল না। ঘটনা-সজ্জার মধ্যে ভাবাতিরেক তাঁর রচনায় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। 'গবেষণা' যেহেতু একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি,তাই এর মূল ভিত্তি যুক্তি, পরিমাপ বা পরিসংখ্যানগত উপস্থাপনার ওপর প্রভূত নির্ভরশীল। আমরা গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রতিটি সিদ্ধান্তকে যুক্তি ও পরিসংখ্যান দিয়ে উপস্থিত করেছি। 'গবেষণা' হলো অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তের সম্মিলিত এক রূপায়ণ-কর্ম। প্রতিটি অধ্যায়ের মত এ অধ্যায়েও অবধূতের কথাসাহিত্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে কাহিনি ও চরিত্রের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে। নতুন চিন্তাই গবেষণার একমাত্র বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য নয়, ইতিপূর্বে যা অনালোচিত বা অনালোকিত ছিল, তাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরাও গবেষকেরই কাজ। তত্ত্বাবধায়ক মহাশয়ের অনলস পরিশ্রমে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে সে কাজটি করা হয়েছে। নাগা সন্ন্যাসীরা মালবারের তরুণ সন্ন্যাসীর ওপর যে অত্যাচার করেছিল তাকে 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'উপন্যাসে এনেও অবধূত ব্যঞ্জনার সাহায্যে তা এমনভাবে প্রকাশ করলেন যে পাঠকের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। আবার তিন মরু ডাকাতের হাতে লাঞ্ছিতা কুন্তীর ('মরুতীর্থ হিংলাজ',অবধূত) কথা আমরা অনুভব করেছি কিন্তু কোনো অশ্লীলতাকে আশ্রয় করতে হয়নি।---বহুক্ষেত্রে আমরা অবধূতকে অনুচিত অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে পেরেছি। মানুষের জীবনে যা যা ঘটে তা আটকানো যায় না-কুরুচিকর হলেও অস্বীকার করা যায় না। কথা হলো তা যদি সাহিত্যে আসে তবে সাহিত্যে তা কীভাবে প্রকাশ করা হোল সেটাই দেখার।

অবধূত প্রসঙ্গে নানা নেতিবাচক সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে আমরা বলতে চাই অনেক সফল বাংলা কথাসাহিত্যিকের চাইতে মানুষের বিচিত্র জীবন ও আচরণকে তিনি বেশি প্রকারে দেখিয়েছেন। অবধূতের দেখার জগৎ প্রসারিত ছিল আলো-আঁধারে, উচ্চতায় নীচতায়

সমাজজীবনে কিম্বা পথের প্রান্তে। রাজনীতিতে কিম্বা ধর্মাশ্রমে। মহৎ মানুষ যেমন দেখেছেন ছদ্মমহত্ত্বও তাঁর চোখে পড়েছে। সমাজ বিরোধী, বিকারগ্রস্ত, দেশদ্রোহী, নরপিশাচ, রক্তচোষা---কোনো কিছুই তাঁর চোখকে এড়িয়ে যায়নি। কোনো ব্যাপারে বুজরুকি তিনি মেনে নেননি। বরং বলা চলে ব্যভিচার ও বুজরুকিকে তিনি চাপা দিতে চাননি। অমানবিকতাকে উন্মুক্ত করাতেই বরং তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর হাতে যে কলম ছিল সৃষ্টির পথে চলতে গিয়ে 'অশ্লীলতার দোহাই মেনে তা থেমে যায়নি। এমনকি পথভ্রষ্ট হয়নি। ক্যামেরার ফোকাসের মত নির্লিপ্ত অথচ স্পষ্ট। এই স্পষ্টতার মধ্যে ইঙ্গিত আর ব্যঞ্জনা আছে বলে বিষয়গুলিকে অশ্লীল বলে মনে হলেও প্রকাশকে অশ্লীল বলা যায় না।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য

১. ছয় খণ্ডে রচিত ফ্রয়েডের The Interpretation of Dreams'-1913, The Psy chology Everydaylife-1914,On Dreams-1914

২. Studies in the Psychology of Sex (1897-1928)

৩. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, বাংলা কথাসাহিত্য : প্রকরণ ও প্রবণতা, পৃ. ১৫০-১৫১

৪. ১৯৬৩ সালে অবধূতের 'ভূমিকালিপি পূর্ববৎ' প্রকাশ পায়। এর ঠিক দু'বছর আগে প্রকাশিত হয় 'পিয়ারী' (১৯৬১) 'বীভৎস রস'-এর সঙ্গে বৈষয়িক বিষয় যোগ করে তিনি রচনা করেছেন 'ভূমিকালিপি পূর্ববৎ' (১৯৬৩)। পরলোকবিষয়ক কার্যকলাপ, প্লানচেট, ভৌতিক ঘটনা ইত্যাদি এ উপন্যাসের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। (দেবেশ আচার্য্য,বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সী,কলকাতা, ২০১০, পৃ.৭৬৪-৭৬৫)

৫. Robert Ross, Ibid, Chapter 1, p. 3

৬. Robert Ross, Research : an Introduction,Chapter 1, p. 4

৭. Jhon Grote

৮. George Watson, Choosing a theme Writing a Thesis, Ch.- V, p. 24

৯. The Scholar Critic : An Introduction to Literary Research,The Literary Object, Chapter 11, p. 55

১০. অবধূত,ভোরের গোধূলি, তুলি কলম, কলকাতা,আগস্ট,১৯৬৯ গ্রন্থটি প্রথমে 'কথাসাহিত্য' (পঞ্চদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা-শ্রাবণ, ১৩৭১,পৃ. ১২০৫-১২১১) পত্রিকার সাত পৃষ্ঠার আলোচনা থেকে বলা যায় যে এটি 'কথাসাহিত্য'পত্রিকায়'উপন্যাস' হিসেবেই ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'ও উপন্যাস হিসেবে একই সংখ্যায় পৃ. ১১৭১-১১৮০ এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'দোলগোবিন্দের কড়চা' পৃ. ১১৮৬-১১৯৩ জুড়ে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১১. অবধূত,ভোরের গোধূলি, তুলি কলম, কলকাতা,আগস্ট,১৯৬৯,পৃ. ৩২

১২. প্রোম : বর্মার একটি শহর প্রোম। সাধুবেশে রুদ্রাক্ষ গলায় অবধূতের এই ছবিটি প্রমাণ দেয় যে অবধূত এখানে ছিলেন। দ্রষ্টব্য:পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৬৪, চিত্র নং২/গ।

১৩. অবধূত,ভোরের গোধূলি, তুলি কলম, কলকাতা,আগস্ট, ১৯৬৯, পৃ. ২

১৪. 'মৌরী' নামে একটি চরিত্র অবধূতের 'ভোরের গোধূলি'(১৯৬৯) এবং 'বিশ্বাসের বিষ'(১৯৭৪) উভয় উপন্যাসে আছে। 'ভোরের গোধূলি' উপন্যাসে সে শৈশবে বোমের আঘাতে বাবা মাকে হারিয়ে বাবার বন্ধুর কাছে ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়। আর 'বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসে সে ভাগ্য বিপর্যয়ে বারবণিতা।

১৫. 'টপ্পাঠুংরি' (১৯৬৯) উপন্যাসটি 'আমার চোখে দেখা' নামেও প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত উপন্যাস এটি নয়। একে চারটি ভিন্ন কাহিনির সংকলন বলে মনে হয়। কথকের জীবনব্যাপী ঘটনার রূপায়ণ। এটি জীবনের মুহূর্ত-আশ্রয়ী হাল্কা বিষয় বা খণ্ডজীবন-কেন্দ্রিক রচনা নয়। এই উপন্যাসের প্রথম ভাগের একটি চরিত্র সেবা সোম। এই পদবীর ব্যবহার আছে 'ভোরের গোধূলি'(১৯৬৯) উপন্যাসেও।

১৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ২০১২-২০১৩,মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ.৪২৭

১৭. বিনা সম্পাদনায় বিভিন্ন গল্প মিলে গল্প সংকলন এবং নানা রকম উপন্যাস মিলে প্রায় পাঁচ-ছ'টি প্রকাশনা থেকে (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৮) কখনো এক নামের উপন্যাস অন্য নামেও ছাপা হয়েছে তাই মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা নিশ্চিৎভাবে বলা যায় না। আমরা অবধূতের মোট গ্রন্থ ---৪৯ টি এরকম গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পেরেছি গ্রন্থতালিকায় তা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমাদের প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে অবধূতের মৌলিক গ্রন্থ ৩০ টি।

১৮. অবধূত, আমার চোখে দেখা, জুন, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৬৫

১৯. Ethical principles. Seth, part-i,Chapt-iii,p-203

২০. অবধূত, আমার চোখে দেখা, জুন, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৭২

২১. ঐ, পৃ. ৭৬

২২. অবধূতের 'টপ্পাঠুংরি' (১৯৬৯, ক্লাসিক প্রেস) উপন্যাসটি 'আমার চোখে দেখা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ এর জুন মাসে।

২৩. অবধূতের 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসের ভূমিকায় অবধূত সম্পর্কে বিস্তারিত মূল্যায়ন ছিল। অবধূত শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে 'কথাসহিত্য' পত্রিকা সেই লেখাটি পুনর্মুদ্রিত করে। দ্রষ্টব্য :পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৯১

২৪. অবধূত, সপ্তস্বরা পিনাকিনী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃ. ২৩

২৫. ঐ, পৃ. ১১৯

২৬. ঐ, পৃ. ৩২

২৭. ঐ, পৃ. ৩৩
২৮. ঐ, পৃ. ১৪
২৯. ঐ, পৃ. ৯৯
৩০. ঐ, পৃ. ১৪
৩১. ঐ, পৃ. ১৮
৩২. বদন বাগচী অবধূতের লেখা 'টপ্পাঠুংরি' উপন্যাসের একটি ভদ্রবেশী ভিলেন চরিত্র।
৩৩. অবধূত, সপ্তস্বরা পিনাকিনী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃ. ৩০
৩৪. ঐ, পৃ. ১৪
৩৫. ঐ, পৃ. ৬৫
৩৬. ঐ, পৃ. ২১
৩৭. ঐ, পৃ. ২৩
৩৮. ঐ, পৃ. ২৪
৩৯. ঐ, পৃ. ১০৩
৪০. ঐ, পৃ. ৪৮
৪১. ঐ, পৃ. ৪৯
৪২. ঐ, পৃ. ৫০
৪৩. ঐ, পৃ. ২৫
৪৪. ঐ, পৃ. ২৬
৪৫. ঐ, পৃ. ৫৫
৪৬. ঐ, পৃ. ১০৩
৪৭. ঐ, পৃ. ৫৮-৫৯
৪৮. ঐ, পৃ. ৭২
৪৯. ঐ, পৃ. ৯৮
৫০. ঐ, পৃ. ২৮
৫১. ঐ, পৃ. ৯৪
৫২. রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অবধূতের লেখায় প্রচুর । উর্বশী কবিতার উল্লেখ আছে 'মরুতীর্থ হিংলাজ',(১৯৫৪) 'দেবারীগণ'(১৯৬৯)---এই দুই উপন্যাসে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি গান আছে 'মরুতীর্থ হিংলাজে'(১৯৫৪)। প্রসঙ্গত মনে হয় 'নিখিলেশ' নামটি অবধূত কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের স্মৃতি থেকে পেয়েছিলেন ? তবে উভয়ের চরিত্রগত কোনো মিল নেই। মিল যা আছে তা ঐ নামে মাত্র।
৫৩. অবধূত, সপ্তস্বরা পিনাকিনী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,(প্রকাশকাল অজ্ঞাত) পৃ. ৯৬
৫৪. ঐ, পৃ. ৬৯

৫৫. অবধূত, সপ্তস্বরা পিনাকিনী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,(প্রকাশকাল অজ্ঞাত) উপন্যাসের বিন্দুবাসিনী বা প্রিন্সিপ্যালের ছেলে নিখিল এখন পুলিশ কেসে পলাতক। বর্তমান নাম কাইজার।

৫৬. অবধূত, সপ্তস্বরা পিনাকিনী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,(প্রকাশকাল অজ্ঞাত) পৃ. ১০১

৫৭. ঐ, পৃ. ৯৬

৫৮. ঐ, পৃ. ৬৯

৫৯. ঐ, পৃ. ২৫

৬০. ঐ, পৃ. ১০০

৬১. ঐ, পৃ. ১০২

৬২. ঐ, পৃ. ১১৫

৬৩. ঐ, পৃ. ১১৯

৬৪. অবধূত, কৌশিকী কানাড়া, কলিকাতা পুস্তকালয়,কলকাতা,১৯৬৩ -বইটি দুস্প্রাপ্য। এই বইটি তাঁর সংগ্রহ থেকে দিয়েছিলেন উদয়শংকর বর্মা, অধ্যাপক বিধাননগর সরকারী মহাবিদ্যালয়। দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৮৮

৬৫. 'পীত ঝঞ্ঝা' মানে হলুদ ঝড় ।

৬৬. 'বিষাণ' মানে প্রলয় শঙ্খ।

৬৭. 'ঈশাণ' মানে মহাদেব।

৬৮. অবধূত, কৌশিকী কানাড়া, কলিকাতা পুস্তকালয়,কলকাতা,১৯৬৩, পৃ. ১১

৬৯. ঐ, পৃ. ৫০

৭০. ঐ, পৃ. ৫০

৭১. ঐ, পৃ. ৩২

৭২. ঐ, পৃ. ১২

৭৩. ঐ, পৃ. ৫৪

৭৪. ঐ, পৃ. ৫৫

৭৫. অসুরদের মধ্যে 'রক্তবীজ'মহা ভয়ঙ্কর। পুরাণে কথিত আছে 'শিরাসুর' আর 'কবন্ধী' নামে দুই অসুর দেবলোকে ত্রাসের সঞ্চার করে। শির+ অসুর = শিরাসুর। এই অসুরের কেবল মাথাটাই ছিল। আর 'কবন্ধী'-র ছিল কেবল দেহ । মাথা ছিল না। দেবী 'কপাল হস্তা' তাঁদের বধ করেন। মাটিতে এই দুই অসুরের রক্ত ঝরে পড়লেই তারা অগুণিত হয়ে জন্মাচ্ছিল। অবশেষে দেবী অসুরের রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই স্বয়ং ছিন্নমস্তা' রূপে পান করেছিলেন। অসুরেরা ধ্বংস হয়।

৭৬. অবধূত, কৌশিকী কানাড়া, কলিকাতা পুস্তকালয়,কলকাতা,১৯৬৩,পৃ. ৬৯

৭৭. ঐ, পৃ. ৬৫-৬৬

৭৮. ঐ, পৃ. ৬৮

৭৯. ঐ, পৃ. ৮৮
৮০. ঐ, পৃ. ৫৪
৮১. ঐ, পৃ. ৯১
৮২. ঐ, পৃ. ৯৮-৯৯
৮৩. ঐ, পৃ. ৯৯
৮৪. ঐ, পৃ. ৯৯-১০০
৮৫. ঐ, পৃ. ৮৪
৮৬. ঐ, পৃ. ৭১
৮৭. ঐ, পৃ. ১১৮
৮৮. ঐ, পৃ. ৮৬
৮৯. ঐ, পৃ. ৫৫
৯০. ঐ, পৃ. ৫৬
৯১. ঐ, পৃ. ১০০
৯২. ঐ, পৃ. ৪০
৯৩. ঐ, পৃ. ৪৫-৪৬
৯৪. ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি সাক্ষরিত হয় দিল্লীতে। লিয়াকৎ আলি খান তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ১৯৫০ সালে ভারত ও বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) ১০ লক্ষেরও বেশি হিন্দু-মুসলমান উদ্বাস্তু হন। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এবং নোয়খালিতে ব্যাপক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শুরুতেই বলা হয়েছিল ‘ সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের মতই দেশের সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রাজনৈতিক ও অন্যান্য পদে থাকতে পারবেন এবং দেশের প্রশাসনিক ও সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করতে পারবেন। উভয় সরকারই এগুলিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করছে এবং এগুলিকে কার্যকর করবে।
৯৫. অবধূত, কৌশিকী কানাড়া, কলিকাতা পুস্তকালয়,কলকাতা,১৯৬৩, পৃ. ৫৮
৯৬. ঐ, পৃ. ৫৮
৯৭ ঐ, পৃ. ৫৯
৯৮. ঐ, পৃ. ১৪২
৯৯. ঐ, পৃ. ১৪৫
১০০. ঐ, পৃ. ৭৭
১০১. অবধূত, বিশ্বাসের বিষ,মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,১৯৭৪, এই উপন্যাসে গোপিকারমণ বলেছেন সবারই অস্ত্র চালাতে পারা দরকার।
১০২. অবধূতের ‘ফক্কড়তন্ত্রম ’দুস্প্রাপ্য একটি গ্রন্থ। এটি গ্রন্থপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত

হয়। দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট, চিত্র নং ১৭

১০৩. নীললোহিত, প্রমথ চৌধুরীর লেখা নীললোহিত একটি ছোটগল্প এই চরিত্রটির স্বপ্নময় জীবন-কল্পনা এখানে তুলনীয়।

১০৪. অবধূত, বিশ্বাসের বিষ,মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,১৯৭৪, উপন্যাসে একটি চরিত্র 'কালী'। 'কালী' বাউণ্ডুলে ফক্কড় থেকে পরবর্তীকালে লেখক হয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে শুভায়ভবতু উপন্যাসটি শেষ হয়েছে দুরি বৌদির খাতায়। এটি একশ পৃষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃত একটি চিঠি। এই চিঠির মাধ্যমে উপন্যাসের সমস্ত জট খোলা হয়েছে। গোটা উপন্যাস যেখানে ঘটনার বিবৃতি'দুরি বৌদির খাতাটা সেখানে প্রতিটি ঘটনার পরিচয়। উপন্যাসের ঘঠনশিল্পে এটি অবশ্যই বৈচিত্র্য সঞ্চার করে। 'শুভায় ভবতু গ্রন্থে'১৯৭-২৯৬ পৃষ্ঠা জুড়ে রচিত হয়েছে 'দুরি বৌদির খাতা'।

১০৫. অবধূত, বিশ্বাসের বিষ,মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,১৯৭৪ মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ৩

১০৬. ঐ, পৃ. ৭

১০৭. ঐ, পৃ. ৪

১০৮. 'পরিচয়ের আড়ালে' বলতে কথকের নিজের লেখক সত্তার কথা বলা হয়েছে। 'বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসে কথক চরিত্রটির নাম 'কালী'। একদা ফক্কড় জীবনের সাথী দীননাথ উকিল এই নামেই তাঁকে ডেকেছে। আমরা মনে করি এই 'কালী'----আসলে কালিকানন্দ অবধূত ।

১০৯. অবধূত, বিশ্বাসের বিষ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১৭

১১০. ঐ, পৃ. ২৯-৩০

১১১. ঐ, পৃ. ১৪

১১২. ঐ, পৃ. ১৯

১১৩. ঐ, পৃ. ২১-২২

১১৪. ঐ, পৃ. ২৪

১১৫. ঐ, পৃ. ৩১

১১৬. ঐ, পৃ. ৩৫

১১৭. ঐ, পৃ. ১৮

১১৮. ঐ, পৃ. ২৭-২৮

১১৯. ঐ, পৃ. ২৯-৩০

১২০. ঐ, পৃ. ৩৭

১২১. ঐ, পৃ. ৪৩

১২২. অবধূত, পিয়ারী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৬৫-৬৬

১২৩. ঐ, পৃ. ৬২- ৬৩

১২৪. ঐ, পৃ. ৬৩

১২৫. ১৯৫০ সালে নেহেরু -লিয়াকৎ চুক্তি সাক্ষরিত হয় দিল্লীতে। লিয়াকৎ আলি খান তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ১৯৫০ সালে ভারত ও বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) ১০ লক্ষেরও বেশি হিন্দু-মুসলমান উদ্বাস্তু হন।

১২৬. অবধূত, পিয়ারী (গল্পগ্রন্থ), দাবানল, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৭৩

১২৭. ১৯৫০ সালে ২৭ অক্টোবর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সাথে যোগসাজশে সামরিক আইন জারি করেন সেনাপ্রধান আইয়ুব খান। ইনি ১৯৫৪-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

১২৮. ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এবং নোয়াখালিতে ব্যাপক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির শুরুতেই বলা হয়েছিল ' সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের মতই দেশের সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রাজনৈতিক ও অন্যান্য পদে থাকতে পারবেন এবং দেশের প্রশাসনিক ও সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করতে পারবেন। উভয় সরকারই এগুলিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করছে এবং এগুলিকে কার্যকর করবে।

১২৯. অবধূত, পথভুলে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃ. ২৬

১৩০. আখাউড়াঃ রঙপুর একটি রেল স্টেশন এটি অধুনা বাংলাদেশে। আখাউড়া হলো বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরা আসার মূল বর্ডার এটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

১৩১. অবধূত, পথভুলে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬২,পৃ. ১৪

১৩২. ঐ, পৃ. ৩৫

১৩৩. ঐ, পৃ. ৩৮

১৩৪. ঐ, পৃ. ৪৫

১৩৫. ঐ, পৃ. ৫৯

১৩৬. ঐ, পৃ. ১৯

১৩৭. ঐ, পৃ. ৩৭

১৩৮. ঐ, পৃ. ৩৮

১৩৯. ঐ, পৃ. ৪৭

১৪০. ঐ, পৃ. ৫৮

১৪১. ঐ, পৃ. ১০৬

১৪২. ঐ, পৃ. ১০৯

১৪৩. অবধূত, সাচ্চা দরবার, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,১৯৬০, পৃ. ২৪

১৪৪. ঐ, পৃ. ২৬

১৪৫. ঐ, পৃ. ৬৬

১৪৬. ঐ, পৃ. ৪২

১৪৭. ঐ, পৃ. ৮

১৪৮. ঐ, পৃ. ৯
১৪৯. ঐ, পৃ. ১২
১৫০. ঐ, পৃ. ১১
১৫১. ঐ, পৃ. ৮
১৫২. ঐ, পৃ. ৬৪
১৫৩. ঐ, পৃ. ৬৬
১৫৪. ঐ, পৃ. ৬৯
১৫৫. ঐ, পৃ. ৭৬
১৫৬. ঐ, পৃ. ৫৬
১৫৭. ঐ, পৃ. ৭৭
১৫৮. ঐ, পৃ. ২৭
১৫৯. ঐ, পৃ. ৬২
১৬০. ঐ, পৃ. ৬১
১৬১. ঐ, পৃ. ৭১
১৬২. ঐ, পৃ. ৫৯
১৬৩. ঐ, পৃ. ৭৫
১৬৪. ঐ, পৃ. ৬৯
১৬৫. ঐ, পৃ. ৭৯
১৬৬. ঐ, পৃ. ৮৬
১৬৭. অবধূত,সুখশান্তি ভালোবাসা, শুভায় ভবতু, তুলি-কলম, কলকাতা,১৯৭৮, ব্রজমাধবকে লেখা দুরির লেখা চিঠি, পৃ. ২৫৩
১৬৮. ঐ, পৃ. ২৫৩

চতুর্থ অধ্যায়

গল্পকার অবধূত :
চলমান জীবন-অন্বেষা ও রস নির্মিতির অনুসন্ধান

পৃষ্ঠা

এক. গল্পকার অবধূতের 'ক্রীম': চলমান জীবন-অন্বেষা ২৬৬

দুই. 'নিরাকারের নিয়তি': কিশোর মনের গল্প ২৭৯

তিন. অবধূতের ছোটগল্প :প্রসঙ্গ বহুব্রীহি ২৮০

চ তু র্থ অ ধ্যা য়

গল্পকার অবধূত :
চলমান জীবন-অন্বেষা ও রস নির্মিতির অনুসন্ধান

ভূমিকা

পৃথিবীর প্রাচীনতম কাহিনি বলা হয় মিশরীয় লেখক 'আন্নানা'-র একটি লেখাকে।* ছোটগল্পের বীজ সেখানে পাওয়া যায়। কাহিনি অতিপ্রাচীন হলেও তাতে ছোটগল্পের সাহিত্যিকরূপ পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যের কথা অনেক পরে, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে ইংরাজি সাহিত্যেও ছোটগল্প একটি প্রধান সাহিত্যিক রূপ পায় নি।** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ভুবনের গল্প'-র মধ্যেও ছোট গল্পের সূচনা হলেও বাংলা ছোটগল্পে এর প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের হাতেই। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনায় প্রবেশের আগে সে-কথা মনে রাখা দরকার। ছোটগল্পে চলমান জীবনের ছায়া পড়ে। 'চলমান জীবন' বলতে কী বুঝি? ছোটগল্পের কাহিনির মধ্যেই সে জীবনের অন্বেষণই বা কী ভাবে হতে পারে? অবধূতের ছোটগল্পের মধ্যে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই। উপরি লাভ হয় সাহিত্য-রসের আস্বাদন। অবধূতের বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর ছোটগল্পের নানা প্রসঙ্গে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। পাঠকের বিস্ময় জেগেছে এই লেখকের অভিজ্ঞতা-লব্ধ নানা জায়গা আর ভিন্ন প্রকৃতির মানুষকে তাঁর ছোটগল্পের অঙ্গণে পেয়ে। অবধূতের গল্প পাঠে পাঠকের চিত্তে নতুন জগৎ আবিষ্কারের আনন্দ উপলব্ধ হয়। এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগে আমরা অবধূতের ছোটগল্পে সেই জীবনবৈচিত্র্য সন্ধান করবো। দ্বিতীয়ভাগে আমরা দেখবো গল্পের রসপরিণতি কতখানি শিল্প-সার্থকতা লাভ করেছে। প্রতিটি গল্পের আলোচনায় নির্দিষ্টভাবে এ দুটি বিভাগ সম্পর্কে বিশ্লেষণী মনোভাব কাজ করবে। বলা বাহুল্য চতুর্থ অধ্যায়ে গল্প-মূল্যায়নের এই মাপকাঠিটি গল্পের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

অবধূতের মত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে পরশুরাম বিস্তর জীবনাভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ-- যদিও তাঁদের রচিত কথাসহিত্যের প্রকৃতি ও রসের বিচারে তাঁরা ভিন্ন। তবু তাঁর মনও অবধূতের

পাদটীকা: * 'একটি প্রাচীন গল্প', আন্তর্জাতিক, নভেম্বর, ১৯৫৭

** Maugham, W.S. The points of view, London, 1958, P- 147

মতো বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে দুঃসাহসী কৌতূহল আর অ্যাডভেঞ্চার প্রবণতায় উদ্দীপ্ত। গাছে উঠে বাঁদরের বাচ্চা তার মার কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, কাঁসাই নদীর উৎস খুঁজতে কম বয়সী বন্ধুদের নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যাওয়া, গুহার মধ্যে ভাল্লুক কী ক'রে থাকে তা জানতে চাওয়া তা যেমন করেছেন তেমনি বিপদেও পড়েছেন। চা বাগানের আড়-কাঠির হাতে পড়া থেকে আরম্ভ ক'রে নাগপুর অঞ্চলে ঢাকাই মুসলমানদের সাথে হাতি ধরার দলে ভিড়ে সর্বস্ব খোয়ানো পর্যন্ত তাঁর জীবনে ঘটেছিল। আবার উড়িষ্যা পুলিশের সাব্-ইনস্পেক্টর থাকবার সময় সেখান থেকে ওড়িয়া ভাষা তুলে বাংলা চালু করার উৎকট আদর্শও তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, একটি ভাষার সূত্রে তিনি সারা ভারতের মধ্যে একতা আনবেন। এর জন্য বাংলা ভাষা তুলে সারা ভারতে হিন্দীর প্রচলনেও তাঁর আপত্তি ছিল না। ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে থাকার সূত্রে ইউরোপ ভ্রমণও হয়েছিল। এর ফলে তাঁর রচনায় আত্মমুখী মনোমন্থন নেই এঁরা উভয়েই -বর্হিমুখী। কথাসাহিত্যে ঘটনা-নির্ভরতার দিক থেকে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় আর অবধূত পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয়। দুজনের প্রধান অবলম্বন বাইরের অভিজ্ঞতা। অবধূত অবশ্য ইউরোপে যান নি। সারা ভারত তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন আর সাহিত্যে সে অভিজ্ঞতা উজাড় করেছেন।

বাংলায় যাকে সার্থক ছোটোগল্প বলে তা অবধূত লিখেছেন তিনটি গল্পগ্রন্থ মিলে মোট ২৩টি। গল্পগ্রন্থ তিনটি হলো 'ক্রীম' (১৯৫৯), 'নিরাকারের নিয়তি'(১৯৬৩) এবং 'বহুব্রীহি' (১৯৬৪)---অবধূত তিনটি গল্প গ্রন্থের-ই নামকরণ করেছেন গ্রন্থের প্রথম গল্পের নাম নিয়েই। 'ক্রীম' প্রথম গল্প সংকলনের প্রথম গল্প। এর সাথে আছে আরো তিনটি গল্প ভ্যানিশিং ক্রীম, আইসক্রীম,এবং ক্রীমক্র্যাকার। 'নিরাকারের নিয়তি' (১৯৬৩) মোট ৬টি গল্পের সংকলন। প্রথম গল্পটি এক্ষেত্রেও গ্রন্থনাম হিসেবে ব্যবহৃত। অবশিষ্ট পাঁচটি গল্প হোলো: প্রথম অভিযান, ফেউ,ফেলি, মুস্কিল এবং আসান। এর মধ্যে 'মুস্কিল' আর 'আসান' গল্প দুটি পরবর্তীতে স্থান পেয়েছে 'বহুব্রীহি' নামের ১৫ টি গল্পের সংকলনে। অতএব তিনটি ছোটোগল্প সংকলন মিলে অবধূতের গল্প মোট ২৩টি।

জীবনের নানামুখী অভিজ্ঞতা অবধূতের জীবন-দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছিল। দেখা গেছে যিনি নানা জায়গায় জীবন কাটিয়েছেন তাঁর মধ্যে সঙ্কীর্ণতা কমে গিয়ে উদারতা অনেক বেড়ে যায়। তিনি আঞ্চলিকতার দোষ কাটিয়ে ওঠেন। অবধূত অজ্ঞাতবাসের প্রায় আঠারো বছর ধরে ভারতের নানা স্থানে নানা পরিচয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর অনেক বেশি। তাই অবধূত স্বভাবে ছিলেন মুক্ত-মনা। গৃহগত-প্রাণ সাধারণ বাঙালি তিনি ছিলেন না। তাঁর জীবনে রাত পোহালেই নতুন রাস্তা। চলতি-পথের নানা মানুষের সঙ্গে প্রতিদিনই নতুন করে আলাপ। কোনো একঘেঁয়েমি নেই। নিজের সঙ্গে মুখোমুখি বসার সময় তাঁর কম ছিলো। মনের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি অনুসরণ অপেক্ষা বিচিত্র চলমান জীবনই যেন তাঁর চোখে বেশি করে মেলে ধরেছে। একটা মানুষ বা সমাজে আটকে পড়া কোনো ভাবনাগ্রস্ত মানুষকে তিনি বিশ্লেষণের যেন সুযোগই পাননি। আমরা লক্ষ করেছি অবধূতের গল্পে ও উপন্যাসে মনোজগৎ তেমন গুরুত্ব

পায় নি। চেতন-অবচেতনের ,আলো-অন্ধকারের, মানব-চিত্তের বিচিত্র রহস্যময়তার কোন সংকেতও দেখা যায় না। তাঁর গল্প অন্তরের অন্দরমহলে বর্ণময় হয়ে ওঠেনি। গল্পের বিষয় হৃদয়-নির্ভর নয়,কর্ম-নির্ভর। অধিকাংশ গল্প বৈঠকখানায় শোনার মত বা শোনাবার মত। অবধূতের লেখা মূলত বর্হিমুখী। ঘটনা-বৈচিত্র্য আর চরিত্র-বৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল।

এক. গল্পকার অবধূতের ক্রীমঃ চলমান জীবন-অন্বেষা

অবধূতের প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম 'ক্রীম' (১৯৫৯)। এই গ্রন্থের প্রথম গল্পটির নামানুসারে লেখক এই গল্পগ্রন্থটির নামকরণ করেছেন। নিষ্কলঙ্ক প্রেমের গল্প 'ক্রীম'। জীবন-পাত্রে দুধের মত সাদা যে মানবিক সম্পর্ক তার স্বরূপ উদ্ঘাটনই এ গল্পের প্রধান আশ্রয়। সেই জীবনের মন্থন-জাত অভিজ্ঞতাকে গল্পকার নাম দিয়েছেন 'ক্রীম'। দলজিৎ আর গোমাবতীর নির্মল প্রণয়-সম্পর্কই গল্পের আশ্রয়। তাদের প্রণয়-সম্পর্ক দুধের মতন পবিত্র ও জীবনদায়ী। তাদের সমস্যা ও যন্ত্রণার রূপায়ণ যেন দুধকে মন্থন করা। সেই মন্থনে যেন পাঠক দুধের ক্রীম পেলেন-নামকরণের সার্থকতা এখানেই।

এ গল্পের দুটি কাহিনি এবং পাত্র-পাত্রী দুই জোড়া। প্রথম জোড়া দলজিৎ ও গোমাবতী এবং দ্বিতীয় জোড়া সমীর ও ছায়া। শিল্পী দলজিৎ এবং তার প্রেমিকা গোমাবতীর কাহিনি রহস্যের আড়ালে গল্পসূত্রে নিবেদিত হয়েছে। অন্যদিকে ভাবি ডাক্তার সমীর ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞা ছায়ার জীবনপ্রকৃতিতে গোমা-দলজিৎ কাহিনির বিপরীত। সমীর ও ছায়ার সম্পর্ক প্রবলভাবে সুস্পষ্ট। তাদের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই। ছায়া দেখতে হুবহু গোমাবতীর মত। প্রেমিক দলজিৎ ছায়াকে ভাবতেই পারে না যে সে গোমাবতী নয়। এই সূত্রেই দুটি কাহিনি পস্পরের সাথে জুড়ে গেছে। লেখক দুটি সমান্তরাল ধারার কাহিনিকে বেশ রোমান্টিকভাবে কিছু পথ এগিয়ে নিয়ে অবশেষে ঘটনার চরমে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছেন। বিভ্রান্ত যুবক দলজিতের মৃত্যু-জনিত ট্র্যাজিক বেদনা এ গল্পে আছে; আবার সমীর-ছায়ার কাম্য-মিলনও ঘটেছে ফলে দলজিৎ-এর মৃত্যু ও অপ্রাপ্তির গভীর যন্ত্রণায় এ গল্প শেষ হয়নি। এখানে নানা টানা-পড়েনের মধ্য দিয়ে সমীর ও ছায়ার কাম্য মিলনও দেখানো হয়েছে।

গোমাবতীও ছায়াকে ঘিরে গড়ে ওঠা রহস্যের সমাধান ঘটেছে গল্পের শেষে এসে। গল্পকারের পরিবেশ সঞ্চার ও নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রশংসা না করে পারা যায় না। যেন চোখের সামনে ঘটনাকে ঘটে যেতে দেখা যাচ্ছে। বিরূপ সমালোচকেরা প্রচার করেন যে বীভৎসতা এবং অশ্লীলতা অবধূতের গল্পে অপরিহার্য কিন্তু সে দাবি এখানে নস্যাৎ হয়ে যায়। বীভৎসতা বা অশ্লীলতার কোনো প্রশ্ন তো ওঠেই না বরং এ গল্পের কাহিনি যেন সুরে সুরে বয়ে চলেছে সত্যপ্রেমের স্বরূপ সন্ধানে। একজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী কিম্বা গৃহহীন ফক্কড়ের সামনে একের পর এক ঘটনাক্রমে উন্মোচিত হয়ে চলেছে দলজিতের রোমান্টিক প্রেমের কুণ্ঠিত প্রকাশ।

গল্পের কথক একজন হৃদয়বান 'রাহী' নিজেকে যিনি বলেছেন 'ফক্কড়',তাঁর অভিজ্ঞতার সূত্রেই

পাঠক এ গল্প শুনতে পেলেন। দেখা গেলো ভাব-বিহ্বলতায় ভেসে চলেছে দলজিৎ। তার সম্বিতহীন পথ-চলা এখন তাকে এনে ফেলেছে কুরুক্ষেত্রে। সেখানে দেখা মিললো গল্পের কথক এই 'ফক্কড়'-এর সঙ্গে। যার ঘর নেই,গৃহী মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, থামার কোনো হেতু নেই, চলার কোনো লক্ষ্য নেই, সেই ফক্কড় জুটে গেল প্রেমিক দলজিতের সাথে।

দলজিতের একটাই কাজ---গোমাবতীকে সে ফিরে পাবেই। 'গোমা'-ই তার জীবন। সে 'গোমা'-র নানা ছবি এঁকেছে নিজের হাতে। সে একজন শিল্পী। তার আর-এক পরিচয় সে ছায়ানট। গোমাবতী তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। তাকে ছাড়া জীবন তার অচল। সে বহুদিন পরে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেখা পেলো ছায়ার। গোমাবতীর সাথে তার কী আশ্চর্য মিল ছায়া সুশিক্ষিতা মনোবিদ। সে সমীরের বাগদত্তা। সমীর ডাক্তারি পড়া শেষ করে ছায়াকে বিয়ে করবে। ছায়া অপেক্ষার এই সময়টা সঙ্গীত শিখতে এসেছে এক আশ্রমে। সেখানে নানা বিদ্যার চর্চা করছে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা। নাচ-গান, ছবি-আঁকা --নানা বিদ্যার শিক্ষণ-কেন্দ্র---এ আশ্রমে দলজিৎ এসেছে আঁকা শিখতে।

সেদিন ছায়া গান শেখাতে ব্যস্ত ছিল। দলজিত ছায়ার ছবি আঁকবে বলে তার অনুমতি প্রার্থনা করে। বহুজনের সেই কৌতূহলী উপস্থিতিতে দলজিৎ কে নিজের ছবি আঁকার অনুমতি দেয় ছায়া। সেদিন অল্প সময়ের মধ্যে এই নিষ্পাপ অবাঙালী তরুণ ছায়াকে এঁকে ফেলে তার ক্যানভাসে। সবাই বিস্মিত আর মুগ্ধ হয়ে যায় দলজিতের গুণপনায়। পরদিন দলজিৎ পাঞ্জাবী পোশাকে ছায়ার নানা ছবি আনে। কোনোটি দাঁড়ানো, কোনোটি বসা, কোনোটি আবার শুয়ে আছে এমন। কী প্রাণবন্ত সে-সব ছবি ! একরাতে এত ছবি কেমনভাবে আঁকা সম্ভব---এই কথাটাই সবার মনে তখন ভিড় করে এসেছে। জানা গেলো এ-সব ছবি গোমাবতীর !

দলজিৎ মানতে পারে না যে মনোবিদ ছায়া 'গোমাবতী' নয়। সে ছায়াকে 'গোমা' বলেই ডাকে। বাংলা ভাষা তার আসে না কিন্তু ছায়ার গাওয়া বাংলা গান সে অসাধারণ ভাবে গাইতে পারে। কুরুক্ষেত্রে তার গান শুনে ফক্কড় ভাবতেই পারেনি যে সে বাঙালি নয়। ছায়া তার সমস্যা বোঝে কিন্তু সে-তো গোমাবতী নয় তাই গোটা ব্যাপারটা সে বিস্মিত পুলকে তার হবু স্বামী সমীরকে নিয়মিত জানাতে থাকে।

সমীর সব জানে। সেও একজন শিল্পী। ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও তার ইচ্ছা নিজের জীবনটা সে ছায়ার সাথে সুরে সুরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। গান তার ভারি পছন্দ। দুজনে মিলে তাই 'ছায়ানট' দলজিতের সব কথা আলোচনা করে। দলজিৎ 'গোমা' বলে ডাকলেও জানে সে গোমাবতী নয়। দলজিৎ তো গোমাকে ভালোবাসে তাই ছায়া দলজিতের সাথে নিজেকে কোনো সূত্রেই জড়ায় না। সচেতন মন জানে দলজিৎ তাকে নয় ভালোবাসে গোমাবতীকে। তাই দলজিৎকে বন্ধু হিসেবে মনে রেখে সমীরের সাথে সমস্ত কথা আলোচনা করে। মানুষ মানুষের সাথে সচেতনভাবে পছন্দমত সম্পর্ক পাতিয়ে মেশার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু প্রেমের বিচিত্র রূপ ক'জনে জানে! শিল্পীর মনোজগৎ বোধহয় স্বতন্ত্র ধরনের হয়ে থাকে। অবধূত দেখালেন দলজিৎ গোমাবতীকে কিছুতেই ভুলতে পারেনি। তার ভালোবাসা এতখানি তীব্র যে নিজে পাঞ্জাবী হওয়া

সত্ত্বেও ছায়ার মধ্যে গোমাবতীকে আবিষ্কার করার একান্ত ভালোলাগায় সে বাংলা ভাষার গান আয়ত্ত্ব করে ফেলেছে। গোমাবতীকে ছাড়া তার জীবন অসম্পূর্ণ। বলা ভালো যে গোমাবতী ছাড়া সে বাঁচার কথা ভাবতেও পারে না। এদিকে ছায়া-র বাবা প্রমাদ গুণলেন। তিনি তাঁর মেয়েকে নিয়ে চলে এলেন দিল্লী সেখানে সন্তর্পণে সেরে ফেললেন ডাক্তার সমীরের সাথে নিজের মেয়ে ছায়ার শুভবিবাহ।

এদিকে দলজিৎ বিবাহিতা ছায়াকে দেখে নিজের জীবনের সব আশা হারিয়ে তাদের সান্নিধ্য থেকে পালাতে চেষ্টা করে। ছায়া যে দলজিৎ কে ভালোবাসতে শুরু করেছিল তা সে জানতে পারে ছায়ার মুখেই। সমীরের সাথে বিয়ের আগে বহু চেষ্টা করেও ছায়া দলজিতের সন্ধান পায়নি। ছায়া নিরুপায় হয়ে মাত্র দুদিন আগে সমীরকে বিয়ে করেছে। তাতে দলজিতের মনে এই ভাবনা আরো নিবিড় হয় যে ছায়া নয় আসলে সে 'গোমা'-ই। তখন দলজিৎ বুঝতে পারে ঘটনা যাই ঘটুক গোমাবতী বা ছায়াকে পাওয়ার নৈতিক অধিকার এখন আর তার নেই। গোমা-হীন জীবন তার কাছে পরম শূন্য সে আর এক মুহূর্তও তাদের সাথে থাকতে পারে না। তাকে ছায়ার স্বামী সমীর,কুরুক্ষেত্রের সঙ্গী ফক্কড় কিম্বা ছায়ার বাবা-কেউ-ই বোঝাতে পারে না। ছায়া বা গোমাবতীও না। সে কিছুতেই এই নব-দম্পতির সাথে যেতে চায় না।

এক অসাধারণ চরিত্র এই দলজিৎ। সে বাংলা ভাষা বোঝে না। সঙ্গীতের ভাষা সে জানে। ছায়ার সঙ্গে সুরে মায়াবিষ্ট দলজিৎ। ফক্কড়ের পরামর্শে ছায়া তাই সুরের আকর্ষণে গররাজি দলজিৎ কে তাদের সাথে রেলের কামরায় তুলে নিতে পেরেছিল। পরে সম্বিৎ ফিরে পেলো। বোধগম্য হলো যে এই দম্পতি তাকে সঙ্গে নিতে চাইছে। তৎক্ষণাৎ ওদের জীবন থেকে পালাতে গেলো দলজিৎ। ছুটে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করলো। মাথা ফাটলো রেলের লাইনে আকস্মিকভাবে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে। গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। চলন্ত এঞ্জিনে চাপা-পড়া থেকে কোনো রকমে বেঁচে যায় দলজিৎ। তবে অচৈতন্য অবস্থা থেকে আর তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো গেলো না। দিল্লী স্টেশন থেকে হাসপাতাল, হাসপাতাল থেকে ভাড়াবাড়ি। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির ওধারে ছায়ার বাবা এক মস্ত অট্টালিকা ভাড়া নিয়েছিলেন। সেখানে দলজিতকে শোয়ানো হোল দুদিন আগের ছায়া-সমীরের ফুলশয্যার খাটে। তখন দলজিৎ বেহুঁশ। অল্প সময়ের জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল দলজিৎ। বিড় বিড় করে গাইছিল সে,

"ভীষণ আমার রুদ্র আমার নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার
উগ্র ব্যথায় নূতন করে বাঁধলে আমার ছন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
সবকিছু মোর নিলে এসে-তারপর শূন্য দৃষ্টিতে সে কিছু খুঁজছিল। তার সাথে গলা মিলিয়ে ছায়া গাইলো 'সেদিন আমি পূর্ণ হলেম,ঘুচলো আমার দ্বন্দ্ব।' তারপর দলজিতের গলাও মিশলো ছায়ার গলার সাথে 'দুঃখ সুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ।"[১]

আর কোনো কথা বা সুর বেরোয়নি দলজিতের গলা থেকে। তারা দুজনে মিলে সম্পূর্ণ ছিল লেখক তাই অন্তিমে দুজনের সুর মিলিয়ে দিলেন। বিনা আড়ম্বরে চলে গেলো দলজিৎ।

এরপর গল্পটি অসাধারণ মোড় নিয়েছে। দলজিতের মৃত্যু আপাত নিরীহ হলেও প্রকৃত অর্থে গভীর ছাপ ফেলেছে সমীর ও ছায়ার জীবনে। তাদের মিলনের মধ্যে বড় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে দলজিৎ। সমীর ও ছায়া দুজনেই ভালো গাইতে পারে। তাদের স্বপ্নও ছিলো হাসি আর গানে জীবনকে ভরিয়ে তুলবে। সে চেষ্টাও তারা কম করেনি। তবু দলজিতের মৃত্যু উভয়ের মাঝখানে যেন ব্যবধান রচনা করেছিল। তারা একসাথে ঘুমাতে পারতো না। ছায়া মনে করতো সমীর তাকে মানসিক রোগী ভাবছে। সমীর তেমনটি না ভাবলেও ছায়া এজন্য মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিল। অবশেষে ছায়া বাড়ি ছেড়ে পালাতে চাইলো। পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল পাঞ্জাবী পটিতে গোমার বাড়িতে। সশস্ত্র পুলিশের ভয়েও কেউ মানতে চায় না যে ছায়া তাদের চোখের সামনে বড় হয়ে ওঠা 'গোমাবতী' নয়। গল্পের পরিণতিটি যথেষ্ট উত্তেজক। পুলিশি হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত সমস্ত জট গেলো খুলে। সমীর ও ছায়ার মধ্যে স্থায়ী মিলন ঘটলো। ঘটনা-সংস্থাপন ও চরিত্র-চিত্রণের সার্থকতা প্রশংসাযোগ্য।

ভ্যানিশিং ক্রীমঃ

'ক্রীম' গল্প সংকলনের দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'ভ্যানিশিং ক্রীম'। এখানে গল্পের প্রধান চরিত্র পুনর্বসু পালিত। সংক্ষেপে পিপি। পিপি বলতে পাবলিক প্রসিকিউটারকে বোঝায়। গল্পের নায়ক সে-সব কিছু নন। নির্ভেজাল নিরহংকার একজন মানুষ। ধূতি-পাঞ্জাবী পরা চাদর জড়ানো সাবেকী পোশাকের ভদ্রলোক। তিনি তাঁর মৌলিক মতবাদকে যদি একবার আঁকড়ে ধরার সুযোগ পান তবে কারো কথাতেই তিনি নিজের পথ থেকে সরতে চান না। হাসিমুখে নিজের মতবাদেই অনড় থাকেন। এঁর জীবনের পরিণতি এ গল্পে দেখানো হয়েছে। ইনি একদিন এক দাঙ্গার রাতে প্রাইভেট টিউশান পড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময়ে জীবনের বাজি রেখে একটি মেয়েকে উদ্ধার করেন। এদিন তাঁর এক ছাত্রী পুলিশের হাতেই চরমভাবে ধর্ষিত হচ্ছিল---তিনি পুলিশ দুজনকে মেরে তাকে রক্ষা করেন। পরে পুলিশ মারার দায়ে বাড়ি ছেড়ে পালান। এদিকে মেয়েটি পুনর্বসু পালিতের প্রেমে পড়ে যায়। মেয়েটি নানা ঘটনার পরে যখন মনের কথা বলতে বাধ্য হয় তখন আশা করা যায় যে একটি মধুর মিলন দিয়েই এ গল্পের শেষ হবে। কিন্তু তা হলো না। ঘটনা পরম্পরায় মেয়েটি পিপির প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও গভীর বিষন্নতায় আচ্ছন্ন হলো। গল্প বিয়োগান্ত পরিণতি পেলো। পুনর্বসু পালিত যদি পরিবেশকে এতটুকু বোঝার চেষ্টা করতেন তবে তাঁর এবং স্বাতী সোমের জীবন অন্যরকম হতে পারত। পিপির মধ্যে সব গুণ ছিলো যেটির অভাবে সব মাটি করে দিলো তা হলো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে বদলাতে পারা।

অবধূত দেখালেন এমন অনেক মানুষ থাকেন যাঁরা ন্যায়, নীতি, আদর্শ ইত্যাদি শব্দগুলোকে তাদের প্রকৃত অর্থের সাথে জীবনে গ্রহণ করতেই জানেন না। হাসি-ঠাট্টা জীবনেরই অঙ্গ। এটা মানুষের বোঝা উচিত। স্বাতীর মেসোর সাথে কথা বলার সময় পিপি তাঁর রসিকতার সুরটি

পিপি ধরতে পারলেন না মাঝে থেকে গম্ভীর হয়ে উঠলেন। শিক্ষক-ছাত্রীর প্রেম নিয়ে ঠাট্টাকে অপমানের বিষয় বলে ভুল করলেন। নিজের চরিত্রবল প্রমাণ করতে গিয়ে দুটি জীবন ব্যর্থ করে দিলেন। একদিকে নিজে অসুখী হলেন অন্যদিকে তাঁর ছাত্রী---একটি বয়স্থা কন্যার স্বপ্নকে ভেঙে দিলেন। স্বাতী ও পিপির মিলনকে সার্থক করার জন্য বহু মানুষের কর্মোদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিলেন। নন্দা নামের বিমান সেবিকা পিপির মধ্যে একটি ভালো মানুষকে খুঁজে পেয়েছিল। দাদার আসনে বসিয়ে নিজেও খুশি হতে চেয়েছিল। পিপির রূঢ়তায় সে গভীর বেদনায় পালিয়ে গেলো। এখন আমরা গল্পটির বিষয় আলোচনা করে লেখকের রসনির্মাণ এবং কাহিনি বয়নের সার্থকতা আলোচনা করবো। এ গল্পে মানুষের আশাভঙ্গ করার বেদনা গল্পের শেষকে বিষণ্ণ করে তুললো।

এখন গল্পের সূত্রে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যায়। পিপির আত্মীয়-স্বজনরা, প্রতিবেশীরা তাঁকে হিসেবের খাতা থেকে বাদ দিয়েছিল। এই বাদ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। যে প্রতিবাদ করে না, প্রতিরোধ করে না---কেবল এড়িয়ে যায় তাকে কী-ই বা করা যায়? লোকে তাঁকে ভুল বোঝে,চালবাজ ঘুঘু ভাবে। ডন-বৈঠক,প্যারালাল বারে অভ্যাস করা এই মানুষটি যে শারীরিক ভাবে খুব শক্তপোক্ত হবেন তা আশা করা যায়। তবে তাঁর মনের জোর যে কোনো অংশে কম নয় তা এ গল্পে প্রমাণিত হয়েছে। আরো বড়ো সত্য হলো নির্বুদ্ধিতা আর গোঁড়ামো তার মধ্যে সবচেয়ে প্রবল।

প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে তিনি তাঁর নিজস্বতাকে বজায় রাখেন। কোনোভাবেও যে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করতে পারেন না---এটা এক ধরনের জড়ত্ব! এ গল্পের তিনটি ক্ষেত্রে তা প্রমাণিত। যেমন:

প্রথমত, বোমাবাজির রাতে ইনি দৈনন্দিন গৃহশিক্ষকতা করে ফিরছিলেন। সেদিন রাতে পাড়ার কোনো লোকজন স্বাভাবিকভাবেই বাইরে ছিলো না। উনি কোনোকিছুর পরোয়া না করে নিজের কাজ সেরে ফিরছিলেন। চোখের সামনে দেখলেন একটি মেয়ের উপর চড়াও হতে চলেছে দুজন পুলিশ। পাশে ডাঁই করা লোহা থেকে মুহূর্তে তুলে নিলেন একটি লোহার পাত আর তা দিয়ে দুই 'কর্তব্য রত' পুলিশকে 'নিকেশ' করে দিলেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি একজন বিমানসেবিকার গালে চড় মারতেও দ্বিধা করেননি যখন নিজে পালিয়ে এসে তাঁর বাড়িতেই আত্মগোপন করে আছেন দু-দুটো খুনের দায় কাঁধে নিয়ে। এ সময়ে তার এতটুকুও বুদ্ধি কাজ করেনি। নন্দার বেসামাল অবস্থা দেখে সে তাকে চড় মেরে বসে। সে নারী মাংস লোলুপ নয়। সে ভদ্র ও শিষ্ট একজন বাঙালি। এটা বুঝতে পেরে নন্দা তাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণামও করে। এটা তার চরিত্রের একটা বড় গুণ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরে পাঠক অবাক হয়ে ভাবেন কীভাবে সামান্য অবিবেচনা জীবনের ধারাকেই আমূল বদলে দিতে পারে!

তৃতীয়ত, স্বাতী সোম তাঁর ছাত্রী। সুন্দরী ও সাহসিনী এই মেয়েটি পুনর্বসু পালিতকে ভালোবেসে ফেললেও একজন শিক্ষকের যা করা উচিত বলে তিনি ভেবেছেন তা থেকে কোনোমতে

সরে এলেন না। তাঁর নিজের কথা না ভেবে পুলিশকে আক্রমণ করলেন ও যা হওয়ার হলো। আমরা সবকিছুই দ্রুত ঘটে যেতে দেখলাম। স্বীকার্য যে লেখক ছোটগল্পের চরিত্রধর্ম আগাগোড়া মেনে চলেছেন। এ গল্পের মূল কাহিনি শুরু হলো দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে।। হঠাৎ লড়াই লেগে গেল শহরে। অবধূত খুব সুন্দরভাবে লিখেছেন :

"পাকা ব্যবস্থা ছিল, প্রথমেই সরকার সসম্মানে তাঁদের জ্ঞাতি-ভাইদের গাড়িতে তুলে সুরক্ষিত স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর জনতার ওপর লেলিয়ে দিলেন তাঁদের পোষা হায়নাদের।"[২]

ট্রাম বন্ধ। খোলা রাস্তায় একটিও বাতি জ্বলছিল না। গলি রাস্তায় দু'একটা জ্বলছিল। পথে কোনো লোকজন নেই।এই সময় কানে এলো একটি মেয়ের করুণ আর্তনাদ। পিছনে তাড়া করে আসা শব্দ। ওর ডানদিকে গলা সমান উঁচু পাঁচিল। তার টপকাতে অসুবিধা হয়নি। সেখানে জড়োকরা লোহার মধ্য থেকে রেলের একখানি পাত পেলো হাতড়ে। আক্রমণকারী দুজনের মৃত্যু হয়েছে ভেবে তাদের শিকার মেয়েটি খুবই ঘাবড়ে গেলো। মেয়েটি বাড়ি ফিরলো পিপির দেওয়া চাদর খানি জড়িয়ে। তার পরনের শাড়িখানি কদর্য থাবায় আগেই চলে গিয়েছিল। আর সেই পুলিশ কর্মী দুজন পিপির রডের আঘাতে অর্ধমৃত হয়ে পড়ে রইলো।

রাতের এই নাটনীয় কাণ্ড ঘটে যাওয়ার পরে পাঠক জানতে পারলেন যে শ্রী আদিশূর সোমের মেয়ে স্বাতী সোম ছিল এ দিনের শিকার। স্বভাবতই ইঞ্চিখানেক ব্যাসের একটি চুরুট টেনে সারা রাত পায়চারি করে কাটালেন মেয়েটির বাবা। বাড়ির সবার মুখে কুলুপ আঁটা। স্বাতীর মা কালীর কাছে মানত করলেন মেয়ে নিরাপদে ফিরে আসার জন্য। স্বাতী কাউকেই কিছু বলতে না পেরে একেবারে চুপ আর নিঃসঙ্গ হয়ে উঠলো। একা একা গুমরে মরতে থাকলো এই ভেবে যে কেনো পিপি তার কাছে একবারও এলো না। চাদরের অজুহাত নিয়েও তো আসতে পারতো! চোখের দৃষ্টির মধ্যে তার মনের অবস্থা বুঝে ফেললেন তার সদ্য আসা মাসি এবং মেসোমশাই। এই গল্পে চরিত্রগুলি আচরণ এবং প্রতিক্রিয়াকে লেখক এমন সার্থকতার সাথে ব্যবহার করেছেন যে মধ্যবিত্ত ঘরের সমস্যার গুরুত্বটি খুব স্বল্প পরিসরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এদিকে পিপির ভগ্নীপতি ধনুর্ধর উকিল চতুরানন চৌধুরী পিপিকে পাঠালেন গোপন স্থানে। সেখানে শহরের মধ্যস্থলে দশতলা অট্টালিকায় তাঁর স্থান হলো। দশতলায় বড় ঘরখানির মেঝে-জোড়া দেড় হাত উঁচু গদিপাতা। তার ওপর মখমলের সাদা ধপধপে চাদর। সেখানে পিপির লাভ হোলো মধুচক্রের এক যুবতী-নন্দা আগারওয়াল - সে হরবনস আগারওয়ালের নববধূ।

"ভয়ানক ধারালো নাক চোখ চিবুক, শাঁখের মত পিছল গলাটি। দুই কাঁধের নিচে থেকে কাঁধ পর্যন্ত যেন মোমের তৈরি। তারপর খুব সামান্য একটু বক্ষবন্ধনী, বক্ষবন্ধনীর পরে কোমর, কোমর মুঠিতে না ধরা গেলেও মনেতে ধরে।"[৩]

নন্দা আর এডিথ বর্তমানে বিমানসেবিকা। প্রতারিতা নন্দা মধ্য-কলকাতায় দশতলা এই বাড়িতে গত রাতের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা থেকে স্বাভাবিকভাবে ভেবেছিল পিপিও কামুক ব্যক্তি। সব পুরুষ একরকম নয়। অর্ধনগ্ন পোশাকের জন্য নন্দা পিপির হাতের চড় খেলো। সাথে

সাথে তার শুভবুদ্ধি জেগে উঠলো এবং চিনে নিলো পুনর্বসু পালিত বা পিপিকে।

বিবাহ-রাত্রে এই মেয়েটি প্রতারণার শিকার। তার স্বামী বিবাহ-ব্যবসায়ী। বিয়ে করে বেচে দেওয়াই ছিল তার স্বামীর কাজ। সে তার স্বামীর সপ্তম স্ত্রী। বর্তমানের স্বামী আগারওয়াল। সেও তাকে একই উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছে সে ইঙ্গিত গল্পে আছে। জীবনের শুরুতে এই ধরনের পুরুষ দেখার পর যা হওয়ার তাই হয়েছিল কিন্তু মাস্টারমশাই পিপির হাতের চড় বুঝিয়ে দেয় সব পুরুষ এক নয়। বুঝতে পারে কেমন ধাতের মানুষ এই পুনর্বসু পালিত। নন্দা এবার সানন্দে পাল্টালো নিজেকে,রূপে ভোলানোর চেষ্টা ছেড়ে সহোদর ভাই হিসেবে গ্রহণ করলো পিপিকে। চওড়া লাল শাড়ি-পরা একটি মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গলায় আঁচল দিয়ে ঢিপ করে তার পায়ের ওপর এক প্রণাম করল। বিমান সেবিকা এবং এই দশতলার মক্ষীরাণী নন্দা পিপিকে নিজের দাদার সম্মানিত আসনে বসালো।

কৌশলে সে পিপির কাছ থেকে আসল কথাটা বের করে নিলো। কেন সে লুকিয়ে আছে তাও কৌশলে জেনে নিল। এরপর নন্দা পিপিকে নিয়ে সোজা চলে এলো একশো সাতান্ন নম্বর দেশজ্যোতি ভাদুড়ীমশাই রোডে। এই সূত্রে লেখক গল্পকে পরিণতির সূত্র ধরিয়ে দিলেন। সেখানে স্বাতীর জ্ঞানী ও রসিক মেসোমশাই আর মাসি মিলে প্রায় বিবাহের আয়োজন করে ফেলার জোগাড় করে ফেলেছেন। পরিস্থিতি এমন ভাবে এগোলো যে মনে হোল স্বাতীর সাথে পিপির বিবাহযোগ সমুপস্থিত। কিন্তু তা আদৌ হলো না।

গল্পটি দীর্ঘ কিন্তু পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন নয়। পিপির চরিত্র সম্পর্কে লেখক শুরুতে যা বলেছিলেন পিপি তার প্রমাণ রাখলো। পিপি জানে ছাত্রীরা কন্যা-সমা। সে তার বাইরে কোনো মতে যেতে পারলো না। পিপি নিজেই সমস্ত পণ্ড করে রসিকতার আবহ থেকে সিরিয়াস হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

> "স্বাতী, তুমি আমার ছাত্রী। ছাত্রী-মেয়ের মত। মেয়ের মতই আমি দেখি ছাত্রীদের। বলোমা, সত্যি করে বলো, ইনি যেসব ইঙ্গিত করছেন তা কি তোমার মনের কথা? সেদিন সেই ভয়ংকর রাত্রে অন্ধকারে সত্যিই তোমায় চিনতে পারিনি আমি। সেই খুনোখুনির পরে মাথাটাও আমার ঠিক ছিল না। তাই তোমায় চিনতে পারিনি প্রথমে। সেই অপরাধের জন্যে জঘন্য অপমান করছেন ইনি আমায়। বল মা, এগিয়ে এসে বল, তোমার মাস্টারমশাই কোনোদিন কখনো...।"[৪]

---এই ঘটনার পরে স্বাতী তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে নিজের কাছ থেকে যেন পালিয়ে গেলো। এই পালিয়ে যাওয়া আসলে তার জীবন থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন। পিপি তাঁর হৃদয় জয় করেছিলেন নিশ্চিত লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়ে। মেয়েটির হৃদয়-পূজার সে অর্ঘ্য পিপি ফিরিয়ে দিলেন তাঁর আজন্মপোষিত ধ্যান-ধারনার বশবর্তী হয়ে। বাইরের ঠুনকো সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে কিম্বা স্বভাব-সিদ্ধ আচরণকে পাল্টাতে না পারার জন্য স্বাতীর মনের অবস্থা কিম্বা স্বাতীর মেসোমশাই বা নন্দার মনের ইচ্ছাকে পিপি বুঝতে পারলো না। পাঠক বুঝতে পারবেন স্বাতী তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে গভীর যন্ত্রণা বুকে নিয়ে চলে গেল।

নন্দাও এত ব্যথাহত হলো যে পিপির সঙ্গ ত্যাগ না করে পারলো না। পিপি এখন বুঝতে পারছে কাজটা সে যা করেছে তা সে করতে চায়নি। বড় কষ্ট দিয়েছে স্বাতীকে। যা অতি সুন্দর হতে পারতো এমন একটি মধুর পরিসমাপ্তিকে সে নষ্ট করেছে। তাই লেখক জানালেন পিপির এই স্বভাব তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। এখন সে চেষ্টা করবে নন্দা আর স্বাতীকে ভুলে যেতে। বোধহয় সম্ভব হবেও একদিন কিন্তু এমন একটি মধুর সম্পর্ক যা বিবাহ পর্যন্ত গড়াতে পারতো তা সম্ভব হলো না পিপির একান্ত বেয়াড়াপনার জন্য।

এ গল্পে আমরা দেখি ঘটনা-নির্ভরতা। এ গল্পে বিবৃতির চাইতে চরিত্রের মধ্যে কথোপকথনই বেশি লেখক নিজে যেন কিছু বলতেই চান না। তিনি কেবল যা দেখেছেন তাই যেন বলে যাচ্ছেন। ৫৩ পৃষ্ঠার এই গল্পটি সম্পূর্ণভাবে কলকাতা-কেন্দ্রিক। এখানে চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে বৈপরীত্যমূলক আচরণের প্রাধান্য। বাইরের পরিচয়টা যেন অবধূতের চরিত্রগুলির সত্যকার রূপ নয়। বাইরের পরিচয়টা একটা খোলশ -মাত্র। নন্দা বাইরে লাস্যময়ী এক নারী অথচ ভেতরে একান্ত ঘরোয়া এক শিষ্ট মহিলা। তার স্বামী বিবাহের উপযুক্ত পাত্র হয়েও শেষপর্যন্ত কুৎসিত মনের এবং নিন্দিত কাজ করে জেলে গেছে। আগারওয়াল মধুচক্রের একজন খরিদ্দার। সে একজন ব্যবসায়ীও বটে উদ্দেশ্য নিয়েই সে শেষপর্যন্ত নন্দাকে বিয়ে করেছে। বিমান- সেবিকার চাকরিও দিয়েছে। সে সমাজ-বিরোধী হয়েও বাইরে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। আবার নিজের বাড়িতে নন্দাকে নিয়ে ইয়ার-বন্ধুসহ ফূর্তি করছে। আসলে নন্দা এবার রক্ষিতায় পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে স্বাতী সোম ডানপিটে মহিলা হয়েও পিপির জন্য তার স্বভাব ত্যাগ করে রীতিমত বিরহিনীর জীবন যাপন করেছে। রঙ-বেরঙের পোশাক ত্যাগ করে সাদা থান পরতে শুরু করেছে। হাসি-খুশি তার উড়ে গেছে। সে পিপিকে ওরফে পুনর্বসু পালিতকে ভালোবেসে অপেক্ষা করতে করতে একেবারে বদলে গেছে। তার পরিবর্তন দেখে তার বাবা-মা পাত্র দেখতে শুরু করেছে।

স্বাতী সোম দুর্ঘটনার সেই রাতের পর থেকে পিপির জন্য তার বুকের মধ্যে ভয়ংকর এক যন্ত্রণা সে একান্তভাবে বয়ে চলেছে। সে প্রতীক্ষা করে আছে কখন পিপি আসবে। সে তার চাদর ফেরৎ নেবার জন্য আসবে বলে স্বাতী তা পরিষ্কার করে গুছিয়ে রেখেছে। রাতদিন অপেক্ষা করতে করতে তার খাওয়া-ঘুম,আনন্দ-হাসি সবই চলে গেছে। লেখকের ভাষায় : 'অহর্নিশ একা একা গুমরে মরা আর প্রতীক্ষা করা, এই দু'জাতের বিষ একবার যার মনে আশ্রয় নেয়, তার দুই চক্ষু খুব বেশী মুখর হ'য়ে ওঠে।'

সে নিজের সমস্ত জামাকাপড় ছোট বোনকে আর বৌদিদের সেধে দিয়ে দিল। মায়ের কাছ থেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে নিয়ে কিনে আনলো সাদা ধূতি তাই পরলো নিজে। সরু পাড় সাদা ধূতি আর সাদা ব্লাউজ। আর কিছু নয়। কান-গলা খালি রাখলো। বাড়ির লোকের কোনো কথার প্রতিবাদ করলো না, ঝগড়া করলো না --সবরকম নিন্দা-স্তুতি হজম করলো। মধ্যবিত্তের টানাটানির সংসারে কার হাতে আর বেশি সময় থাকে ? এ সময় এলেন স্বাতীর ছোটমেসো আর ছোটমাসি। তাঁরা এস্কিমোদের দেশ থেকে হাইলে সেলাসীর দেশ পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। স্বাতীর ছোট মাসি নিঃসন্তান আর অর্থবান স্বামীর আদুরে বউ। তাঁর চোখে পড়ে স্বাতী ধরা

পড়ে গেল।

তারপর স্বাতীর মেসোমশাই অনেক কৌশল করে তার পেটের কথা বাইরে আনলেন। ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে স্বাতীর মন দেওয়ার পর্ব কি আরো দীর্ঘায়িত করা যেত? পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয়না স্বাতীর মনে এখন গভীর ভালোবাসা এই সংযমী সাহসী উদার ও হৃদয়বান মানুষটির জন্যে। পিপি সাংঘাতিক ভাবে সংসার-অনভিজ্ঞ। তার ভদ্রতা এখানে পাথরের মত নিস্প্রাণ। স্বাতীর মনের স্বরূপ বোঝা তার অসাধ্য স্বাতীও আর আগের মতন নেই। ডানপিটে মেয়েটি লজ্জায় সঙ্কোচে সম্পূর্ণ আলাদা! তাই পিপির সামনে সে তার মনের কথাটা পর্যন্ত বলতে পারনি। অসহ্য যন্ত্রণায় সে পিপির সামনে থেকে পালিয়েছে।

পিপি বাইরে নিরীহ হয়েও ভেতরে আপনবৈশিষ্ট্যে অনড় তার প্রমাণ এই ছোটগল্পের ক্ষুদ্র অবকাশে লেখক জানিয়ে দিয়েছেন। লেখক বোধহয় বোঝাতে পেরেছেন যে মানুষ পরিবেশ বা পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে পাল্টাতে পারে না সে নিজেকে বঞ্চিত করে এবং তার শুভানুধ্যায়ীদেরকেও পীড়িত করে। এই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য কোনোমতেই প্রশংসার যোগ্য নয় বরং একধরনের জড়ত্ব বলা যেতে পারে। তবে ইন্দ্রিয়জয়ের সাধনা করে যাঁরা জগতের কল্যাণপুত কর্মে আত্ম নিয়োগ করেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

আইসক্রীম : নিঃস্ব প্রেমিকের উবে যাওয়া

অবধূতের প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম 'ক্রীম' (চৈত্র ১৩৬৬)। এই গ্রন্থের তৃতীয় গল্পটি হলো আইসক্রীম। এখানে হাসির মোড়কে এগিয়ে চলা গল্পের সিরিয়াস পরিণতি আমাদের চমকে দেয়। আড্ডার আসর থেকে বিয়ে, বন্ধুর বিয়ের আসর থেকে এক বন্ধুর একেবারে ফুরিয়ে যাওয়ার ঘটনা অবধূত এ গল্পে শুনিয়েছেন। আইসক্রীম যেমন মিলিয়ে যায় তেমনি কথায় কথায় বাজি ধরা প্রগল্‌ভ বাসব দত্ত ভালোবাসার জোচ্চুরী ধরতে গিয়ে নিজে আটকে গেলো। তারপর ভালোবাসার শূন্যগর্ভ নাটুকেপনায় নিজেই ধরা দিল। তারপর তার ভালোবাসার প্রাপ্তি অসম্ভব জেনে নিজেই জীবন থেকে সরে গেল। বিবাহের যৌতুক হিসেবে নিজের স্থাবর অস্থাবর সবকিছুই দিয়ে বাসব পৃথিবী থেকেই বিদায় নিল। তার চলে যাওয়াটা এতটাই আকস্মিক, যে বোঝার আগেই শেষ হয়ে গেল। এভাবে হয়তো ছোটগল্পের চরিত্র-ধর্ম সার্থকভাবে ফুটে উঠলো তবে বাসব মরে গিয়েও তার বন্ধুদের মনে চিরকাল বিস্ময় জাগিয়ে রাখলো। এই বাসব প্রেমকে ভাবতো একটা মামুলি ধরনের ব্যাপার। তার মতে এ বিষয় নিয়ে গল্প লেখাও চলে না। ভূতের গল্প যেমন শেষ পর্যন্ত ঘাড় মটকানোর গল্প হয়ে দাঁড়ায় তেমনি প্রেমে পড়ে লোকের নাকানি চোবানির ঘটনা কীভাবে ঘটে সেটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় 'প্রেম' বিষয়টাই সেখানে থাকে না। তার এই মনোভাব অনুযায়ী গোটা গল্পের সিংহভাগ জায়গা জুড়ে তাকে প্রেম বিষয়টা নিয়েই নেতিবাচক মন্তব্য আর তাকে প্রমাণ করার বিষয়ে সক্রিয় দেখা যায়। কিন্তু শেষ পরিণতিতে একটি মাত্র ড্রাফটে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিক্রির টাকা ভরে দিয়ে নিজে হতাশ্বাস মৃত্যু বরণ করে। ড্রাফটটি নববধূর উদ্দেশ্যে সে দান করে যায়।

অবধূতের সাথে যাঁদের আলাপ ছিল তাঁরা অনেকেই তাঁকে ভণ্ড ভেবেছিলেন আর প্রতিভাবানেরা তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন অসামান্যতা। তিনি নিজেকে ধাপ্পাবাজ প্রমাণ করতে আগ্রহী ছিলেন। ছাইচাপা আগুনের মত তাঁকে সে আবরণ ভেদ করে তাঁকে ব র ণ করে নিয়েছিলেন ভাগ্যবানেরা। এখানেও তেমনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্র বাসব দত্ত যে আবেগ ও ভালোবাসায় গড়া একজন সত্যিকারের প্রেমিক, তা আমাদের তখন বোধগম্য হয় যখন সে হাতের বাইরে চলে গেছে। বৈপরীত্যের মধ্যে দিয়ে গল্পের প্রতিপাদ্যে পৌঁছনোর কৌশল এই গল্প গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'আইসক্রীম' গল্পটিকে ইচ্ছা করলেই নাটকরূপে উপস্থাপিত করা যায়। সংলাপ এত বেশি যে নাটকে রূপ দিতে হলে পরিশ্রম নেই বললেই চলে। স্বভাবত এখানে চরিত্র-প্রাধান্য আমাদের চোখে পড়ে। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দুই ধরনের চরিত্র এখানে এসেছে। বিয়ের আসরে এসেছে জনতা-চরিত্র। বিশ্লেষণী আলোয় দেখা যায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অবধূত সংযম বজায় রেখেছেন। মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব কেউ-ই পায়নি। এমনকি নিজেও সরে থেকেছেন আর মহাভারতের সঞ্জয়ের মত কী ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তা আমাদের শুনিয়েছেন। পাঠক তার নিজের চোখে সবই যেন দেখতে পাচ্ছেন। এই কৌশলটি এতটাই সার্থক হয়েছে যে চরিত্র আর কাহিনি গড়ে তোলা বলে মনে হয় না। মনে হয় যা ঘটছে তার আবার সত্য মিথ্যা কী?

এখানে সক্রিয় পুরুষ চরিত্রগুলি হলো: বাসব দত্ত, সানু মিত্তির, ধ্রুবজ্যোতিবাবু,ভবভূতি সোম,জাগুয়ার (জগদ্ধাত্রী প্রসাদ) রায়, পিরামিড পুরকায়স্থ, পিরামিডের ভগ্নীপতি, বোধানন্দ বোস, সাঁচ্চা (সচ্চিদানন্দ) বোস,সত্যভূতি সোম,খনখনে গলার পুরুত ঠাকুর এবং সাধু মহারাজ। নারী চরিত্রের মধ্যে সুধা ও সুধার মা। এছাড়া ঢাকুরিয়ার বিবাহ বাসরে উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনরা। তাঁদের ব্যক্তি-নাম করেননি লেখক। এমনকি ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ততার জন্য সুধার মাকে 'কনের মা' বলে পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়েছেন। অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সেখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো লেখক চরিত্রের মুখে সার্থক ভাষা ও চেহারার উপযুক্ত বর্ণনা দিয়েছেন। উপস্থাপনার এই দুটি কৌশলের সার্থক প্রয়োগে অবধূত 'আইসক্রীম' গল্পের চরিত্রগুলিকে যেন পাঠকের সামনে জীবন্ত হাজির করিয়েছেন। স্থান হিসেবে এসেছে দক্ষিণ অঞ্চলের কফিহাউস,গঙ্গার ধার, কৃষ্ণচূড়ারতলা, উত্তরাঞ্চলের খালসা হোটেল, ঢাকুরিয়া (ঢাকুরে, এখানেই বসেছিল বিবাহ-বাসর)। অবধূত উল্লেখ করেছেন : 'গাড়ি জ্বালানো আবার ফ্যশান হয়েছে আজকাল।'

'ক্রীম-ক্র্যাকার': বহুনামীর প্রণয়-পরিণতি

'ক্রীম' (চৈত্র ১৩৬৬) গল্পগ্রন্থে মোট চারটি গল্প আছে। শেষ গল্পটি 'ক্রীম-ক্র্যাকার'। এই গল্পটির বিষয় আপাত গাম্ভীর্যের মধ্যে কৌতুক রসের শিল্পিত উপস্থাপনা বলা যায়। এ গল্পের প্রধান চরিত্রটির একাধিক নাম---মোট এগারোটি। অন্যান্যদের মধ্যে আছেন---কণক মৈত্র, শ্রীমতী সুজাতা দেবী, ডক্টর সুবিমল মৈত্র,

যজ্ঞেশ্বর বাবু, কালা চাকর ভুজঙ্গ, নকুড় মামা,প্রফেসর বিজয় বোস, প্রফেসরের স্ত্রী হৈমন্তী, মস্টার ব্যাঙো ওরফে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আমরা এখন গল্পের বিষয় আলোচনা করে চরিত্রগুলির নির্মাণকৌশল ও গল্পের রসপরিণতি বিচারে অগ্রসর হবো।

'ক্রীমক্র্যাকার' গল্পের প্রধান চরিত্র বড় বিচিত্র ধরনের। তাঁর বয়স বিশ-বাইশের কাছাকাছি। মেধাবী ও খেয়ালী এই কলেজ-পাশ যুবকের নামটাই বড় সমস্যার। বর্তমানে তার নাম শ্রীতৃষ্ণিম আচার্য। আদিতে তার নাম ছিল 'খোকা' আর 'সোনা'। বাবা-মা আর আত্মীয়রা এই নাম ব্যবহার করতেন। পাঁচ বছর বয়সে এই নাম বদলে গেল। স্কুলের খাতায় লেখা হলো 'শ্রীমান নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য,পিতা শ্রী প্রাণকেষ্ট ভট্টাচার্য। নৃসিংহ নামটা প্রথমে নসু পরে নেসোএবং শেষপর্যন্ত আরো ভেঙে হলো 'নোসে'। স্কুলের পণ্ডিত মশাই বার বার এই বিশ্রী নামটা এত ছড়িয়েছিলেন যে ম্যাট্রিকে এসে নিজেই এ নাম বদলে রাখলো আদিত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য।

'ভালো রেজাল্ট করে আদিত্য কলেজে ভর্তি হলো। বন্ধু আর অনুজদের মুখে এ নামের প্রথমটুকুই টিঁকলো- হলো 'আদিত্য'। তারপরেও গতিমুখে আরো ছোট হলো 'আদিদা'। কলেজের শেষ পরীক্ষার আগে এ নামটা তাই বদলে সে নিজেই রাখলো 'শ্রীখদ্যোত ভট্ট'। সে নামটাও টিঁকলো না। চারিদিকে যেভাবে বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে তাতে তার পছন্দ হলো 'বিপ্লব'-এই নামটা। মেধাবী যুবক বিপ্লব ভটের কলমে ইংরেজি কাগজের শেষ পাতায় দাঁতভাঙা গোটাকতক প্রবন্ধ লিখে ফেললো। ইংরেজী-জানা মানুষ তার প্রতিভাকে আবিষ্কার করে ফেললো। জাঁদরেল এক ইংরেজ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন বিভাগের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে বসে পড়লো বিপ্লব ভট। এই নামটাও বদলে হলেন বিশ্বমূর্তি শর্মা। সাথে সাথে বাড়ি বদল। পাইকপাড়া থেকে শোভাবাজার। এই শোভাবাজার ছেড়ে যখন নিউ সি আই টি রোডে এলেন তখন নাম নিলেন শুভার্থী শর্মা।''তারপর বকুলবাগান, বকুলবাগান থেকে বাওয়ালী মণ্ডল রোড, সেখান থেকে নিউ আলিপুরে যখন পৌঁছলেন প্রসিদ্ধ হরমন হারকিউলিস অ্যাণ্ড কোম্পানীর পাবলিসিটি অফিসার, তখন তাঁর নামটা দাঁড়িয়েছে শ্রীতৃষ্ণীম আচার্য, আর বেতনটা বাড়তে বাড়তে চার অঙ্কের ওপরে গিয়ে †c ŠQ‡Q| ÕÕ[৫]

তার কথা হলো একঘেঁয়েমির নাম ব্যভিচার। একটি মাত্র নামের লেবেল এঁটে জীবন কাটানোর নাম ব্যভিচার। তাই এগারোবার নিজের নাম বদলেছেন। বাসার ঠিকানাও বদলেছেন সেই সাথে। বর্তমানে তিনি নিউ আলিপুরের পি ১৯/৭/৩ নম্বর ফ্ল্যাটে বাস করেন। নাম বদলের মত বাসা বদল করা তাঁর আর এক উৎকট অভ্যাস। তাই বলে যুক্তি দেখাতে পিছপা তিনি নন। নিজের কাছে তিনি পরিষ্কার। পাখিরা বাসা বদলায়, সাপেরা গর্ত বদলায় বাঘেরা এক বন ছেড়ে আরেক বনে যায়। বিড়ালের আর গরুর স্বভাব কেন মানুষ নেবে? এরাই তো কেবল এক বাড়িতেই আমৃত্যু কাটাতে বাধ্য হয়। এই বাধ্য-বাধকতা মানুষ কেন মেনে নেবে?-এই যুক্তিতে বাড়ি আর পাড়া বদল করার শুরু। এবার মাস আষ্টেকের মধ্যে বাড়ি বদল করেননি। চেহারার বদল ঘটেছে সাহেবিয়ানা ছেড়ে ধরেছেন ধূতি-পাঞ্জাবী-চাদর। চাকর শশী আর রাঁধুনী জগুর মা 'বাবু'র হবিষ্যি আর সুঁচিবাই-গ্রস্ততার চোটে পালানোর পথ খুঁজবার উপক্রম করলো। সাত বছরের

সঙ্গী স্কটল্যাণ্ডের কুলীন সারমেয়টি প্রভুর প্রসাদ হাড়গোড় চিবুতে না পেয়ে মন মরা হয়ে রইলো। শ্রী তূষ্ণীম আচার্য তাঁর নামটিকে সার্থক করার জন্যে পরম তৃপ্তিতে গুম মেরে রইলেন।

এরপরেই গল্পের মোড় ঘুরলো। যজ্ঞেশ্বর বাবুর ভাইয়ের মেয়ে কনক স্কুলে চাকরি করতো আসামের ওধারে অজ পাড়াগাঁয়ে। জামাই ডক্টর সুবিমল মৈত্র চাকরি-সূত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন চীন জাপান কোরিয়া কায়রো -নানা দেশে। এবার কনকের স্বামী ডক্টর মৈত্র স্থায়ীভাবে থাকবেন কোলকাতায়। এখন উঠেছেন প্রফেসর বন্ধুর বিজয় বোসের বাড়িতে। ভালো ফ্ল্যাট খুঁজে সেখানে উঠবেন। টেলিগ্রামের খবর অনুযায়ী আগের দিন ট্রেন পৌছে গেছে। সেটা দুই বন্ধুর কেউ-ই খেয়াল করেননি। তাই বোস-গিন্নি তাঁর পুলিশ মামাকে খবর দিলেন। ইনি এ গল্পের আর-এক উদ্ভট মানুষ 'নকুড় মামা'। চললো কনক মৈত্রকে খোঁজা অন্যদিকে কনক আর তার জেঠতুতো বোন সুজাতা খুঁজতে লাগলো ডক্টর সুবিমল মৈত্রকে। তার বাসায় এখন এসে আছেন সুজাতার প্রেমিক। তার চাকরের সাথে কথা বলে সুজাতা বিভ্রান্ত হলো। ভিন্ন চেহারায় প্রেমিক কে সামনে দেখেও চিনতে পারলো না সুজাত। আরো নানা চরিত্র ও তাদের কার্যকলাপ এই কাহিনির সাথে যুক্ত হলো। হাসি-ঠাট্টার মেজাজে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রসিকতা আর মজার টানা-পড়েনে গল্প বুনলেন লেখক। অবধূত পাঠকের আনন্দ উপভোগের হাস্যরস নিখুঁত পরিকল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত পথে জোগান দিলেন। অনায়াস দক্ষতায় তা রূপ পেলো। গল্পের নানা চরিত্রের বিচিত্র বেশ আর আচরণ চিত্রময় ভাষার সঙ্গতে জীবন্ত হয়ে উঠল। এ গল্পের বর্ণনার মধ্যে দৃশ্যময়তা আমাদের মুগ্ধ করে। ত্রিপুরার গার্লস হাইস্কুলের দিদিমনি কনক মৈত্রের নাম লেখা বিরাট বেঢপ বাক্স হাতে তার বোন সুজাতার চেহারা আর পুরুষালি দাবড়ানি মজার সামগ্রী। পরে আবার লজ্জাবতী কনে হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি বেশ উপভোগ্য। এই হাসির জোগান দিয়েছেন লেখক অসঙ্গতির নিখুঁত চিত্রায়নের মাধ্যমে। লেখকের কথায় :

> "...ঈষৎ গোলাপী রঙের মাংসের ওপর দু'তিন রকমের চড়া রঙের বৈপরীত্য ফোটাতে পারলে কি অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়, সেটুকু চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাবার জন্যেই যেন সেই বিচিত্র সাজে সজ্জিতা হয়ে এসেছেন শ্রীমতী সুজাতা দেবী।"[৬]

সুজাতার বাবা গড়পাড় রোডের যজ্ঞেশ্বর বাবুর ব্যস্ততাও বেশ উপভোগ্য। ইনি কনকের জ্যাঠামশাই। তাঁর কান-কালা চাকর ভুজঙ্গধর সবকথায় এক উত্তর দেয় 'যে আজ্ঞে।' তাকে কেন্দ্র করে জমেছে নির্মল কৌতুক।

গল্পে দুই শ্রেণির চরিত্র এসেছে। এরা পরস্পরের বিপরীত। ফলে প্রত্যেকের আচরণ অল্প চেষ্টাতেই মনে স্থায়িত্ব লাভ করে। ভিন্ন রূপে ধরা পড়ে। উদ্ভট আচরণের জন্য আমাদের মনে রাখতে হয় গল্পের প্রধান চরিত্রকে যিনি এপর্যন্ত এগারোটি নাম আর সেই অনুপাতে বাসা বদল করেছেন। নিজের রূপ,খাদ্যাভ্যাস চলাফেরা সবটার-ই পরিবর্তন করেছেন। এছাড়া একই শ্রেণিতে পড়েন 'নকুড়মামা'। ইনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ভাঁড় অফিসার রূপে চিত্রিত হয়েছেন।

> "বুঝবি না রে তুই পাগলী, বুঝবি না,'ভুঁড়িতে বেল্ট আঁটতে আঁটতে নকুড় মামা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হেসে উঠলেন।" [৭]

আবার প্রফেসর বিজয় বোসের অপটুত্বও উপভোগ্য। তাঁর মত শিক্ষিত মানুষের বাস্তব জ্ঞান-হীনতার জন্য পাঠকের মুখে স্মিত প্রশ্রয়ের হাসি জন্ম নেয়। প্রফেসর বিজয় বোস-এর স্ত্রী হৈমন্তী অতি সক্রিয় হয়ে নকুড়মামা নামক ভাঁড়টিকে যেমন লালবাজার থেকে কনক দেবীর খোঁজ করতে তুলে এনেছেন তেমনি আবার নকুড়মামার অসঙ্গতির কারণে কথা শোনাতেও পিছপা হননি। তবে পাঠক নকুড় মামার মুখে স্বামীর হাতে স্ত্রীর খুন হওয়ার যেসব ঘটনা শোনেন তার সাথে কনকদেবীর হারিয়ে যাওয়ার কল্পনাটার এতটাই অমিল যে এই বিকল্প-সন্ধানী মাথা -মোটা পুলিশ -কর্তাকে হাস্যকর চরিত্র রূপে উপভোগ করতে পাঠকের বাধে না। এছাড়া হ্যারিংটন স্ট্রীটের হানড্রেড ওয়ান ক্লাবের প্রতিদিনের খদ্দের মিস্টার ব্যাঙো ওরফে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে পাঞ্জাবী ড্রাইভারের পা ধরে সম্ভাব্য প্রেমিকার বাক্স-সহ মালপত্র নিজের কাছে নিয়ে যায় আর ফেরত দেয় নেশা কেটে যাওয়ার পরে, তাতে বেশ মজা পান পাঠক। তার মুখের ভাষা অতি উপভোগ্য :

> "হেই বাবা পাঁয়জী না পিঁয়াজী, লে চলো বাবা মালপত্র, হামকো জান্‌সে মেরো না বাবা বুকমে পা দিয়ে। লেও বাবা, লেও দশঠো রূপেয়া। কুছ পরোয়া নেই।
>
> ` k‡Wv †` Mv ewo‡g †cŠQv †` ‡b †m| Ö

অবশেষে ফিরে এলেন ড. সুবিমল মৈত্রের প্রবাসী স্ত্রী কনক মৈত্র। ডাক্তার স্বামীর সাথে দেখা হোল। মিল হোল সুজাতা আর বাসা বদলের কারবারী বর্তমানে শ্রী তূষ্ণীম আচার্য নামধারী সাহেবের সাথে। যিনি ঘনঘন বাসা বদল আর নাম বদল করেন তিনি এবার সম্ভবত স্থায়ী বাসা বাঁধবেন সুজাতা দেবীর কড়া শাসনে। গল্পটি রম্যরচনা,কৌতুক-নাটক এবং ছোটগল্পের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যকে আত্মীকরণ করেই সার্থকভাবে গড়ে উঠেছে।

'সেই যখন আমিও তোমাদের মত ছিলাম'

'সেই যখন আমিও তোমাদের মত ছিলাম' গল্পে ব্যক্তি মানুষের কথা বলার ঢঙে ছাগল পরিবারের কথা বলেছেন। 'ফুল গাছ ভালবাসত বলে 'ফুলি' নামটি রেখেছিলেন নন্তুর মা'---মনে হচ্ছে যেন কোনো মেয়ের শৈশবে নাম রাখার কথা বলছেন লেখক-কথক। এরপর লেখক বলেছেন,

> "এক ছেলে আর এক মেয়ে হোল ফুলির। ছেলে মেয়ের নাম রাখলাম আমরা। মেয়েটা ভয়ানক হ্যাংলাপনা করত, খালি খাবার জন্যে ছোঁকছোঁকানি। তাই তার নাম রাখা হোল লালী। জিভ দিয়ে লাল পড়লে লালী ছাড়া আর আর কোন্ নাম রাখা যায়! লালীর ভাই কিন্তু ভয়ানক গম্ভীর আর আর খুব গাঁট্টাগোট্টা হোয়ে দাঁড়াল। তার নাম রাখা হোল বটকা। লালী আর বটকা আমাদের সঙ্গে বড় হোতে লাগল। আমরা হোলাম ওদের অভিভাবক। এতটুকু কর্তব্যের ত্রুটি করলাম না আমরা। অভিভাবক হোলেই ভালটা মন্দটা জোটাতে হয়। উঠে পড়ে জোটাতে লাগলাম আমরা।"[৭]

---এই বর্ণনা থেকে মনে হচ্ছে যে কোনো অনাথ বাচ্চার দেখাশোনা করছে কোনো বড় লোকের খেয়ালি বাচ্চারা। এখানে নামকরণের ক্ষেত্রে একটি অর্থপূর্ণ সচেতনতা লক্ষ করা যায়। প্রথম নামের তো ব্যাখ্যা দিয়েই দিয়েছেন স্বয়ং গল্পকার - সে ফুলগাছ খেতে খুব ভালো বাসতো তাই তার নাম ফুলি। এর মেয়েটির লোভের কারণে নাম হয়েছে-লালা-ঝরানো লালী আর যে নামটির ব্যাখ্যা করা হয়নি সে হোল বট্‌কা। বটগাছ মৃত্যুঞ্জয়। বটকা মরতে মরতে বেঁচে গেল। -অমরত্বের এই ব্যঞ্জনা টুকু নামের মধ্যে ধরে দেওয়া হোল। কেবল ছাগল-জননী ও তাদের পুত্র-কন্যাদের ক্ষেত্রে সত্য নয় মানুষের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য।

গল্পের মধ্যে ছাগল বা ছাগল-ছানার কথা এমনভাবে বলা হয়েছে যে আদৌ মনুষ্যেতর প্রাণীর গল্প বলে অনেকদূর পর্যন্ত বোঝা যায় না; তাই ব'লে কোনো চেষ্টাকৃত সতর্কতা গল্প রসের স্বাদ পেতে বাধা হোয়ে ওঠে না।

> "দেখতে দেখতে ওরা বড় হোয়ে উঠল। বড় হোতেই লালীকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল নন্তুর মামার বাড়িতে, বটকা আমাদের সঙ্গেই রইল। গুরুগম্ভীর বটকার পানে তখন তাকানো যায় না। মিসমিসে কালো ইয়া তাগড়া সাজোয়ান যম, আড় চোখে তাকিয়ে থাকত বটকা মুখ হেঁট করে। তারপর কথা নেই বার্তা নেই,
> †Z‡o wWi‡q GK Xy †Zgb RvqMvq Xyw‡j Avi †`L‡Z †nvZ bv|Ó°

এবার বোঝা যাচ্ছে লেখক বলছেন একটি স্বাস্থ্যবান পাঁঠার কথা আর ফুলি তার মা। লালী একটি বক্‌রি তাকে নিয়ে নয়, গল্প তৈরী হয়েছে পাঁঠাকে নিয়ে। এই পাঁঠাটিকে দত্তবাড়ির পূজাতে বলি দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল কিন্তু সে বাচ্চাদের চেষ্টায় রক্ষা পেয়ে যায়। সেই রক্ষা পাওয়ার কাহিনিটি এই গল্পের মূল অবলম্বন। এই গল্পটি মানুষের বাচ্চা আর ছাগল-ছানার মধ্যের সম্পর্ককে একটি বিশেষ আন্তরিকতায় অথচ, বাহুল্য-বর্জিত ঘটনা-পরম্পরায় সাজিয়েছেন লেখক। কাহিনি সজ্জায় দেখা যায় :

১. ফুলি, লালী আর বটকার বন্দোবস্ত করা
২ বটকার দুরন্তপনা
৩. বটকাকে পূজার বলি হিসেবে দত্তবাবুর পছন্দ হওয়া
৪. বটকাকে বাঁচানোর জন্যে বালক-মহলে দুশ্চিন্তা
৫. বটকাকে অপহরণ করে রাখা
৬. ঘটনা প্রকাশ হওয়া
৭. বটকার মুক্তি ও স্বস্তির সুখাবেশ

দুই. নিরাকারের নিয়তি: কিশোর মনের গল্প

এটি একটি গল্প সঙ্কলন এখানে মোট ছটি ছোটগল্প আছে : নিরাকারের নিয়তি, প্রথম অভিযান, ফেউ, ফেলি, মুস্কিল ও আসান---এর মধ্যে আবার 'মুস্কিল' ও 'আসান'-এই দুটি গল্প 'বহুব্রীহি' নামক গল্প সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। 'নিরাকারের নিয়তি' গল্পটিতে অলৌকিক বিষয়কে বাস্তবোচিত

রূপে পরিবেশন করা হয়েছে।

প্রথম অভিযান[১১]

গল্পের শুরু হয়েছে উত্তমপুরুষের জবানীতে 'আমার সর্বপ্রথম অভিযানের গল্প শোনাব। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের কথা'। তখন তাঁরা নাইন ক্লাসে ভর্তি হতেন। নাইন ক্লাসে ভর্তি হতেন এমন বয়েসে যে নাইন্থ কথাটা চেষ্টা করেও উচ্চারণ করতে পারতেন না। তারপর নাইন থেকে উঠতেন এইটে এইট্থে। তারপর এইট থেকে সেভেন। আর সেভেন থেকে সিক্স, পিছু হেঁটে হেঁটে উঠে যেতেন। সিক্সে উঠে বুঝতে পারতেন আর একটা বছর পার হোলেই ফিফ্থ ক্লাসে উঠে লিখে পরীক্ষা দিতে শুরু করবেন। আর লিখে পরীক্ষা দিতে পারলেই দস্তুরমত সাবালক হোয়ে যাবেন।'

এ গল্প সাবালক হওয়ার আগের : "তোমাদের কাছেই এই কাহিনীটার কিছু মূল্য হোতে পারে বড়দের কাছে এর কোনও দাম হবে না। কারণ এটা দেশভ্রমণ নয় বা কোনও নামজাদা তীর্থদর্শন নয়।"[১২]

এখানেই মনসাতলা লেনের মধ্যে এই সাহেবকে এভাবে দেখা যেত যখন মনসা তলা লেনের সব বাড়ির ক'জন বাবা,কাকা, দাদা, মামারা, আপিস থেকে বাড়ি ফিরতেন তখন। সেই ভিড়ের সঙ্গে মিশে সেই লোকটাও ঢুকে পড়ত পাড়ায়। ঢুকে সব কখানি বাড়ির সামনে দিয়ে অদ্ভুত সুরে গান গাইতে গাইতে চলে যেত। সে হাঁটত হয় দেওয়াল ধরে নয় ত কারো আঙুল ধরে সামনে পেছনে এপাশে ওপাশে টলতে টলতে। একলা আসত লোকটা, একদম একলা। হাঁটি-হাঁটি -পা-পা-করে টলতে টলতে এগিয়ে আসত। সর্বপ্রথম দেখা যেত তার টুপিটা কালি-মাখানো মস্ত একটা মাটির গামলা উপুড় করে মাথায় দিয়েছে যেন। গামলার ভেতর ঢাকা পড়ত তার চোখনাক সব। দেখা যেত শুধু দাড়ি একগাদা সাদা দাড়ি ঝুলে থাকত সেই গামলার নিচে। আর সেই দাড়ি ওয়ালা গামলার ভেতর থেকে বার হোত গান। ভাঙা গলার পরিত্রাহি চিৎকার, মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যেত না সেই চিৎকারের। গানটা নাকি সে ইংরেজী ভাষায় ইংরেজী সুরে গাইত। একঘেয়ে সুরের একরকমের কথা সব, দম ফেলবার জন্যে থামত এক এক বার থামবার আগে শেষ কথা 'মাসি'-র উপর দিত এক লম্বা টান। তখন এমন উঁচুতে চড়ে যেত তার গলা যে গলিটার এ মুড়ো ও মুড়ো থর থর করে কেঁপে উঠত শেষের 'মাসি' শব্দটির উপর ভর করে। গল্পের শেষে ফিরে এসে ভন্টা---দলের ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলে যে তাকে অনুসরণ করা ব্যর্থ। অভিযান পণ্ড। রাস্তার মাঝখানে পাগলা সাহেব বেমালুম গায়েব হোয়ে গেল। পরে ঘটনাটা জানা গেল চোখে দেখে। বুকের ওপরের সেই কাঁচা মাংসের রঙ করা রবারখানা খুলে গলায় ঝোলানো একটা ছোট্ট থলে থেকে বেষ্টার সন্দেশগুলো বার করে যখন অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে দিতে লাগল পাগলা সাহেব। তখন সত্যিই তাদের চোখে জল এল,সে বেচারীরা জন্মে অবধি সন্দেশ রসগোল্লা ছুঁয়ে দেখেনি। ভাত রুটিও বোধহয় জোটে না তাদের। এরপর আর কিছু না বললেও চলত। সাহেব জানালেন তাই তিনি ঐ রকম সেজে যা পান

এনে এদের খাওয়ান।

এই সংস্করণে গল্পের সিচুয়েশন অনুসারে হাতে আঁকা সাদা-কালো খুব সুন্দর ছবি আছে। এখন আমরা অবধূতের ছোটোগল্প সংকলনের শ্রে'বই 'বহুব্রীহি'-র বিষয় ও রস-ভিত্তিক আলোচনায় ব্রতী হবো। লেখকের মূল্যায়ন-ভিত্তিক অন্যান্য আলোচনা যুক্ত হবে তার পরেই।

তিন. অবধূতের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ বহুব্রীহি

অবধূতের শ্রে'ছোটগল্প সংকলন নিঃসন্দেহে 'বহুব্রীহি'। নামকরণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মনে পড়ে ব্যাকরণের কথা। ছোটবেলায় সমাস শিখতে হয়েছিল। বহুব্রীহি। 'বহুব্রীহি'শব্দের সাথে সেই প্রথম পরিচয়। 'দ্বিগু'সমাসের মত পূর্বপদের সংখ্যা বাচকতায় আর উত্তর পদের অর্থ সাহায্যে তাকে চেনা যেত না। দুম্ করে নতুন একটা মানে আছে---এটা শিখতে হত। সে সময় যা ভাবাত তা হলো দশ জনের দশটা মাথা কতবার তো এক জায়গায় হয়েছে কই রাবণ হয়ে সে তো কোন কিম্ভূত আচরণ করতে শুরু করে নি। তবু মেনে নিতে হয়েছে যে 'দশানন'- মানে রাক্ষস রাজ রাবণ।'বহুব্রীহি'-র প্রভাব মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েও শেষ হয়নি। সারা জীবন বোধ হয় এ সমস্যা থেকে যাবে। পূর্বপদ ও উত্তরপদের অর্থ পুরোটা জানা থাকলেও উভয়ের প্রভাব মুক্ত সম্পূর্ণ নতুন একটা পদস্থ অর্থ প্রায়ই জীবন-অভিজ্ঞতায় অপদস্থ করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই সব মনুষ্যকৃত 'কেন'-র উত্তর আমরা পাই না। বেঙ্কট বর্মার নক্সা চুরির কথা লোকে বলাবলি করলেও যন্ত্ররাজ বিভূতি পায় বিজয়মাল্য। পাঠশালে কানমলা খাওয়া আর নক্সা চুরি করা- কী করে উত্তরকূটের রাজসম্মান প্রাপ্তিতে বিভূতিকে সাহায্য করে তা আমাদের অজানা। মনে হয় জীবন এক বহুব্রীহি সমাস। অবধূতের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা ছোটগল্পগুলি যেন সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। এখানে মোট পনেরোটি ছোটগল্প আছে। সেগুলি এখানে আলোচিত হবে। আমরা প্রথমে এই পনেরোটি গল্পের নাম জেনে নেবো:

১. বহুব্রীহি (পৃ. ১-২২)
২. কাকবন্ধ্যা (পৃ. ২৩-৪৪)
৩. রূপকথার মত (পৃ. ৪৫-৭০) ৪.বাগীশ্বরী (পৃ. ৭১-১০০)
৫. নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে (পৃ. ১০১-১১৩)
৬. সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ কাহিনী (পৃ. ১১৪-১২৬)
৭. নেহাত নাচার (পৃ. ১২৭-১৪৬-১০০)
৮. বিভ্রম (পৃ. ১৪৭-১৫৬) ৯.ইজ্জত (পৃ. ১৫৭-১৬৫)
১০. অব্যর্থ কবচ (পৃ. ১৬৬-১৭১) ১১. রসোত্তীর্ণ (পৃ. ১৭২-১৮০)
১২. মুস্কিল (পৃ. ১৮১-১৯০) ১৩. আসান (পৃ. ১৯১-২০৫)
১৪. পায়রা (পৃ. ২০৬-২১৪) ১৫. ডঙ্কাদা (পৃ. ২১৫-২২৪)

বহুব্রীহি : লম্পটের উত্তরণ

'Happiness depends on what you give not what you get.'[১৩] তীর্থস্থানের নানা নারকীয় কাহিনি সমস্ত দেশে আলোর নীচে অন্ধকারের মত থাকে। সাধারণ মানুষ জন্মগত ভক্তি আর তীর্থের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে যখন দোদুল্যমান তখন প্রয়োজন হয় একটি বিশ্বস্ত আধ্যাত্মিক মানুষের, যিনি পরিস্থিতির উপযোগী করে লোকঠকানো মনগড়া কাহিনি শোনাবেন না। অবধূতের মত লেখকের লেখায় আমরা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি। দুলাল মুখোপাধ্যায় সন্ন্যাস জীবনে অজ্ঞাতবাস কালে যে বিভিন্ন সাধু-সন্তের সাথে কাটিয়ে ছিলেন,সে সময়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই প্রেরণা দিয়েছিল গল্প লিখতে। এসব গল্প তারই ফলশ্রুতি।তান্ত্রিক সন্ন্যাসী কালিকানন্দ অবধূত যখন সে কাহিনি বর্ণনা করেন তখন তার সত্যাসত্য নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। বুঝতে বাকি থাকে না যে এ কোন বানানো গল্প নয়। কাগজের কাটতির জন্যে লেখা গল্পও নয়।

'বহুব্রীহি' গল্পের কাহিনি বেনারস থেকে উত্তর কাশী পর্যন্ত গড়িয়েছে। দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে যে কাহিনির শুরু তীব্র কামনা আর প্রতিহিংসার মধ্যে দিয়ে তার শেষ হয়েছে উত্তর কাশীতে। এক ডোবার জলে যেন আছড়ে পড়েছে পতিতপাবনী গঙ্গার তারণী স্রোত। ছোটগল্প পেয়েছে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা। এ গল্পে একটি লোক যে আপাদ মস্তক পাপে নিমজ্জিত---তার কাহিনি বলা হয়েছে। গরাণহাটার এক বারাঙ্গনাকে নিয়ে সে চলে এসেছে বেনারসে। তার দৃষ্টি পড়ে আছে মেয়েদের শরীরের প্রতি---পূর্ব অভ্যাসের পথ ধরে। টাকার বিনিময়ে নারী দেহ পাবার বন্য অভ্যাসে সে এক মহিলার দ্বারা প্রতারিত হয় টাকা খরচ করার পরেও সেই মহিলার কারসাজিতে তার স্বামীর কাছে মার খায়। প্রাণে বেঁচে যায় অথচ অপমানের জ্বালায় সে ছটফট করতে থাকে। অবশেষে সে মহিলার ওপর শারীরিক অত্যাচার চালায়। সেই অত্যাচারে ও হতাশায় সে উন্মাদিনী হয়ে যায়। বহুব্রীহি পালিয়ে যায়। অনশোচনায় জ্বলে পুড়ে শেষপর্যন্ত মানবসেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে। অবধূত এ গল্পে চরম পাপ কর্ম থেকে পুণ্য কর্মে আত্মনিয়োগের গল্প শুনিয়েছেন। পরিবেশনার গুণে গল্পটির প্রতিটি চরিত্র আর কাহিনি জীবন থেকে পাওয়া বলেই মনে হয়। এখন গল্পটির কাহিনি বয়ন ও চরিত্র নির্মাণের স্বরূপ আলোচনা করে গল্পটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে কি-না দেখবো।

গল্পের নাম 'বহুব্রীহি' নায়কের নামও। মামীর কাছে মানুষ। মামা-মামীর প্রশ্রয়ে বখে যাওয়া ছেলে। আমরা তাকে দেখছি গণক রূপী গল্প-কথকের দৃষ্টিতে---সে তার মামার বাবু স্বভাব পেয়েছে। এসেছে জ্যেতিষের কাছে নিজের ভবিষ্যৎ জানতে। তার হাতে ঘড়ি, গলায় সোনার বোতাম, এক ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি চওড়া আংটি। জামাটা গরদের, নতুন। বোধ হয় কালই পরেছে। জামার দু'জায়গায় হলুদের দাগ লেগেছে। অর্থাৎ একটু বেসামাল অবস্থায় মাংস খেয়েছে। তার চোখের কোলে কালির পোঁচ। ঘাড় থেকে কানের ওপর পর্যন্ত চাঁচা, ব্রহ্মতালুতে এক বোঝা চুল। মাথার চুলগুলো রুক্ষ,বার বার নেমে আসছে কপাল ছাপিয়ে চোখের ওপর। পরনের কাপড়খানা জরি পেড়ে। বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় তার গোত্র জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায়। অবধূত

এ গল্পটিকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যেন সিনেমায় দেখছি :

> ''বলুন আপনার গোত্র।'
>
> 'অ্যালুমিনিয়াম, আমাদের গোত্র হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম', বলে বহুব্রীহি সবকটি দাঁত বের করে ফেললে। অতি কষ্টে হাসি সামলে বললাম -'কে বলে দিল আপনাকে গোত্রটি?'

থতমত খেয়ে ঢোঁক গিলে দু'হাত কচলাতে কচলাতে বহুব্রীহি বললে-'আমার পরিবার। তার সব মনে থাকে কিনা!' গণক তাঁকে সংশোধন করে দিলেন :''তিনি আপনাকে আলম্ব্যয়ন বলেছিলেন, তাই না?'' [১৪]

---একে সিনেমাটিক না বলে উপায় কী ? ---এখানে চলমান জীবনের স্পর্শ মেলে। অর্থবান মানুষ হৃদয়ে শূন্য হলে নারী মাংস লোভী হয়ে কাল কাটায়। এটি জীবনোপভোগের একটি আদিমতম পথ। ব্যবসায়ী শহর কলকাতার জীবনদর্শনের এটি একটি মূল ধারা। এরপর একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রিবেলা, কার্তিক মাসের শেষে একটা চাতালের উপর বসে চাদর মুড়ি দিয়ে জপে মন বসাবার চেষ্টা করছেন কথক, তাঁর কানে এল কথোপকথন:'রাত যে কাবার হতে চলল গো বাবু।

জবাব হ'ল বেশ গদগদ ভাষায়- কি করি বল মাসী-সব দিক সামলে-সুমলে আসতে হয় তো।'

বুড়ি ঝাঁজিয়ে উঠল এই বলে যে এরা তো বাজারের নয় যে, বহুব্রীহির জন্যে রাত দুপুরে হা-পিত্যেশ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে ! তখন বেহায়ার মত হি-হি করে হাসলো সে। দিল পান-জর্দা তারপর খোশামুদির ক'রে খুশি করলো বুড়িকে। -এই আচরণে লালসা পরায়ণ মানুষের হাঙর-মুখ প্রকাশ পেয়েছে সার্থকভাবে। এরপর অভীষ্ট সিদ্ধ হলো। এই ঘটনার পরে একদল লোকের তাড়া খাওয়া বহুব্রীহিকে বাঁচালে কথক :

> ''আপনার জন্যেই আজ প্রাণে বাঁচলাম বাবা, সময়টা যে খুব খারাপ, একথা তো আপনি আজ সকালেই আমায় বলেছেন। আপনার কথাই ফলে যাচ্ছিল।আগেই শান্তি স্বস্ত্যয়নের টাকাটা দিয়ে দিয়েছি, তাই রক্ষে পেলাম আপনার দয়ায়-আপনিই বাবা সাক্ষাৎ কালভৈরব।''[১৫]

---এ ক্ষেত্রে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে পাপী লোকের দুর্বলতার উপর জ্যোতিষী বা ধর্মধ্বজীর প্রতিষ্ঠা। চলমান জীবন নানা ব্যক্তিকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়। আর ব্যক্তি পরিবর্তিত হতে পারে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-প্রভাবে। বহুব্রীহি নিজের অপকর্মে যে জিনিসপত্র খোয়ালো তার মিথ্যা সাক্ষী হিসেবে নিয়ে গেল কথক কে তার নিজের বাড়িতে। কিন্তু ওই বেঁটে বজ্জাতের পেটে-পেটে কত বুদ্ধি তা বুঝেছে তার 'গিন্নি' ও সন্নাসীকে ঠকাতে পারে, কিন্তু গিন্নির চোখে ধুলো দিতে পারবে না। ---এখানে দেখা গেছে গরাণহাটার দেহপসারিণী পারিবারিক প্রতিষ্ঠা পেতে চায় ঘর বাঁধতে চায়, সামাজিক চরিত্র পেতে চায়। অধিকার বোধ গড়ে উঠেছে তার বহুব্রীহির উপরে। সমাজ অনুমোদন না করুক ভিন্নধারার এই চলমান জীবন অবধূতের কলমে বাস্তব হয়ে উঠেছে। সেদিন যা ঘটেছিল

তা পরে প্রকাশ পেল বুড়ির মুখে :

> "বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে---যেমন ঠেঁটা মেয়ে মানুষ। ওর নাক কান কাটা যাবে না তো কার যাবে ? মানুষ নিয়ে যাই, তোকে টাকা দেয়, আর তুই কিনা তোর সোয়ামীর কথায় তার মাথা খেতে চাস। লোকটাকে ঘরে নিয়ে তার জামা কাপড় পর্যন্ত ছাড়িয়ে তারপর সেই গুণ্ডা স্বামীকে ডেকে আনে। তখন মারধোর করে সর্বস্ব কেড়ে নিযে নেংটো করে পথে বার করে দেয়। এর নাম ধম্ম। ধম্মের কল হাওয়ায় নড়ে। আজ ফল বুঝবি ভদ্দর লোকের ছেলেদের সঙ্গে ঠেঁটামি করার। ছুঁড়ির গা-ময় ছেঁকা দিয়ে ছেড়ে দেয়, তবে আরও ভালো হয়। ছ্যাঁচড়া মেয়েমানুষ কোথাকার।"[১৬]

---মানবধর্মের ব্যাখ্যা বোধহয় জীবনাশ্রয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতারই তত্ত্বরূপ। বহুব্রীহি গল্পে বুড়ি তার বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছে। মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতেই হয়---এখানে কথাসাহিত্যিক অবধূত সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি ভোলেননি। বুড়ি অসামাজিক কাজ করেও তাই অন্যের বিচার করতে দ্বিধা করে না। যুগে যুগে এবং গোষ্ঠী-পরিবর্তনে জীবনের ভাষ্য বদলায়---জীবন এভাবেই কালান্তরে বা স্থানান্তরে এগিয়ে চলে। অনস্বীকার্য যে চলমানতাই জীবন। পরিবর্তনশীলতা চলমানতারই ভিন্ন রূপ। তার পরিণতি-সূত্রে ব্যক্তি-সাপেক্ষে জীবনের আদর্শের নব নব উপস্থাপনা---বাস্তবক্ষেত্রের এ সত্য অনস্বীকার্য। কালে কালে বাস্তবতার সাথে নিঃসন্দেহে ঘটে জীবনবোধের সহজ মিতালি। এই বোধ সম্পন্ন হলে স্রষ্টা খুঁজে পান সৃষ্টির অভিনব রাস্তা। সম্ভব হয় সার্থক রসনির্মিতির অনুকূল রূপনির্মাণ। অবধূতের ছোটগল্প প্রসঙ্গে জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়,সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, প্রেমচন্দ প্রমুখের কথা মনে পড়ে। তথাকথিত ভদ্রসমাজের বাইরে বেরিয়ে এঁরা জীবনের সন্ধান করেছেন। অবধূত তাঁদের থেকে আলাদা এখানে যে তিনি মানুষের পরিবর্তনে বিশ্বাসী। অন্যান্যরা যেখানে পরিবেশ আর ব্যক্তির চাওয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে স্বভাবের পরিবর্তন দেখান অবধূর সেখানে ব্যক্তির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পিছপা হন না। তিনি বিশ্বাস করেন যুগান্তরের অন্ধকার মুহূর্তের আলোকপাতে দূর হয়। অন্যান্যরা সেখানে মানুষের স্বভাব বদলায়---কি-না সে বিষয়ে সংশয়ী। আর যদি বদলায় তবে তার একটা মাত্রা রেছে বদলায়---এই বিশ্বাস তাঁদের পল্প পরিণতিকে সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

এরপরে ঘটনা অন্যপথে বাঁক নিলো। বুড়ির শাস্তি দিতে বদ্ধ পরিকর হলো সেই 'ছ্যাচড়া মেয়েমানুষ'-এর পরিবারের লোকেরা। বুড়ি নিজের সম্পত্তি ছাই ভর্তি দুটো মালসায় রাখা সোনার গহনা,টাকা-পয়সা তুলে দিলো গণক ঠাকুরের হাতে।গণক-কথকের ঠিকানা হলো হাড়াররাগের গলির ভেতর ঢুকে সেই চিন্তামণি গণেশের কাছাকাছি গিয়ে ডান ধারে যে হনুমান মন্দির আছে তার পেছনের বাড়ীর একতলায়। বুড়ি ঠিকানাটা জেনে তার হাতে দিল নিজের সম্পত্তি গুলো। নেকড়ায় বাঁধা একটি মালসা। যা পরে বুড়িকে ফেরৎ দিতে হবে। গণকের বাসায় বুড়ি এলো না।পরের দিন এল বহুব্রীহির সাড়ে তিন মন ওজনের পরিবার। খাতির করে বসাতে গেলে, তিনি রক্তবর্ণ চোখ পাকিয়ে বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বহুব্রীহি কোথায়?'। কথা শুরু হলে তাঁর থেকে অনেক বৃত্তান্ত জানা গেল :

১. গরাণ হাটে ওর মামা ছিল তাঁর 'বাবু'। ওই ছোঁড়া তাঁর মাথা গুলিয়ে দিলে---ওর পেছনে তিনি মুঠো মুঠো টাকা উড়িয়ে আজ সর্বস্ব গেছে তাঁর। দেহ সর্বস্ব প্রেম সম্পর্ক মানে না। নৈতিকতা সামাজিকতার শিষ্ট ধারাপাতে পড়ে না যে জীবন - অস্বীকারের উপায় নেই যে সে জীবনও জীবন। সেই চলমান বাস্তব -জীবনকে রূপ দিয়েছেন অবধূত এই 'বহুব্রীহি' গল্পে।

২. গণক সাধুর কাছে সব বললেন : 'বাবা, আপনি কি করে জানবেন তার গুণ। সেদিন ওই ছোঁড়াই গিয়েছিল বুড়ীর সঙ্গে নতুন জিনিসের খোঁজে। তারপর সব কেড়ে নিয়ে ওরা তাকে তাড়িয়েছিল। বোধহয় ঐ আংটিটা বুড়িকে ঘুষ দিয়ে সে পালাতে পেরেছিল। নয়ত সেদিন আরও উত্তম-মধ্যম ছিল ছোঁড়ার কপালে। আপনার সঙ্গে বাড়ি গেল। আমিও খুব গালমন্দ করলুম। ওমা, তার পরদিনই গা ঢাকা দিলে হাজার দেড়েক টাকা সঙ্গে নিয়ে। এই কদিনে লোকজন জুটিয়ে ধরে নিয়ে গেছে সেই ছুঁড়ীকে যে তার নাকালের জন্যে দায়ী। ও হ'ল বিষ কেউটের ভাগ্নে। রোখ চাপলে ওর হাত থেকে নিস্তার নেই। সে ছুঁড়ীর কপালে অশেষ খোয়ার আছে, এই বলে দিলুম।'[১৭]

এখন হাল ছেড়ে বহুব্রীহির 'পরিবার' গেলো কলকাতায়। কথককে নিজের ঠিকানা দিলেন---পরীবালা বাড়িউলি, দু'শ সাতান্নর-এ গরাণহাটা স্ট্রীট। বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গেলেন যদি বহুব্রীহির কোনও খোঁজ-খবর পান, তবে যেন তাঁকে খবর দেন। তারের খরচা আর প্রণামী মিলে কয়েকখানা দশ টাকার নোট রেখে গেলেন তাঁর পায়ের কাছে। যা ভাবা গিয়েছিল তাই হল :

> "দিন সাতেক পরে বাঙালী টোলার ভেতর মাথা নেড়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি যুবতী মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। তার দুই গালে আর শরীরের অন্য সব যায়গায় বড় বড় ফোস্কা। কেউই চিনতে পারলে না মেয়েটিকে কেউ এগিয়ে এসে তাকে নিজের লোক বলে দাবী করলে না।"[১৮]

---বহুব্রীহি যে 'বিষ কেউটের ভাগ্নে' ---তা বোঝা গেল। লেখকের মিতবাক স্বভাব শিল্পী হিসেবে মহৎ করে তোলে। এমন মেয়েকে যে কেউ চিনতে চায় না সে কথা না বললেও চলে ---ব্যঞ্জনা তাই স্বল্প কথায় পরিবেশিত।

কথকের জবানীতে শোনা যাক পরের ঘটনা : 'মাস চারেক পরে আংটি দুটো বেচে যা পেলাম আর তখনও যা কিছু নগদ ছিল সব নিয়ে দেরাদুন এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম। এবার কেদারবদ্রী সেরে আসি। বাবা কেদারনাথ আর প্রভু বদরীনারায়ণের দয়ায় যাওয়া-আসার খরচটা বিনা চেষ্টায় হাতে এসে গেছে। কিছুতে এ সুযোগ ছাড়া কাজের কথা নয়।'[১৯]

ব্রহ্মজ্ঞানীকেও সংসারের নিয়ম মেনে চলতে হয়। সন্ন্যাসী বারাঙ্গনার টাকায় কেদার-বদ্রী ঘুরতে এলেন ! চলমান জীবন। আদর্শও জীবনের অনুসারী। এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ প্রভাবিত পাল যুগে নগরশোভিনীদের সম্মানের কথা মনে পড়ে।

চলমান জীবন কলকাতা থেকে কাশী পতিত থেকে পতিত পাবণ

গল্পের জায়গা বদলে গেল এবার আমরা চলে এলাম উত্তর কাশীতে। স্থানটি গঙ্গোত্রীর ছাপান্ন মাইল নীচে উত্তর কাশী। এখানে বাঙলার ছেলে ভোলানাথ কালী প্রতিষ্ঠা করেছেন। দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন এখানে তিনি।দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী বছরের পর বছর বাস করেছেন উত্তরকাশীতে। গুহা আছে, কাঠের কুঠরী আছে তাঁদের বাসের জন্যে। আর আছে ছত্র। এখন ছত্র থেকে দিনে একবার কয়েকখানি রুটি দেওয়া হয় সাধুদের। ভাদ্র মাস থেকে প্রায়ই বরফ পড়া শুরু হয়। পোষ -মাঘ মাসে কাক চিলও থাকে না উত্তরকাশীর আকাশে। শুধু জেগে থাকেন গঙ্গা আর হিমালয়। তা'ছাড়া বাতাস পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে।- ছোটগল্পের একমুখীন গতি ক্ষুণ্ন না করেও লেখক জানালেন সেখানকার ইতিহাস :

> "সেই উত্তরকাশীতে গিয়ে পৌঁছলাম অক্ষয় তৃতীয়ার আগের দিন। বাসনা ছিল কয়েক দিন বাস করব। কিন্তু কলেরা বাদ সাধলে সে আশায়। গিয়েই জানা গেল উত্তর কাশী এলাকায় কলেরা লেগে আছে।"[২০]

ছোটগল্পের আধারে দিনপঞ্জীর বাস্তবতা গেল মিশে। এল প্রত্যক্ষতা - সেও বড় গুণ।সে যাহোক এহেন প্রতিকূল পরিবেশে কে দেখবে মানুষের অসুস্থতা? এমন পরিস্থিতিতে পাহাড়ী বস্তিতে দণ্ডীমহারাজ কলেরার সেবা চালাচ্ছেন একলা। এখানকার লোকে তাঁকে দেবতার মত মানে। মুণ্ডিত মস্তক নেহাৎ অল্পবয়সী দণ্ডী মহারাজের দয়ায় সে রাতে কথক ও তাঁর সঙ্গীরা রক্ষা পেলেন। কাঠ এল, বড় বড় ধূনি জ্বালা হ'ল কয়েকটা। একটা ধুনির পাশে তিনি মৃগচর্মের ওপর শিরদাঁড়া সোজা করে বসে রইলেন সারা রাত। এরপর অনেক রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল কথকের। হঠাৎ নজর পড়ল দূরে বসা দণ্ডী মহারাজের দিকে। চোখ বুঁজে স্থির হয়ে বসে আছেন। শ্বাস প্রশ্বাস চলছে কিনা তাও বোঝা যায় না। আগুনের আলো পড়েছে মুখের ওপর। একটি পরম নিশ্চিন্ততার ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে মুখে। দেখতে দেখতে কেমন ধাঁধাঁ লেগে গেল। কে এ ! ঐ মুখ তো তাঁর বেশ চেনা মনে হচ্ছে। কে ইনি? কোথায় দেখেছেন একে? আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন। আর ভুল হচ্ছে না! চিনেছেন দণ্ডী মহারাজকে। কিন্তু কোথায় গেলেন তিনি? ছুটলেন দূরের পাহাড়ী বস্তিতে। তাঁকে দেখতে পেলেন। একটি কলেরা রোগীর ময়লা পরিষ্কার করছেন দু'হাতে। তিনিও তাঁকে দেখতে পেলেন। খুশির ঝলক ফুটে উঠল তাঁর দুই চোখে। প্রথমে হাত জোড় করলেন। তারপর হাত নেড়ে ইশারা করলেন চলে যেতে। তারপর নিজেই চলে গেলেন সেখান থেকে আর এক ঘরে আর এক রোগীর পাশে। তিনিও ঘুরতে লাগলেন মুখ বুঁজে তাঁর সঙ্গে। মায়ের মত সেবা করছেন রোগীদের। নিজের হাতে সব পরিষ্কার করছেন গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আর করবেনই বা কি? ওষুধও নেই পথ্যও নেই।

> "দণ্ডীস্বামী আবার হাত জোড় করে ইশারা করলেন ফিরে যেতে। মাথা নত করে

প্রণাম করে ফিরেই এলাম আমার যে তীর্থ করা শেষ হয়নি তখনও।"[২১]

---সমালোচকের কাজ কমিয়ে দিয়েছে অবধূতের প্রসাদ গুণ-ঘটনা বর্ণনার স্বচ্ছতা। আলাদা করে গল্পের সারাংশ লিখতে হয়না। এ গল্প স্বভাবতই মেদ বর্জিত। এরপর একটি অনুচ্ছেদেই গল্প সমাপ্ত হয়েছে।

> "তারপর যথাসময়ে কাশী তে ফিরে এসেছি উত্তরাখণ্ডের চারধাম দর্শন করে। গরাণহাটার বাড়িউলির অনেক চিঠি এসে জমে আছে।একখানারও উত্তর দিইনি। অবশ্য লিখতে পারতাম,উত্তর কাশীতে এক দণ্ডীস্বামীকে দেখেছিলাম। যাঁকে দেখতে হুবহু বহুব্রীহির মত। এবং তিনিও আমায় চিনেছিলেন। কিন্তু কি লাভ হবে সে কথা জানিয়ে গরাণহাটায়। উত্তরকাশীতে তো তখন শুধু বরফ পড়ছে। যাবে কে সেখানে?"[২২]

---প্রসঙ্গত মনে পড়ে : 'Love comes from God, and those who are loving and kind show that they are children of God,'-St. Jhon সক্রেটিসের জীবন-দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে সিনিকরা (Cynicis) জীবনের যে আদর্শ স্থির করেন সেগুলি হলো মানুষকে হতে হবে বিচারশীল, চিন্তাশীল; এবং কামনা-বাসনাকে, পশুপ্রবৃত্তিকে, বিচারশক্তির দ্বারা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে নৈতিক জীবনের পরাকাষ্টা। সিনিকদের অভিমত হলো মানুষের সন্তোষ বাইরের খাদ্য-পানীয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। অন্তরের ঐশ্বর্যের ওপর। খাদ্য-পানীয় ইত্যাদি দৈহিক সুখভোগের উপর নয়, প্রজ্ঞাই সন্তোষ। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনো সুখের সন্ধান করেন না।" The wiseman would rather be mad than pleased "[২৩] যে মতে ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে জয় করে বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত জীবনকে আদর্শ জীবন হিসেবে গণ্য করে তাকে 'বিচারবাদ' বা 'কৃচ্ছ্রতাবাদ'(Regorism) বলে। বহুর মঙ্গলের জন্য বহুব্রীহির ব্যক্তিমৃত্যু ঘটল মঙ্গল সাধিত হলো সমাজের বহুজনের! " The false,worthless, particular, private, separate self must die, if the true self, the rational personality, is to live."[২৪]

অতিরিক্ত খবর হিসেবে আমরা বারবণিতা পল্লীর জীবন-সম্পর্কে জানতে পারলাম। ভৌগোলিক সীমা ছড়িয়ে পড়ল কোলকাতা থেকে উত্তর কাশী পর্যন্ত। আবার সমাজবিজ্ঞানীর মত কলকাতার গরাণহাটার পেশা ও প্রেম চকিতে বিশ্লেষণ করলেন। এই গরাণহাটার কথা মধুসূদন উল্লেখ করেছেন 'একেই কী বলে সভ্যতা?' নাটকে, প্রসঙ্গত তা মনে পড়তে পারে। বারবণিতা পল্লীর সাথে অবধূতের যে পবিত্র সম্পর্ক ছিল সেকথা আমরা জেনেছি ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রুদ্রচণ্ডী মঠের ভৈরব' নামের গ্রন্থে।

কাকবন্ধ্যা : অসম্পূর্ণতায় আত্মহত্যা

'কাকবন্ধ্যা' গল্পে অবধূত নারী জীবনের পূর্ণতা যে সন্তান-প্রাপ্তিতে তা একটি পারিবারিক কাহিনির আধারে দেখিয়েছেন। লাজুক সুশিক্ষিতা ঊষা ভালোবেসে বিয়ে করেছে প্রশান্তকে। প্রশান্ত বড়লোক

বাবার একমাত্র ছেলে। ছোটবেলায় তার মা মারা গেছেন তার বাবা এ বিয়েতে বাধা দেন নি। ঊষার বাবা অধ্যাপক। তিনি মেয়ের ভালোবাসাকে মেনে নেননি। ঊষা ভালোবাসার মর্যাদা রেখে প্রশান্তর সঙ্গী হয়েছে। প্রশান্ত প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। কোনো অভাব তাদের জীবনে নেই। প্রশান্তর ঊষাময় জীবন। তাদের একটি পুত্রও জন্মালো কিন্তু হায় ! সে ছ'মাস পরেই মারা গেল। হারানো সেই ছেলের জন্য ঊষা পাগল হয়ে গেল। তার কোল খালি! সে একটি সন্তান চায়। অথচ তার শারীরিক কারণেই আর কোনো সন্তান তাদের হবে না। এটা জানতে পারার পরে ঊষা ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দিয়ে মারা গেল। এ গল্পের পারিবারিক সম্পর্ক কোনোভাবেই আমাদের অপরিচিত নয়। কোনো অশ্লীলতা বীভৎসতা---অবধূতের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে আনা হয় যেসব অভিযোগ তার কোনোটাই নেই। ঘটনা বিন্যাসে এবং চরিত্র চিত্রণে অবধূতের দক্ষতা 'কাকবন্ধ্যা' গল্পে প্রশংসনীয়।

এখন আমরা গল্পটি বিশ্লেষণ করে এর চরিত্র-চিত্রণ, রসনির্মিতি এবং গঠনশৈলী বুঝে নেব। প্রথমেই গল্পের নাম কেন এমন হলো তা বুঝে নেওয়া যাক। কাকেরা জীবনে একবারই বাচ্চা দেয়। অর্থাৎ স্ত্রী কাক একবারই ডিম পাড়ে। গল্পের নায়িকা বন্ধ্যা নয়। তার সন্তান হয়েছিল কিন্তু জন্মানোর পর ৬ মাস বয়সে সে মারা যায়। এরপরে আর কোনো সন্তান তার হয়নি ---তাই সে বন্ধ্যা নয়, কাকবন্ধ্যা। তার প্রেমিক এবং স্বামী 'কাকবন্ধ্যা' গল্পের নায়ক প্রশান্ত চৌধুরীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন :

> "রাজীবলোচন চৌধুরীর একমাত্র ছেলে সে। আড়াই বছর বয়সে তার মা মারা যান। বড় দু:খে মাতৃহীন শিশুটিকে মানুষ করেছিলেন চৌধুরী মশায়। সিলেটে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় পড়তে এল প্রশান্ত। রাজীবলোচন পড়ে রইলেন দেশে। বুক দিয়ে সব রক্ষা করতে লাগলেন ছেলের জন্যে।" [২৫]

ধনীলোকের লেখাপড়া জানা ছেলে প্রশান্ত আর অধ্যাপক বাবার সুশিক্ষিতা মেয়ে ঊষা নিজের মতে বিয়ে করেছে। মেয়ের বাড়ি থেকে মেনে নেয় নি। ছেলের বাড়ি থেকে মেনে নিলেও তা ছিল আন্তরিকতা-শূন্য। পরবর্তীকালে বাবা মারা যাওয়ার পরে বুঝেছে আত্মীয় স্বজনেরা চান না তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করুক। অবশেষে সব বিক্রি করে প্রশান্ত তার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায় বাইরে। সেখানে সব করেছে তারা কিন্তু যে সন্তান মারা গেছে ছয় মাস বয়সে সেই সন্তান-কামনাই একমাত্র চাওয়া হয়ে রইল প্রশান্তের স্ত্রীর জীবনে।

> "খোকা খোকা খোকা-একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে ঊষা ছেলে ছেলে করে আজকাল। কাল রাত্রেই একচোট কান্নাকাটি মান অভিমান হয়ে গেছে। কেন আর একটা ছেলে হচ্ছে না ? বছর দু' বছর অন্তর ছেলে হয় সকলের, কিন্তু তাদের হয় না কেন আর একটি ছেলে?" [২৬]

মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে গুণবতীর প্রসঙ্গ :

> "বসে আছি
> তপ্ত বক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ

লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব---এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে। হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি!''

যখন সে জানতে পারলো তার পক্ষে আর মা হওয়া কোনদিনই সম্ভব নয়, তখন সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রশান্তকে ভুল বুঝে তার ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে অভিমানে ট্রেনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল। অথচ প্রশান্ত ঊষা-অন্ত প্রাণ- বিত্তবান হওয়ার পরেও সে ঊষা-কেন্দ্রিক। লেখক জানিয়েছেন :

> ''নেশা, তার জীবনের একমাত্র নেশা হচ্ছে ঊষা। স্বপ্নের জাল বোনে সে ঊষাকে ঘিরে। সমুদ্রের তীরে পাহাড়ের চূড়ায় একখানি ছোট সাদা রঙের বাড়ি। নাম ঊষসী। সেদিন প্রশান্তর জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝা কিছু থাকবে না। কূল পেয়েছে সে তখন। ঊষাকে আঁকড়ে ধরে কূলে উঠতে পেরেছে শেষপর্যন্ত।সেই পাহাড়ের চূড়ায় ঊষাকে পাশে নিয়ে বসে নিশ্চিন্ত হয়ে দেখবে পায়ের তলায় সমুদ্রের নিষ্ফল আস্ফালন। ক্ষুব্ধ আক্রোশে বার বার আছড়ে পড়ছে সমুদ্র। মাথা খুঁড়ে মরছে প্রশান্তর নাগাল পাওয়ার জন্যে। প্রশান্ত সেদিন সবাইয়ের ধরা ছোঁয়ার বাইরে পৌঁছে গেছে। সেই কথাই অনেকবার বুঝিয়েছে ঊষাকে।''[২৭]

অপূর্ণ মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ঊষাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য করল। সুন্দর একটি স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় গল্পের শেষটি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। দুজনের সংগ্রাম, প্রতিষ্ঠা-বিশ্বাস -নির্ভরতার এই আকস্মিক পরিণতি ব্যথায় ভরিয়ে দেয় গল্পের শেষ। তাই অনি:শেষ যন্ত্রণায় শেষ হয়, নিরাসক্ত অবধূতের কলম একথা অবশ্যস্বীকার্য।

ইজ্জত : মধ্যবিত্তের আত্মসম্ভ্রম

নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের গল্প ইজ্জত। মধ্যবিত্তের অর্থসঙ্কট আর ভাড়াটে জীবনের অসহায়তার প্রেক্ষাপটে এ গল্পের কাহিনি নির্মিত হয়েছে। মধ্যবিত্তের কথাই বা বলি কী করে ? এ গল্প নিম্ন-আয়ের মধ্যবিত্ত সংস্কার লালনের প্রেক্ষিতে যন্ত্রণা আর ব্যর্থতাকেই তুলে ধরেছে। স্বল্প পয়সায় অনেক লোকের সাথে ভাড়াবাড়িতে বাস করে---নানা অশান্তির মধ্যে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল একটি পরিবার। কিন্তু পরে এই পরিবেশেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গেলো। এখানকার পরিবেশ এতটাই খারাপ লাগত যে কাহিনির মায়ের ভূমিকায় যে মহিলা তিনি ক্ষেপে উঠেছিলেন

এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে। তা সম্ভব হয়নি---টাকার জন্য। পরে মেয়ে পুরিয়া দেবীকে আশ্রয় করে পাড়ার লোকের কাছে ভালোবাসা আর সহযোগিতা পেতে শুরু করে। পরে আসল কারণটি যখন জানা যায় তখন সব হারিয়ে বসে আছে। মেয়েটি গোপনে লোভের শিকার। মেয়ের অকাল অবাঞ্ছিত গর্ভের লজ্জা থেকে বাঁচার আর উপায় নেই। তার উপর যৌনতার অসংযমের চিহ্ন ফুটে উঠেছে সর্বাঙ্গে! ইজ্জত বাঁচানোর আর রাস্তা রইলো না। এখন আমরা গল্পের বিষয় ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করে এর শিল্পিত সার্থকতার স্বরূপ বুঝে নেব।

মা এবং বাবা চরিত্রের কোন নাম নেই---এ গল্পে। আছে তাদের সমস্যা। সে সমস্যা আবার বাবার থেকে শুরু হয়নি। বাবা যেন নিরুপায় একটা মানুষ মুখ গুঁজে যাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে যেতে হবে। আর তাই করতেই তিনি হিমসিম খাবেন তার প্রতিবাদ কিম্বা অভিযোগ জানাবার জায়গা নেই। সচরাচর যা হয় সেই সম্ভাব্যতা মেনেই শুরু এ গল্পের :

> "আর কি কোথাও বাড়ি জোটে না এই কোলকাতা শহরে। ঝাড়ু মারি এই বাড়ির কপালে। এখানে থাকলে আর ইজ্জত থাকবে না বলে দিচ্ছি।"[২৮]

---গল্পের পরিণতি দেখে মনে হয় মায়ের মুখে ভবিতব্যকে বসিয়ে দিলেন অবধূত।

মায়ের খুব বেশি দাবি নেই। মেয়ে বড় হচ্ছে তার জন্য একটি আলাদা স্নানের জায়গা দরকার। এ বাড়িতে অনেক লোকের একটি কলতলা আর সেখানে স্নান করতে যাওয়া মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয় বলে মা নিচের থেকে জল তুলে মেয়েকে তিন তলায় স্নান করাবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তবু এ বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। মা নিজেই একজন নারী তাকেও ভোগ করতে হচ্ছে দৃষ্টির নানা অত্যাচার। মা তাই বলতে বাধ্য হন :

> "আমি ছেলেপুলের মা। ভোর না হতেই মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে চলে আসি।তা তখনও কি রেহাই আছে। একতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত চারদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁতে বুরুশ ঘষছেন সব ভদ্রলোকেরা। চ্যাংড়া থেকে ঘাটের মরা বুড়োটা পর্যন্ত হ্যাংলা নচ্ছারের বেহদ্দ এই বাড়িতে। এখন মেয়ে বড় হয়েছে। বাড়িতে রয়েছে ওর সমবয়সী আরও বিশটা মেয়ে। সারাদিন বেলেল্লাপনা চলেছে। আমার মেয়েকে আমি ওরকম হতে দোব না। কিন্তু করবই বা কি এ বাড়িতে। কতক্ষণ চোখে চোখে রাখব। নিজে বালতি করে জল তুলে দি পাঁচতলায় রান্না ঘরের সামনে। খুকি সেখানে স্নান করে।তাই নিয়ে কত হাসি ঠাট্টা গা টেপাটেপি। হাড় বেহায়া না হলে এ বাড়িতে টিঁকতে পারা যাবে না। ঘর দেখ যেখানে পাও।"[২৯]

গৃহকর্ত্রীর চোখেফ পড়ে। বাবার এসব চোখে পড়েনা তা নয়। তার সামনেই প্রতিবেশী হারানদার মেজ ছেলে কি গেয়ে ওঠেনি এই ছড়াটি? অসহায় সে কীভাবে এর প্রতিবাদ করবে? সে সব জেনেও নিরুপায়। তার সামনেই ঘটেছিল এঘটনা। গেয়েছিল এই বিদূপাত্মক গান।

> "বাঁকা ভুরু মাঝে

আঁকা টিপখানি
আঁখি হিল্লোলে আহা মরি মরি।''[৩০]

আপন মনে তাই স্ত্রীর দাবি মেনে নিয়ে মনে মনে হাসতে হয় এ হাসি অসহায় মানুষের আপন দুর্ভগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদহীন নীরব আত্মধিক্কার :

''পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়ায় নিজস্ব বাথরুম পর্যন্ত চাই। আর একটা কামধেনু চাইলেই বা কে বাধা দিচ্ছে।পঁয়ত্রিশ টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে যে কটি টাকা আর হাতে থাকে তাতে নিজেদের দুখানা জামা কাপড় ধোপার বাড়ি পাঠানো যায় না। জামা কাপড় ধোপার বাড়ি পাঠাতে হলে অন্তত আর এক প্রস্থ দরকার। তাও যাদের নেই তাদের আবার ইজ্জত।''[৩১]

সব অসহায়তার একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে সে কেমন করে যেন সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করতে সক্ষম হয়। অনেক সময় তার নাম বলা যায় ভেসে যাওয়া। যে ভাসতে জানে তার কোনোদিন শক্তিহীনতার দুঃখ পেতে হয়না। সকলের সাথে এমন একটা ভাব হয়ে গেছে যে পুরিয়া -নন্তুর মা আর এখান থেকে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারেন না। এ পাড়ায় ছেলে ছোকরাদের মাথা হয়ে বসেছে মল্লার সে আবার নৃত্যকলা পারর্দর্শী। আর জানে তার ক্ষমতার কোন শেষ নেই। সে বা তার দলের চোখে,এমন কি আরো অনেকের চোখে, মেয়ের ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত উজ্জ্বল তা ধরা পড়ে গেছে। সেই বিশ্ববিখ্যাত নাচের দলের মাথা মল্লার স্বয়ং 'মেশোমশাই'বলে সম্বোধন করলো পুরিয়ার বাবাকে। এমন কি রাস্তার ওপর ছেঁড়া কেডস্ স্পর্শ করে হাতটা অতি যত্নে কোঁকড়ানো চুলে মুছে পাশে পাশে অতি বিনীতভাবে হাঁটতে লাগল এবং পুরিয়া দেবীর নাচে যে কতখানি প্রতিভা আছে তার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলো। তখন কন্যার গর্বে তাঁর বুকটা একটু ফুলে উঠল বৈকি। একইভাবে পথে দেখা হলে বন্ধু বাঁড়ুজ্জেও তার মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন :

''হ্যাঁ মেয়ে বটে আপনার -খাসা মেয়ে। যেমন গলা তেমনি নাচ। শনিবার নটীর বিয়েতে' নটীর পার্ট করে একেবারে মজিয়ে ফেললে সকলকে। আমি আজ বলে রাখছি আপনাকে দেখবেন ওই মেয়ের জন্যে একদিন আপনার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরবে।''[৩২]

এরপর বাবা চরিত্রের সন্তানের প্রশংসা শ্রবণে গদগদ মনোভাব অবশ্যই সব পিতৃহৃদয়কেই যেন প্রকাশ করে দেয়।

গল্পটির মধ্যে আরো একটি চরিত্র আছে যে ব্যতিক্রমী কিন্তু তাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে পারেনি কেউই। সে আর কেউ নয় সে ওই পরিবারেরই ছেলে যে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না তার দিদিকে আর দলের পাণ্ডাকে। বাবার তাতে মনে হযেছিল বোধহয় এ সবের মূলে কাজ করছে ঈর্ষা। দিদিকে,অর্থাৎ পুরিয়া দেবীকে সবাই ভালোবাসে সিনেমা দেখায়, ভালো ভালো পোশাক দেয় মাখবার উপকরণ দেয় তাই হিংসা করে ভাই। এক কথায় ব্যর্থতার আক্রোশে ফেটে পড়ছে বলে নন্তু সম্পর্কে সস্মিত হাস্যে উদাসীন দূরত্ব ও একপ্রকার অবজ্ঞার ভাব পোষণ

করে তার বাবা।

> "তার দিদিকে সকলে ভালোবাসে, জিনিসপত্র দেয়, দিদি কত ফাংশানে যায়, কত লোকের সঙ্গে সিনেমা থিয়েটার দেখে এই হিংসায় সে জ্বলে পুড়ে মরছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম তাও নয়। অন্য কিছু ব্যাপার আছে। মহা বিপদে পড়ে গেলাম ছেলেকে নিয়ে।ওর জন্যে এবার পাড়া ছাড়তে হয় বুঝি।"[৩৩]

মা প্রথমে যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিলেন পরে তাঁকে আর দেখা গেল না। অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে গল্পের শেষ কাহিনি শোনালেন লেখক। এই অংশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নন্তু। সে তার পরিবারের জন্য কতখানি ভাবত তার প্রমাণ লেখক খুব ছোট অবসরে দিয়েছেন প্রথম দিকেই।

এর পর যেন তার দিদির অভ্যুত্থানে সে ঈর্ষান্বিত -এমনই মনে হয়েছিল।তার বাবা এজন্য নন্তুকে তার মামার বাড়ি কৃষ্ণনগরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। -গল্পটি এভাবেই চলতে চলতে হঠাৎ মোড় ফেরে। সবচেয়ে যে দুর্বল আর অসহায় এক চরিত্র হিসেবে গল্পে স্থান করে নিয়ে কোনরকমে টিঁকে ছিল,পাঠকের সেই অবজ্ঞাত নন্তুই নিয়ে নিল সবটুকু আলো। মানব মনের অপার রহস্য মানুষ কী জানে? বাবাও ছেলেকে বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে তার পরিবারের সম্মান বজায় রাখার জন্য যেভাবে নিত্য একক প্রতিবাদ,প্রচেষ্টা ও সাহস দেখিয়েছে তা নিশ্চয় প্রশংসনীয়।নাটকীয় ভঙ্গিতে বাবার মাধ্যমে লেখক ঘটনার বিবৃতি দিয়েছেন।

> "নন্তুর জন্যে আমার ইজ্জত অনেক বেড়ে গেল। মাইনে বেড়ে গেল ত্রিশ টাকা। নন্তু টাকা পেলে,মেডেল পেলে, সার্টিফিকেট পেলে।" [৩৪]

ঘটনাটি তাক লাগাবার মত। বাগান বাড়িতে যেখানে মল্লার আর তার সঙ্গীরা বিকৃত কামনার চরিতার্থতা ঘটাত সেটা আগেই জেনে সকলের অজ্ঞাতে সে বাগানবাড়ির খাটের নিচে ঢুকে বসেছিলো। সেদিন ওদের লোভের শিকার ছিল অনিমেশ বাবুর মেয়ে। গোটা দলকে ধরে ফেললো পুলিশ নন্তুর সাহায্যে।

নন্তুর এই অভাবনীয় প্রাপ্তির পর এ পরিবারে সুখ আসতেই পারত। কিন্তু বাস্তব দর্শী অবধূতের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। বাস্তব চাওয়াকে ধরি ধরি করেও ধরতে পারা যায়না- আশা ছলনাময়ী। এই পরিবার তাই সুখকে কিছুতেই ধরতে পারলো না। গল্পের শেষটি এপ্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে নন্তুর হাত ধরে পরিবার যখন হাসতে চেষ্টা করছে তখন চাবুকের বাড়ি পড়ল পিঠে :

> "...কিন্তু আমার মেয়ের গা ময় বিশ্রী ঘা দেখা দিলে। তখন আর মুখ দেখাবার উপায় রইল না কোথাও। আরও তিন মাস পরে ধরা পড়ল আমার মেয়ে ছ'মাস গর্ভবতী। তারপর-আমরা পাড়া ছাড়লাম। আর আমার নন্তু সেই যে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গেছে আজও তার পাত্তা নেই।"[৩৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সাধারণভাবে অবধূতের বিরুদ্ধে অশ্লীলতা এবং বীভৎস রসের বাড়াবাড়ির যে অভিযোগ আনা হয় এ গল্পে তা কোনোভাবে সত্য নয়। গল্পের পরিণতিতে cW‡Ki ü`q fvivµvš—nq| A_©‡bÖwi g‡a¨ wb‡Ri eq¯'v ‡g‡qi fwel¨r wb‡q নন্তুর বাবা

মায়ের যে কষ্ট তা অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। প্রসঙ্গত অবধূতের দক্ষতা নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয়।

রূপকথার মত : গল্প হলেও যেন সত্যি

বহুব্রীহির তিন নম্বর গল্প 'রূপকথার মত'। রূপকথার নায়ক এখানে মণিকান্ত আর নায়িকা অরুণা ---সে সিলেটের কায়স্থ। রূপকথার গল্পে যেমন রাজকন্যার সাথে সুখকর মিলন ঘটিয়ে শেষ করা হয় এখানে পরিণতি তেমনি। এ গল্পে রাজপুত্রটির নাম মণিকান্ত ছোটবেলা থেকে যে নিজের মামার বাড়িতে দিদিমার আদরে মানুষ হয়েছে কোনদিন কোন অযত্নকৃত যন্ত্রণা সে পায়নি, কোন পরিশ্রমের কাজ করার কোন প্রয়োজন হয়নি। পড়াশোনায় চিরকাল সে যেমন ভালো তেমনি কাজও পেয়েছে মোটা টাকার মাইনের। 'ইনসিওরেন্স কোম্পানীর বড় অফিসার সে। তার জীবনে প্রেমের আকস্মিক আগমন ও তাকে জীবনে পাওয়ার মাধ্যমে এ গল্প সমাপ্ত হয়েছে। একটি বাসের মধ্যে প্রচণ্ড ভিড়ে উভয়ের আলাপ। প্রথমে অরুণা আর পাঁচটি গায়ে পড়া ছেলের মত ভেবেছিল মণিকান্তকে। পরে নিজের ভুল বুঝতে পারে। এ গল্পের কাহিনি নির্ভার। একমুখিন এর গতি। রূপকথা যেমন সব পাওয়ার গল্প শোনায় এখানে তেমনি সব পেয়েছেন মণিকান্ত চৌধুরী। এখন আমরা এ গল্পের কাহিনি বিশ্লেষণ করে চরিত্রগুলির সার্থকতা বিচার করবো।

> "তিন বছর পাঁচ মাস চাকরি করছে নাতি। একচল্লিশটা বাণ্ডিল সাজানো আছে সিন্দুকে। এক পয়সা নড়চড় হয়নি। হবেও না কস্মিনকালে। নাত বৌ এলে গুণে নিতে বলবেন বুড়ী।"[৩৬]

নাতির আর খরচ কি। আগে যা ছিল এখন তাও নেই। কলেজের মাইনে, পরীক্ষার ফি লাগে না আর দিদিমার খায় দিদিমার পরে। ছ-বছর বয়স থেকে তাই করছে, করবেও চিরকাল তাই।

মেজমামা পরেশবাবু রাগারাগি করেন তাঁর ইচ্ছা হলো মণি হয় তাঁর গাড়িতে যাওয়া আসা করুক, নয় তো কিনে ফেলুক এক খানা গাড়ি। ঐ ভাবে বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া আসা যেন সে না করে। মণি শোনেনি। এই ভীড়ের বাসেই একটি মেয়ের পা মাড়িয়ে দিল মণিকান্ত চৌধুরী। হঠাৎ তার চোখ পড়ল মেয়েটির দু'টি চোখের ওপর। তার পৌনে এক হাত দূরে বিরক্তিতে ভীষণ হয়ে উঠেছে সেই চোখ দু'টির দৃষ্টি, যন্ত্রণায় লাল হয়ে উঠেছে মুখখানি। নিমেষের মধ্যে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভিড় ঠেলে পেছন দিকে ঝুঁকে পড়ল মণিকান্ত, কোনও রকমে পা দু'খানা সরাল একটু। সামনের মুখখানির দম আটকানো ভাবটা কাটল। মেয়েটি নি:শ্বাস নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলে : 'অসভ্য কোথাকার।'[৩৭]

এরপর যেন অবধূত পাঠককে একটি নাটক দেখালেন। চোখের সামনে যেন অভিনীত হলো সে নাট্যদৃশ্য। অপরিচিত এবং ভদ্র নিরীহ গোছের এই মেয়েটির গাল শুনে লাল হয়ে উঠল মণিকান্ত র দুই কান। প্রচণ্ড গ্লানিতে ভরে গেল মন; কোনও রকমে বললে :

"মাফ করুন দয়া করে, পেছনের চাপে---কোঁ ওঁ ওঁ -ক্যাঁচ। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থামল বাস। দু'হাতে মাথার ওপরের রড ধরেই ছিল মণিকান্ত, প্রাণপণে সামলালে ঝাঁকুনিটা। সামনের মুখ মাথা এসে সজোরে ধাক্কা খেলে তার বুকের সঙ্গে। বৌবাজারের মোড় ঘুরে লালবাজারের দিকে ছুটল গাড়ি। আবার মিলল চোখের সঙ্গে চোখ। এবার †m †PvL‡i †Phvi v Ab¨ i Kg| ÔAvcbvi gvc Ki‡eb `qv K‡i|Õ[৩৮]

---বোঝাই যাচ্ছে চলতি বাসের মধ্যে প্রচণ্ড ভিড়ের বর্ণনা করছেন আর দু'জন যাত্রীর মুখে কথা চলছে---এ দুটিকে গল্পের পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন অবধূত। সংক্ষিপ্ত আর দর্শনযোগ্য এ কাহিনি বিশেষভাবে সিনেমাটিক। এই বাসেই দেখা গেলো---উভয়ের প্রতিক্রিয়া আর অবধূতের বাক্য-বিন্যাসের মুন্সীয়ানা :

"এবার আর একটি ধাক্কা খেলে মণিকান্ত বুকে। ওপরে নয় ভেতরে।'-'ধাক্কা' শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'ওপরে নয় ভেতরে।"[৩৯]

---এই বাক্যে যা বলবার সব বলে ফেললেন অবধূত। -নারী কিম্বা পুরুষ উল্লেখের প্রয়োজন হলো না। এর পর বাস থেকে নেমে সিনেমার মত ঘটে গেল পাশাপাশি পথচলা। কথা হলো পথ-চলতি তার মধ্যে একটি কথা ছুঁয়ে গেল মণিকান্তের মন :

"মেয়েটি বললে,'পেটের দায়ে সবই করতে হতে পারে। রোজ এত মেয়ে বাসে, ট্রামে ঠেলাঠেলি করে যাবে আসবে, কিছুদিন আগে কি কেউ ধারণা করতে পেরেছিল ?"[৪০]

---বেদনাহত অভিমানের সুর বাজল। মণিকান্ত দেখলে যে মেয়েটি একটু ছিপছিপে গড়নের ---সাদাসিধে মানুষটি। বেশ একটু লম্বা ধাঁচের মুখ। মাথার অপর্যাপ্ত রুক্ষ চুল আগোছাল করে জড়ানো। চুলের মস্ত বোঝাটা রয়েছে ঘাড়ের ওপর। ভালো করে নজর না করলে দেখতে পাওয়া যায় না এত সরু একগাছি সোনার হার আছে মেয়েটির গলায়। এধারে গলা পর্যন্ত ওধারে হাতের কনুই পর্যন্ত ঢাকা পুরু কাপড়ের সাদা জামা। কাপড় জামা খুবই পরিষ্কার। পরনে এক ইঞ্চি চওড়া পাড়ের সাদা কাপড়। কাঁধে ঝুলছে একটা সাধারণ চামড়ার ব্যাগ। লম্বা রোগা হাতে একগাছি করে সরু সোনার চুড়ি তার মুখে কোনও কিছু মাজা ঘষার চিহ্ন দেখা যায় না। বয়স আন্দাজ কুড়ি একুশের ওপর হবে না। মেয়েটি নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে হাঁটছে মাথা নিচু করে। 'হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে মণিকান্ত, কোন অফিস আপনার?'

মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে জবাব দিলে মেয়েটি -'ইরাবতী ব্যাঙ্ক'।[৪১]

এরপর কাহিনির অগ্রগতিতে মণিকান্ত অফিসের কাজে গেল দিল্লী। মামাতো বোন শান্তি সুধা আর তার স্বামী এমন কাণ্ড করে বসেছে যে, এক সঙ্গে তেরটি ভদ্রমহিলা তাকে জামাই করার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিলেন। মণিকান্ত তাই সাত দিনের মধ্যেই ফিরে এল।---এই ফিরে আসাতেই বোঝা গেল তার জন্য ঘটকালি নিস্প্রয়োজন---অন্য কোথাও মন আটকে আছে।---এখানেও স্বল্পবাক্ অবধূত, স্পষ্ট করে বলবার প্রয়োজন মনে করেননি।

এদিকে বড়মামা কিনে দিলেন গাড়ী। সে গাড়ি ছেড়ে বৃষ্টিতে নেমে গেল সেই মেয়েটির ব্যাঙ্ক বজায় আছে কি-না তার খবর নিতে অযাচিত উপকার করতে গিয়ে অপমানিত মণিকান্ত

পড়ল জ্বরে। এদিকে ড্রাইভারের কাছে সব জানতে পারলেন বড়মামা খোঁজ নিলেন মেয়েটির।

এর পনের দিন পরে ইরাবতী ব্যাঙ্ক উঠে যাওয়ার খবর এল। মণিকান্ত ওরফে চৌধুরী সাহেবের ইচ্ছাতেই মেয়েটি চাকরী পেল ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে। এই চৌধুরী সাহেব যে মণিকান্ত তা অরুণা দাশগুপ্তা জানেন না। মণিকান্তের সম্পর্কে অফিসের সবাই বলাবলি করে; তার উদার হৃদয়ের কথা :

> ‘‘বিপদে পড়ে যদি কেউ গিয়ে সাহস করে দাঁড়াতে পারে সামনে তাহলেই হোল। নিজের কাজ ফেলে রেখে তৎক্ষণাৎ ছোটাছুটি করতে থাকবেন তার সঙ্গে। জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত ওঁর কথায় ওঠেন বসেন। কিন্তু সহজে কেউ ঘেঁষতে পারে না কাছে। জেনারেল ম্যানেজার জানতে পারলে আর রক্ষে নেই তার। Kov ûKg ‡KD ‡hb bv wei³ K‡i ‡P&šajyx mv‡ne‡K| ÔÕ[৪২]

আরো আনেক কথাই হোল, ইরাবতী ব্যাঙ্কের অরুণা দাশগুপ্তা একপাশে দাঁড়িয়ে সব শুনলে। নতুন চাকরি হয়েছে তার এই অফিসে। আজ সে ভাল করে জানতে পালে, কি করে তার চাকরি হোল এখানে। আজ -কালকার দিনে সেধে ডেকে চাকরি দেওয়ার রহস্যটি পরিষ্কার হয়ে গেল।

এরপর একদিন অরুণার ডাক হোল :‘আপনার কি প্রাণের মায়াও নেই! এখনও রোজ আসছেন যে অফিসে।’ -ট্রাম ভাড়া এক পয়সা বাড়ায় উত্তাল কলকাতার কথা এল। চৌধুরীবাবুকে চেনা গেল। সেদিন রাতে মঙ্গল সিং বড়বাবুর ঘরে জানিয়ে এল যে মেয়েটিকে কার্তিক বসু লেনের এত নম্বর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এসেছে বেলা তিনটের সময় মণিবাবুর হুকুমে। গাড়িতে বসে মেয়েটি কাঁদছিল। বড় মামার নির্দেশ মত ঘটক যদু আচার্য সব খবর নিয়ে এল। সুরেশবাবু দেখলেন নিকুঞ্জ ডাক্তারের মেয়ের অফিস আর ভাগ্নের অফিসের নাম এক।

> ‘‘সুরেশবাবু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। এ সম্বন্ধ হতে পারে। সিলেটের ওধারে কায়স্থ বৈদ্যে সম্বন্ধ হয়। কিন্তু মেয়ে চাকরি ছাড়লে ডাক্তারের চলবে কেমন করে? মেজ ভাই পরেশের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।’’[৪৩]

পরেশ বাবু বললেন,‘আগে মেয়ে দেখ তোমরা। শিলচরে আনেক গুলো চা বাগান আছে দত্তদের। বিভূতি দত্তকে বলে সেই চা বাগানের ডাক্তার করে দেওয়া যাবে মেয়ের বাপকে।’

সত্যিই রূপকথার মত এ গল্পে অরুণা- মণিকান্ত ওরফে চৌধুরী সাহেবের বিয়ে হলো। শুভ সমাপ্তিতে পৌঁছাতে যে পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন তা সিনেমার মতই পাঠক যেন দেখতে পেল। বিশেষ করে সংঘাত ও অনুশোচনায় মণি-অরুণার প্রেম সিনেমার মতই দর্শনযোগ্য। অবধূতের গল্পের এই জমাটি দৃশ্যরূপ তাঁর শিল্পী মনের আনন্দকে ব্যক্ত করে। কোথাও এতটুকু কষ্ট নেই এই প্রসাদগুণ পাঠকের বাড়তি পাওনা।

বিভ্রম : অবিশ্বাসীর আত্মদান

কামিনী আর কাঞ্চন সর্বদাই অনিষ্টের মূল। যত বড় ব্যাপার ততবেশি জটিলতা। এ গল্পে জমিদারী

আবহে কর্মচারীর প্রতি অবিশ্বাস আর শত্রুতার বিপজ্জনক পরিবেশ রূপ পেয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক স্বভাব,আনুগত্য, জুলুম বেইমানী, প্রতিশোধ সন্দেহ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে লেখা গল্প বিভ্রম। এই বিভ্রমের মূলে আছে মানুষের প্রতি অবিশ্বাসের মনোভাব। এ গল্পে ধারণা আর বাস্তবে কতটা তফাৎ হতে পারে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন লেখক। ট্যারা চোখের শয়তানি, অশিক্ষিত-অপটুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা কাজ করে তা অনেক সময় পরবর্তীকালের মনোরম অভিজ্ঞতায় আগেরটিকে মিথ্যা প্রমাণ করে। হরি বক্সীকে তিনি সন্দেহ করতেন কিন্তু হরিবক্সী তাঁকে বাঁচাতেই নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দিল---এটা একটা বিভ্রম বটে! গল্পের শেষে পৌঁছে লেখক একথা জানিয়েছেন।

> “গড়গড়ার নলে একটা ছোট্ট টান দিয়ে তিনি তাকিয়া কোলে নিয়ে ঠায় এক ভাবে চেয়ে বসে রইলেন। চেয়ে রইলেন সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো তাঁর প্রপিতামহ রায় দেওয়ান ত্রিনয়ণ চাটুজ্যে বাহাদুরের অয়েল পেন্টিংখানার দিকে। রায় বাহাদুর একটা চেয়ারের পেছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একখানা জাঁদরেল বই ধরা। মোটা সোনার চেন ঝুলছে তাঁর বুকে। চাপকান শামলা মোটা গোঁফে চমৎকার মানিয়েছে তাঁকে। শোনা যায় তাঁর নামে এ তল্লাটে বাঘে গরুতে এক সঙ্গে জল খেতো।”[৪৪]

পূর্বপুরুষের এই তেজের পাশে তিনি নিষ্প্রভ---এটাই ভাবছিলেন। কেননা ত্রিনয়ন চাটুজ্যের প্রপৌত্র সঞ্জীবন চ্যাটুজ্যে মশাইকে হিমসিম খেতে হচ্ছে অতি সাধারণ কয়েকটি মানুষের কাছে। তার দেওয়ান হরি বক্সীকে তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। মনে হয় যেন হরি বক্সী দেড় চোখে দেখে। কোন দিকে সে চেয়ে রয়েছে তা বোঝা যায় না :

> “ডাইনে যারা তারা মনে করবে বক্সী মশায় বাঁ পাশের ওদের দিকে চেয়ে আছেন। বাঁ দিকের যারা তার ঠিক উল্টোটি ভাববে। বক্সী কিন্তু কোন দিকেই চায় না।স্রেফ নিজের দিকেই সে চেয়ে থাকে।”[৪৫]

---এখানে শব্দবিন্যাস লক্ষ করার মত চোখের বাস্তব ত্রুটির কথাই আমরা জেনেছিলাম। সে বেশ ট্যারা। কিন্তু এখানে চায় কথাটি দুটি বাক্যে তিন বার ব্যবহৃত। পরের দুই বারের অর্থ চোখে দেখা নয় এর মানে নিজের স্বার্থ ছাড়া সে কিছু বোঝে না। সে যে স্বার্থপর তা বলা যায় নিঃসন্দেহে। ‘বিভ্রম’ গল্পে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে হরি বক্সী এই দেওয়ানগিরি করে সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছে তবে নিজের বেশবাসে কোনো বাবুগিরি তার নেই। এখন এর দৌলতে তার ঘরবাড়ি জমিজমা পুকুর বাগান সবই হয়েছে।

> “বার বছর আগে যখন সে এই দেওয়ান বাড়িতে বাজার সরকার হয়ে বার টাকা মাহিনা আর খোরাকিতে চাকরি নিয়ে ঢোকে তখন জল খাবার একটা ঘটিও ছিল না বক্সীর। কিন্তু এই বার বছরে সে এমন গোছান গুছিয়ে নিয়েছে যে এখন খুশি হলে সে জালায় চুমুক দিয়ে জল খেতে পারে।”[৪৬]

---বার বছর আগে যে ছাতাটি বগলে চেপে এ বাড়িতে ঢোকে বক্সী, সেটি আজও তার

বগলের মধ্যে সদা সর্বদা বিরাজ করছে। সে কাজের লোক বিলাসিতা তার আসে না। লেখক জানিয়েছেন :

> ‘‘জুতো তার সে দিনও ছিল না, আজও নেই। ফতুয়ার উপর এখনও সে কোমরে গামছা বাঁধে। বেশির মধ্যে বেড়েছে, বেশ দর্শনীয় ভাবেই বেড়েছে মাথার উপরের টাকটি। বার বছর আগে যা ছিল চওড়া একখানি কপাল মাত্র, এখন তার সীমানা evo‡Z evo‡Z Nv‡oi Kv‡Q G‡m †cŠ‡Q‡Q|”[৪৭]

গল্প একমুখীন গতিতে এগিয়ে চলেছে পরিণতির অভিমুখে। হরি বক্সী চলেছে লাঠিয়াল ঠিক করতে। জমিদারের হয়ে যারা লড়াই করবে। শ্রীনাথ বাউরী আগে লাঠালাঠি করত এখন সে বাবাজী হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে জিজ্ঞাসা করে: কে যায়? বক্সী উত্তর দিলে, ‘আমি হরিরাম।’

> ‘‘আসুন আসুন উঠে আসুন দাওয়ায় নায়েব মশাই। একটু তামাক সেবা করে যান।’’[৪৮]

এখানে বসে বক্সীর মনে যে কথা গুলি আলোচিত হয়েছে তার ফলে জমেছে পাঠকের কৌতূহল।

> ‘...কিন্তু আজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে রওনা হয়েছে সে উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও সিদ্ধ হবে না। তা সে ভাল করেই জানে। মুসলমানরা শুনবে কেন? কংগ্রেস সরকার ওদের হাতের মুঠোয় পুরেছে। ওরা খুন জখম লাঠালাঠি সব ছেড়েছে কেন ছাড়বে না? মানুষ যতই নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবন যাপনের সুযোগ পাবে ততই তার স্বভাব বদলাবে। ঘরে যদি ভাত থাকে আর জান মান বাঁচাবার দায়িত্ব যদি নেয় দেশের শাসন কর্তারা তবে কার সখ হয় খামকা মাথা নিতে আর মাথা দিতে।’’ [৪৯]

এসব হরি বক্সীর ভালো লাগে না। জমিদারের দেওয়ান হলে লাঠালাঠি ভালো লাগেনা বললে চলবে কেন? তাছাড়া ফস করে ছাড়ি বললেই কি ছাড়া যায় এ দুর্লভ পদ। গাঁয়ে ফিরে গেলে তাকে নায়েব বাবু বলে ডাকবে কে? কে তাকে এত খাতির করে বসিয়ে তামাক খাওয়াবে, চা দেবে? গাঁয়ে তো সে স্রেফ মধু নাপতের ব্যাটা হরে নাপতে। এখানে এসেই না সে বক্সীবাবু পদটিকে বুকের রক্ত দিয়ে লাভ করেছে।-এই আত্মবিশ্লেষণ না থাকলে কেন সে খামোকা জমিদারের জন্য প্রাণ দিতে গেল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতনা। তদুপরি লেখক তার প্রাণপাতের পটভূমি নির্মাণ করেছেন এইভাবে। বক্সীবাবু নিজের কানে জমিদারী লুঠ করার গভীর ষড়যন্ত্রের কথা শুনেছে। শুনেছে নিজের কানেই। গল্পে দেখা গেলো শ্রীনাথ বাউরীর ঘরেই বসেছে মন্ত্রণা সভা। নায়েব মশাই বক্সীবাবু কান পেতে শুনল : [নিচের উদ্ধৃত কথা গুলির জন্য দ্রষ্টব্য :বহুব্রীহি গ্রন্থের ১৫২-১৫৩ পৃ.]

১. ‘শালার নায়েবটাকে এখানেই শেষ করে দিলে হোত।’

২. ‘কি দরকার যাক না শালা আস্তানায়।’

৩. 'টুঁটি মুচড়ে তাকে পুঁতে রাখবে চাচা।'

৪. 'কাকে বকে টের পাবে না।'

৫. 'ও ব্যাটা তো লুকিয়ে চলেছে সেখানে। যদি কখনও না ফেরে তাতেই বা কার কি? ওখানে যে গেছেএকথা বলছে কে ওর হয়ে।'

৬. 'বলবার জন্যে কেউ বেঁচে থাকলে তবে তো।'

৭. 'বাবুর ঘরেরর বন্দুকটা এসে গেছে বাবাজী ?'

৮. 'সন্ধ্যার আগেই এল। বোষ্টমী তেমন মেয়ে নয়। আজ দু-মাস হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটছে ঝি হয়ে! গুলির বাক্সও এসেছে একটা -দেউড়ির বন্দুকটা আমরা গিয়েই হাতে পাব। চৌবে শালারা এতক্ষণে ভেগেছে দেউড়ি ছেড়ে।'

৯. 'কতবড় আস্পদ্দা দেখ শালার ! উনি অন্দর মহলে শুয়ে থাকবেন আর আমরা জান দিতে যাব ওঁর কথায় চৌধুরী বাড়ি। কেন চৌধুরীরা আমাদের সাথে কি দুশমনি করেছে?'

১০. 'সেবার বাঁচালে কে আমাদের ধান চাল দিয়ে। এই শালার দেওয়ান বাড়ি তখন বলেছিল, মুসলমানের একটা মাথা এক একশ টাকায় কিনব, কি মনে আছে চাচা?'
'সবই মনে আছে, আজ তার শোধ।'

১১. 'কেউ আমাদের সন্দেহই করবে না! তাছাড়া কংগ্রেসী বাবুরা আমাদের হয়ে লড়বে।থানার দারোগা তো কংগ্রেসী বাবুদের হাতের মুঠোয়।''

১২. ''দেওয়ান বাড়ির কথায় চৌধুরী বাবুদের গদিতে হাত দিলে রক্ষে থাকত নাকি ? গুষ্টিকে গুষ্টি শেষ করত কংগ্রেসী বাবুরা। ওঁনারাই তো আজকাল কংগ্রেসে টাকা ঢালেন।''

---এখানে অবধূত পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে রাজনৈতিক দল টাকার বশে চলে।

এরপর টান টান উত্তেজনায় জমে উঠেছে কাহিনি। এরপর বক্সী আর দাঁড়ালো না। হামাগুড়ি দিয়ে ফিরল। রাস্তায় পা দেবার উপায় নেই কে জানে পাহারা বসে গেছে কি না।কোনও রকমে বুক পিছলে রাস্তাটা পার হয়ে সেই ভাবেই বউ দীঘিতে গিয়ে নামল। বড় বড় পদ্মপাতা ভাসছে। এখন আর তাকে পায় কে। কিছুক্ষণ পরেই ওপারে গিয়ে উঠল বক্সী। সামনেই দেওয়ান বাড়ির খিড়কি। ভিতর থেকে বন্ধ। কি করে? ঘুরে সামনে যাবার সাহস হোল না। যদি কেউ ওত পেতে বসে থাকে কোথাও।

খিড়কি দরজার ভিতর দিকে গোয়াল। গোয়ালের চালের বাঁশ এধারে অনেকটা নেমে এসেছে দেওয়ালের বাইরে। বক্সী লাফ দিয়ে ধরলে সেই বাঁশ ধরে অদ্ভুত কায়দায় পাঁচিলের উপর উঠে গেল। তারপর ভিতরে নামতে কতক্ষণ। বাড়ির ভিতরে অন্দরের পুকুর। সে পুকুরের ওপাশে অন্দর মহল। চলেছে বক্সী মরিয়া হয়ে চলেছে। যেভাবে হোক তাকে যে পৌঁছতেই হবে দেউড়িতে, সেখানকার দুনলা বন্দুকটা আর টোটা গুলো যে তার হাতে পড়া চাই-ই।

এদিকে আবার খানিকটা ঢেলে গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে কপাল কুঁচকে গেলাসটার দিকে চেয়ে রইলেন সঞ্জীবন চ্যাটুয্যে। তাঁর চিন্তা বক্সী তো এখনও ফিরল না। রাত তো বারটা বাজে। মহা বিভ্রমে পড়ে গেলেন সঞ্জীবন চ্যাটুজ্যে মশাই। এর পর হঠাৎ দেউড়িতে দুম্ দুম্

গুলির আওয়াজ,এদিকে নিজের বন্দুকটাও পাচ্ছেন না। হঠাৎ কিসের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তিনি জ্ঞান হারান। পরদিন দেখেন দেউড়িতে সারি সারি সাতটা লাস শোয়ান হয়েছে। নন্দ চৌধুরীর চটকলের লোক সব। কিন্তু কে মারলে এদের ? কে বাঁচালে দেওয়ান বাড়ির মান সম্মান? কে চালালো গুলি? অবশেষে জানা গেল যে যাকে 'জ্যান্ত কুকুর দিয়ে খাওয়াবেন' বলে ভেবেছিলেন সেই 'নিমকহারাম' বক্সী রেখেছে মান। সঞ্জীবন বাবুকে নিয়ে যাওয়া হোল। আস্তে আস্তে তিনি পাশে বসে পড়লেন 'বক্সী ! হরি বক্সী শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিলে তাঁকে বাঁচাতে!'জীবনের সবচেয়ে বড় বিভ্রমে পড়ে গেলেন তিনি।'[৫১] হরি বক্সী তার নায়েব পদের মান রেখে সঞ্জীবন বাবুকে মহা বিভ্রমে ফেলে গেলেন। হরি বক্সী প্রাণ দিয়েই অমর হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে eB‡e‡j A‡Q "He that seveth his life shall lose it, and he that loseth his life shall find it"[৫২].

ডঙ্কাদা : মস্তানের সম্মাননা

'ডঙ্কাদা' গল্পটিতে অবধূত আজকের দিনের ক্ষমতাশালী মানুষের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি মানুষের বোধহয় দুটো পরিচয় থাকে যা সাধারণভাবে শোনা যায় আর একটা পরিচয় থাকে যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এখানে অবধূত সমষ্টি পরিচয়ের বাইরে ব্যক্তি পরিচয়কে তুলে এনে সমাজকে একটি বার্তা দিতে চেয়েছেন। যুবক ছেলেমেয়েরা সবাই 'ডঙ্কাদা'-র অনুগত। মেঘনাদ ক্লাব, শঙ্কিনী সঙ্ঘ, বৈদেহী সমিতি---ইত্যাদি সামাজিক নানা সংগঠন তাঁর নেতৃত্বে চলে। ভাঙা-চোরা লোহা-লক্কড়ের কারবারী যে বন্‌শী দাস আগরওয়াল,তাকে এবার কর্পোরেশন ইলেকশনে দাঁড় করাবে ভেবেছিল ডঙ্কাদা। ব্যবসায়ী আর সাধারণ মানুষ সকলেই 'ডঙ্কাদা'-র চাঁদা দিয়ে ধন্য হন। এক কথায় সে একজন ক্ষমতাশালী মানুষ।

এ হেন ডঙ্কাদা মারা গেছেন। তার অনুগত ছেলে-মেয়েরা তার অন্তিম শোভাযাত্রায় চলেছে। এই শোভা যাত্রার বইরে তার সম্পর্কে যে কথা অবধূত শোনালেন তাতে এর পাঠক মাত্রই শোভাযাত্রাকে এখন সরলভাবে দেখতেই পারবেন না। এ গল্প পাঠে তাদের মনে হবেই যে বাইরের শোভাযাত্রা দেখে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে লোকটির অন্তিম সংস্কারে যেসব লোকেরা চলেছে শ্মশানে কিম্বা মাটি দিতে তারা তাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই চলেছে। সাজসজ্জা আড়ম্বর দেখেও বোঝা যায় না লোকটির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু -বান্ধবেরা এ হেন আয়োজন করেছেন। ডঙ্কাদার আকস্মিক প্রয়াণ এবং তার শ্মশান যাত্রাকে কেন্দ্র করে লেখক সেই বার্তা দিলেন পাঠককে।

১. শহর বিখ্যাত নাচের স্কুল শঙ্খিনী সঙ্ঘ। ডঙ্কাদা যার শুধু সম্পাদকই নয় এক কথায় সভাপতি থেকে দারোয়ান পর্যন্ত সবই, ..।
২. বনশী দাস আগরওয়ালের বাবা ভাঙ্গা-চোরা পুরনো লোহা লক্কড়ের কারবারী। বিসর্জনের

যাবতীয় খরচা বন্‌শীদাসের। ডঙ্কাদাকে সে গুরুর চেয়ে বেশী ভক্তি করে। ডঙ্কাদা না থাকলে মাসে দু'বার করে ওদের পুলিশে ধরত চোরাই কারবারের জন্যে। ডঙ্কাদা কথা দিয়েছিল যে এবার কর্পোরেশন ইলেক্সনে বন্‌শীকে দাঁড় করানো হবে।

৩. বিজয়া দশমীর ভোর রাতে পাড়ার প্রতি বাড়িতে হানা দেওয়া হোল। এ যে ডঙ্কাদার শেষ কাজ। আর একবার তো আর ডঙ্কাদার মহাপ্রয়াণ হবে না কখনও। এ সময় নেই কথাটি শুনছে কে? আর নেই বলার স্পর্ধাই বা আছে কার?"

৪. বিরাট শোকযাত্রা তৈরী হোল। বেনারসী পরিহিত কপালে চন্দন ডঙ্কাকে শোয়ান হোল ফুল শয্যায়। তারপর আরম্ভ হোল সেই মহাযাত্রা। প্রথমেই শঙ্খিনী সঙ্ঘের সভ্যারা। এলো চুলকালো৷ পাড় শাড়ি পরনে প্রত্যেকের। সর্বগ্রে ষাটজন চললেন ষাটটি শাঁখ বাজাতে বাজাতে। তারপরেই একখানি সাইকেল রিক্সা। সেখানিতে মাইক লাগানো। আরম্ভ হোল 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'।

৫. মেঘনাদ ক্লাবের সভ্যদের অঙ্গে স্রেফ একটি করে লেঙট। তাঁরা চললেন তাঁদের সর্ব দেহের পেশী সঞ্চালন করতে করতে।"এই মেঘনাদ ক্লাব এই পেশী সঞ্চালন এই শ্রী হবার জন্যে বছর বছর লড়াই কার কৃপায় ? ডঙ্কাদাই এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং মেঘনাদ ক্লাবের দাবী সর্বাগ্রে।"[৫৩]

৬. আনুষঙ্গিক গোষ্ঠী ডঙ্কাদার প্রতিষ্ঠিত নাটকের দল। বৈদেহী সমিতি এর আরেক কীর্তি।

৭. এই মহাযাত্রা আরম্ভ হোল ঠিক বেলা এগারোটার সময়। পাঁচ জায়গায় থামতে হোল। পাঁচ জায়গা থেকে ফুলের মালা দেওয়া হোল ডঙ্কাদার নশ্বর দেহের উপর। 'তারপর ঝাড়া আধ ঘন্টা এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে আমরা যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।'[৫৪]

রাত তখন ন'টা চন্দন কাঠের চিতা উঠল জ্বলে। শোক সভার প্রচার হোল কাগজেও। গল্পের শেষে পৌঁছে লেখক জানালেন:'শেষে এসে গেল কালী পূজা। আমরাও তখন আবার লেগে গেলাম সর্বজনীন শ্যামাপূজার আয়োজনে। সেই পূজার রাত্রেই জানতে পারলাম সকলের হৃদয়ের কতখানি জুড়ে অধিষ্ঠান করছিলেন ডঙ্কাদা। কথা হচ্ছিল। মেয়েদের ওধারে ডঙ্কাদাকে নিয়ে। কে বললেন, 'মরেছে না হাড় জুড়িয়েছে সকলের।' কম বয়সী কয়টি গলার খিল খিল শব্দে হাসি উথলে উঠল।'[৫৫]

এ ধারে বসেছেন পাড়ার হব্যি ভব্যি ভদ্রলোকেরা। বামাচরণ ডাক্তার সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি দেবী প্রতিমার দিকে চেয়ে জোড় হাতে ফিস ফিস করে বললেন,'মা তারিণী -একটিকে দয়া করেছ আর কটিকেও নাও মা। সকলে স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলে বাঁচুক।'[৫৬]---গল্পের শেষে একটি নাটকীয় দৃশ্যের উপভোগ্যতায় মন ভরে উঠল পাঠকের।

নেহাত নাচার : পরের লেখা চুরি করে লেখক হওয়া

ভাগ্য অনেক সময় মানুষের ভবিতব্য কী হবে তা স্থির করে দেয়। পরের সম্পত্তিতে বড় লোক হয়েছে---এমন নজির প্রচুর আছে। পরের প্রতিভাকে চুরি করে সম্মান অর্থ---দুই-ই আদায়

করেছে এমন মানুষ বাস্তবে প্রচুর আছে। 'নেহাত নাচার' গল্পে আমরা দেখেছি গ্রামের একজন মানুষের মোট ভর্তি লেখা অন্য একজন নিজের নামে চালিয়ে দিয়ে খুবই নামডাক করে নিয়েছে। পেয়েছে আকাশছোঁয়া প্রতিপত্তি। লেখক এ গল্পে তেমনি এক কাহিনি উপহার দিয়েছেন।

নরহরি হাই প্রকৃত লেখক কিন্তু তাঁর লেখা গুলি বেরিয়েছে বাঁকা চাঁদ রায় ঘোষের নামে। 'নেহাত নাচার' গল্পটি গল্প লেখার গল্প। অন্যের কাহিনি নিজের নামে চালিয়ে লেখক হয়ে ওঠার ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত। এখানে কথক স্বয়ং একটি চরিত্র এবং প্রধান চরিত্র হিসেবে সে সব কথা নিজেই বলেছে। গল্পটির ক্ষেত্র বাঁকুড়া। এসেছে হুগলী আর কলকাতার কথা। ভাগ্নী-জামাই গোবর্ধন ঘোষের কন্যার বিবাহের পাত্রের খোঁজ নিয়ে তিনি হুগলীতে যাচ্ছেন। সেই জন্য ব্যাণ্ডেল লোকালে চেপে তিনি যাচ্ছিলেন তাঁর শ্যালিকার বাড়িতে।

আপাতত গন্তব্য হুগলী। কথক বাঁকাচন্দ্র তাঁর লেখার পোঁটলাটি হাতিয়ে নেমে গেলেন। নিজের নামে ভবিষ্যতে বেরুবে গল্প, উপন্যাস এমন কি সে কাহিনি চলচ্চিত্র হিসেবে বহু মানুষের কাছে পৌঁছাবে। কেউ জানবে না আসল রহস্য। তাই বলে বিবেক কি ঘুমিয়ে থাকবে? এ প্রশ্নের উত্তর অবধূতের অজানা নয়। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মত করে ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাখ্যা দান করে। এইসব করতে গিয়ে চিরন্তন সত্য বলে কিছুই আর থাকে না।

বাঁকাচন্দ্রের হতাশা এখন কেটে গেছে। এখন সব স্বপ্ন তার পুরেছে। এখন সে বিখ্যাত লেখক। মনকে একরকম করে বুঝিয়েছে যে,যা সেদিন করেছিল, যার ফলে আজ তার বাড়ি গাড়ি আর এই প্রচণ্ড সাহিত্যিক বলে নামটি হয়েছে- তা' করেছিল নেহাত নাচার হয়েই। তার মত নেহাত নাচার হলে অনেকেই এ রকম কাণ্ড করে বসতেন।। লেখক বাঁকা চাঁদ ঘোষ এজন্য মর্মে এক যন্ত্রণা বোধ করেন তার আসল স্রষ্টার জন্য, কিন্তু মনকে প্রবোধ দেন যে নিতান্ত বাধ্য না হলে একাজ তিনি করতেন না। এ গল্পটি থেকে আমরা যে বার্তা পাই তা এরকম:

১. আজকাল মানুষ বিবেক নামক বিষয়টিকে নিজের মত করে বুঝিয়ে নেয়।
২. পরের লেখা নিজের নামে চালিয়ে অনেকেই নাম-যশ করেছেন।
৩. গল্প লেখার জন্য যে স্বতন্ত্র প্রতিভা চাই, তা অনেকে জানেন না।
৪. সৃষ্টির গড়ে ওঠার পেছনে সমালোচকেরা যেসব কারণ ব্যাখ্যা করে থাকেন সেগুলির বেশিটাই হাস্যকর।
৫. সাধারণ মানুষ রচনা পড়ে লেখকের বাইরেটা মেলাতে যে চেষ্টা করেন তা হাস্যকর।
৬. লেখক অবধূত তারাশঙ্কর, বনফুল, প্রেমেন্দ্র, প্রবোধ,অচিন্ত্য,গজেন্দ্র মিত্র প্রমুখের লেখাকে সশ্রদ্ধায় পড়তেন। চেনা-জানা ছিল ভালো মতই।
৭. অন্যের নাম ভাঙিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নেন অনেকেই।

গল্পটির সার্থকতা

গল্পের কাহিনি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। এর উপস্থাপন বিষয়ে স্বীকার্য যে বিনা মুখবন্ধে চলতি অভিজ্ঞতার সাথে এ গল্প পরিবেশিত। বন্ধুর সাথে বোনের প্রেমের এবং বোনের বান্ধবীর সাথে প্রণয় গড়ে ওঠার বহুকালীন বাঙালী জীবনের অভিজ্ঞতার পথ ধরে পারিবারিক আবেষ্টনীতে সব চরিত্রকে পাওয়া গেল।এবং কোন সময় পার্শ্বকাহিনির জন্য ব্যয় না করে এগল্প পরিণতিতে তীব্র বেগে পৌঁছে গেছে। বন্ধুটি লেখকদের খুব কাছের হওয়াতে শ্রী বাঁকা ঘোষ রায় এবং তার বোনের বিস্ময় জাগাতে সক্ষম। তার আসা যাওয়া এবং বোনের প্রেমে পড়া কোন ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠেনি। গল্পে প্রকাশিত না হলেও জানা যায় বোনের সাথে ঘনিষ্ঠতা করার পথ হিসেবেই বাঁকাকে লেখক করে তোলার প্রয়াস। সেই সূত্রেই তার নামে অন্যের গল্প চুরি করে প্রকাশ করা প্রেমে পড়লে ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান থাকে না, এ তো সামান্য একজন মানুষ যাকে আবার সামাজিক ভাবে ছোটকরার নানা কারণ তিনি নিজেই ঘটিয়েছেন। বৃদ্ধ একে তো মহাজনী---তেজারতি করেন, তার উপর বৃদ্ধ বয়স এনেছে তৃতীয় স্ত্রী। তিনি বিদুষী। চান স্বামীর লেখা প্রকাশ পাক।এই বৃদ্ধকে নাস্তানাবুদ করা যুক্তি সঙ্গত তো বটেই। এ আবার কথকের প্রেমিকার জন্য পাত্র ঠিক করেছে ‘উঁচু বংশ, ঘরে মা লক্ষ্মী বাঁধা। তবে বয়সটা একটু বেশী হয়ে গেছে। দু’টি উপযুক্ত ছেলে আছে সেই ভদ্রলোকের। তা’ থাকুক, মানে---নাতনীর আমার খাওয়া-পরা আদর-যত্নের Af ve n‡e bv| Õ[৭] -এর পর লেখক বাঁকাচাঁদের মনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে প্রতিহিংসায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল তার মাথার মধ্যে। রাগে ও বেদনায় কানের ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।---এ হেন পরিস্থিতিতে নরহরি হাই প্রতারিত হবেন এটাই স্বাভাবিক -তার প্রতি ন্যায় বিচার।

রেস্টুরেন্টের নাম দেলখোস, পত্রিকার নাম নখদর্পণ,পরের লেখা চুরি করে নাম করেছেন যিনি তাঁর নাম বাঁকা চাঁদ রায় ঘোষ, মিথ্যা প্রকাশনার গল্পে যে প্রকাশনার নাম দেওয়া হয়েছে ‘একশ তিয়াত্তর নম্বর চটকদার কোম্পানী-ইত্যাদি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

গল্পটির বিষয় যেহেতু প্রবঞ্চনা তাই লেখক চেহারা আর প্রতিভার বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। যাঁরা চেহারা দেখে প্রতিভার মূল্যায়ন করেন তাঁরা অধিকাংশ স্থানে ভুল করে বসেন। এক্ষেত্রে সরাসরি দেকে নেবোঃ

১. কবি কালিদাস আর ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করকে তাঁদের চেহারের সাথে মিলিয়ে নিতে পারেন নি লেখক বাঁকাচাঁদ ঘোষ রায়। বন্ধু যথার্থরূপেই চিনিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তাঁদের লেখা পড়ে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল মনের মধ্যে তার সাথে মিল কই?

‘আঙুল তুলে দূর থেকে দেখালেন বন্ধু,‘ঐ দেখ,উনি তারাশঙ্কর আর ওঁর সামনে ঐ যে মোটা মত বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উনি হচ্ছেন কবিশেখর কালিদাস রায়।’ [৫৮]

‘কয়েকমুহূর্ত চেয়ে দেখলাম, তারপর সজোরে প্রতিবাদ করলাম, ধ্যাৎ,-তা’ কখনো হতে পারে না।’

বন্ধু আকাশ থেকে পড়লেন,‘তার মানে!’

‘মানে তুই ভুল করছিস কিংবা আমাদের ইয়ে পেয়ে ঠকাচ্ছিস।’

এই সূত্রে এসেছেন সজনীকান্ত দাস, প্রবোধ সান্যাল,প্রমথনাথ। লেখার সঙ্গে চেহারার মিল পেলেন না এমন নয় ভাবনার সাথে মিলে গেল গজেন্দ্র মিত্রের চেহারা।

এরপর দেখানো হলো স্বভাব ও চেহারায় এমনকি ব্যক্তি জীবনেও খুঁজে পাওয়া গেল না নরহরি হাইকে। ভাবতে কী পারা যায় যে একজন লেখক করেন তেজারতি ব্যবসা? একাধিক বিবাহ? নরহরি এসব কীর্তি করেই একজন সুলেখক। আর কথক বাঁকাচাঁদ সব দিক থেকে লেখক হবার উপযোগী হয়েও পরের লেখা চুরি করেন। এই বিস্ময় জাগতিক সত্য। গল্পটি বুঝতে হলে এই কথাগুলি মাথায় রাখতে হবে।

বই পাড়ায় কার কার যেন ডাক শুনলেন। ফিরে তাকালেন কথক। কে এই ভদ্রলোক? কাকে ডাকেন! হন্ হন্ করে এগিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। পায়ে বুট জুতো আর খাঁকী রঙের মিলিটারি মোজা, কাপড় হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গুটিয়ে পরা, খাঁকী সার্ট তার ওপর ডোরাকাটা ছিটের কোট গায়ে। আবার একখানা সবুজ রঙের খদ্দরের শাল জড়ানো রয়েছে কোমরে। ভদ্রলোক বোধ হয় তিন সপ্তাহ দাড়ি কামান নি। চুল ছেঁটেছেন বোধ হয় গত বছর এই সময়। লাল টকটকে চারখানি দাঁত বেরিয়ে রয়েছে। বগলে রয়েছে কাঁথা জড়ানো বেশ বড় গোছের একটি পুঁটলি। পুঁটলির ভারে তিনি বাঁ দিকে একটু হেলে পড়েছেন।-এই রকম একটা সর্বরকমে আশাভঙ্গকারী মানুষ হলেন প্রকৃত লেখক? এ কি মানা যায়? একে নিদারুণ শাস্তি দিতে, তার যথাসর্বস্ব হাতিয়ে নিতে তাই বোধহয় বাঁকাচাঁদের বাধে না। ---অর্থাৎ গল্পের পরিবেশ রচনায় লেখক সার্থক স্রষ্টার সাথে তাঁর লেখার গরমিল যেমন বাস্তব তেমনি ভাবেই নরহরি এক ব্যতিক্রমী লেখক,যিনি লেখক হওয়ার মত আচরণ করতে শেখেন নি অথচ হয়ে পড়েছেন -গোটা গল্পটির মধ্যে আমরা সেই বক্তব্যই প্রকাশিত হতে দেখি।

সমালোচকেরা অনেক কিছু বলেন কিন্তু সে বলা একটি স্বাধীন সৃষ্টির রহস্য আবিষ্কারের পক্ষে নিতান্তই মামুলি। যে বন্ধু প্রচুর লেখককে চেনেন তিনি লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করেন পাকা লেখকের মতই। যেন গুণীজনের অধ্যবসায় আয়ত্ত্ব না করে কেবল পরিচয়-সূত্রে তাঁদের প্রতিভাকে আত্মস্থ করা সম্ভব। এ হেন বন্ধুর টিপ্‌স স্মরণীয় তা হলো প্রথমে ভাবতে হবে যেন মাথাট একটা খালি খোল---একেবারে ফোঁপরা মানে কিচ্ছু নেই। ঐ মাথার ভেতর। এইবার ঐ খালি মাথায় পুরে ফেলতে হবে। ধরা যাক তিন জোড়া মেয়ে পুরুষ। হতে পারে যে প্রথম জোড়ার মেয়েটি হবে কালো কুচ্ছিত কিন্তু তার বাবা হবে বড় লোক আর ছেলেটি হবে সুপুরুষ, কিন্তু গরীব একেবারে হাড় হাভাতে গোছের। দ্বিতীয় জোড়ার মেয়েটি হবে হয় কেরানী নয় তো স্কুলের দিদিমণি কিংবা হাসপাতালের নার্স বা রিলিফ ডিপার্টমেন্টের মেয়ে। সুপারেন্টণ্ডেন্ট আর পুরুষটিকে করে দিতে হবে যক্ষাগ্রস্ত কবি বা কম্যুনিস্ট। তারপর তৃতীয় জোড়ার মেয়েটিকে বানাতে হবে চা-বাগানের পাতা তোলা মেয়ে বা কয়লা-খাদের কয়লা - তোলা মেয়ে বা পানউলি বা একেবারে তাদের একজন যারা মুখে রঙ মেখে রাস্তায় দাঁড়ায় আর পুরুষটিকে চোর জোচ্চোর পকেটমার কিংবা রিক্সাওয়ালা বিড়িওয়ালা যা খুশি করা যেতে পারে। এইবার ঐ তিনটি মেয়ে আর পুরুষ কে নিয়ে যেমন খুশি কল্পনা করতে হবে। তাদের কখনো নিয়ে যেতে হবে সমুদ্রের

ধারে, কখনও পাহাড়ের মাথায়, কখনও বনে জঙ্গলে, কখনো সহরের বস্তিতে। কখনও দেখাতে হবে এ ওকে চাচ্ছে কিন্ত পাচ্ছে না, কখনও দেখাতে হবে ও একে পাচ্ছে কিন্তু চাচ্ছে না। কিংবা দেখাতে হবে এ ওকে চাচ্ছেও না পাচ্ছেও না,-তার বদলে যাকে যার চাওয়ার কথা নয় তাকে পাচ্ছে আর যাকে যার পাওয়ার কথা নয় তাকে চাচ্ছে, এরই নাম হচ্ছে গল্পের প্লট, যাকে বলে রোমান্স। মাথাটা মাঝে মাঝে বার কতক ঝাঁকালে ওরা সব মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যাবে, তখন হুড় হুড় করে গল্প বেরিয়ে আসবে। আরেক চমৎকার চরিত্র রঘুদার। রঘুদার শ্বশুর বাড়ি টালিগঞ্জে, পাঁচ পাঁচটা সিনেমার স্টুডিওর সামনে দিয়ে যেতে হয়। বলতে গেলে সিনে-জগতের সব কিছু জানা রঘুদার। তিনি বললেন :

> ‘‘কুচ পরোয়া নেই চালিয়ে যা লেখা। ওধারে একটা ব্যবস্থা করছি আমি। শুধু মনে রাখবি এমন একজোড়া নায়ক -নায়িকা থাকা চাই তোর যাতে শ্রেষ্ঠনাথ আর চিত্রাদেবীকে বেমালুম ফিট করে! তাহলেই-’বলে ডান হাতের চারটি আঙুল
> Avgvi bv‡Ki mvg‡b Z‡j a‡i ej‡j b, ÔbM Pvi nvRvi|Õ[৫৯]

একজন সুস্থ স্বাভাবিক শিক্ষিত মানুষ পরের সাধনার ফসল আত্মসাৎ করতে চায়না। অবধূতের ছোটগল্পেও তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। এককথায় উচ্চাভিলাষ। এই ছোট্ট একটা মানবিক প্রবৃত্তি মানুষকে অনেক অসম্ভব কাজ করিয়ে নেয়। এই মনোবাসনা পারিপার্শ্বিকতার সংযোগে কীভাবে ঘটে থাকে তা ভেসে যাওয়া মানুষটি নিজেই বুঝতে পারে না।

অন্যের বিচারে অনেক স্বাভাবিক ভুল মারাত্মক আকার ধারণ করে। অবধূত মানুষকে জন্মগত ভিলেন ভাবতে পারেন নি- তাঁর গল্পের চরিত্র গুলির কার্য অবশ্যই অপকর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট। রঘু দা যেমন তাকে তার বইয়ের সিনেমা-রূপের কথা ভাবিয়েছে তেমনি তার বাড়ির প্রতিটি সভ্য তাদের স্বভাব অনুসারে তাকে একাজে সফল হতেই হবে এমন একটা পরিস্থিতিতে ফেলেছে।

বোন এবং বোনের বান্ধবী বাঁকা চাঁদের প্রেমিকা -উভয়েই প্রেমের সমাধি তলে গল্পের জন্য নানা কথা শুনিয়ে দিল। এই গল্পটি তার নামে বেরিয়েছে সম্ভবত তার বন্ধুর কীর্তি। নরহরির খাতা থেকে গল্প টুকে নিয়ে চালিয়ে দিয়েছে বাঁকা চাঁদের নামে। হয়ত তার প্রেমিকার বাড়িতে নিজের জায়গাটা পাকা করে নেওয়ার জন্য। কথক বাঁকা রায় তা জানতই না কিন্তু তা বলার উপায় রইল না। ঘটনা এগিয়ে চলল নিজের গতিতে :

১. বোন বলল: ‘এতবড় ছোট নজর কেন তোমার দাদা? গল্প লেখা হয়েছে, কাগজে ছাপিয়েছ, ঘূনাক্ষরে আমরা কিচ্ছু শুনতে পাইনি এতদিন। কেন আমরা তোমার আজ শত্রু, না?’বলে তার বোন ছোট ছোট চক্ষু দুটি আরও ছোট করে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল।
২. প্রেমিকা খিল খিল করে হেসে বললে ‘যেমন ধড়িবাজ তেমনি মিথ্যুক’[৬০]
৩. পাড়ার ছেলেরা চাঁদা তুলতে এসে বলে গেল যে এখঝন আবার আট আনা দিতে আসছে কি করে বাঁকা দা? ছেলে পড়াতো বলে আট আনা দিতো। এখন গল্প লিখে মুঠো মুঠো টাকা কামাচ্ছে এখনও তার ছোট নজর গেল না!

৪. বেকার অবস্থায় নেপা মাঝেমধ্যে সিগারেট বিড়ি খাওয়াত এখন প্রতিষ্ঠিত লেখকের কাছে পাওনা সতেরো টাকা এগারো আনা তিন পয়সা চিঠির মাধ্যমে চেয়ে বসল। পরপর এসব ঘটনা কেনো ঘটছে সে বুঝবে কেমন করে? কথক এর পর জানিয়েছেন :

> "প্রায় ক্ষেপে যাওয়ার মত অবস্থা হয়ে উঠল আমার। পরিস্থিতি এমন হলো যে লেখক না হয়ে আর উপায় নেই, অগত্যা অন্যের লেখা চুরি করা ! সেই অনুযায়ী ঘটল যেমনটি আশা করা যায়। সাতটা পনের মিনিটের ব্যাণ্ডেল লোকাল যখন শেওড়াফুলি পৌঁছালে তখন গাড়ি প্রায় খালি গাড়ি মানকুণ্ডু স্টেশনে থামার আগে রুমাল মাথায় বেঁধে নিলেন প্রায় ভুরু পর্যন্ত ঢাকা। চন্দন নগর স্টেশনে থামলে নেমে গিয়ে উঠলেন পাশের গাড়িতে। এ কামরায় আর কোন লোকই ছিল না। তিনি গাড়ির কোণে মাথা রেখে হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন। কাঁথা জড়ানো পোঁটলাটি পাশে রয়েছে। চুঁচুড়া আসছে। গাড়ির গতি কমে এল। প্লাটফর্মের উল্টোদিকের দরজা খুলে দাঁড়ালেন। আরও কমে এল গাড়ির স্পীড। পেছনে ফিরে দেখলেন বিচিত্র সুরে তাঁর নাক ডাকছে। বুকের মধ্যে তখন তাঁর হাতুড়ির আওয়াজ হচ্ছে। দম বন্ধ করে দাঁতে দাঁত টিপে দাঁড়িয়ে আছেন। আরও কমল গাড়ির স্পীড। তুলে নিলেন পুঁটলিটা। তারপর এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়লেন। সেই রাতেই ব্লেড দিয়ে কেটে ফেললেন সব ক'খানি খাতার মলাট। এরপর চুরির চিহ্ন মুছে ফেললেন।"খাতা ক'খানি বিছানার নিচে পেতে রেখে মলাট ক'খানি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এলাম।"[৬০]

গল্পের আরো একটু বাকী আছে কীভাবে লেখক বিবেক দংশন থেকে মুক্তি পেলেন। এই সংবাদটুকু পরিবেশনের জন্য লেখক বাঁকাচাঁদের একমাত্র বোনের বান্ধবীকে গল্পে এনেছেন। বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব উঠলো। কিন্তু সে তার যে এখনও চাকরী জোটেনি-এই কথাটা অসহায়ভাবে জানালো। এবার বোনের পাশে যিনি নত মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি অশ্রু ভেজানো কণ্ঠে বললেন, কেন -যারা বই লেখে তারা কি বিয়ে করে না? আসল কথা আমার মত মেয়েকে'- কান্নায় বুজে এলো গলা। আর কিছু বেরুল না মুখ দিয়ে। বেরুবার প্রয়োজনও ছিল না। চন্ চন্ করে পায়ের রক্ত মাথায় উঠতে লাগল বাঁকাচাঁদের। মাথা ঘুরিয়ে বিছানার দিকে চেয়ে দেখলেন ওর নিচে বিশ বছরের রসদ মজুত। তারপরে রাজী হলো বিয়েতে। এই প্রসঙ্গে একটি মেয়েকে বিয়ে করার বিষয়টা এস যাওয়ায় বাঁকাচাঁদের কর্তব্য পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া গেলো।

এর পর থাকে কৈফিয়তের পালা। লেখক বাঁকাচাদ ঘোষ রায় ভাবছেন মনের ভেতরে বেশ ব্যথাও তিনি অনুভব করেন বেচারা নরহরি হাইয়ের জন্যে। গায়ে ছোট ছোট কাল পিপড়ে হাঁটলে যেমন বোধ হয় তেমনি বোধ হয় মাঝে মাঝে তাঁর বিবেকের গায়ে। নিজেকে বোঝানোর জন্যে ভাবেন যে বিয়ে করে যৌতুক যা পায় তা' কি লোকে ব্যবহার করে না? তিনি এই ভেবে সান্ত্বনা পান যে নরহরির আত্মীয়কে বিয়ে করে তাঁর লেখাগুলি যৌতুক পেয়েছেন। নরহরি

হাই-এর খাতা ক'খানি সে বিবাহের যৌতুক হিসেবে গ্রহণ করেছে, এতো হতেই পারে! গল্পের শেষে লেখক ভ্রূকুটি করলেন। নির্লজ্জ আত্মসমর্থনের যুক্তি মুহূর্তে স্বার্থপর মানুষের চরিত্রকে বাস্তব সম্মত রূপেই তুলে ধরল। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে এ গল্পটি লেখকের চুঁচুড়া -ব্যাণ্ডেল-চন্দননগর---এই ব্যক্তি পরিচিত অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

অব্যর্থ কবজ : জ্যোতিষীর অসহায়তা

সাধু-সন্ন্যাসীরা আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করেন -এই ধারণার সাথে স্বার্থ পূরণের বাসনা মিশে গিয়ে আমাদের মনে সাধারণভাবে এই বিশ্বাস কাজ করে যে তাঁরা চাইলে আমাদের সমস্যা অলৌকিক উপায়ে দূর করতে পারেন। তাছাড়া ভেক ধারী সাধু-সন্ন্যাসী পীর ফকির দরবেশ সকলেই মানুষকে ঠকিয়ে উপার্জনের পথ হিসেবে বেছে নেন-জ্যোতিষকে। নিজেদের পরিবারের ক্ষেত্রে সে জোচ্চুরি অনেক সময় ধরা পড়ে যায়। গেঁয়ো যোগী ভিক পায় না-এর বড় কারণ তাকে বার বার কাছ থেকে দেখার ফলে তার অসতর্কতার সুযোগে অনেক সময় তাকে ঠিকভাবে চিনে নিয়েছে প্রতিবেশীরা। অবধূত শিক্ষিত, সজ্জন ব্যক্তি। তিনি চান নি মিথ্যা মোড়কে জড়িয়ে সত্যের দামে বিকোক। লেখক হিসেবে তাই অনেক সময় নিজেকে বিদ্রূপ করেছেন।

'অব্যর্থ কবজ'গল্পটি অনেকটা সেই প্রকৃতির। কথক নিজে একজন হস্তরেখাবিদ হয়ে নিজের ব্যর্থতার কথা আমাদের শুনিয়েছেন। এ গল্পে রসিক অবধূতকে খুব ভালো করে চিনে নেওয়া যায়। একজন সকাল বেলাতেই হাত দেখাতে এলেন। নাম তার বগলা প্রসাদ ঘোষ দস্তিদার। গল্পের প্রথম লাইন সহ কিছুটা দেখা যেতে পারে :

> "মোহিনীমোহন কামিনীকুমার অবলারঞ্জন এই রকমের একটি নাম হলেই মানাতো ভাল। তা'নয় একেবারে বগলা প্রসাদ ঘোষ দস্তিদার। শান্তিপুরে জরিপাড় ধূতি সিল্কের পাঞ্জাবি কোঁচানো উড়ানি দিয়ে দেহ যষ্ঠিখানি মণ্ডিত। ভয় হয় ঠোকাঠুকি লাগলে এখনই হয়ত ওখানি ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়বে কিম্বা ঝড় উঠলে উড়িয়ে নিয়ে যাবে অসীম শূন্যে।"[৬১]

---হাত দেখে উপার্জনের টাকা বউ -এর হাতে দিতেই তিনি সে টাকা ফেরৎ দিতে বললেন। অনেক খবরের মধ্যে জানালেন যে ওঁর বাপের বাড়ির তিনখানা বাড়ির পরের বাড়িতে থাকেন মালতীদিরা। অর্থাৎ সেই বাড়ির মেয়ে তিনি। তাঁরই স্বামী হচ্ছেন শ্রী বগলা প্রসাদ ঘোষ দস্তি দার। অগত্যা সৌজন্য হেতু হাত দেখার টাকা ফেরৎ দিতে হলো। বগলাপ্রসাদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা খুব সহজ ছিলো। জানা ঘটনার ভিত্তিতে তিনি কেবল গণক হিসেবে পরামর্শ দিয়েছেন। এটা হাত দেখার ফল নয়। আগে থেকে ঘটনা জানার ফল। এই জানা গুলি হলো:

১.মালতী দি'কে নিজের কাছে না রেখে শ্বশুর বাড়িতে রাখতেন আর নিজে যেতেন পাঁচিল টপকে রাতের অন্ধকারে-পরকীয়া প্রেমিকের মত। এই করতে গিয়ে পাড়ার ছেলেদের হাতে মারও খেয়েছিলেন।

২. নিজের স্ত্রীকে ফুসলিয়ে আনতে চাইতেন।
৩. চিঠি পাঠাতেন মধুমালতী এই নাম দিয়ে তাতে লেখা থাকত কেমন করে আপাদ-মস্ত ক ঢেকে থাকতে হবে।
৪. স্বামীর খেয়াল মেটাতেই সিঁদুর মুছে তিনি কলেজে পড়া অবিবাহিত মেয়ে সেজে রাত নটার সময় লেকের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেন।
৫. হাসপাতালের নার্স সেজে সিনেমায় গিয়ে বসেছেন বগলাবাবুর পাশে।
৬. একলা পুরী পালিয়ে গেছেন যাতে দু'দিন পরে বগলা বাবু সেখানে গিয়ে সমুদ্রের পাশে তাঁকে হঠাৎ ধরে ফেলার সুযোগ পান।
৭. এক বাড়িতে থেকেও দশ-পনেরো দিন লুকিয়ে কাটিয়েছেন যাতে বগলাবাবু তাঁকে খুঁজে না পাবার দু:খটা চেখে চেখে ভোগ করতে পারেন।
৮. কিম্ভূতকিমাকার সব প্রেমপত্রের জবাব দিয়েছেন, মান অভিমান ঝগড়াঝাটি যে কত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।
৯. শিলং যেতে হবে। সেখানে মালতীদি হবেন লাবণ্য। নিজে হবেন অমিত রায় হয়ে নতুন রকমের প্রেম করে আসবেন কিছুদিন বগলাবাবু।স্ত্রীর কাছ থেকে মক্কেল সম্পর্কে সব জানা হয়ে গেল। জ্যোতিষী এবার বগলাপ্রসাদের সম্পর্কে সব জানার পরে বিধান দিলেন দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তার উপর। কাজ হলো মালতীদি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর কণ্যার জন্মদিনে একভরির একছড়া সোনার হারও পাঠালেন। একটু গল্পাংশ স্মরণ করি :

> "স্ত্রীকে বললাম---দেখলে তো, আমার কবচ অব্যর্থ কিনা। হাতে হাতে ফল পেলেন তোমার মালতীদি।তাতে হাতে ফল পাবার আরও কিছু বাকী ছিল তখনও।"[৬২]

এ হেন ভদ্রলোকের পত্নীপ্রেম, রোমান্টিক বিলাস তার সাথে পত্নীর স্বামীর খেয়াল মিটিয়ে চলার চেষ্টা-সব মিলিয়ে হাল্কা রসের আনন্দে ভেসে চলেছিল এ গল্প। অবশেষে জানা গেল প্রেমের বাতিকগ্রস্ত নয় পরকীয়া প্রেমে সিদ্ধ হতেই তার নানা ভেক ধারণ অবশেষে নিজ শালিকা হেনার সাথে বিবাহ রূপ জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ। এখন জ্যোতিষী কী করেন? তিনি কবজ দিয়ে বলেছিলেন :

> "তিনি যাকে চান তাকে যদি হাতের মুঠোয় পান তা'হলে কোন মতেই তার কথার অবাধ্য হওয়া চলবে না।তাকে নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মত ঘর সংসার করতে হবে।কখনও আর তার সঙ্গে কোন রকম প্রেমের খেলা খেলবেন না।তাকে কোন রকম সন্দেহ করতে পারবেন না।"[৬৩]

বলা বাহুল্য তখন পর্যন্ত তার জ্যোতিষ -বিধান স্ত্রীর দেওয়া খবরের উপর নির্ভর করে গৃহ শান্তির উদ্দেশ্যেই লাগানো হচ্ছিল। মালতীদির উচ্ছা পূরণের লক্ষ্যেই এ বিধান পরিকল্পনা মতই এগুচ্ছিল। কিন্তু খবরেই ছিল গোলমাল হেনার সাথে জামাইবাবু বগলা প্রসাদের প্রেমের

কথাটা জানাই ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে এই গোপন অভিসারের পিছনে ছিলো শ্যালিকা হেনা। সেটা বগলাপ্রসাদের স্ত্রী জানতো না। গণকের কাছে সেকথা তাই বলার প্রশ্নও ছিলো না। নিছক খেয়াল বলে তিনি ভেবেছিলেন এবং স্বামীর খেয়াল মেটাচ্ছিলেন। এখন ফল হলো উল্টো জ্যোতিষ বিধান মতে পাকাপাকি ভাবে হেনার সাথে থাকবার সিদ্ধান্ত নিল বগলাপ্রসাদ। বগলাপ্রসাদের মনের ইচ্ছা বাস্তব রূপ পেল জ্যোতিষীর পরামর্শ মেনে।

অতএব সন্দেহ নেই কবচ অব্যর্থ ফল দিয়েছে কিন্তু সেকথা স্ত্রীর কাছে বলার উপায় নেই ---কীভাবে সে অব্যর্থ ফল ফলেছে। তাই গল্পের শেষে লেখকের মন্তব্য :

> "আমি তখন ভাবছি কোথায় আমার মুখ লুকোব। কবচের অব্যর্থ ফল ফলেছে কিন্তু নিজের গৃহিনীর কাছে মুখ দেখাব তারও উপায় নেই।"৬৪

রসোত্তীর্ণ : শব্দার্থকেন্দ্রিক রসিকতায়

দুটি পৃথক কাহিনি নিয়ে আট পৃষ্ঠার গল্প রসোত্তীর্ণ। গল্পের শুরু হয়েছে ছোট গল্প সম্পর্কে মতামত দিয়ে। এই গল্প পড়তে বসে প্রথমে মনে হবে যেন ছোটগল্প -বিষয়ক একটি আলোচনা পড়ছি আর সে আলোচনার লক্ষ্য রসোত্তীর্ণ গল্প কখন লেখা সম্ভব। এখন আমরা এ গল্পের শুরুটা দেখে নিতে পারি :

> "নাম করা সাহিত্যিক অনিমেষ বসু আমার বন্ধু। তাঁর মতে জীবনটা হোল কতকগুলো ছোট গল্পের সমষ্টি। তিনি বলেন, হয় চমক লাগা, নয় চুমুক লাগানো ---এই নিয়ে জীবন। তা' বলে চমক লাগালেই তা' সাহিত্য হবে না বা বা চুমুক লাগালেই তা' ছোট গল্প হয়ে উঠবে না। কিন্তু দৈবাৎ যদি চুমুক লাগাতে গিয়ে চমক লাগে তখনই আরম্ভ হয় এক একটি ছোট গল্পের। আর সে গল্পটি সার্থক রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে ঠিক উল্টোটি ঘটলে। চমক লাগাবার মত অসাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও যখন সেই পরিস্থিতির সফেন পাত্রটিতে আরামসে চুমুক লাগানো চলে তখনই গল্পটি দাঁড়িয়ে যায়। অর্থাৎ কি না একটি চমক লাগানো সার্থক ছোট গল্প হয়ে ওঠে।" ৬৫

দুটি ছোট কাহিনি নিয়ে এ গল্প রচিত। কথকের মতে এ দুটি চুমুক লাগাতে গিয়ে চমক লাগানোর মত। প্রথমটি খুবই ছোট 'ফুললো আর মল' গোছের আখ্যান।'(রসোত্তীর্ণ,পৃ. ১৭২)গল্পের শুরু ব্যারাকপুর থেকে বাসে সে বাস পৌঁছে গেল শ্যাম বাজার মোড়ে। সহযাত্রী প্রায় পৌনে একশ।

> "বাসের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ 'হয়েই দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম এক সরবতের দোকানে। ঠাণ্ডা গেলাসটি হাতে পেয়ে আয়েসে দু'চোখ বুঁজে এল। দিলাম একটি চুমুক। সঙ্গে সঙ্গে ফরফর করে উঠল মুখের মধ্যে। পরবর্তী ক্রিয়াটিও ঘটল টেবিলের উপরেই। একটা উচ্চিংড়ে এক লাফে উধাও হয়ে গেল। বরফ পেটা মুগুর নিয়ে

তেড়ে এল এক দোকানদার। কটি পয়সা গুণে দিয়ে সুড় সুড় করে সরে পড়লাম।'' ৬৬

গল্পটি শেষ করে বললেন :

''এইখানেই প্রথম কাহিনীর পূর্ণচ্ছেদ। এ যদি গল্প হয় তবে এর চেয়ে ছোট গল্প আর হতেই পারে না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।কিন্তু রসোত্তীর্ণ হলো কি না সেটুকুই দুর্ভাবনা। অযথা প্রাণী হত্যাটা হোল না এই যা একমাত্র রসের ব্যাপার এর মধ্যে। উচ্চিংড়েটা নিরাপদে সরবতের টক -মিষ্টি রস থেকে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এটি অবশ্য একটি রসোত্তীর্ণ ঘটনা।'' ৬৭

গল্পের শেষে না পৌঁছালে তাঁর এজাতীয় রসিক মনের দুর্লভ পরিচয় পাওয়া হত না। এ জাতীয় প্রকাশ প্রমথ চৌধুরীর মধ্যেই আমরা প্রথম দেখেছিলাম। কাটে শব্দ টিকে তিনি কীটদষ্ট এবং বাজারে কাটা এই দুই অর্থে ব্যবহার করে চমৎকার রস সৃষ্টি করেছেন।

পরের ঘটনাটির অকুস্থল নৈহাটি প্লাটফরম।ঢুকছে শান্তিপুর লোকাল।এখানেই মণি ব্যাগ চুরি গেল কথকের। টাকা ছিল মাত্র এগারোটা সেজন্য কষ্ট নয় এগারো হাজার হলেও এত কষ্ট হত না। কষ্টের কারণ তার ভালোবাসার স্মৃতি কণকের ফটো ছিল এর মধ্যে। পকেট মার টা হলো ঠিক তখনই যখন গরম চায়ের ভাঁড়ে এক কাপ চুমুক দিয়েছে আর এক হাতে রেলের হ্যান্ডেলটা ধরে। সে যাইহোক ব্যাগটি পাওয়া গেল।শিয়ালদহে সেই পকেট মারের পকেট মেরেছে আর এক মেয়ে, তখনই। মেয়েটি ধরা পড়েছে কিন্তু যার পকেট মারা হয়েছে সে পালাল আসলে চোরের উপর বাটপাড়ি হয়েছে আরকি উৎসাহী লোকের ভিড়ে আসল মালিককে দেখে পালিয়েছে আগের পকেটমার।

সে পালাল ভীড়ের মধ্যে। আর নজর রাখল মেয়েটির উপর। পুলিশ সত্যকার ব্যাগের মালিককে ছেড়ে দিল আর যে মালিকের ব্যাগটিকে আদায় করে দিল তাকে উদ্ধার করল কথক। ধরা পড়া মেয়েটির অনুরোধে সে বাড়ি পর্যন্ত গেল। না গেলে গুণ্ডারা তাকে ছাড়বে না যে ! অবশেষে দেখা গেল এ মেয়েটি কৃষ্ণা তার দিদির নাম কণক। কণকের স্বামী হরবিলাস সান্যাল ছিল কারখানার কর্মচারী এখন মাতাল সে চায় তার শ্যালিকা দেহ ব্যবসা করে তার মদের দাম যোগাড় করে দিক। তার মত আত্মকেন্দ্রিক মাতাল বর্তমানে দুর্লভ।

রাসবিহারীবাবু তাঁর মেয়ে কণকের বিয়ে দিয়েছিলেন,সে যখন ক্লাস এইটের ছাত্রী ভালো মাইনে আর শহরের ছেলে বলে কথা! বেশী কথা লেখক ব্যবহার করেন নি। খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে কাহিনী। গলিপথ পেরিয়ে এল বস্তির এক বাড়ির সামনে। কথককে সঙ্গে আসতে দেখে মাতাল জামাইবাবু হরবিলাসের মনে হল তার শালী কৃষ্ণা এত দিন রাজী ছিল না, আজ মনের মত মানুষ ধরে এনেছে। ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে বসে রইল পাহারায়। সব দেখে শুনে চমক লাগল আর নেশা ছুটে গেল লেখকের। কথক বা লেখকের বাস্তব-উপলব্ধিটা এমন রূঢ় যে হৃদয়ের সমস্ত আবগকে ঝেড়ে ফেলতে মুহূর্তমাত্র সময় লাগেনা।

''পাঁটের দাম আদায় হয়েছে বললে কৃষ্ণা। তার ভগিনীপতি তখন দরজা খুলে

> দিলে। রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনিব্যাগ, মণিব্যাগের মধ্যে যে ফটোখানি লুকনো আছে, সব রেখে এলাম যার ফটো তার কাছে। মনিব্যাজের জন্যে আর আমার মনে কোনও আক্ষেপ নেই।" [৬৮]

মুশকিল : শৈশবের লীলায়

গল্পটির শুরুতে একটি বাক্য 'একটা মুশকিল লেগেই আছে।' ছোট্ট ভাইটির বড় যে বোন যার নাম সাবিত্রী সবাই ডাকে 'সাবি' বলে সে সাত পেরিয়ে আট বছরে পড়েছে। তার ওপরের ভাইটি বেণীমাধব এখন স্কুলে পড়ে।পা পায়না বলে বগলে ঝুলে সাইকেল চালায়, ঘুড়ি ওড়ায়। বাড়ির বড় ছেলেটি এখন থাকে চিত্তরঞ্জনে। কলেজে পড়ে। এই হোল ঊষানাথের পরিবার। এর বাইরে আছেন ঊষানাথের মা ও স্ত্রী। সব মিলিয়ে জমজমাট। এর মধ্যে সবচেয়ে যে মন কাড়ে সে হলো মণিবাবু। তাকে ছোড়দি ডাকে রঘুডাকাত বলে ছোড়দার দেওয়া নাম স্টুপিড, ঠাকুমা ডাকেন মণি বলে।

> "মা ডাকেন খোকন। বাবা বলেন এই পাজী' তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া একমাথা চুল। এই মাত্র আঁচড়ে পাট করে দেওয়া হোল, চক্ষু না পাল্টাতে যে কে সেই। সমস্ত চুল এসে কপাল ছাপিয়ে মুখের উপর ঢেউ খেলছে, দৃকপাত করবার ফুরসৎ নেই সেদিকে ভোর হতে না হোতেই পিছু হেঁটে চার হাতে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেবে আসবে নিচে। এসে ঠাকুমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করবে, "থাক্-মা, ও থাক্-মা!'[৬৯]

সাবিত্রী ঠাকুমার কাছে শোয়। ঘুম ভাঙলেও কান খাড়া করে পড়ে থাকবে বিছানায় যতক্ষণ না ছোট ভাইটি এসে ডাকছে 'থাক্ মা ও থাক্ মা' তারপর 'থোল্দি থোল্দি' বলতে বলতে ছোট হাত দুখানি চাবড়াতে থাকবে বন্ধ দরজার গায়ে। শ্রীমান মণিমাধবের দিনের কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে ছোড়দির কোলে চড়েই। কি? না ঐ পাখিটাকে ধরে দাও এখুনি। ঐ যে সজনে গাছের ডালে লম্বা লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে রামধনু রঙ-এর বড় পাখিটা, ঐটাই চাই। জোর জুলুম লাগাবে কোল থেকে নামবার জন্যে। কিন্তু ছোড়দি অত কাঁচা মেয়ে নয়। নামিয়ে দিক, আরএই সকালের ঠাণ্ডাটা লাগুক খালি পায়ে। ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি নিয়ে আসবে।

> "চল বাড়ি যাই লক্ষ্মীটি, তোমায় এখুনি একটা পাখি তৈরী করে দোব। সুন্দর সাদা তুলো এই এতবড় পাখি।'
>
> 'না ঐ তে দাও। কোলে বসে দু-পা সজোরে চালাতে লাগল ছোড়দির সামনে পেছনে কিন্তু তা' বলে এখন ছাড়লে চলবে না। চোখ মুখ ধুইয়ে দুধ খাইয়ে তবে ছাড়তে হবে। নয়ত পাজীকে আর ধরাই যাবে না।"[৭০]

সাবিত্রী স্কুল থেকে সাঁতারের ক্লাস করে ফিরল জ্বর গায়ে নিয়ে। কিছুতেই সে জ্বর কমে না। চার থেকে দুই পর্যন্ত নামলেও আর নামে না। সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দাদাও এসেছে চিত্তরঞ্জন

থেকে। এদিকে সবাই যখন চিন্তাগ্রস্ত, তখন মণি কোথায় গেল ? খোঁজা হলো সর্বত্র। পুলিশেও খবর দিতে হোল। শেষপর্যন্ত তাকে পাওয়া গেল ছোড়দির কাছে কখন সে এসে ঘুমিয়ে আছে। ছোড়দিরও আর সে উত্তাপ নেই। দুজনেই ঘুমাচ্ছে। সাবিত্রীর মুখ খানি পরম তৃপ্তিতে উজ্জ্বল।

আসান : সমব্যথীর গল্প

গল্পটির রসকেন্দ্রে একটি কুকুরছানা। আসলে দুটি কুকুরছানা। যদিও নিমু আর শান্তা ভিন্ন সবাই জানে একটি কুকুর ছানা। বাড়ির দুটি বাচ্চা নিমু আর শান্তা কুকুরছানা দুটিকে তুলে এনেছিল রাস্তা থেকে। দুটোই মিসমিসে কালো তবে একটির লেজটা ছিল সাদা। এই চিহ্ন দেখে নিমু বুঝতে পারে তার ছানাটি পালিয়েছে। এখন যেটি কাছে আছে সেটি দিদি শান্তার। সে ছানাটিকে বুকে আঁকড়ে নিজের দাবি ছাড়তে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত কেউ-ই ধরে রাখতে পারে না। কুকুর-বাচ্চা বাড়ির সকলের কাছে বিরক্তি আর গা ঘিন ঘিন করা অবাঞ্ছিত সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি।

কাহিনীর অগ্রগমনে ও পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে এসেছে অনেক চরিত্রঃ মা,পিসিমা, যামিনী বাবু-বাবা, আরতি ও আরাধনা- দুটি বড় বোন ও তাদের দাদা সুব্রত-আরো পরে এসেছেন পুরন্দর বাবু তাঁর পুলিশ,কুকুর, দারোয়ান এবং এই পুলিশকর্তার মেয়ে স্ত্রী-প্রতিবেশী হিসেবে, কাছের বাড়ির মানুষ হিসেবে।

হঠাৎ দুপুর রাতে বাড়ির সব লোক এক জায়গায় হয়ে গেল। সংলাপ শুরু হলো প্রথম পর্যায়ে কোথা থেকে বাচ্চা কুকুরের কাতরানি আসছে সেই সম্পর্কিত ভাবনার প্রকাশ। তিন তলার সব কটি কর্ণারে সে ঢুকে থাকতে পারে তাই খোঁজায় বাদ গেল না কোন জায়গা-ই। শুচিবাই গ্রস্তা পিসিমা ভেবে আকুল তাঁর আচারের বয়াম থেকে বড়ির কৌটা - বিছানা থেকে জামা কাপড় এসবের কী হবে? কুকুর যদি সত্যিই ঢুকে থাকে?

সুব্রত শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলো বাথরুমের পাশের বারান্দা থেকে। এক কোনায় ছেঁড়া সোফার গাদা করা স্পঞ্জের তলা থেকে পাওয়া গেল লুকোচুরি করা এই বিড়াল ছানাটিকে। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। সুব্রত কান ধরে মারলে এক টান। ছিটকে পড়ল বাইরে।

দ্বিতীয়বার বাটা পান মুখে দিয়ে যখন পিসিমা শুয়ে পড়তে ব্যস্ত তখন আবার মায়ের কানে এল কুকুরের আওয়াজ। এবার বাবার চশমা ভুল হলো না। দ্বিতীয়বারে সুব্রত আবার এল তেতো মুখে কাঁচা ঘুম ভেঙেছে তার। এবার সে এমনভাবে ছুঁড়ল নির্ঘাত এ বাচ্চাটা মার যাবেই। বাড়ির সব চেয়ে যে ছোট সেই নিমু একে আঁকড়ে ধরেছিল। তার টা আগেই গেছে এটা শান্তার তাতে কী হয়েছে। কিন্তু কেউ তাকে সমর্থন করেনি-এমনকি মা-ও না। তার কাছে এ তো কুকুর নয় এ তো মানুষ -পরিবারের একজন। শান্তা আর সে মিলে এই দুটিকে নিয়ে কত না খেলা খেলেছে! তাদের সংসারে এ একজন সদস্য একথাটা কেউ-ই তো বুঝলো না। নিদারুণ প্রতিবাদের মাঝখানে সে ও শান্তা একেবারেই হতভম্ব।বাবা যখন তাদের একটু সহানুভূতির কথা বললেন অমনি কেঁদে এক্সা।

পরেরদিন বোনের একটা হাত ধরে ভাই টানাটানি জুড়ে দিলে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল---'মান্তু, মান্তু, কানে। বলে ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না দেখালে। নিজের একখানা পায়ে হাত দিয়ে বললে -'কত্তো, হাঁত্তে পারে না।' চোখ বড় বড় করে শান্তা বললে -'পা ভেঙেছে বুঝি তাই হাঁটতে পারে না।'

ভাইয়ের দেখানো পথ ধরে তারা পৌঁছে গেল একটা গ্যারাজে। গোটা কতক টিনের পাশে ঘরের কোণে মান্তু। এদিকে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল গ্যরাজের সাটার। এক ঝটকায় নেমে এল ঘরের মধ্যে অন্ধকার।

ওদিকে মা বাড়িতে ব্যস্ত হয়ে আছেন কাচাকাচিতে ভেবেছেন ছেলে মেয়েরা ঘুমাচ্ছে এই ফাঁকে কাজ সেরে নিতে হবে। ওদিকে ঠাকুর ঘরে ব্যস্ত পিসিমা। মা পিসিমা দুজনেই ভাবলেন ছোট দুটি গেল কোথায়? নিশ্চয়ই কোন অকাজে ব্যস্ত ! কিন্তু না, কোথাও নেই। শুরু হল চেঁচামেচি। পাড়ার লোক ছুটে এল। আধ ঘন্টার মধ্যে আসলেন যামিনীবাবু। সুব্রত এল মিনিট পনের পরে। তারপর আরম্ভ হল তুমুল ব্যাপার। থানার থেকে রেডিও লাগানো গাড়ি ছুটল সমষ্যা সমাধানে। বড় রাস্তার ওপরে চারখানা বাড়ি পরেই থাকেন পুরন্দর বোস। পুলিশের মস্ত বড় অফিসার। পাড়ার লোক তাঁকে ফোন করে দিলে অফিসে। দু'জন অফিসার সঙ্গে নিয়ে নিজেই তিনি তাঁর গাড়ি চালিয়ে এসে পড়লেন এবং নানা রকম কাণ্ড করতে লাগলেন তাঁরা! ---অবশেষে পুলিশের কুকুরের সহায়তায় বাচ্চা দুটি কে উদ্ধার করা গেল। পুলিশের কুকুর তবু খুব উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করছে দড়ি ছাড়তেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল গ্যারাজ ঘরের কোণায়। মরা কুকুর-বাচ্চার গা শুঁকছে। গল্পের শেষ এখানেই। গল্পটি শেষ করার পর অনেক কথাই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'সমব্যথী' কবিতায় এরকম একটি কল্পিত প্রসঙ্গ এনেছেন। শিশু তার মাকে যে প্রশ্ন গুলি করেছিল, যে অভিমান করেছিল তা আমাদের মনে পড়ে।

অবধূত বড়দের সাথে বাচ্চাদের ভালো-লাগার পার্থক্য সঙ্গত কারণেই নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে শুনিয়েছেন কিন্তু কোথাও একটা জায়গা অবশ্যই থাকে, যেখানে মানুষ নিজের স্বার্থপরতার কারণে নিজেই মর্মে যন্ত্রণা অনুভব করে। এ গল্পে কুকুরের বাচ্চার প্রতি নিষ্করুণ আচরণের জন্য মাকে তাই বেদনা অনুভব করতে হয়। গল্পটি যাতে সস্তা না হয় এ জন্য লেখক এই পরিবারের মানসিক যন্ত্রণাভোগের মাত্রাকে দীর্ঘায়িত করেন নি বা কোনভাবে ফলভোগের সঙ্গে পূর্বরাত্রে কুকুর-বাচ্চার প্রতি কৃত অন্যায়কে যুক্ত করেননি। এখানে বিষয়টিকে লেখকের শৈল্পিক নৈপুণ্যের পরিচায়ক হিসাবে ধরা যেতে পারে।

পায়রা : ব্যাঙ্গাত্মক ভাবনায় স্বরূপ সন্ধান

ঘুমের মধ্যে অসংবদ্ধ প্রলাপে কাটতেই পারে বেঘোর সময়। তার জন্য কেউ দায়ি হয় না। এ গল্পে লেখক দায় এড়ানোর জন্যে এমন এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। প্রয়োজনে গল্পে অবলম্বিত রাজনৈতিক বক্তব্যের দায় 'স্বপ্নের প্রলাপ' বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। স্বাধীন ভারতের পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যর্থ। সাধারণ মানুষ অদূরদর্শী-প্রকৃত ভালোর স্বরূপ

সবসময় বোঝে না।

জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন। ভারতবাসীর ফাঁকিবাজি মানসিকতা ! স্বভাবতই জাতীয় বিপর্যয় রোধের অলীক স্বপ্ন- সব মিলিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। এর জন্য লেখক স্বপ্নের মধ্যে আপাত অসংলগ্ন প্রতীকী বাকচিত্র নির্মাণ করেছেন। সাদা পায়রা শান্তির দূত ! রঙ করে সাদা করার মধ্যে সস্তায় বাজিমাত করার প্রবণতা প্রকাশ করেছে। সবটাই স্বপ্ন -ঘটনা নয়-তবু অস্বীকারের উপায় নেই -এর সম্ভাব্যতাকে।

ব্যাঙ্গাত্মক ছোটগল্প পায়রা। সে শান্তির দূত। পায়রা পুষলেই দেশময় লোকে শান্তি কামী হয়ে যাবে এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই। অনেক সময় রাষ্ট্রযন্ত্র ছেলে মানুষী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। তখন তা না মেনে উপায় থাকে না আবার মেনে নেওয়ার মধে থাকে গাফিলতি। এ গল্পে হাল্কা রসিকতার চালে লেখক প্রতীকীভাবে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক বরং বলা ভালো রাষ্ট্রনৈতিক হুকুম নামা জারি হওয়ার অসারতা এবং প্রজা সাধারণের পালনে অনীহা বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন।

কেবল শান্তির কথা বলা যথেষ্ট নয়। শান্তির জন্য যে অহিংসা প্রবৃত্তি তা সচরাচর মানুষের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। এ গল্পে বাঙালির হুজুগ প্রিয়তা, আলসেমি, স্বপ্নবিলাস, যুক্তিহীন আনুগত্য প্রদর্শন (যথার্থ না হতে পারে)-ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

স্রষ্টা অবধূতের রচনা বৈশিষ্ট্য

বহুব্রীহি গল্প গ্রন্থের গল্পগুলি থেকে ছোটগল্পকার অবধূতের রচনাবৈশিষ্ট্য নিম্নোক্ত রূপে আলোচনা করা যায় :

১. ঘটনা বর্ণনার মত করে কাহিনি বলে যাওয়া। ঘটনা মানে যা ঘটেছে এমন। আর কাহিনি হলো তাই যা ঘটনার সদৃশ এখানে উপস্থাপকের যোগ্যতার একটি বিশেষ ভূমিকা থাকবে। এই কাহিনি তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাধারণত অভিন্ন অর্থাৎ উৎসে জীবন-অভিজ্ঞতা আর প্রকাশে শিল্প প্রয়োজন। কখনো যদি কাহিনির কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করতে হয় তবে তা করেছেন পরে। যাতে দেখার ব্যাঘাতে পাঠকের রসগ্রহণে না অসুবিধা হয়। ফলে পাঠকের মনোযোগ কথকের সাথে সব সময় বজায় থেকেছে। একটা কৌতূহল সর্বদাই পাঠককে আগ্রহী করে বিষয় সচেতন করে রেখেছে যেমন:যেদিন প্রথম সে ঊষাকে রাজী করালে রিক্সায় চড়াতে। সারাক্ষণ ঊষা থরথর করে কাঁপতেই লাগল তার বুকে রিক্সার ভেতর বসে। না তুললে মুখ, না বললে একটি কথা কেথায় গেল সেদিন তার অনর্গল ছল ছলানি আর বকবক করা আর কোথায়ই বা গেল তার সেই ফাজলামি দুষ্টুমি। যখন থামল গিয়ে রিক্সা শ্যামবাজারের মোড়ে---তখন একটিও কথা না বলে একবার তার দিকে ফিরেও না চেয়ে দৌড়ে গিয়ে ট্রামে উঠে বসল। যেন তার কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। তারপর দিন কালেজে দেখা হতে আর ফিরেই দেখলে না তার দিকে। যেন চেনেই না তাকে। দিন কতক তো কলেজের বাইরে কোথাও দেখাই করলো না

যেয়ে। তারপর আবার যেদিন দেখা হ'ল দু'জনে, সেদিন কি রাগ!

'কেন তুমি সেদিন ওসব করতে গেলে প্রশান্তদা ?' প্রশান্ত বিস্মিত হয়ে বলে : 'কি, কি করেছি আমি সেদিন !'সত্যই ভয়ানক আশ্চর্য হয়েছিল প্রশান্ত। কিছুই এমন করা হয়নি সেদিন যাতে ভয়ানক অপরাধ হয়ে গেছে। শুধু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে চেপে নিয়ে বসেছিল তাকে। একবারও উষা মুখ তোলেনি। কিন্তু তাতেই কি এত অপরাধ হয়ে গেল যে আর সাতদিন দেখাই করলে না সে প্রশান্তর সঙ্গে। সত্যই আরও ভয় পেয়েছিল প্রশান্ত সেদিন ঊষার প্রশ্ন শুনে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ফিক করে হেসে ফেলেছিল ঊষা। তার সঙ্গে চোখ দু'টি অপরূপভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছিল, ''যাও, তুমি ভয়ানক ইয়ে !'ইয়ে কথাটি হচ্ছে ওর মুদ্রা দোষ। কি অদ্ভুত ভঙ্গিমা করেই উচ্চারণ করে কথাটি। ইচ্ছে করলে শুধু চোখ ঘুরিয়েই বুঝিয়ে দেবে যে ইয়ে হচ্ছে ইয়ে।''[৭১]

২. শব্দের ব্যাখ্যা তাৎপর্যে প্রকাশ করার অভিনব কৌশল তিনি শিল্পিত সংযমে কাজে লাগিয়েছেন। ইঙ্গিতময়তা আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে সেসব ক্ষেত্রে। স্মরণ করা যায় পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তের নিম্নোক্ত অংশ টুকু :

''কেন তুমি সেদিন ওসব করতে গেলে প্রশান্তদা?'

''কি, কি করেছি আমি সেদিন !'কি অদ্ভুত ভঙ্গিমা করেই উচ্চারণ করে কথাটি। ইচ্ছে করলে শুধু চোখ ঘুরিয়েই বুঝিয়ে দেবে যে 'ইয়ে হচ্ছে ইয়ে।''[৭২]

৩. ব্যঞ্জনায় শরীরী সম্পর্ক গুলি বুঝিয়ে দিতেই তাঁর আগ্রহ অকারণ সস্তা আদি রসের পরিবেশন তিনি করতে চাননি। 'জল কাদা বাঁচিয়ে গিয়ে দাঁড়াল রেলের বুকিং অফিসের সামনে গাড়ি-বারান্দার নিচে। দুপুরবেলা প্রকাশ্য রাস্তার ওপর মানে সেই গাড়ি বারান্দার নিচে। কতকগুলো স্ত্রী পুরুষ শুয়ে ঘুমুচ্ছে। ঐ জায়গাটাই ওদের ঘর বাড়ি। কাজেই শালীনতার প্রশ্ন উঠতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়েছে এবং ঘুমুলে মানুষের হুঁস থকে না।'[৭৩]

৪. অবধূতের রচনার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো গল্পের প্লটে সীমা ছড়িয়ে পড়বেই কাহিনিতে বেশী চরিত্র যদি কখনো কখনো নাও থাকে তবু সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্রে গল্প আবদ্ধ থাকবে না। 'ডঙ্কাদা' গল্পটি কলকাতা কেন্দ্রিক হয়েও তার মধ্যে বাইরের কথা এসেছে নাচের ট্রেনিং নেওয়ার সূত্রে।

বিরাট যে বিশ্ব, সেখানে তাঁর স্বভাবের নিমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি কোথাও আর তা পাঠকের কাছে আরো আকর্ষণের কারণ হয়ে উঠেছে। সিলেট থেকে শুরু হয়ে মূলত কলকাতার জট খুলতে 'কাকবন্ধ্যা' গল্পের নায়ক-নায়িকা চলে এসেছে -শিলং চেরাপুঞ্জি। নিচের ব্যঞ্জিত বর্ণনায় ঊষা এবং প্রশান্তর জীবনের পূর্বাভাষ পাওয়া যায়।দীর্ঘ হলেও তা উদ্ধৃত করা হলো :

''আকাশে পাহাড়ে আলোয় আঁধারে মান অভিমানের খেলা চলে সেখানে। নীলাম্বরী ওড়না জড়িয়ে নি:শব্দে নেমে আসে আকাশ, পাহাড়ের গায়ে গা এলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপটি করে। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে পাহাড়, আবেশে চোখ বুঁজে আসে তার। এমন সময়

ফিস-ফিসিয়ে শুনিয়ে যায় বাতাস তার কানে কানে -ওকে বিশ্বাস কোর না, আবার পালিয়ে যাবে এখনই। শুনে মুখ কালো হয়ে ওঠে পাহাড়ের। থমথম করতে থাকে তার চোখের দৃষ্টি তখন তার ঝাঁকড়া চুলে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে আকাশ। অনেকক্ষণ পরে হাসি ফুটে ওঠে পাহাড়ের মুখে, খুশির আলো ঝলমল করে ওঠে তার চোখে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে যায় আকাশকে। আর সেই মুহূর্তে আকাশ পালিয়ে যায় মুচকি হেসে অনেক-অনেক দূরে -একেবারে ধরা ছোঁয়ার নাগালের বাইরে।'' [৭৪]

---এ বর্ণনায় লেখক অবধূতের কবিসত্তার পরিচয় মেলে।

৫. চরিত্রের মুখে তিনি বেশী কথা দেন নি তাদের আচরণ যেন পাঠকের সামনে দর্শনযোগ্য হয়ে উঠেছে। 'রূপকথার মত' গল্পের নায়িকার ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে মনে পড়ে।

অবধূতের সৃষ্টিলোকের পর্যলোচনায় সবথেকে বড় কথা হলো তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ---'অশ্লীলতা' একেবারেই অবিচার। ছোটগল্পে বরং এ বিষয়ে তাঁর সংযম প্রশংসনীয় স্তরে উঠেছে। 'বহুব্রীহি' -গল্পটিকেই তার দৃষ্টান্ত ভাবা যেতে পারে। তাঁর সম্পর্কে মূল্যায়ন যদি করতেই হয় তাঁর গল্প পাঠে জীবন-সত্যের উপস্থাপনের জন্যে তাঁর সাহসিকতাকে স্বীকার করতেই হবে। তিনি 'কৌল' ছিলেন অর্থাৎ উচ্চ বংশজাত। সে উচ্চতার মাপ তাঁর বীরভাবাত্মক তন্ত্রসাধকের বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে অর্থাৎ ছোটগল্পে ও উপন্যাসে তিনি সাহস সঞ্চার করেছেন। নগ্ন বাস্তব জীবন ও ভিন্ন ধর্মাচারকে সাহসিকতার সাথে পরিবেশন করেছেন। বীভৎস রসের তিনি সার্থক স্রষ্টা। সে রস জোরকৃত নয়,সহজভাবে নিরাসক্ত দৃষ্টির পরিবেশন, তাই পাঠকের বিশ্বাস অর্জনে আজও সমর্থ। তাঁর সরস রসিকতা, আর চিত্রধর্মিতা পাঠককে বাস্তবের অনুভব ঘটাতে সক্ষম এ গুণ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। বেশ কয়েকটি গল্প যেন সিনেমার স্ক্রিপ্ট হয়ে উঠেছে পরিবেশ ও কাহিনি চলচ্ছবির উপযোগী। এ গুণ যে পাঠকের উৎসাহ সঞ্চারী তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

ছোটগল্পে আত্মপ্রক্ষেপ : অবলম্বন 'ক্রীম'

এই গল্পের পটভূমি দিল্লী ও কুরুক্ষেত্র। উত্তম পুরুষের জবানিতে এর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এখানে অবধূতের পথিক সত্তা আর পথের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। গৃহী মানুষ আর রাহী মানুষের মনে একই ঘটনা দুরকম ছাপ ফেলে। এই পার্থক্য তাদের জীবন দর্শনের জন্য। সাধারণ মানুষ মূল্যবান কিছু হারালে তার জন্যে দুঃখিত হয়। ফক্কড়ের জীবন-দর্শন এই সূত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে ফক্কড়-জীবনে সবই স্বল্প, সবই ক্ষণস্থায়ী। পথে কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ পথেই হারিয়ে যাবে- এই হল ফক্কড়-জীবনের আইন। এর জন্যে হা-হুতাশ করে না ফক্কড়, মাথা কুটে মরে না। কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ যত অমূল্যই হোক, তা যত তাড়াতাড়ি খোয়া যায় ততই স্বস্তি। হারিয়ে গেলে মুক্তির আনন্দে ফক্কড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। তারপর পথ তো আছেই। আর যাই

হারাক, ফক্কড় কখনও পথ হারায় না। পথ হারাবার ভয় না থাকায় যখন-তখন যে- কোনও পথে পা দিতে ফক্কড় পিছপা হয় না।

আত্মপ্রক্ষেপ : অবলম্বন 'সেই যখন আমিও তোমাদের মত ছিলাম'

'সেই যখন আমিও তোমাদের মত ছিলাম'গল্পে অবধূত ব্যক্তি মানুষের সম্বন্ধে কথা বলার ঢঙে ছাগল পরিবারের কথা বলেছেন। 'ফুল গাছ ভালবাসত বলে 'ফুলি'---নামটি রেখেছিলেন নন্তুর মা'---মনে হচ্ছে যেন কোনো মেয়ের শৈশবে নাম রাখার কথা বলছেন লেখক-কথক। এরপর লেখক বলেছেন,

> "এক ছেলে আর এক মেয়ে হোল ফুলির। ছেলে মেয়ের নাম রাখলাম আমরা। মেয়েটা ভয়ানক হ্যাংলাপনা করত, খালি খাবার জন্যে ছোঁকছোঁকানি। তাই তার নাম রাখা হোল লালী। জিভ দিয়ে লাল পড়লে লালী ছাড়া আর আর কোন্ নাম রাখা যায়! লালীর ভাই কিন্তু ভয়ানক গম্ভীর আর আর খুব গাঁট্টাগোঁট্টা হোয়ে দাঁড়াল। তার নাম রাখা হোল বটকা। লালী আর বটকা আমাদের সঙ্গে বড় হোতে লাগল। আমরা হোলাম ওদের অভিভাবক। এতটুকু কর্তব্যের ত্রুটি করলাম না আমরা। অভিভাবক হোলেই ভালটা মন্দটা জোটাতে হয়। উঠে পড়ে জোটাতে লাগলাম আমরা।"[৭৫]

ছোটগল্পে অবধূত : বহুব্রীহি গল্পের সাধু

'আর একবার বেশ করে দেখে নিলাম মক্কেলের ঘড়ি বোতাম, এক ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি চওড়া আংটি আর সাজপোশাক। জামাটা গরদের, বোধ হয় কালই পরেছে, দুজায়গায় হলুদের দাগ লেগেছে। অর্থাৎ একটু বেসামাল অবস্থায় মাংস খেয়েছে।চোখের কোলে কালির পোঁচ, ঘাড় থেকে কানের ওপর পর্যন্ত চাঁচা, ব্রহ্মতালুতে এক বোঝা চুল, চুলগুলো রুক্ষ, কিছুতেই সেগুলো যথাস্থানে থাকছে না, নেমে আসছে কপাল ছাপিয়ে চোখের ওপর। পরনের কাপড়খানা জরি পেড়ে...' 'সে তার মামার বাবু স্বভাব পেয়েছে এসেছে জ্যেতিষের কাছে নিজের ভবিষ্যৎ জানতে। বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় তার গোত্র জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায়। গোত্র কি তা বোঝানোর পরে সে বিমর্ষ হয় কেননা তা তার জানা নেই। কিন্তু শুনে এসে যা বলল তা এক হাসির দৃশ্য :

> 'বলুন আপনার গোত্র।'
>
> 'অ্যালুমিনিয়াম,আমাদের গোত্র হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম', বলে বহুব্রীহি সবকটি দাঁত বের করে ফেললে।
>
> অতি কষ্টে হাসি সামলে বললাম---'কে বলে দিল আপনাকে গোত্রটি?'
>
> থতমত খেয়ে ঢোঁক গিলে দু'হাত কচলাতে কচলাতে বহুব্রীহি বললে---'আমার পরিবার। তার সব মনে থাকে কিনা!'

বোঝাই যাচ্ছে অবধূতের অজ্ঞাত জীবনে জ্যেতিষ চর্চা একটি উপার্জনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। অন্তত কপর্দকশূন্য সেই পলায়নপর অবস্থায় সেটা অস্বাভাবিক নয়।(পৃ. ৪,বহুব্রীহি,মিত্র ও ঘোষ, বেথুন লাইব্রেরি)

এই গল্পে লেখক বলেছেন:'যতটা সম্ভব আত্মীয়তার সুর গলায় ঢেলে বললাম, পাকা বরিশালী ভাষায় -কি গো ঠাকরেন, হয়েছে কি? কাঁদছ কেন?'[৭৬] ---লেখক বরিশালী মানুষ এ থেকে কেউ কেউ এ অনুমান করেছেন।

বাগীশ্বরী গল্পে সাধক অবধূতের আত্মপ্রক্ষেপ

বাগীশ্বরী গল্পের আশ্রমবাসী সাধু অসীমানন্দ যাঁকে আবিষ্কার করলেন আমরা মনে করি তিনি অবধূত। তাঁর চেহারা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা থেকে আমরা দেখি :

> "খালি পেট, এমন খালি যে পিঠে পেটে লেগে গেছে। সর্বাঙ্গ ফাটা, এ হেন ফেটেছে যে সাদা জলের মত রস বার হচ্ছে মুখ কপাল আর হাতের চেটো থেকে। দুই চোখের ওপর নিচের পাতায় ঘা, হিমালয়-বাসের জীবন্ত ফল, পিসু পোকার দংশন থেকে যার উৎপত্তি। ঠোঁট দু'খানা ফোলা আর সোনাগোলার মত গায়ের রঙ। সেই বিকট মূর্তির আবরণ মাত্র কৌপীন আর এক চিলতে ন্যাকড়া। এ হেন চমৎকার অবস্থায় আমায় পাকড়াও করে শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দজী মহারাজ সেদিন যখন টাঙ্গায় তুললেন তখন আমার দ্বিধা সংশয় বা ভাবনা চিন্তার না ছিল অবকাশ না ছিল সামর্থ্য।"[৭৭]

সদ্য আগত এ সাধু ভোলেন নি যা এই সাধুকে তাঁর গুরুদেব বলেছিলেন : 'সাবধান বেটা, কখনও হরিদ্বারে বা হৃষিকেশে আটকা পড়িস নে। এ বড় ভীষণ দ', এখানের ঘূর্ণিজলে জাল ছেঁড়া বাঘা মাছেরা জন্মের মত আটকা পড়ে ঘায়েল হয়ে যায়। ওজন দরে ধর্ম বস্তুটার কেনাবেচার এতবড় বাজার ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই।'---এই সতর্ক বাণী মাথায় ছিল বলে আমরা এ গল্পে দেখেছি তিনি অসীমানন্দের এ আশ্রমের দায়িত্ব নিতে চান নি, অস্বীকার করেছিলেন এ প্রস্তাব---যে অসীমানন্দের অবর্তমানে তিনিই হবেন আশ্রম-স্বামী। তখন তিনি যেভাবে চালাবেন সেইভাবেই চলবে আশ্রম।---এ প্রস্তাবকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন।

> "প্রায় চীৎকার করে উঠলাম---টাকা! টাকা নিয়ে করব কি আমি? দেখুন এ সমস্ত চালাকি আমি বুঝি, ও সমস্ত চাল চলবে না আমার সঙ্গে।"[৭৮]

অবধূতের ব্যক্তি জীবনের অনেক কথাই যেন অসীমানন্দের মুখে শোনা যায় :

> "কি ভয়ানক কাণ্ড! এই কিম্ভূত কিমাকার মূর্তি দেখে কার সাধ্য চিনবে। একেবারে ব্যাস বাল্মীকি বনে গেছে মানুষটা। সেই চার পাঁচ বছর আগে দেখেছিলাম কাশীতে। তারপর যতবার কাশী গেছি, খোঁজ করেছি। সবাই বলে পালিয়েছে। কেন পালিয়েছে, তাও কেউ জানে না। বদখত কিছু একটা ঘটিয়ে পালিয়েছে কি না? না তাও নয়। তবে খামকা মানুষটা গা ঢাকা দিতে গেল কেন! তখন

এইরকমই কিছু একটা ধারণা হয়েছিল আমাদের- নিশ্চয়ই কোথাও সাধন-ভজন বা তীর্থ দর্শন করতে গেছে। একি অমানুষিক কাণ্ড! ভগবান রক্ষা করুন- আমার ভগবান দর্শন পাওয়ার দরকার নেই বাবা!"[৭৮]

---এই গল্পেই বলেছেন যে তাঁর কান ঠিক নেই, অবিরাম পাহাড়ী নদীর গোঙানি শুনতে শুনতে কানের দফাও রফা হয়ে গেছে---আর চেহারার কথা তো অসীমানন্দের মুখে শোনা গেল! এঁর সম্পর্কে আশ্রমের জননী শ্রীর কাছে উপস্থিত হয়ে অসীমানন্দ আরো বলেছেন যে হবে না কেন? এঁরা তো আনন্দের তপস্যা করেন না। এঁদের যে দুঃখের তপস্যা-দু:খ নিঙড়ে আনন্দের রস বার করার সাধনা করেন এঁরা। হলাহল মন্থন করেন -অমৃত লাভের আশায়। ফলে একটা সুস্থ সবল মানুষের এই হাল হয়েছে।--- একথা শোনার পরে এবং তাঁকে ক্লিষ্ট অবস্থায় চোখে দেখার যন্ত্রণায় শ্রীর অবস্থা লক্ষ করার মত।

"কোথা থেকে জল এসে গেল সেই আঁখি দুটিতে। আঁখি দুটি ছাপিয়ে সেই জল বড় বড় মুক্তার মত গড়িয়ে নামতে লাগল গাল বেয়ে।"[৭৯]

---কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হল সেই দৃশ্য দেখে,কথক তখন মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।-আমরা বলতে চাই কথকের ভূমিকায় স্বয়ং লেখক অবধূতকে আমরা পেলাম। চতুর্থ অধ্যায়ে অবধূতের ছোটগল্পগুলির বিশ্লেষণ, চরিত্র বিচার এবং রসনির্মিতির স্বরূপ নির্ধারণ করার প্রয়াস আপাতত এখানেই শেষ করা গেলো।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য

১. অবধূত,ক্রীম, ত্রিবেণী প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০, প, ৪৫
২. ঐ, পৃ. ৫৯
৩. ঐ, পৃ. ৭৮
৪. ঐ, পৃ. ১০৯
৫. অবধূত, ক্রীম-ক্র্যাকার, ক্রীম (গল্পগ্রন্থ), ত্রিবেণী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১৪৭
৬. ঐ, পৃ. ১৮২
৭. ঐ, পৃ. ১৭৮
৮. ঐ, পৃ. ১৮২
৯. অবধূত, সেই যখন আমিও তোমাদের মত ছিলাম, নিরাকারের নিয়তি(গল্পগ্রন্থ), ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৬০, পৃ. ২৯
১০. ঐ, পৃ. ৩২

১১. ঐ, পৃ. ৩১
১২. ঐ, পৃ. ৩২
১৩. 'Happiness depends on what you give not what you get.'-M. Gandhi
১৪. অবধূত, বহুব্রীহি(গল্পগ্রন্থ), বহুব্রীহি (গল্প ও চরিত্র) মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৪
১৫. ঐ, পৃ. ৯
১৬. ঐ, পৃ. ১৭
১৭. ঐ, পৃ. ১৯
১৮. ঐ, পৃ. ১৯
১৯. ঐ, পৃ. পৃ-২০
২০ ঐ, পৃ. পৃ-২০
২১. ঐ, পৃ. ২১
২২. ঐ, পৃ. ২২
২৩. Ethical principles, Seth, Part-i, Chap ii, p.154
২৪. Ethical principles, Seth, Part-i, Chap iii, p.201
২৫. অবধূত, কাকবন্ধ্যা, বহুব্রীহি(গল্পগ্রন্থ), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৩০
২৬. ঐ, পৃ. ৪০
২৭. ঐ, পৃ. ২৬
২৮. অবধূত, বহুব্রীহি (গল্পগ্রন্থ),ইজ্জত মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪,পৃ. ১৫৮
২৯. অবধূত, ইজ্জত, বহুব্রীহি, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ১৬০-১৬১
৩০. ঐ, পৃ. ১৬৩
৩১. ঐ, পৃ. ১৬৩
৩২. ঐ, পৃ. ১৫৫
৩৩. ঐ, পৃ. ১৫৭
৩৪. ঐ, পৃ. ১৫৯
৩৫. ঐ, পৃ. ১৬৫
৩৬. অবধূত, বহুব্রীহি(গল্পগ্রন্থ),রূপকথার মত, মিত্র ও ঘোষ,কলকাতা, ১৯৬৪, . পৃ.৪৫
৩৭. ঐ, পৃ. ৪৬
৩৮. ঐ, পৃ. ৪৫
৩৯. ঐ, পৃ. ৪৭
৪০. ঐ, পৃ. ৪৭
৪১. ঐ, পৃ. ৪৯
৪২. ঐ, পৃ. ৬০
৪৩. ঐ, পৃ. ৬০
৪৪. অবধূত, বহুব্রীহি (গল্পগ্রন্থ),বিভ্রম, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ১৪৭
৪৫. ঐ, পৃ. ১৪৮
৪৬. ঐ, পৃ. ১৪৯

৪৭. ঐ, পৃ. ১৪৯
৪৮. ঐ, পৃ. ১৫০
৪৯. ঐ, পৃ. ১৫১
৫০. ঐ, পৃ. ১৫৪
৫১ ঐ, পৃ. ১৫৬
৫২. Quotation taken from Seth's Ethical Principles . P.১৬১
৫৩. অবধূত, বহুব্রীহি (গল্পগ্রন্থ), ডঙ্কাদা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ২২১
৫৪. ঐ, পৃ. ২২২
৫৫. ঐ, পৃ. ২২৩
৫৬. ঐ, পৃ. ২২৪
৫৭. অবধূত, বহুব্রীহি (গল্পগ্রন্থ),নেহাত নাচার, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ১৪২
৫৮. ঐ, পৃ. ১৩৬
৫৯. ঐ, পৃ. ১৩৯
৬০. ঐ, পৃ. ১২৮
৬১. অবধূত, বহুব্রীহি (গল্পগ্রন্থ),অব্যর্থ কবজ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ১৬১
৬২. ঐ, পৃ. ১৭০
৬৩. ঐ, পৃ. ১৭১
৬৪. ঐ, পৃ. ১৭২
৬৫. ঐ, পৃ. ১৭২
৬৬. ঐ, পৃ. ১৭৩
৬৭. ঐ, পৃ. ১৭৩
৬৮. ঐ, পৃ. ১৮০
৬৯. অবধূত, বহুব্রীহি (গল্পগ্রন্থ) মুশকিল, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ১৮৫
৭০. ঐ, পৃ. ১৮৬
৭১. অবধূত,বহুব্রীহি (গল্পগ্রন্থ), কাকবন্ধা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৩২
৭২. ঐ, পৃ. ৩৬
৭৩. ঐ, পৃ. ৩৭
৭৪. ঐ, পৃ. ৩৯
৭৫. অবধূত, নিরাকারের নিয়তি (গল্পগ্রন্থ), সেই যখন আমিও তোমাদের মত ছিলাম, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ.৩১
৭৬. অবধূত, বহুব্রীহি (গল্পগ্রন্থ), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ.১৩
৭৭. অবধূত, বহুব্রীহি, বাগীশ্বরী, মিত্র ও ঘোষ,কলকাতা, ১৯৬৪ পৃ. ৭৫
৭৮. ঐ, পৃ. ৮৯
৭৯. ঐ, পৃ. ৭৬

পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রমণ-সাহিত্যিক দুলাল মুখোপাধ্যায় : ভারতের তীর্থক্ষেত্রের সাক্ষাৎদ্রষ্টা ও রূপদক্ষ শিল্পীর স্বরূপ সন্ধান

	পৃষ্ঠা
এক. বাংলা ভ্রমণসাহিত্য ও অবধূত	৩২৪
দুই. রূপদক্ষ শিল্পীর স্বরূপঃ চরিত্র ও পরিবেশ	৩৩১
তিন. 'হিংলাজের পরে': দেবী আশাপূর্ণার দর্শন লাভ	৩৩৮
চার. ভ্রমণোপন্যাস 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' : বিচিত্র মানুষের কথা	৩৪০
পাঁচ. 'দুর্গম পন্থা' : অলৌকিকতার বাস্তবায়ন	৩৪৪
ছয়. সন্ন্যাস নিয়ে উজ্জয়িনীর সাধু-সঙ্গে	৩৬০
সাত. সন্ন্যাস জীবনে তীর্থভ্রমণে নর্মদার সাধু-সঙ্গ	৩৬২

প ঞ্চ ম অ ধ্যা য়

ভ্রমণ-সাহিত্যিক দুলাল মুখোপাধ্যায় : ভারতের তীর্থক্ষেত্রের সাক্ষাৎদ্রষ্টা ও রূপদক্ষ শিল্পীর স্বরূপ সন্ধান

ভূমিকা

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় ভ্রমণসাহিত্যিক হিসেবে বাংলাসাহিত্যে অবধূতের অবদান কতখানি তার স্বরূপ নির্ধারণ। অবধূত গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো ভ্রমণক্ষেত্র বা ধর্মক্ষেত্র---সর্বত্রই তিনি রূপদক্ষ শিল্পী। শুধু ধর্মপ্রাণতায় বুঁদ হয়ে থাকেননি---সেখানকার রূপ-রস আর পরিবেশ-সুদ্ধ জনজীবনকে তিনি উপন্যাসে তুলে এনেছেন--- সেটাই তাঁর দক্ষতার মাপকাঠি। 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'কলিতীর্থ কালীঘাট' 'সাচ্চা দরবার', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়','দুর্গম পন্থা' ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। ভূপাল-খাণ্ডোয়ানা,প্রয়াগ, জব্বলপুর,কাশী, উত্তরকাশী,লাসবেলা, বালুচিস্তান, করাচী, পশ্চিমসাগর তীরের কোটেশ্বর, পূর্বসাগর তীরের আদিনাথ, কচ্ছের জুনাগড় ইত্যাদি তীর্থস্থানে অবধূত গিয়েছিলেন---তাঁর প্রত্যক্ষতার স্বরূপ সন্ধানও আমাদের লক্ষ্য। এখানকার মানুষ ও তাঁদের জীবনের প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। সাধারণভাবে ভ্রমণসাহিত্যে ভ্রামণিকের যে অপার আনন্দ-উপলব্ধি রূপ পায় অবধূতে তা আমরা কদাচিৎ দেখি। এখানেই তিনি ব্যতিক্রমী। তাঁর প্রধান লক্ষ্য প্রকৃতির স্তব করা নয় তিনি বিভিন্ন প্রকৃতির কোলে নিসর্গ-চালিত বিচিত্র জীবনকে আবিষ্কার করে তার স্বরূপ পাঠককে উপহার দিয়েছেন। এই কাজে রূপদক্ষ শিল্পীর তুলি পাঠকসমাজে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। এই রূপদক্ষতা কবির ব্যঞ্জনায়, ইঙ্গিতে ও সংযমে---অনেক ক্ষেত্রে মৌনতায়। শিল্পী যখন রূপদক্ষ উপস্থাপনায় চরমভাবে সার্থক হন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি মৌন হয়েও মুখর হয়ে ওঠে। অবধূতের বিভিন্ন রচনা বিশ্লেষণ ক'রে আমরা তা দেখাবো। বিশ্লেষণমূলক সেই আলোচনার আগে আমরা বাংলা ভ্রমণসাহিত্য ও ভ্রমণসাহিত্যিকদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। তাহলে অবধূতের স্বকীয়তা ঠিক কোথায় তা বুঝতে পারা যাবে।

ভ্রমণসাহিত্য কথাসাহিত্যের একটি রমণীয় শাখা। কথাসাহিত্য বিষয়ক আলোচনার পথিকৃৎ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী প্রমুখ। সংজ্ঞা নির্ণয়,বৈশিষ্ট্য-বিচার এবং তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বিশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা ভ্রমণ কাহিনির একটি তালিকা দিয়েছেন বনানী চক্রবর্তী[১]। অক্ষয় কুমার নন্দী থেকে হিমানীশ গোস্বামী পর্যন্ত ৭৩ জনের রচনার উল্লেখ করেছেন। বলাবাহুল্য সব লেখকের নাম কিম্বা সব ভ্রমণকাহিনির নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। বাদ গেছে বহু লেখকের নাম এবং বহু ভ্রমণকাহিনির নাম। এখানে উল্লেখিত বাংলা ভ্রমণকাহিনির শ্রেষ্ঠ দুই লেখক হলেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শঙ্কু মহারাজ[২]। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ্য অবশ্যই প্রবোধ কুমার সান্যাল, জলধর সেন প্রমুখ হিমালয়-প্রেমিক এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর মত লেখক যিনি সারাজীবন পর্যটক। এই ধারায় আলোচিত হয়েছেন অবধূত।

এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাকে বাংলা উপন্যাসের পটভূমি করেছেন অনেকেই; সূত্রপাত হয়েছিল সম্ভবত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) হাতে। 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' 'ভারতবর্ষ পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৯ সালে। পরে এটি উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেদের মেয়ে' (১৩২৬) 'কাঞ্চনমালা' (১২৯০) ইত্যাদিরও পটভূমি দেশভ্রমণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাসে হিন্দু বৌদ্ধ যুগে বাংলার নৌবাণিজ্য, বৌদ্ধ বিহার গুলিতে বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুকদের যে গমনাগমন প্রভৃতির বর্ণনা আছে তা অনেকটাই ঐতিহাসিক ব্যাপার। কিন্তু শ্রীকান্তের ভবঘুরে জীবনের তিন-চতুর্থাংশই ব্যক্তি শরৎচন্দ্রেরই ভ্রমণাভিজ্ঞতা। উপন্যাসের শুরু হয়েছে এইভাবে:

> ''আমার এই 'ভবঘুরে'জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় লিখিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।''

বাংলা ভাষায় প্রথম ভ্রমণকাহিনি লেখা হয় পদ্যে ---বিজয়রাম সেন-এর 'তীর্থমঙ্গল' [৩]এটি তীর্থস্থানের খুঁটিনাটি বর্ণনাসমৃদ্ধ একটি তথ্য বা দলিল স্বরূপ। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই রচনাধারা মেনে অধিকাংশ ভ্রমণসাহিত্য সেই স্থানের তথ্যপূর্ণ বর্ণনায় পর্যবসিত। ভ্রমণস্থানের খুঁটিনাটি বর্ণনার এই লক্ষ্য নিয়েই রচিত হয়েছে পরবর্তী কালে বহু ভ্রমণসাহিত্য। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে সচিত্র ভ্রমণকাহিনির স্রষ্টা প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। (১৮৮৫-১৯৭৯) প্রমোদকুমার অত্যন্ত পরিশ্রমী কষ্ট সহিষ্ণু আবেগ-উচ্ছ্বাস বর্জিত এক খাঁটি পর্যটক। প্রমোদবাবুর ভাষা স্বচ্ছ সরল ও সাধুভাষার ছাঁদে গাম্ভীর্যপূর্ণ। হিমালয় সংক্রান্ত রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো 'কৈলাস' ও 'মানস সরোবর'। গ্রন্থ দুটি পাঠ করলে পাঠকের সেখানকার প্রাচীন ইতিহাস, জাতিগত পরিচয়, সমাজ জীবন আহার বিহার, অভ্যাস জীবন জীবিকা পোশাক পরিচ্ছদ মঠ-মন্দির ধর্মসাধনা, কোনো কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। রামানন্দভারতী, অভেদানন্দ বা উমাপ্রসাদের কৈলাস ভ্রমণেও এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ 'টপোগ্রাফি' পাওয়া যায় না। এই ধারাকে ভেঙেছেন অবধূত।

এক. বাংলা ভ্রমণসাহিত্য ও অবধূত

অবধূত একজন সাধক অবশ্যই-তাই ব'লে একথা মনে করার কারণ নেই যে তিনি ধর্মফল লাভ করার জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি পুণ্যার্থী হিসেবে যত না ঘুরেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন জীবনকে দেখার বিষয়ে। অবধূত বলেছেন, যে তীর্থে তীথে তিনি ঘুরে বেড়াতেন স্রেফ স্থানগুলো প্রাণ ভ'রেদেখার আনন্দে। পুণ্যার্থীদের মত পাপ-পুণ্য, লাভ লোকসান এই সমস্ত হিসেব-নিকেশ তাঁর মনের কোণেও উদয় হয়নি কখনও। অবধূত বলেছেন যে এত বড় দেশটা জুড়ে এতগুলো তীর্থ যাঁরা বানিয়ে রেখে গিয়েছেন তাঁদের ওপর তাঁর মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠত। অবধূতের পুলক শিহরিত মনে একথা জেগে উঠেছে যে এদেশে মানুষ আমরণ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে, অজানা অচেনা স্থানে পৌঁছে সেখানকার অত্যদ্ভুত দৃশ্য দেখে বার বার বাকরুদ্ধ হতে পারে কিন্তু তাঁর বিশ্বাস কিছুতেই ফুরোবে না নতুন জায়গায় যাওয়ার রোমাঞ্চ। তাই তাঁর কাছে জীবনে গৃহবন্দী সুখী জীবন অপেক্ষা বিপর্যস্ত রাহী জীবন বেশি সমাদৃত। একজন ভ্রামণিকের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবধূতের এ মানসিকতার সমর্থন মেলে বাইবেলে; সেখানে বিরাট এ পৃথিবীকে জানা মানুষের মহত্তম কাজ ব'লে স্বীকৃত :

> "He that seveth his life shall lose it, and he that loseth his life shall find it.' (Bible) Quotation taken from Seth's Ethical Principles. P.161
>
> 'If the right eye offend thee, pluck it out, and cast from the; for it is better for thee that one of thy members should perish.and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee; for it is profitable for the that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell"[৪]

ভ্রমণোপন্যাস 'মরুতীর্থ হিংলাজ'

ভ্রামণিক দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নানা তীর্থক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। সুদূর লাসবেলা স্টেটে হিঙ্গুলা দেবীর মন্দিরেও গিয়েছেন। করাচী থেকে বালুচিস্তান এর সীমানা পর্যন্ত লাসবেলা স্টেট-এর বিস্তার। তীর্থযাত্রীদের দলে মিশে অবধূত যেভাবে হিংলাজ গিয়েছিলেন সেই অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে লিখেছেন 'মরুতীর্থ হিংলাজ' নামের উপন্যাস। অবধূত ভৈরবী সহ তান্ত্রিকের জীবন যাপন করেছেন। তিনি তাই অবধূত। শক্তিসহ সাধনা করেছেন বলে তিনি অবধূত। বৈষ্ণবাচার্য নিত্যানন্দও ছিলেন অবধূত। যাঁরা শক্তিসহ সাধনা করেন তাঁরা 'অবধূত' নামে পরিচিত। বক্ষমাণ আলোচনায় 'অবধূত' বলতে আমরা কেবল দুলাল মুখোপাধ্যায় বা 'কালিকানন্দ অবধূত'কেই বুঝবো। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপন্যাসটি সাধারণ ভক্তের অন্ধ-বিশ্বাস-নির্ভর লেখা নয়। রূপদক্ষ শিল্পীর তুলিতে এখানে আঁকা হ'য়েছে বিভিন্ন জায়গার বিচিত্র চরিত্রকে। তীর্থক্ষেত্রের পরিবেশ

আর দুর্গম পথ একজন শিল্পীর সরস দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। অবধূত এসব বর্ণনা করতে ব্যর্থ হতেন যদি নিজে সে-সব তীর্থ নিজের চোখে না দেখতেন! নতুন জায়গা খুঁটিনাটি বর্ণনা কারুর পক্ষে করা সম্ভ নয় যদি সে স্বয়ং উপস্থিত থাকে।

উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়েছে করাচী শহরের শেষপ্রান্তের একটি বস্তি থেকে। এখানে নাগনাথের আখড়ার অতি প্রাচীন দালানটার এক কোণে আশ্রয় নিয়েছেন হিংলাজ যাত্রী বেশ কয়েকজন নরনারী। অতি দুর্গম মরুপ্রান্তর পেরিয়ে খুব বেশী মানুষ এই হিংলাজ পীঠ দর্শনে যায় না। কথকের মুখে জানা যায় যে সারা ভারত থেকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রসকষহীন এই তীর্থে যাত্রী প্রায় জোটেই না। প্রাণের মায়া ত্যাগ করার প্রশ্ন আক্ষরিক অর্থেই আছে। কথার কথা নয়। তাই এখানে যদিও বা কেউ আসেন, তিনি হয় লোটা কম্বল ---চিমটা, মাঙকে খানেওয়ালা অথবা বড় জোর একদল কাথীওয়াড়ী চাষী, এদের সম্বল আটা, লবণ, মরিচ ও কম্বল। দুর্গম এই পথে বিস্তর জলকষ্ট, দস্যুভয়, মরুঝড়, ও সূর্যের নির্মম দহনের সাথে আছে খামখেয়ালী নির্জলা মরু প্রকৃতির হাতে বিস্তর মৃত্যু সম্ভাবনা। প্রকৃতির নিয়ম মেনে এই তীর্থ থেকে ফিরে আসতে হয়। আর নিয়ম মানলেই যে বিপদ হবে না-এমনটিও নয়। প্রকৃতির মর্জি কে বোঝে? নির্দিষ্ট সময়ের আগেও অনেকসময় নেমে যায় বর্ষা তখন ফিরতি পথে আটকে যেতে পারে মানুষ।

> "অনেকবার নাকি এমন ঘটেছে যে নদীর জল বৃদ্ধির ফলে দিনের পর দিন আটকে পড়ায় যাত্রীদের আহার্য ফুরিয়ে যায়, তারা আর কখনও ফিরে আসে না। পরের বছর যাঁরা যান তাঁরা এখানে ওখানে বালুর উপর রাশি রাশি শুকনো শুভ্র হাড় দেখতে পান।"[৫]

হিংলাজ মহাপীঠ। এখানে পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল। প্রবাদ আছে রামচন্দ্র রাবণকে হত্যা করার পর ব্রহ্ম হত্যার পাপভাগী হয়েছিলেন, সে পাপস্খালনের বিধান মেনে তাঁকে এখানে আসতে হয়েছিল। উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে যে মোহান্ত ভৈরবী, ছড়িদার রূপলাল, সুখলাল, গুলমহম্মদ, দিল মহম্মদ, জয়শঙ্কর পাণ্ডেজী,পোপটলাল প্রমুখ প্রায় ত্রিশ জন আর খাদ্যবহনকারী দুটি উট আছে তাদের সঙ্গী। পথ নির্দেশক পিতাপুত্র দু-জন আফগান ---গুল মহম্মদ আর দিল মহম্মদ। যাতায়াতে সময় লাগার কথা ৩২ দিন। প্রথামত পাণ্ডাজী সকলকে শপথ করালেন যে মাতা হিঙ্গুলা দর্শন করে ফিরে আসা পর্যন্ত সবাই সন্ন্যাস-ব্রত পালন করবেন। এবং কাউকে হিংসা করবেন না। পাণ্ডার নির্দেশে সবাই গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নিল নিজ নিজ কাপড়, শপথ করলো নিজ নিজ কুঁজোর জল কেউ কাউকে এমন কি স্বামী--স্ত্রী, মা-ছেলেকে পর্যন্ত-দিতে পাবে না। এই নিয়ম ভাঙার অর্থ দুটো জীবনই নষ্ট হওয়া।

ছড়িদারের গুরুত্ব এখানে সর্বাধিক তীর্থ যাত্রীরা তাদের যজমান; তাঁরা এঁদের ভক্তি করবেন, এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন এবং এঁদের সেবা করবেন। ছড়িদার রূপলাল ও সুখলাল কিন্তু খুবই কম বয়সী। এদের দু'জনের বয়স যথাক্রমে ১৭/১৮ বা ১২/১৩ বছর বলে কথকের অনুমান হয়। এদের যে পরিচয় দিয়েছেন লেখক তা এই রকম। ছড়িদাররা দুজন সারা দিনরাত্রে

ছিলিম তিরিশেক গাঁজা খেতে পারে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অশ্রাব্যভাষায় গালাগালি করতে পারে। এদের কাজ হলো সারাদিন হিন্দী ফিলমের গান গাওয়া। যাত্রীরা হতে পারেন জ্ঞানী গুণী কিম্বা বয়স্ক বা বিত্তবান---তবু ছোকরা বয়সী পাণ্ডাদের মান্য করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে, সেবা করতে হবে-তবেই তীর্থফল পাবেন যাত্রীগণ।

সে যাই হোক যাত্রা শুরু হয়েছে খুব সকালেই। এবার আস্তে আস্তে পুব-আকাশে ফুটে উঠছে আলো। দেখা গেলো কাঁটা ভরা বাবলা আর কুলের ডাল খুব প্রিয় উটের। যদিও গালের দুপাশ বেয়ে কাঁটার ঘায়ে রক্ত ঝরছে-তবু বড় আরামেই তারা সেসব চিবিয়ে চলেছে। পথ চলতে চলতে পায়ের কাঁটা বার বার টেনে টেনে বার করছে যাত্রীরা। তবু চলেছে। এখানে সঙ্গছাড়া হলে চলবে না। একবার পিছিয়ে পড়লে আর খুঁজে পাবে না সাথীদের। হারিয়ে যাবে একই রকম দেখতে অন্তহীন ঝোপঝাড় আর বালির টিলার মধ্যে। এ মরুসাগরে পথ হারালে আর দলকে খুঁজে পাবে না। তখন দলছাড়া হয়ে মৃত্যু অনিবার্য। দুপুর হতে না হতে উত্তাপ বেড়ে যায় কুয়াশার মত লাগে। তাতে আবছা হয়ে ক্রমে চারদিক যেন ছোট হয়ে আসে। চার হাত দূরের কিছু দেখা যায় না। প্রথমে মাথার তালু জ্বলতে থাকে। পায়ের তলায় কোনো সাড়া থাকে না। নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। হাঁ-মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে গিয়ে গলা থেকে পেটের ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে ইচ্ছা করে। আবার তাড়াতাড়ি এগোতে গেলে পায়ের গোছ বালিতে পুঁতে যায়---এগোতে পারা যায় না। মানুষের সে অসহায়তা র তুলনা নেই। মরুভূমির এই পথ যেন অন্তহীন! মরুবালুর সমুদ্র! অবধূত এই পথের সাক্ষাৎদ্রষ্টা বলেই এমন খুঁটিনাটি বিষয়গুলি ভুক্তভোগীর চোখ এড়িয়ে যায়নি। ভ্রমণগাইড পড়ে বা কারো মুখে শুনে এ জাতীয় লেখা একেবারেই অসম্ভব।

ধুলো ঝড় আর আকস্মিক বৃষ্টি, প্রখর রৌদ্র আর লুঠেরার হাতে মৃত্যুভয় অতিক্রম ক'রে চোদ্দ দিন চোদ্দ রাত্রির পর সেই গুহামন্দিরে পৌঁছালো দলটি। জয়শঙ্কর পাণ্ডেজীর মত পথেই মারা গেছে যারা তাদের সেখানেই বালির মধ্যে পুঁতে দিতে হয়েছে। অবশিষ্টরা অতি ভোরে যাত্রা করে অঘোর নদীর তীরে পৌঁছালেন। এখানে মন্দিরের মোহান্ত মহারাজকে পূজা দিয়ে মৃত আত্মীয়দের শ্রাদ্ধাদি কর্ম সেরে নদী পার হতে হয়। নদীর এপারে নুড়ি পাথর ওপারে পাহাড়। সেই পাহাড়ের গুহায় দেবী হিংলাজের পীঠ। নদী পেরিয়ে (সাঁতরে বা হেঁটে) কিছু দূর গেলে একটি ঝর্ণা। হিংলাজ মাতার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে সেই ঝর্ণা পেরুলে রক্তকরবীর ঝাড় পেরিয়ে সরু পথ ধরে এগিয়ে কয়েক ধাপ উঠে অন্ধকার গুহা ঘরে মায়ের সাধন পীঠ। সে ঘরে একজন একজন করে ঢুকতে পারবে। উচ্চতা খুবই কম। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। ঢুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। তারপর মায়ের দর্শন করে মহারাজের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়।

এরপর তীর্থযাত্রীরা দেখতে যায় আকাশ গঙ্গা। ফেরার পথে লেখক ভৈরবী এবং কুন্তী তিন জনে দিগভ্রান্ত হয়ে গরম মরুভূমিতে গোলোক ধাঁধার মত ঘুরে মৃতপ্রায় হয়ে যান। মরুভূমিতে সূর্য বড়ো ভয়ংকর! প্রথমে মাথার তালু জ্বালা করতে থাকে, পায়ের তলায় শেষ

পর্যন্ত কোন সাড়ই থাকে না। নিশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়। হাঁ করা মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চলতে থাকে, ফলে গলা থেকে পেটের ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। তখন দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে কোথাও পালানো ভিন্ন অন্য কিছুই মাথায় আসে না। আর তখন সেই হিংস্র বালুর উপর তাড়াতাড়ি এগুতে গেলেই পায়ের গোছ পর্যন্ত বালুতে বসে গিয়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে হয়। সেই অসহায়তার তুলনা কোথায়? জলের তৃষ্ণায় কুন্তী পাগল হয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কেউ জানে না। এইবার নিশ্চয়ই পরিষ্কার জমি দেখতে পাওয়া যাবে এই আশায় সেই ভোর রাত থেকে চোখের দৃষ্টি ছোটবড় নানা বালির টিলা আর ঝোপঝাড়ে অনবরত বাধা পেতে পেতে মেজাজ পর্যন্ত বিগ্‌ড়ে উঠে মানুষ পাগল হয়ে যায়। এভাবে থিরুমলের মত কুন্তীও পাগল হয়ে যায়।

মরুভূমিতে দশ বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি মিষ্টি জলের কূপ মেলে। উটের মালিক সেই জল সকলকে পান করায়। এর জন্য প্রত্যেক যাত্রী উটের মালিক ও কুয়োর মালিককে একটি করে পোড়া রুটি দিয়ে থাকে তাদের এটি প্রাপ্য। মরুভুমির মাছি প্রায় চীনা বাদামের সাইজে। এদের উৎপাতে জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে এরা সংখ্যায় অজস্র। চীনাবাদামের সাথে মাছির তুলনার মাধ্যমে অবধূত অনায়াসে মাছির দুঃসহ অত্যাচারকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কৈশোরে পিতৃ-মাতৃহীন থিরুমল প্রথমে নাচ গান করতো পরে চেয়েছিল বাঈজীর দল করতে। চুরিও সে করত। জ্যোতিষের পথে উপার্জনের চেষ্টাও সে করেছে। এসময় স্বামী হারা কুন্তীকে দেখে সে পাগল হয়ে ওঠে। দেখা গেলো কুন্তীও সে সব ছেড়ে নামে পথে। পালাতে গিয়ে মরুপথে ডাকাতের হাতে সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয় তাদের, ধর্ষিত হয় কুন্তী। তারপরে তারা মরতে মরতে বাঁচে। প্রাণ ফিরে পেয়ে এরা হিংলাজ যাত্রীদের সাথে ভিড়ে যায়। থিরুমল কুন্তীকে নিয়ে আবার পালাতে চাইলে কুন্তী রাজী হয় না। প্রত্যাখ্যানের আঘাতে পাগল হয়ে যায় থিরুমল। লেখক কুন্তী-থিরুমলের সম্পর্ক গড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পথের কষ্ট অবর্ণনীয় । পাণ্ডেজী জয়শঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়লেন থিরুমল তাকে পিঠে নিয়ে চলল শেষে পাণ্ডেজী মরে কাঠ হয়ে থিরুমলের গলায় ঝুলে থাকে। তারপর একদিন শেরদিলের ডেরার কাছে এক ছোট্ট উপত্যকা-ঘেরা ঘন পাহাড়ের শ্রেণির মধ্যে থিরুমল উধাও হয়ে যায়।

এগারো দিন এভাবে চলার পর অভিযাত্রীরা পৌঁছালো চন্দ্রস্বামীর চন্দ্রকূপের পাহাড়ে। চন্দ্রকূপে গলিত কাদার কূপে ধামার মত বড় বড় বুদ বুদ উঠছে। ধোঁয়ায় ভালো করে দেখা যায় না। সেই পাহাড়ে কূপের কাছে স্বীকার করতে হবে---ভ্রূণহত্যা এবং নারী হত্যা---এই দুটি পাপে সে লিপ্ত কিনা। পাপ করেও স্বীকার না করলে বুদবুদ ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সে পাপীকে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া হবে। চন্দ্রস্বামী তাকে হিংলাজ মাতা দর্শনের অনুমতি দিলেন না-এটাই বোঝা যাবে। সুন্দরলাল বাজোরিয়া পাপের কথা গোপন করতেই অগ্নিকুণ্ডের বুদবুদ ওঠা বন্ধ হলো। নিরুপায় সুন্দরলাল বাজোরিয়া কৃত পাপ স্বীকার করে নিলেন অনুমতি মিলল তখন হিংলাজ মাতাকে দেখার। এখানেই অকস্মাৎ দেখা গেল থিরুমলকে। সে সবার বাধা অতিক্রম করে ঝাঁপ দিল ঐ অগ্নিকুণ্ডে। সব হতাশা থেকে সে এভাবে মুক্তি পেল। সংক্ষেপে

উপন্যাসের কাহিনি আমরা জেনে নিলাম।

তীর্থস্থানের সাক্ষাৎদ্রষ্টা হিসেবে অবধূত ওরফে মোহান্ত চন্দ্রকূপ দেবতার পূজা-পদ্ধতি শুনিয়েছেন। চন্দ্রকূপ বাবার পূজার জন্যে আগের রাত্রে ফলাহার করলেন পুণ্যার্থীরা। বাদাম খেজুর আর জল। বাবার জন্যে লোট পোড়ানো হয়। একখানা নতুন কাপড়ের চার কোণ ধরে দাঁড়ালো চারজন। প্রত্যেকে সেই কাপড়ে আধপো ক'রে আটা আর সাধ্যমত চিনি ঘি ঢেলে দিল। অনেকে কিছু কিছু কিশমিশ পেস্তা বাদামও দিলো। এ সমস্ত সকলে আলাদা ক'রে এনেছে চন্দ্রকূপ আর হিংলাজের ভোগের জন্য। নগ্নগাত্রে রূপলাল সেই চারজন লোক আর তাদের ধরা চাদরখানাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলে। এবার চন্দ্রকূপের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে জল দিয়ে সেই সমস্ত জিনিস ঐ চাদরের উপরেই মেখে ফেললে মাটির ওপর মাখা নিষেধ। মাটিতে পড়লেই হবে উচ্ছিষ্ট। তাই এত কড়াকড়ি! ততক্ষণে কুড়িয়ে আনা শুখনো ডালপালাতে আগুন ধরানো হলো। সেই প্রকাণ্ড আটার দলাটা এবার আগুনের ওপর তুলে দেওয়া হলো। সারারাত ধরে আগুন জ্বলবে তারপর নিভবে আর জুড়োবে। ততক্ষণে হবে ভোর। তীর্থযাত্রীরা সকলে সেই আগুনের ধারে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে রইলেন। ভোরে লোটা নিয়ে পূজা দেওয়া হবে চন্দ্রকূপ বাবার। পূজার অন্যান্য উপাচারের মধ্যে আছে নারকেল, গাঁজা কলকে। এক টুকরো লাল সালুও অনেকে নিলে চন্দ্রকূপের মাটি বেঁধে আনবে ঐ কাপড়ে! স্নান দান মন্ত্রপাঠ পিতৃপুরুষের তর্পণ---এসব তীর্থকর্ম পর্বতে ওঠার আগে সেরে নেওয়া হলো। এখানে পণ্ডিত রূপলাল মন্ত্রপাঠ করলেন এবং দক্ষিণা গ্রহণ করলেন।

তারপর শুরু হলো পর্বতারোহণ। অবশেষে চন্দ্রকূপে পৌঁছলেন। মন্ত্র পড়তে পড়তে রূপলাল এক এক চাপড়া ভেঙে নিতে লাগলো সেই পোড়া মস্তবড় আটার ডেলাটার গা থেকে আর ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো চন্দ্রকূপে। সেগুলো তলিয়ে যেতে থাকলো। শেষে নারকেল এবং দশবারোটা কলকেতে গাঁজা ভ'রে ছুঁড়লে কাদার মধ্যে সেগুলোও তলিয়ে গেলো। পাণ্ডার পূজা শেষ হ'লে যাত্রীদের পূজার পালা। দণ্ডখাটা দুজনের আগে পূজা দেওয়ার জন্য হাত ধরে তুলে নিলেন পাণ্ডা রূপলাল। তারা উচ্চৈঃস্বরে একে একে নিজের নাম, বাপের নাম-ইত্যাদি বলে গেলো জোরালো হাওয়ায় আর উত্তেজনার মধ্যে সবকথা কানেও গেলো না। তারপর নারকেল কলকে গাঁজা সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে অর্পণ করলে দেবতাকে। দু-হাত সামনে থেকে কাদা তুলে নিয়ে তাদের কপালময় লেপে দিলো রূপলাল। এরপর ওরা পাণ্ডাকে দক্ষিণা দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। রূপলাল তাদের পিঠ চাপড়ে দিলে। শেষে ওরা নিজেদের হাতে এক এক থাবা কাদা তুলে নিয়ে অন্যপাশে গিয়ে বসলো। একে এক সবাই পূজা দেবে। পোপটলালের পূজা দেওয়া হয়ে গেছে। হঠাৎ বুজকুড়ি উঠছে না। সমস্ত জায়গাটা একেবারে প্রাণহীন নিস্তব্ধ নিথর---যেন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে চন্দ্রকূপ। যেন নীচের আগুন নিভে গেলো আচম্বিতে! সেইসাথে প্রচণ্ড ঝড়ও একেবারে স্তব্ধ! রূপলাল একটি লোকের হাত চেপে ধরেছে। তার চোখে আগুনের হলকা! লোকটা সুন্দরলাল বাজোরিয়া , সে কাথিওয়াড়ের লোক নয়। গোয়ালিয়রের মানুষ। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সী। ওর বাবা রাজকোটে ব্যবসা করে প্রচুর

টাকা আর খানকতক বাড়ি রেখে গেছেন।

সুন্দরলাল পুত্র লাভের জন্য বিয়ে করেছেন গোটা তিনেক। তবু পুত্রলাভ হয়নি। তাই এসেছেন হিংলাজ মায়ের কাছে। বংশ-রক্ষা দূরে থাক এখন নিজের প্রাণ বাঁচানোই সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ালো। তবে সে-কি ভ্রূণ হত্যা বা স্ত্রী হত্যার পাপ করেছে? সে সজ্ঞানে করেনি! তবে কেন বাবা চন্দ্রকূপ নারাজ হলেন তার পূজা নিতে? রূপলাল ঝাঁকিয়ে চললো। উত্তর নেই সুন্দরলালের মুখে। শুধু কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে তার শরীর। বলির পাঁঠার মত অবস্থা! যদি ধাক্কা দিয়ে চন্দ্রকূপে ফেলে দেয় রূপলাল! অবশেষে মোহান্তের প্রশ্নে তার মনে পড়ে গেলো। সে একটি মেয়েকে ভালোবেসে ছিলো। ঘনিষ্ঠ সংসর্গে তার গর্ভ সঞ্চার হয়। সেই অবস্থায় বাজোরিয়ার মা মেয়েটিকে তাড়িয়ে দেয়। আর কোনো খোঁজ তার মেলেনি। তার গর্ভ নষ্ট বা স্ত্রী হত্যা বা দুটোই ঘটেছে তার অজ্ঞাতে। তাই সে পাপ তারই। তখন সুন্দরলাল চন্দ্রকূপের দিকে চেয়ে দু'হাত জোড় ক'রে বলে গেলো সেই মেয়ের নাম আর তার সঙ্গে যা যা ঘটেছিল আগাগোড়া সেই কাহিনি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাক কান নিজের দুহাতে ম'লতে লাগলো। আবার একটি দুটি ক'রে বুজকুড়ি কাটতে আরম্ভ করলো চন্দ্রকূপে। আবার হাওয়া বইতে লাগলো। সুন্দরলালের হাতে নারকেল কল্কে গাঁজা তুলে দিয়ে রূপলাল মন্ত্রপাঠ শুরু করলো। সবাই বাবার জয়ধ্বনি দিতে লাগলো 'জয় বাবা চন্দ্রকূপ স্বামী মহারাজ,জয়!'

এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে অবধূত সুন্দরলাল বাজোরিয়াকে কেন্দ্র করে পাঠককে পোয়েটিক জাস্টিস দিলেন। সে গর্ভাবস্থায় নিজের সন্তানসহ প্রেমাস্পদাকে রক্ষা করতে পারেনি তাই তিনটি বিয়ে করেও বংশধর পায়নি। সে নিঃসন্তান হয়েই আছে। এ উপন্যাসে কুন্তীর পাগল এবং হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাও অনুরূপ দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়। মরুপথে কুন্তীকে ঘাড়ে করে থিরুমল নিয়ে আসছিল। যতক্ষণ তার দম ছিল ততক্ষণ সে তাকে ত্যাগ করেনি। অথচ

কুন্তী মোহান্ত বা ভৈরবীদের সেবায় সুস্থ হয়েই বলেছিল থিরুমল তার কেউ নয়। পরে সেই থিরুমলের জন্যই তাকে মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদতে হয়েছে। থিরুমল তারই দেওয়া আঘাতে পাগল হয়ে হারিয়ে গেছে। অবশেষে সবার অলক্ষে চন্দ্রকূপে এসে যেন কুন্তীকে শাস্তি দিতেই তারই সামনে ওই ভয়ংকর ফুটন্ত কাদার কুপে ঝাঁপ দিয়ে তলিয়ে গেছে। কুন্তীও কূল-কিনারাহীন মরুপথে উন্মাদিনী হয়ে হারিয়ে গেল!

তীর্থ-ভ্রামণিক দলঃ যাত্রা হলো শুরু

এখন চরিত্র ও কাহিনি নির্মাণশৈলীর দিক থেকে উপন্যাসটিকে ফিরে দেখা যাক। যাত্রারম্ভে দেখা যায় নাগ নাথের তৈরী অতি প্রাচীন দালানটিতে পুণ্যার্থীরা জমা হয়েছেন। দু-চারজন করে জমতে জমতে শেষপর্যন্ত যাত্রীদল ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছল গোটা একমাস অপেক্ষা করে। উপন্যাসের ভাষার মধ্যে একটা স্বভাবিক গতি অনুভব করা যায় যেন নিরীহ ভাবে যা ঘটেছে সেটাই শুনছে পাঠক। লেখকের কোনো পরিকল্পনার ছোঁয়া এখানে মেলে না। তাই সন্দেহ হয় না যে এটা বানিয়ে বলা কোনো কথা। অবধূতের লেখার সবথেকে বড় গুণ এর সত্যতা।

এটা ১৩৫৩ এর আষাঢ় মাস। বৃষ্টি নেমে যাবে তাই আর অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। পথের নদীগুলো শুখনো থাকতেই ফিরে আসা চাই। অনেকবার নাকি এমনও ঘটেছে যে নদীর জল বৃদ্ধির ফলে দিনের পর দিন আটকে পড়ায় যাত্রীদলের আহার্য গেছে ফুরিয়ে, তারা আর কখনো ফিরে আসেনি। পরের বছর যাঁরা গেছেন তাঁরা এখানে-ওখানে বালুর ওপর রাশি রাশি শুকনো শুভ্র হাড় দেখতে পেয়েছেন। এভাবে সাধারণ বর্ণনায় অসাধারণ ভীতি সঞ্চারিত হয় পাঠকের মনে।

'ছড়িদারদের তরফ থেকেও এবার যাত্রার তাগিদ দেখা দিল। এখন উটওয়ালা এলেই হয়'[৬] দিনের বেলায় সবাই পাথেয় যোগাড়ে ব্যস্ত থাকেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভগবান দাসের কথা। শেঠ ভগবান দাস সবচেয়ে বড় সোনার ব্যবসায়ী করাচী শহরে। তিনি কলকাতার কালী আর গৌহাটির কামাখ্যা মাকে দর্শন করেছেন। তিনি ব্যবস্থা করলেন তাঁদের হিংলাজ দর্শনের। কামাখ্যার তান্ত্রিক ভৈরব-ভৈরবীর প্রতি তাঁর অটল আস্থা-যদিও তিনি নিজে গোঁড়া জৈন। পোকা খাবার ভয়ে অর্থাৎ পাছে জীবহত্যা হয় এ কারণে সন্ধ্যার পর তিনি জলও পান করেন না।

> "তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একটা আস্ত উট ব্যবস্থা করলেন ভৈরবীর জন্যে। সেই উটের পিঠে উঠল মুখঢাকা টিনে টিনে বোঝাই চীনা বাদাম আখরোট কিশমিশ খেজুর মিছরি আর বস্তা বস্তা চাল আটা লবণ মরিচ আলু পেঁয়াজ। বড় বড় বোম্বাই পেঁয়াজ কেন হিংলাজে চলেছে? শেঠজী আমাদের বোঝালেন, বালুর মধ্যে এই পেঁয়াজ চিবিয়ে খেলে 'লু' লাগবে না। আর পিপাসাও কম পাবে।"[৭]

সহযাত্রী কথকের কথায় ব্যবস্থা এতই দরাজ হাতে হল যে দলসুদ্ধ সবাই এমনকি ছড়িদাররা তাঁকে 'মোহান্ত মহারাজ' বলে ডাকতে শুরু করলে। তারপর বিপুল পরিমাণ লটবহরকে দুই ভাগে ভাগ করে উটের দু-ধারে ঝুলিয়ে দেওয়া হল, তাতে তার পিঠের উপর খানিকটা সমতল স্থান তৈরী হল। তার উপর একটা দড়ির খাটিয়া চিৎ করে পেতে উটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল। শেষে খাটিয়ার পায়া চারটে ঘিরে দড়ি বাঁধা হল। সেই চিৎ-করা খাটিয়ার মধ্যে দড়ি ধরে বসে চললেন ভৈরবী। তাজ্জব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যাওয়া আসার ষোলো দুগুণে বত্রিশ দিন দৈনিক আধঘন্টা হিসাবে সমানে তিনি ঝাঁকি খেলেন। আর সেকি ঝাঁকানি! উট এক কদম চরণ ফেললে ঈশান অগ্নি নৈঋত বায়ু চারকোণে চারবার টাল সামলাতে হয় তাঁকে যিনি উপরে চড়ে বসে থাকেন। কিন্তু কোন অভিযোগের কোন তোয়াক্কা নেই ভৈরবীর। তিনি খুশীমনে সামনের চীনাবাদাম ও খেজুর চিবনোতে মন দিলেন। মনে হচ্ছে এটাই তাঁর কাজ। বলা যায় যা হলো তা একেবারে রাজসিক ব্যাপার।

তীর্থযাত্রীদের লটবহর নিয়ে যাত্রা শুরু হল একদিন বিকেল তিনটের সময়। তার আগে পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা অষ্টপ্রহরে কম করেও অষ্টাশীবার 'উটওয়ালা কবে আসবে' এই এক কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে তীর্থযাত্রীদের নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম হল।

> "এদিকে আমাদের শ্রদ্ধেয় ছড়িদারগণ নির্বিকারভাবে উত্তর দিতেন, কে জানে কবে আসবে, সংবাদ ত দেওয়া হয়েছে ; স্বাধীন মুল্লুকের লোক তারা, সবই

তাদের মেজাজের উপর নির্ভর করে।"[৮]

---যাত্রা শুরু হলো উটের পিঠে। উঠল জনা-প্রতি বত্রিশ সের হিসাবে আটা লবণ মরিচ গুড়। এর পরেও দেখা গেল মরুজাহাজ উর্বশী তথা 'মেয়ের পিঠে উঠলেন সভোজ্য ও সবস্ত্র ভৈরবী।'[৯] এদিকে দল বেঁধে বস্তির মেয়েরা ভৈরবীকে বিদায় দিতে ঘিরে দাঁড়াল। তঁদের দেওয়া মেটে সিঁদুরে তাঁর কপাল লালে লাল। মঙ্গল-সূচক লাল সুতোর গুচ্ছ কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত সকলে বেঁধে দিল। বিদায় দিতে গিয়ে তাঁদের সকলের চক্ষু সজল'।

ত্রিশ জন হিংলাজ যাত্রীর সঙ্গে আরো যুক্ত হলো দুজন উটওয়ালা,দুজন ছড়িদার আর কুন্তী-থিরুমল এই ছয়জন। সাকুল্যে দাঁড়ালো ছত্রিশ জন। সবার নাম উপন্যাসে আসেনি প্রয়োজনও হয়নি উল্লেখ করার। তারা সংখ্যা মাত্র। তবে যাত্রাপথের নানা চরিত্র এ কাহিনিতে কম বেশি স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য চরিত্র গুলি হলো : শেঠ ভগবান দাস, মোহান্ত মহারাজ, ভৈরবী, শেখ গুল মহম্মদ দিল মহম্মদ, শেঠজীর স্ত্রী, কূপওয়ালা/ জলওয়ালা, শ্রী রূপলাল পণ্ডিত (জ্যেষ্ঠ ছড়িওয়ালা), কাথীওয়াড়ী ভাইরা (কুন্তীর সাথে বলাৎকার করেছিল এরা, সুখলাল পণ্ডিত(রূপলাল পণ্ডিতের ছোটভাই), কুন্তী (২৩-২৪ বছর বয়স), পোপটলাল প্যাটেল , শেরদিল, জয়াশঙ্কর পাণ্ডে---প্রমুখ।

দুই. রূপদক্ষ শিল্পীর স্বরূপ:চরিত্র ও পরিবেশ

মরুতীর্থ হিংলাজে রুক্ষ মরুভূমির মত এই যাত্রায় সহযাত্রীরাও যেন অনুরূপ স্বভাবের। অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং কষ্টসহিষ্ণু মানুষ পিতা-পুত্র উভয়েই। গুলমহম্মদ যেমন সৎ তেমনি দীর্ঘ চেহারার সুপুরুষ। উপন্যাসে তার বিনয় আর ধর্মপ্রাণতা আমাদের মুগ্ধ করে। লেখক তাঁর চেহারার বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> "রৌদ্রদগ্ধ সাড়ে ছয় ফুট লম্বা গুলমহম্মদ এককালে রূপবান ছিলেন। পুত্র দিলমহম্মদও লম্বায় সাড়ে ছ ফুট, স্বাস্থ্যও বেশ সুন্দর। রূপ, রং ও মুখ টিপে হাসি সমস্ত মিলিয়ে যেন রূপকথার রাজপুত্র...তাদের মাধুর্যের তুলনা দিতেও আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।" [১০]

একমাত্র বিপদ হচ্ছে ওদের পরিধেয়গুলি বড় দুর্গন্ধ। বৈপরীত্য এনে বিষয়কে সুস্পষ্ট করা অবধূতের অতি প্রিয় কৌশল। এখানেও সেই পথে সার্থক হয়েছেন তিনি।কলকাতার কাবুলিওয়ালা দেখা যায় অনেক---তাই এদের আকৃতি সম্বন্ধে সকলেরই মোটামুটি একটা ধারণা আছে। কিন্তু সাজপোশাকের কদর্য নোংরা অবস্থাটা কল্পনা করা যায় না। এদের প্রকৃতিও অসাধারণ। সহজ সরল মাধুর্যপূর্ণ। সে মাধুর্যের তুলনা নেই। তাদের স্বভাবের বিষয়ে বাক্য ব্যয় না করে বর্ণনা করতে 'সম্পূর্ণ অক্ষম'---এই শব্দ যুগলের ব্যবহারে অবধূত রূপদক্ষ শিল্পী হ'য়ে উঠেছেন। নোংরা কোনো লোকের খুঁটিনাটি বর্ণনা করেননি ব'লে পাঠকের কল্পনার চোখ খুলে গেলো। মস্তিষ্ক সক্রিয় হ'য়ে উঠলো আর তারাও জীবন-অভিজ্ঞতা হাতড়ে তেমন ধরনের নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত মানুষকে বুঝে নিতে পারলো। এক কথায় রূপদক্ষতা হলো অবধূতের সেই

গুণ যার প্রভাবে কোনো কোনো পাঠকের নিষ্ক্রিয় বা অসাড় মন সজাগ হয় । লেখকের পরিশ্রম কমে অথচ উদ্দেশ্য পূর্ণ হ'য়ে যায়।

স্বাধীন দেশের লোক উটওয়ালারা। তীর্থযাত্রীরা যেখানে তীর্থ করতে যাবেন-সেই দেশ লাসবেলা স্টেট। করাচী সীমানা পার হয়ে সেই দেশের আরম্ভ এবং আর তার শেষ বালুচিস্থানের সীমানায়। সেখান থেকে আসবে সেই উট আর উটওয়ালা। লোক গুনে সরকারের খাতায় লিখিয়ে দিয়ে যাত্রীদের ভার নেবে। ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়াও তার দায়িত্ব। রাস্তা সে-ই জানে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ হল, না তা নয়, জানে তার উট অবশেষে একদিন এসে পৌঁছল তারা। সংখ্যায় তারা চারজন। উটের মা ও মেয়ে দু-জন, আর বাপ-ছেলে উটওয়ালা দু-জন। এভাবে সোজা সরল কথায় অবধূত যা দেখেছেন তাই বলেছেন---তাঁর বর্ণনা গুণে তিনি যে সশরীরে উপস্থিত তা অনায়াসে বোঝা যাচ্ছে। শেখ গুলমহম্মদ অর্থাৎ বাপ-মহাশয় বকতে বকতে উপস্থিত হলেন। তাঁর ভয়ানক ক্ষুধা এবং ক্ষুধার তাড়নাতেই এত বয়সে তাঁকে ঘর ছেড়ে এই শক্ত কাজ করতে হচ্ছে। তিনি বলেন :

> ''সবই নসীব! তবে হাঁ,ধর্মপিপাসু 'নানী কী হজ' যাত্রিগণের তিনি নকর,সুতরাং পরপারে বেহেস্তে বাস ঠেকায় কে।'' [১১]

---সেই সাথে তাঁর আশা এবারের যাত্রায় খয়রাৎ যা জুটবে তাতে নিশ্চিন্তে এক বছর ঘরে আরাম করা যাবে। আরও কত কি তিনি বলে যেতে লাগলেন কে তার হিসাব রাখে? ---এই ভাষা কেবল শব্দ নয় পাঠকের চোখে গুল মহম্মদের যেন ছবি আঁকা; পাঠকের নিজের চোখে দেখিয়ে দেওয়া। দৃষ্টিহীনের চক্ষুদানের মত। এখানে অবধূত গুলমহম্মদের মুখের কথাতে তার মনের অন্তরতম কোণটিকেও স্পষ্ট করে তুলেছেন। মরুতীর্থ যাত্রীদের এখন সামনে এই বিষয়টি প্রধান যে বত্রিশ দিন এদের হাতে জীবন মরণ, মান-ইজ্জত ---সবকিছু।

Back Flash পদ্ধতিতে লেখা এ উপন্যাস। আমরা জানি মরুতীর্থ হিংলাজ দর্শনের বত্রিশদিন মরুপথে কাটানোর অভিজ্ঞতায় লেখক বলেছেন :

> ''সেবা করার প্রবৃত্তি উপদেশ শুনে বা বই পড়ে কারো মধ্যে গজায় না। সততা ব্যাপারটা পেনাল কোড ও পুলিশের চোখ রাঙানিতে বেঁচে আছে এও সত্য নয়। ভাল-মন্দ,ন্যায়-অন্যায়-এই সমস্ত প্রশ্নের বাইরে আলাদা আর একটা জগৎ আছে যেখানে নিদারুণ অভাবেও প্রকৃতির নিরাভরণ নিঃস্ব সন্তানেরা দরদওয়ালা বুকের ছাতি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই বুক গুলির মধ্যে একমাত্র প্রেম ও ভালবাসারই রাজত্ব। সেই রাজত্বের রাজা ও রাজপুত্র নির্বিকার চিত্তে আমাদের সকল দায়িত্ব তুলে নিলে।''[১২]

প্রসঙ্গত মনে আসে উপযোগবাদের সমর্থকরা সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণকে 'যথোচিত কাজ' বলতে চান। জেরোবি বেন্থাম, জি. ই. মূর এবং মিল এই মতের সমর্থক। ফ্লেচার এবং স্মার্টও এ মতের সমর্থক। অতএব শেখ গুল মহম্মদ ও পুত্র দিলমহম্মদ যথার্থ কাজেই ব্রতী। এঁদের মহানুভবতার পরিচয় পরে পাওয়া যাবে।

হিংলাজ থেকে আনা একটা গাছের ডাল, দেখতে অনেকটা ত্রিশূলের মত। জিনিসটাকে সিঁদুর মাখিয়ে এক অপূর্ব বিস্ময়কর বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। মুশকিল-আসানদের মত তাতে বিচিত্র কাপড়ের ফালি ঝোলানো। এটি বালির ওপর পুঁতে সর্বপ্রথম এর ভোগ লাগানো হবে। ভোগ লাগানো মানে হচ্ছে এক ছিলিম গাঁজা সেজে এঁকে সসম্ভ্রমে নিবেদন করে ---নিজেরা কষে দম লাগানো। এই ছড়ির প্রসাদাৎ-অর্থাৎ একে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করলে-হিংলাজ -যাত্রীদের যাত্রা হবে নির্বিঘ্ন। হিংলাজ মাতার জয়ধ্বনির সঙ্গে ছড়ি উঠল।

> ''সবিস্ময়ে দেখলাম আমাদের ছড়িদার বা সঙ্গী দু-জনের বয়স একসঙ্গে যোগ দিলে ত্রিশ পার হবে না। অর্থাৎ বড়টি সতেরো বা আঠারো এবং ছোটটি বারো বা তেরোর সীমানা পার হয়নি। ভরসা কোথায়?'' [১৩]

নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু পরিবেশ আর ভাষা যেন অভিন্ন

সাধারণত স্রষ্টার ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য লেখার শৈলীতেই ধরা পড়ে---বিশেষ করে কবিদের ক্ষেত্রে। সাহিত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষা স্রষ্টার শিক্ষা ও সৃষ্টিকুশল সচেতন মনের মিলনেই তৈরী হয়। অবধূতের ভাষা কিন্তু তাঁর শিক্ষা আর মনের সঙ্গতে নির্মিত নয়। মনে হয় যেন সে ভাষা এসেছে সরাসরি পরিবেশ থেকে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলে সে ভাষায় লেখা সম্ভব হয়েছে। অঞ্চল-নির্ভর সে ভাষা যিনিই বলুন না কেন না দেখলে না শুনলে বলতে পারবেন না। আর দেখলে যেন এভাবে ছাড়া অন্যভাবে বলা সম্ভবই হোত না। ঠিক এই কারণে অবধূতের ভাষা এক-এক পরিবেশের কাহিনি বর্ণনায় এক এক রকম। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে চন্দ্রকূপে পূজা পদ্ধতি এভাবে বলতে পারতেন না। যে পরিবেশের কথা উপন্যাসে এসেছে ভাষা নির্মিত হ'য়েছে সেই পরিবেশ থেকেই। অবধূত যেন নিমিত্ত মাত্র। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই ব্যক্তি মন্ময় কাব্যের জগতে ব্যক্তি-নির্দিষ্ট ভাষায় যে ভাব প্রকাশ করেন তাতে ব্যক্তি চিহ্ন থাকে আর ঘটনার বিবৃতিতে ভাষা মোটামুটি ব্যক্তি-সত্তা নিরপেক্ষ হয়ে পরিবেশ নির্ভর হয়ে ওঠে। পরিবেশ-জাত ভাষার এই জীবনীশক্তি অবধূতের লেখায় প্রতিভাত হয়। তাই অবধূতের লেখায় অপরিচিতের উপস্থাপনাতে কোথাও অবিশ্বাস জন্মে না। অনেক সময় নিজের অপরিচিত হলেও অন্যের অভিজ্ঞতা পাঠক বিনা বিচারে গ্রহণ করে। অর্থাৎ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ভাষাই অবধূতের সত্যভাষণ কে সমস্ত পাঠকের কাছে গ্রহণোপযোগি করে তুলেছে। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থের একটি অংশ এখন মনে করতে পারি :

> ''যা দেখলাম তা রূপলালের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। এ-পাড় থেকে ও-পাড় ---মাঝখানের মাপ একশ' হাতের কম নয়---সুডৌল গোল একটি কালো থকথকে কাদার পুকুর। বহু জায়গায় পাড়ের উপর দিয়ে উপচে সেই কাদা গড়িয়ে নামছে নীচে। আর হাঁ--মস্ত মস্ত ধামার মত বুদবুদ হরদম উঠছে সেই কাদায়, সঙ্গে সঙ্গে সাদা বাষ্পও। জীবন্ত, একেবারে ষোল-আনা প্রাণময় এই চন্দ্রকূপ।''[১৪]

এই বর্ণনায় যে ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে তা কি কোনো ব্যক্তি-নির্দিষ্ট? মনে হয় না। আসলে এই পরিবেশ না থাকলে এ ভাষা কখনই কারু লেখায় বেরোতে পারত না।

করাচির প্রান্ত সীমায় হাব নদীর জলে স্নান সেরে সন্ন্যাসীর দল বেরিয়ে পড়লেন হিংলাজের উদ্দেশ্যে। তিনদিন মরুভূমিতে হাঁটার পর এলেন এই বাড়িটায়। অবধূতের দৃষ্টিভঙ্গীর অসাধারণত্ব জড়ের মধ্যে সপ্রাণ মানবধর্মের আরোপে।

নিষ্প্রাণে প্রাণ--- সাহিত্যরসের উৎসার

সাহিত্য-সাধনার একটি বড় গুণ অচেতন পদার্থকে জীবনের সাথে যুক্ত করা ---তা কখনো অনুকূল পরিবেশ কখনো তা প্রতিকূল রূপে দেখা দেয়। মানুষের সম্পর্কে তারা তাৎপর্যে যুক্ত হয়ে যায়। এমন একটি প্রসঙ্গ মনে পড়ে :

> ''নির্বাসন দন্ড যে কত বড় কঠোর শাস্তি, মর্মে মর্মে তা অনুভব করলাম আমাদের আশ্রয়স্থল তিনদিক বন্ধ একদিক-খোলা দালানটির দিকে চেয়ে। সারা দুনিয়ার তাবৎ শহরপল্লীর ছোট-বড় যত ঘরবাড়ি আছে, সকলে মিলে একদা না জানি কোন মহা অপরাধের দরুণ এই দালানটিকে নির্বাসন দেয়, সেই থেকে বেচারা দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশির মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে, কারণ যে কেউ কিছুক্ষণের জন্যেও আশ্রয় নেয় সে-ই পেটের দায়ে এর মধ্যে আগুন জ্বালায়। ...এত বালি চারিদিকে তবু এর অঙ্গে কোথাও ছিটে-ফোঁটাও চুনবালির স্পর্শ নেই।'' [১৫]

---এখানে ঘরটির নিঃসঙ্গতার সাথে সাথে বালির সমুদ্রও এক বিশেষ তাৎপর্যে যুক্ত হয়ে যায়। রূপদক্ষ শিল্পীর মানস-চক্ষু খুলে যায়:

> ''বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা পাকিয়ে বানিয়ে ব্রহ্মা তাঁর দুহাতের কনুই পর্যন্ত মাখা কাদা মাটি পরিষ্কার করবার জন্যে জলের মধ্যে দুহাত ডুবিয়ে বেশকরে ধুয়ে ফেললেন। সেই জলে যে দোলা লাগলো আজ পর্যন্ত তা আর থামলো না।...তাঁর মনে হয়েছে যে একদা এর প্রাণ ছিল সমুদ্রের মত, তখন এও অশান্ত ছিল। হঠাৎ কোনও এক যাদুমন্ত্রে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আজ আর এতে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিখিল বিশ্বের বিরাট প্রাণের স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। আর সেদিন দুপুরে সেই নিষ্প্রাণ স্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে জগৎ জোড়া মৃত্যুর শীতলতার মাঝে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগলাম।'' [১৬]

---সমুদ্রের সঙ্গে তুলনায় মরুর এ বর্ণনা অসাধারণ। এখানে লেখক বলেছেন : 'জীবন ও মৃত্যু এই দুটির কোন্‌টি যে বেশি শক্তিশালী তাই চিন্তা করতে লাগলাম।'[১৭] ---এটি যেন পরবর্তী কাহিনিতে প্রবেশের ভূমিকা। বড় মাপের লেখক কাহিনীর মধ্যে আকস্মিকতাকে প্রশ্রয় দেন না। এর পরই দেখলাম ভয়ংকর মরুভূমিতে থিরুমল ও কুন্তীকে। দুজনেই মরণের অপেক্ষায়! পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না যে কুন্তীর ওপর হয়ে যাওয়া পাশবিক অত্যাচার

আর বাধা দিতে গিয়ে থিরুমলের জীবন-সংশয়---এই দুটি ঘটনার পটভূমি হিসেবে লেখক এমন পরিবেশ রচনা করেছেন। পথ এগিয়ে চলেছে। পাল্টে যাচ্ছে সব কিছু। এ জাতীয় উপন্যাসে তাই ঘন ঘন বদলে যায় পরিবেশ আর পরিস্থিতি। তার ফলে উপন্যাসের ঐক্যসূত্র কেটে যাওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু ভ্রামণিক অবধূত অবলীলায় বিষয়ান্তরে প্রবেশে সমর্থ। যিনি এখনি জীবন ও মৃত্যুর তত্ত্ব নিয়ে ভাবছেন, পরমুহূর্তেই গভীর নির্মম বাস্তবতার কথা লিখতে বসলেন। মরুভূমির দিকে একদৃষ্টে এই ভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে পড়ল :

> "দুহাত দিয়ে চোখ রগড়ে এবার ভালো করে চেয়ে দেখি ---না, কিছুতেই ভুল দেখছি না---নিশ্চয়ই কিছু একটা এগিয়ে আসছে এদিকে। চেয়ে রইলাম মোহাবিষ্ট হয়ে। "[১৮]

লেখকের সংযম : অশ্লীলতার প্রসঙ্গ

কুন্তী মরুর মধ্যে নৃশংসভাবে ধর্ষিতা হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায়। মোহান্ত তথা কথকের চোখে না পড়লে তারা নিশ্চিৎ মারা যেত। কাছের থেকে যেভাবে তাদের দেখা গেল তাতে আমরা লেখকের সংযম লক্ষ করতে পারি। সকলেই ঘিরে দাঁড়াল। অচেতন কাঁধের বোঝা নামাতে দেখা গেল যে গুলমহম্মদ যাকে এনেছে সে পুরুষ এবং মোহান্তের কাঁধে এসেছে একটি নারী। পরিস্থিতি তাদের বুদ্ধি ও মানসিক অবস্থাকে নিঃসাড় করে দিয়েছে -এটা বোঝা যাচ্ছে। কোনো কৌতূহল নেই। নারী-পুরুষ ভেদের কথা মনেও পড়েনি - কেবল দুটি প্রাণকে রক্ষা করার মানবিক তাগিদটুকুই প্রকাশিত। মেয়েটির বয়স তেইশ চব্বিশের বেশি হবে না। রোদে পোড়া ফর্সা রং, হাল্কা ছিপছিপে গড়ন। একটু লম্বা ছাঁদের মুখ, কোনোভাবেই চ্যাপ্টা বা ভোঁতা নয়। চোখ দুটি সে বুজে আছে। মাত্র দু-আঙুল চওড়া কপালে ভ্রূ দুটি পরস্পর ছুঁয়ে আছে।

> "কোঁকড়ানো কালো চুলে বহুদিন বোধহয় চিরুনি ছোঁয়ানো হয়নি। পাতলা ঠোঁট দুখানি একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে। দুই কষ বেয়ে গাঁজলা ভেঙেছে, তার স্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে।"[১৯]

---ভৈরবী অচেতন মেয়েটির ঠোঁটের মধ্যে আঙুল দিয়ে বললেন যে দাঁতে দাঁত লেগে আছে। অর্থাৎ সে অনেকক্ষণ আগে থেকেই অজ্ঞান হয়ে আছে---এখানে এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যে কুন্তীর চেহারা ও অবস্থা সংলাপের মধ্যে ফুটে উঠেছে। পুরুষটাকে ওরা ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে গেল। ভৈরবী আর মোহান্ত মেয়েটাকে তুলতে গেলেন। তার পায়ের দিকে ধরতে গিয়ে ভৈরবী চমকে উঠে ইশারায় তাঁকে দেখালেন। শুভ্র নিটোল পা হাঁটু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, পায়ের পাতার উপর রূপোর চওড়া একটা অলঙ্কার আর হাঁটুর উপর দিয়ে ঘাঘরার নীচে ধেকে পা বেয়ে রক্তের রেখা পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। সেই দিকে চেয়ে শিউরে উঠলেন---এরপর কুন্তীর ওপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের স্বরূপ বোঝালেন কিন্তু কোথাও মাত্রারিক্ত কৌতূহলে সে বর্ণনা মানুষের যন্ত্রণার অতিরিক্ত কৌতূহল সৃষ্টি করেনি। উপস্থিত সকলেই বেদনার সাথে দেখলো---অচেতন মেয়েটিকে :

"ফিরোজা রং-এর ঘাঘরা তার পরনে,তাতেও রক্ত লেগে শুকিয়ে শক্ত হয়ে রয়েছে। সরু কোমরে ঘাঘরাটা যেখানে কষে বাঁধা তার উপরে পেটের চামড়া অনেকটা দেখা যাচ্ছে। গায়ে কমলা রংএর কাঁচুলী জাতীয় জামা, মাত্র বুকের উপরের মাংসপিণ্ড দুটিকে ঢেকে রেখেছে। উপরে আধখানা বুক গলা পর্যন্ত খোলা। মাথার চুলের থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে সন্দেহের অবকাশ রইল না যে হাড় মাংস রক্তে গড়া এই নিখুঁত বস্তুটির উপর লালসা নখদন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে একে নিংড়ে মুচড়ে দ'লে থেঁতলে এই অবস্থা করে দিয়েছে।"[২০]

---কেবল বর্ণনীয় বিষয় নয় চরিত্রগুলির চিত্রণেও সেই রূপদক্ষ শিল্পীকে আমরা অনুভব করি। নিখুঁত ছোঁয়ায় তিনি সিদ্ধহস্ত। এখন আমরা সে পরিচয় নেবো।

পথের পরিচয় : বাৎসল্যময়ী ভৈরবী

সাধারণভাবে আমরা যে-সব উপন্যাস দেখতে পাই সেখানে পাত্র-পাত্রী মোটামুটি ভাবে চেনা পারিবারিক গণ্ডী থেকে আসে। গল্পটাও হয় পরিবার ভিত্তিক। পথের ওপর যে জীবন সেখানে আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ বড় দুর্লভ। তবু দেখা যায় প্রায় ত্রিশজন যাত্রীর নানা সমস্যা ও সহযোগিতার মধ্যে একটা পারিবারিক পরিমণ্ডল এই মরুপথেই নির্মিত হ'য়েছে। ভৈরবী সেখানে মাতৃমূর্তিতে অবতীর্ণ। ব্যক্তিত্বময়ী এই মহিলার চোখে যেন আকাশের আলো আর উপস্থিতিতে পুষ্পের সৌরব। সকলের কাছে তিনি 'মাতাজী'। মোহান্তর জীবন-পথের তিনি বিশ্বাস আর সাধনার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। প্রসঙ্গক্রমে আমরা তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দিতে পারি :

ক. অচেতন কুন্তীকে কাঁধ থেকে নামানোর পর ভৈরবী এক কুঁজো নিয়ে ছুটে এলেন। সন্তানের স্নেহ এখানে প্রকাশিত। মাতৃস্থানীয়া এই মহিলা নিজের বিপদের কথা একেবারেই ভুলে গেলেন। রূপদক্ষ লেখক স্বল্প কথায় দৃশ্যটি উপহার দিয়েছেন। এই চরিত্রের মধ্যে বাৎসল্যময়ী রূপের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল সামান্য অবকাশে :

"আমি আমার পাশের দেহটাকে দেখিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসে পড়ে সেই মহামূল্য শীতল জল, যা কাল পর্যন্ত অতি সাবধানে খরচ করা একান্ত প্রয়োজন, তার সবটুকু অকৃপণ হস্তে তার মাথায় মুখে ঢালতে লাগলেন। যাত্রার পূর্বে হাব নদীর কিনারায় কাকেও একফোঁটা কুঁজোর জল না দেবার সেই প্রতিজ্ঞাটার এইভাবে চরম গতি লাভ হল।"[২১]

খ. কুন্তীর উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের ভয়াবহতা এক মাতৃপ্রাণা রমণীকে নির্বাক করে দিয়েছে :

"ভৈরবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তিনি নির্বাক নিস্পন্দ। তাঁর কপালের উপরে একটা শিরা দাঁড়িয়ে উঠেছে। একহাত ঘাড়ের নীচে আর এক হাত পায়ের

> নীচে দিয়ে মেয়েটাকে তুলে নিলাম, যেমন করে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েকে তোলা হয়।
> ভৈরবী কুঁজোটাকে নিয়ে পিছনে পিছনে এলেন।"[২২]

---অবধূত এই দুর্গম যাত্রাপথের ঘটা কাহিনির মধ্যে চরিত্র, পরিবেশ আর উপস্থাপিত বিষয়ের যে নিপুণ ছবি এঁকেছেন তা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। থিরুমল আর কুন্তী এখন দলের সাথে এক হয়ে চলেছে। তাদের আর বাইরের লোক বলে মনেই হয় না। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে জাত লেখকের হাতে কীভাবে পথের মধ্যে পরিচয় হলো আর পথেই গড়ে উঠলো সম্পর্ক! কুন্তী তো এই দলেই ছিল না। অথচ সবাই তার দঃখে সহমর্মী। একদিন দেখা গেল আঁচলে চোখের জল মুছে কুন্তী উঠে দাঁড়ালো থিরুমলের সামনে। থামলো থিরুমলের বাজনা। যন্ত্রটা থেকে মুখ তুলে কুন্তীর দিকে চেয়ে থিরুমল মধুর হাসি হাসলো। সে হাসি সে দৃষ্টি ইঙ্গিত মুখর, প্রাণময়---তা উন্মাদের অর্থহীন প্রলাপ নয়। কুন্তী মুখ হাত ধুয়ে নিতে বললে। থিরুমলও হারমোনিয়াম ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়ালো। চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এ দলে মিশে তারা কোথায় চলেছে! বিষয়টি বোঝার জন্য একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

> "কেন, তুমি কি ভুলে গেলে নাকি---আমরা হিংলাজ মায়ের দর্শন করতে যাচ্ছি, তোমার মনে পড়ছে না ?'এই বলে কুন্তী---বোধ করি মা হিংলাজের উদ্দেশ্যেই---হাত জোড় করে কপালে ঠেকালে। থিরুমল মাথা হেঁট করে পায়ের দিকে চেয়ে তার রুক্ষ চুলের ভিতর আঙুল চালতে লাগল। কোথায় যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে.খুঁজছে। কুন্তী এগিয়ে এসে তার হাত ধরল, 'চলো এখন, মুখ হাত ধোবে।' শান্ত ছেলেটির মত চলে গেল থিরুমল কুন্তীর সঙ্গে। এক লোটা জল নিয়ে গেল কুন্তী।"[২৩]

কি অসাধারণ নির্ভরতার ছবি যা একটা স্মিত সুখাবেশের জন্ম দেয়। শান্ত সমাহিত সম্পর্কের অনুভব জাগ্রত হয়। ভৈরবী মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে ভাবলেন এবার ছেলেটা বোধহয় হুঁশ ফিরে পাচ্ছে। ---নয় ত মেয়েটার কী গতি হবে বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বলেই তিনি উঠে বসলেন। তাঁর নজর ঘুরে গেল। ওধারে গণ্ডগোলটা বেড়েই চলেছে। কার সঙ্গে কার ঝগড়া হচ্ছে আর কি নিয়েই বা লাগল ঝগড়া? ---পাঠক এই বর্ণনার দৌলতে যেন একটি সিনেমার দৃশ্যই উপভোগ করছিলো---এক বলা যায় রূপদক্ষতা। এখানে পারিবারিক কাঠামোর বাইরে অপরিচিত মানব-মানবীকে সামাজিক-মানবিক সম্পর্কের বাঁধনে অনায়াসে বেঁধে কথাসাহিত্যের রসটুকু পরিবেশন করেছেন অবলীলায়।

এই যাত্রাপথে জল ও জ্বালানীর বড়োই অভাব। জ্বালানীর জন্যেই সকালে হাঙ্গামা বেঁধে গিয়েছিল এখানকার কুয়োওলার সঙ্গে। লোকটিকে প্রেতের মত দেখতে। লম্বায় সাধারণ একটা মানুষের দেড়গুণ হবে তার শরীর, কিন্তু সেই দীর্ঘ শরীর শুধু একখানা শুখনো কোঁচকানো চামড়া ঢাকা একটা প্রকাণ্ড কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নয়। এই লোকটির সাজপোশাক বলতে যা কিছু তা ওর গায়ে ঝোলানো আর মাথায় জড়ানো রয়েছে। অতিজীর্ণ ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো

গুলোর পরিচয় না দেওয়াই ভালো। সরু ফালি ফালি লম্বা ছেঁড়া কতকগুলো ন্যাকড়ার টুকরো যা এককালে হয়ত ওর পাজামাই ছিল---তাই কোমর থেকে ঝুলছে। এই একই অবস্থার একটা কিছু গলায় ঝোলানো আছে---তাতে সামনে পিছনে কিছুই ঢাকা পড়েনি। আর লোকটার মাথায় যা জড়ানো আছে তাকে ন্যাকড়াও বলা চলে না। উপবাসক্লিষ্ট শরীরে সবচেয়ে ভীষণ ওর কোঠরগত চক্ষুর দৃষ্টি। মনে হচ্ছে যেন সে জলজ্যান্ত ক্ষুধা বহুদূর থেকে লম্বা জিহ্বা লক লক করে ছুটে আসছে। তীর্থভ্রমণ কাহিনি হিসেবে মরুতীর্থ হিংলাজ পাঠক সমাজে সুপরিচিত। ভালো করে পড়লে বোঝা যায় জীবনের কথা গভীর ও নিপুণ তাৎপর্যে এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তবে এ উপন্যাসের প্রকৃতি আলাদা। চরিত্র গুলি যাত্রা পথের মাঝে দেখা দিয়ে সরে যাচ্ছে ব'লে সাধারণ উপন্যাসের পাঠক অভ্যস্থ বিশ্লেষণের অভাব এখানে অনুভব করেন। সমালোচকের মূল্যায়ন তাই যথার্থ :

> ''সাধারণ প্রচলিত ভ্রমণকাহিনী বর্ণনার পথ অবধূত ত্যাগ করে গল্প লেখকের পথকেই অনেকখানি অনুসরণ করেছেন। অনেক গুলি চরিত্র নিয়ে লেখক হিংলাজ তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছেন। পথের বর্ণনা, খাবার কষ্ট, জলকষ্ট, মরুঝড়, দস্যু, চন্দ্রকূপ প্রভৃতি ভ্রমণ অভিজ্ঞতার উপাদান স্বরূপ যেমন পাই, তেমনি থ্রিলিং, খুন, প্রণয়, সতীত্বনাশ প্রভৃতি হিন্দী সিনেমার মতো ঘটনা কাহিনীর অবতারণাও আছে।''[২৪]

এখানেও নানা চরিত্রের ভিড়ে কখন যেন ভ্রমণকাহিনী চাপা পড়ে গেছে। থিরুমল, -কুন্তী, মহান্ত-ভৈরবী, রূপলাল, সুখলাল, পোপটলাল প্রমুখ ছোট বড় চরিত্রের দিকে মনোযোগ চলে আসাতে ভ্রমণের কথাটা গৌণ হয়ে গেছে। অবশ্য তা যদি না হত, তবে একটানা ভ্রমণকাহিনি ক্লান্তিকর লাগত। যাহোক যদি আমরা এর গোত্র নির্ণয় করতে চাই তবে একে ভ্রমণোপন্যাস বলাই সঙ্গত।

তিন. হিংলাজের পরেঃ দেবী আশাপূর্ণার দর্শন লাভ

হিংলাজের পরে' উপন্যাসটির মূল বিষয় হলো সমুদ্রপথে করাচী থেকে কোটেশ্বর যাত্রা। সেখানে পৌঁছে আশাপূর্ণাদেবীর মঠে কিছুদিন কাটানো এবং নানা অভিজ্ঞতার অর্জন। এই উপন্যাসেই ১৮২ পৃষ্ঠায় অবধূত বলেছেন তাঁর লেখক হয়ে ওঠার গল্প। এখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ও পরামর্শের কথা ইঙ্গিতে জানিয়েছেন। এই উপন্যাসে দেখি আরব সাগরে চলেছে যে নৌকাটি তাতে মাঝি-মাল্লা সহ উপস্থিত আছেন ক্যাপ্টেন ও যাত্রীরা। মাঝির নাম জমশেদ সাহেব, জমশেদের বাবাও দুঃসাহসী মাঝি ছিলেন। তাঁর নাম জহিরুদ্দিন। তিনি এক মহিলার ফাঁদে পড়ে সব হারান । এই মহিলা একজন ফিরিঙ্গি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পথে জল থেকে এঁকে বাঁচান জহিরুদ্দিন। নিজে আপত্তি করেছিলেন সমুদ্রে তাকে সাথে নিতে,কিন্তু ব্যর্থ হন তার জেদের কাছে। ঘটে বিপর্যয়। সর্বস্ব হারিয়ে এখন তিনি মালয়ের পথে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করেন।

আরব সাগরের বুকে এই যাত্রায় অন্যান্যদের সাধারণ যাত্রী ছাড়াও কথকের সঙ্গী আছেন কৈকেয়ীনন্দন মিশ্র বা মিশিরজী,পরমানন্দজী, পার্সী দুজন---দম্পতি : আদমজী পদম ভাই ও তাঁর স্ত্রী। পরমানন্দজী প্রসঙ্গে জানা যায় যে ---এঁরা কচ্ছের মহারাজের ইষ্টদেবী আশাপূর্ণার সেবায় সাত পুরুষ ধরে নিযুক্ত। এঁর ছেলের নাম ভূমানন্দজী। তাঁর পরে সে রাজ পুরোহিত হবে। কচ্ছে পৌঁছে বিপন্ন কথকের পরিচয় হলো মেষপালক নাথুরামজীর সাথে। তিনি ও তাঁর পুত্রেরা কথকের বিপদে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁর পুত্র যদি দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে আশাপূর্ণা দেবীর মঠে না যেতেন তবে ধ্রুব মহারাজ তাঁদের বাঁচাতে পারতেন না।

আশাপূর্ণাদেবীর মঠে ধ্রুব মহারাজ অস্ত্রাগার পাহারা এবং ডাকাত ধরার জন্য একটা গোটা বাহিনীকে দেখভাল করেন। এঁরা যেমন শক্তিমান তেমনি সাহসী অন্যায়কারীদের মায়ের নামে বলি চড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন। অসহায় মানুষের বিপদে এঁরা সর্বদা আত্মবলি দিতে প্রস্তুত। এই মন্দিরের রাজপুরোহিত পরমানন্দজী। তিনি আসার সময়ে কথকের সঙ্গী ছিলেন। তাঁরই আন্তরিক সৌজন্যে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে কথক আশাপূর্ণা দেবীর মন্দিরে যান পরমানন্দজীর সাথে । ব্রাহ্ম মুহূর্তে পরমানন্দজীর কৃপায় জ্যোর্তিময়ী রূপে মায়ের দর্শন হয়। সেবারের তীর্থযাত্রা শেষ হয় জুনাগড়ে। কাথিওয়াড় বা জুনাগড়ে সেবার ন'দিন ছিলেন।

উপন্যাসটির গঠনকৌশল স্বতন্ত্র ধরনের। উপন্যাসে নানা অপরিচিত মানুষের সহাবস্থান ঘটেছে। এক এক জন এক এক রকমের গল্প শুনিয়েছেন। এইভাবে তিনটি কাহিনি এ উপন্যাসে এসেছে। এ প্রসঙ্গে 'টপ্পাঠুংরি'-র কথা মনে পড়ে। কবি স্বভাবের জমশের মুখে শোনান পূর্ব বাংলার কন্যা রিহান খাতুন ওরফে রিহানুদ্দিন এর সাথে রোমাঞ্চকর প্রেম। রিহানের বাবা ফরিদুদ্দিন কর্তৃক বিক্রী করে দেওয়া এবং তার বিরহে জমশেদের সারা পৃথিবী খুঁজে ফেরার গল্প তিনি শুনিয়েছেন। দ্বিতীয় কাহিনি ইরানী মেয়ের। এটি পার্শী দম্পতির ছেলে চুরি যাওয়ার গল্প। ইরাণী মেয়েদের ভয়ংকর স্বভাব আর দুঃসাসিক কাজের নমুনা এ গল্পে আছে। তৃতীয় কাহিনিটিতে আশাপূর্ণা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কচ্ছে পৌঁছে আশাপূর্ণা দেবীর সন্ন্যাসীদের কার্যকলাপ, কচ্ছের আদিবাসিন্দাদের জীবন জীবিকা প্রভৃতি প্রসঙ্গ এ উপন্যাসের কাহিনীকে নানা রকম কৌতূহল বজায় রেখে শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। আশাপূর্ণা ব্যাঘ্রবাহিনী দেবী। ইনি একটি গুলবাঘের মৃত্যুতে রাজাকে নির্দেশ দেন একশ' আটটি নর বলি দেওয়ার জন্য। এসব এখন কিংবদন্তী ---আড়াই শত বছর আগের কথা। বর্তমানেও বলি হয়। ডাকাত ধরা পড়লে এখানে উৎসর্গ করে দেওয়া হয়। ধ্রুব মহারাজ সেকথা নিজের অভিজ্ঞতার থেকেই কথককে শোনান।

এ ছাড়া ভ্রমণসাহিত্যের ছোটখাঁটো বিষয় হিসেবে এসেছে:সমুদ্রপথে নৌকায় বসে রাশি রাশি মাছ ধরা, মাছ ভাজা এবং নানা রকম বিপদের কথা ---ইত্যাদি। সমুদ্রের বুকে ভয়ঙ্কর ঝড় -বৃষ্টি, বিশাল জলস্তম্ভ হওয়া, বোম্বেটেদের লুঠের ভয়, ডাকাতের হাতে পড়ার ভয়, ঝড়ের বেড়ে উড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে নৌকার ছোট খোলে সেঁধিয়ে পড়া, ভার কমাতে নৌকার খোলের বালি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা, গভীর রাতে চরাপড়া সমুদ্রে গুণ টেনে নিয়ে যাওয়া

---ইত্যাদি শ্বাসরোধী কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ভ্রমণপিপাসু মানুষের কৌতূহলের ক্ষেত্রে তার মূল্য অনস্বীকার্য। পরিবেশ, মানুষ অনুসারে ভাষার ব্যবহার, কথার ধরণ ---সব মিলিয়ে ভ্রমণকাহিনী হিসেবে তো বটেই উপন্যাস হিসেবেও মূল্যবান।

চার. ভ্রমণোপন্যাস 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' : বিচিত্র মানুষের কথা

'নীলকণ্ঠ হিমালয় '(১৯৬৬) নাম শুনেই মনে হবে বুঝি এটি হিমালয়-ভ্রমণের কাহিনি। গ্রন্থটি পড়লে দেখা যাবে শুধু ভ্রমণ কাহিনি নয় আসলে এটি হিমালয়ের সাধু-সন্নাসীদের জীবনচর্যা, তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতার গল্পই শোনাতে চেয়েছেন। ভ্রমণসাহিত্যিক অবধূত মানুষকে চিনেছেন মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে। কথাসাহিত্যিক যখন নিজে সাধক তখন এ গুণটি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শরৎ-মূল্যায়নে অবধূতের এই দৃষ্টির প্রশংসা করেছেন বারিদবরণ ঘোষ। এ বিষয়ে'অবধূত শতবর্ষ সংকলন'-র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

নীলকণ্ঠ হিমালয়' অবধূতের লেখা একটি অসাধারণ ভ্রমণোপন্যাস। উপন্যাস' এই প্রকরণটি সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় পৌঁছাতে প্রায় সকলেই অক্ষম। সকলের এ বিষয়ে সহমত পোষণ না করার কারণ হল এর বহুবিচিত্র সত্তা। মানতেই হয়, নির্দিষ্টভাবে উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কঠিন। রসজ্ঞ পাঠক মাত্রই উপন্যাস সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন এমনই এক আশ্চর্য বিষয় এটি। এর বৈচিত্র্য তাই বিস্ময়কর। উপন্যাসের মধ্যে যে একটা জীবনদর্শন ফুটে ওঠে এ বিষয়ে কারোরই কোনো সন্দেহ নেই। উপন্যাস-লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য বিশেষ গুরুত্ব পায়। হিমালয়কে নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়েছে বিস্তর। বহু উপন্যাসে টোপোগ্রাফি এমন নিখুঁত যে যে-কেউ হিমালয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন সে বই পড়ে। হিমালয়ের উপর এত বই লেখা হয়েছে যে প্রায় আর কিছু হিমালয় সম্পর্কে জানাবার কিছু বাকি নেই বললেই হয়। অবকধূত রচিত 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' সে গোত্রভুক্ত নয়। অবশ্যই নর-নারী জীবন-অন্বেষার জন্য ব্যতিক্রমী।

চিত্তেশ্বরী মন্দিরের সাধু : অবধূতের ভূত-ভবিষ্যৎ

'নীলকণ্ঠ' হিমালয়' উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই যে অবধূত তিনবছর ধরে হিমালয়ের বিভিন্ন এলাকাতে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে গেছেন। সেই অভিজ্ঞতা গুলোই লিপিবদ্ধ করেছেন-তবে সে কাজটি ডায়েরির মতো তারিখ আর স্থান মিলিয়ে লেখেন নি। সেটা সম্ভবও ছিল না। ধরুণ যখন এটা লিখছেন আর যখন হিমালয়ের মধ্যে তিনি কাটাচ্ছেন এই দুটি সময়ের মধ্যে প্রায় ত্রিশ বছরের ব্যবধান। কখনো ত্রিশ বলেছেন, কখনো বলেছেন বত্রিশ। স্বভাবতই সেটা হয়। তিন বছর ধরে যখন ঘটনাগুলো ঘটছে-তখন তো আর লেখেননি, লিখেছেন ত্রিশ বছর বাদে। তাই স্বভাবতই কোন ঘটনা লেখার সময় থেকে ত্রিশ বছরের আগে মনে হবে, কোনটা মনে হবে বত্রিশ বছর আগের---এ হতেই পারে।

এখানে দেখা গেছে যে কথক সন্ন্যাস নিয়ে হিমালয়ে যাবেন সেটা আগে থেকেই ভবিষ্যৎ বাণী করা ছিল। চিত্তেশ্বরী মন্দিরের এক সন্ন্যাসী সে ভবিষ্যৎ-এর কথা বলে দিয়েছিলেন। সুবাসী দিদির সামনে সেই সন্ন্যাসী যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তখন স্বাভাবিক ভাবে তিনি বিশ্বাসই করেননি কিন্তু তিনি সত্যিই হিমালয়ে কাটালেন তিনটি বছর। তিনটি বছর যে কাটালেন তা-কি সোজা ভাবে ? তিনটি বড়ো বড়ো ব্রত কাঁধে নিয়ে তিনি হিমালয়ে কাটিয়েছিলেন।

- তিনটি বছর মৌনী ব্রত অবলম্বন করলেন। খাবারের বিষয়ে বা খিদের ব্যাপারে অর্থাৎ জীবন-ধরণের জন্য কোনো বিষয়ে ইঙ্গিত পর্যন্ত করতে পারবেন না। কথা তো নয়-ই -এই ব্রতের নাম মৌনী ব্রত।
- সেই সাথে অজগর বৃত্তি ও পঞ্ছী বৃত্তি। অজগর সাপ নিজের শিকার নিজে সন্ধান করে না। যে সন্ন্যাসী ভিক্ষা করেন না যা জোটে তাই খান---তিনি এই ব্রতধারী। খাবার জোগাড় করতে নিজে চেষ্টা করবেন না -এই ব্রতের এটাই নিয়ম।
- পাখি যেমন নিজের খাবার জমা করে না, তেমনি বেশি খাবার কেউ দিলেও দিনের টুকু নিয়ে সবটাই বিলিয়ে দিতে হবে। পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করতে পারবেন না। এই নিয়ম পালন করতে হয় পঞ্ছীব্রত ধারীকে।

কথক তাঁর জীবনের শুরুতে যা ঘটেছিল তা আমাদের শুনিয়েছেন। ধনঞ্জয় সোম কীভাবে নেড়া সোম বা নুলো সোম হোল তার ইতিহাস জানা গেছে এই সূত্রে বোমা বাঁধতে গিয়ে সে মরতে বসেছিল। সেই খবর নিয়ে এসেছিলেন প্রফেসর। ইনি হিমনোটাইজ করতে পারতেন। প্রেতাবেশ ঘটাতে পারতেন। এঁর কাছে এসে দেখেছিলেন চোখ বাঁধা অবস্থায় কীভাবে শব্দ শুনে তীর বিদ্ধ করা যায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। সুবাসী দিদির বাড়িতে তিনি ভাড়া থাকতেন পরে এঁর সাথে মনোমালিন্য হওয়াতে সুবাসী দিদি কথককে নিয়ে আসেন চিত্তেশ্বরী মন্দিরে। বোঝা যাচ্ছে কৈশোর বয়স থেকেই বাধাবন্ধন হীন চলাতে তিনি অভ্যস্থ ছিলেন।এ জীবনের কথা না জানলে কথকের জীবনের পূর্বপর সামঞ্জস্য হারিয়ে যেত। অবধূত যে যথার্থ লেখক ছিলেন কথক চরিত্রের এই ক্রমবিবর্তনটি তারই পরিচয় বহন করছে।

ভ্রামণিক জীবনের যেসব অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানতে তাতে হিমালয় মূল লক্ষ্য নয় তবে গুরুত্বপূর্ণ আধার অবশ্যই।তা উপন্যাসটিতে বিভিন্ন মানুষের জীবনকথাই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন প্রথমেই আমরা জানতে পেরেছি মালবারের ছেলে তার নাম ছিল নারায়ণ স্বামী, কান ফাটা নারায়ণ স্বামী বলা হতো তাকে, সে ভালো করে হিন্দী বলতে পারতো না এবং তার বয়স কুড়ি পার হয়নি, তার জীবনে একটা ঘটনা ঘটে।

ঘটনাটা হচ্ছে গোরখপুরে এক শেঠ হরিণের চামড়া দেওয়া শুরু করে, সেই হরিণের চামড়া সে চায় কিন্তু সে পায়নি, অভিমান করে বসেছিল। সেই বাচ্চাটিকে আবার দেড় বছর পর কেদারের কাছে এক চটিওয়ালার দরজায় পড়ে থাকতে দেখেন অবধূত। তার গা ময় ঘা, মুখের উপর মাছি ভ্যানভ্যান করছে, দুই চোখে বরফের চাহনি। চটিওয়ালার কাছে জানলে বুঝতে পারলেন যে, একটা দারুণ অত্যাচার তার উপর হয়ে গেছে নাগা সাধুদের দ্বারা।

'নীলকণ্ঠ হিমালয়'-এর ১৭১ পৃষ্ঠায় তার বর্ণনা আছে। এখানে অবধূত সংযতবাক। রূপদক্ষ শিল্পী রূপময় করতে কেবল ভাষার সাহায্য নেন না---ব্যঞ্জনার সাহায্যে অব্যক্ত ভাষায় পাঠকের মনে সঞ্চার করে দেন এখানে তা ঘটেছে। পাঠকের মন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওঠে। পাঠক বুঝে যান কথকের মত করে।

> 'বলবার দরকারও ছিল না। বুঝতে পারলাম, যারা নাগা হয়ে ইন্দ্রিয় জয় করার সাধনা করেন তারা ওর তাজা দেহটা পেয়ে জোর্‌সে তপস্যা চালিয়েছিলেন। সেই বিষ্ঠা কানফাটা নারায়ণ স্বামী হজম করতে পারেনি।'

এবং তার পরেই অবধূত মন্তব্য করছেন বিষ আগাগোড়া সবটুকু ঢালা হয় এবং এইজন্যই যেন হিমালয় নীলকণ্ঠ হয়ে গেছে এবং এই সমস্ত অনাচার সেখানে হয় বলেই যেন নীলকণ্ঠের কিরীট চিরতুষারমণ্ডিত কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন। এরপর আমরা দেখছি যে স্মৃতিচারণা করছেন অবধূত। ছত্রিশ বছর আগের এক সন্ধ্যায় চিত্তেশ্বরী মন্দিরে উনি সর্বপ্রথম জানতে পেরেছিলেন যে নীলকণ্ঠের সঙ্গে তার পরিচয় হবে। সেই পরিচয়টা হবে মর্মান্তিক ধরনের এবং তখন তিনি বিশ্বাস করেননি কিন্তু একসময় তা সত্যি হলো। হিমালয় ভ্রমণ কীভাবে হয়েছিল সেটা তাঁর স্মরণে আছে। 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসে উত্তর কাশীতে কালীবাড়িতে মা আনন্দময়ী তার বাক্‌শক্তি হরণ করে নিয়ে কানে কানে বলে দিয়েছিলেন 'চোখ চেয়ে দেখবি, কান পেতে শুনবি আর বুদ্ধি দিয়ে বুঝবি জিভ বার করে দাঁত কামড়ে থাকলে কি কেউ কিছু বলতে পারে রে তাই তোর মা জিভ বার করে দাঁত কামড়ে রয়েছে। ঐরকমটাই করে দিলুম। যা ঘুরে বেড়াগে যা। যাকে খুঁজছিস এইবার সে ধরা দেবে।'---সেকথা আমরা পরে আরও জানতে পারব বিশদে এরপর আমরা দেখছি যে ন্যাড়া সোমের কথা আসছে।

ন্যাড়াসোমের সঙ্গে তার ছোটবেলার পরিচয়। ন্যাড়া আর নুলো এই দুরকম হওয়ার কারণ হচ্ছে, একটা সময় তারা বোমা বাঁধতে গিয়েছিল এবং বোমা বাঁধতে গিয়ে দুজন দুটো কাজ করছিলো। ন্যাড়ার নাম তখন 'ধনঞ্জয় সোম'ই ছিলে। ধনঞ্জয় সোম বা ধনা সোম পাট পাকিয়ে বাঁধছে, হাত দুখানা রয়েছে একটা গামলার ওপর। গামলা ভর্তি মেথিলেটের স্পিরিট। হাবুল আর হাবি একটা মগে করে সেই স্পিরিট তুলে ওর হাতের ওপর ঢালছে, বাঁধা হয়ে যাওয়ার পর বড়ো জোর মিনিট পনেরো লাগবে স্পিরিটটুকু উব্‌তে তখন আলতো করে মালটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বোমাটি ফেটে যাবে।

এটা হয়েছিল ভূত চতুর্দশীর দিন। মল্লিকদের পোড়ো আস্তাবলের ভিতরে এই মাল বানানো চলছিলো এবং সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'-এর ১৭৩ পৃষ্ঠায় তার বর্ণনা আছে।

> ''গিয়ে দেখি একদম পরিষ্কার। আস্তাবলটাই উড়ে গেছে পেছনেই একটা বেলগাছ ছিলো তার প্রায় অর্ধেকটা সাবা। ইঁট, সুড়কি, কড়িবরগা সরিয়ে ওদের বার করা হলো। হাবিটার মুখ মাথার অর্ধেকটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ধনার বাঁ হাতের কব্জির নীচে থেকে উধাও হয়েছে দেখা গেল।''

---সে যাই হোক এইভাবে যে ছেলেটি নুলো হয়ে গেল সে কিন্তু থেমে থাকলো না সে-ই প্রথম এসে একটা নতুন খবর দিলো, প্রোফেসর মজুমদার 'আর্চার হিপনোটিস' ইনি ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ থেকে বিস্তর উপাধি পেয়েছে এবং তার কাছেই এরা গিয়ে হাজির হলো। ভদ্রলোকের চেহারার বর্ণনা আছে---একটু বেঁটেখাটো শক্তগোছের মানুষ, দুটো চোখ অস্বাভাবিক সাদা - ইনিই প্রোফেসর মজুমদার এবং এর চোখের তারা যে দুটো আছে তা মনেই হয় না। প্রথম দিনেই তাঁর অসাধারণ শক্তি দেখালেন। শব্দ ভেদি বাণ পঁচিশ হাত সামনে থেকে ধনুক বাণ নিয়ে একটি টুলের উপর বসলেন একখানা বড় রুমাল নিয়ে তার চোখ বেঁধে দেওয়া হল, দুটো কান খোলা আছে, তিনি ঘন্টা গুলোর দিকে পেছন ঘুরে বসলেন তারপর ১ ২ ৩ করে যখনই নেড়া ঘন্টার গায়ে বাড়ি মারছে প্রফেসর চোখ বাঁধা অবস্থায় বাণটা ছাড়ছে এবং পরপর ১ ২ ৩ ৪ ৫ পাঁচটা বাণ লক্ষ্যভেদ করছে এটা দেখল।

তার পরে আবার প্রফেসার হিপনোটজিমের খেলা দেখালেন। দমদমের এক বাগান বাড়িতে সেখানে দেখা গেল একজন রায়বাহাদুরকে তিনি হিপনোটাইজ করেছেন এবং তাঁকে বলছেন 'চড়ে বসুন আপনার ঘোড়ার উপর . আপনি খুব ভালো ঘোড়া চড়েন আর দেখান আপনার ঘোড়া চড়ার কায়দা বলে তাকিয়ার একমাথার দড়ি খুলে তার হাতে দিলেন এবং তখন অবস্থা খুবই খারাপ মোসাহেবরা হুজুরের কাণ্ড দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে এবং তিনি তখন এতটাই হিপনোটাইজ্ড হয়ে আছেন যে তাকিয়ার দুপাশে দু পা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসে হোতকা রায়বাহাদুর তাকিয়ার দড়ি দুহাতে ধরে 'হেট হেট' করে ঘোড়া হাঁকাতে শুরু করেন। এরপরে প্রেতাবেশ বিষয়টা শিখলেন দেখা গেল এই প্রেতাবেশের ফলে নানানরকম ঘটনা ঘটে। 'প্রেতের আবেশ'- তাই প্রেতাবেশ, যেমন কথক জানাচ্ছেন যে যে মানুষ ইংরেজি পর্যন্ত জানেনা অনর্গল সে ফরাসি ভাষায় কথা বলতে লাগল-তাঁরই চোখের সামনে। আর জীবনে যে 'সা রে গা মা পা' সাধেনি সে হঠাৎ উঁচু ঘরানার ভৈরবির ঠুংরি জুড়ে দিল ! এরমধ্যে আরও একটা ব্যাপার তিনি দেখলেন যে এই প্রেত সবসময় ভালো হয় তা নয় কখনো কখনো খারাপ প্রেতও থাকে, তার একটা বর্ণনা করছেন। দেখাচ্ছেন একজনকে যে সে কিছুতে এটা মানতে চাইছে না যে এরকম কিছু একটা হতে পারে তখন সেই ছোকরাকে তিনি ডাকলেন এবং তাকে হিপনোটাইজ করলেন এবং তারপর প্রেতাবেশ ঘটালেন। সেই বর্ণনাটি অসাধারণ ভাবে তিনি দিয়েছেন। বলছেন দুহাত মেলে এগিয়ে গেলেন প্রফেসার ছোকরার শরীরের এক দিকে। দিয়ে আস্তে আস্তে বারকতক সঞ্চালন করলেন হাত দুখানা, তারপর হাত দুখানা নিজস্ব ঢঙে উঠে আসতে। সে একটি খারাপ প্রেতাত্মার কবলে পড়ে প্রফেসরকে মেরে ফেলতে ঝাঁপিয়েছিল। সবাই তাকে গায়ের জোরে না চেপে ধরলে অনিবার্য হত প্রফেসরের বিপদ। কথকের আকৈশোর রোমাঞ্চের প্রতি আকর্ষণ বজায় ছিল। তাই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছালেও তাঁকে হিমালয়, মরুভূমি, সমুদ্র,---সর্বত্র ভ্রামণিক হিসেবে বেশ মানিয়ে যায়। কথক চরিত্রের এই পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা থেকে অবধূতের চরিত্র নির্মাণের দক্ষতা প্রমাণিত হয়ে যায়।

হিমালয় ভ্রমণের নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য তার তুষার ধবল অতুলনীয় রূপ দেখানোর জন্য অবধূত

নীলকণ্ঠ হিমালয় লেখেন নি। একে তাই হিমালয় সম্পর্কিত ফুল ফল কিম্বা আরোহন অবরোহনের ভয়াবহতা সম্পর্কিত গ্রন্থ বলা চলে না। এ গ্রন্থের মধ্যে আছে নানা সাধুবেশী শয়তান,পলাতক কয়েদী, ভুটান তিব্বত প্রভৃতি দেশের সাধু-সন্নাসীদের সম্পর্কে নানা খবর। তিন বছর ধরে হিমালয়ের নানা অংশে অজগরো বৃত্তি, পঞ্ছীবৃত্তি-ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে দেশের নানা তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়ান। তখন তিনি মৌনীবাবা। মৌনী বাবার সাথে পথে আলাপ হয় নানা মহাত্মার আবার সমাজবিরোধী মানুষের হাতে নিগৃহিত হবার পরিস্থিতি তৈরীও হয়। সব মিলিয়ে জীবন তাঁর অভিজ্ঞতায় হয় পূর্ণ। সাহিত্যে তা তিনি উজাড় করে দিয়েছেন।

এখন একটি জিজ্ঞাসা উঠে আসে। তা হলো নীলকণ্ঠ হিমালয় বইখানা ভালো ? সৈয়দ মুজতবা আলীর মতে

'অত্যুৎত্তম।' তাই বলে একে 'সর্বোত্তম' বলা যায় না। তিনি চেয়েছেন যেন অবধূতের মোক্ষটিও বিলম্বে আসে। কারণ মুক্ত পুরুষ মৌন হয়ে যান। অবধূত পূর্ণ তিন বৎসর নীলকণ্ঠে মৌনব্রতী ছিলেন---সে সময়টাকে প্রস্ততির কাল ধরে নেওয়া যায়। তারপর তিনি বাঙলা সাহিত্য -মজলিসে তাঁর সাধনার ধন সঙ্গীতে পরিবর্তিত করে গান গাইলেন এক যুগ ধরে। এসময়ে মৌন হলে সাহিত্যের 'সাধারণ মানুষ ' বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ধর্মের আধারে তিনিই গেয়েছেন মানুষের জয়।

> ''এই একটি মাত্র জয়ধ্বনি আছে দগ্ধ পৃথ্বীতলে যে জয়ধ্বনিতে কি হিন্দু কি মুসলমান, কি কৃষ্ণ কি শ্বেত সর্বমানুষ আত্মহারা হয়ে যোগ দেয়।''[২৫]

---অবধূত সেই মানুষের জয়গাথাই উচ্চারণ করেছেন সাহিত্যে এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা।

পাঁচ. দুর্গম পন্থা : অলৌকিকতার বাস্তবায়ন[২৬]

> ''মনস্তাত্ত্বিক মানদণ্ডে ও কার্যকারণ শৃঙ্খলার সূত্রে বিচার করিলে অয়স্কান্তের জীবনকে এক দুঃস্বপ্নের অকারণ খেয়ালের মতোই মনে হয়। কিন্তু লেখকের কল্পনার নিবিড়তা, জীবনপ্রজ্ঞার পরিচয় ও বিষয়তন্ময়তা এই স্বপ্নবাস্পের মধ্যেও কিছুটা বাস্তব সাদৃশ্যের আরোপ করিয়াছে। তাহার গৃহস্থালির রোমাঞ্চকর পরিবেশ, তাহার অভাবনীয় ভাগ্য পরিবর্তন, তাহার মানসিক সম্পর্কের উদ্ভট অনিশ্চয়তা, তাহার স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের আকস্মিকতা সবই যেন আধুনিক যুগে আরব্য রজনীর ঐন্দ্রজালিক অবাস্তবতার কথা স্মরণ করায়। যেটুকু শিল্পজ্ঞান ও জীবন ঘনিষ্ঠতা থাকিলে অতি-নাটকীয় বীভৎসতাকে স্বাভাবিক ছন্দে গাঁথা যায়, অবধূতের তাহা প্রচুর পরিমাণেই আছে।''[২৭]

'দুর্গমপন্থা' উপন্যাসটি ফ্লাসব্যাক রীতিতে গড়ে উঠেছে। কতকটার কথক স্বয়ং লেখক বাকীটার ভাষ্যকার অয়স্কান্ত বকশী। 'দুর্গম পন্থা' উপন্যাসে কথকের জবানীতে আদিনাথ দর্শনের জন্য যাত্রার প্রসঙ্গে অবধূত বলেছেন যে তাঁরা চড়েছিলেন ছোট্ট একখানি স্টীমারে। একে ঠিক স্টীমার বলা যায় না। প্যাসেঞ্জার-বহা স্টীমার বলতে বোঝায় সেগুলোকে, যেগুলো খুলনা বরিশাল গোয়ালন্দে যাওয়া আসা করে। কলকাতা বন্দরে বড়ো জাহাজ টানবার জন্যে যে যেরকম

স্টীমার জাহাজের সামনে পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, যাকে বন্দরের ভাষায় টাগবোট বলা হয়, এ হচ্ছে সেই জাতীয় ব্যাপার। অবধূতের ভাষায় 'গোয়লন্দ খুলনার স্টীমার চলে বড়লোকের বাড়ির ভারী গতরের গিন্নীবান্নীর মত গজগামিনী চালে, আর সে স্টীমার চৌরঙ্গী পাড়ার চঞ্চলা চন্দ্রাননা চম্পকবরণীদের মত নাচতে নাচতে যায়। তাই তার শরীর হাল্কা, গড়ন একটু ছিমছাম ধরনের, আর শক্তি---ঐ 'ফুটানিকা ডিব্বা' বইটার মত।'

আলোচ্য উপন্যাসটি সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা হয়নি বললেই চলে, যাঁরা অত্যন্ত কম সময় বইটির জন্যে দিয়েছেন এবং প্রাক-নির্দিষ্ট ধারণা মনে রেখে তাচ্ছিল্যের সাথে পাতা উল্টে গেছেন তাঁরা স্বভাবতই গ্রন্থটির প্রতি সুবিচার করেন নি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় লেখক ভ্রমণ কাহিনি লিখতে বসে খেই হারিয়ে নানা আজগুবি বিষয়ে মন দিয়ে ফেলেছেন। আদিনাথ দর্শন করতে গিয়ে জাহাজে মগেদের সাথে মারামারিতে ঘোষাল মশায়ের নাতজামাই এবংপরে ব্রহ্মচারীর জড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে যে অন্যগতি কাহিনিতে যোগ হয়েছিল তার ফলে লেখক যেন খেই হারিয়ে ভেসে গেছেন আজগুবি অয়স্কান্তের ভৌতিক অস্তিত্বে। ব্যাপারটা এইরকম যে যদি জাহাজে মারামারি না ঘটত তাহলে তাঁরা আদিনাথে নামতেন এবং কাহিনিটি হয়তবা এভাবে অবিশ্বাস্য একটা ছেলেভুলানো আখ্যানে শেষ হত না। এক কথায় পরিকল্পনাহীন অসংযমে অবধূতের দুর্বল কল্পনা সময় আর কালি-কাগজের অপব্যয় করেছে।

এপ্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য অবধূতের ব্যক্তি জীবন আর তার রচনার প্রেরণাগত সততা। ঈশ্বর আর প্রেত স্বর্গ আর নরক আমরা বাক্যে অস্বীকার করি আর হৃদয়ে ভয়ে হোক ভক্তিতে হোক মেনে নিয়েই পথ চলি। লোকঠকানো যাদের পেশা তারাও পরমেশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। প্রায়শ্চিত্য করার বিধি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। হোম যাগ-যজ্ঞ পূজা-পার্বণ অলক্ষ্মী বিদায় ইত্যাদি অনুষ্ঠান থেকে কী শিক্ষাবিদ কী মন্ত্রী আমলা কেউ-ই বাদ যান না। তাহলে তাকে গল্প উপন্যাসের মধ্যে আনতে দোষ কোথায়? প্রাচীন সাহিত্যে সব দেশে আছে আধুনিক সাহিত্যে সেভাবে নেই। তার কারণ হলো একালে মানুষের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির যোগ কমে এসেছে সবই মানুষের মনোমত সৃষ্টি হওয়াতে জগতের স্বাভাবিক সৃষ্টি অনেক লুপ্ত। মানুষের বাইরের চোখ বন্ধ না হলে ভিতরের চোখ খোলে কেমন করে? অভ্যস্ত জীবনের বাইরে কোনো ঝুঁকি তাঁরা অপছন্দ করেন। সাধারণ গৃহ লালিত মানুষের মনের কথাটি বলেছেন অবধূত :

> ''রহস্য জিনিসটার মজা হচ্ছে, ওটা টানলে বাড়ে। একটা রহস্য ধরে টানাটানি জুড়লে আরও দশটা দশ জাতের রহস্য তার পিছনে পিছনে এসে উপস্থিত হয়। সেগুলোয় শেষপর্যন্ত পৌঁছবার আগেই দেখা যায়, একপাল রহস্য দূর থেকে উঁকি দিয়ে রসিকতা জুড়ে দিয়েছে। সেই রসিকতা দেখে হাড় জ্বলে ওঠে, তখন 'নিকুচি করেছে' বলে রহস্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যাঁরা চালাক মানুষ, তাঁরা কখনও কোনও রহস্যের ভেতর নাক গলাতে যান না। তাঁরা জানেন,ও বস্তু যত চাপা থাকে, ততই ভাল। খামকা কেঁচো

খুঁড়তে সাপের গায়ে খোঁচা দিয়ে কি লাভ!''[২৬]

ঘটনাপ্রধান জীবনে যেমন মনস্তত্ত্ব জায়গা করে নিয়েছে যেমন চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাস এসেছে তার নিজের সত্যের জোরে। তেমনি একদা অস্বীকারের চেষ্টা হলেও আধ্যাত্মিক আর আধিভৌতিক বিষয় গল্প উপন্যাসে জায়গা করে নিচ্ছে। ঘরের ভিতর বসে বহুর মাঝে থেকে অশরীরীদের অবিশ্বাস করা যেকোন কাপুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু রহস্যের সমাধান করবো বলে নির্জন শ্মশানে শ্রীকান্তের মত কত জন বা গিয়েছেন ?গেলে হয়ত স্বীকার করতেন সেখানে এক অশরীরী আকর্ষণ আছে সন্ধ্যার পর যেমন নিজের অজান্তে শ্রীকান্ত চলেছিল মহাশ্মশানের দিকে তেমনি আঠারো বছর যে মানুষ গাছের নীচে ঘুমিয়েছেন আর চোখ ভরে দেখেছেন, বিশ্ব রহস্য ভেদ করার অন্তত চিন্তা করার সময় পেয়েছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের থেকে অনেক একথা অস্বীকার করবে কে? অবধূত সম্পর্কে আমাদের আজকের সিদ্ধান্ত হলো তিনি মিথ্যুক নন। তাঁর রচনায় জোর করে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা নেই বলে তাঁর উপলব্ধসত্য আমাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করে। সভ্যতার সাথে জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্য। জাতিস্মর নিয়ে আজও খবরের কাগজে নানা সংবাদ পরিবেশিত হয়। বাউলেরা বিশ্বাস করেন দেহভান্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। দেহের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে বলে নর-নারীর দেহ কামনা তাঁর সাহিত্যে উপেক্ষণীয় নয়। তাই বলে অকারণ কামের প্রশ্রয় তিনি দেন নি। তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় গুণ লেখকের সংযম। অকারণ বাক্ বিস্তার তিনি করেন নি। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :প্রথম দর্শনে কথকের মনে হয়েছিল : 'ইনিই অয়স্কান্ত? এই মাংস-শুন্য হাড় ক'খানাকে লোকে অত ভয় করে!

হিস্টিরিয়া একধরনের রোগ ভর করলে সেরকমই হয় কিন্তু তারপরেও আছে আরো নানা উপসর্গ তাকে ক'জন নিজের চোখে দেখেছেন ? আজকের মানুষরা বিশেষকরে শিক্ষিত মানুষেরাই বেশি করে জ্যোতিষীর কাছে যান। মাদুলি যদিবা কোমরে বা লুকানো স্থানে থাকে আঙুলে রত্নধারণ করেন এমন লোকের ৯০ ভাগ তথাকথিত শিক্ষিত। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা তাই বাবা মায়ের দোহাই দেন এসব অব্যাখ্যাযোগ্য মাদুলি কবজ পাথর ধারণের। নজরকাঁটা গলায় ঝোলানো এখনও অধিকাংশ সমাজের স্বাভাবিক বিষয়। মৃতের শ্রাদ্ধশান্তির অনুষ্ঠানের কি কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেলে? লেখক তার বিশ্বাস মতে বরং বলা ভালো, বিশ্বাস্য করে তোলার মাধ্যমে উপন্যাসকে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য রূপে উপস্থিত করে তোলেন। আমরা ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞতাকে সন্দেহ করি না। কীভাবে তিনি উপন্যাসের সব চরিত্রের মনের কথা আগেই জেনে যান এ নিয়ে প্রশ্ন করি না। অথচ প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। আমাদের বহুদিনের অভ্যাস এই রীতিকে দেখতে অভ্যস্ত, তাই এবিষয়ে প্রশ্ন ওঠে না। তেমনি জীবন কেবল বর্তমান নিয়ে নয় অতীত আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তার সম্পূর্ণতা। কেবল দেহ নয় মন আত্মা---সবই আমাদের জীবনের অঙ্গ। যাঁরা মননের চর্চা করেন তাঁরা অনেক বেশী রকমে জানেন সাধারণের থেকে তাঁরা অনেক বড় মাপের মানুষ। যাঁরা জীবনের নশ্বরতাকে জেনে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে পথে নামেন তাঁদের উপলব্ধ সত্য সাধারণের কৌতূহলের বিষয় সবাই সেই রহস্য জানতে চান একাত্ম হতে না পারলে আসে অবিশ্বাস সেই জায়গায় পাঠকের অধিকাংশের আসন নির্দিষ্ট তাই লেখকও

নিজের একটা ব্যখ্যা খাড়া করে রাখেন অবিশ্বাসীকে যাতে বলতে পারেন ---ঠিকই ---এসব বানানো গল্প। অবধূতও করেছেন। তিনি নিজের কল্পনায় এসব পেয়েছেন তা জানিয়েছেন:

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কেন জানি না, একবার মুখ ফিরিয়েছিলেন কথক। ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বকশী মশাই,অন্ধকারে চোখ মুখ দেখতে পাননি। কিন্তু একটা খুব একটা ছেলেমানুষী ধারণা হয়ে গেল তাঁর হঠাৎ। লম্বা দেহটাকে রক্ত মাংসের দেহ বলে মনে হল না তাঁর। যেন ছায়া দিয়ে গড়া কায়া যেন---

> ‘‘ঐ ধারণাটা মাথায় নিয়ে কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে ভালো ঘুম হল না। যতবার ঘুম আসে, ততবার চমকে উঠি। ছায়া দিয়ে গড়া অয়স্কান্ত বকশীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছি যেন কোথায়। এমন বিশ্রী পথে চলেছি, যে পথে পায়ের তলায় ছায়া ছাড়া কিছুই ঠেকে না। ছায়াপথে চলতে চলতে ঘুমিয়ে পড়লাম।’[২৯]

---এই সংযম লক্ষ করার মত। নিজের উপলব্ধিকে অস্বীকার করার চেষ্টা আছে---সনাতন যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কিন্তু নিজের চোখ এবং অনুভূতিকে অস্বীকার করবেন কীভাবে ? অলৌকিকতার বর্ণনায় অসংযম তো নেই-ই বরং অলৌকিকতার প্রসঙ্গে অতিমাত্রায় সংযমী যেন বলতে চান না অথচ সত্যের খাতিরে বলে ফেলছেন। পূর্ব সাগরের তীরে যেখানে কর্ণফুলী নদী গিয়ে মিশেছে সেখানে একটি দ্বীপে তীর্থক্ষেত্র আদিনাথ। আদিনাথের অবস্থান বুঝে নেওয়া যেতে পারে :

> ‘‘ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে পূবে পশ্চিমে একটি সরল রেখা টানলে দেখা যাবে যে পূব সাগরের তীরে আদিনাথ আর পশ্চিম সাগরের তীরে কোটেশ্বর এই দুটি তীর্থ সরল রেখাটির দুই প্রান্তে বসে আছে। আদি নাথ দর্শন করে যদি কোন মহাপুরুষ চক্ষু বুজে সোজা পশ্চিমমুখো হাঁটতে শুরু করেন আর কিছুতেই কোন দিকে না ঘোরেন ফেরেন, তাহলে একদিন তিনি কোটেশ্বর মহাদেবের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চক্ষু উন্মীলন করতে পারেন। অবশ্য যদি তিনি রাস্তাঘাট কোনও কিছু পরোয়া না করেন অর্থাৎ আকাশচারী হন তবেই এটা সম্ভব।’[৩০]

বাস্তবে আদিনাথ দর্শনে অনেক বাধা লেখক-কথক বলেছেন ‘...আমার মত নিতান্ত সাধারণ মানুষের বেলায় আদিনাথ পৌঁছতেই আদ্যশ্রাদ্ধ ভোজনের যোগাড় হয়েছিল।’[২৭]

ব্রহ্মচারী সনাতন শর্মা কথকের ভ্রমণ সঙ্গী। স্টীমারে সাক্ষাৎ হয়েছে ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গে ঘোষাল মশাই এর সঙ্গে আছেন নাত্নী বিনু আর নাত্নী-জামাই। মোট পাঁচ জন বাঙালী বাকীরা মগ মগানী বা মগী ‘মেয়েপুরুষ সকলেই লুঙ্গি পরে আছে, চুরুট টানছে আর যেন নাকী সুরে কথা বলছে।---ওদের ভাষায় অত্যধিক পরিমাণ ‘ঙ’ আর ঞ থাকার দরুন কথাগুলো ও-রকম নাকী সুরে বেরোয়!’[৩১] অবধূতের প্রাঞ্জল ভাষাকে বদলে না ফেললে উপন্যাস পড়ার স্বাদটাও কতকটা মেলে:

> ‘‘সাগর, সাগর-ছোঁয়া পাহাড়, পাহাড়-ভরা জঙ্গলের মধ্যে ওরা চঙ বানিয়ে থাকে।

'চঙ্'কথাটির সঠিক অর্থ কি তা বলা শক্ত। বানিয়াচঙ্ নামে একটি স্থান আছে, নামটি অনেকেরই পরিচিত। মনে হয় স্থানটির নাম বানিয়াচঙ্ এই জন্যেই রাখা হয়েছিল, যেহেতু কোনও সময় ওটা ছিল বেনেপটি। অর্থাৎ একচেটে বেনেদের বসবাস ছিল ওখানে। কিন্তু মগ বাসা বাঁধ চঙের উপর। বাঁশ দিয়ে উঁচু মাচা বানায়, তার ওপর খাড়া করে বাঁশের ঘর। মগের সংসার সেই মাচার ওপর বাঁশের কেল্লায়। মগ যাকে চঙ্ বলে তাকেই বোধ হয় আমরা টঙ বলে থাকি। শুধু ঙ আর ঞ নয়, চ অক্ষরটির উচ্চারণও বেশ দরাজভাবে করা হয় কিনা মগাই ভাষায়। কাজেই আমাদের টঙ্ চাটগাঁ পার হয়ে চঙ্ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা, তাই বা কে বলতে পারে।'[৩২]

---কর্ণফুলীর মুখে জলের ভেতর জায়গায় জায়গায় থেকে যেন দাঁত বের করে ভেসে উঠেছে কতকগুলো কিমভূতকিমাকার পাথুরে জানোয়ার। লোক নামাতে স্টীমার থামে সেগুলোর পাশে। নতুনদের মনে হয় থামে না মোটেই যেন নাচতে নাচতে আসছিল যাত্রী নামানোর জন্য এখন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নাচতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র গঠনের সব নৌকা এসে ছেঁকে ধরল স্টীমার খানাকে। তখন 'নাচন্ত স্টীমার থেকে দোলন্ত নৌকায় ঝুলন্ত অবস্থায় যাত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের নিজ নিজ মালপত্র নিয়ে। নিমেষের মধ্যে সে-সব নৌকাগুলো ছুটে চলে গেল চক্ষের আড়ালে, মানে এপাড়ায় ওপাড়ায়। সেখানে নামা ওঠা -দুইই হলো। এতটুকু অসুবিধা হল না কারও। এই দোলানির মধ্যে ওদের অনর্গল হাসি আর অবিরাম আনুনাসিক বকাবকি শুনে কথকের মনে হল এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধে বোধ করছে না কেউ এভাবে উঠতে নামতে। তিনি বুঝতে পালেন যে কর্ণফুলির সন্তান ওরা। পাগলী মেয়ে কর্ণফুলি যেমন দুরন্ত তেমনি ছটফটে। ওর সন্তানরা শান্তশিষ্ট হবে কী করে।

'শম্ভুনাথশ্চ চন্দ্রনাথশ্চন্দ্রশেখরপর্বতে।
আদিনাথঃ সিন্ধুতীরে কামরূপে বৃষধ্বজঃ॥'[৩৩]

অশরীরী অত্যাচার আর অসহায় অয়স্কান্ত

উপন্যাসটির নাম 'দুর্গম পন্থা' এই নামের কারণ এ নয় যে ভ্রমণপথ বড় বিপদসঙ্কুল,বরং যে জীবনপথের কথা ঔপন্যাসিক জানাতে চেয়েছেন সে মার্গ বা জীবনপথ বড়ই দুরধিগম্য। কক্সবাজারের প্রতাপশালী বিমিশ্র চরিত্র বৈশিষ্টের অয়স্কান্ত বকশী বেয়াড়া এক চরিত্র। একজনের দেহে আর একজনের প্রাণ নিয়ে সে এক ট্রাজেডির মূর্তিমান বিগ্রহ। তাঁর মা ফুল্লরা পরজন্মে ফুল্লনলিনী গাঙ্গুলিও একইভাবে অন্যের দেহ আশ্রয়ী এক মানুষ। স্বভাবতই এদের আচরণ, পছন্দ-অপছন্দ অতীত বর্তমান -ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে বেশি। অয়স্কান্তের দৈহিক বর্ণনায় ও কার্যকলাপে লেখক অন্যমাত্রা যোগ করেছেন :

১. প্রথম দর্শনে কথকের মনে হয়েছিল:‘ইনিই অয়স্কান্ত? এই মাংসশুন্য হাড় ক’খানাকে লোকে অত ভয় করে ! তাঁর ড্রয়িং রুম :‘কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল কাঠের চাল। চালের তলার দিকে কাঠ,ওপরে টিন। আসবাবপত্র কিন্তু কাঠের নয়,সমস্ত দাঁত হাড় শিং চামড়া দিয়ে বানানো। বাঘের চামড়া দিয়ে সমস্ত মেঝেটা মোড়া। তার ওপর টেবিল চেয়ার যা সব বসানো রয়েছে সেগুলোর পায়া মোষ হরিণ ইত্যাদি প্রাণীর দাঁত শিং দিয়ে তৈরি। ঐ সব জিনিস ছাওয়াও হয়েছে চামড়া দিয়ে। কাঠের দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে সাপের চামড়া, আরও কত সব প্রাণীর বর্হিবাস। তার মাঝে মাঝে লটকানো রয়েছে ছোরা ছুরি বর্শা বল্লম ভোজালি খাঁড়া -আরও কত কি মারাত্মক জাতের অস্ত্র যা চোখেও দেখিনি কখনও। এক কোণে গাদা হয়ে পড়ে আছে গোটাকতক রাইফেল বন্দুক পিস্তল। অনেকগুলো চামড়ার খাপ বেল্ট ডাঁই হয়ে পড়ে আছে সেখানে। পেছন দিকের বারান্দায় ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে হেটমুণ্ডে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সদ্য খুন করা একটা চিতাকে। বোধহয় সেটার ছাল ছাড়াবার ফুরসত তখনও হয়নি।’-এই বর্ণনায় লেখকের বাস্তবানুরক্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। যেটা একজন উপন্যাসকারের প্রধান গুণ। কোন অলৌকিক গাঁজাখুরি গল্পের শুরু বলে মনে হয় নি কখনো-পরিবেশ ভিন্ন কিন্তু পার্থিব কোন অবিশ্বাসের পথ ধরে চলতে হয়নি পাঠককে-এক কথায়এ উপন্যাসের বর্ণনা জীবন বিচ্ছিন্ন নয়। লেখকের সংযম এখানে প্রশংসনীয়।

২. বকশী মশাই শুরু করে দিলেন হাসি, কাঁপতে লাগল তাঁর হাড় ক’খানা। দু হাতে পেট টিপে ধরে খ্যাঁক খ্যাঁক...। ’ পেটে অসহ্য যন্ত্রণা চেপে রাখার জন্য হাসির ছদ্মবেশ। -যেকোনো ব্যক্তিত্ববান মানুষের অসুস্থতা বা দুর্বলতার প্রকাশ নিজের মর্যাদা-হানিকর। অয়স্কান্ত সম্পর্কে এর বেশি আমরা কিছু ভাবতে পারিনি। অলৌকিকতাকে জোর করে চাপানোর যে অশৈল্পিক কাজ তা অবধূত করেন নি।

৩. অয়স্কান্তকে প্রথম দেখলাম এইভাবে: ‘...খেংরাকাঠির মত রোগা অস্বাভাবিক লম্বা একজন বয়স্ক লোক একপাল ভীষণ দর্শন কুকুরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক খণ্ড কাঁচা মাংস নিয়ে লোফালুফি করছে। মাংস খণ্ডটা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সবকটা কুকুর লাফিয়ে উঠছে সেটা ধরবার জন্যে। কিন্তু ধরতে পারছে না কেউ, আশ্চর্য কায়দায় কুকুরের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটাই আগে লুফে নিচ্ছে সেটা। তখন কুকুরে মানুষে লাগছে কাড়াকাড়ি। চিৎকারে হুংকারে ফেটে যাচ্ছে আকাশ। দূরে দাঁড়িয়ে সেই রোম হর্ষণ কাণ্ড দেখতে লাগলাম।’[৩৪]

৪.অয়স্কান্ত বক্সীকে এই দেহের প্রকৃত মালিক যে মারা গেছে , সেই অশরীরী আত্মা প্রচণ্ড কষ্ট দিচ্ছে। এই শরীরটি যার সে ছাড়বে কেন? লেখক অনবদ্য ভাষায় তা বলেছেন। বকশী মশাই তাকিয়ে রয়েছেন! কি ভয়ঙ্কর চাহনি ! চোখের তার দুটো যতদূর সম্ভব উঠে গেছে ওপর দিকে, তারার নিচের সাদা অংশে রক্তের লেশ মাত্র নেই। সে দৃষ্টিতে প্রাণও নেই যেন। হঠাৎ সেই অস্বাভাবিক চাউনি সুদ্ধ তাঁর মুখখানা আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে আসছে। গলা বুক সব উঠতে লাগল। কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঠেকে রইল মেঝের সঙ্গে। কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কাঠ একখানা, আস্তে আস্তে সিধে হয়ে উঠল ওপর দিকে।

বকশী মশাই কোমর পিঠ ঘাড় মাথা টান টান করে পা ছড়িয়ে বসে রইলেন সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে নিজের কপালের দিকে তাকিয়ে। 'একটিবারের জন্যও কাঁপল না তাঁর চোখের পাতা, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কিনা তাও বোঝা গেল না।'[৩৫]

এই মানুষটি যে প্রচণ্ড ভাবে শারীরিক কষ্টে দুমড়ে মুষড়ে যাচ্ছেন তা বুঝতে পারলেন কথক। লেখক যেখানে সহজভাবে বলেন সেখানে গবেষকের বলার কিছু থাকে না। তার ওপর লেখকের ভাষাভঙ্গির পরিচয়ও মেলে। এটা উপরি লাভ।

> "তাঁর দেহ যষ্টিখানি তখন বেঁকে চুরে তেবড়ে নানারকম ভঙ্গি ধারণ করছে। যেন কোনও অদৃশ্য হস্ত ধীরে সুস্থে অতি মোক্ষমভাবে মোচড় দিচ্ছে তাঁকে ধরে, রসকষ একটুকু অবশিষ্ট থাকতে কিছুতেই নিস্কৃতি দেবে না। বুঝতে পারলাম এইভাবে নিঙড়ে নিঙড়েই বকশী মশাইকে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলা হয়েছে। তাই উনি উল্লুকের গলায় সোনার চেন পরান, খেঁক খেঁক করে কদর্য হাসি হাসেন। বলেন -'ভাত-কাপড় সোনা-দানা হীরে-জহরত কোনও কিছু দিয়েই কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। খেয়েছে দেয়েছে থুয়েছে আর শিকল কাটার মতলব ভেঁজেছে।" [৩৬]

---কেন শিকল কাটার মতলব ভেঁজেছে লেখক কৌশল গত কারণে তা গোপন রেখেছেন। দেহ বর্ণনায় ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে অশরীরী সত্তার ইঙ্গিত পরে বোঝা যায়।

রূপদক্ষ শিল্পীর কলমে : চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টির দক্ষতা লৌকিক ও অলৌকিকের সেতু

কথক অনুভব করেছেন : 'অয়স্কান্তের আকর্ষণ-শক্তি থাকলে কি হবে, যা আকর্ষণ করে তা লোহার বুক চিরে ছিটেফোঁটা রসকষ মেলে না, তাই অয়স্কান্তর চামড়াখানা পর্যন্ত শুকিয়ে কুঁচকে বিশ্রী হয়ে গেছে। বকশী মশাইয়ের শুকনো চামড়া ঢাকা হাড়গুলো মড়মড় করতে লাগল।'[৩৭]

অয়স্কান্তের এই যন্ত্রণা কথক অনুভব করতে লাগলেন যে দেখতে দেখতে তাঁর হাত-পাগুলোও কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হতে লাগল। নির্ভেজাল সাকার বেদনা আচ্ছন্ন করে ফেললে তাঁর নড়াচড়া করার শক্তিটুকু। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যন্ত্রণায় টনটন করতে লাগল কথকের। উঠে গিয়ে ওঁকে ধরে বসাবেন না কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। এ অবস্থায় কি করা কর্তব্য তারও কোন ধারণা ছিল না। কাঠ হয়ে বসে রইলেন বকশী মহাশয়ের দিকে চেয়ে আর যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন বকশী মশায়ের জন্য।

> "নজরে পড়ল ঠোঁট নাড়ছেন যেন বকশী মশাই। বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াতে লাগলেন তিনি। সেই আওয়াজ কানে যেতে আমার হাত-পায়ের আড়ষ্ট ভাবটা কাটল। উঠে গিয়ে ওঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম---'কি বলছেন? ডাকব কাউকে? ও বকশী মশাই -বকশী মশাই।"[৩৮]

তার মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরিয়ে এসে ছিটকে লাগল লেখক তথা কথকের মুখে। চাদর দিয়ে চোখমুখ মুছে ফেলে চোখ খুলতেই দেখলেন :

> "বকশী মশাই তাকিয়ে রয়েছেন ! কি ভয়ঙ্কর চাহনি ! চোখের তার দুটো যতদূর সম্ভব উঠে গেছে ওপর দিকে, তারার নিচের সাদা অংশে রক্তের লেশ মাত্র নেই। সে দৃষ্টিতে প্রাণও নেই যেন। হঠাৎ দেখি সেই অস্বাভাবিক চাউনি সুদ্ধ তাঁর মুখখানা আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে আসছে। গলা বুক সব উঠতে লাগল। কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঠেকে রইল মেঝের সঙ্গে। কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কাঠ একখানা, আস্তে আস্তে সিধে হয়ে উঠল ওপর দিকে । বকশী মশাই কোমর পিঠ ঘাড় মাথা টান টান করে পা ছড়িয়ে বসে রইলেন সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে নিজের কপালের দিকে তাকিয়ে। একটিবারের জন্যও কাঁপল না তাঁর চোখের পাতা, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কিনা তাও বোঝা গেল না।"[৩৯]

এরপর রূপদক্ষ লেখক যে পরিবেশ তৈরী করেছেন তা উপযুক্ত : 'দুনিয়াসুদ্ধ জন্তু-জানোয়ারের ছাল-চামড়া হাড়গোড় দিয়ে সাজানো সেই প্রায়ান্ধকার ঘরখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হল, আমিও মরে গেছি। মরণের ওপারের রাজত্বে পৌঁছে চাক্ষুষ দেখছি পারলৌকিক কাণ্ড-কারখানা। প্রেতের দৃষ্টি দিয়ে প্রেতলোকের গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য পড়তে লাগলেন বকশী মশাই। সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকব বা ছুটে বেরিয়ে যাব ঘর ছেড়ে এমন সামর্থ্যও রইল না।'[৪০]

জাদুবাস্তবতার উপন্যাস 'দুর্গমপন্থ'-য় অয়স্কান্ত পুনর্জন্ম নেওয়া একটি মানুষ। রূপদক্ষ অবধূতের এই চরিত্র পরিকল্পনা অন্যান্য সাধারণ উপন্যাসের সাথে মেলে না। অয়স্কান্তের মধ্যে অশরীরী সত্তার নিত্য আনাগোনা! দেখতে অতি সাধারণ হলেও তার ক্ষমতা অসীম। কোনো কিছুই তার দৃষ্টির বাইরে নেই। তিনি আবার সাহেবী পোশাকে ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক :

> "এ বি সি অর্থাৎ অয়স্কান্ত বকশী কোম্পানীর মালিক কেতা দুরস্ত সাজ- পোষাক, খানদানী আদবকায়দা আর সূক্ষ্ম ওজনের কথাবার্তা নিয়ে রাশি রাশি মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন, প্রচুর দলিল দস্তাবেজ সই করলেন, নানা রকমের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত রইলেন দিনের মধ্যে কুড়ি ঘন্টা করে।"[৪১]

'অনেক নতুন খবর জানতে পারলেন কথক। অয়স্কান্ত বকশীর চট্টগ্রামে ,কলকাতায়, রেঙ্গুনে, এবং মাদ্রাজে শহরের ওপর বড় বড় অফিস আছে। সেই সব অফিসে কাজ করে প্রচুর বড় সাহেব ,ছোট সাহেব, বড় বাবু, ছোট বাবু, দারোয়ান, চাপরাসী---ইত্যাদি। এত কর্মচারীর মধ্যে শতকরা দু জনেরও সৌভাগ্য হয়নি তাদের খোদ মালিককে দেখবার। এই টুকু তারা সকলে জানে যে তাদের মালিক সমুদ্রের কিনারায় ঘর বেঁধে থাকেন, স্টীমারে চড়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ান, সমুদ্রের সঙ্গে ঘর না করলে তিনি তাঁর শরীরের মধ্যে বেশীদিন টিঁকতে পারেন না। এভাবে কেটে গেছে বহু দিন। এবার তাঁর স্ত্রী বনলতার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছেন অয়স্কান্ত বকশী। জানা গেল রেঙ্গুনে যাচ্ছে স্টীমার মাঝে কেবল আকিয়াবে একটু থামা। জলে ভাসছে স্টীমার । রূপদক্ষ শিল্পী অবধূতের কথায় এই পরিবেশের অসামান্য চেহারা ফুটে ওঠে। শেষপর্যন্ত

সেই বোধটুকুও আর থাকে না। জল আর অন্তরীক্ষের সঙ্গে ঘুলিয়ে যায় । তখন জেগে থাকা আর ঘুমিয়ে পড়ার ব্যবধানও ঘুচে যায়। এরপর একটা অসাধারণ বর্ণনা আছে :

> ‘সেই অবস্থায় ভাসতে ভাসতে হঠাৎ দেখি, এক মজাদার লুকোচুরি খেলার বুড়ী বনে গেছি। জল আর অন্তরীক্ষ জুড়ে চলছে এক ধরি ধরি ছুঁই ছুঁই খেলা। চোখ-জুড়ানো রঙের একফালি বাঁকা টিকলি কপালে আটকে কাজলী মেয়ে আঁধারি জল থেকে মাথা তুলে উঁকি দিলে। জলের অপর-প্রান্তে তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে আলো বেচারা ধারণা করতে পারে নি, আঁধারি তাকে ফেলবে। আলোকে দেখতে পেয়ে ছুটল আঁধারি অন্তরীক্ষের পথ ধরে তাকে ছুঁতে। আলো ডুবল টুপ করে লুকিয়ে ফেলল নিজেকে জলের মধ্যে। সারাটা অন্তরীক্ষ পার হয়ে পৌঁছল যখন আঁধারি সেই জায়গাটিতে যেখানে জলে ডুব দিয়েছিল আলো, তখন সে জানতেও পারল না যে তার পিছন দিকে আলো আবার জল থেকে মুখ তুলে চুপি চুপি উঁকি দিচ্ছে। বোকা মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, জলের তলায় আলোকে খুঁজে ধরবার জন্যে। নিশ্চিন্ত হয়ে বুক ফুলিয়ে আলো উঠে পড়ল অন্তরীক্ষে। চলতে লাগল সোজা সেই জায়গাটিতে, যেখানে আঁধারি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভাল করেই জানে যে সে, জলের তলায় খোঁজা শেষ হলে আবার আঁধারি জলের ওপর মাথা তুলবে। হলও ঠিক তাই, জলের তলায় খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যে মুহূর্তে আঁধারি আবার মাথা জাগালে, সেই মুহূর্তে আলো অপর প্রান্তে দিলে ডুব। চলতে লাগল এই মজার খেলা নীরবে নি:শব্দে জলে আর অন্তরীক্ষে। সেই খেলার বুড়ি সেজে চুপচাপ ভাসতে লাগলাম আমি আলো আঁধারির মাঝখানে।’’[৪২]

কথক অয়স্কান্তের সঙ্গী হয়ে জাহাজের সাথে চলেছেন সাগরে। এর মধ্যে কোনো অবাস্ত বতা নেই। চারিদিকে শুধু জল আর জল ওপরে কেবল নিঃসীম আকাশ। সেই আকাশের শূন্য পটে আলো আঁধারির খেলা চলছে আর মায়াময় সেই পরিবেশে লেখক দেখতে পাচ্ছেন অয়স্কান্তের অতীতকে! অবিশ্বাস্য কাহিনিটি স্বপ্নে পাওয়ার মত করে বর্ণনা করলেন লেখক :

> ‘‘ধরা ছোঁয়া খেলার বুড়ীর পদটি বজায় রাখতে হলে অপক্ষপাতিত্বের পরাকাষ্ঠায় পৌঁছানো প্রয়োজন। নির্জলা নিরপেক্ষতার নেশায় বুঁদ হয়ে গেলে বর্তমানের বালাই থাকে না। ... মরা ইতিহাস একঘেঁয়ে ঘ্যানঘেনে অর্থহীন সুরে আওড়াতে লাগল তার মর্মবাণী, সে সুর কানের দরজায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেল। মর্ম পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারল না। মরা ইতিহাসের প্রচ্ছদপট ঢেউখেলানো টিন দিয়ে বানানো। প্রচ্ছদপটের ভেতরে চলেছে আধুনিক প্রস্তর যুগ। বিশাল একটা মাঠ, ঢেউ খেলানো টিন দিয়ে এমনভাবে ঘেরা হয়েছে যে, ভেতরে কি হচ্ছে, তা বাইরে থেকে টের পাওয়ার উপায় নেই। একদা একটি ছোট ছেলে তার দাদার হাত ধরে এসে পৌঁছল সেই টিনের বেড়ার পাশে। দাদা তাকে নিয়ে গেট

পার হয়ে ভেতরে ঢুকল। ভয়ংকর ব্যাপার চলেছে ভেতরে। বড় বড় পাথরের চাঙড়, কত তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, পড়ে আছে চারিদিকে। ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্-হাজার হাজার হাতুড়ির আওয়াজ উঠছে। বিস্তর মানুষ ছেনি হাতুড়ি দিয়ে কাটছে সেই পাথর গুলো। চাঁচছে, ঘষছে নানা রকমের নানা আকার বানিয়ে ফেলছে। ব্যাপার দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল ছেলেটি, তার বিস্ময়-ব্যাকুল দুই চোখেফুটে উঠল অজস্র কি এবং কেনর ভিড়। কোথা থেকে জুটল এত পাথর? কারা বয়ে আনলে এই পাথর গুলো? করবে কি এরা পাথর গুলো দিয়ে? এই পাথুরে জঙ্গলের মধ্যে তার দাদা করেই বা কি? এই ভয়ঙ্কর আওয়াজের ভেতর এরা আছে কি করে?"[৪৩]

নাগ-নাগিনী পরিবার : সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে

হিন্দুশাস্ত্রে মানুষের জন্মান্তর স্বীকৃত। সাহিত্যে সাধারণত তার ব্যবহার নেই বললেই চলে। মহকাব্যের কথা স্বতন্ত্র। জাদুবাস্তবতার উপন্যাসে ইহলোক পরলোক একই ঘটনার বৃত্তে ধরা দেয়। 'দুর্গমপন্থা(কার্তিক,১৩৬৮) সেরকমই একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক অয়স্কান্ত বকশী সেই রকমের মানুষ। এই সূত্রে এসেছে নাগ দম্পতির কথা। আমরা দেখলাম অতীত জীবনকে বর্তমান জীবনের সাথে যুক্ত করবার সময়ে লেখকের ভাষা স্বাভাবিক ভাবেই বদলে যায়। যেকথা আমাদের শাস্ত্রে আছে যার সত্যতা আমাদের বুঝতে হলে সাধনার প্রয়োজন কিন্তু তাকে না মানবার জন্য কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন হয়না।এ উপন্যাসে অবলম্বিত জন্মান্ত রের ঘটনা তেমনি একটি বিষয়। এই বিষয়ে লেখক অত্যন্ত সচেতন। লেখক যা বিশ্বাস করেন এবং সত্য বলে জানেন তাকে পাছে লোকে অবিশ্বাস করে --এইভেবে অবধূত পিছিয়ে যাননি। বলা বাহুল্য লেখকের বলিষ্ঠ প্রত্যয় এজাতীয় রচনার প্রধানতম শর্ত। এখানে অবধূত অয়স্কান্তে র পূর্ব জীবনের কথাকে বর্তমানের সাথে জুড়েছেন। আমরা জানলাম যেখানে আবার ইতিহাসের আলো পড়ল,সে জায়গাটা সেই মহারাণীর স্মৃতি সৌধ থেকে অনেক দূরে। সেটা মহানগরী নয়, সেখানে কেউ কারও নামে পাথর গাঁথবে না, কিন্তু সেখানেও ইতিহাস গড়ার মাল মশলা মেলে কারণ সেখানে বাস করেন নাগ মহাশয় আর নাগিনী মহাশয়া। এবার শুরু হতে চলেছে অয়সকান্তের জীবনের দ্বিতীয় পর্ব।

নতুন জীবনের কথা প্রসঙ্গে এলো নাগ পরিবারের কথা। আড়াই সের দুধে তোলা দু-এক আফিং জ্বাল দিতে থাকলে যে সরখানি তৈরী হয়, সেই সরখানি মাত্র আহার করেন নাগ মহাশয়। তাঁর স্ত্রী নাগিনী মহাশয়া সরের তলায় যে দুধটুকু পড়ে থাকে, সেটুকু পান করেন। এই দম্পতি পারলৌকিক কারবার করেন। ইহলোকের বহু গণ্যমান্য মানব-মানবী তাঁদের খদ্দের। এঁদের সম্পর্কে যা জানা গেলো, তা হলো এঁদের মস্ত বড় এক বাগানের মধ্যে মস্ত বড় এক অট্টালিকা। সেই অট্টালিকায় বাস করেন নাগ মহাশয় আর নাগিনী মহাশয়া। নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে তাঁদের সাধন ভজন। গোটা দুয়েক চাকর থাকে মাত্র তাঁদের সঙ্গে।

তারা বাঙালী নয়, কি যে করেন তাদের মণিবরা তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। ঘামাবার মত মাথাও নয় তাদের। কিন্তু হঠাৎ একদিন জুটল সেখানে একটি ছোকরা। নাগেদের এক ভক্ত তাকে নিয়ে এসে সেখানে রেখে গেল। গুরুদেব এবং গুরুঠাকরুণের সেবা করবে। তিন কুলে কেউ নেই ছোকরার, সে নাগ পরিবারের আশ্রয় পেয়ে বর্তে গেল। গল্পের ক্রমাগ্রসরমানতার ধারায় পাঠক দেখবেন ইনিই অয়স্কান্ত।

দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে লেখক জানিয়েছেন : 'ইতিহাস তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় যারা পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগবার দরুণ ইহজন্মে কর্ম করে বেড়ায়। কিন্তু যে বেচারা পরজন্মের কর্মভোগটা ইহজন্মে ভুগছে, তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় কে! খোঁচা খোঁচা কয়েকটা নতুন গোঁফ দাড়ি, একমাথা জট পাকানো চুল, শতগ্রন্থি দেওয়া একখানা ময়লা কাপড় পরা যে লোকটা মাঠে ঘাটে লোকের লাথি ঝাঁটা খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তার নাম ইতিহাসের পাতায় ওঠেনি। ও রকম জীব এন্তার চরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র, চরতে চরতে বেমালুম কে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, কার গরজ পড়েছে খোঁজ রাখার। কিন্তু ওদের একজন হারাল না, ঘুরতে ঘুরতে শেষপর্যন্ত আটকে গেল। বাঁধা পড়ল একটা খোঁটায়। তারপর আবার তাকে নিয়ে ইতিহাস রচনা হতে লাগল।'[৪৪]

গঙ্গেশ গাঙ্গুলী : উকিল থেকে অলৌকিকে

এই পর্বের শুরুতে মহকুমা আদালতের ধনুর্ধর উকিল গঙ্গেশ গাঙ্গুলী আদালতের আইনের সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যাটাও আত্মসাৎ করে ফেলেছিলেন। সাধু সন্ন্যাসী ফকির দরবেশ যাকে যখন হাতের কাছে পেতেন,ধরে নিয়ে যেতেন নিজের বাড়িতে। তাবিজ কবজ মন্ত্র মাদুলি, জড়ীবুটী, অব্যর্থ ওষুধ,কত কি তিনি জুটিয়েছিলেন, তার ঠিকানা নেই। সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করার ফলে তাঁর ভেতরেও একজন সাধুর জন্ম হয়েছিল। তিনি জানতে পারতেন কার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তাঁর কৃপা না নিয়ে ছাড়তেন না। সংসারী মানুষ সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ঔপন্যাসিকের মতই এ প্রসঙ্গে 'দুর্গমপন্থা'-র ৬১ পৃষ্ঠায় অবধূত বলেছেন :

> ''সংসার-দুর্গের ভিত্তি গাঁথার মশলা তৈরী হয় দু জাতের দুটি ভেজাল পদার্থের সংমিশ্রণে। পদার্থ দুটির নাম---মেনে নেওয়া আর মানিয়ে চলা। রাশি রাশি চোখের জল আর বুকের রক্ত দিয়ে নরম করতে হয় ঐ দুটি শুকনো গুঁড়োকে। তার ফলে তাতে রস জমে, আঠালো হয়। ঐ আঠালো মশলার গুণে বড় বড় বিশ্বাস আর নির্ভরতার চাঙড় গুলো গায়ে গায়ে আটকে থাকে। তখন সেই ভিত্তির ওপর একতলা, দুতলা, দশতলা যত তলা খুশি সংসার-অট্টালিকা গড়ে তোলা যায়।''

পারলৌকিক জগতের হিসাব মেলানো আজও কি সবার জন্য সহজ হয়েছে? ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষিরা আজ কোথায়? বিশ শতকের পাঁচের দশকে অবধূত সেই চেষ্টা করেছেন উপন্যাস -এর মধ্য দিয়ে। তাঁর সততা নিয়ে অনেকে সন্দিহান পরবর্তী যুগ তাঁদের অনেকের সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে কিন্তু সুষ্ঠু সমাধান একপ্রকার অসম্ভব। সৈয়দ মুজতবা

আলি[৪৫]অবধূতের সততায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। আমরা তাই পরলোক-ইহলোক সম্পর্ক নিয়ে লেখক যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বোঝবার চেষ্টা করবো :

> "ইতিহাসের চলন পিছন দিকে, সমুখ পানে মুখ রেখে সে পিছু হেঁটে চলে। তাই সে নিজের পিছনটা দেখতে পায় না যতটুকু পিছোয় ঠিক ততটুকু সামনে দেখতে পায়। আর সেইটুকুই ইতিহাস দেখায় সকলকে। তার পিছনে অন্ধকার রহস্যের গর্ভে কি আছে, তা সে নিজেও জানে না, কাউকে জানাতেও পারে না। কিন্তু হঠাৎ যদি সে ঘুরে দাঁড়ায়, তার নিজের পিছনে কি আছে তা জেনে ফেলে, তখন সেই ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উল্টো টানে পাহাড় পর্বত যায় ভেসে, সামান্য সংসার-ইমারত কি করে টিঁকবে!"[৪৫]

এই ব্যাখ্যাটি ফুল্লনলিনীর মনোভাবকে বাস্তবসম্মত করে তুলতে সাহায্য করে।

পরলোক এবং ইহলোক যেন মিলে মিশে একাকার 'দুর্গমপন্থা' উপন্যাসে। বাংলাসাহিত্যের প্রথম পরিপূর্ণ আত্মজীবনী রাসসুন্দরী দেবীর (১৮০৯-১৮৯৯)'আমার জীবন'-এও ঈশ্বর ভূত সবই আছে । গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ(০৬.০৩.১৯২৭-১৭.০৪.২০১৪)-এর জাদুবাস্তবতার উপন্যাসেও তাই। আজ বিবিসি নিউজ এর মাধ্যমে মার্কেজ পৃথিবী বিখ্যাত। 'দুর্গমপন্থা' সম্পর্কে আলোচনার আগে সেকথা মনে রাখতে হবে। গঙ্গেশ গাঙ্গুলী একজন আইনজীবী। বলাবাহুল্য ঘোর বাস্তবতার কারবারী।অথচ তিনিই এ উপন্যাসে ঘটে যাওয়া সমস্ত অলৌকিকতার সাক্ষী। তাঁর চরিত্রের সাথে যা একেবারে যায় না তাই ঘটেছে তাঁর জীবনে। এরফলে সাধারণ পাঠক অবিশ্বাস করার সুযোগই যেন হারিয়ে বসেন। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যাচ্ছে যে গঙ্গেশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী শ্রীযুক্তা ফুল্লনলিনী দেবীর দীর্ঘ ৪৮ বছরের সংসারে কোন অসঙ্গতি চোখে পড়েনি। একদিন হারানো ছেলে আজকের অয়সকান্ত সামনে এলে বাড়ীর সকলে বুঝতে পারলো গিন্নিমার আসল স্বরূপটা। গঙ্গেশ-আইনজীবী মানুষ, সবরকম চেষ্টা করলেন।

অয়স্কান্তকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আটকে রেখে মারধোর করলেন। ফল হোল বিপরীত :

ক. বড় ছেলে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পিছনের ঠেলায় মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে ফাটালো ঠোঁট।

খ. ছোট বউ দুধ জ্বাল দিচ্ছিল হাঁড়ি উঠে গেল দোতলার কাছাকাছি তারপর উল্টে গেল গরম দুধ, ছড়ালো মুখে চোখে। হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো ছোট বউকে।

গ. বড় নাতি শুভাশীষ চাপা পড়ল খাট-বিছানার তলায়। ঘুমোচ্ছিল সে খাটে শুয়ে, হঠাৎ বিছানা-সুদ্ধখাট খানা উল্টে গেল। খাট বিছানা সরিয়ে যখন তাকে বার করা হল, তখন তার দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

ঘ. শেষ পর্যন্ত এক মরা ইঁদুর এসে ছিটকে পড়ল কর্তার মুখে।

ঙ. আইনের রক্ষক গঙ্গেশ গাঙ্গুলির নাকাল হওয়া কম বিস্ময়ের নয়। বিরাট ওজনের

> বইভর্তি আলমারী গড় গড় করে এগিয়ে এসে বৈঠকখানার দরজার মুখে বসে গেল।
> বই পত্র তছনছ হলো অদৃশ্য হাতের তৎপরতায়।

অবশেষে অনেকে মিলে আলমারী সরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো মূর্ছা গেছে মালিক। অবশেষে গাঙ্গুলী মশাই নুয়ে পড়লেন সহধর্মিনীর দরজার তালা খুলে দিলেন। মানতে হলো ফুল্লনলিনীর গৃহত্যাগের দাবি। হাত জোড় করে বললেন :

> "তুমি যাও। আর কোনও দাবি নেই আমার তোমার ওপর। এখন দয়া করে তুমি আমায় রেহাই দাও। আমার বংশ নাশটা আর করো না।"[৪৬]

জবাবও দিলেন না গাঙ্গুলী-গিন্নী। বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। ছেলে মেয়ে নাতনী সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এখানে কোনো কথা অবধূত যেন বলছেন না। যা ঘটছে তাই তিনি বর্ণনা করছেন মাত্র। ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না। অবধূতের লেখার জাদু---এখানে। আমরা এই পরিবেশ রচনায় ও চরিত্র রূপায়ণে রূপদক্ষ শিল্পীর ছোঁয়া পাই।

অয়স্কান্তকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ফুল্লরা। স্টীমার ঘাটে যাওয়ার আগে গেলেন থানায় ছেলের হাত ধরে সোজা স্টীমার ঘাটে। যারা পিছু নিয়েছিল তার দেখল চাঁটগার দুখানা টিকিট কিনলেন আঁচল থেকে এক মুঠো টাকা বার করে। টিকিট কাটলেন চট্টোগ্রামের।

পূর্বতন স্বামী নিকষকান্তের বয়স এখন ৯৬ বছর তবু নিকষকান্তের বুদ্ধিজ্ঞান একেবারে টনটনে। যথোচিত প্রমাণ দিয়ে এ বাড়িতে আশ্রয় পেল অয়সকান্ত ও তার জননী। মৃত্যুর আগে নতুন করে উইল তৈরী হলো, এরজন্য অয়সকান্তকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হল।

> "যে ছোকরাটি একদা তার দাদার হাত ধরে ইংরেজ রাণীর স্মৃতিসৌধ বানানো দেখতে যেত, যে ছোকরাটি একদা তার দাদা আর মাকে হারিয়ে বেওয়ারিস মাল হিসেবে পথের ধূলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছিল, হঠাৎ তার বর্তমানটা গেল মুছে, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ গেল জুড়ে। নতুন ইতিহাস গড়ে উঠতে লাগল। "[৪৭]

এরপর জাদুবাস্তবতার এ উপন্যাসে দেখা গেল মা-ছেলের সক্রিয়তায় এ বাড়ির আয় উন্নতি। কেউ জানে না কোথা থেকে কবে কোন্ বকশীর প্রথম শুভাগমন হয়েছিল কক্স বাজারে। নিকষকান্ত বকশী মশাই গোলদারী ব্যবসা চালাতে চালাতে কি উপায়ে যে জাহাজ কিনে ফেললেন, তাও কেউ বলতে পারে না। একটা উপকথা চালু আছে ওদেশে। কবে নাকি এক টাইফুন না টর্ণেডো উঠেছিল কক্সবাজারের দরিয়ায়। আর তার ফলে ভাঙা জাহাজের কাঠ ধরে ভেসে এসে কূলে ঠেকেছিল দুজন ভিন্-দেশী মানুষ। নিকষকান্ত বকশী তাদের উদ্ধার করেছিলেন দরিয়ার কূল থেকে, ঘরে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তারপর একটু হিসেবের গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। সেই মানুষ দুটোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি কোথাও। তার বদলে বকশী মশাইয়ের নিজের কেনা আস্ত একখানা জাহাজ একদা ঠিক সময় এসে কক্সবাজারের কূলে ভিড়েছিল। স্টীমার এর ব্যবসা আরো হরেক রকম জিনিসের কারবার করেন অয়স্কান্ত।

> "অয়স্কান্তের আকর্ষণী শক্তি এত বেশী যে কক্সবাজারের যাবতীয় মুনাফা, সব দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে তাঁর অঙ্গের সঙ্গে আটকে যায়। হেন জিনিস নেই যার কারবার করেন না অয়স্কান্ত। মাছ কাঠ ধান তেল লোহা লক্কড় টিন ওষুধ কাপড় জামা সাইকেল জুতো সোনাদানা হীরে জহরত,দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস বকশী কোম্পানীর জাহাজ কক্সবাজারের জন্যে বয়ে নিয়ে আসে। বড় বড় অফিস, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুদাম, শত শত মানুষজন, মায় এক সাহেব ম্যানেজার পর্যন্ত আছে বকশী মশাইয়ের।"[৪৮]

তার কোম্পানীর বিচিত্র লোকজন। হয়তো কেউ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুহূর্তে তা টের পেয়ে যায় অয়সকান্ত। সাবধান করার পর যদি না শুধরে নেয় তবে আর রক্ষে নেই। অবধূত যা অবিশ্বাস্য তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেননি। তাঁর নিশ্চেষ্টভাবটাই প্রত্যক্ষবৎ অনুভবে সাহায্য করেছে পাঠককে। ফুল্লনলিনী স্বাভাবিক মানুষ নন। লেখক সেকথা একবারও বললেন না। তিনি যেন অসহায় দর্শক। পাঠকও তাঁর মত করে বুঝে নিলেন। রূপদক্ষ শিল্পী অবধূত যেন লক্ষ করলেন নিকষকান্তের বাড়ির পরিবেশ বদলাচ্ছে।

বকশী বাড়িতে ফুল্লনলিনী এখন ফুল্লরা। এ বাড়ির মালিক নিকষকান্তে বকশী-র স্ত্রী । সে এ বাড়িতে আসার পর থেকে একটা দুটো করে এলো অনেকগুলো কুকুর। তাদের আশ্রয় হল এ বাড়ি। আদর যত্নে তারা রইল এখানে। সারাদিনে খুব বেশি বাইরে দেখা যেত না তাঁকে। কুকুরদের খাওয়ানোর পরে তিনি খেতেন সামান্য ফলমূল। কুকুর প্রথমে নিরামিষ খাবার খেত পরে রান্না মাংস। এরপর আবার খাসি কেটে তার কাঁচা মাংস খাওয়ানো চলতে থাকে। এখন আবার তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়েছে তাই দুটি খাসির মাংস তাদের খেতে লেগে যায়। ফুল্লরার নতুন সখ হল কুকুরদের মাঝখানে জ্যান্ত খাসি ছেড়ে দেওয়া তাকে একদল কুকুর খুবলে খুবলে খাবে -এটা চোখের সামনে দেখতে চাইত ফুল্লরা। অয়স্কান্ত এটা বন্ধ করতে চেয়েছিল কিন্তু মায়ের ইচ্ছায় সেটা চালু থাকে। রক্তাক্ত বীভৎস সেই ব্যাপার যতক্ষণ চলে ততক্ষণ সেখানেই বসে শেষ পর্যন্ত দেখে যান অয়স্কান্তের মা।লক্ষ্যণীয় যে একজন মহিলা কোনো নৃশংস আচরণ না করেও পৈশাচিক দ্রশ্য দেখতে ভালোবাসেন ---যেন একটা তামাশা! জ্যান্ত ছাগলগুলো আর্ত চিৎকার করছে আর তাদের খুবলে খুবলে খাচ্ছে কুকুরের দল! আর একজন মহিলা তা উপভোগ করছেন! স্বাভাবিকভাবে মনে আসে সে কি মহিলা না পিশাচিনী? একদিন ঘটল সেই ভয়ানক কাণ্ড। তাকেই খুবলে খেলো তারই পোষা কুকুর। তারা যে রক্তের স্বাদ পেয়েছে! উপন্যাসের বর্ণনায় আমরা তার বীভৎসতা অনুমান করতে পারি।

মারা যাওয়ার পর তাঁর যথাবিহিত সৎকার করা হলো। কুকুরের ভুক্তাবশেষ দেহ চন্দনের চিতায় ভস্মীভূত হলো। রাজকীয় চালে শ্রাদ্ধশান্তির কাজ মিটল। এমন টাকা খরচ করা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয় একথা বলাই যায় :

এরপর বিচিত্র উপায়ে কুকুর গুলোকে মারলেন অয়স্কান্ত। অয়সকান্তের চেহারা লক্ষ করার মতো। কালো কুচকুচে তার দেহবর্ণ। হাড়ের গায়ে মাংস নেই বলে কেবল চামড়ার ছাউনি

বললেই ঠিক হয়। চোখ দুটো যেন কোঠরে ঢুকে আছে। তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আর দেহের বেয়াড়া উচ্চতা ভিন্ন আর কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়ার মত নয় কোন কিছু তার সহ্য হয়না। ---এ যেন ভূতুড়ে চেহারা---পাঠক অস্ফুটে তা উচ্চারণ ক'রে ফেলেন। এ হেন অয়সকান্তের কেবল পকেটে থাকতেই হবে অন্তত দুই বোতল সোডা। ঘরের মধ্যে যেদিকেই তাকানো যাক না কেন সোডার বোতল চোখে পড়বেই। প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে না পেলে কীরকম অনর্থ হতে পারে তা ভাবতেই পারে না বাড়ির অন্য সদস্যরা অন্য সদস্যরা অবশ্য তেমন কেউ নেই। তার বিপুল ব্যবসায়ের অনেক লোকজন। বছরের উপরও যাঁরা এই কাজের সাথে যুক্ত তারাও তাদের মালিককে এক আধবারের বেশি দেখেছে বলে দাবি করতে পারে না। ---এই অনুপস্থিতিটাই অয়স্কান্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অশরীরীর সত্যকার পরিচয়।

অয়স্কান্তের ব্যবসা-সূত্রে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বর্মামুলুকে, তাই মেয়ের বিয়ে দিয়ে মাধোরাম মুন্সীর জামাই সহ মেয়েকে পাঠানো হয়েছিল এ পরিবারে কিছুদিন কাটানোর জন্যে। লেখক তার বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে। বোঝাই যাচ্ছে পারিবারিক বন্ধুত্ব খুবই নিবিড় না হলে এমন জাহাজ তাদের জন্য পাঠানো হতে পারে না। জাহাজের বিষয়ে কিছু খবর আমরা এই সূত্রে জেনে নিতে পারি। এই ঘটনা কীভাবে ট্রাজিক পরিণতি লাভ করলো তা উপন্যাস অবলম্বনে জেনে নেওয়া দরকার : জামাই ধুর্জটী নাথ চৌধুরী অত্যন্ত জিজ্ঞাসু চরিত্রের মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানপিপাসু তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় মুমূর্ষুর প্রাণ বাঁচানো। যেখানে প্রাণহরণের নিশ্চিত কারণ ঘটে সেখানেই প্রাণ বাঁচানোর উপায় লুকিয়ে আছে---এই ভাবনা থেকেই তিনি নিবিষ্ট চিত্তে সাপের বিষ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছেন। বহু সাপ তাঁর হাতে ধরা পড়ে আটকে আছে কাচের ঘরের মধ্যে। সাপ ধরার বিদ্যেটাও শিখে নিয়েছেন স্বামীর কাছ থেকে। এই কাজটি নির্বিঘ্নেই চলছিল। কী করে যে বিজ্ঞানীর মাথাটাই বিগড়ে গেল তা কেউ বলতে পারে না। এই ঘটনার আগে যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো। বিজ্ঞানীবাবুর স্ত্রী ফিরে যাওয়ার সময় একবার অনুরোধ করেছিল অয়সকান্তকে, তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে:'চলুন না আমাদের সঙ্গে।'[৪৯]--হঠাৎ এই প্রস্তাবে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান অয়স্কান্ত। চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। দেখলেন কালো তারা দুটি জলে ডুবে গেছে। তারপর আবার শোনা গেল :'কি করে একলা থাকবেন এখানে আপনি?'এরপর অয়সকান্তের রাগ গিয়ে পড়ে কুকুর গুলোর উপর।

অয়স্কান্তের যাওয়া হয়ে ওঠেনি কিন্তু আবার অল্প দিন পরে তারা ফিরে এসেছিল বনলতা নামে একটি প্রাণচঞ্চল মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। এই মেয়েটি তার জীবনে ভালোবাসার স্বরূপ বয়ে এনেছিল :

> "আমার স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলাম চাটগাঁ, শ্বশুর-বাড়িতে পৌঁছে পুরুত ডাকিয়ে নতুন করে মন্ত্র পড়া হল, আগুন জ্বালিয়ে খই পোড়ানো হল। শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করে আবার আমরা জাহাজে উঠলাম। "[৫০]

অয়স্কান্তের স্বীকারোক্তি কার্যকারণেও আমাদের মনে কোন সন্দেহ বা অস্বাভাবিকতা সঞ্চার করে না। তার রসিকতার মেজাজটিও উপভোগ্য! তাকে প্রেতাত্মা বলে সন্দেহ করার মত নয়। কথকের মন বুঝতেও তার কোনো অসুবিধা হয়নি।

> "তাই তো প্রথম দিন আপনার সামনে আপনার সেই ঘোষাল মশাইয়ের নাতজামাইটিকে শালা বলে ফেলেছিলাম। ঘোষাল মশাইয়ের নাতজামাইটি যত বড় মানুষের নাতজামাই হন না কেন, আসলে তিনি একটি শালা। কারণ তার দিদিকে আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ করেছিলাম।"[৫১]

অয়স্কান্তের স্ত্রী বনলতা প্রাণচঞ্চল সেবাব্রতী সত্যকার সঙ্গিনী হ'য়ে উঠতে পেরেছিল। এই সূত্রে অয়সকান্তর আত্মহারা হয়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন লেখক---বনলতার সুদর্শন ভাইটির প্রসঙ্গ এনে। সুদর্শন নাতজামাইটির রূপ কথকের চোখের সামনে ভেসে উঠল। তাতে তিনি আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন, তার বোন বনলতার মূর্তিখানি কেমন ধরনের হতে পারে। অয়সকান্ত পাগল ছিলেন বনলতার রূপে। কথক তার কারণ আন্দাজ করলেন রূপবান ভাইকে দেখে। কেননা ভাই- বোনের আকৃতি অনেক ক্ষেত্রে এক রকমের হয়,খানিকটা আদল থাকেই। ছিলও সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নয় তো অয়স্কান্ত পাগল হতে গেলেন কেন? এই ভাইটির সঙ্গে কথক কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছিলেন। সে দুষ্টুমি ভরা চোখ দুটিকে তিনি ভুলতে পারেননি। রোমান্টিক এই লোকটি বউটিকে নিয়ে সকলের নজরের আড়ালে গিয়ে এমন ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসলেন যে নারীলোলুপ গুণ্ডারা আকৃষ্ট হয় এবং আদিনাথ দর্শনটাই মাথায় উঠে গেল। তাই কথক মনে মনে ভাবলেন 'ওর বোন আর কত ভালো হবে!'[৫২]

অয়স্কান্ত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু ব্যক্তি জীবনে বড় একা! তার একাকীত্ব ও অনৈসর্গিক সম্পর্ক-সূত্রে এরপর লেখক বলেছেন :

> "ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কেন জানি না, একবার মুখ ফিরিয়েছিলাম। ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বকশী মশাই, অন্ধকারে চোখ মুখ দেখা গেল না। কিন্তু একটা খুব একটা ছেলেমানুষী ধারণা হয়ে গেল আমার হঠাৎ। লম্বা দেহটাকে রক্ত মাংসের দেহ বলে মনে হল না। যেন ছায়া দিয়ে গড়া কায়া যেন-ঐ ধারণাটা মাথায় নিয়ে কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে ভালো ঘুম হল না। যতবার ঘুম আসে, ততবার চমকে উঠি। ছায়া দিয়ে গড়া অয়সকান্ত বকশীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছি যেন কোথায়। এমন বিশ্রী পথে চলেছি, যে পথে পায়ের তলায় ছায়া ছাড়া কিছুই ঠেকে না। ছায়াপথে চলতে চলতে ঘুমিয়ে পড়লাম।"[৫৩]

---এই বর্ণনাভঙ্গি রূপদক্ষ শিল্পীর সার্থকতাবাহী। কথক কোনো দায় নিচ্ছেন না অথচ পাঠক অয়স্কান্তকে একটি প্রেতাত্মা রূপে বুঝে যাচ্ছে। উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশে 'ছেলেমানুষী ধারণা' ---এই শব্দবন্ধে অবধূত নিজের দায় ঝেড়ে ফেলেছেন। পাঠক জেনে গেলেন সত্য অথচ কথকের

কাছে কৈফিয়ৎ দেবার মত উপায় রইলো যে এটা 'ছেলেমানুষী' ধারণা মাত্র! পাঠক পড়ার সময় শুধু এটা জেনে যান যে অয়স্কান্তের দেহটা রক্তমাংসে গড়া নয়।এই ভাষাভঙ্গি বা প্রকাশশৈলীকে রূপদক্ষতা ব'লে চিহ্নিত করা যায়। অবধূতের কথাসাহিত্য পড়তে গিয়ে প্রায়ই একথা মনে হয় যে এভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ব্যক্তি বা বস্তুর রূপ অর্থাৎ চেহারা দক্ষতার সাথে পাঠকের মনে দেগে দিতে সক্ষম অবধূত। অবধূত তাই রূপদক্ষ শিল্পী।

ছয়. সন্ন্যাস নিয়ে উজ্জয়িনীর সাধু-সঙ্গে

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা ব্যক্তি অবধূতের নানা সাধু-সঙ্গের পরিচয় নেবো। অবধূত সন্ন্যাসজীবনে উজ্জয়িনীতে এই মহাতেজা সাধুর সাথে 'আঠার মতো' লেগে থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা গোপন করতে পারেননি ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ে[৫৪]র কাছে।

> "উজ্জয়িনীতে কিছুদিন থেকে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় নর্মদাতীরের এক গ্রামে এসে ঘাঁটি গাড়লাম আমরা। জায়গাটি জব্বলপুরের ঘোড়াঘাটের কাছে। এইস্থানে মার্বেল পাথরের বুক চিরে বয়ে চলা নর্মদার সৌন্দর্য অপরূপ। এক ভয়ংকর নির্জনে গাছতলায় আমাদের ধুনি জ্বালিয়ে বসতে দেখে ওই গ্রামের এক বিত্তবান গোয়ালা ভাবে গদগদ হয়ে আমাদের দুজনকে পরম সমাদরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।"[৫৫]

অপুত্রক ষাট বছরের কাছাকাছি এই গোয়ালা সাধুর চরণে নিবেদন করলেন যে তাঁর বয়স হয়েছে। প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন বছর পাঁচেক হল। কিন্তু এখনও এর মধ্যে সন্তান সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। গোয়ালার বয়স হয়েছে। তিনি তো আজ আছেন কাল নেই। সুন্দরী যুবতী স্ত্রী তাঁর। তিনি মরে গেলে সে স্বাভাবিক নিয়মে ব্যাভিচারিণী হবে। এর ওর দ্বারা একদিন না একদিন ভ্রষ্টা সে হবেই। সাধুর কৃপায় যদি একটি পুত্র লাভ করতে পারেন তাহলে তাঁর বহু দিনের সঞ্চিত বিত্ত রক্ষা হবে। নচেৎ তাঁর দুরাচারী আত্মীয়রা লুটেপুটে খাবে। একথা শুনে গোপরমণীকে ডেকে উজ্জয়িনীর সেই মহাত্মা বিধান দিলেন যে তাকে সাত দিনের জন্য স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। আলাদা কক্ষে শয়ন করবে। অধিক পরিমাণে দুধ, ঘি, মাছ, মাংস ভক্ষণ করবে এবং সিঁদুর আলতা পরে নিষ্ঠার সঙ্গে 'হৌঁ হ্রীং' মন্ত্র জপ করবে।

গোপ রমণী গুরুজিকে প্রণাম করে অবধূতের দিকে কটাক্ষে মদনবাণ নিক্ষেপ করে চলে গেলেন। নর্মদা তীরে একটি নির্জন স্থানে পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে গুরু -শিষ্য উপস্থিত হলেন। গুরুজি তাঁকে বললেন যে এখানে একটি পরিত্যক্ত গুহা আছে। নগ্নসর্বাঙ্গ হয়ে নর্মদায় অবগাহন করে ওই গুহায় বসে এই মন্ত্রে সুরসুন্দরীর ধ্যান করতে হবে---

'ওঁ পূর্ণচন্দ্রনিভাং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীম্।
পীনোত্তুঙ্গকুচাং বামাং সর্বেষামভয়প্রদাম্ ॥'

---এই জগৎপ্রিয়া দেবীর বদন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ। দেহ গৌরবর্ণা। পরিধানে বিচিত্র বসন। স্তনদ্বয় উচ্চ ও স্থূল। ইনি সকলকে অভয়দান করে থাকেন। তুমি তোমার অন্তরে ওই গোপরমণীকে কল্পনা করে সুরসুন্দরীর ধ্যান করো। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তুমি এই গুহাতে অবস্থান করবে। দ্বিপ্রহরে যদি ক্ষুধার তাড়না আসে তবেই হবিষ্যান্ন গ্রহণ করবে। নচেৎ নয়। আমি নিজে হাতে চরু রান্না করে তোমাকে দিয়ে যাব এবং দূর থেকে তোমার প্রতি লক্ষ রাখব যাতে কেউ তোমাকে বিরক্ত না করে।''[৫৬]

এইমত চলতে চলতে গুরুজি তাঁর অমোঘ বাণী শুনিয়ে দেন :

> ''ক্ষ্যান্ত হও। এই সাধনায় তুমি পতিত হয়েছ। একাজ তোমার দ্বারা আর কখনও সম্ভব হবে না। ওই রমণীর মুখদর্শনও আর তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে না। তুমি এক্ষুণি এই গৃহ ত্যাগ করে ওই গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও। এবং আবার সন্ন্যাসধর্ম পালন কর। তবে খুব সাবধান। কোনও রকমেই এক বছরের মধ্যে ওই রমণীর সঙ্গে গোপনে মেলামেশা করবার চেষ্টা করবে না। তাহলে কিন্তু ভয়ানক অনর্থ ঘটে যাবে। আর যদি গৃহী হতে চাও তাহলে এই মুহূর্তে মালা জটা ত্যাগ করো। মনে রেখো সাধনার দ্বারা সুরসুন্দরীকে তুমি জাগিয়েছ কিন্তু তাঁকে তৃপ্ত করতে পারোনি। করবার চেষ্টাও করোনি। তাঁকে ওই নারীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেয়েও ওই নারীর যৌবনের মধু আহরণের দিকেই তোমার মন ছিল বেশি। এখন তোমার ক্ষমা ত্যাগে। ভোগে নয়।''[৫৭]

এরপর দশ বছর কেটে যায় প্রয়াগে দেখা হয় অবধূতের সাথে। গুরুজি ধুনি জ্বালিয়ে লোটাকম্বল বিছিয়ে গঞ্জিকা সেবন করছিলেন। অবধূতকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন, 'তোর কথাই ভাবছিলাম, তুই এলি। তা সেই রসবতী ভৈরবীটিকে কোথায় রেখে এলি বাবা?' এর কী উত্তর দেবেন? নতবদনে রইলেন। তখন নিজেই বললেন গুরুজী :

> ''তাকেও ধরে রাখতে পারলি না অথচ নিজেও পতিত হলি। ওদের ধরে রাখা যায় না রে পাগল। যাক ভাগ্য ভালো যে তুই নিজে বেঁচে গেছিস। সুরসুন্দরীর আরাধনায় বিঘ্ন ঘটানোর মূলে ওই রমণীই বেশি সক্রিয় ছিল। তাই দেবীর ক্রোধানলে দেবীর অনুচরেরাই তাকে শাস্তি দিয়েছে। ও বড় বেশি রমণাকাঙ্ক্ষী ছিল। তাই এতটুকু ধৈর্য রক্ষাও সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। হয়নি বলেই দেবীর অনুচরেরা ওকে রমণ করে ওর আশা মিটিয়েছে। কতজনে করেছিল অত্যাচার মনে আছে তোর?''[৫৮]

এই গুরুদেব সর্বজ্ঞ ছিলেন। অবধূত এই দিনের কথা স্মরণ করেছেন। সেই রাত্রে ঘর ছেড়ে তাঁরা দুজনেই জব্বলপুরে ট্রেনে ওঠেন। ইন্দোর এক্সপ্রেসে প্রথমে ভূপালে যান। তারপর অন্য ট্রেনে খাণ্ডোয়ানায় নেমে একটি গ্রামের প্রান্তে পাহাড়ের কোলে তাঁরা ডেরা বাঁধেন। বেশ

চলছিল। হঠাৎ একরাতে কয়েকজন দুর্ধর্ষ লোক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কথকের ওপর। কথককে একটা গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে সেই লোকগুলো অমানুষিকভাবে ধর্ষণ করল গোপরমণীকে। ধর্ষণ শেষে তারা যখন স্থান ত্যাগ করে চলে গেল তখন ওর শরীরে প্রাণটুকুও অবশিষ্ট নেই। এরপর অবধূতকে সেই সিদ্ধপুরুষ বলেছিলেন :

> "যে সাধনায় তুই পতিত হলি সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছি আমি। তাই দেবী সুরসুন্দরীই সব কথা জানিয়ে দেন আমাকে। সিদ্ধিলাভ করলে আমার মতন তুইও সর্বজ্ঞ হতে পারতিস। তা যাক আজ রাতে একটা চমক লাগাবো। সুরসুন্দরী প্রসন্না হলে কী হতে পারে না পারে সে ব্যাপারে একটা ধারণা হবে তোর। অমনি লতা সাধনার ব্যাপারটাও বুঝতে পারবি। যদিও তোর দ্বারা আর হবে না, তবুও তুই একবার জানতে চেয়েছিলি। দু 'চোখ মেলে দেখবি ব্যাপারটা।"[৫৯]

সাত. সন্ন্যাস জীবনে তীর্থভ্রমণে নর্মদার সাধু-সঙ্গ

আধ্যাত্মিক জগতের সাধক যা ভাবেন কিম্বা বলেন তা সাধারণ মানুষ নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারেন না। আমরা তাই অলৌকিক বিষযে নিজের কথা বলবার চেষ্টা না ক'রে যতদূর সম্ভব উদ্ধৃত করবো। বলার অধিকারী যাঁরা তাঁদের আন্তরিক উপলব্ধির গুণে অনধিকারীর হৃদয়েও সে অলৌকিক উপলব্ধির প্রবেশ ঘটতে পারে। তদুপরি সে ভাষা এতটাই প্রাণবন্ত যে গবেষকের ভাষায় তার চাইতে সরল করে বলবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করছি না আমরা। তার উপর উদ্ধৃতির সৌজন্যে এক্ষেত্রে অবধূতের সাহিত্য-রস সরাসরি আস্বাদনের তৃপ্তিটাও অস্বীকার করা যায় না। সে যাইহোক লতা সাধনার গুণ বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে সাধনায় সিদ্ধ হলে এ জগতে অবস্থানকালে সাধারণ মানুষের অসাধ্য এবং অকল্পনীয় অনেককিছুই করা যায়। যেমন ইচ্ছামতো ভ্রমণ, ইচ্ছামতো ভোগ সবই সম্ভব। বাস্তব জীবনের নানা সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতেও ইনি সাহায্য করেন। অন্তিমকালেও ইনি ত্যাগ করেন না। এই দেবী সুরসুন্দরীই দেহাবসানকালে মানুষের পরমাত্মাকে কোলে করে মুক্তির দুয়ারে পৌঁছে দেন। অবধূত তাঁর শিষ্যকে আরো যা বলেন তা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা গেলো:

> ..."ওই সাধকের স্পর্শ মাত্রেই সুরসুন্দরীর কৃপায় মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধি দূর হয়। সাধকের আগমনে অনাবৃষ্টিকালে বৃষ্টিপাত হয়। মহামারী দূর হয়। তবে কিনা এই সাধনা প্রেতলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নিয়ে। আর এই তত্ত্ব লাভ করতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে 'মরা' ব্যাপারটা কী? এবং মরবার পর কী দশা হয়। ধরো আমি মরে যাচ্ছি। আমার মৃত্যুদশাটা কল্পনা করো। লম্বা হয়ে শুয়ে আছি। শ্বাস নিতে পারছি না, হাত-পা সব অবশ হয়ে পড়েছে। হুঁশ আছে কিন্তু সবকিছুই আবছা আবছা দেখছি। একটু একটু শুনতে পাচ্ছি। গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যেন সমস্ত অনবরত মনে করবার চেষ্টা

> করছি, আমি হচ্ছি আমি, আমি হচ্ছি আমি। কেটে কেটে যাচ্ছে। আমি যেন আমি নই, আমি যেন হারিয়ে গেছি। আমার সঙ্গে যেন আমার একটুও সম্বন্ধ নেই। শ্বাস নিতে পারছি না। হাওয়া নেই, ডুবে যাচ্ছি। হাঁকপাঁক করছি ভাসবার জন্য। হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে গেল। কী হল? এই সার কথাটি জেনে রাখো। যদি সত্যিই একটিবার চমকে উঠতে চাও তাহলে তোমাকে মরতে হবে। খাঁটি চমকানি মাত্র একবারই চমকাই আমরা। এবং সেই চমকানিটির নামই মৃত্যু। মৃত্যু মানেই একটি চমকানি। হোঁচট খাওয়ার মতো একটা ব্যাপার। রুদ্ধশ্বাস একটা সিনেমা দেখছ। নায়িকা একটু একটু করে পোশাক খুলছে। এই বুঝি সবকিছু খুলে ফেলল। আলো জ্বলে উঠল হঠাৎ। কী ব্যাপার ? না ইন্টারভ্যাল। মরণ ব্যাপারটাও ঠিক তাই। অর্থাৎ এই আছি এই নেই। আমার দেহটা পড়ে আছে কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নেই। এটা বুঝতে অবশ্য বেশ কিছু সময় লাগে। আমি তখন চেঁচামেচি করছি। একবার বউকে ধাক্কা মারছি, একবার ছেলেকে ধাক্কা মারছি-এই ! এই! শোনো না তোমরা। কী মুশকিল। কেন শুনছ না আমার কথা ? এই তো রয়েছি। তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি।''[৬০]

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণসাহিত্যিক প্রায় আশি জন। এর মধ্যে অবধূত বিশেষভাবে ব্যতিক্রমী। অবধূত সাধক এবং ঔপন্যাসিক; তাই তাঁর আত্ম-সন্ধান তাঁর প্রায় সব লেখার মধ্যে স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। যেখানে নিছক নিসর্গ সৌন্দর্যই প্রধান কথা সেখানেও তাঁর আত্মদর্শন অত্যন্ত শিল্পিত সংযমের সাথে পরিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়েও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এর বাইরে যে কথাটি আমরা বিশেষভাবে বলতে চাই তা হলো ভ্রামণিক হিসেবে তাঁর লক্ষ্য কিন্তু কেবল নিসর্গচিত্রণই নয়,বড়োজোর নিসর্গলালিত মানুষকে চেনা আর চেনানোই তাঁর উদ্দেশ্য বলে মনে হয়েছে আমাদের। তিনি কেবল স্থানবৈচিত্র্যই দেখেননি সেই-সব জায়গার মানুষের বিচিত্র জীবন-অন্বেষণই তাঁর লক্ষ্য ব'লে আমাদের মনে হয়েছে। তাঁদের পেশা, জীবনধারণ এক্ষেত্রে লেখকের কৌতূহলকে যেন সব সময় জাগিয়ে রেখেছে। আমরা লক্ষ করেছি মিতবাক মর্মভেদী ব্যঞ্জনাদক্ষ শিল্পী অবধূতের শিল্প-সার্থকতা সংশয়াতীত। তুষারাচ্ছাদিত হিমালয় (নীলকণ্ঠ হিমালয়), কঠোর রুক্ষ মরুভূমি (মরুতীর্থ হিংলাজ), অগাধ সমুদ্র (হিংলাজের পরে), কর্ণফুলির বেগবান স্রোত (দুর্গম পন্থা),শ্মশানের নিঃসঙ্গতা (উদ্ধারণ পুরের ঘাট)---তীর্থস্থানের কুটিলতা(কোটেশ্বর মন্দির, হিংলাজের পরে), রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত (শুভায়ভবতু, সপ্তস্বরা পিনাকিনী, কৌশিকী কানাড়া, দেবারীগণ)---সর্বত্রই রূপদক্ষ শিল্পী অবধূত সমানভাবে সার্থক।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য

১. বনানী চক্রবর্তী, বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০১৩, রত্নাবলী, কলকাতা
২. জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার 'শঙ্কু মহারাজ' ছদ্মনামে লিখতেন।
৩. বিজয়রাম সেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচনা করেন 'তীর্থমঙ্গল'। খিদিরপুরের রাজা জয়নারয়ণ ঘোষালের পিতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের কাশীধাম তীর্থযাত্রার সঙ্গী ছিলেন কবিরাজ বিজয়রাম সেন। রাজার আদেশে সমগ্র তীর্থকর্মটি কবিতায় লেখেন ভ্রমণবৃত্তান্ত হিসেবে। এটি মঙ্গলকাব্যের ঢঙে লিখিত। যাত্রাপথে যা যা চোখে পড়েছে সবই লিখেছেন বিজয়রাম সেন। এমনকি গয়াধামের কোন কোন বেদীতে পিণ্ড দান করতে হয় ২৪ থেকে ৩৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী তার দীর্ঘ তালিকাও আছে। গয়া সম্পর্কে এটি একটি বিশ্বস্ত নির্দেশিকা পঞ্জী হয়ে উঠেছে।
৪. Bible, Quotation taken from Seth's Ethical Principles . P.161
৫. অবধূত,মরুতীর্থ হিংলাজ, মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ২১১
৬. অবধূত, মরুতীর্থ হিংলাজ, ভ্রমণ কাহিনী সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, নবম মুদ্রণ, ১৪১৮ পৃ. ৩
৭. ঐ, পৃ. ৪
৮. ঐ, পৃ. ৫
৯. ঐ, পৃ. ৫
১০. ঐ, পৃ. ৫
১১. ঐ, পৃ. ৫
১২. ঐ, পৃ. ৫
১৩. ঐ, পৃ. ৬
১৪. ঐ, পৃ. ১৩০
১৫. ঐ, পৃ. ১৫
১৬. ঐ, পৃ. ১৫-১৬
১৭. ঐ, পৃ. ১৬
১৮. ঐ, পৃ. ১৭
১৯. ঐ, পৃ. ১৭
২০. ঐ, পৃ. ১৭
২১. ঐ, পৃ. ১৬
২২. ঐ, পৃ. ১৬-১৭
২৩. ঐ, পৃ. ৩

২৪. ঐ, পৃ. ৬৪
২৫. অবধূত রচিত 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'উপন্যাসের পাঠকের নিবেদন, সৈয়দ মুজতবা আলী, ঈদ দিবস, ১৩৭২
২৬. আলোচ্য 'দুর্গমপন্থা' উপন্যাসটি নাতিদীর্ঘ; মাত্র ৮৩ পৃষ্ঠার। তুলিকলম ১৯৭৮ সালের জুন মাসে সুখশান্তি ভালোবাসা নামে তিনটি উপন্যাস একত্রে প্রকাশ করে। প্রকাশক ছিলেন কল্যাণব্রত দত্ত। প্রথম সংস্করণ এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল কিনা জানা যায় না। এই সঙ্কলনে প্রকাশিত তিনটি উপন্যাস হলো ১. শুভায় ভবতু ২. দুর্গম পন্থা ৩. দেবারীগণ।
২৭. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি.কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ. ৪২৭
২৮. অবধূত, দুর্গমপন্থা, সুখ শান্তি ভালোবাসা, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৫
২৯. ঐ, পৃ. ৮০
৩০. ঐ, পৃ. ১
৩১. ঐ, পৃ. ৩
৩২. ঐ, পৃ. ৩
৩৩. ঐ, পৃ. ৪
৩৪. ঐ, পৃ. ৫
৩৫. ঐ, পৃ. ৬
৩৬. ঐ, পৃ. ১১
৩৭. ঐ, পৃ. ১১
৩৮. ঐ, পৃ. ১৯
৩৯. ঐ, পৃ. ২৫
৪০. ঐ, পৃ. ২৪
৪১. ঐ, পৃ. ২৪
৪২. ঐ, পৃ. ২৫
৪৩. ঐ, পৃ. ২৫
৪৪. ঐ, পৃ. ২৫
৪৫. সৈয়দ মুজতবা আলী সরস্বতীর বরপুত্র । শোনা যায় একদা তিনি বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করে বিদ্যার দেবীর পূজাও করেছিলেন।
৪৬. অবধূত, দুর্গমপন্থা, তুলিকলম, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৫৪
৪৭. ঐ, পৃ. ৫৪
৪৮. ঐ, পৃ. ৫৪

৪৯. ঐ, পৃ. ৬১
৫০. ঐ, পৃ. ৬৫
৫১. ঐ, পৃ. ৬৫
৫২. ঐ, পৃ. ১৭
৫৩. ঐ, পৃ. ৭২
৫৪. ষষ্ঠী চট্টোপাধ্যায় অবধূতের শিষ্য ও প্রসিদ্ধ লেখক। 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' তাঁর বিখ্যাত সিরিজ।
৫৫. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রচণ্ডীমঠের ভৈরব, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩৩
৫৬. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৩৬
৫৭. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৩৮
৫৮. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৩৩
৫৯. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৩৮
৬০. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৩৮

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য :
দুর্গমে ও শ্মশানে অতীন্দ্রিয় অনুভবের স্বরূপ সন্ধান

	পৃষ্ঠা
এক. মরুমানব ও অলৌকিক ভয়	৩৭০
দুই. যমুনোত্রীর পথে দুর্গম ভৈরোঁ পাক : অবলম্বন ‘নীলকণ্ঠ হিমালয়’	৩৭২
তিন. কৈলাসে নাদানুভূতি ও দেহাতিরিক্ত আত্মার দর্শন	৩৭৫
চার. অবধূত ও ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় : মেঘনার চর ও অলৌকিক সাধু	৩৭৭
পাঁচ. গারবেয়াং থেকে কালাপানি---প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রগ-ছেঁড়া যন্ত্রণা	৩৮১
ছয়. তিব্বতের শিম্পি লিং গুহা ও অবধূতের চৈতন্যস্বরূপতার উপলব্ধি	৩৮১
সাত. পারলৌকিক প্রভাবে জীবনের বেমানন বিপর্যয়	৩৮২
আট. কোটেশ্বর তীর্থে অবধূতের দেবী আশাপূর্ণার দর্শনঃ জীবনের ভাষ্য	৪০১
নয়. চিত্তেশ্বরী মন্দিরে সাধু-দর্শন : পূর্বজন্মের কথা	৪০৪
দশ. ভৃগুগঙ্গার শূন্যে ভাসমান সাধু	৪০৫

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য : দুর্গমে ও শ্মশানে অতীন্দ্রিয় অনুভবের স্বরূপ সন্ধান

ভূমিকা

আমরা আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠঅধ্যায়ে দুলাল মুখোপাধ্যায় তথা অবধূতের কথাসাহিত্যে দুর্গম পথ আর অতিলৌকিক উপলব্ধির পরিচয় নেবো। অবধূতের সাহিত্য পড়লে জানা যায় প্রাচীনকাল থেকে কত বিপদ-সঙ্কুল স্থানকে ভারতের সাধকেরা ঈশ্বর সাধনার জন্য বেছে নিয়েছেন। এখন রাস্তাঘাট অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও সে-সব স্থানে পৌঁছাতে হয় জীবন হাতে নিয়ে। স্বভাবতই মনে হয় তীর্থ স্থানের মাহাত্ম্য এই দুর্গমতার কারণেই হয়ে থাকে। দুনিয়ার জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার স্পর্শমণি এই তীর্থগুলি সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এইরকম দুর্গমে হওয়ার কারণ বোধহয় তীর্থপথের কষ্টটুকুই পুণ্যার্থীর সাধনা। তপস্যা করলে ব্রহ্মদর্শন হয়। তাই বলা হয়েছে 'তপোহি ব্রহ্ম'। ট্রেনে চেপে তীর্থদর্শন করলে গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগে না কিন্তু 'তপ'টুকু বাকি থেকে যায়। তীর্থপথ দুর্গম হলে তীর্থে পৌঁছাতে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গুলো পর্যন্ত পুড়ে খাঁটি সোনা হ'য়ে যায়। অন্য কোনো কামনা বাসনা দূরের কথা যে উদ্দেশ্য নিয়ে তীর্থযাত্রা সেই পুণ্যকামনার ছিটে ফোঁটাও যেন তীর্থে পৌঁছে আর না থাকে ভক্তের তবেই ঈশ্বরদর্শন সম্ভব। সৎ বা অসৎ কোনো জাতের বাসনা-কামনা বুকে থাকলে ঈশ্বরকেও দেখা যাবে রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে। ঐ রঙিন কাচ ভেঙে ফেলে সব কিছু সাদা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়ার শক্তিলাভ করার জন্যই এইসব দুর্গম তীর্থদর্শন। সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা বা দুরূহ তপস্যা---শুধু এইগুলো থাকলে চলবে না! 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' 'হিংলাজের পরে'---ইত্যাদি তীর্থস্থান তাই দুর্গম। এই দুর্গম পথের বিপদ-এর বিশ্লেষণ এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পরিচয় নেওয়াই আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের ষ'অধ্যায়ে আমাদের লক্ষ্য।

'মরুতীর্থ হিংলাজ'(১৯৫৪) উপন্যাসে চন্দ্রকূপ বাবা অতি জাগ্রত বলেই তীর্থযাত্রীদের বিশ্বাস। পথও অতি দুর্গম। এই স্থানটি অঘোর নদীর আগে। করাচীর হাব নদী পার হয়ে বিশাল মরুভূমি ডিঙিয়ে অঘোর নদী। এ নদীর এ পারে সবই 'ঘোর' অর্থাৎ 'ভীষণ'---সবই

অশান্ত। ওপারে শান্তিময়ী মা। অঘোর নদীতে স্নান ক'রে মায়ের মন্দিরে উঠতে হয়। এই মন্দিরের পুরোহিত সাধক 'কোটরী পীর' নামে লাসবেলা রিয়াসতের সর্বত্র বিখ্যাত। করাচীর নাগনাথের আখড়ায় ছড়িওয়ালারা এঁকেই ডাকেন 'অঘোরী বাবা' ব'লে। এই দুর্গম তীর্থস্থানে উপস্থিত ছিলেন অবধূত। উপন্যাসে তিনি 'মোহান্ত' নামে পরিচিত। সর্বপাপ হারী চন্দ্রকূপ দেবতার পূজা-পদ্ধতি শুনেছি তাঁর মুখে। চন্দ্রকূপ বাবার পূজার জন্যে আগের রাত্রে ফলাহার করলেন পুণ্যার্থীরা। বাদাম খেজুর আর জল। রাতে বাবার জন্যে 'লোট'পোড়ানো হল। 'লোট' কি তা আমরা জানলাম। একখানা নতুন কাপড়ের চার কোণ ধরে দাঁড়ালো চারজন। প্রত্যেকে সেই কাপড়ে আধপো ক'রে আটা আর সাধ্যমত চিনি-ঘি ঢেলে দিল। অনেকে কিছু কিছু কিশমিশ বা পেস্তা বাদামও দিলো। এ সমস্ত সকলে আলাদা ক'রে এনেছে চন্দ্রকূপ বাবা আর হিংলাজ-মাঈ-এর ভোগের জন্য। নগ্নগাত্রে রূপলাল সেই চারজন লোক আর তাদের ধরা চাদরখানাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। এবার চন্দ্রকূপের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে জল দিয়ে সেই সমস্ত জিনিস ঐ চাদরের উপরেই মেখে ফেললেন। মাটির ওপর মাখা নিষেধ। মাটিতে পড়লেই হবে উচ্ছিষ্ট। তাই এত কড়াকড়ি! ততক্ষণে কুড়িয়ে আনা শুখনো ডালপালাতে আগুন ধরানো হলো। সেই প্রকাণ্ড আটার দলাটা এবার আগুনের ওপর তুলে দেওয়া হলো। সারারাত ধরে আগুন জ্বলবে তারপর নিভবে আর জুড়োবে। ততক্ষণে হবে ভোর। তীর্থযাত্রীরা সকলে সেই আগুনের ধারে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে রইলেন। ভোরে 'লোট' নিয়ে পূজা দেওয়া হবে চন্দ্রকূপ বাবার। পূজার অন্যান্য উপাচারের মধ্যে আছে নারকেল, পাথরের মালা এবং গাঁজা-কলকে। এক টুকরো লাল সালুও অনেকে নিলে চন্দ্রকূপের মাটি বেঁধে আনবে ঐ কাপড়ে! স্নান দান মন্ত্রপাঠ পিতৃপুরুষের তর্পণ---এসব তীর্থকর্ম পর্বতে ওঠার আগে সেরে নেওয়া হলো। এখানে পণ্ডিত রূপলাল মন্ত্রপাঠ করলেন এবং দক্ষিণা গ্রহণ করলেন। তারপর শুরু হলো পর্বতারোহণ। অবশেষে চন্দ্রকূপে পৌঁছলেন। মন্ত্র পড়তে পড়তে রূপলাল এক এক চাপড়া ভেঙে নিতে লাগলো সেই পোড়া মস্তবড় আটার ডেলাটার গা থেকে আর ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন চন্দ্রকূপে। সেগুলো তলিয়ে যেতে থাকলো। শেষে নারকেল এবং দশবারোটা কলকেতে গাঁজা ভ'রে ছুঁড়লেন কাদার মধ্যে সেগুলোও তলিয়ে গেলো। পাণ্ডার পূজা শেষ হ'লে যাত্রীদের পূজার পালা।

দণ্ডখাটা দুজনের আগে পূজা দেওয়ার জন্য হাত ধরে তুলে নিলেন পাণ্ডা রূপলাল। তারা উচ্চৈঃস্বরে একে একে নিজের নাম, বাপের নাম-ইত্যাদি বলে গেলো। জোরালো হাওয়ায় আর উত্তেজনার মধ্যে সবকথা কানেও গেলো না। তারপর নারকেল কলকে গাঁজা সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে অর্পণ করলে দেবতাকে। দু-হাত সামনে থেকে কাদা তুলে নিয়ে তাদের কপালময় লেপে দিলেন রূপলাল। এরপর ওরা পাণ্ডাকে দক্ষিণা দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। রূপলাল তাদের পিঠ চাপড়ে দিলেন। শেষে ওরা নিজেদের হাতে এক এক থাবা কাদা তুলে নিয়ে অন্য পাশে গিয়ে বসলো। একে এক সবাই পূজা দেবে। পোপটলালের পূজা দেওয়া হয়ে গেছে।

হঠাৎ বুজকুড়ি উঠছে না। সমস্ত জায়গাটা একেবারে প্রাণহীন নিস্তব্ধ নিথর-- যেন একেবারে

ঠাণ্ডা হয়ে গেছে চন্দ্রকূপ। যেন নীচের আগুন নিভে গেলো আচম্বিতে! সেইসাথে প্রচণ্ড ঝড়ও একেবারে স্তব্ধ! রূপলাল একটি লোকের হাত চেপে ধরেছে। তার চোখে আগুনের হলকা! লোকটা সুন্দরলাল বাজোরিয়া, সে কাথিওয়াড়ের লোক নয়। গোয়ালিয়রের মানুষ। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সী। ওর বাবা রাজকোটে ব্যবসা করে প্রচুর টাকা আর খানকতক বাড়ি রেখে মারা গেছেন। সুন্দরলাল পুত্র লাভের জন্য বিয়ে করেছেন গোটা তিনেক। তবু পুত্রলাভ হয়নি। তাই এসেছেন হিংলাজ মায়ের কাছে,এখন চন্দ্রকূপে। চন্দ্রকূপ বাবার অনুমতি নিতে এখানে এসে বংশ-রক্ষা দূরে থাক এখন নিজের প্রাণ বাঁচানোই সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ালো। সবাই উৎকণ্ঠিত--তবে সে কি ভ্রূণ হত্যা বা স্ত্রী হত্যার পাপ করেছে? সে সজ্ঞানে করেনি! তবে কেন বাবা চন্দ্রকূপ নারাজ হলেন তার পূজা নিতে? রূপলাল ঝাঁকিয়ে চললো। উত্তর নেই সুন্দরলালের মুখে। শুধু কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে তার শরীর। বলির পাঁঠার মত অবস্থা! যদি ধাক্কা দিয়ে চন্দ্রকূপে ফেলে দেয় রূপলাল! অবশেষে মোহান্তের ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্নে তার মনে পড়ে গেলো। সে একটি মেয়েকে ভালো বেসেছিলো। তার গর্ভ সঞ্চার হয়। সেই অবস্থায় তার মা তাকে তাড়িয়ে দেয়। আর কোনো খোঁজ মেলেনি। তার গর্ভ নষ্ট বা তার মৃত্যু-জনিত স্ত্রী হত্যা বা দুটোই ঘটেছে তার অজ্ঞাতে। তাই সে পাপ তারই। তখন সুন্দরলাল চন্দ্রকূপের দিকে চেয়ে দু'হাত জোড় ক'রে বলে গেলো সেই মেয়ের নাম আর তার সঙ্গে যা যা ঘটেছিল আগাগোড়া সেই কাহিনি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের নাক কান নিজের দুহাতে ম'লতে লাগলো। আবার একটি দুটি ক'রে বুজকুড়ি কাটতে আরম্ভ করলো চন্দ্রকূপে। আবার হাওয়া বইতে লাগলো। সুন্দরলালের হাতে নারকেল কল্কে গাঁজা তুলে দিয়ে রূপলাল মন্ত্রপাঠ শুরু করলো। সবাই বাবার জয়ধ্বনি দিতে লাগলো 'জয় বাবা চন্দ্রকূপ স্বামী মহারাজ,জয়!'

এক. মরুমানব ও অলৌকিক ভয়

এই চন্দ্রকূপের পথ যেমন দুর্গম তেমনি অলৌকিক প্রভাবে ভীতিপ্রদ। সে-সবের কথা শুনলে মানুষের আত্মবিশ্বাস একেবারে থাকে না। এই অধ্যায়ে পথের দুর্গমতা বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো। এ মরুপথে নেকড়ের আক্রমণ যেকোনো সময়ে হতে পারে। থিরুমল যখন উন্মাদ অবস্থায় ফিরে এলো তখন বুঝতে পারেনি গুলমহম্মদ তাই অকস্মাৎ হাঁক দিয়ে উঠলো নিমেষের মধ্যে আকাশ-বাতাস ভ'রে গেলো বহু জনের তুমুল গর্জনে। দলসুদ্ধ সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে এমনকি উট দুটোও! প্রত্যেকে হাতের লাঠি শূন্যে তুলে বিকট চিৎকার করছে। কিন্তু কেউ একপাও এগোচ্ছে না। গুলমহম্মদ আর দিলমহম্মদ মাথার ওপর টাঙ্গি বাগিয়ে ধরে হাঁকার দিচ্ছে। সবার মুখ সেই দিকে যেদিক থেকে কেউ আসছিল বলে তারা অনুমান করেছে! তাকে ভয় দেখাবার জন্য এত লম্ফঝম্ফ। পোপটলাল মোহান্তের কানে কানে তার অনুমানের কথা বললে। তার মনে হলো যে আসছিল সে থিরুমল। কিন্তু বাহেড়াও হতে পারে! গুলমহম্মদ ছাড়া কারো পক্ষে বলা শক্ত। 'বাহেড়া' বা 'বাম' বনমানুষ জাতীয় প্রাণী। তাদের স্বভাব হচ্ছে

ঘুমন্ত মানুষ চুরি করা। রাতের অন্ধকারে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে নিঃশব্দে তারা আসে। মানুষের মত দুপায়ে হেঁটে তারা চলা ফেরা করে। ঘুমন্ত মানুষের কাছে এসে তার পায়ের কাছে মুখ রেখে শুয়ে পড়ে বাহেড়া। শুয়ে তাদের লম্বা লকলকে জিব দিয়ে মানুষের পায়ের তলায় চাটতে থাকে। যত চাটে লোকটার ঘুমও তত গাঢ় হয়। শেষপর্যন্ত মানুষটি চৈতন্য হারায়। তাদের জিভের বিষাক্ত লালায় সম্ভবত এ কর্মটি হয়ে থাকে। আর যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে দেখে যে পাহাড়ের মধ্যে এক গুহায় শুয়ে আছে, কিন্তু উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তখন তার পায়ের তলায় ছাল-চামড়া আর কিছুই নেই। দগদগে ঘা পায়ের তলায়। বোঝা যায় বনে থাকে বনমানুষ, তুষার শৃঙ্গে তুষারমানব, তেমনি মরুমানব আছে মরুভূমিতে। দিলমহম্মদের স্বল্প কথায় জানা গেল যে মানুষচুরি এই মুল্লুকে হামেশা হয়ই। পরে বালুর উপর বাহেড়াদের অস্বাভাবিক লম্বা পায়ের ছাপ দেখে সবাই বুঝতে পারে কারা চুরি করলে মানুষটিকে।

এসব ভয়ের চাইতে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপা এই মরুপথ। ধুলো ঝড় আর আকস্মিক বৃষ্টি, প্রখর রৌদ্র আর লুঠেরার হাতে মৃত্যুভয় অতিক্রম ক'রে চোদ্দ দিন চোদ্দ রাত্রির পর সেই গুহামন্দিরে পৌঁছালো দলটি। প্রখর সূর্যতাপ,জলকষ্ট ও পথশ্রমে জয়শঙ্কর পাণ্ডেজীর মত পথেই মারা গেছে যারা তাদের সেখানেই বালির মধ্যে পুঁতে দিতে হয়েছে। অবশিষ্টরা অতি ভোরে যাত্রা করে অঘোর নদীর তীরে পৌঁছালেন। এখানে মন্দিরের মোহান্ত মহারাজকে পূজা দিয়ে মৃত আত্মীয়দের শ্রাদ্ধাদি কর্ম সেরে নদী পার হতে হয়। নদীর এপারে নুড়ি পাথর ওপারে পাহাড়। সেই পাহাড়ের গুহায় দেবী হিংলাজের পীঠ। নদী পেরিয়ে (সাঁতরে বা হেঁটে) কিছু দূর গেলে একটি ঝর্ণা। হিংলাজ মাতার নামে জয়ধ্বনি দিয়ে সেই ঝর্ণা পেরুলে রক্তকরবীর ঝাড় পেরিয়ে সরু পথ ধরে এগিয়ে কয়েক ধাপ উঠে অন্ধকার গুহা ঘরে মায়ের সাধন পীঠ। সে ঘরে একজন একজন করে ঢুকতে পারবে। উচ্চতা খুবই কম। সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। ঢুকতে হয় হামা গুড়ি দিয়ে। তারপর মায়ের দর্শন করে মহারাজের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়।

এরপর তীর্থযাত্রীরা দেখতে যায় আকাশ গঙ্গা। ফেরার পথে লেখক ভৈরবী এবং কুন্তী তিন জনে দিগভ্রান্ত হয়ে গরম মরুভূমিতে গোলোক ধাঁধার মত ঘুরে মৃতপ্রায় হয়ে যান। মরুভূমিতে সূর্য বড়ো ভয়ংকর! প্রথমে মাথার তালু জ্বালা করতে থাকে, পায়ের তলায় শেষ পর্যন্ত কোন সাড়ই থাকে না। নিশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়। হাঁ করা মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চলতে থাকে, ফলে গলা থেকে পেটের ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। তখন দিগ্বিদিগ্জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে কোথাও পালানো ভিন্ন অন্য কিছুই মাথায় আসে না। আর তখন সেই হিংস্র বালুর উপর তাড়াতাড়ি এগুতে গেলেই পায়ের গোছ পর্যন্ত বালুতে বসে গিয়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে হয়। সেই অসহায়তার তুলনা কোথায়? এইবার নিশ্চয়ই পরিষ্কার জমি দেখতে পাওয়া যাবে এই আশায় সেই ভোর রাত থেকে চোখের দৃষ্টি অনবরত বাধা পেতে পেতে মেজাজ পর্যন্ত বিগ্ড়ে উঠে মানুষ পাগল হয়ে যায়। কুন্তীও পাগল হ'য়ে যায়। জলের তৃষ্ণায় আর প্রচণ্ড গরমে কুন্তী পাগল হয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কেউ জানে না।

দুই. যমুনোত্রীর পথে দুর্গম ভৈরোঁ পাক : অবলম্বন 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'

নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসে অবধূত যখন খরসালি থেকে যমুনোত্রী গেলেন সেপথ অত্যন্ত ভয়ংকর! মাঝখানে একটি জায়গা পড়ে---'ভৈরোঁ পাক'। পর্বতের উপরে এই পাক পার হ'তে পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা পায়ে পায়ে। পাকটি পার হতে সময় লাগে আধ ঘন্টার মত। কিন্তু পথটি বড় সঙ্কীর্ণ। একটা পাহাড়ের গা কেটে যে পথ তৈরী হয়েছে তা মাত্র এক হাত বা দুই হাত চওড়া। পা পিছলালে কোথায় গিয়ে দেহটা আটকাবে এ চিন্তা মাথায় এলে আর 'ভৈরোঁ পাক' পার হওয়া সম্ভব নয়। লোহার খোঁচা দেওয়া লাঠি বরফে বিঁধে বিঁধে এগোতে হবে।এক জনের পিছনে একজন যাবে। পাশ কাটানোর উপায় নেই। সামনে থেকে যদি কেউ পিছলে যায় তাহলে তার দিকে চাওয়া যাবে না। যে গেছে সে গেছে। যে আছে তাকে নির্বিকার ভাবে মুখ বুজে এগোতে হবে। যমুনা মায়ের কৃপা হলে অবশ্যই পার হ'তে পারবে। সকালবেলায় যাত্রীরা উঠে যেত 'ভৈরোঁ পাক' দিয়ে। তারা নেমে আসত বিকেলে। কাণ্ডি ডাণ্ডি ভৈরোঁ পার হতে পারে না। যত ধনীই হোক ভৈরোঁ পাক নিজের পায়ে পার হতে হয়। যদিও যারা ডাণ্ডি কাণ্ডি বয় তারাই হাতে ধরে পার করে নিয়ে যেতে পারে। ঐ ভৈরোঁ পাকের জন্য স্বভাবত সেকালে বেশি লোক যমুনোত্রী যেত না। খরসালির লোকে কথককে বাধা দিয়েছিল কিন্তু কথক শোনেন নি। ঘন্টা দুয়েক মুখ টিপে চলার পর 'ভৈরোঁ পাক' শুরু হল। বরফ পড়তে পড়তে এমন ঢালু হয়ে গেছে যে সেই সরু পথে পা দেওয়ার কথা চিন্তা করাও যায় না। মহাত্মা চললেন তাঁর সামনে। ইনি নগ্নগাত্রে' চলেছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই জয় করেছেন। মহাত্মার ডান হাতে রয়েছে সেই চিমটে। চিমটের মুখ ডান পাশে গিঁথে দিয়ে এক পা বাড়িয়ে বরফের ওপর রাখলেন। একটু পরে আর এক পা তুলে সেখানে রেখে দাঁড়ালেন। তারপর হেঁচকা মেরে চিমটে তুলে নিয়ে হাত খানেক বা হাত দেড়েক সামনে আবার বিঁধলেন। অবধূতকে বললেন কোনও ভয় নেই, যেখান থেকে তিনি পা তুলবেন সেখানে একটা খাঁজ পড়বে সেই খাঁজে পা দিয়ে যেন তিনি উঠে দাঁড়ান। বরফ গলছে না তাই পা পিছলাবে না কিছুতেই। মহাত্মার ভরসায় ও সাহায্যে তিনি পার হলেন ভৈরোঁ পাক।

যমুনোত্রীতে শুধুই বরফ। চারিদিকে সাদা! শুধু তপ্ত কুণ্ডের আশেপাশে পাথর দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে একটি কাঠের ঘর। তার প্রায় সবটুকু ঢেকে গেছে বরফে। বরফ কেটে নইলে বরফ গলে গেলে তবে সে ঘরে ঢোকা যাবে। ধর্মশালা এই একটিই। সে সময় যাত্রীরা সকালে উঠে বিকালে নেমে যেত। রাতে থাকত না কেউই। যেটুকু সময় থাকত তারা তপ্ত কুণ্ডের আশে পাশেই কাটাত। তপ্ত কুণ্ডে আলু চাল ফেলে দিত গামছায় বেঁধে। অনেকে আবার আটা মেখে ডেলা পাকিয়ে ফেলত। কিছুক্ষণ পরে সেগুলো সিদ্ধ হয়েই ভেসে উঠত জলের ওপর। তখন চিমটে ধরে তুলে নিত ওপরে। সেটাই 'যমুনোত্রী মাঈর প্রসাদ'। এটা খেয়ে যাত্রীরা দিনটা কাটিয়ে বিকালে 'খরসালি'তে ফিরত। কথক ওরফে অবধূত কয়েক হাজার ফুট ওপরে

উঠে আকাশকে দেখলেন আয়নার মত। এখন ফেরা আর সম্ভব নয় মহাত্মার সাথে রাত্রে এখানে থাকার কথা ভেবে তিনি রোমাঞ্চিত হলেন। যমুনোত্রীর দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হলো সেখানে কাকে তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন। যেখান থেকে জল নেমে আসছে সেদিকে তাকিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। মহাত্মা বুঝলেন যে ঘুমের ঘোরে কথকের বিভ্রম হচ্ছে। এখন যদি ঘুমিয়ে পড়ে তবে মৃত্যু নিশ্চিত। তাই ঘুমাতে নিষেধ করে চিমটার মাথা থেকে আংটা খুলে হাতের ওপর ঠুকে একখানা দানা বের করে কথকের হাতে দিয়ে বললেন :

> "বিশ বা ত্রিশবার রাম রাম বল জিভের ডগায় নিয়ে তার পর থুকে ফেলে দাও। এখানে ঘুমিয়ে পড়লে ঘুম আর ভাঙবে না। এস আমরা তফাতে গিয়ে বসি। গরম জলের তাপ লেগে ঐ রকম গোলমাল করছে।"[১]

মহাত্মার আদেশ পালন করে শরীরে তাপ এলো এখন খুব গরম বোধ হচ্ছে। বরফের ভেতর গিয়ে বসলে যেন শরীর জুড়ায়। কাঁধে বুকে বরফ পড়ছে। কথক ভারি আরাম বোধ করছেন। যেন চৈত্রমাসের গরমে পানা পুকুরে দুপুরের রোদে গা ডুবিয়ে বসে আছেন। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ষোলো আনা জেগে উঠেছে তাঁর। এখন কথকের মাথায় চিন্তা একটিই। এই অমৃত দানা কীভাবে পাওয়া যাবে। এখানে দেখা হলো এক বিপ্লবীর সাথে তিনি ফাঁসির দড়ি এড়াতে এসে আছেন এখানে। তিনিই এই অমৃতদানার আবিষ্কারক। তাঁকে বললেন :

> "তুমি তো ঠিক গাড়ল নও। খিদে তেষ্টা জয় করে ভেলকি দেখাবে এইজন্যে অনর্থক নষ্ট করছ জীবনটাকে, ছিঃ।"[২]

এরপরে তিনি সেই সাগরেদ ওরফে মহাত্মাকে বলেছিলেন পরদিন যেন তিনি কথককে ভৈরোঁ পাক পার করে দিয়ে আসেন। কথক যদি কোনো বিপদ ঘটায় এই সন্দেহ তাঁর সাকরেদটি প্রকাশ করলে সেই বিপ্লবী যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে তাঁর কী পরিমাণ সাহস ছিল তা বোঝা যায়।

> "এর মত মানুষকেও যদি ভয় করে চলি তাহলে বাঁচব কেমন করে। যাও, ওকে নামিয়ে দিয়ে এসো। ওপারের রাস্তা চলবার মত হ'য়ে এসেছে, তাড়াতাড়ি যদি চলতে পারি আমরা তাহলে বরফ গলবার আগেই তিব্বতে ঢুকতে পারব।"[৩]

খরসালি থেকে টিহরী হয়ে উত্তরকাশী যাওয়ার পথটিও বড় দুর্গম। এখানে আসার আগে দেখা হলো বিন্দেশ্বরী প্রসাদ ভরদ্বাজের সাথে। খরসালি থেকে তিন দিন কি চারদিন হাঁটার পরে একটা গর্তের মুখে এসে থামলেন। কালীকম্বলীর পুথিতে লেখা ছিল একটি চটির কথা। কিন্তু একি! রাস্তা চেঁচে পুঁছে বাঁ পাশের খাদের মধ্যে নেমে গেছে। অগত্যা ধুনি জ্বালিয়ে রাত কাটাতে হবে বলে কাঠ সংগ্রহের জন্য পাহড়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন সব পরিষ্কার! যেন হিমালয়ের মুখে কোনো নাপিত দাড়ি কাটার ক্ষুর চালিয়েছে! ভাঙা ডালপালা জোগাড় করে ধুনি জ্বালাবার আয়োজনে প্রাণপণে ফুঁ দিচ্ছিলেন উপুড় হয়ে। কেবল ধোঁয়া উঠছে। এমন সময় কে যেন পিঠে সজোরে কিল কষালো। এরপর গুড়গুড় গুড়ুম গুম গুম করে গোটা পাহাড় যেন নেমে এলো পালাবার পথ পেলেন না। চাপা পড়া ছাড়া উপায় নেই এমন সময় একগাছা দড়ি চাবুকের বাড়ির মত এসে লাগলো গায়ে সাথে সাথে চিৎকার। দড়িটা ধরতে বলছে।

দড়ি ধরে হাতে পেঁচিয়ে খানিকটা টানার পরে ওদিক থেকে টান পড়লো এইভাবে প্রাণে বেঁচেছিলেন। এখানে থাকার সময়েই তিনি মৌনীবাবা হয়ে উঠলেন।

অবধূত এই মৌনী অবস্থাতেই বিদুর বাবার খপ্পরে পড়েন। বিরাট আকারের ওলের গ্যাজ বেরুলে যেমন লাগে এর মাথাটা বিরাট ভুঁড়ির উপর তেমনি ভাবে থাকে। এঁর পা দুটো অকেজো। ভয়ঙ্কর নামজাদা এই মহাপুরুষ। কচ্ছ সিন্ধু কাথিওয়ার অঞ্চলের হিন্দু জৈন এমনকি পারসী সম্প্রদায়েরও বিরাট বিরাট ধনীদের পরম পূজ্য গুরুদেব এই বিদুর বাবা। জুনাগড়ে[৪] ওঁর ফটোর সামনে নিত্য পূজা-উপাসনা হয়। প্রচুর উপার্জনের জন্য প্রচুর পাপ করতে হয় বিদুরবাবা সেই পাপ গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই প্রায়শ্চিত্ত্যের বিধান দেন। সাধারণত মেয়েরাই প্রায়শ্চিত্ত্য করে। কথকের চোখের সামনে একটা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের নারীকে উলঙ্গ করে আর দুটি নারী পিটাতে লাগলো চড় কিল লাথি চুল ধরে টানাটানি খামচানি, বিদুর বাবার নির্দেশে দেহের বিশেষ বিশেষ জায়গায় মোচড় দেওয়া বহুক্ষণ ধরে এসব চলল। মেয়েটি চোখ বুঁজে মুখ টিপে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করলো। কথক বিদুর বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলেন পৈশাচিক তৃপ্তিতে সেই পিশাচের দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। এই ভাবে তিনি কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন। ভক্তেরা বিশ্বাস করেন যুগ যুগ ধরে একাসনে বসে ধ্যান করার জন্য কুঁচকি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। পা দুটো কেবল কালোচামড়া দিয়ে ঢাকা দুটো কাঠি যেন! বিদুর বাবার বিশেষ প্রীতি ভাজন এক বিপুল দেহধারিনী মহিলা। কথক যাকে দেখেই বলেছেন খাণ্ডারণী। তার ইচ্ছা কথকের শরীরটা নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত্যের কাজ করে! এও এক ধরনের বিকৃত কাম পিপাসা! কথক যশোমতীর পারেখের কাছে পালানোর পথে সবই শুনেছিলেন।

যশোমতী নামের এক নারী নিজে পালাবার চেষ্টা করছিল। সে কথককে সঙ্গে নিয়ে পালায়। বিশ কি পঁচিশ দিন এই যশোমতীর সাথে তাঁকে কাটাতে হয়। কখনো গভীর জঙ্গলে কখনো পাহাড়ের গর্তে! প্রাণ বাঁচাতে চিবুতে হয়েছে গাছের পাতা! নাগ মহারাজের আশ্রমে অসংখ্য সাপের মধ্যেও ছিলেন। এখানে সাপেরা কাউকে কিছু বলে না। শেষ পর্যন্ত বহু বিপদের মধ্যেও তারা পালাতে সক্ষম হয়। সেখানে বসে তিনি ভেবে নিলেন যে এখান থেকে সোজা নেমে যাবেন গঙ্গার কাছে। গঙ্গা পার হলে পেয়ে যাবেন ত্রিযুগী নারায়ণ যাওয়ার রাস্তা! সেখানে যেতে পারলে কেদার বদ্রী যাওয়ার পথ মিলবে। ত্রিযুগী নারায়ণের আগেই নাগরাজের আশ্রমে যশোমতী পারেখ চলে যায়। আর কথক চলেন নিজের রাস্তায়। এসময় রক্ত আমাশয়ে ভুগে মৃতপ্রায় হয়েছিলেন। ত্রিযুগী নারায়ণে। এসময় তাঁকে বাঁচান জিওলজিক্যাল সারভে অফ ইণ্ডিয়ার এক সাহেব তাঁর নাম এনডেন। তাঁর স্ত্রীর নাম জুলী। এঁরা গৌরীকুণ্ডে তাঁবু পেতে ছিলেন। তাঁদের যশোদা পারেখ বলে গেছেন এই মৃতকল্প অসুস্থ সাধু মৌনী। বড় একজন যোগী। পুণ্যলোভাতুরা জুলী মেমসাহেব ও তাঁর স্বামীর বিস্তর সেবা যত্নে ওষুধপত্রের সাহায্যে তিনি সেরে ওঠেন। এরপর গৌরীকুণ্ড থেকে রামওয়াড়া হয়ে কেদার যাবেন। কম্বল, পোশাক,খাবার প্রচুর দিলেন সাহেব দম্পতি। রামওয়াড়া এসে কোনো লোককেই পেলেন না। পথের দিকে

চেয়ে দেখলেন কোনো রাস্তা নেই। শুধু বরফ আর বরফ। কথকের ভাষায় :

'বরফ, সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে মায় পায়ের তলায় সর্বত্র সাদা বরফ। অগুনতি উলঙ্গ সাদা পিশাচ পিশাচী বরফের ভেতর থেকে বেরিয়ে আমার চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে হা হা হি হি করে হাসি জুড়ে দিলে যেন। প্রাণপণে দু চোখ বুজে দু হাতে দু কান চেপে উবু হয়ে বসে পড়লাম।'[৫]

তিন. কৈলাসে নাদানুভূতি ও দেহাতিরিক্ত আত্মার দর্শন

তার পরে কীভাবে গেলেন কেদার সে কথাটা অনেকদিন পরে বলেছিলেন ব্রহ্মাবধূত পরমহংস দেবীদাসকে।[৬]

''এইখানে তুমি একবার তোমার ঐ খোলসটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলে।' আরো বললেন 'দেহটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলে, দেখেছিলে যে তোমার দেহটাকে কেউ টেনে নিয়ে চলেছে। অসম্ভব সম্ভব হল, যে জায়গা কোনো মতেই মানুষ পার হতে পারে না, সেই জায়গা নির্বিঘ্নে পার হয়ে তোমার দেহ কেদারনাথে পৌঁছে গেল। তারপর তুমি আবার দেহের মধ্যে আশ্রয় নিলে। এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল নিজে থেকে। কি করেযে ঘটল তা তুমি নিজেও জান না।''[৭]

কেদার পৌঁছে দেবীদাসবাবা বললেন :

''এইখানে তুমি সেবার নাদ শুনেছিলে। বহুদিন ধরে চেষ্টা করলে মন বুদ্ধি আজ্ঞাচক্রে লীন হয়ে যায়। তখন হয় আত্ম দর্শন। আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নাদানুভূতি হয়। 'আত্মদর্শেনমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ন সংশয়। তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন কর্তব্যং স্বাত্মদর্শনম্॥ এই আত্মদর্শন যে কার কিভাবে হবে তা কেউ বলতে পারে না। যোগশাস্ত্রে কত রকমের উপায় বলা হয়েছে। কিছুই তোমাকে করতে হয়নি, সবই হয়ে গেল।''[৮]

অবধূতের আধ্যাত্মিক জগতের পরিচয় পেতে দুটি উৎস আমাদের অবলম্বন। তাঁর রচিত উপন্যাস ও ছোটগল্প এবং তাঁর পরিবারের মানুষ, আত্মীয়-স্বজন, শিষ্য বা অবধূতের সাথে যোগাযোগ ছিল এমন ব্যক্তি। তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে 'নীলকণ্ঠ হিমালয়', 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'সাচ্চা দরবার', 'দুর্গমপন্থা,' 'হিংলাজের পরে'---ইত্যাদিতে আমরা অবধূতের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির স্বরূপ নিরূপণ করবো। প্রথমেই বলে রাখা ভালো অবধূত-পরিবারের মানুষ ছাড়া অন্যান্য নির্ভরযোগ্য লৌকিক উৎস আর এখন পাওয়া সম্ভব নয়। অবধূতের সমকালীন কেউ আর বেঁচে নেই। তাঁর পুত্রবধূ অমলের মা সূচনা দেবী এবং পৌত্র তারাশঙ্কর এ বিষয়ে তেমন কোনো মন্তব্য করেননি। অবধূতের মুখে সূচনা দেবী হিঙ্গুলা মাতার মন্দিরে জ্যোতি দর্শনের কথাটি শুনেছিলেন। চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরের জোড়াঘাটের বাড়িতে তিনি অবশ্য বর্তমান গবেষকের কাছে সেকথা স্বীকার করেছেন। ভৈরবীমাতা এবং অবধূতের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন

ষষ্ঠীপদ মুখোপাধ্যায়। ইনি অবধূতের মৃত্যুর পরে তাঁর লেখা ‘রুদ্রচণ্ডী মঠের ভৈরব’ গ্রন্থে অবধূতের অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলেছেন। এছাড়া ‘প্রসাদ’[৯] নামের পত্রিকায় অবধূতের জীবনের অলৌকিক ঘটনার কথা লিখেছেন। তিনি যে অনেক ক্ষমতাশালী সন্ন্যাসীর প্রীতি অর্জন করেছিলেন তা আমরা সেখান থেকে নানা প্রসঙ্গে জানতে পারি। অবধূত অলৌকিক শক্তির অধিকারী বহু সন্ন্যাসীকে দেখেছিলেন বলে তাঁর মধ্যে অলৌকিক সাধনার প্রতি বিশ্বাস এসেছিল গভীরভাবে। যিনি বিশ্বাস করেন তিনি সফল হন। স্বামীজী বলেছেন সেই ব্যক্তিই আস্তিক যে নিজেকে বিশ্বাস করে। এই অধ্যায়ে তাই অবধূতের আধ্যাত্মিক জগতে বিশ্বাসের পটভূমিটি আমরা জেনে নেবো। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে অবধূতের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ আগে থেকেই ছিল। এখন একটি ঘটনার কথা বলা যায়। জানিয়েছেন ষষ্ঠীপদ মুখোপাধ্যায়। অকুস্থল অবধূতের জোড়াঘাটের বাড়ি।

> “এত বেড়াল পুষেছেন কেন স্বামীজি?’অবধূত হাসতেন, বলতেন,‘কেন পুষেছি জান? এদের মধ্যে হঠাৎ করে যদি কোনওদিন একটা দধিমুখী বেড়ালের আবির্ভাব হয় তো আমার কপাল খুলে যাবে।”[১০]

একদিন অবধূত জোর করে নিজের সন্ন্যাস বেশ পরিয়ে দিয়েছিলেন ষষ্ঠীপদ মুখোপাধ্যায়কে। কালক্রমে এই নতুন সন্ন্যাসীর নানা অভিজ্ঞতা হয় সেকথা আমরা জানতে পারি। তাঁর সূত্রে আমরা অবধূতকে বুঝে নিতে পারবো। অবধূতের নির্দেশে ষষ্ঠীপদ তখন সন্ন্যাসী। সে সময় ধরণীবাবার আশ্রমে গেরুয়াধারী ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ‘সতী’ নামে একটি মেয়ের স্বামী সেজে বাস করেছিলেন একঘরে। সে সময়ের কথা বলেছেন অকপটে।

> “সবাই জানল আমিই ওর স্বামী। ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম আবার ফিরে এসেছি। জয়চণ্ডী মঠের সেই নির্জন আশ্রমে দিন গুলি আমার ভালোই কাটতে লাগল। আমি আসার পর থেকে বাজে লোকেদের উপদ্রব একেবারেই কমে গেল। সতী লোক দেখিয়ে বাইরের লোকেদের কাছে আমাকে তার স্বামী বলে পরিচয় দিত। উঠানে বসে স্নান করলে নিজে হাতে গা মুছিয়ে দিত। এসব হত দিনের বেলায়। রাতে তার অন্য রূপ। ...এই অবস্থায় কতদিন থাকা যায়? আগুনের পাশে ঘি গলবেই। তাই চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। চিত্ত দুর্বল হয়। সতীকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে।’ ...খুব ভোরে উঠে কাউকে কিছু না জানিয়ে নদী পেরিয়ে সোজা চেপে বসি সিউড়ির বাসে।”[১১]

জোড়াঘাটে ফিরে ষষ্ঠীপদ সব বলেন কিন্তু চেপে যান সতী-প্রসঙ্গ। কিন্তু জানতে পারেন অবধূত : ‘আমাকে লুকোবার চেষ্টা কোরো না বাছাধন। বক্রেশ্বরে গিয়ে ঠিক কী হয়েছিল বলো তো?’---এর পর ষষ্ঠীপদ জানিয়েছেন :

> “আমার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। কার কাছে কী গোপন করছি আমি। এতদিনেও যাঁকে কখনও ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে ধ্যানস্থ হতে দেখলাম না,জপতপ যে উনি কখন কোন সময়ে করেন তাও জানতে পারলাম না তিনি যে কী করে

> সবকিছু জেনে ফেলেন এটাই আমার কাছে পরম বিস্ময়। সত্যিকারের সিদ্ধযোগী না হলে এ কখনও সম্ভব হয়? ওঁকে সাধন ভজনের কথা কিছু জানতে চাইলেই অকপটে বলে দেন,'সব বুজরুকি। পেট চালানোর ফিকিরে এইসব করা হয়।'[১২]

---এ থেকে বোঝা যায় প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও অবধূত সবার কাছে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। মানুষ যা লুকিয়ে রাখতে চান তাকে হাতে পাওয়া প্রমাণের জোরে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আধ্যাত্মিকতার জগৎ এমনটাই প্রসঙ্গত তা আমাদের মনে রাখতে হবে।

লতা সাধনা

অবধূত ষষ্ঠীপদকে বলেছিলেন যেন এই সাধনার কথা কাউকে তিনি না বলেন 'লতা সাধনা হল অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার একটি সাধনা। তন্ত্রমতে দেহসাধনার একটি ধারা অনেকটা এইরকম। ---অবধূত নিজের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন :

> ''স্ত্রীলোকের টাটকা মৃতদেহ চুরি করে নিয়ে গিয়ে এমন কাণ্ড করতে দেখেছি যা একেবারেই অবিশ্বাস্য। লতা সাধনা অনেকটা ওইরকমই। বহুদিন শ্মশানে-মশানে বসে থেকেছি, অস্বাভাবিক কাণ্ড কত দেখেছি। উদ্ধারণপুরের ঘাট বইখানি যখন পড়েছ তখন নিশ্চয়ই মনে আছে সেই আমঅতনের কথা? আমঅতন মড়া খেলাত। হাড়ি,ডোম, বাগদীদের ঘরে কোনও বউ ঝি মলে আমঅতন আর তার ভাইপো আমজীবন তেড়ে গিয়ে তাদের কেড়ে নিয়ে আসত গঙ্গায় দেবার জন্য। কোনও আত্মীয়স্বজনকেই সঙ্গে আসতে দিত না। ভয় দেখাত। সোমত্ত মেয়েছেলে মরেছে। ওর কি সাধ-আহ্লাদ মিটেছে গো? সঙ্গে যদি কেউ যাও তাহলে ও ঠিক তাদের ঘাড়ে চেপে ঘরে ফিরবে। ওইরকম ভয় দেখানোর দরুন সঙ্গে কেউ আসত না। আর ওরা তখন সেই মড়া নিয়ে রাতের অন্ধকারে যা খুশি তাই করত। সচক্ষে দেখেছি আমি মড়া খেলানো ব্যাপারটা কী। লতা সাধনাও ঠিক এমনই একটা ব্যাপার।'' [১৩]

এখানে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন অবধূত। বলেছেন 'যা খুশি তাই করত'। বিকৃত কাম-পিপাসার চরিতার্থতাই ছিল আমঅতন আরতার ভাইপো আমজীবনের লক্ষ্য। সাধকেরা এই দেহ সাধনার মাধ্যমে সুরসুন্দরীকে জাগ্রত করেন। কেন সাফল্য আসে আর ব্যর্থই বা হতে হয় কেন এ পরিচ্ছেদে আমরা তার উত্তর খুঁজবো।

চার. অবধূত ও ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় : মেঘনার চর ও অলৌকিক সাধু

অবধূত সন্ন্যাস জীবনে নানা সাধুর সাথে শ্মশানে মশানে তান্ত্রিক সাধনায় মগ্ন হ'য়ে রাতদিন বহু বছর কাটান। এ সময় তিনি সাহেব হত্যার দায়ে ফেরার ছিলেন তাই পুলিশের নজর

এড়িয়ে চলতেন। তবে এ বিষয় নিশ্চিত যে কেবল সন্ন্যাসীর ভেক নয় সাধনাও চলত পাশাপাশি। নিজের জীবনে দুর্যোগকে আধ্যাত্মিক সাধনার সুযোগে রূপান্তরিত করেন অবধূত। বিভিন্ন সাধু সঙ্গ আর দুর্গম জীবনের আলোচনা সূত্রে স্বভাবতই আলোচ্য অভিসন্দর্ভের ষ'অধ্যায়টি তাঁর জীবনে অতিন্দ্রীয় অনুভবের স্বরূপটি বুঝে নিতে সাহায্য করবে।

১. ''ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মাইল আষ্টেক দূরে বেহার গ্রাম। বেহার গ্রাম থেকে মেঘনার চর বিশেষ দূরে নয়। সেখানে থাকতেন এক সাধক। সত্যি সত্যি তিনি মড়া খেলাতেন। কীরকম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি আগে তাই বলি। আস্ত এক বোতল মদ তিনি শুষে নিতেন নিজের পুরুষাঙ্গ দিয়ে। বোতলের মুখে সংযোগ করে এক অদ্ভুত উপায়ে কুম্ভক করতেন আস্তে আস্তে। বোঁ বোঁ করে শব্দ হত। সবাই দেখত মদটা কমতে কমতে এক সময় নিঃশেষ হয়ে গেল। ছটাক খানেক গাঁজা একটা কলকেতে পুরে আগুন চাপিয়ে তাঁর হাতে দেওয়া হল। একটানে গাঁজাটা তিনি ছাই করে ফেললেন। এতটুকু ধোঁয়া বেরলোনা নাক-মুখ দিয়ে। খানিক পরে ধোঁয়াটা বেরোতে লাগল তাঁর পুরুষাঙ্গ দিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে বেরিয়ে হাওয়ায় উড়ে গেল। অলৌকিক কাণ্ড আরও বহুজাতের করতেন তিনি অনায়াসে।''[১৪]

২. অবধূতের মুখে শুনে তাঁর ভক্ত ও লেখক ষষ্ঠীপদ মুখোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন তাঁর গুরুদেবের অলৌকিক ঘটনা দেখার কথা। অবধূত তাঁকে জানিয়েছিলেন আর সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেছেন ষষ্ঠীপদ মুখোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার পরের গ্রাম গৌতমপাড়া। সেদিন সেখানে যাত্রা চলছিল। কলকাতা থেকে খুব নামজাদা এক যাত্রার দল গেছে। রাজা কমলারঞ্জনের কাছারি ছিল ওই গ্রামে। কাছারির নায়েব যাত্রা করাচ্ছেন, শীতকালে। আকাশে ছিটে ফোঁটা মেঘ নেই। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। মস্ত সামিয়ানা উড়ে গেল। হ্যাজাগ লণ্ঠনগুলো চুরমার হয়ে গেল চোখের নিমেষে। সে এক প্রলয় কাণ্ড। এনায়েৎ খাঁ সাহেবের দাদা উপস্থিত ছিলেন সেই আসরে। ঝড় জল মাথায় করে ছুটলেন তিনি তাঁর গুরুর কাছে। অর্থাৎ মেঘনার চরে যেখানে সাধক থাকতেন। গিয়ে দেখেন গুরু নেই। এদিকে কীভাবে যেন ঝপ করে ঝড় জল বন্ধ হয়ে গেছে তখন। অন্যদিকে গুরুকে না পেয়ে ফিরে এলেন খাঁ সাহেব। এসে দেখেন তাঁর গুরু আসরের মাঝখানে জাঁকিয়ে বসে আছেন। বোতল বোতল মদ আর কলকে কলকে গাঁজা ওড়াচ্ছেন। সামিয়ানা খাটিয়ে হ্যাজাক জ্বালিয়ে আবার আসর বসার আয়োজন হচ্ছে। সেই সাধক ছিলেন মুসলমান। সিলেটে প্রসিদ্ধ শাহজালাগের দরগায় আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয় অবধূতের। বেশ বুড়ো হয়েছেন। চুল দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। উলঙ্গ থাকেন না আর। ভক্তরা বহুমূল্য পোশাক পরিয়েছে। হরদম গোলাপজল আর আতর ছিটানো হচ্ছে। ফকির সাহেব বেদম পান চর্বণ করছেন। মোটা সোটা তাকিয়ার মাঝখানে দিনরাত একভাবে বসে আছেন। কারও সঙ্গে একটি কথাও বলছেন না। অবধূত চিনতে পেরেছিলেন চোখ দুটো দেখে। সম্পূর্ণ সাদা চোখ দুটি।

> চোখে তারা আছে বলে মনেই হয় না। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মেঘনার চরে দেখেছিলেন ওই চোখ দুটি। ও চোখ ভোলা শক্ত। দুদিন দু'রাত ঠায় বসে রইলাম ফকির সাহেবের দরবারে। তারপর ওঁর দয়া হল। ওঁর এক চ্যালা এসে বলল, 'শিগগির চলুন, ফকিরসাহেব আপনাকে ডাকছেন।'[১৫]

---এরপর ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মেঘনার চরে অবধূত মড়া খেলানো ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেন। অবধূতের জবানীতে লিখেছেন ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় :

> "কিছুই করেন না। দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা বিজবিজ করে বকেন শুধু। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠেন। অশ্রাব্য গালাগালি দেন। কখনও বা হাসেন নিজে নিজে কিংবা ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। বেশ বোঝা যায়,অদৃশ্য কারো সঙ্গে সদা আলাপ করছেন। তাঁর সঙ্গে প্রেমালাপও যেন জুড়ে দিয়েছেন। দেখছি আর ভাবছি, কার সঙ্গে অমন মধুর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন সাধু? হঠাৎ একদিন রাতে রহস্যটা আর রহস্য রইল না। চাক্ষুষ দেখলাম। কী করেন সাধু। কীভাবে তাঁর অদৃশ্য বন্ধুটিকে সন্তুষ্ট করেন।"[১৬]

এরপর অবধূত যা দেখেন তা এরকম : তখন অনেক রাত অবধূতকে ঠেলে তুললেন সাধু। বললেন 'একটি আধার এসেছে। তোমাকে একলা থাকতে হবে কিছুক্ষণ। যাব আর আসব। বেশি দেরি হবে না।'

বলেই জলে ঝাঁপ দিলেন কিছুক্ষণ ছপছপ শব্দ শোনা গেল পরে সে শব্দ মিলিয়ে গেল। শেয়াল দুটো ছটফট করছে। সাপকটা কেবল নিশ্চিন্তে আছে। বিবশ অবস্থায় কতক্ষণ সময় কেটেছিল বলতে পারেন না। আবার সেই ছপছপ শব্দ শোনা গেল। সাধু হুকুম করলেন আগুন করতে। চালা থেকে খড় নামিয়ে আগুন জ্বালাতে হবে। কী একটা ভারী জিনিস তিনি বয়ে আনলেন বিড় বিড় করছেন 'পেয়েছি। পেয়ে গেছি এইবার দেখা যাক তুমি ধরা দাও কিনা।'

জ্বলে ওঠা আগুনে দেখা গেল এক নগ্ন সর্বাঙ্গ যুবতী শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। অপর্যাপ্ত ভিজে চুলে মুখটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। মনে হল যুবতীর দেহ কেউ মোম দিয়ে তৈরী করেছে। সাধু বললেন যে মড়াটাকে একটু সেঁকা দরকার। বোধহয় কাল মরেছে। শক্ত হয়ে গেছে শরীরটা। একটু সেঁকলেই নরম হবে। চালার নীচে পাটকাঠি আছে। তা দিয়ে তাপ দেওয়া হলো।

সাধুর নির্দেশ মত গাছের ডালে মাচার ওপর উঠে গেলেন কিন্তু লক্ষ্য রাখলেন সাধুর ক্রিয়াকাণ্ডের উপর। এরপর বেঁচে উঠল এই শব। 'তার দুচোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি অথচ মুখে মধুর হাসি। আমি ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। যুবতী এবার হাঁটু গেড়ে বসে সাধুর সঙ্গে বিপরীত রতিতে মিলিত হল উন্মত্ত রতিক্রিয়ায়'[১৭]। তবে আমার দিক থেকে একবারের জন্যও দৃষ্টি ফেরাল না। ব্যাপারটা কতক্ষণ চলেছিল বলা খুব কঠিন। কেননা সে সময় বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল আমার। এই শক্তি অর্জনের নেশা মানুষকে কীভাবে নিজের জীবন বলি দিতে প্রেরণা দেয় সেই প্রসঙ্গে আর এক দুর্গমতার পরিচয় আমরা নেবো।

অবধূত বলেছেন 'বিশ্বাসবিহীন বুক হচ্ছে শ্মশান, যেখানে শব পোড়ে। মন তখন শব,

সেই শবের ষোলকলা পূর্ণ হবে কেমন করে!' [১৮] বজ্রগিরির সাথে মানস সরোবর চলেছেন কথক তথা অবধূত। সশিষ্য বজ্রগিরির বিশাল এই দলেই পরিচয় হয় লোধা সিং-এর সাথে। ছিন্নমস্তার সাধক লোধা সিং। এর বাড়ি ছিল কাঙ্গরায়। পাঠানকোট থেকে জ্বালামুখী তীর্থে যেতে হয়। জ্বালামুখী মহাপীঠ! পাথরের গায়ে আগুন জ্বলে। সেখান থেকে উদয়স্ত হাঁটলে দুদিনে তার বাড়ি পৌঁছানো যায়।এখানে ছিন্ন মস্তা বছরে কয়েকবার নররক্ত পান করেন। কে বা কারা যে নরবলি দিয়ে যায় সেখানে তা কেউ জানতে পারে না। তিব্বতের পথে কেউ কারো ভার নেন না। যদি রোগ হয়, চলতে না পারে সে পড়ে থাকে বরফের বুকে। দয়া মায়া প্রেম করুণা সব মিষ্টি মিষ্টি কথা পৌঁছতে পারে গারবেয়াং পর্যন্ত! গারবেয়ং থেকে কালাপানি তারপর লিপুধরা। লিপু পাস। কালী নদীর উজানে চলেছেন। নীচে কালীনদী শোরগোল তুলে প্রবাহিত। অবিরাম চিৎকার পোকামাকড়ের সাথে অতি উৎকট হাসির শব্দ! এক জাতের নেকড়ে এরকম ভাবে ডাকে। এরা এমনই হিংস্র যে খিদে পেলে দলসুদ্ধ সবাই পরামর্শ করে একজনকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে! ওদের হাসি থামলে শুরু হয় কান্না। নাকী সুরে ঐ কান্নার শব্দ নাকি ভয়ংকর অমঙ্গলকর। এটা পাহাড়ীরা বিশ্বাস করে।

ধনেশ পাখির মত প্রকাণ্ড ঠোঁট ওয়ালা এক জাতের পাখি ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে থাকে ঐ সময় ডিম পাড়ে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুবার পর বাচ্চা নিয়ে নিচে নেমে যায়। নিদারুণ ঠাণ্ডায় বাচ্চারা চিঁচিঁ করে চেঁচায়। এর আওয়াজ সত্যিই ভয়াবহ। ইনি অবধূতের বন্ধু হয়ে পড়েন। ছিন্ন মস্তাকে লাভ করার সাধনায় মরতে বসেছিলেন সে কাহিনি লোমহর্ষক! লোধার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে একজন তাকে জ্যান্ত পুঁতে দিয়েছিল। কয়েকদিনের জন্য কৈলাস যাত্রা স্থগিত করলেন বজ্রগিরি। বজ্রগিরি তাঁকে খুজে বার করে শাস্তি দেবেন। আমরা সেই বীভৎস ঘটনাটা কীভাবে ঘটলো তা জেনে নিতে পারি। ছিন্নমস্তার স্থানে লোধা এজন অপরিচিত সাধুকে নিয়ে যায়। সাধু বলেন শবাসন চাই। সেই শবাসনে বসে একলক্ষ মন্ত্র জপ করলে সাক্ষাৎ দর্শন দেবেন দেবী ছিন্ন মস্তা! এখন শব জুটবে কীভাবে? তখন উভয়ে মিলে ঠিক করলো যে একে অপরের শবাসন হবে। একজন সিদ্ধি লাভ করলে আর একজনও সিদ্ধি লাভ করবে। স্থির হলো সেই মহাপুরুষ আগে সিদ্ধি লাভ করে লোধাকে বাঁচিয়ে তুলবেন। তারপর প্রমাণ মাপের একটি গর্ত কেটে প্রচুর পরিমাণে মদ খেয়ে লোধা সেই গর্তে শুয়ে পড়ল। যিনি শব সাধনা করবেন তিনি তখন গাছের ডাল পালা দিয়ে গর্তের উপরটা ছেয়ে ফেললেন। তারপর মাটি আর পাথর চাপা দিলেন। দম বন্ধ হয়ে মরবে লোধা আর তখন পাক্কা শবাসন হবে। কিন্তু লোধার নেশা ছুটে গেল শ্বাস রোধ হওয়ার আগেই। অমানুষিক শক্তি লোধাকে বাঁচালো। গর্ত থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের তলায় কতক্ষণ পড়েছিল লোধা তা সে জানে না। হুঁশ ফিরে পাওয়ার পরে আবার সে নেমেছিল সেই গর্তে কম্বলখানি বার করে সোজা হাজির হয়েছিল অবধূতের কাছে। সব শোনার পরে বজ্রগিরি মাঝে মাঝে উচ্চারণ করতে লাগলেন: 'পাব, নিশ্চয়ই আমি ধরতে পারব তাকে, কিছুতেই সে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।'[১৯] ---বোঝাই যাচ্ছে মানস সরোবরের এই পথের দুর্গমতা কীভাবে মানুষের দ্বরা

আরো দুর্গম হয়ে উঠতে পারে।

পাঁচ.গারবেয়াং থেকে কালাপানি---প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রগ ছেঁড়া যন্ত্রণা

বজ্রগিরির সাথে এই দলে এক মহাজন গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর পুরো সংসার। তিন পুত্র দুই পত্নী এবং মাল সহ একপাল ঝাব্বু, ঘোড়া ভেড়া---সব কিছু। তিব্বতের বাজারে মাল বিক্রীও হবে আবার পুণ্য অর্জনও হবে। তাঁর তাঁবু উঠতেই সময় লাগল ছ ঘন্টা! ভুটিয়া মদ ছটাক খানেক পেটে গেলে গারবেয়াং এর মাঘ মাসকে বাংলাদেশের ফাল্গুন মাস মনে হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সেই অমৃত ঢক ঢক করে গিলেও খোদ মহাজন পর্যন্ত কার্পেটের তলায় পড়ে সারারাত দাঁতে দাঁতে ঠক্কর খান। এখন তাঁরা লিপুধরার দিকে। চলেছেন গারবেয়াং-এর গোলাপ জঙ্গল আর নেকড়ের ভয় কাটিয়ে কালী নদীর পাড় ছাড়িয়ে। যত উপরে উঠছেন কালাপানির দিকে তত মাথা কামড়ানি বাড়ছে ঐ জিনিসটা তিব্বতের পথে গারবেয়াং -এর পরে আগাগোড়া চলতে থাকে। যেন ছিঁড়ে যাবে রগ। দিন রাতে কখনো থামছে না। অবধূত তখন মন্তব্য করেছেন : 'সাধে কি কৈলাসবাসী সবাই গাঁজা টেনে বুঁদ হয়ে থাকেন?' [২০] এরপরে পৌঁছলেন এক মৃত্যু-পুরীতে। এখানে যে শুষ্কতা তা দেখে স্বয়ং 'মায়াহীন শুকদেবেরও নিঃশ্বাস পড়বে'।[২১] কালাপানিতে চিত্ত জুড়ে কেবল হাহাকার চলে বলে মনে হয়েছে অবধূতের। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। জল নেই কোথাও। মরা পাথর। বাটি ডোবানোর মত জল পেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল মানুষ। জল একটু খেলে তেষ্টা যেন হাজার গুণ বেড়ে যায়। সে জল তাই না খাওয়াই শ্রেয়। ঠাণ্ডায় পা দুটি অসাড়। কুয়াশার মত মেঘ ছুটছে এক হাত সামনে দেখার উপায় নেই। তেষ্টা আর মাথা কামড়ানি ছাড়া আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে প্রেতপুরীতে চলছেন। যেন সব ছায়াময়! সারাদিন এভাবে ছ-সাত ঘন্টা চলার পরে লিপুর মাথায় উঠলেন।

ছয়. তিব্বতের শিম্পি লিং গুহা ও অবধূতের চৈতন্যস্বরূপতার উপলব্ধি

তিব্বতে পৌঁছে শিম্পি লিং গোম্ফায় গেলেন অবধূত। সে অভিজ্ঞতা বিচিত্র। বজ্রগিরি বাবার সাহায্যেই পুরং শহরের শিম্পি লিং গোম্ফায় আশ্রয় পেয়ে যান অবধূত। সত্ত্ব রজঃ তমঃ - এই তিনটি গুণের কবল থেকে মানুষের নিস্তার পাবার উপায় কী? এক কথায় এর উপায় হলো নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া। এই সাধনাই হয় তিব্বতের মঠে। সেখানে চমরী গাইয়ের জমানো দুধ দিয়ে জ্বালানো হয় প্রদীপ। এঁরা জল স্পর্শ করেন না। অবধূত এবং লোধা সিং কে চা খেয়ে বাঁচতে হয়েছিল। মহাতপা বশিষ্ট এসেছিলেন এখানে। অবধূত তা স্মরণ করে পুলকিত হন। 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হওয়ার সাধনা করেন ওঁরা। মহাশক্তির সাধকেরা সাধনা করেন সেই মহাশক্তির যিনি সৃষ্টি করছেন পালন করছেন সংহার করছেন। শিবশক্তির যোগ হলে মহাশক্তির স্ফুরণ হয়। সেই মহাশক্তির অধীশ্বর হওয়ার সাধনাই শাক্ত-সাধনা। জন্ম-মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তির

রাস্তা খোঁজা চলে এই ভাবে। অবধূত বলেছেন 'কালীসাধনা করে আমরা কালী হয়ে যেতে চাই, যে কালীর কোনও বর্ণ নেই। সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ তিনটি গুণ হচ্ছে তিনটি বর্ণ কালো রঙের মধ্যে যে কোনও রঙ ঢাললে সেটা কালো হয়ে যায়। তাই আমাদের আরাধ্যা মহাশক্তি কালী ত্রিগুণাতীতা। আর ঐ কালী হচ্ছেন মহাকালের শক্তি। মহাকালের বুকে যখন শক্তির খেলা শুরু হয় তখন সৃষ্টি শুরু হল। যতক্ষণ শক্তির খেলা চলল মহাকালের বুকে ততক্ষণ সৃষ্টিটি চলল। যেদিন থামল ঐ মহাশক্তির খেলা সেদিন সব শেষ। পড়ে রইল সেই মহাকাল, যে কালের আদি নেই অন্ত নেই।লামাদের উপাস্য দেবতা মহাকাল, বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতা মহা শূন্যতা। মহাকাল আর মহাশূন্যতার মধ্যে অবধূত তফাৎ করেন নি। তিনি উপলব্ধি করেছেন মহাকালকে উপলব্ধি করতে হলে কালশক্তি কালীর সাধনা করতে হবে। মহাশক্তি কালী সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ। মহাশূন্যতাকে উপলব্ধি করতে হলে প্রজ্ঞাশক্তির সাধনা করতে হবে। প্রজ্ঞাশক্তির সাধনা করতে করতে সাধক এবং সেই প্রজ্ঞাশক্তি এক হয়ে যাবে। অবধূত উপলব্ধি করলেন :

> "সাধক হলেন বুদ্ধ, যিনি জানতে চাচ্ছেন। যা জানতে চাচ্ছেন তার নাম প্রজ্ঞা। জানবার জন্যে যে শক্তি সাধনা করছেন তার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা।জানা হয়ে যাবার পরে যা হবেন তা হল ধ্যানী বুদ্ধ, জানবার আগে যা থাকেন তার নাম ধ্যানী বোধিসত্ত্ব। ধ্যানী বোধীসত্ত্বের মধ্যে মূর্ত হয়ে রয়েছে প্রেম এবং সমবেদনা। ধ্যানী বুদ্ধ প্রেম এবং সমবেদনার ঊর্ধ্বে। ধ্যানী বুদ্ধ মহাশূন্যতার মূর্ত প্রতীক, সাক্ষাৎ মহাকাল, সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনটি গুণ তাঁর নাগাল পায় না।"[২২]

সাত. পারলৌকিক প্রভাবে জীবনের বেমানন বিপর্যয়

উপন্যাসটি নাতিদীর্ঘ; মাত্র ৮৩ পৃষ্ঠার। তুলিকলম ১৯৭৮ সালের জুন মাসে সুখশান্তি ভালোবাসা নামে তিনটি উপন্যাস একত্রে প্রকাশ করে। প্রকাশক ছিলেন কল্যাণব্রত দত্ত। প্রথম সংস্করণ এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল কিনা জানা যায় না। প্রকাশিত তিনটি উপন্যাস হলো ১. শুভায় ভবতু ২. দুর্গম পন্থা ৩. দেবারিগণ। অবধূতের জীবন বাঙালি সাধারণ লেখকের মত ছিলনা। তিনি সঙ্কট বন্ধুর পথে জীবনের আঠারো বছর কাটিয়েছিলেন। বক্ষমান অধ্যায়ে আমরা তার কিছু পরিচয় পাবো। 'দুর্গম পন্থা' উপন্যাসে কথকের জবানীতে অবধূত বলেছেন :

> "...প্যাসেঞ্জার-বহা স্টীমার বলতে আমরা বুঝি সেগুলোকে, যেগুলো খুলনা বরিশাল গোয়ালন্দে যাওয়া আসা করে। কলকাতা বন্দরে বড়ো জাহাজ টানবার জন্যে যে যেরকম স্টীমার জাহাজের সামনে পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, যাকে বন্দরের ভাষায় টাগবোট বলা হয়, এ হচ্ছে সেই জাতীয় ব্যাপার। .."

আলোচ্য উপন্যাসটি সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা হয়নি বললেই চলে,যাঁরা অত্যন্ত কম সময় বইটির জন্যে দিয়েছেন এবং প্রাক-নির্দিষ্ট ধারণা মনে রেখে তাচ্ছিল্যের সাথে পাতা

উল্টে গেছেন তাঁরা স্বভাবতই গ্রন্থটির প্রতি সুবিচার করেন নি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় লেখক ভ্রমণ কাহিনি লিখতে বসে খেই হারিয়ে নানা আজগুবি বিষয়ে মন দিয়ে ফেলেছেন। আদিনাথ দর্শন করতে গিয়ে জাহাজে মগেদের সাথে মারামারিতে ঘোষাল মশায়ের নাতজামাই এবংপরে ব্রহ্মচারীর জড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে যে অন্যগতি কাহিনিতে যোগ হয়েছিল তার ফলে লেখক যেন খেই হারিয়ে ভেসে গেছেন আজগুবি অয়সকান্তের ভৌতিক অস্তিত্বে। ব্যাপারটা এইরকম যে যদি জাহাজে মারামারি না ঘটত তাহলে তাঁরা আদিনাথে নামতেন এবং কাহিনিটি হয়তবা এভাবে অবিশ্বাস্য একটা ছেলেভুলানো আখ্যানে শেষ হত না। বিরূপ সমালোচকদের মতে এককথায় পরিকল্পনাহীন অসংযমে অবধূতের দুর্বল কল্পনা সময় আর কালি-কাগজের অপব্যয় করেছে। খুঁটিয়ে পড়লে সজাগ পাঠক বুঝতে পারবেন এ উপন্যাসটি আসলে বাস্তবের সাথে পারলৌকিক জগতকে অসাধারণভাবে মিলিয়ে চলেছে। এর পাত্র-পাত্রীরা তাঁদের শিক্ষা আর পরিবেশের প্রভাবে খুব স্বাভাবিকভাবে বাস্তব জীবনের সাথে একভাবেই সব অলৌকিক ঘটনাকে গ্রহণ করেছে। এই উপন্যাসটি যে জাদুবাস্তবার উপন্যাস তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

এ-প্রসঙ্গে আমাদের লক্ষ্য অবধূতের ব্যক্তি জীবন আর তার রচনার প্রেরণাগত সততা। ঈশ্বর আর প্রেত স্বর্গ আর নরক আমরা বাক্যে অস্বীকার করি আর হৃদয়ে ভয়ে হোক ভক্তিতে হোক মেনে নিয়েই পথ চলি। লোকঠকানো যাদের পেশা তারাও পরমেশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। প্রায়শ্চিত্য করার বিধি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। হোম যাগ-যজ্ঞ পূজা-পার্বণ অলক্ষ্মী বিদায় ইত্যাদি অনুষ্ঠান থেকে কী শিক্ষাবিদ কী মন্ত্রী আমলা কেউ-ই বাদ যান না। তাহলে তাকে গল্প উপন্যাসের মধ্যে আনতে দোষ কোথায়? প্রাচীন সাহিত্যে সব দেশে আছে আধুনিক সাহিত্যে সেভাবে নেই। তার কারণ হলো একালে মানুষের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির যোগ কমে এসেছে সবই মানুষের মনোমত সৃষ্টি হওয়াতে জগতের স্বাভাবিক সৃষ্টি অনেক লুপ্ত। মানুষের বাইরের চোখ বন্ধ না হলে ভিতরের চোখ খোলে কেমন করে? সাধারণ গৃহ লালিত মানুষের মনের কথাটি বলেছেন অবধূত :

> "রহস্য জিনিসটার মজা হচ্ছে, ওটা টানলে বাড়ে। একটা রহস্য ধরে টানাটানি জুড়লে আরও দশটা দশ জাতের রহস্য তার পিছনে পিছনে এসে উপস্থিত হয়। সেগুলোয় শেষপর্যন্ত পৌঁছবার আগেই দেখা যায়, একপাল রহস্য দূর থেকে উঁকি দিয়ে রসিকতা জুড়ে দিয়েছে। সেই রসিকতা দেখে হাড় জ্বলে ওঠে, তখন 'নিকুচি করেছে' বলে রহস্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যাঁরা চালাক মানুষ, তাঁরা কখনও কোনও রহস্যের ভেতর নাক গলাতে যান না। তাঁরা জানেন, ও বস্তু যত চাপা থাকে, ততই ভাল। খামকা কেঁচো খুঁড়তে সাপের গায়ে খোঁচা দিয়ে কি লাভ!"[২৩]

ঘটনাপ্রধান জীবনে যেমন মনস্তত্ত্ব জায়গা করে নিয়েছে যেমন চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাস এসেছে তার নিজের সত্যের জোরে তেমনি একদা অস্বীকারের চেষ্টা হলেও আধ্যাত্মিক আর আধিভৌতিক বিষয় গল্প উপন্যাসে জায়গা করে নিচ্ছে। ঘরের ভিতর বসে বহুর মাঝে থেকে

অশরীরীদের অবিশ্বাস করা যেকোন কাপুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু রহস্যের সমাধান করবো বলে নির্জন শ্মশানে শ্রীকান্তের মত কত জন বা গিয়েছেন? গেলে হয়ত স্বীকার করতেন সেখানে এক অশরীরী আকর্ষণ আছে সন্ধ্যার পর যেমন নিজের অজান্তে শ্রীকান্ত চলেছিল মহাশ্মশানের দিকে তেমনি আঠারো বছর যে মানুষ গাছের নীচে ঘুমিয়েছেন আর চোখ ভরে দেখেছেন, বিশ্ব রহস্য ভেদ করার অন্তত চিন্তা করার সময় পেয়েছেন,তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের থেকে অনেক বেশি একথা অস্বীকার করবে কে? অবধূত সম্পর্কে আমাদের আজকের সিদ্ধান্ত হলো তিনি মিথ্যুক নন। তাঁর রচনায় জোর করে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা নেই বলে তাঁর উপলব্ধ সত্য আমাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করে। সভ্যতার সাথে জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্য। জাতিস্মর নিয়ে আজও খবরের কাগজে নানা সংবাদ পরিবেশিত হয়। বাউলেরা বিশ্বাস করেন দেহভান্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। দেহের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে বলে নর-নারীর দেহ কামনা তাঁর সাহিত্যে উপেক্ষণীয় নয়। তাই বলে অকারণ কামের প্রশ্রয় তিনি দেন নি। তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় গুণ লেখকের সংযম। অকারণ বাক্ বিস্তার তিনি করেন নি। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় : প্রথম দর্শনে কথকের মনে হয়েছিল:‘ইনিই অয়সকান্ত? এই মাংসশুন্য হাড় ক'খানাকে লোকে অত ভয় করে !’

হিস্টিরিয়া একধরনের রোগ ভর করলে সেরকমই হয় কিন্তু তারপরেও আছে আরো নানা উপসর্গ তাকে ক'জন নিজের চোখে দেখেছেন? আজকের মানুষরা বিশেষকরে শিক্ষিত মানুষেরাই বেশি করে জ্যোতিষীর কাছে যান। মাদুলি যদিবা কোমরে বা লুকানো স্থানে থাকে আঙুলে রত্নধারণ করেন এমন লোকের ৯০ ভাগ তথাকথিত শিক্ষিত। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা তাই বাবা মায়ের দোহাই দেন এসব অব্যাখ্যাযোগ্য মাদুলি কবজ পাথর ধারনের। নজরকাঁটা গলায় ঝোলানো এখনও অধিকাংশ সমাজের স্বাভাবিক বিষয়। মৃতের শ্রাদ্ধশান্তির অনুষ্ঠানের কি কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেলে? লেখক তার বিশ্বাস মতে বরং বলা ভালো, বিশ্বাস্য করে তোলার মাধ্যমে উপন্যাসকে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য রূপে উপস্থিত করে তোলেন। আমরা ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞতাকে সন্দেহ করি না। কীভাবে তিনি উপন্যাসের সব চরিত্রের মনের কথা আগেই জেনে যান এ নিয়ে প্রশ্ন করি না। অথচ প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। আমাদের বহুদিনের অভ্যাস এই রীতিকে দেখতে অভ্যস্ত, তাই এবিষয়ে প্রশ্ন ওঠে না। তেমনি জীবন কেবল বর্তমান নিয়ে নয় অতীত আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তার সম্পূর্ণতা। কেবল দেহ নয় মন আত্মা -সবই আমাদের জীবনের অঙ্গ। যাঁরা মননের চর্চা করেন তাঁরা অনেক বেশী রকমে জানেন সাধারণের থেকে তাঁরা অনেক বড় মাপের মানুষ। যাঁরা জীবনের নশ্বরতাকে জেনে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে পথে নামেন তাঁদের উপলব্ধ সত্য সাধারণের কৌতূহলের বিষয় সবাই সেই রহস্য জানতে চান একাত্ম হতে না পারলে আসে অবিশ্বাস সেই জায়গায় পাঠকের অধিকাংশের আসন নির্দিষ্ট তাই লেখকও নিজের একটা ব্যখ্যা খাড়া করে রাখেন অবিশ্বাসীকে যাতে বলতে পারেন -ঠিকই -এসব বানানো গল্প। অবধূতও করেছেন। তাদের ভোলাতে তিনি নিজের কল্পনায় এসব পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন :

"ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কেন জানি না, একবার মুখ ফিরিয়েছিলাম। ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বকশী মশাই, অন্ধকারে চোখ মুখ দেখা গেল না। কিন্তু একটা খুব একটা ছেলেমানুষী ধারণা হয়ে গেল আমার হঠাৎ। লম্বা দেহটাকে রক্ত মাংসের দেহ বলে মনে হল না। যেন ছায়া দিয়ে গড়া কায়া যেন---।

"ঐ ধারণাটা মাথায় নিয়ে কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে ভালো ঘুম হল না। যতবার ঘুম আসে, ততবার চমকে উঠি। ছায়া দিয়ে গড়া অয়সকান্ত বকশীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছি যেন কোথায়। এমন বিশ্রী পথে চলেছি, যে পথে পায়ের তলায় ছায়া ছাড়া কিছুই ঠেকে না। ছায়াপথে চলতে চলতে ঘুমিয়ে পড়লাম।"[২৪]

এই সংযম লক্ষ করার মত।নিজের উপলব্ধিকে অস্বীকার করার চেষ্টা আছে-সনাতন যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কিন্তু নিজের চোখ এবং অনুভূতিকে অস্বীকার করবেন কীভাবে? অলৌকিকতার বর্ণনায় অসংযম তো নেই-ই বরং অলৌকিকতার প্রসঙ্গে অতিমাত্রায় সংযমী যেন বলতে চান না অথচ সত্যের খাতিরে বলে ফেলছেন। দুর্গমপন্থার অকুস্থলে চলেছেন অবধূত। পূর্ব সাগরের তীরে যেখানে কর্ণফুলী নদী গিয়ে মিশেছে সেখানে একটি দ্বীপে তীর্থক্ষেত্র আদিনাথ। আদিনাথের অবস্থান বুঝে নেওয়া যেতে পারে :

"ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে পূবে পশ্চিমে একটি সরল রেখা টানলে দেখা যাবে যে পূব সাগরের তীরে আদিনাথ আর পশ্চিম সাগরের তীরে কোটেশ্বর এই দুটি তীর্থ সরল রেখাটির দুই প্রান্তে বসে আছে। আদি নাথ দর্শন করে যদি কোন মহাপুরুষ চক্ষু বুজে সোজা পশ্চিমমুখো হাঁটতে শুরু করেন আর কিছুতেই কোন দিকে না ঘোরেন ফেরেন, তাহলে একদিন তিনি কোটেশ্বর মহাদেবের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চক্ষু উন্মীলন করতে পারেন। অবশ্য যদি তিনি রাস্তাঘাট কোনও কিছু পরোয়া না করেন অর্থাৎ আকাশচারী হন তবেই এটা সম্ভব।"[২৫]

বাস্তবে আদিনাথ দর্শনে অনেক বাধা লেখক-কথক বলেছেন ;...'আমার মত নিতান্ত সাধারণ মানুষের বেলায় আদিনাথ পৌঁছতেই আদ্যশ্রাদ্ধ ভোজনের যোগাড় হয়েছিল।'[২৬]উপন্যাসটি ফ্লাসব্যাক রীতিতে গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের কতকটার কথক স্বয়ং লেখক বাকীটার ভাষ্যকার অয়সকান্ত বকশী। ব্রহ্মচারী সনাতন শর্মা কথকের ভ্রমণ সঙ্গী। স্টীমারে সাক্ষাৎ হয়েছে ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গে ঘোষাল মশাই এর সঙ্গে আছেন নাত্নী বিনু আর নাত্নী-জামা। মোট পাঁচ জন বাঙালী বাকীরা মগ মগানী বা মগী।

"মেয়েপুরুষ সকলেই লুঙ্গি পরে আছে, চুরুট টানছে আর যেন নাকী সুরে কথা বলছে। ...ওদের ভাষায় অত্যধিক পরিমাণ ঙ আর ঞ থাকার দরুন কথাগুলো ও-রকম নাকী সুরে বেরোয়!"[২৭]

"সাগর, সাগর-ছোঁয়া পাহাড়, পাহাড়-ভরা জঙ্গলের মধ্যে ওরা চঙ বানিয়ে থাকে। চঙ্ কথাটির সঠিক অর্থ কি তা বলা শক্ত। বানিয়াচঙ্ নামে একটি স্থান আছে,

নামটি অনেকেরই পরিচিত। মনে হয় স্থানটির নাম বানিয়াচঙ্ এই জন্যেই রাখা হয়েছিল, যেহেতু কোনও সময় ওটা ছিল বেনেপটি। অর্থাৎ একচেটে বেনেদের বসবাস ছিল ওখানে। কিন্তু মগ বাসা বাঁধ চঙের উপর। বাঁশ দিয়ে উঁচু মাচা বানায়, তার ওপর খাড়া করে বাঁশের ঘর। মগের সংসার সেই মাচার ওপর বাঁশের কেল্লায়। মগ যাকে চঙ্ বলে তাকেই বোধ হয় আমরা টঙ বলে থাকি। শুধু 'ঙ' আর 'ঞ' নয়, 'চ'অক্ষরটির উচ্চারণও বেশ দরাজভাবে করা হয় কিনা মগাই ভাষায়। কাজেই আমাদের টঙ্ চাটগাঁ পার হয়ে চঙ্ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা,তাই বা কে বলতে পারে।''[২৮]

---বর্ণনা অসাধারণ। ব্যক্তিত্বের আরোপ ঘটেছে জড়ের উপর। আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি কর্ণফুলীর মুখে জলের ভেতর থেকে দাঁত বের করে ভেসে উঠেছে কতকগুলো কিমভূতকিমাকার পাথুরে জানোয়ার। স্টীমার থামে সেগুলোর পাশে। থামে না মোটেই, নাচতে নাচতে আসছিল, হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নাচতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র গঠনের সব নৌকা এসে ছেঁকে ধরল স্টীমার খানাকে। তখন নাচন্ত স্টীমার থেকে দোলন্ত নৌকায় ঝুলন্ত অবস্থায় যাত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের মালপত্র নিয়ে। নিমেষের মধ্যে নৌকাগুলো ছুটে চলে গেল চক্ষের আড়ালে, মানে এপাড়ায় ওপাড়ায়। আবার বহু যাত্রী উঠেও এল টপাটপ্ করে সেই অবস্থায় নৌকা থেকে স্টীমারে। এতটুকু অসুবিধা হল না কারও। ওদের অনর্গল হাসি আর অবিরাম আনুনাসিক বকাবকি শুনে মনে হল এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য বা অসুবিধে বোধ করছে না কেউ এভাবে উঠতে নামতে। লেখকের মনে হয় কর্ণফুলির সন্তান ওরা। পাগলী মেয়ে কর্ণফুলি যেমন দুরন্ত তেমনি ছটফটে তাই ওর সন্তানরা শান্তশিষ্ট নয়। প্রমাদ গণলেন কথক। তাঁরা চন্দ্রশেখর পর্বতে শম্ভূনাথ দর্শন করে চলেছেন আদিনাথ দর্শনে। তাঁরা তীর্থপিয়াসী।

'শম্ভূনাথশ্চ চন্দ্রনাথশ্চন্দ্রশেখরপর্বতে।
আদিনাথঃ সিন্ধুতীরে কামরূপে বৃষধ্বজঃ॥'

সিন্ধু তখনও অনেক দূর। তখনও আমরা কর্ণফুলির মধ্যে। এখানেই যদি নামতে উঠতে এই অবস্থা হয় তাহলে খাস সিন্ধু তীরে কীরকম দাঁড়াবে আমাদের দশা, সেটা কল্পনা করতে গিয়েই আমরা বেহাল হ'য়ে পড়লাম। ঘোষাল মশাই তো তারস্বরে শিব নাম নিতে শুরু করলেন। নাতনী নাতজামাইয়ের সঙ্গে তিনিও পাপস্খালনের আশায় চলেছেন আদিনাথে।'[২৯]

আচমকা এক প্রচণ্ড ধাক্কায় যাত্রীরা ছিটকে পড়ল এ ওর ঘাড়ে। সেই সঙ্গে কানে গেল উৎকট একটা আওয়াজ, প্রচণ্ড জোরে যেন ঘষড়ানি লাগছে দুটো ভারী জিনিসের। হাত-পা-মুখ-মাথার চোট অগ্রাহ্য করে কোনও রকমে খাড়া হয়ে সভয়ে দেখতে লাগল সবাই চারিদিকে হল কি!

এই সময়ে অন্যদের আচরণ থেকে বিপদের গুরুত্ব যে তেমন কিছু নয় তা অনুমান করা যায় :

১. স্টীমারের সারেং খালাসীদের মুখভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। ঢং ঢং

টিং টিং নানা জাতের ঘন্টা বাজছে ইঞ্জিন ঘরে। সেইরকম ঘষড়ানির শব্দও চলেছে সমানে।

২. 'মগ মগানীরা মহাস্ফুর্তিতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর ঘাড়ে।'[৩০] যাঁরা অনভ্যস্ত তাঁদের হাল শোচনীয় :

ক. ব্রহ্মচারী সনাতন শর্মা বিশুদ্ধ হিন্দীতে জানি না কাকে গাল মন্দ দিচ্ছেন আর নিজের ফুলে ওঠা কপালে হাত ঘষছেন।

খ. নাতনীটির চোখ মুখ থেকে দুষ্টুমি গেছে উবে। সে দাদুকে জড়িয়ে ধরে সভয়ে চাইছে চারিদিকে।

গ. দাদু চক্ষু বুজে ঠোঁট নাড়ছেন আর নাতজামাইটি চোখে দূরবীন লাগিয়ে আদিগন্ত জলের বুকে কি দেখছেন তা তিনিই জানেন।[৩১]

যাইহোক জানা গেল ''স্টীমারের তলাটা নাকি এমন মজবুত ধরনের আর এমন মজবুত করে তৈরী যে কিছুতেই ফেঁসে যাবে না।এবং স্টীমার খানাও এমন জাতের যে কোনও মতেই ডুববে না।''[৩২]

জাহাজ চলেছে কক্সবাজার হয়ে টেক্সাস্ তারপরএইপথেই ফিরবে চট্টগ্রাম। চাটগাং থেকে আদিনাথ-সকালে বেরিয়ে দিনের মধ্যেই পৌঁছানো যায়। আদিনাথ দ্বীপ রেখে কক্সবাজার। সেখানে কালীবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা। সামনে সমুদ্র আর পিছনে বন এ বন পাহাড়,সাপ হাতি আর আরাকানী মগের ভয়ে বিঘ্ন সঙ্কুল। এখানে পরিবেশের উল্লেখমাত্র করে অবধূত কক্সবাজার এলাকার ত্রাস অয়স্কান্ত বকশীকে নিয়ে উপন্যাস নির্মাণ করেছেন। বীভৎস রসাশ্রিত একটি গল্প বলাই সঙ্গত মনে হয়।

এই যাত্রাপথে ঘোষাল বাবুর নাত্নীকে ঘিরে উপন্যাসে রোমান্সের রসিকতার যোগান দিয়েছেন। কোন এক যাদুমন্ত্র বলে সমস্ত আবহাওয়াটাই গেল বদলে। বাচাল বেশরম বেহেড নাতনীটির চোখেমুখে ফুটে উঠল এক অপূর্ব স্নিগ্ধ শ্রী। ঠোঁট গালের রঙ, ফিরিঙ্গী ধাঁচের সাজপোষাক আর ভূতুড়ে প্রগল্‌ভতার ভেতর থেকে শান্তশিষ্ট বাঙালী মেয়ের ব্রতচারিণী মূর্তিটি বেরিয়ে এল। দাদুর গা ঘেঁষে বসে সে দাদুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে লাগল-

'বাচমগোচরমনেক গুণস্বরূপং
বাগীশবিষ্ণুসুরসেবিত-পাদপীঠম।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম॥'

তারপর যা ঘটল তা আরো অদ্ভুত আরো অবিশ্বাস্য। আত্মনিষ্ঠ সনাতন শর্মা খুঁজে ফেরেন একটি আত্মা। নিজের বা অন্য কোন প্রাণীর নয়, তিনি খুঁজছেন ভারত বর্ষের সনাতন আত্মাটিকে। এই পবিত্র কর্ম যখন তিনি শুরু করেন তখন তাঁর বয়স ছিল অল্প শরীরে ছিল শক্তি,ঠ্যাং দুখানা ছিল আস্ত। এখন তাঁর বয়স গড়াচ্ছে ভাঁটির টানে,শরীরে নেই তেজ, আধখানা ঠ্যাং পর্যন্ত গেছে। কবে নাকি কামরার মধ্যে স্থান না পেয়ে ট্রেনের পা দানিতে দাঁড়িয়ে ভ্রমণ

করছিলেন, কি জানি কী করে তখন তাঁর হাতের মুঠি বেইমানি করে বসল, ফলে খোয়া গেল ডান পায়ের হাঁটুর কাছ থেকে সবটুকু। তাতেও কিছু গেল এল না, ভারতের সনাতন আত্মাটিকে খুঁজে বার করার দুষ্কর ব্রতে ক্ষান্ত হলেন না ব্রহ্মচারিজী। বাড়ার মধ্যে বাড়ল দুই উপসর্গ, দুই বগলের নীচে দুখানি ঠেঙা গুঁজে ঠকাস্ ঠকাস্ শব্দ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। আর মনে মনে সর্বক্ষণ জপতে লাগলেন---

'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতংমম মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।'

ব্রহ্মচারী ও ঘোষাল মশাই যখন ধর্ম আলোচনায় মগ্ন তখন ওধারে কে হুঙ্কার দিয়ে উঠল 'তবে রে স্কাউন্ড্রেল শুয়োরের বাচ্চা পাজী' সঙ্গে সঙ্গে ধপাধপ মারের আওয়াজ।

লাফিয়ে উঠলাম সকলে। ঘোষাল মশাই আর্তনাদ করে উঠলেন -'

> ''বিনু, বিনু, গেল কোথা?' সে কথায় কান দেবার ফুরসত কই -ছুটলাম। ইঞ্জিন -ঘরের ওপাশে ঘটছে ব্যাপারটা। যাত্রীদের মোটঘাট টপকে ওধারে পৌঁছে চোখে পড়ল রেলিঙের ধারে ছোটো খাটো একটা ভিড়। ভিড়ের ওধার থেকে একখানা লম্বা লোহার শাবল উঁচু হয়ে উঠল সকলের মাথার ওপর, কিন্তু সেখানা আর নামবার অবকাশ পেল না। সেই মুহূর্তে সজোরে আর একটা জিনিস নামল সেই হাতের ওপর। জিনিসটাকে চিনতে পারলাম, ব্রহ্মচারীর বগলের ঠেঙা। ঠেঙাখানা বার চার পাঁচ উঠল আর নামল চক্ষের নিমেষে।''[৩৩] এর পর দেখা গেল :

ক. নাতনীটি নাতজামাইকে জড়িয়ে ধরে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

খ. নাতজামাইটির জামা গেছে ছিঁড়ে, ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

গ. বাঁ বগলে ঠেঙা গুঁজে রেলিং ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রহ্মচারী। তখনও বাগিয়ে ধরে আছেন ডান বগলের ঠেঙাখানা দু হাতে।

বিনুর স্বামী কৃতজ্ঞচিত্তে একখানি চিঠি হাতে ধরিয়ে দিলে কথকের হাতে। বিনুও অনুরোধ করেছিল চিঠি খানা রাখার জন্য যদি দরকারে লাগে! বিনুর অনুরোধ এড়াতে পারেন নি। এদিকে মগেদের সাথে বিপদকে উপেক্ষা করে নামতে পারেন নি-ব্রহ্মচারী। সন্ন্যাসীরা কোনো মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করেন না নিজেদের তাই, বিনুর অনুরোধে থেকে যাওয়ার ফলে আত্মবিশ্লেষণে নিজের মধ্যেই ডুবে গেলেন ব্রহ্মচারী। নিজের এই হৃদয়দৌর্বল্য নিজের কাছে লজ্জার। অন্যদিকে কথক এবার নিজে অনুভব করছেন :

> ''শুয়ে পড়লাম চাদর মুড়ি দিয়ে। শুনতে লাগলাম সমুদ্রের বুকের ভেতরের তুমুল তোলপাড় ধ্বনি। শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে হল সমুদ্র যেন জপ করছে, আদি-অন্তহীন জপ। জগৎ জোড়া আত্মপ্রতারণা আর আত্মগ্লানির দুর্ভর বোঝাটাকে ডাঙার ওপর ঠেকিয়ে রাখবার আশায় নিরন্তর আত্মরক্ষা-মন্ত্র জপে চলেছে সমুদ্র। এ জপ থামবে সেদিন, যেদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা একেবারে নিঃসাড় নিঃসঙ্গ হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।''[৩৪]

'নীলকণ্ঠ হিমালয়' উপন্যাসে কথক তথা অবধূত 'লাঙ্গুলবারিয়ার জিতেন সাধুর-র হাত থেকে

ছাড়া পেয়ে চলেছেন উত্তরকাশীর পথে। এখানে তিনি দশনামী সন্ন্যাসী হতে পারবেন। কোথায় থাকছেন সারাদিন কি রকম পথ দিয়ে চলছেন কিছুই খেয়াল করতে পারছেন না। সমস্তরকম ভোগে তখন বিতৃষ্ণা। প্রসঙ্গত তিনি স্মরণ করেছেন কমলোদ্ভব-র বাণী :

'অয়ং সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্ম ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ।
যদ মনসি সম্পন্নং বৈতৃফ্ সর্ববস্তুষু।
তদ সন্নাসিমিচ্ছেত্ত্ব পতিতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়ো॥'

---যতক্ষণ না পার্থিব সকল বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মাচ্ছে ততদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করলে বিপর্যয় অনিবার্য। এর মধ্যে আবার দশনামী না হলে সাধু সমাজে অচ্ছুৎ। স্বয়ং রামকৃষ্ণ তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন।

গোরক্ষনাথের শিষ্য প্রজ্ঞানাথ ও নরেন্দ্রনগরের দেবী আনন্দময়ীর দর্শন

অবধূত বাবা গোরক্ষনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য প্রজ্ঞানাথজী-র দেখা পান। তিনি জানালেন 'মা আনন্দময়ী' আসছেন। সাধু ভোলানাথ একাসনে বসে দীর্ঘ কয়েক বছর তপস্যা করে এক কালী মন্দির স্থাপন করেন। অবধূত সেই মন্দিরের সাধকের প্রতি ভক্তি যুক্ত হন। তিনি আনন্দময়ী সম্বন্ধে কিছু কথা বলেন। ইনি সাধু ভোলানাথ সম্পর্কে কিছুই না বললেও তিনশ পঁয়ষট্টি দিন এ মন্দিরে পূজা করেন। তাঁর সব চাওয়া ঘুঁচে গেছে। তাঁর কাছে বিশেষ কিছু জানতে পারেন নি অবধূত। সর্বজ্ঞানী প্রজ্ঞানাথ জানালেন রক্ত মাংসের শরীরে ইনি ত্রিগুণাতীত হ'য়ে গেছেন। কালীকম্বলীর ছত্রে শোনা গেলো মা আসছেন। কয়েকজন দণ্ডী স্বামী বললেন তিনি আসছেন। মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, এমন কি ইংরেজী ভাষাভাষী সাধুও শোনালেন ঐ এক সংবাদ। নব্বই বছরের বেশী উত্তর কাশীতে বাস করছেন ভারতী বাবা, একমাত্র 'হরি ওং তৎসৎ' ভিন্ন আর কোনো কথা তিনি নব্বই বছরে বলেননি। সেই মহাপুরুষের মুখেও শোনা গেলো 'বেটী আতী হায়' গাড়োয়ালীদের মুখেও এক কথা। ভোলানাথ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের বর্তমান সাধু যিনি এই মন্দির একদিনও ছাড়েন নি, তিনি অবধূতকে অনুরোধ করেন যে যদি মা রাজী থাকেন তবে তাঁর সাথে তিনি যাবেন গঙ্গোত্রী সেই ক'দিন অবধূত যেন মন্দিরের পূজাটা চালিয়ে নেন। এর চাইতে পরম সৌভাগ্য আর কী হ'তে পারে? রক্ত মাংসের ইষ্ট দেবী মা আনন্দময়ী আসছেন গাড়োয়ালের মহারাজার বিশেষ ব্যবস্থাপনায়। নরেন্দ্রনগর থেকে উত্তর কাশী চলে আসতে দু'দিন লাগবে।

প্রজ্ঞানাথজী শিশুর মত সরল। সদাসন্তুষ্ট। এত রোগা এত দুর্বল যে দেখলে মন খারাপ হয় নিবু নিবু প্রদীপের মত কিন্তু নেভে না! জ্বলছে যেন নিবাত নিষ্কম্প তাঁর প্রাণ-প্রদীপ যেন সত্য-শিব-সুন্দরের আরতি করছে। এই প্রজ্ঞানাথের গুহাতেই দেখা পান আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ির পাঞ্জাবী ছত্র থেকে যে ঘি দেওয়া গরম হালুয়া আসত তাই প্রজ্ঞানাথের আদেশে তাঁর জন্য রেখে দিতেন। এই বুড়িটা চোখে দেখতে পায় না। হাঁটতে পারে না। ঐভাবে

বেঁচে আছে। এই সন্ন্যাসীই অবধূতকে শেখালেন কীভাবে প্রাণায়াম করতে হয়। প্রজ্ঞানাথ নিজের কম্বল দিয়ে ভোর রাতে বললেন অবধূতকে মায়ের সাথে দেখা করে আসতে। অবধূত এত ভোরে যাওয়া উচিত কি-না এ প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন: 'তোমার মা দিন রাত সন্ধ্যে সকাল তৈরী করেছেন, ওঁর কাছে কোনও সময় সময় নয়। কালের অতীত কালী, মহাকালকেও গ্রাস করে ফেলেন। যাও, দেরি করো না'[৩৫] উত্তরকাশীর কালিবাড়ীতে গেলেন অবধূত কালীর দরজা বন্ধ। ধপধপে সাদা কাপড় পরা যিনি হাঁটছিলেন তাঁর মুখখানাও পুরো দেখা গেল না। তিনি এধার থেকে ওধারে হেঁটেই চলেছেন। হাঁটুনি কিছুতেই থামছে না। ভয়ঙ্কর রকম ম্যাজেস্টিক সেই গুরুতর মর্যাদা সম্পন্ন হাঁটুনির সামনে নিজেকে কেঁচো মনে হলো অবধূতের। তাঁর ঘাড় সোজা সমস্ত দেহটা সোজা চোখে পলক পড়ছে না একরাশ চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে। যেন মানুষ নয়, একটা আস্ত সিংহ যেন, কেশর ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবধূতের দু'হাত সামনে দিয়ে বার বার পার হচ্ছেন অথচ কিছুই তাঁর চোখে পড়ছে না। অবধূত নিজেও কীভাবে জড়ের মত হয়ে গেলেন। দাঁড়িয়েই রইলেন সব ভুলে। আনন্দময়ী মায়ের এক শিষ্যা এসে তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে মা যখন কথা বলতে চাইবেন তিনি তখন ডেকে নেবেন। জেনে নিলেন তাঁর ঠিকানা। অবধূত পরে জানলেন এভাবে তিনি আগের দিন থেকে কুড়ি ঘন্টা ধরে চলছেন। অবধূতের মনে হলো এটি জ্যান্ত পাথরের মূর্তি। ফিরে আসার পরে প্রজ্ঞানাথ জানালেন :

> "তোমার জন্যে ঐ নাক টেপাটেপি নয়, তোমার ধাতে সইবে না। দূর ছাই বলে ফেলে দিয়ে আবার ছুটে বেড়াবে। যা তুমি চাইছ তা আছে ঐ রক্ত মাংসের দেহটায়। সাংঘাতিক জাতের জেনারেটার চার্জ ক'রে নাও, নিজের ব্যাটারিটাকে চার্জ ক'রে নাও ঐ জেনারেটার থেকে।"[৩৬]

এরপরে অবধূত গেলেন সেদিনও দেখা হলো কিন্তু হথা হলো না সবাই চুপচাপ। পাথরের প্রতিমা পিছনে পা মুড়ে বসে আছেন বাকীরা নিঃশব্দ। যেন ঘুমন্ত! এরপরে প্রজ্ঞানাথ বললেন,মায়ের পূজা সাজিয়ে নিয়ে যথাবিধি পূজা করতে। সেই প্রসাদ মাকে খাওয়াতেও হবে। না পারলে পূজা নিষ্ফল! অবধূত যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। কে তিনি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারছেন না। ভোগের থালাখানি নিয়ে প্রজ্ঞানাথ স্বয়ং চলেছেন। একইভাবে বসে আছেন মা আনন্দময়ী কোনো বাহ্যজ্ঞান নেই। ব্রক্ষ ছাড়া আর যাই জিভ দিয়ে উচ্চারণ করা যায় তাই উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়। প্রজ্ঞানাথ নীরবতার মধ্যে দিয়ে বোঝালেন। এরপর মা আনন্দময়ী তাঁকে নির্জনে কাছে ডাকলেন। মায়ের কাছে বসতেই হাঁ করতে বললেন। মুখের ভিতর থেকে মা আঙুল বের করে নিলেন। মুখ বন্ধ হলো। মা অভয় বাণী শোনালেন :

> "এইবার ঘুরে বেড়াগে যা, চোখ মেলে দেখবি, কান পেতে শুনবি, চৈতন্য দিয়ে বুঝবি। তোর মা নিজের জিভটা কামড়ে রয়েছেন। জিভ কামড়ে থাকলে কি কেউ কথা বলতে পারে রে। তোর জিভটাও অচল করে দিলুম। এইবার মজা করে দেখে নে তোর মায়ের এই সংসারটা কেমন জায়গা। এই যে হিমালয়,

এখানেই সব আছে। তিন বছর পরে যখন বেরুবি পাহাড় থেকে তখন সব তোর জানা হয়ে গেছে। বিষ, সমস্তই বিষ। সেই বিষ যিনি কণ্ঠে ধারণ করে আছেন তিনিই সাক্ষাৎ শিব নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের ভালও নেই মন্দও নেই। সৎ অসৎ কিছুই নেই। সত্যের জাত নেই। সত্য হল সত্য, ঐ নীলকণ্ঠই একমাত্র সত্য। বিষকে কণ্ঠে ধারণ করেছেন যিনি তিনিই সত্য শিব সুন্দর। আর সুন্দরের শক্তি আনন্দভৈরবী'' ৩৭

উপন্যাসটির নাম 'দুর্গম পন্থা' এই নামের কারণ এ নয় যে ভ্রমণপথ বড় বিপদসঙ্কুল,বরং যে জীবনপথের কথা ঔপন্যাসিক জানাতে চেয়েছেন সে মার্গ বা জীবনপথ বড়ই দুরধিগম্য। কক্সবাজারের প্রতাপশালী বিমিশ্র চরিত্র বৈশিষ্ট্যের অয়স্কান্ত বকশী বেয়াড়া এক চরিত্র। একজনের দেহে আর একজনের প্রাণ নিয়ে সে এক ট্রাজেডির মূর্তিমান বিগ্রহ। তাঁর মা ফুল্লরা পরজন্মে ফুল্লনলিনী গাঙ্গুলিও একইভাবে অন্যের দেহ আশ্রয়ী এক মানুষ। স্বভাবতই এদের আচরণ,পছন্দ-অপছন্দ অতীত বর্তমান -ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে বেশি। অয়স্কান্তর দৈহিক বর্ণনায় ও কার্যকলাপে লেখক অন্য মাত্রা যোগ করেছেন:

১. প্রথম দর্শনে কথকের মনে হয়েছিল:'ইনিই অয়স্কান্ত? এই মাংসশুন্য হাড় ক'খানাকে লোকে অত ভয় করে !' তাঁর ড্রয়িং রুমে কাঠের মেঝে, ঘরের দেওয়াল কাঠের। চালের তলার দিকে কাঠ, ওপরে টিন। আসবাবপত্র কিন্তু কাঠের নয়,বিভিন্ন জন্তুর দাঁত হাড় শিং চামড়া দিয়ে বানানো। বাঘের চামড়া দিয়ে ঘরের সমস্ত মেঝেটা মোড়া। তার ওপর টেবিল চেয়ার যা সব বসানো রয়েছে সেগুলোর পায়া অদ্ভুত। মোষ হরিণ ইত্যাদি প্রাণীর দাঁত শিং দিয়ে তৈরি। ঐ সব জিনিস ছাওয়াও হয়েছে চামড়া দিয়ে। কাঠের দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে সাপের চামড়া এবং নানারকম প্রাণীর ছাল। কাঠের দেওয়ালে মাঝে মাঝে লটকানো রয়েছে ছোরা ছুরি বর্শা বল্লম ভোজালি খাঁড়া -আরও কত কি মারাত্মক জাতের অস্ত্র ! এক কোণে গাদা হয়ে পড়ে আছে গোটাকতক রাইফেল, বন্দুক এবং পিস্তল। অনেকগুলো চামড়ার খাপ আর বেল্ট ডাঁই হয়ে পড়ে আছে সেখানে। পেছন দিকের বারান্দায় ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে হেটমুণ্ডে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সদ্য খুন করা একটা চিতাকে। বোধ হয় সেটার ছাল ছাড়াবার ফুরসত তখনও হয়নি। ঘরের এই খুঁটিনাটি বর্ণনায় লেখকের বাস্তবানুরক্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। এটা একজন উপন্যাসকারের প্রধান গুণ। কোন অলৌকিক গাঁজাখুরি গল্পের শুরু বলে মনে হয় নি। কখনো কখনো-পরিবেশ আমাদের অভিজ্ঞতাকে হার মানায়। তা সত্ত্বেও এ উপন্যাসের বর্ণনা জীবন বিচ্ছিন্ন নয়। অলৌকিকতার দিকে কোনো উৎসাহই লেখক দেখাননি। লেখকের সংযম এখানে প্রশংসনীয়।

২. বকশী মশাই শুরু করে দিলেন হাসি,কাঁপতে লাগল তাঁর হাড় ক'খানা। দু হাতে পেট টিপে ধরে খ্যাঁক খ্যাঁক ...।' পেটে অসহ্য যন্ত্রণা চেপে রাখার জন্য হাসির ছদ্মবেশ।-যেকোনো ব্যক্তিত্ববান মানুষের অসুস্থতা বা দুর্বলতার প্রকাশ নিজের মর্যাদা-হানিকর।

অয়স্কান্ত সম্পর্কে এর বেশি আমরা কিছু ভাবতে পারিনি। অলৌকিকতাকে জোর করে চাপানোর যে অশৈল্পিক কাজ তা অবধূত করেন নি।

৩. অয়স্কান্ত আর পাঁচজনের মত সাধারণ কোনো মানুষ নন। লেখক সেকথা ভোলেননি। আবার উপন্যাসে ভৌতিক জগতের ওপর বিশ্বাস আনার জন্য কোনোভাবে বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেননি। জাদুবাস্তবতার এ উপন্যাসে কথক অয়সকান্তকে প্রথম দেখলেন এইভাবে: "..খেংরাকাঠির মত রোগা অস্বাভাবিক লম্বা একজন বয়স্ক লোক একপাল ভীষণ দর্শন কুকুরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক খণ্ড কাঁচা মাংস নিয়ে লোফালুফি করছে। মাংস খণ্ডটা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সবকটা কুকুর লাফিয়ে উঠছে সেটা ধরবার জন্যে। কিন্তু ধরতে পারছে না কেউ, আশ্চর্য কায়দায় কুকুরের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটাই আগে লুফে নিচ্ছে সেটা। তখন কুকুরে মানুষে লাগছে কাড়াকাড়ি। চিৎকারে হুংকারে ফেটে যাচ্ছে আকাশ। দূরে দাঁড়িয়ে সেই রোমহর্ষক কাণ্ড দেখতে লাগলাম।"[৩৮]

৪. অয়কান্ত বকশীর একান্ত কাছে আসার ফলে কথক যা দেখেছিলেন তা তার অসংখ্য কর্মচারীরাও দেখার সুযোগ পায়নি। অয়সকান্ত একান্ত নির্জনে। তার আশে পাশে কোনো লোক নেই। এমন সময় কথক দেখলেন অস্বাভাবিক এই ঘটনা। সাধারণ মানুষের দেহ আশ্রয় করে মৃত আত্মা কীরূপ আচরণ করতে পারে কথকের মাধ্যমে আমরা এখানে তা দেখতে পেলাম :

> "বকশী মশাই তাকিয়ে রয়েছেন! কি ভয়ঙ্কর চাহনি ! চোখের তার দুটো যতদূর সম্ভব উঠে গেছে ওপর দিকে, তারার নিচের সাদা অংশে রক্তের লেশ মাত্র নেই। সে দৃষ্টিতে প্রাণও নেই যেন। হঠাৎ দেখি সেই অস্বাভাবিক চাউনি সুদ্ধ তাঁর মুখখানা আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে আসছে। গলা বুক সব উঠতে লাগল। কোমর থেকে পা পর্যন্ত ঠেকে রইল মেঝের সঙ্গে। কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কাঠ একখানা, আস্তে আস্তে সিধে হয়ে উঠল ওপর দিকে। বকশী মশাই কোমর পিঠ ঘাড় মাথা টান টান করে পা ছড়িয়ে বসে রইলেন সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে নিজের কপালের দিকে তাকিয়ে। একটি বারের জন্যও কাঁপল না তাঁর চোখের পাতা, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কিনা তাও বোঝা গেল না।"[৩৯]

লক্ষ্যণীয় যে সাধারণভাবে কথক নিজের প্রতিক্রিয়া জানান। নিজের ভয় পাওয়া,গায়ে কাঁটা দেওয়া -কিছুই এখানে নেই। ভাবটা এমন যে তিনি যা দেখেছেন কেবল সেটাই স্মৃতি থেকে ব'লে চলেছেন। কাউকে ভয় পাওয়ানো বা ছেলেভুলানোর কোনো চেষ্টা নেই। ভৌতিক বিষয় বলতে গিয়ে তিনি এটা ভোলেন নি যে অয়সকান্ত নামের এই মানুষটি আবার শারীরিক কষ্টে দুমড়ে মুষড়ে যান।

> "তাঁর দেহ যষ্টিখানি তখন বেঁকে চুরে তেবড়ে নানারকম ভঙ্গি ধারণ করছে। যেন কোনও অদৃশ্য হস্ত ধীরে সুস্থে অতি মোক্ষমভাবে মোচড় দিচ্ছে তাঁকে

> ধরে, রসকষ একটুকু অবশিষ্ট থাকতে কিছুতেই নিস্কৃতি দেবে না। বুঝতে পারলাম এইভাবে নিঙড়ে নিঙড়েই বকশী মশাইকে একেবারে ছিবড়ে করে ফেলা হয়েছে। তাই উনি উল্লুকের গলায় সোনার চেন পরান, খেঁক খেঁক করে কদর্য হাসি হাসেন। বলেন -'ভাত-কাপড় সোনা-দানা হীরে-জহরত কোনও কিছু দিয়েই কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। খেয়েছে দেয়েছে থুয়েছে আর শিকল কাটার মতলব ভেঁজেছে।''[৪০]

---কেন শিকল কাটার মতলব ভেঁজেছে লেখক কৌশলগত কারণে তা গোপন রেখেছেন --অয়সকান্তর এই যন্ত্রণা কথক অনুভব করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁর হাত-পাগুলোও কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হতে লাগল। নির্ভেজাল সাকার বেদনা আচ্ছন্ন করে ফেললে কথকের নড়াচড়া করার শক্তিটুকু। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যন্ত্রণায় টনটন করতে লাগল তাঁর নিজেরই। উঠে গিয়ে ওঁকে ধরে বসাবেন না কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। এ অবস্থায় কি করা কর্তব্য তারও কোন ধারণা ছিল না। কাঠ হয়ে বসে রইলেন বকশী মহাশয়ের দিকে চেয়ে আর যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন। তাঁর নজরে পড়ল ঠোঁট নাড়ছেন যেন বকমী মশাই। বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াতে লাগলেন তিনি। সেই আওয়াজ কানে যেতে কথকের হাত-পায়ের আড়ষ্ট ভাবটা কাটল। উঠে গিয়ে ওঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কাউকে ডাকবেন কিনা কিন্তু সে কথার উত্তর দিতে পারলেন না। তার মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরিয়ে এসে ছিটকে লাগল লেখক তথা কথকের মুখে। চাদর দিয়ে চোখমুখ মুছে ফেলে চোখ খুলতেই দেখলেন যে বকশী মশাই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। বকশী মশাই কোমর পিঠ ঘাড় মাথা টান টান করে পা ছড়িয়ে বসে সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে নিজের কপালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথক লক্ষ করলেন যে একটিবারের জন্যও তাঁর চোখের পাতা কাঁপল না, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কিনা তাও বোঝা গেল না। তাঁর চোখের তার দুটো যতদূর সম্ভব উঠে গেছে উপরের দিকে, তারার নিচের সাদা অংশে রক্তের লেশ মাত্র নেই। সে দৃষ্টি প্রাণহীন। তারপরে দেখলেন সেই অস্বাভাবিক চাউনি সুদ্ধ তাঁর মুখখানা আস্তে আস্তে গলা বুক সহ সোজা ওপরের দিকে উঠে আসছে। এরপর লেখক যে পরিবেশ তৈরী করেছেন তা উপযুক্ত :

> ''দুনিয়সুদ্ধ জন্তু-জানোয়ারের ছাল-চামড়া হাড়গোড় দিয়ে সাজানো সেই প্রায়ান্ধকার ঘরখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হল, আমিও মরে গেছি। মরণের ওপারের রাজত্বে পৌঁছে চাক্ষুষ দেখছি পারলৌকিক কাণ্ড-কারখানা। প্রেতের দৃষ্টি দিয়ে প্রেতলোকের গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য পড়তে লাগলেন বকশী মশাই। সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকব বা ছুটে বেরিয়ে যাব ঘর ছেড়ে এমন সামর্থ্যও রইল না।''[৪১]

এই অয়স্কান্ত আবার সাহেবী পোশাকে ধোপদুরস্ত ভদ্রলোক। এ বি সি অর্থাৎ অয়সকান্ত বকশী কোম্পানীর মালিক কেতা দুরস্ত সাজ-পোশাক, খানদানী আদবকায়দা আর সূক্ষ্ম ওজনের

কথাবার্তা নিয়ে রাশি রাশি মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলেন, প্রচুর দলিল দস্তাবেজ সই করলেন, নানা রকমের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত রইলেন দিনের মধ্যে কুড়ি ঘন্টা করে। কথক অনেক অনেক নতুন খবর জানতে পারলেন। জানলেন চট্টোগ্রামে, কলকাতায়,রেঙ্গুনে, মাদ্রাজে সব বড় বড় শহরে বড় বড় অফিস আছে অয়সকান্ত বকশীর। প্রচুর বড় সাহেব ছোট সাহেব বড় বাবু ছোট বাবু দারোয়ান চাপরাসী কাজ করে সেই সব অফিসে। তাদের মধ্যে শতকরা দু জনেরও সৌভাগ্য হয়নি খোদ মালিককে দেখবার। এই টুকু জানে সকলে, মালিক সমুদ্রের কিনারায় ঘর বেঁধে থাকেন, স্টীমারে চড়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ান, সমুদ্রের সঙ্গে ঘর না করলে তিনি তাঁর শরীরের মধ্যে বেশীদিন টিঁকতে পারবেন না। অবধূত এই উপন্যাসে সেই দুর্গম জীবনের কথা বলেছেন সচরাচর সাধারণ মানুষ যেখানে পৌঁছাতে পারে না। বাস্ত ব আর অবাস্তব পরিবেশ এমন এক কুহেলির সৃষ্টি করেছে যে পাঠকের পক্ষেও তা ক্রমশ দুবোধ্য আর দুর্গম হ'য়ে উঠছে। কথক স্বাভাবিক জীবনের একজন মানুষ তিনি তাঁর ইহলৌকিক বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলির ব্যাখ্যা পাচ্ছেন না। এভাবে এ উপন্যাসের কাহিনি হয়ে উঠছে দুর্গম।

বনলতার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছেন অয়সকান্ত বকশী। জানা গেল রেঙ্গুনে যাচ্ছে স্টীমার মাঝে কেবল আকিয়াবে একটু থামা। জলে ভাসছে স্টীমার। কথক জানিয়েছেন যে শেষপর্যন্ত সেই সম্বলটুকুও জল আর অন্তরীক্ষের সঙ্গে ঘুলিয়ে গিয়ে বেমালুম মিলিয়ে গেল। তারপর তিনি জেগে রইলেন না ঘুমিয়ে রইলেন, তাও ঠিক বলতে পারলেন না। অয়স্কান্তের গতাগতি কথকের কাছে দুর্বোধ্য তাই তার জগৎ ক্রমশ কথকের কাছে দুর্গম হ'য়ে উঠছে। কথকের উপলব্ধির একটা অসাধারণ বর্ণনা আছে :

> "সেই অবস্থায় ভাসতে ভাসতে হঠাৎ দেখি, এক মজাদার লুকোচুরি খেলার বুড়ী বনে গেছি। জল আর অন্তরীক্ষ জুড়ে চলছে এক ধরি ধরি ছুঁই ছুঁই খেলা। চোখ-জুড়ানো রঙের একফালি বাঁকা টিকলি কপালে আটকে কাজলী মেয়ে আঁধারি জল থেকে মাথা তুলে উঁকি দিলে। জলের অপর-প্রান্তে তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে আলো বেচারা ধারণা করতে পারে নি,আঁধারি তাকে ফেলবে। আলোকে দেখতে পেয়ে ছুটল আঁধারি অন্তরীক্ষের পথ ধরে তাকে ছুঁতে। আলো ডুবল টুপ করে লুকিয়ে ফেলল নিজেকে জলের মধ্যে। সারাটা অন্তরীক্ষ পার হয়ে পৌঁছল যখন আঁধারি সেই জায়গাটিতে যেখানে জলে ডুব দিয়েছিল আলো, তখন সে জানতেও পারল না যে তার পিছন দিকে আলো আবার জল থেকে মুখ তুলে চুপি চুপি উঁকি দিচ্ছে। বোকা মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, জলের তলায় আলোকে খুঁজে ধরবার জন্যে। নিশ্চিন্ত হয়ে বুক ফুলিয়ে আলো উঠে পড়ল অন্তরীক্ষে। চলতে লাগল সোজা সেই জায়গাটিতে,যেখানে আঁধারি জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভাল করেই জানে যে সে, জলের তলায় খোঁজা শেষ হলে আবার আঁধারি জলের ওপর মাথা তুলবে। হলও ঠিক তাই, জলের তলায় খুঁজে

খুঁজে হয়রান হয়ে যে মুহূর্তে আঁধারি আবার মাথা জাগালে, সেই মুহূর্তে আলো অপর প্রান্তে দিলে ডুব। চলতে লাগল এই মজার খেলা নীরবে নি:শব্দে জলেআর অন্তরীক্ষে। সেই খেলার বুড়ি সেজে চুপচাপ ভাসতে লাগলাম আমি আলো আঁধারির মাঝখানে।"[৪২]

অবিশ্বাস্য কাহিনিটি স্বপ্নে পাওয়ার মত করে বর্ণনা করলেন লেখক। মরা ইতিহাসের প্রচ্ছদপট ঢেউখেলানো টিন দিয়ে বানানো। মৃত্যু তো জীবনের অতীত। তাই সে জগৎ ছায়াচ্ছন্ন। তাই প্রচ্ছদপটের ভেতরে চলেছে আধুনিক প্রস্তর যুগ। বিশাল একটা মাঠ, ঢেউ খেলানো টিন দিয়ে এমনভাবে ঘেরা হয়েছে যে, ভেতরে কি হচ্ছে, তা বাইরে থেকে টের পাওয়ার উপায় নেই। বাইরের জগৎ তো জীবনের কোলাহলে ব্যস্ত! তাই কে খবর রাখে যে একদা একটি ছোট ছেলে তার দাদার হাত ধরে এসে পৌঁছল সেই টিনের বেড়ার পাশে ! দাদা তাকে নিয়ে গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকল। ভয়ংকর ব্যাপার চলেছে ভেতরে। বড় বড় পাথরের চাঙড়, কত তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, পড়ে আছে চারিদিকে। ছেলেটির চেতনা লোপ পাওয়ার মত। ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্-হাজার হাজার হাতুড়ির আওয়াজ উঠছে। বিস্তর মানুষ ছেনি হাতুড়ি দিয়ে কাটছে সেই পাথর গুলো। চাঁচছে,ঘষছে নানা রকমের নানা আকার বানিয়ে ফেলছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ছেলেটি সেখানকার ব্যাপার দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। তার বিস্ময়ব্যাকুল দুই চোখে ফুটে উঠল নানা জিজ্ঞাসা। কোথা থেকে জুটল এত পাথর? এই পাথর গুলো কারা বয়ে আনলো? লোকগুলো করবে কি এই পাথর গুলো দিয়ে? তার দাদা এই পাথুরে জঙ্গলের মধ্যে কি করে? এই ভয়ঙ্কর আওয়াজের ভেতর এই মানুষগুলো কি করে আছে? অবধূত জাদুবাস্তবতার এই উপন্যাসে বর্ণনার স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছেন। ভাষা যেন আলো-আঁধারি মিশ্রিত। লেখক পাঠককে নিয়ে গেলেন এই পাথরের জঙ্গলের বাইরে। অর্থাৎ যেখানে আবার ইতিহাসের আলো পড়ল, সে জায়গাটা সেই মহারাণীর স্মৃতি সৌধ থেকে অনেক দূরে। সেটা মহানগরী নয়, সেখানে কেউ কারও নামে পাথর গাঁথবে না, কিন্তু সেখানেও ইতিহাস গড়ার মাল মশলা মেলে।

দেখা যাচ্ছে সেখানে বাস করেন নাগ মহাশয় আর নাগিনী মহাশয়া। তাদের জীবন বিচিত্র ধরনের। আড়াই সের দুধে তোলা দু-এক আফিং জ্বাল দিতে থাকলে যে সরখানি তৈরী হয়, সেই সরখানি মাত্র আহার করেন নাগ মহাশয়। ভাত রুটির প্রয়োজন পড়েনা তাঁদের! তাঁর স্ত্রী নাগিনী মহাশয়া সরের তলায় যে দুধটুকু পড়ে থাকে, সেটুকু পান করেন। জানা গেলো পারলৌকিক কারবার করেন তাঁরা। ইহলোকের বহু গণ্যমান্য মানব-মানবী তাঁদের খদ্দের। মস্ত বড় এক বাগানের মধ্যে মস্ত বড় এক অট্টালিকা। সেই অট্টালিকায় বাস করেন নাগ মহাশয় আর নাগিনী মহাশয়া। নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে তাঁদের সাধন ভজন। গোটা দুয়েক চাকর থাকে মাত্র তাঁদের সঙ্গে। তারা বাঙালী নয়, কি যে করেন ত দের মণিবরা তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। ঘামাবার মত মাথাও নয় তাদের। কিন্তু হঠাৎ একদিন জুটল সেখানে একটি ছোকরা। নাগেদের এক ভক্ত তাকে নিয়ে এসে সেখানে রেখে গেল। গুরুদেব এবং

গুরুঠাকরুণের সেবা করবে। তিন কুলে কেউ নেই ছোকরার, আশ্রয় পেয়ে বর্তে গেল সে ছোকরা।

দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে লেখক জানিয়েছেন যে ইতিহাস তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় যারা পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগবার দরুণ ইহজন্মে কর্ম করে বেড়ায়। কিন্তু যে বেচারা পরজন্মের কর্মভোগটা ইহজন্মে ভুগছে, তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় কে!খোঁচা খোঁচা কয়েকটা নতুন গোঁফ দাড়ি, একমাথা জট পাকানো চুল,শতগ্রন্থি দেওয়া একখানা ময়লা কাপড় পরা যে লোকটা মাঠে ঘাটে লোকের লাথি ঝাঁটা খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তার নাম ইতিহাসের পাতায় ওঠেনি। ও রকম জীব এন্তার চরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র, চলতে চলতে বেমালুম কে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, কার গরজ পড়েছে খোঁজ রাখার। কিন্তু ওদের একজন হারাল না, ঘুরতে ঘুরতে শেষপর্যন্ত আটকে গেল। বাঁধা পড়ল একটা খোঁটায়। তারপর আবার তাকে নিয়ে ইতিহাস রচনা হতে লাগল। আমরা পরে জানতে পারলাম এই ছেলেটি পরে কাহিনির নায়ক অয়সকান্ত! জাদুবাস্তবতার উপন্যাসে ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে সাধারণ মানুষের মাধ্যমে সেতু রচিত হয়। এখানেও হয়েছে। বাস্তবতা নির্ভর উপন্যাসের পাঠক সেই পরিবেশকে অনেক সময় মেনে নিতে পারেন না। তাদের কাছে অবশ্যই দুর্বোধ্য আর দুর্গম হয়ে যায়।

এই পর্বের শুরুতে আমরা দেখি মহকুমা আদালতের ধনুর্ধর উকিল গঙ্গেশ গাঙ্গুলী আদালতের আইনের সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যাটাও আত্মসাৎ করে ফেলেছিলেন। সাধু সন্ন্যাসী ফকির দরবেশ যাকে যখন হাতের কাছে পেতেন, ধরে নিয়ে যেতেন নিজের বাড়িতে। তাবিজ কবজ মন্ত্র মাদুলি,জড়ীবুটী,অব্যর্থ ওষুধ, কত কি তিনি জুটিয়েছিলেন, তার ঠিকানা নেই। সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করার ফলে তাঁর ভেতরেও একজন সাধুর জন্ম হয়েছিল। তিনি জানতে পারতেন কার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তাঁর কৃপা না নিয়ে ছাড়তেন না। সমাজবদ্ধ মানুষের সংসার সম্পর্কে একজন দক্ষ ঔপন্যাসিকের মতই এ প্রসঙ্গে অবধূত বলেছেন :

> "সংসার-দুর্গের ভিত্তি গাঁথার মশলা তৈরী হয় দু জাতের দুটি ভেজাল পদার্থের সংমিশ্রণে। পদার্থ দুটির নাম - মেনে নেওয়া আর মানিয়ে চলা। রাশি রাশি চোখের জল আর বুকের রক্ত দিয়ে নরম করতে হয় ঐ দুটি শুকনো গুঁড়োকে। তারফলে তাতে রস জমে, আঠালো হয়। ঐ আঠালো মশলার গুণে বড় বড় বিশ্বাস আর নির্ভরতার চাঙড় গুলো গায়ে গায়ে আটকে থাকে। তখন সেই ভিত্তির ওপর একতলা, দুতলা,দশতলা যত তলা খুশি সংসার-অট্টালিকা গড়ে তোলা যায়।"[৪৩]

এই উপন্যাসের পটভূমি বক্তব্য বিষয় সবটাই আলাদা। অবধূত তা জানতেন। তাই দুর্গম এ উপন্যাসের মর্মার্থ বোঝার জন্য পাঠকের মনকে প্রস্তুত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন লেখক :

> "ইতিহাসের চলন পিছন দিকে, সমুখ পানে মুখ রেখে সে পিছু হেঁটে চলে। তাই সে নিজের পিছনটা দেখতে পায় না যতটুকু পিছোয় ঠিক ততটুকু সামনে

দেখতে পায়। আর সেইটুকুই ইতিহাস দেখায় সকলকে। তার পিছনে অন্ধকার রহস্যের গর্ভে কি আছে, তা সে নিজেও জানে না, কাউকে জানাতেও পারে না। কিন্তু হঠাৎ যদি সে ঘুরে দাঁড়ায়, তার নিজের পিছনে কি আছে তা জেনে ফেলে, তখন সেই ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের উল্টো টানে পাহাড় পর্বত যায় ভেসে, সামান্য সংসার-ইমারত কি করে টিঁকবে!" ৪৪

গঙ্গেশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী শ্রীযুক্তা ফুল্লনলিনী দেবীর দীর্ঘ ৪৮ বছরের সংসারে কোন অসঙ্গতি চোখে পড়েনি। একদিন হারানো ছেলে আজকের অয়সকান্ত সামনে এলে বাড়ীর সকলে বুঝতে পারলো গিন্নিমার আসল স্বরূপটা। গঙ্গেশ-আইনজীবী মানুষ, সবরকম চেষ্টা করলেন :

১. অয়স্কান্তকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আটকে রেখে মারধোর করলেন। ফল হোল বিপরীত :

ক. বড় ছেলে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পিছনের ঠেলায় মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে ফাটালো ঠোঁট।

খ. ছোট বউ দুধ জ্বাল দিচ্ছিল হাঁড়ি উঠে গেল দোতলার কাছাকাছি তারপর উল্টে গেল গরম দুধ, ছড়ালো মুখে চোখে। হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো ছোট বউকে।

গ.বড় নাতি শুভাশীষ চাপা পড়ল খাট-বিছানার তলায়ঘুমমোচ্ছিল সে খাটে শুয়ে, হঠাৎ বিছানা-সুদ্ধখাট খানা উল্টে গেল। খাট বিছানা সরিয়ে যখন তাকে বার করা হল, তখন তার দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

ঘ. শেষ পর্যন্ত এক মরা ইঁদুর এসে ছিটকে পড়ল কর্তার মুখে।

ঙ.আইনের রক্ষক গঙ্গেশ গাঙ্গুলির নাকাল হওয়া কম বিস্ময়ের নয়। বিরাট ওজনের বইভর্তি আলমারী গড় গড় করে এগিয়ে এসে বৈঠকখানার দরজার মুখে বসে গেল। বই পত্র তছনছ হলো অদৃশ্য হাতের তৎপরতায়। অবশেষে অনেকে মিলে আলমারী সরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো মূর্ছা গেছে মালিক। অবশেষে গাঙ্গুলী মশাই নুয়ে পড়লেন সহধর্মিনীর দরজার তালা খুলে দিলেন। মানতে হলো ফুল্লনলিনীর গৃহত্যাগের দাবি। হাত জোড় করে বললেন:'তুমি যাও। আর কোনও দাবি নেই আমার তোমার ওপর। এখন দয়া করে তুমি আমায় রেহাই দাও। আমার বংশ নাশটা আর করো না।'

জবাবও দিলেন না গাঙ্গুলী-গিন্নী। বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।ছেলে মেয়ে নাতনী সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।-বোঝাই যাচ্ছে বাস্তব-জীবন থেকে অবধূত সরে যান নি। উপন্যাস বলতে তাই কোনো বাধা থাকছে না। অথচ যা ঘটল তাকে ম্যাজিক না বলে উপায় কী?

অয়স্কান্তকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ফুল্লরা। স্টীমার ঘাটে যাওয়ার আগে গেলেন থানায় ছেলের হাত ধরে সোজা স্টীমার ঘাটে। যারা পিছু নিয়েছিল তার দেখল চাঁটগার দুখানা টিকিট কিনলেন আঁচল থেকে এক মুঠো টাকা বার করে। টিকিট কাটলেন চট্টোগ্রামের। যা কিছু ঘটছে সবই চোখের সামনে-বলা উচিত বহু মানুষের চোখের সামনে।

পূর্বতন স্বামী নিকষকান্তের বয়স এখন ৯৬ বছর তবু নিকষকান্তের বুদ্ধিজ্ঞান একেবারে টনটনে। যথোচিত প্রমাণ দিয়ে এ বাড়িতে আশ্রয় পেল অয়স্কান্ত ও তার জননী।মৃত্যুর আগে নতুন করে উইল তৈরী হলো,এরজন্য অয়সকান্তকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হল।

> "যে ছোকরাটি একদা তার দাদার হাত ধরে ইংরেজ রাণীর স্মৃতিসৌধ বানানো দেখতে যেত, যে ছোকরাটি একদা তার দাদা আর মাকে হারিয়ে বেওয়ারিস মাল হিসেবে পথের ধূলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছিল, হঠাৎ তার বর্তমানটা গেল মুছে, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ গেল জুড়ে। নতুন ইতিহাস গড়ে উঠতে লাগল।"[৪৫]

এরপর দেখা গেল মা- ছেলের সক্রিয়তায় এ বাড়ির আয় উন্নতি। কেউ জানে না কোথা থেকে কবে কোন্ বকশীর প্রথম শুভাগমন হয়েছিল কক্স বাজারে। নিকষকান্ত বকশী মশাই গোলদারী ব্যবসা চালাতে চালাতে কি উপায়ে যে জাহাজ কিনে ফেললেন, তাও কেউ বলতে পারে না। একটা উপকথা চালু আছে ওদেশে। কবে নাকি এক টাইফুন না টর্নেডো উঠেছিল কক্সবাজারের দরিয়ায়। আর তার ফলে ভাঙা জাহাজের কাঠ ধরে ভেসে এসে কূলে ঠেকেছিল দুজন ভিন্-দেশী মানুষ।

> "নিকষকান্ত বকশী তাদের উদ্ধার করেছিলেন দরিয়ারকূল থেকে, ঘরে নিয়েগিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তারপর একটু হিসেবের গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। সেই মানুষ দুটোকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি কোথাও। তার বদলে বকশী মশাইয়ের নিজের কেনা আস্ত একখানা জাহাজ একদা ঠিক সময় এসে কক্সবাজারের কূলে ভিড়েছিল।"[৪৬]

স্টীমার এর ব্যবসা আরো হরেক রকম জিনিসের কারবার করেন অয়স্কান্ত। অয়স্কান্তের আকর্ষণী শক্তি এত বেশী যে কক্সবাজারের যাবতীয় মুনাফা,সব দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে তাঁর অঙ্গের সঙ্গে আটকে যায়।

> "হেন জিনিস নেই যার কারবার করেন না অয়স্কান্ত। মাছ কাঠ ধান তেল লোহা লক্কড় টিন ওষুধ কাপড় জামা সাইকেল জুতো সোনাদানা হীরে জহরত, দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস বকশী কোম্পানীর জাহাজ কক্সবাজারের জন্যে বয়ে নিয়ে আসে।বড় বড় অফিস, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুদাম,শত শত মানুষজন, মায় এক সাহেব ম্যানেজার পর্যন্ত আছে বকশী মশাইয়ের।"[৪৭]

তার কোম্পানীর বিচিত্র লোকজন। হয়তো কেউ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অলেওকিক শক্তি বলে অয়সকান্ত তা মুহূর্তে টের পেয়ে যায়। কর্মচারীকে সাবধান করা হয়। এরপরও যদি না সমঝে চলে তবে আর রক্ষে নেই। তাই কোনো বিদ্রোহ ষড়যন্ত্র সেখানে নেই। সবাই তটস্থ।

ফুল্লনলিনী এখন ফুল্লরা। লক্ষ করা গেছে সে এ বাড়িতে আসার পর থেকে একটা দুটো ক'রে এলো অনেকগুলো কুকুর। তাদের আশ্রয় হল এ বাড়ি। আদর যত্নে তারা রইল এখানে। সারাদিনে খুব বেশি বাইরে দেখা যেত না তাঁকে। কুকুরদের খাওয়ানোর পরে তিনি খেতেন সামান্য ফলমূল। কুকুর প্রথমে নিরামিষ খাবার খেত পরে রান্না মাংস। এরপর আবার খাসি কেটে তার কাঁচা মাংস খাওয়ানো চলতে থাকে। এখন আবার তাদের বংশ বৃদ্ধি হয়েছে তাই

দুটি খাসির মাংস তাদের খেতে লেগে যায়। ফুল্লরার নতুন সখ হল কুকুরদের মাঝখানে জ্যান্ত খাসি ছেড়ে দেওয়া। এরপর তাকে একদল কুকুর খুবলে খুবলে খাবে -এটা চোখের সামনে দেখতে চাইত ফুল্লরা। অয়স্কান্ত এটা বন্ধ করতে চেয়েছিল কিন্তু মায়ের ইচ্ছায় সেটা চালু থাকে। রক্তাক্ত বীভৎস সেই ব্যাপার যতক্ষণ চলে ততক্ষণ সেখানেই বসে শেষ পর্যন্ত দেখে যান অয়স্কান্তের মা।

একদিন ঘটল সেই ভয়ানক কাণ্ড---কুকুরে ছিঁড়ে খেলো ফুল্লরাকে। উপন্যাসের বর্ণনায় আমরা তার বীভৎসতা অনুমান করতে পারি। মারা যাওয়ার পর তাঁর যথাবিহিত সৎকার করা হলো। কুকুরের ভুক্তাবশেষ দেহ চন্দনের চিতায় ভস্মীভূত হলো। রাজকীয় চালে শ্রাদ্ধশান্তি র কাজ মিটল। এমন টাকা খরচ করা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয় একথা বলাই যায়।এরপর বিচিত্র উপায়ে কুকুর গুলোকে মারলেন অয়স্কান্ত। অয়সকান্তের চেহারা লক্ষ্য করার মতো। কালো কুচকুচে তার দেহবর্ণ। হাড়ের গায়ে মাংস নেই বলে কেবল চামড়ার ছাউনি বললেই ঠিক হয়। চোখ দুটো যেন কোঠরে ঢুকে আছে। তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আর দেহের বেয়াড়া উচ্চতা ভিন্ন আর কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়ার মত নয় কোন কিছু তার সহ্য হয়না। কেবল পকেটে থাকতেই হবে অন্তত দুই বোতল সোডা। ঘরের মধ্যে যেদিকেই তাকানো যাক না কেন সোডার বোতল চোখে পড়বেই। প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে না পেলে কীরকম অনর্থ হতে পারে তা ভাবতেই পারে না বাড়ির অন্য সদস্যরা অন্য সদস্যরা অবশ্য তেমন কেউ নেই। তার বিপুল ব্যবসায়ের অনেক লোকজন। বছরের উপরও যাঁরা এই কাজের সাথে যুক্ত তারাও তাদের মালিককে এক আধ বারের বেশি দেখেছে বলে দাবি করতে পারে না।

অয়সকান্তের ব্যবসা-সূত্রে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বর্মামুলুকে, তাই মেয়ের বিয়ে দিয়ে মাধোরাম মুন্সীর জামাই সহ মেয়েকে পাঠানো হয়েছিল এ পরিবারে কিছুদিন কাটানোর জন্যে। লেখক তার বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে। বোঝাই যাচ্ছে পারিবারিক বন্ধুত্ব খুবই নিবিড় না হলে এমন জাহাজ তাদের জন্য পাঠানো হতে পারে না। জাহাজের বিষয়ে কিছু খবর আমরা এই সূত্রে জেনে নিতে পারি।

এই ঘটনা কীভাবে ট্রাজিক পরিণতি লাভ করলো তা উপন্যাস অবলম্বনে জেনে নেওয়া দরকার : জামাই ধূর্জটীনাথ চৌধুরী অত্যন্ত জিজ্ঞাসু চরিত্রের মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানপিপাসু তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়: যেখানে প্রাণহরণের নিশ্চিত কারণ ঘটে সেখানেই প্রাণ বাঁচানোর উপায় লুকিয়ে আছে আর এই ভাবনা থেকেই তিনি নিবিষ্ট চিত্তে সাপের বিষ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছেন। বহু সাপ তাঁর হাতে ধরা পড়ে আটকে আছে কাচের ঘরের মধ্যে। সাপ ধরার বিদ্যেটাও শিখে নিয়েছেন স্বামীর কাছ থেকে। এই কাজটি নির্বিঘ্নেই চলছিল। কীকরে যে বিজ্ঞানীর মাথাটাই বিগড়ে গেল তা কেউ বলতে পারে না। লক্ষ করার বিষয় এই যে অবধূত জাদুবাস্তবতার এই উপন্যাসে ভাষাভঙ্গির মধ্যে ব্যঞ্জনা ব্যববহার করছেন। স্পষ্ট করে বলছেন না তা বলে বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। যেমন :

১. কীকরে অয়স্কান্ত সব জেনে যান। তার ফলে কর্মচারীরা তাদের মালিককে খুব ভয়

পায়।

২. কেন ফুল্লনলিনী আসার পরে প্রচুর কুকুর এলো?

৩. অয়সকান্তের মা কেনো জ্যান্ত খাসির ছিঁড়ে খাওয়া টাকে উপভোগ করত!

৪. কেনো অয়স্কান্ত এমন বীভৎস কালো আর এত হাড় বের করা?

৫. কীভাবে মাধোরামের বিজ্ঞানী জামাইটি পাগল হলো?

৬. বনলতাকে কেন অকালে হারাতে হলো? -এ সব জিজ্ঞাসার উত্তরটাই পেয়ে যান। লেখক জানাবার প্রয়োজনও মনে করেননি। বলবার ভঙ্গিটা এমন যে লেখকের উপলব্ধি যেন পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। পারলৌকিক শক্তির পরিচয় যেমন উপলব্ধি করা যায় কিন্তু সে উপলব্ধি চাইলেও অন্য কাউকে সঞ্চারিত করা যায় না --এমনভাবেই অবধূত জাদুবাস্তবতার এ উপন্যাসে প্রচুর ইঙ্গিত ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ই ঠিক করে দেয় ভাষা কেমন হবে। প্রকাশভঙ্গি তার অবলম্বিত বিষয়ের উপরেই নির্ভরশীল। অন্তত অবধূতের লেখার মধ্যে আমরা সে নমুনা পেয়ে যাই।

বিজ্ঞানী জামাইটির পাগল হওয়া আর বনলতার হারিয়ে যাওয়ার আগে যা ঘটেছিল তা হলো এই ঘটনার আগে যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো। বিজ্ঞানীবাবুর স্ত্রী ফিরে যাওয়ার সময় একবার অনুরোধ করেছিল অয়স্কান্তকে, তাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে:‘চলুন না আমাদের সঙ্গে।’[৪৮]---হঠাৎ এই প্রস্তবে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান অয়স্কান্ত। চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। দেখলেন কালো তারা দুটি জলে ডুবে গেছে। তারপর আবার শোনা গেল :‘‘কি করে একলা থাকবেন এখানে আপনি?’এরপর অয়সকান্তের রাগ গিয়ে পড়ে কুকুর গুলোর উপর। অয়স্কান্তের যাওয়া হয়ে ওঠেনি কিন্তু আবার অল্প দিন পরে তারা ফিরে এসেছিল বনলতা নামে একটি প্রাণচঞ্চল মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। এই মেয়েটি তার জীবনে ভালোবাসার স্বরূপ বয়ে এনেছিল :

> ‘‘আমার স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলাম চাটগাঁ, শ্বশুর-বাড়িতে পৌঁছে পুরুত ডাকিয়ে নতুন করে মন্ত্র পড়া হল, আগুন জ্বালিয়ে খই পোড়ানো হল। শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন করে আবার আমরা জাহাজে উঠলাম।’’[৪৯]

অয়স্কান্তের স্বীকারোক্তি এবং কার্যকারণেও আমাদের মনে কোন সন্দেহ বা অস্বাভাবিকতা সঞ্চার করে না। অয়সকান্ত স্বাভাবিক কথা-বার্ত র মধ্যে হাসি ঠাট্টা রসিকতাও করেন। পরে সেই সূত্র টেনেও কথা বলেন। যেমন :

> ‘‘তাই তো প্রথম দিন আপনার সামনে আপনার সেই ঘোষাল মশাইয়ের নাতজামাইটিকে শালা বলে ফেলেছিলাম।ঘোষাল মশাইয়ের নাতজামাইটি যত বড় মানুষের নাতজামাই হন না কেন,আসলে তিনি একটি শালা। কারণ তার দিদিকে আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ করেছিলাম।’’[৫০]

এই সূত্রে কথক বনলতার অসাধারণ সৌন্দর্যও ব্যাখ্য করেন। বর্ণনা না করে এই ব্যাখ্যা করলেও তার জন্য কোনো শব্দের প্রয়োজনও হয়নি। আমরা তা লক্ষ করতে পারি।

অয়স্কান্তের আত্মহারা হয়ে ওঠার কারণ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক :

> ''নাতজামাইটির রূপ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম, তার বোন বনলতার মূর্তিখানি কেমন ধারা হতে পারে। ভাই- বোনের আকৃতি অনেক ক্ষেত্রে এক রকমের হয়, খানিকটা আদল থাকেই। ছিলও সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নয় তো অয়স্কান্ত পাগল হতে গেলেন কেন? ভাইটির সঙ্গে কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছিলাম। সে দুষ্টুমি ভরা চোখ দুটিকে ভুলতে পারিনি। বউটিকে নিয়ে সকলের নজরের আড়ালে গিয়ে এমন ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসলেন যে আদিনাথ দর্শনটাই মাথায় উঠে গেল। ওর বোন আর কত ভালো হবে!''[৫১]

এরপর লেখক বলেছেন :

> ''ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কেন জানি না, একবার মুখ ফিরিয়েছিলাম। ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বকশী মশাই,অন্ধকারে চোখ মুখ দেখা গেল না। কিন্তু একটা খুব একটা ছেলেমানুষী ধারণা হয়ে গেল আমার হঠাৎ। লম্বা দেহটাকে রক্ত মাংসের দেহ বলে মনে হল না। যেন ছায়া দিয়ে গড়া কায়া যেন- ঐ ধারণাটা মাথায় নিয়ে কেবিনে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে ভালো ঘুম হল না। যতবার ঘুম আসে, ততবার চমকে উঠি। ছায়া দিয়ে গড়া অয়স্কান্ত বকশীর সঙ্গে সঙ্গে চলেছি যেন কোথায়। এমন বিশ্রী পথে চলেছি, যে পথে পায়ের তলায় ছায়া ছাড়া কিছুই ঠেকে না। ছায়াপথে চলতে চলতে ঘুমিয়ে পড়লাম।''[৫২]

---লেখক যেভাবে অয়স্কান্তের অস্বাভাবিকাকে তুলে ধরেছেন তাতে ভৌতিক গল্প বলে মনে করা যাবে না। লেখক এমনভাবে বলছেন যেন সত্যের দায় নিচ্ছেন না। যেকোনো সময়ে অস্বীকার করতে পারেন। 'ছেলেমানুষী ধারণা হয়ে গেল', 'মনে হল না',---ইত্যাদি শব্দবন্ধ গুলি তার প্রমাণ। এভাবে বলার ফলে বিরোধী সমালোচনার মুখে সবটাই কথকের মনের ভুল বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। আসলে অলৌকিকতা ধরা দেয় আবার চলে যায়। চলে গেলে দেখানো যায় না তাই এ বিষয়ে বলতে গেলে যে ভাবে বলা উচিত লেখক সেই পথই অনুসরণ করেছেন। সত্য বললেন অথচ দায়মুক্ত থাকলেন। বিতর্ক এড়িয়ে উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করার এ কৌশল নিঃসন্দেহে অভিনব।

আট. কোটেশ্বর তীর্থে অবধূতের দেবী আশাপূর্ণার দর্শন : জীবনের ভাষ্য

'হিংলাজের পরে' উপন্যাসের মুখবন্ধে লেখক জানিয়েছেন :'১৩৬২ সাল শ্রাবণ মাস। আত্মপ্রকাশ করল এক কাহিনী -'মরুতীর্থ হিংলাজ'। সে কাহিনী যাঁরা পড়লেন,তাঁরা মাথা ঝাঁকিয়ে রায় দিলেন,শেষ হল না, জের রয়ে গেল। ...১৩৬৯ সাল পৌষ মাস। আর এক কাহিনী আত্ম প্রকাশ করছে-হিংলাজের পরে। ১৩৫৩ সালের ভাদ্র মাসে যে নৌকাখানা করাচীর কূল ছেড়ে সমুদ্রের বুকে উধাও হয়েছিল, সেই নৌকার বরাতে ষোল বছর পরে একটা কূল মিলছে।

এই কাহিনীর নাম 'হিংলাজের পরে'। এইভাবে গ্রন্থটি শুরু হ'য়েছে। অবধূত তাঁর পথিক সত্তাকে বজায় রেখেই অধিকাংশ উপন্যাস লিখেছেন তা অবধূতের পাঠক মত্রেরই জানা আছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি তীর্থ দর্শন করেছেন---বহু। তীর্থের নিয়মকানুন তাঁর অজানা নয়। আর হিন্দু ধর্মে আছে যে মহাপীঠ দর্শনের পরে ভৈরব দর্শন করতে হয়। কালীঘাটের কালীকে দর্শন করে দেখতে হয় ভৈরব নকুলেশ্বরকে, কামাখ্যা দর্শন করে দেখতে হয় ভৈরব উমানন্দকে। এও তেমনি। দেবী হিঙ্গুলাকে দর্শন করে দেখতে হবে ভৈরব কোটেশ্বরকে। নয় তো তীর্থ দর্শনের ফল পাওয়া যাবে না।

এই উপন্যাসে বৃদ্ধ সৌম্যদর্শন আদমজী পদমভাই নয় নম্বর পরিচ্ছেদে কথককে সময়ের উল্টো স্রোতে নিয়ে গিয়ে অতীতের ঘটনাকে দেখাতে সমর্থ হন। কীভাবে তাঁর ছেলে চুরি যায় স্টো এক রোমাঞ্চকর কাহিনির মধ্যে দিয়ে কথক জানেন। যেন প্রত্যক্ষ দেখার অনুভূতি হয়। সাধারণ মানুষ এসব কথায় বিশ্বাস করবে না। অথচ এই অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনে হয়েছিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হয় কথকের চোখের সামনে।

অবধূত অবশ্য ফলের প্রত্যাশী হ'য়ে কখনো তীর্থে যেতেন কিনা সন্দেহ। বরং তিনি তামাশা করেছেন পুরোহিততন্ত্রের অযৌক্তিক কথা-বার্তাকে। যেমন কেন ফলের আশা করতে নেই তার ব্যাখ্যায় রসিক অবধূতকে আমরা পেয়ে যাই। তাঁর মত অনেকটা এই রকম যে ফলের কথাটা বাদ দেওয়াই ভাল তার কারণ ওটা এমনই পদার্থ যা পেয়েছি বললে ঠকতে হয়, আবার কেউ যদি বলে 'পায়নি' তবে তীর্থ দেবতা রুষ্ট হতে পারেন। অতএব ফলের কথা তাঁর মতে শ্রদ্ধার সাথে মাথায় তুলে রাখা ভালো। বরাবরের মত এখানেও যেন রূপদক্ষ অবধূত সোজা কথায় আওড়ে যেতে চান সেই কথাগুলি যার লক্ষ্য পরপর ঘটে যাওয়া কাহিনির স্বরূপ আলোচনা ও প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা দান। শিল্পীর সচেতনতা বজায় রেখেই এখানে অবধূত যেন ব্যক্তি অবধূতকে চেনার মত সহাস্য মন্তব্য করেন :

> "যাঁরা হিংলাজ পড়েছেন, এই কাহিনীটি পড়বার পরে তাঁরা যদি মানেন যে এতদিনে জের মিটল,তা হলে বুঝব, ষোল আনা ফল হাতে হাতে পেলাম।"[৫৩]

আলোচ্য অধ্যায়ে অবধূতের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বিষয়ে যে স্থানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা সরাসরি সেই ১৫ পরিচ্ছেদের ২৬৭পৃষ্ঠায় দেবী আশাপূর্ণার সামনে এসে অবধূত যা বললেন এবং যা করলেন তার কিছুটা বাদ দিয়ে দীর্ঘ হলেও অবিকৃতভাবে অনবদ্য রূপময় সেই অংশটি তুলে ধরলাম :

> "যা বললেন পরমানন্দ ঠিক তাই করলাম। মনে মনে আকুল ভাবে বললাম মা দর্শন দাও। একটিবার দর্শর দাও মা, নয়তো এ জীবন রাখব না। এখানে এসেও যদি তোমার দর্শন না পাই তা হলে---তা হলে কি করব না করব বলতে হল না। আস্তে আস্তে সেই অন্ধকারে আলো দিয়ে গড়া এক মানুষী মূর্তি ফুটে উঠল। হাত চারেক সামনে শূন্যে স্থির হয়ে রইল সেই মূর্তি। মূর্তিটি আলোর তৈরী, শুভ্র জ্যোতি ছাড়া আর কিছুই নয়। পাশ থেকে পরমানন্দজী

ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতে লাগলেন---

'স্বাহা স্বধা বষট্ রূপা শুভাং পীযূষ বাদিনীম্।
অক্ষরাং বীজ-রূপাঞ্চ পালয়িত্রীম্ বিনাশিনীম্ ॥'

আমি মূক হয়ে গেলাম কি দেখছি, কি শুনছি, কিছুই তখন মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে না। ছোটখাটো এক মানবী মূর্তি, কমলালেবু রঙের আচ্ছাদনে মুখখানি ছাড়া সমস্ত দেহ আবৃত। চোখ দুটি ঘোর নীলবর্ণ অর্ধ নিমীলিত। ছোট্ট দেহটির ভেতরে যেন সাদা আলো জ্বলছে। এ কি কোনও পুতুল ! না স্রেফ দৃষ্টি বিভ্রম ! যা দেখছি, তা সত্যি দেখছি না,এইটা আঁকড়ে ধরে নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তারপর কথা। পরিষ্কার হিন্দীতে মা বললেন -এই বাচ্চা যা দেখছে তা বিশ্বাস করতে পারছে না।' পরমানন্দজী বললেন -মা, তুমি ওকে বিশ্বাস করিয়ে দাও।'[৫৪]

''তখন সেই আলোক মূর্তি থেকে একখানি আলোয় তৈরী হাত বার হল। হাতখানি ধীরে ধীরে উঠল লম্বা হয়ে। তার পর সেই মূর্তিটি ভেসে এল আরও অনেক কাছে। হাতখানি ঠেকাল আমার মাথার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘুম ভেঙে গেল আবার। সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় মনে মনে বললাম -চৈতন্যরূপিণী,চৈতন্য দান করো। অদ্ভুত মিষ্টি সুরে মা বলতে লাগলেন -তুমি আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যা কিছু দেখছ, সমস্ত আলো থেকে সৃষ্ট হয়েছে। আলোর সন্তান আমরা, আমরা জ্যোতির সন্তান। আসল তুমি ঠিক আমার মত। এখান থেকে মহাব্যোম, মহাব্যোম থেকে অনাদি অনন্ত মহাশূন্যে অবাধে বিচরণ করতে পার তুমি, যদি তুমি নিজেকে চিনতে পার। তোমার ঐ খোলসটা আসল তুমি নও। তোমার কামনা বাসনা সংস্কার দিয়ে গড়া আর এক খোলস আছে সেটাও তুমি নও। তার পর আসল তুমি -জ্যোতির সন্তান জ্যোতির্ময়। সূর্য থেকে সেই জ্যোতি সর্বত্র ছড়াচ্ছে, জ্যোতি রূপান্তরিত হয় না, জ্যোতি কখনও নিভেও যায় না। জ্যোতির স্বভাব বহু বিচিত্র রূপে প্রকাশ পাওয়া। এই-ই সৃষ্টির খেলা। নিজেকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করো। সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হবার জন্যে চেষ্টা করো। তা হলে আর শান্তি অশান্তি থাকবে না।

আর কি জিজ্ঞাসা করা যায়! তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম---মা, সেটা কি এ জীবনে সম্ভব হবে। মা অতি অপরূপ হাসি হাসলেন। জ্যোতি মিলিয়ে গেল।''[৫৫]

নয়. চিত্তেশ্বরী মন্দিরে সাধু-দর্শন : পূর্বজন্মের কথা

'নীলকণ্ঠ হিমালয়' (১৯৬৫)উপন্যাসে কথক তথা অবধূত বরানগরের এক সন্ন্যাসীর কথা বলেছেন

যিনি প্রথম যৌবনে তাঁর জীবনের ভবিতব্য তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় অবধূত পূর্ব জন্মে কী ছিলেন কেমন ছিলেন তাও বলে দিয়েছিলেন। সে সময়ে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। পরে তিনি দেখলেন সেই সাধুর প্রতিটি কথাই সত্য হয়েছে। চিৎপুর রোড শুরু হয়েছে চিত্তেশ্বরী মন্দিরের সামনে থেকে। বাগবাজার পোল পার হয়ে সেখানে নিয়ে গেলেন সুবাসীদি। এই মন্দিরে এক হাজার আটটা নরবলি দিয়েছিলেন এই মহাপুরুষের গুরুদেব। বলাবাহুল্য আমরা অবধূতের সাধন বিষয়ে মন্তব্য করবার অধিকারী নই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি যা বলেছেন দীর্ঘ হলেও তা বক্ষ্যমাণ আলোচনায় তুলে ধরব। এইসূত্রে আমরা তাঁর অনবদ্য অনুভবকে আত্মীকরণ করার সুযোগও পেয়ে যাব। তাঁর সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি এ প্রসঙ্গে আমাদের উপরি পাওনা।

তিনি দেহরক্ষা করেছেন। ইনি ঝাড়া আড়াইশ' বছর বেঁচে আছেন। ইনি শেষবারের মত গুরুদেবের আসন দর্শন করতে এসেছেন। ফিরে গিয়ে সেই মানস সরোবরে দেহরক্ষা করবেন। রাত্রি ন'টা বেজে গেছে। নিঃশব্দে ভ'রে উঠেছে ঘরের ভিতরটি। এই ঘরটি মন্দিরের পিছনে। ফুলের গন্ধে ঘরটি ভ'রে আছে। থোড়ের মত মোট এবং কোমর সমান উঁচু চারটে বাতি জ্বলছে ঘরের চার কোণে। মাঝখানে একরাশ গোলাপ। তার পিছনে বাঘছালের আসন পাতা। আসন খালি। গুরুদেব বোধহয় গঙ্গায় গেছেন। আরো আধ ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে মন্দিরের সব ক'টি ঘন্টা একসঙ্গে বেজে উঠলো। ঘন্টাগলো থামবার পরে উপস্থিত ভক্তেরা দেখতে পেলেন বা মনে হলো তাঁদের সামনে বাঘছালের ওপর কে যেন বসে আছেন। মূর্তিটা বাষ্পের তৈরী বলে মনে হল। ক্রমে ক্রমে বাষ্প জমে উঠলো যেন! কথকের ভাষায় :

> ''অবশেষে দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হল সর্ব অবয়ব, স্পষ্ট হয়ে উঠলো আস্ত মানুষটি। দাড়ি গোঁফ চুল কিছু নেই,অঙ্গেও কোন আবরণ নেই, সোজা হয়ে বসে আছেন ছোটখাটো এক বৃদ্ধ। হাঁ, বৃদ্ধই বটে, কিন্তু আড়াইশ তিনশ বছর বয়েস বলে মনে হল না। তবে যথেষ্ট বুড়ো হয়েছেন, অন্ততঃ একশ বছরের কাছাকাছি পৌঁছেছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুধে-অলতা-গোলা গায়ের রঙ, শরীরে এতটুকু মেদ নেই। কোমরটি এমন সরু যে দু হাতের চেটোয় ধরা যায়।''[৫৬]

সেদিন তিনি কথককে পরের দিন সন্ধ্যায় একটি নতুন সিল্কের রুমাল নিয়ে একলা আসতে বললেন। এর পরে যা ঘটেছিল তা অবধূত বলেছেন এইভাবে :

> ''ছত্রিশ বছর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল তা বলতে বসেছি হয়তো ভুল হচ্ছে, হয়তো কিছু ছাড় পড়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। খুঁটিনাটি সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারলে বলাটা সার্থক হত, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। প্রথম কারণ, খুঁটিনাটি সবকিছু ছত্রিশ বছর পরে মনে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কারণ, এইটেই আসল কারণ, সেদিন সন্ধ্যার সময় বরানগরের কোন্ ঘাট দিয়ে গঙ্গায় নেমেছিলাম সেই মহাপুরুষের সঙ্গে তাও খেয়াল করিনি।''[৫৭]

সে যাই হোক তাঁরা জলে নামার সাথে সাথে একটি পানসি এগিয়ে এসেছিল সামনে

কথক সেই মহাপুরুষের সাথে সেই পানসিতে উঠে পড়েন। আর একটি মানুষ ছিলেন---সেই পানসির মাঝি। তাঁরা উঠে পানসির মাঝখানে বসেছিলেন। পানসি মাঝ গঙ্গায় এগিয়ে যায়। সেখানে তাঁর পূর্ব জন্ম চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কথকের চোখের সামনে ছায়াছবির মত ঘটে গেল চোখের সামনে। সে জীবনের সমস্ত উত্তেজনা,আনন্দ, শোক,--সবই অনুভব করলেন। তারপর যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেন তখন মনে হলো যে যা দেলেন তা যে নিজেরই জীবন তারই বা কী প্রমাণ আছে? এমন কি উল্টোভাবে ভাবলেন পূর্ব জন্মের এই কাহিনির ঘটনাস্থল পাত্র-পাত্রী --সবই যদি মিলেও যায় তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে এই জন্মে সেই লোকটাই তিনি নিজে কি-না। এরপর তিনি ভুলে গেলেন। অনেকদিন পরে তাঁকে নানা গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে সেই গ্রামে এসে পড়েছিলেন খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন তাঁর সেদিনের দেখা সবকিছুই মিলে গেছে।

> "খোঁজ নিয়ে জানলাম, হ্যাঁ, ঐ গ্রামে চৌধুরী বাড়ি আছে বটে। গেলাম চৌধুরীবাড়িতে, চৌধুরীবাড়ির বড় ছেলের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখাও হল। পঞ্চাশ পার হয়েছেন তিনি, উৎকট রকম ছুঁচিবাইগ্রস্তা মানুষ, স্পষ্ট দেখতে পেলাম হাতে পায়ে হাজা ধরে গেছে। অনেক পেড়াপীড়ি করার পর নবদ্বীপের রক্তবর্ণ লোমের কাপড় পরে হাত পাঁচেক তফাতে এসে দাঁড়ালেন। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা, জল মুখে দেননি। কারণ ঠিক ভাবে শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেননি তখনও। ভয়ানক রকম বিরক্ত হয়ে প্রথমেই বলে বসলেন যে একটি পয়সা দিতে পারবেন না তিনি, আমার মত সাধু-সন্নেসী অনেক দেখেছেন, কোনও বুজরুকি তাঁর কাছে খাটবে না।"[৫৮]

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেলো শোওয়ার ঘরের আয়নার পিছনে সত্যিই পাওয়া গেল চৌধুরী বাড়ির বড় ছেলের রাখা প্রচুর গুপ্তধন। সেই টাকা দিয়ে ছুঁচিবাইগ্রস্তা মহিলাটি তাঁর মৃত স্বামীর নামে গ্রামেই একটি পাকা বাড়িতে মাতৃমঙ্গল আশ্রম করেছেন। চৌধুরীবাড়ির বড় ছেলের বিধবা বউটি এখন গুপ্তধনের হদিশ দেওয়া সাধু যে বুজরুকি দেওয়া সাধু নন তা বুঝতে পেরে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অবধূত এইভাবে অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস করতে শুরু করেন।

দশ. ভৃগুগঙ্গার শূন্যে ভাসমান সাধু

নিজে কখনো ভাবেন নি সন্ন্যাসী হবেন তবু সেই মহাত্মার ভবিষ্যৎ বাণী তাঁর জীবনে ফলে গেল। এইভাবে অবধূত যে নিজে অতীন্দ্রিয় অনুভবে সমর্থ হয়েছিলেন। ভরদ্বাজজীকে কথক বলেছিলেন :

> "আমি জানতে চাচ্ছি তাঁদের কথা। নির্জনে যাঁরা বসে তপস্যা করছেন, কোনোরকম ভড়ং নেই যাঁদের। গাছের পাতা খেয়ে যাঁরা জীবন ধারণ করেন বা কিছুই খান না। আমি এসেছি তাঁদের খোঁজ করতে।"[৫৯]

---ইনি অবধূতকে সন্ধান দিলেন এক মহতপা ঋষির। ইনি আসন পেতে আছেন ভৃগু গঙ্গার ওপারে। একজন মোট বহন করে চলেছে আর অবধূত চলেছেন ভরদ্বাজজীর প্রদর্শিত পথে। অনেকটা উৎরাই-এর পরে নামতে হলো ভৃগু গঙ্গার কূলে যখন গৌঁছলেন তখন সূর্যমাথার ওপর। ভৃগু গঙ্গায় ঘটি ডোবে না।, আঁজলা ভ'রে জল নিয়ে গায়ে মাথায় থাবড়ে তাঁরা সানান সারলেন।এক ডেলা গুড় চিবিয়ে জল পান করলেন। এরপর আবার হাঁটতে হলো বেশ খানিকটা উজানে। এ পাথর থেকে ও পাথরে লাফয়ে কখনো বা পায়ের গোছ সমান জলে নেমে। শরীর অবসন্ন, মাথা ঘুরছে পাথরের মত ভারী হ'য়ে উঠেছে পা দু'খানি। রুটির পোঁটলা নিয়ে সঙ্গের লোকটি বেশ এগিয়ে গেছে। ভরদ্বাজ আছেন কথকের কাছাকাছি। তেমন জায়গায় তিনি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সেই হাত ধরে কথক পার হ'য়ে যাচ্ছেন। ওপরের দিকে এক জায়গায় ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ভরদ্বাজ বললেন তিনি নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু আরো অতটা ওপরে উঠতে হবে জেনে পৌঁছানোর আনন্দটাও পেলেন না কথক।তাঁর যেন বুকের রক্ত হিম হ'য়ে গেল। তাঁর চোখে জল দেখে ভরদ্বাজ সিদ্ধান্ত নিলেন রাতে ওখানে একটি গুহায় থাকার। রাতে শুয়ে তিনি ভাবলেন কেন এলেন এত কষ্ট করে! মনে পড়লো: নিত্যানিত্যবস্তুবিচারাসনিত্যসংসারসমস্ত সংকল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ। পরদিন অতি ভোরে উঠে দেড় ঘন্টা উৎরাই করে যখন পৌঁছলেন দেখেন মহাত্মা নেই। বাইরে গেছেন।কথকের ভাষায় :

> ''বসে পড়লাম সেখানেই, আর সামর্থ্য নেই। সবটুকু শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ ক'রে ভোর থেকে খাড়া পাহাড় বেয়ে চার হাতে পায়ে উঠেছি। যে আশায় করেছি ঐ অসম্ভব কাণ্ড, সে আশায় ছাই পড়ল। আর কত সহ্য হয়।''[৬০]

তিনি বসে আছেন ভরদ্বাজ গেলেন গুহার ভিতরে মিনিট এক দুই পরে ফিরে এসে বললেন 'চল, দর্শন পাবে, মহাত্মা আছেন।'[৬১]আসলে সাথী লোকটি দেখতে পায়নি পাবেই বা কী করে? তিনি তো গুহার ছাদ থেকে ঝুলে আছেন। স্বভাবতই কথক প্রশ্ন করলেন : 'হেঁটমুণ্ডে শূন্যে ঝুলছেন কীভাবে? পা দুটো কি ওপরে কিছুর সঙ্গে বাঁধা আছে?' [৬২]

মিনিট পাঁচেক কেটে গেল, প্রাথমিক উত্তেজনা প্রশমিত। আবার গেলেন গুহা ভেতর একধিক লোকের জায়গা নেই সেখানে। গুহামুখ থেকে যে আলো ঢুকেছে তাতে দেখলেন ছাত অনেক উঁচুতে। পা দুখানা কোনও কিছুর সঙ্গে বাঁধা নয়। নিচে মাথাটা ঝুলছে মেঝে থেকে অন্ত ত তিন হাত ওপরে। হাত দু'খানা ঝুলছে না, বুকের ওপর মোড়া। মনে পড়লো শাস্ত্রে তিনি পড়েছেন যে 'কেবলী' [৬৩] প্রাণায়াম সিদ্ধ যোগীরা তাঁর শরীরকে শূন্যে স্থির রাখতে পারেন। সেখানে কম্বলের নীচে শুয়ে তিনি ভাবতে লাগলে কী খান এই মহাত্মা? তার উত্তর তিনি শাস্ত্রেই পেয়েছেন। 'তালুমূলগতাং যত্নাং জিহ্বয়াক্রম্র ঘণ্টিকাং। ঊর্ধ্বরন্ধ্রগতে প্রাণে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥[৬৪]

জিহ্বাকে উল্টে আলজিহ্বাটাকে চেপে আরো ভেতরে পাঠাতে পারলে প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়। প্রাণবায়ু রুদ্ধ হ'লে ক্ষুধা-তৃষ্ণা আলস্য মূর্চ্ছা কিছুই থাকে না। এসব বোঝার পরে তিনি ভাবলেন আর কোথাও নয়। এখানেই পড়ে থাকবেন যতক্ষণ না মহাত্মা আসেন। ঘুমিয়ে পড়লেন কম্বলের

নীচে। এদিকে বৃষ্টি পড়ে ভিজে গেছে কম্বল প্রচণ্ড শীত আর শ্বাসকষ্টে ঘুম ভেঙে গেল। যেন তলিয়ে যাচ্ছেন জলের তলায়। এইধরনের একটা সাংঘাতিক শ্বাসরোধী অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ কাটলো। এবার আর শীত নেই প্রচণ্ড আগুন। শরীরের ভেতর যেন আগুন জ্বলে উঠল। বাধ্য হয়ে সেই গুহার মধ্যেই আশ্রয় নিলেন। এখন কেবল অন্ধকার, বৃষ্টি, শীত তার উপর ভয়। গুহার মধ্যে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছেন। মনে হল কে যেন মাথার ওপর হাত রাখলো। তারপর শুনতে পেলেন 'লেও, খা লেও।' হাত পাতলে একটা সুপারীর মত গোল পদার্থ পেলেন। মুখের ভেতর কয়েকবার নাড়াচাড়া করতেই স্বাদটা টের পেলেন ঝাল নয়, টক নয় নোনতা নয়, মিষ্টি নয় কিন্তু একটা স্বাদ আছে। মুখের মধ্যে সেটা গলে যাচ্ছে টের পেলেন কথক। তখন অদ্ভুত একটা গন্ধ পেলেন পেটে চলে গেলেও গন্ধটা কিন্তু র'য়ে গেল। স্বাদের কোন তুলনা দিতে না পারলেও গন্ধটি সদ্য তোলা পদ্মের মত। তারপরেও বহুদিন গন্ধটা কথকের দেহের ভিতর ছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর নজর রাখলে ঐ গন্ধটা তিনি পেতেন! পরদিন ভোর বেলা আবার দেখা দিলেন তিনি। বাঁ হাত বুকে বাঁধা। ডান হাত মাথায় ছোঁয়ানো। আবার একটি ফল দিলেন। কথক খেলেন তারপর মহাত্মা বললেন 'আবার দেখা হবে, নিশ্চিন্ত হও।' কথক মনে মনে জপ করছেন 'আবার দেখা হবে, নিশ্চিন্ত হও।' অবধূত অলৌকিক কিছু দেখেছিলেন কিনা এর উত্তর বোধ হয় এটাই যে তিনি নিজেই অলৌকিক কিছু দেখলেও বিশ্বাস করতেন না। এক মহাত্মা তাঁকে বলেও ছিলেন'বাপু হে, তোমার ধাতটাই এমন যে এ পর্যন্ত যা তুমি দেখেছ শুনেছ জেনেছ তা তুমি নিজেই বিশ্বাস কর না।'[৬৫]

অবধূত বহুবার কেদারে গিয়েছেন। কেদারে গিয়ে একবার ফলহারী বাবার কাছে ছিলেন কথক ওরফে অবধূত। সেখানে তিনি দেবতাদের আরতি ধ্বনি শুনতে পান। এর পিছনে উখীমঠের এক সাধুর কৃপা ছিল। তিনি উখি মঠের তরফে কেদার নাথের পূজা করতেন। কেদারনাথের আরতি চলাকালীন কেদারনাথকে বুক দিয়ে স্পর্শ করে তিনি প্রার্থনা করেন যে যেন বেতারা যখন আরতি করেন তখন যে বাজনা বাজে সেই বাজনা যেন তিনি শুনতে পান। রুদ্রাক্ষের একটি মালাও পূজারী তাঁর গলায় পরিয়ে দেন তখন। এরপরে চতুর্থদিন হয়ে গেল তিনি সম্পূর্ণ উপবাসে। ফলহারী বাবা কিছুই খাওয়াতে পারলেন না। নিদ্রায় না জাগরণে তিনি জানেন না।

> ''কম্বল একখানা জড়ানো রয়েছে গায়ে, কম্বলের ওপর বরফ জমে উঠেছে। চুল দাড়ি সাদা হয়ে গেছে বরফে। ফলহারী বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক হাত সামনে, নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রয়েছেন আমার চোখের পানে। চোখ দিয়েই দেখছি তখন সমস্ত, যা হচ্ছে বুঝতেও পারছি। কিন্তু সেই দেখা বোঝার সঙ্গে আমার যেন কোনও সম্বন্ধ নেই। আমার মন বুদ্ধি চৈতন্য তখন আটকে গেছে অন্য যায়গায়। শুনছি, অনবরত শুনছি এক বিচিত্র বাজনা। ঝম্ ঝম্ ঝম্, এক তালে বাজছে ঘন্টা ঘড়ি মৃদঙ্গ, খুবই বিলম্বিত লয়ে বাজছে। সেই তালে নাচছে যেন কারা ঝুমুর বেঁধে পায়ে। নাচছে নিশ্চয়ই, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ঝুমুরের শব্দ, না নাচলে ঝুমুরের শব্দ উঠবে কেন?''[৬৬]

পরে তিনি জানতে পারেন যে তিন রাত তিন দিন তিনি বেহুঁশ হয়ে ছিলেন। উজ্জয়িনীতে সিদ্ধিলাভ করেন দেবীদাস। মহাকাল মন্দিরে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশভাগ---এর ফলে পাঁচের দশকে বাংলার কথাসাহিত্যিকদের অনেকেই নগরজীবন ত্যাগ করে পাহাড়- পর্বতে কিম্বা দ্বীপান্তরের বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। সাহিত্যের এই ইতিহাসগত পরিবর্তনকে মনে রেখে কোনো কোনো সমালোচক অবধূত সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেন :

> ''যেন জীবন নামক ব্যাপারটা কখনো সংসারে থাকে কখনো সংসারে থাকেই না, তখন সে থাকে শ্মশানে অথবা জঙ্গলে ! পাঁচের দশকে 'অবধূতের আজগুবি বাজার মাত এই মেজাজের ঘটনা। অপরিচিত পরিবেশ আঞ্চলিক ভাষা লেখককে পাঠকের কাছে সর্বজ্ঞ করে তোলে।''[৬৭]

তাই আমরা অবধূতের সাধু-সন্ন্যাসী প্রসঙ্গে বলতে চাই শ্রী অরবিন্দ বরদার মহারাজের সাথে কাজ করার সময় প্রতি শনিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল অবধি সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে নর্মদার তীরে ঘুরে বেড়াতেন। এ সময় তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষের দেখাও পান। সেই সন্ন্যাসীর করুণ কাহিনী আমরা সাধারণ পাঠক বিপ্লবী ও সাংবাদিক উপেন বাঁড়ুয্যের অদ্বিতীয় পুস্তক 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় জানতে পারি। এঁকে আনা হয়েছিল ঋষি অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীদের চরিত্রবল গড়ে দেবার জন্য। কিছুদিন এঁদের সঙ্গে থাকার পর ইনি প্রত্যেককে সনির্বন্ধ অনুনয়-বিনয় করেন, বিপ্লবীদের ভয়াবহ পন্থা পরিত্যাগ করতে। এরা যখন কিছুতেই সম্মত হলেন না তখন তিনি, সেই মুক্ত পুরুষ, শব্দার্থে সজল নয়নে বাগান-বাড়ি ছেড়ে চলে যান। যাবার সময় অতিশয় দুঃখের সঙ্গে যে ভবিষ্যৎবাণী করে যান সেটা আন্দামানে অক্ষরে অক্ষরে ফলে। আমরা এ ঘটনার উল্লেখ করলাম এই জন্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য সাধনা প্রয়োজন। সেটা কারো কারো পক্ষে সম্ভব হতেই পারে। এটা সবার জন্য নয় তাই বলে একে অবিশ্বাস করাটা সাধারণের জন্য ভণ্ডামো।

অবধূত বাঙালি লেখকের পরিচিত সরণীতে পড়েন না। তিনি চির পথিক। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় পথে কেটেছে। তাই আঠারো বছরের সেই পথাভিজ্ঞতা পরবর্তী গৃহবাসী জীবনের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। তিনি 'মরুতীর্থ হিংলজ', 'হিংলাজের পরে', 'নীলকণ্ঠ হিমালয়','টপ্পাঠুংরি' বা 'আমার চোখে দেখা'---ইত্যাদি উপন্যাসে সেই রাহী জীবনের কথা বলেছেন। এক জীবনে তিনি বহু জীবনের স্বাদ পেয়েছেন বক্ষমাণ গবেষণা অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সেই ব্যাপ্ত জীবনের দুর্গম যাত্রা জীবন সংশয় ঘটা, পরিত্রাণ পাওয়া এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের স্বরূপ আলোচনা করা হলো। দেখা গেল তিনি কখনো ডাকাতের হাতে পড়েছেন কখনো ভণ্ড সাধুর পবলে পড়েছেন। যশোমতী পারেখ না থাকলে বিদুর বাবার হাতে কী যে ঘটত তার কোনো ঠিক ছিল না। খরসালি সাধুবাবা না থাকলে গৌরী কুণ্ডে তিনি জমে যেতেন,বরফে ঢাকা পড়ে মারা যেতেন। ভগবানের অনুগ্রহ না পেলে প্রথমবারের ধ্বস নামা পথে কৈলাশ যাত্রায় কিম্বা যমুনোত্রীর পথে ভৈঁরো পাকে রেহাই পেতেন না। দেবীদাস বাবাজীর

মুখে আমরা তা জেনেছি। আশাপূর্ণা দেবীর সেবক ধ্রুব মহারাজ না এসে পড়লে কোটেশ্বরের পিশাচ-পাণ্ডাদের হাত থেকে রেহাই পেতেন কিনা সন্দেহ। সব মিলিয়ে দুর্গমে ও শ্মশানে অবধূত যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন ও আমাদের শুনিয়েছেন তার জন্য বাঙালি পাঠক চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য

১. অবধূত, ভ্রমণকাহিনী সমগ্র, নীলকণ্ঠ হিমালয়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,১৯৭৯ পৃ. ৩৪৮ : খরসালিতে দেখা এই সাধু বরফের উপর খালি গায়ে শুয়ে থাকতেন। এঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলে কিছু ছিল না।

২. অবধূত, ভ্রমণকাহিনী সমগ্র, নীলকণ্ঠ হিমালয়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৯ পৃ. ৩৯১

৩. অবধূত, ভ্রমণকাহিনী সমগ্র, নীলকণ্ঠ হিমালয়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৯ পৃ.৩৯১

৪. অবধূত,'মরুতীর্থ হিংলাজ' মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৫৪, উপন্যাসে একটি চরিত্র কুন্তী মোহান্তকে বলেছিল তার বাবাকে বলে একটি আশ্রম জুনাগড়ে অথবা বৃন্দাবনে তৈরী করে নেবে। সেখানেই কুন্তী থাকবে।

৫. অবধূত, ভ্রমণকাহিনী সমগ্র, নীলকণ্ঠ হিমালয়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৯ পৃ. ৪৫৪

৬. উজ্জয়িনীতে দত্তাত্রেয় মঠের মহামণ্ডলেশ্বর ছিলেন পূর্ণাবধূত পরমহংস স্বামী দেবীদাস মহারাজ। ব্রহ্মাবধূত দেবীদাস হরদম ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সাথে অবধূতের আগে তিনবার দেখা হয়েছে। প্রথমবার কামাখ্যায় দ্বিতীয়বার গোপেশ্বরে, তৃতীয়বার বাংলাদেশের তারাপীঠে। এরপরে অবধূতের দ্বিতীয়বার কেদার যাওয়ার পথে দেখা হলো। এই সময় সর্বজ্ঞ এই ঋষি তাঁর অতীতের কেদার পৌঁছানোর আসল ব্যাখ্যাটা দেন। ইনিই অবধূতকে অবাক করে তাঁর স্বর্গীয় নাদ শোনার কাহিনি ও স্বরূপ ব্যাখ্য করেন।

৭. অবধূত, ভ্রমণকাহিনী সমগ্র, নীলকণ্ঠ হিমালয়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৯ পৃ. ৪৫৬

৮. ঐ, পৃ. ৪৫৬

৯. প্রসাদ পত্রিকায় (এপ্রিল,২০০৯) 'সত্যের খোঁজে' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্টের ৪৬৯ পৃষ্ঠার আলোকচিত্র। চিত্র নং ৭,'ফটোকপিটি' চুঁচুড়ার পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন-র প্রপৌত্র সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১০. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রচণ্ডীমঠের ভৈরব, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১০

১১. ঐ, পৃ. ২২
১২. ঐ, পৃ. ২৪-২৫
১৩. ঐ, পৃ. ২৬-২৭
১৪. ঐ, পৃ. ২৭
১৫. ঐ, পৃ. ২৮
১৬. ঐ, পৃ. ২৯
১৭. অবধূতের জোড়াঘাটের বাড়িতে একটি বিপরীত রতিমগ্না কালী মূর্তি বা রুদ্রচণ্ডীর আসন আছে। পরিশিষ্টের আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য। চিত্র নং ৮, প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় অবধূতকে 'রুদ্রচণ্ডীর ভৈরব' বলে উল্লেখ করেছেন।
১৮. অবধূত, ভ্রমণকাহিনী সমগ্র, নীলকণ্ঠ হিমালয়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৯ পৃ. ৪৬৩
১৯. ঐ, পৃ. ৪৭২
২০. ঐ, পৃ. ৪৭৪
২১. ঐ, পৃ. ৪৭৫
২২. ঐ, পৃ. ৪৭৯-৮০
২৩. অবধূত, দুর্গমপন্থা, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৬০
২৪. ঐ, পৃ. ৮০
২৫. ঐ, পৃ. ১
২৬. ঐ, পৃ. ২
২৭. ঐ, পৃ. ৩
২৮. ঐ, পৃ. ৩
২৯. ঐ, পৃ. ৪
৩০. ঐ, পৃ. ৫
৩১. ঐ, পৃ. ৬
৩২. ঐ, পৃ. ৬
৩৩. ঐ, পৃ. ১১
৩৪. ঐ, পৃ. ১৬
৩৫. অবধূত, ভ্রমণকাহিনী সমগ্র, নীলকণ্ঠ হিমালয়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৯ পৃ. ৪১৯
৩৬. ঐ, পৃ. ৪২১
৩৭. ঐ, পৃ. ৪২৬
৩৮. অবধূত, দুর্গমপন্থা, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৯
৩৯. ঐ, পৃ. ২৫

৪০. ঐ, পৃ. ২৪
৪১. ঐ, পৃ. ২৫
৪২. ঐ, পৃ. ৫৪
৪৩. ঐ, পৃ. ৬১
৪৪. ঐ, পৃ. ৬১
৪৫. ঐ, পৃ. ৬৫
৪৬. ঐ, পৃ. ৬৬
৪৭. ঐ, পৃ. ৭১
৪৮. ঐ, পৃ. ৭২
৪৯. ঐ, পৃ. ৭৯
৫০. ঐ, পৃ. ৭৯
৫১. ঐ, পৃ. ৭৯
৫২. অবধূত, দুর্গমপন্থা, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৮০
৫৩. অবধূত, হিংলাজের পরে, অবধূত ভ্রমণ অমনিবাস মিত্র ও ঘোষ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৬ পৃ. ১৮৫
৫৪. ঐ, পৃ. ১৮৬
৫৫. ঐ, পৃ. ১৮৭
৫৬. অবধূত, নীলকণ্ঠ হিমালয়, ভ্রমণকাহিনী সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৯ পৃ.৩৪৮
৫৭. ঐ, পৃ. ৩৪৯
৫৮. ঐ, পৃ. ৩৫০
৫৯. ঐ, পৃ. ৩৭৬
৬০. ঐ, পৃ. ৩৭৯
৬১. ঐ, পৃ. ৩৭৯
৬২. ঐ, পৃ. ৩৭৯
৬৩. অবধূত, নীলকণ্ঠ হিমালয়, ভ্রমণকাহিনী সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭৯,পৃ-৩৮০ কেবলী প্রাণায়াম : আটপ্রকার প্রাণায়াম যেমন সহিত, সূর্যদেব, উজ্জায়ী, শীতলী, তন্ত্রিকা, ভ্রামরী,মূর্ছা এবং কেবলী।
৬৪. অবধূত, নীলকণ্ঠ হিমালয়, ভ্রমণকাহিনী সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃ. ৩৮১
৬৫. অবধূত, নীলকণ্ঠ হিমালয়, ভ্রমণকাহিনী সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃ. ৪৫৪
৬৬. ঐ, পৃ. ৪৬০
৬৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৮৩

সপ্তম অধ্যায়

ফলকথা : একালে দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যচর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার

পৃষ্ঠা

এক. 'মরুতীর্থ হিংলাজ' : আজকের প্রেক্ষিতে	৪১৮
দুই. 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' : ন্যায়ের দণ্ড	৪২০
তিন. 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' : আত্মচেতনার বিকাশ	৪২২
চার. 'টপ্পাঠুংরি': পারিবারিক জীবনের সতর্কতা ও উত্তরণ	৪২৪
পাঁচ. 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী': আধুনিক জীবনের বার্তা	৪২৫
ছয়. প্রসঙ্গ : প্রেম---কৃষ্ণা ও করুণাকেতন	৪২৬
সাত. 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী': সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসক	৪২৮
আট. আজকের যুবগোষ্ঠী ও অবধূতের সাহিত্যাদর্শ	৪৩২
নয়. 'কৌশিকী কানাড়া' : পঞ্চম বাহিনী---বিশ্বাসঘাতক দেশবাসী	৪৩৪
দশ. 'ভোরের গোধূলি' : ধর্মচপ্রাণ মানুষের স্বার্থপরতা	৪৩৫
এগারো. দারিদ্র্য ও দেশভাগের অসহায়তাঃ অবলম্বন 'পিয়ারী'	৪৩৭
বারো. বিশুদ্ধ হাসির ক্ষমতায় 'পথভুলে'	৪৪১
তেরো. কথাসাহিত্যে সমাজ-সমস্যা : অবলম্বন অবধূতের উপন্যাস ও গল্প	৪৪৯

স প্ত ম অ ধ্যা য়

ফলকথা : একালে দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য চর্চার প্রাসঙ্গিকতা বিচার

ভূমিকা

"অবধূতের শক্তি সম্বন্ধে কাহারও কোনো সংশয় নাই, যাহা-কিছু সংশয় তাহা শক্তির প্রয়োগরীতি ও বিষয় নির্বাচন-সম্বন্ধীয়।...তাঁহার পথ নির্বাচনের উপরেই উপন্যাস-জগতে তাঁহার স্থান শেষ পর্যন্ত নির্ভর করিবে।"[১] অবধূতের রচনার এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনি অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভট বিষয় নিয়ে এবং ধর্মজীবনের নানা অসঙ্গতি নিয়ে কথাসাহিত্যের আসরে উপস্থিত হয়েছেন। কোথাও যেন কৌতুক হাসির দমকা হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন। আর যেখানে সিরিয়াস হয়েছেন সেখানে বীভৎস রস এসে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বিপর্যস্ত করেছে। তবে সমালোচক যদি 'নীলকণ্ঠ হিমালয়', 'শুভায়ভবতু','মায়ামাধুরী'-প্রভৃতির মত উপন্যাস এবং 'বহুব্রীহি'-র মত ছোট গল্প সঙ্কলন যদি হাতে পেতেন তবে অবধূতের প্রতিষ্ঠার কারণটিও তাঁর কলমে লিখে যেতে পারতেন। পাঠকেরা যাঁরা সমালোচনা গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে লেখকের বিচার করেন তাঁদের কাছে তো সম্পূর্ণ মূল্যায়ন আশা করা বৃথা! তাই উত্তরোত্তর গবেষণার মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে সৃষ্টি ও স্রষ্টার নতুনভাবে মূল্যায়ন হয়ে থাকে। তাই অবধূত-রচনা সম্পর্কে এককথায় 'অবধৌতিক'কার্যকলাপ কিম্বা 'উদ্ভট কাঁটাগাছে' পূর্ণ বলা যাবে কিনা আলোচনা সাপেক্ষ। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভে সেই কাজটি করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

'শুভায় ভবতু' (১৯৫৭)উপন্যাসে লেখক পাঠকের সদুপদেশকে মনে রেখেছিলেন বলে বোধহয় নিষ্কাম প্রেমের নানা গল্প বা 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫)---এর মত জীবনোপলব্ধির সাথে ধর্মবোধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের সপ্তম তথা শেষ অধ্যায়ে আমরা অবধূতের সাহিত্য কীভাবে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার ক'রে গড়ে উঠেছে তার অনুসন্ধান করবো। সেই সঙ্গে আমরা এটিও দেখতে আগ্রহী যে অবধূতের সাহিত্য সামাজিক দায়বদ্ধতাকে মেনে নিয়েও শৈল্পিক চেতনাকে বজায় রাখতে পেরেছে কি-না। কথাসাহিত্যে যদি সামাজিক বা নৈতিক সচেতনতা শিল্পগুণকে

ক্ষুণ্ন করে তবে তা দোষাবহ। 'ফলকথা'-য় আমরা বিশ্লেষণ ক'রে দেখাবো নীতিসচেতনতার জন্য লেখক অবধূত তাঁর রচিত সাহিত্যের স্বাভাবিক পরিণতির পক্ষে অন্তরায় হ'য়ে উঠেছেন কি-না। অর্থাৎ সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে সমাজ মঙ্গল হ'তেই পারে কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য একমাত্র সমাজ-মঙ্গল নয়। সমাজশিক্ষা সাহিত্যিকের একমাত্র দায়িত্ব তো নয়ই এনমনকি প্রধান দায়িত্ব হলেও বিপদ। সাহিত্যিকের প্রধান দায়িত্ব তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা। বক্ষ্যমাণ গবেষণা অভিসন্দর্ভের পূর্ববর্তী অধ্যায় ছ'টিতে আমরা দেখেছি অবধূত সার্থকতার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সে কাজটি করেছেন। আমরা এখন একালের পাঠক কীভাবে ব্যক্তি জীবনে অবধূতের সাহিত্যকে প্রাসঙ্গিক ভেবে থাকি বা ভাবতে পারি তার পরিচয় অবধূতের কথাসাহিত্যের প্রাসঙ্গিক অংশ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। এই বিশ্লেষণ সূত্রে আমরা দেখিয়েছি যেনীতিজ্ঞান, সমাজসংস্কার,দুর্জন-সতর্কতা---ইত্যাদি উদ্দেশ্যমূলকতা অবধূতের উপন্যাস বা গল্পের মধ্যে কোনোভাবে প্রশ্রয় পায়নি। একটা সীমা পর্যন্ত সাহিত্য, লেখকের উদ্দেশ্যকে স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকতা সীমাতিক্রমী হ'লে অবশ্যই তা ত্রুটি ব'লে গণ্য হবে। অবধূতের সাহিত্য সেই ত্রুটি মুক্ত। জন্মশতবর্ষে বারিদবরণ ঘোষের সম্পাদিত 'অবধূত শতবার্ষিকী সংকলন ' সেকথাই মনে করায়।

অবধূত ব্যতিক্রমী লেখক। বাঙালি কাহিনিকারদের মধ্যে যাঁরা অধিকাংশ সময়ই একটি গৃহকোণে নৈমিত্তিক কাজের জীবন কাটান আর অবসর মত লেখেন অবধূত তাঁদের দলে নন। তিনি তেমনভাবে মানসিক নন যেমন ভাবে চাক্ষিক! এই চক্ষুষ্মানতার সাথে চলমানতা যুক্ত। সত্তায় তিনি চির পথিক। জীবনের প্রায় আঠারোটা বছর তিনি ভ্রাম্যমাণ থেকেছেন। তাঁর উপন্যাস ও গল্প তাই থেমে থাকেনি। তাঁর কথাসাহিত্যে চরিত্র-বৈচিত্র্যও বিপুল। অবধূতের জীবনের ঘটনা আর তাঁর রচনা প্রায় সমার্থক। তাঁর কথাসাহিত্য তাই বর্ণনাধর্মী। একটি বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ তিনি আটকে থাকেন না। তাঁর গল্প উপন্যাসের নায়ক -নায়িকারা বড়ই চলমান। চেনা ঘরের কাহিনিকে ইনিয়ে বিনিয়ে পুনরায় গড়ে তোলা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। নামবদল (ক্রীম, ক্রীম-ক্র্যাকার),বাসাবদল(পথে যেতে যেতে,ক্রীম-ক্রাকার), পেশাগত কারণে বিভিন্ন স্থানে যাওয়া(পথভুলে,দেবারীগণ), রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধতার কারণে পালিয়ে বেড়ানো(দুরি বৌদি, বশীকরণ,কৌশিকী কানাড়া, সপ্তস্বরা পিনাকিনী প্রভৃতি) ইত্যাদি বিষয় তাঁর সাহিত্যে যুক্ত হয়েছে বার বার। সামনে এগিয়ে চলার কারণে তাঁর সাহিত্যের অবলম্বিত বিষয় ও চরিত্রকেন্দ্রিকবিশ্লেষণ-নির্ভরতা কম। বিশ্লেষণ-প্রবণতা কমে গেলেও তাঁর রচনার আকর্ষণ কিন্তু কম হয় না।আমরা অবধূতের রচনায় লক্ষ করেছি যে তিনি তাঁর রচনার কোথাও ভাষণ কিম্বা পরামর্শ দিতে চাননি;বরং সত্যদ্রষ্টার আসনে নিজেকে বসিয়ে জগৎ, জীবন ও চরিত্রকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়েছেন

কথাসাহিত্যে প্রধানত কাহিনির মাধ্যমে স্রষ্টার বক্তব্য বা উদ্দেশ্যমূলক বার্তা (Message) প্রকাশ পায়। এছাড়া চরিত্রের সংলাপে বা কথকের বিবৃতিতে সৃষ্ট উপন্যাস বা গল্প জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। অবধূতের রচনাও একইভাবে বিচার্য। প্রাথমিক ভাবে বলা যায় এ যুগে অবধূত অধিকতর প্রাসঙ্গিক---তার কারণ মনে হয় বিশ্বায়ন। এ যুগ তাই তান্ত্রিক যোগী অবধূতকে স্বাভাবিক জীবনের রূপকার বলে গ্রহণ করতে পারে। রবীন্দ্র-যুগের অবসানের জন্য যেমন

কল্লোলযুগ কাজ করেছিল তেমনি আজকের মিডিয়াও গণ্ডীবদ্ধ বাঙালির নিস্তরঙ্গ সাধারণ জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাও এখন আর চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নন। এখন মানুষ পৃথিবীর নানা সমাজের মানুষকে দেখছেন-নানা ঘটনার সাক্ষী হ'য়ে থাকছেন। এরজন্য পথে নামার প্রয়োজন হচ্ছে না। সোস্যাল মিডিয়ার যুগে গ্রাম-বাংলার সমাজ ছাড়িয়ে মানুষ আজ জটিলতর দুনিয়াকে মুঠোভাষে কিম্বা মুভিতে দেখে নিতে পারছেন। অন্যদিকে অনিবার্যভাবে যদিও এখন বই পড়ার ক্ষেত্রে ভাঁটার টান, তবু যাঁরা বই পড়েন তাঁরা বুঝবেন সেকালে অবধূত বিকৃত মানসিকতার মানুষদের কথা যা বলেছেন সমাজে তা ঘটমান সত্য। এখন মানুষ সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতে ধর্মধ্বজীদের ও পঞ্চশোর্ধ্ব মানুষের বিকারগ্রস্ততা---সবকিছুকেই জানতে পারছেন। নষ্ট জীবনের আলোচনায় তাই এখন মানুষের শূচিবায়ুতা অনেক কমে গেছে। অপরাধপ্রবণতার প্রতি অবধূতের রচনা মানুষকে যেভাবে সতর্ক করেছে আজকের দিনে সেটি আরো বিস্তৃত আকারে সম্ভব হচ্ছে নানা ক্রাইম চ্যানেলের মাধ্যমে। সে-সব দেখতে দেখতে মানুষ অসামাজিক বিষয়কে দেখতে ও বিচার করতে অভ্যস্থ হয়ে যাচ্ছেন। সেদিক থেকে অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায় এখন আর অশ্লীলতার অভিযোগে বিনা বিচারে ব্রাত্য নন। গৃহমুখী বাঙালিরা অবধূতের লেখার বিরুদ্ধে আগে যে আঙুল তুলতেন, অশ্লীলতার কথা বলতেন এখন আর সেই শূচিবায়ুগ্রস্ততার কারণ নেই। পাঠক এখন অনভিজ্ঞ নন। জনতাকে সচেতন করার ক্ষেত্রে মিডিয়ার প্রভাব এখন প্রবল। তবে মিডিয়া এবং গ্রন্থের মধ্যে তুল্যমূল্য বিচারে শিক্ষিত মানুষ বরাবর গ্রন্থের প্রতি বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। একটি ভিডিও কিম্বা ফিল্মের মধ্যে মানুষ যেভাবে নিজেকে সংযুক্ত করে গ্রন্থপাঠে তার চাইতে অনেক বেশি তাকে মনোযোগী ও পরিশ্রমী হতে হয়। পরিশ্রমের কারণেই বইয়ের থেকে যা অর্জন করেন মানুষ তার প্রতি নির্ভরতা থাকে অনেক বেশি। অবধূত রচিত কথাসাহিত্যকে তাই আমাদের নতুনভাবে জানা দরকার এবং যাঁরা পড়েননি তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। 'দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা'[২]-য় অবধূত সম্পর্কে যে লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো তাতে আমাদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

সমাজের বাস্তব রূপকে চিনতে পারলেই তবে সমাজে সুস্থভাবে বাঁচা সম্ভব। কথাসাহিত্যে অবধূত এই কাজটি করেছেন বার বার। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, প্রেম, প্রতারণা, পতিতাবৃত্তি, ম্যাজিক, ভণ্ডামো, সাধুগিরি, অলৌকিকতা---সবক্ষেত্রেই অবধূত স্বচ্ছন্দ। অবধূত তাঁর লেখনির সাহায্যে সাধারণ মানুষকে সাবধান করেছেন বার বার। শুধু এই ধরনের নেতিবাচক দিকে মানুষকে সচেতন করেছেন তাই নয় সেই সঙ্গে উৎসাহ দিয়েছেন সাধুতা, সহমর্মিতা, পবিত্রতা, আত্মসংশোধন, ইত্যাদি ইতিবাচক [৩] দিকেও। সমাজ -হিতৈষণা লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। অনেকে বলেন উদ্দেশ্যমূলকতা শিল্পের শত্রু। অবধূতের সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে রসবিচারের দৃষ্টিতে বলা যায় উপন্যাস বা ছোটগল্প রচনাকালে অবধূত স্বীয় আবেগকে সংযত করে যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস যুক্তি আর স্পষ্টতাকে আশ্রয় করে স্রষ্টার বক্তব্য পরিবেশনে সফল হয়েছে। তিনি সমাজ-সচেতন লেখক। ভাবলোকের বিষয়

নয় বাস্তব প্রয়োজনকে শিল্পরূপ দান করার সহজ দক্ষতায় অবধূত তুলনাহীন। লেখক মাত্রই জানেন যে সাহিত্যের প্রাথমিক কাজ শৈল্পিক সার্থকতা ফুটিয়ে তোলা। দক্ষ লেখক শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো-প্রয়োজনের সাথে আপোষ করেন না। অবধূতও করেননি; তাই তাঁর কথাসাহিত্য অবশ্যই শিল্পের বিচারে সফল। এই সফলতা এসেছে চরিত্র ও কাহিনি---দু-দিক থেকেই।

আজকের সমাজজীবনে অবধূতের সাহিত্য-চর্চার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলতে চাই অবধূত অন্যদের চাইতে আরো একধাপ এগিয়ে গেছেন। সাহিত্য রস সৃষ্টির সাথে সাথে সমাজ জীবনে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় সতর্কতাও তাঁর রচিত কথাসাহিত্যের মধ্যে যুক্ত করতে পেরেছেন। এই প্রয়োজনটা সমাজ-মৃগয়ায় শিকার হওয়া সহজ-সরল মানুষের। রাজনীতি, প্রতারণা, নানাবিধ পীড়নের শিকার এই সাধারণ মানুষ। সাধারণ ঘরের বাবা-মা যদি সমাজ-সচেতন না হন তাহলে কেমন করে তাঁদের সন্তানদের রক্ষা করবেন? অবধূতের 'টপ্পাঠুংরি','শুভায় ভবতু','বশীকরণ','সাচ্চা দরবার','বহুব্রীহি','নীলকণ্ঠ হিমালয়' ইত্যাদি রচনা বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাচ্ছে নির্বুদ্ধিতার কারণে মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষরা নির্মম যন্ত্রণার শিকার হন। কারো সংসার নষ্ট হচ্ছে কামনার চোরা গলিতে পড়ে, আবার কেউবা প্রতারিত হচ্ছেন সমাজ ও রাজনীতির জটিলতায় পড়ে। অবধূত তাঁর রচিত কথাসাহিত্যে সে-সবের পরিচয় রেখেছেন। বাবা-মায়ের বা অভিভাবকের সহজ-সরল বিশ্বাস কীভাবে বাইরের কদাকার মানুষকে তাদের লালসা-চরিতার্থতার সুযোগ করে দেয় তার দৃষ্টান্ত অবধূতের লেখার মধ্যে আছে। 'টপ্পাঠুংরি'-র মত উপন্যাস বা 'ইজ্জত'-এর মত ছোটগল্প এর বাস্তব দৃষ্টান্ত।

স্রষ্টব্যক্তি নিজের অভিজ্ঞতা-অনুভবকে সাহিত্যে প্রকাশ করেন। সাধারণ অনুভব-নির্ভর কাব্য জগতে দেখা গেছে কবির অন্তরে গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হলে সে বাইরে রূপ লাভ করতে চায়। তখন কবি অন্তরের সেই রূপকে বাইরে প্রকাশের জন্য তীব্রভাবে আকুল হয়ে ওঠেন। সাধারণ পাঠকেরা পড়ুন বা না পড়ুন সে-বিষয়ে লেখকের ভ্রূক্ষেপ থাকে না। সৃষ্টি-স্বপ্নে বুঁদ হওয়া মনের সৃষ্ট সে ঐশী সাহিত্য প্রয়োজন-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সৃষ্টি। সকল যুগেই সেই প্রয়োজন-নিরপেক্ষ সাহিত্য বিদগ্ধ সমালোচক মণ্ডলীর কাছে মান্যতা পায়---কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনাই এ জাতীয় সৃষ্টির বাধা হতে পারে না। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঐশী প্রেরণা সাধারণত থাকে না। তাই কথাসাহিত্য শিল্প সফল কি-না তা অবশ্যই ভেবে দেখা প্রয়োজন। আদর্শ-প্রচার বা উদ্দেশ্য-মূলকতা যদি কোনো কথাসাহিত্যে প্রবলরূপে আত্মঘোষণা করে তবে তো সে সৃষ্টি ব্যর্থ। ধরে নিতে হবে অঙ্কুরেই তার বিনাশ হয়েছে। আমরা দেখেছি অবধূত সে পরীক্ষায় সর্বত্রই কৃতিত্বের সাথে উৎরে গেছেন। তাঁর উপন্যাসে বা গল্পে চরিত্র যেমন কাহিনির অনিবার্য ফল তেমনি সে-সব চরিত্র আবার পরিবেশ-সফলও। খাপছাড়া সৃষ্টি যদি বাস্তবে থাকেও তবু সাহিত্যে তা গ্রহণীয় নয়। অবধূত তা জানতেন---তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্যে চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা সেই সচেতন সতর্কতার প্রমাণ পেয়েছি। লেখক হিসেবে অবধূত দক্ষ। তিনি অধিকতর সফল এই জন্য যে সাহিত্যমূল্য যেমন তাঁর রচনায় যুক্ত করতে পেরেছেন তেমনি সেই সাথে সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয় সতর্কতাও তাঁর রচনায় আছে। সমাজবদ্ধ

জীব হিসেবে সেটা পাঠকের কাছে উপরি লাভ। আজকের কঠিন-বাস্তবতার ব্যস্ত যুগে বিপন্ন পাঠকের কাছে তা অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য।

বক্ষ্যমাণ গবেষণা অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে আমরা সাধক ও পরিব্রাজক দুলাল মুখোপাধ্যায় তথা অবধূতকে সমাজ-অভিজ্ঞ রূপে যেভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছি আমরা 'ফলকথা'-য় তা ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার প্রয়াস করেছি। কথাসাহিত্যের বিচিত্র জগতে জীবনের নানা সমস্যার কথা অবধূত আমাদের জানিয়েছেন । আমরা জীবনের নানা প্রসঙ্গ তাঁর রচনার মধ্যে পেয়েছি। তাঁর রচনায় গুরুত্বপূর্ণ নানা প্রসঙ্গের মধ্যে আমরা স্মরণ করতে পারি জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত এই বিষয়গুলি যেমন: দেশভ্রমণ, সাধু-সঙ্গ, দেশপ্রেম, গুণ্ডাবাজি, পতিতাবৃত্তি, নারী মনস্তত্ত্ব,শিশু-মনস্তত্ত্ব, সমাজবীক্ষা, প্রেম, চৌর্যবৃত্তি, ভণ্ডামো, ভ্রূণ-হত্যা,আধ্যাত্মিকতা, অলৌকিকতা, ঘুষ নেওয়া---প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

অবধূত যেসব ভ্রমণসাহিত্য রচনা করেছেন---তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। তার কোনোটাই কল্পলোকের বা সহজ-পথের প্রাপ্তি নয়। সফল হতে গেলে কষ্টসহিষ্ণু হতে হয়---পাঠক তা পদে পদে অনুভব করেন। 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'-এর দুর্গম যমুনোত্রী,ভৃগুগঙ্গা,কৈলাস,কেদার---সর্বত্রই চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে দস্যুভয়, ধ্বসে চাপা পড়ার ভয়, বরফে ঢেকে মৃত্যু-সম্ভাবনা---এসব কিছুকে অতিক্রম করেই এসেছে লেখকের হিমালয়-দর্শনের বিরলতম অভিজ্ঞতা। চিমটা-সম্বল সন্ন্যাসীর নগ্নগাত্রে বরফের ওপর রাত কাটানোর ছবি যেমন তিনি দেখিয়েছেন তেমনি তান্ত্রিকের হাতে পড়ে মৃত্যু-সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে মন্ত্রতন্ত্র নয় হৃদয়ের ভক্তি আর কর্মফলই যে সব তা তিনি বলেছেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে অনাচারে বিরক্ত হ'য়ে অবধূত 'হিংলাজের পরে' (১৯৬২) উপন্যাসে বাইরে মন্দির প্রতিষ্ঠার চাইতে অন্তরে দেবতার প্রতিষ্ঠা যে অধিকতর কাম্য, তা বলেছেন। অবধূতের প্রতিটি রচনার মধ্যে যুক্তির প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামো নয় মানুষের মনুষ্যত্বই তাঁর কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

'মরুতীর্থ হিংলাজ' (১৯৫৪)উপন্যাসে মানব সেবার মধ্যেই যে ধর্ম তা অবধূত দেখিয়েছেন। মোহান্ত, ভৈরবী, গুলমহম্মদ, দিলমহম্মদ,কুন্তী প্রমুখ---এর দৃষ্টান্ত। জাত-পাতের ভেদ নয় মানবিকতা যে-কোনো ধর্মের লোকের মধ্যেই থাকতে পারে---নির্লোভ সেবাপরায়ণ মানুষ গুলমহম্মদ আর দিলমহম্মদকে দেখে তা বোঝা যায়।

'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫) উপন্যাসে পথের দুর্গমতা,আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, মহাত্মাদের সঙ্গ-লাভ, সেবার আদর্শ ইত্যাদি আমরা পেতে পারি।

'উদ্ধারণ পুরের ঘাট'(১৯৫৬) উপন্যাসে জীবনের নশ্বরতা আর ন্যায়ের বিধান সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সিঙ্গী মশায়ের শাস্তি, আগমবাগীশের দুর্ভোগ আমাদের শিক্ষা দেয়।জীবন্মৃত হ'য়ে পচা-গলা শরীরে বিছানায় পড়ে থেকে গর্ভবতী নারী-হত্যার শাস্তি পেয়েছেন সিঙ্গী মশায়, কামলোলুপ ধর্মধ্বজী আগমবাগীশের দুর্ভোগ ও কলঙ্কজনক অসহায় মৃত্যু 'পোয়েটিক জাস্টিস" হিসেবে নেমে এসেছে।

'টপ্পাঠুংরি' (১৯৬৯)তে পঞ্চাশোর্ধ্ব পাতানো মামা বদন বাগচীর লালসার শিকার হয়ে কীভাবে একটি শিক্ষিতা চাকুরিরতা মেয়ে ঝুনু হতাশায় আত্মহত্যা করতে পারে তার সম্পর্কে সচেতন করেছেন লেখক। এখানে প্রকৃতির প্রতিশোধকে ছাড়িয়ে গিয়ে এক নারীর হাতে বদন

বাগচীর মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে।

'দুর্গমপন্থা'(১৯৬০)-য় দেখা গেছে মনের জোরে কীভাবে একজন মানুষ নিজে খোঁড়া হয়েও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেন। অয়স্কান্তের বোন-ভগ্নীপতির সাথে মগ-যাত্রীরা যে দুর্ব্যবহার করেছিল তার প্রতিবাদে লেখক তা দেখিয়েছেন।

'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' (প্রকাশকাল অজ্ঞাত)তে অভিভাবকের দায়িত্ব, লালসা-পরায়ণতার নিয়ন্ত্রণ,সেবার আদর্শ, নৈতিকতা, ভাগ্যের হাতে অসহায়তা---ইত্যাদি বিষয়ে আমরা জানতে পারি। এই উপন্যাসে সামাজিক নানা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছেন অবধূত। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা যেকোনো সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দুটি বিষয়। সরকারি লোকেদের হাতে সে দুটি কেমনভাবে নষ্ট হয়ে চলেছে তার পরিচয় অল্প কথায় দিয়েছেন অবধূত।

'পিয়ারী'(১৯৬১)- তে বাইরের বিশুদ্ধতার অন্তরালে একজন মানুষ চতুর্ভুজ ত্রিবেদী যে কীভাবে বিকৃত মানসিকতার শিকার হন তা দেখানো হয়েছে। অবধূত জীবনের নানা রূপকে একজন সত্যিকার ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব মেনেই রূপ দিয়েছেন।

'সাচ্চা দরবার' (১৯৬০)-এ সন্ন্যাস ধর্ম কীভাবে স্বদেশ ও মানবসেবার মধ্যে সার্থকতা পায় তার শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন অবধূত। তারকেশ্বরের সেবাইতদের মধ্যেই বিপ্লবী কার্যকলাপে স্বদেশসেবার প্রমাণ রেখেছেন অবধূত।

'পথে যেতে যেতে'(১৯৭৬) উপন্যাসে পিতৃসত্তার স্বরূপ কীভাবে একজন তেজস্বী পুরুষকে সন্তান-বাৎসল্যে আমূল বদলে দিতে পারে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

'ভোরের গোধূলি'(১৯৬৯) উপন্যাসে বোমাতঙ্ক কীভাবে একটি মেয়ের মনকে অসাড় করে দিতে পারে এবং কীভাবে গোটা পরিবার-জীবনের ধারাকে পাল্টে দিতে পারে তা আমরা জেনেছি।

'দেবারীগণ'(১৯৬৯) উপন্যাসে ঘুষ নেওয়া বা অপরাধ প্রবণতার শাস্তি দেওয়ার অধিকার যদি মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তার বিষময় ফল কী হতে পারে তা আমরা দেখেছি। এখন আমরা পূর্ব অধ্যায়গুলিতে অবধূতের বিভিন্ন আলোচিত গল্প ও উপন্যাসের বিষয় ও চরিত্র এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করে অবধূতের গ্রন্থ পাঠের প্রাসঙ্গিকতা নির্ণয়ে অগ্রসর হবো।

এক. 'মরুতীর্থ হিংলাজ' : আজকের প্রেক্ষিতে

'There is nothing good or bad, but thinking makes it so.'---William Shakespeare -র এই মন্তব্যটি অবধূতের সাহিত্য প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপন্যাসের মধ্যে যাত্রীরা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারছে মরুপথে কত রকমের বিপদের সম্ভাবনা। এর মধ্যে থিরুমল উন্মাদ হয়ে গেছে। সে হারিয়ে গেছে মরু-সমুদ্রে। শেরদিলের কূয়োর কাছে সে যে কোথায় পালালো তার কোনো হদিশ মিললো না---নিরুপায় সবাই ভারাক্রান্ত হ'য়েই এগিয়ে চললো। কুন্তীও ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে। এখন সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় সে মনে করে তার নির্দয়তার জন্য থিরুমল পাগল হয়ে গেছে। তার অবহেলা সে মেনে নিতে

পারেনি। পাপবোধে বিদ্ধা কুন্তী। নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সে সময় সে তীর্থযাত্রীদের কাছে ভিক্ষা করে খাচ্ছে। ভৈরবীর কাছেও রাতে শোয়নি---নিজেকে স্নেহ-মায়া-মমতার থেকে দূরে রেখে প্রায়শ্চিত্য করতে চেয়েছে। কাঙালির মত দূরে গাছ তলায় আঁচল পেতে শুয়েছে। বুড়ো গুলমহম্মদের কথাতেও উঠলো না। সবাই খুবই মর্মাহত। এ রাত্রে সবাই যে ঘুমিয়েছে এমন নয়--সবারই মন বিষণ্ন। এসময় স্বাভাবিক ভাবে কথক অবধূত মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। বিরলে তিনি শুয়ে আছেন। সবাই ভাবছে থিরুমলের হারিয়ে যাওয়া আর পথের কষ্টটা সইতে মোহান্তের সময় লাগবে। সেই রাতে অর্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনি শুনতে পেলেন---কারা যেন চাপা ফিসফাস তর্জন গর্জন করছে। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন এরা তাঁরই সঙ্গের যাত্রী। কারো কারো কথাও শুনতে পারলেন। তারা সতর্ক যাতে মোহান্তের ঘুম না ভাঙে তাই নিঃশব্দে কিল ঘুঁষি চালানো হলো। শাসানো হলো। আর কুন্তীকে গুলমহম্মদ চাপা গলায় নির্দেশ দিলো যাতে সে ভৈরবী মায়ের কাছে শুয়ে পড়ে। পরদিন সকালে কথক লক্ষ করলেন গোকুলদাসের মুখে বিশ পঁচিশবার ঠুঁষো খেলে যেমন হয় তেমন কাল সিটে দাগ। সে ঢেকে বেড়াতে চেষ্টা করছে। তার একান্ত অনুগত চিরঞ্জীও তাকে এড়িয়ে চলছে। অতটা লম্বা লোকটা লজ্জা সঙ্কোচে যেন কুঁকড়ে গেছে। তিনি জলের মত পরিষ্কার বুঝতে পারলেন কী হয়েছিল সেদিন রাতে। পরক্ষণেই সেদিন রাতের ঘটনাটা পোপটলালের সাথে আলোচনায় উঠে এলো। কথক বললেন :

> "পোপটভাই, আমি থাকলে অতগুলো ঠোক্কর কিছুতেই খেতে দিতাম না গোকুল দাসকে, ওর উঁচু মাথা নীচু করিয়ে মুখ খানা বাঁচিয়ে দিতাম। মানুষই ভুল করে, অন্যায় করে, পাপ করে, আবার মানুষেই এই দুনিয়ায় কত ভাল কাজ করছে। কিন্তু ভুল বা পাপ করলেই যদি সেই মানুষটাকে খতম করে দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ায় ভাল ভাল কাজ গুলো করবার জন্যে শেষে যে আর একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[৫]

মোহান্ত যে কাল রাতের ঘটনা জেনে গেছেন তাতে পোপটভাই অবাক হলেন। বললেন:

> "ও ব্যাটার কথা ছেড়ে দিন। ও একটা আস্ত জানোয়ার ফল হাতে হাতে পেয়েছে, বেশ হয়েছে।' বললাম,তাদের ভাগ্য ভাল যারা হাতে হাতে কর্মফল পায় না। তা যদি সবাই পেত তবে গোকুল দাসের মত জানোয়ারকে কর্মফল দেবার জন্যে একখানা হাতও খুঁজে পাওয়া যেত না।"[৬]

---বস্তুত নিয়তির বিধানে প্রত্যেকেই তার কর্মফলের অমোঘ শাস্তি ভোগ করে। মানুষ যখন মানুষের বিচার করে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে, তখন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনধিকারীর চর্চা হয়ে যায়। যে নিজেই ধিক্কারের যোগ্য সেই মানুষই অন্যকে ধিক্কার দেয়। এমন কোনো মানুষ সত্যিই নেই যে নিজের কোনো না কোনো অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয়। অবধূত সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরাধীর অন্যায়কে দেখিয়ে দিয়েছেন। পাঠক নিজে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর রচনায় অপরাধী নিজের কর্মফল ভোগ করেছে কিন্তু অবধূত কোথাও তাঁর সৃষ্ট

চরিত্রের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেননি। তাঁর রচনায় অপরাধীর শাস্তি কার্যকারণের ফল হিসেবে নেমে এসেছে। মানুষ প্রকৃতির নিয়মের (`Law of nature') অধীন;আজকের যুগের মানুষ এই শিক্ষা অবধূতের রচনা থেকে অবশ্যই নিতে পারেন। এখন আমরা দেখতে পারি মরুপথের যাত্রীরা গোকুল দাসের উপর নির্মম প্রহার করার আগে কোন কথা গুলি ভাবতে পারতেন:

১. গুলমহম্মদ সতর্ক করে দিয়ে ছিলেন কুন্তীকে যে একটি বয়স্থা মেয়ের পক্ষে অতি দুঃখের দিনেও এমন খোলা জায়গায় গাছের তলায় রাতে শোওয়া উচিত নয়। কুন্তীর তখন উচিত ছিল ভৈরবী মায়ের কাছে চলে যাওয়া। সে নিজের দুঃখে বিভোর হয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছে। এই দুর্ঘটনার জন্য তার দায় অস্বীকার করা যায় না। তারও শাস্তি হওয়া উচিত।

২. আমরা সারা জীবনে সবাই কিছু না কিছু অসংযম -এর পরিচয় দিয়েছি; অন্যায় ক'রেছি। সচেতনভাবে ভাবলে সবাই তা বুঝতে পারবেন। শাস্তি যদি দিতেই হয় তবে আগে তো বিচারকের নিজের শাস্তি পাওয়া প্রয়োজন! তাই শাস্তি দেওয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ না দেখিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত।

৩. একজনকে শাস্তি দিলে তার গোপন অপরাধ প্রবণতা বাইরে এসে পড়ে। তার স্বাভাবিক লজ্জার আড়াল ঘুচে যায়। তখন বেপরোয়া হয়ে আরো বড় অপরাধের দিকে চলে যেতে পারে। সমাজের পক্ষে তা বিপজ্জনক। মানুষের সমাজে ধৈর্যের ও ক্ষমার চেয়ে বড় কিছু হয় না---অবধূত বার বার সেকথা বলেছেন তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে। দায়িত্বশীল অনেক লেখকের মত অবধূতের প্রাসঙ্গিকতা আজও তাই অনস্বীকার্য।

দুই. 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' : ন্যায়ের দণ্ড

মানুষ জীবনে বিভিন্ন মরণে সবাই সমান। সাড়ে তিন হাত জায়গার মধ্যে তাকে শেষ বিছানা পাততে হবে---এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। ফিরে যাওয়ার সময় কিছুই নিতে পারবে না---বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডার থেকে ভূমি হীন 'রামা কৈবর্ত'---এখানে সবাই সমান। মানুষ আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবের অন্তিম যাত্রায় যখন শ্মশানে কিম্বা গোরস্থানে যায় তখন চোখের জলে একথা মনে করেন। কর্মব্যস্ত দুনিয়ায় সে স্মৃতি বেশিক্ষণ মনে স্থায়ী হয়না। আলোচ্য উপন্যাসের গোটা ঘটনা শ্মশানেই ঘটেছে। এখানে একের পর এক অন্যায়ের সমাপ্তি ও বিচার এমনভাবে ঘটে চলেছে যে পাঠক নিঃসন্দেহে তার দ্বারা প্রভাবিত হন। গোটা বিশ্ব চলেছে ছন্দে। নিয়মভঙ্গের কক্ষচ্যুতি ঘটাতে পারে বিশ্বধ্বংসের মত মারাত্মক ঘটনা। 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'(১৯৫৬)-এও নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। এখানেও একটি সুর বাজে। সে সুর উপলব্ধি করতে হয় :

> "শ্মশানে ঝিরঝিরে বাতাসে, গঙ্গার ঢেউয়ের কুল কুল ধ্বনিতে চিতার ওপর আগুনের আঁচে মানুষের মাথা ফাটবার ফট্ ফটাস আওয়াজে শোনা যায় সেই নিলামের ডাক। সপ্তগ্রামের বণিক-কুলপতি উদ্ধারণ দত্ত মশাই পাকা সওদাগর ছিলেন। নিক্তির তৌলে আজও জোর কারবার চলছে তাঁর ঘাটে। কড়াক্রান্তি

এধার ওধার হবার জো নেই। যিনি নিলাম ডাকেন তাঁর কপালের ওপর আছে তিন তিনটে চোখ। কার সাধ্য রেহাই পাবে সেই চোখ তিনটিকে ফাঁকি দিয়ে।"[৭]

---'উদ্ধারণপুরের ঘাট'। একটি শ্মশানঘাট। বীরভূম মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা মরলে এই শ্মশানেই তারা পুড়তে চায়। একে'বিকিকিনির টাট'---বলার কারণ হলো এখানেই জীবনের সব হিসাব শেষ। কেউ বাদ যায় না-মরতেই হয় আর হিন্দু হলে তাদের পুড়তেও হয় শ্মশানে। পাপী-পুণ্যবান ধড়িবাজ -উপকারী, ধার্মিক আর ধর্মধ্বজী সব এক সঙ্গে সস্তা দরে নিলামে ওঠে সেখানে। নিলাম ডাকেন স্বয়ং মহাকাল---ক্রেতা চার জন। ভবিতব্য, ভাগ্য, কর্মফল আর নিয়তি। অবধূতের এই ব্যাখ্যা পাঠককে নতুন দর্শনে পৌঁছে দেয়। এখানেও মানুষের চালাকি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন অবধূত। সেখানে দেখা গেলো মিথ্যা আড়ম্বর। চলছে নিশীথ রাতের গোপন অনুষ্ঠান---রহস্যপূজায় বসেছেন আগমবাগীশ শ্মশানের ঈশান কোণে। রক্তবস্ত্র পরে, জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে কপালে মস্ত বড় সিন্দুরের ফোঁটা লাগিয়ে বসেছেন সিঙ্গী গিন্নি। ইনি জীবনের অপূর্ণ বানা পূরণ করতে বদ্ধ পরিকর। ঔপন্যাসিক অবধূত অশ্লীলতার দিকটি সর্বত্রই ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন নি। ফলের সংবাদ পরিবেশন করে বিষবৃক্ষের স্বভাব বুঝিয়ে দিয়েছেন! এই ব্যাপারটি লক্ষ করা গেছে---সর্বত্র সে 'কলিতীর্থ কালীঘাট',(১৯৬৫) 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫) অথবা 'উদ্ধারণপুরের ঘাট'(১৯৫৬)--- কোথাও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'কলিতীর্থ কালীঘাট' (১৯৬৫) উপন্যাসে ডালা-ধরা দের বাড়ির মেয়েরা উপার্জনের জন্য কুমতলবীদের সঙ্গ নেয়। ফিনকির সম্পর্কে সে সম্ভাবনায় তার মায়ের নিরুপায় চোখের জলে আমদের সে বিষয় অনুমান করে নিতে হয়েছে। 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫) উপন্যাসে 'লাঙ্গুলবাড়িয়ার জিতেন সাধুর' বিশ-পঁচিশ জন নারীর সম্পর্ক কিম্বা বিদুর বাবার আশ্রম থেকে একই কারণে যশোমতী পারেখের পলায়নের মধ্যে সে ইঙ্গিত আছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে কারো কুমতলব আছে এটা বোঝানো কাহিনির প্রয়োজনে অনিবার্য হলে তবেই অবধূত সে প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। অকারণ আগ্রহ তাঁর রচনায় আমরা দেখতে পাইনি।

'উদ্ধারণপুরের ঘাট' (১৯৫৬)উপন্যাসে সিঙ্গী গিন্নি যে অনিয়ন্ত্রিত জীবনে পা রাখলেন তার ফলে তিনি লজ্জাকর রোগে পড়লেন। তাঁর চেহারা এখন এমন বীভৎস যে তাঁর ছোঁয়া থেকে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে হলো আগমবাগীশকে। অন্যদিকে একদা আগমবাগীশের প্রেয়সী সিঙ্গী গিন্নী তাঁর এই লজ্জাকর ও মারাত্মক রোগের কারণ হিসেবে আগমবাগীশের লালসাকেই মনে-প্রাণে দায়ি করেন। তাই তাঁর পচা-গলা শরীর নিয়ে সিঙ্গী গিন্নী আগমবাগীশকে জড়িয়ে ধরার জন্য আকস্মিকভাবে একদিন তার দিকেই অগ্রসর হলেন। ঘটনাটি যখন ঘটলো তখন তাঁরা এসে পড়েছিলেন বর্ষার বেগবান গঙ্গার একবারে কিনারে! সিঙ্গী গিন্নি তাঁর দিকে ঐ বীভৎস রূপ নিয়ে এগোতেই ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় আগমবাগীশ পা পিছলে গঙ্গার স্রোতে পড়ে তলিয়ে গেলেন। এভাবে প্রকৃতির প্রতিশোধ যেন রূপ পেল।

সিঙ্গী মশায়ের জীবনটাও এরকম। তিনি গুরুদেবের মৃত্যুর পরে গুরু-মা এবং তাঁর কন্যাকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। সবাই জানলো তিনি কর্তব্য করছেন। পরে আর কোনো কিছুই

গোপন রইল না। প্রতিদিনকার দেহসম্ভোগের সাক্ষ্য কী আর মুছে ফেলা যায়! লোকলজ্জার হাত থেকে রেহাই পেতে গুরুকন্যাকে মেরে ফেললেন। গলায় বাঁশ দিয়ে পিষে মেরে ফেলেছিলেন। পুলিশ তাঁর অপরাধ চাপা দিলো অনেক আর্থিক ক্ষতি করিয়ে; কলকাতার চারখানি বাড়ি তার চলে যায় এই অন্যায় চাপা দিতে। অর্থবান লোকেরা টাকার জোরে অনেক অন্যায় করেন। সিঙ্গীমশায়ও করেছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁর এমন শাস্তি হলো যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! সারা গায়ে তাঁর পোকা হলো। সেই পোকা টেনে টেনে বের করতেন সিঙ্গী গিন্নি। আর তাঁর জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়ার শাস্তি কীভাবে সিঙ্গী মশায় ভোগ করছেন তা দেখতেন । সিঙ্গী মশায়ের নরক যন্ত্রণা জীয়ন্তে ভোগ করেও শেষ হয়নি। তার শ্রাদ্ধের আগে প্রায়শ্চিত্য কেউ করাতে চায়নি। অবশেষে তা যদিবা সম্ভব হলো; তাঁর পচা-গলা দেহ চিতায় তোলা গেল না। কলাগাছে জড়িয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। প্রতিটি নির্মম ঘটনার অনিবার্য ফল হিসেবে অবধূত এগুলিকে যুক্ত করতে পেরেছেন। তাই উপন্যাসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এসব পরিণতিকে নীতি শিক্ষার জন্য নির্মিত বলে মনে হয়না বরং জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। আমরা সাধারণ পাঠক এর থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে বড় ক্ষতির সম্ভাবনাকে জীবন থেকে দূর করে দিতে পারি।

তিন. 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' : আত্মচেতনার বিকাশ

গোটা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ একটি শক্তিকে বিশ্বাস করেন। সেই শক্তির প্রসন্নতার জন্য নানা দেশে নানা পূজা-আচার পালন করা হয়ে থাকে। ভারতে তো নানা বর্ণের মানুষের সহাবস্থান: তাই এখানেই আচরিত হয় পৃথিবীর নানা ধর্মীয় আচার বিধি। গোষ্ঠীর নয় অবধূত বিশ্বমানবের আচরণীয় ধর্ম কে কথাসাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। জানা গেছে ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবকে পরম ভক্তি করতেন। তাই তাঁর শদ্ধ চিন্তার প্রভাব অবধূতের উপর পড়াই স্বাভাবিক। পরমহংসদেবের মত নানা মতের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করতেন---তাই পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও নানা ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁর কৌতূহল ছিল ---এও আমরা জানতে পেরেছি। এই সূত্রে আমরা লক্ষ করেছি অবধূত তঁর রচিত কথাসাহিত্যে নানা ধর্মাচারে সিদ্ধাইদের কথা ব'লে রামকৃষ্ণ প্রবর্তিত মতের প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেদিক থেকে আজকের জাতি-কলহের যুগে ভারতের মত দেশে তাঁর অবদান অসামান্য। দীর্ঘ সন্ন্যাসজীবনে হিমালয়ের পথে একে একে তিনি পরিচিত হয়েছেন বহু মহাত্মার সাথে। দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী প্রজ্ঞানাথজী, কেদারের পথে পরমহংস ব্রহ্মাবধূত দেবীদাস মহারাজ, মা আনন্দময়ী,লাঙ্গুলবাড়িয়ার জিতেন সাধু, ফলাহারী বাবা, টিহরীর সন্ন্যাসী, নাগবাবা, খরসালির ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয়ী সন্ন্যাসী প্রমুখের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন এবং মহাত্মাদের আশীর্বাদ তিনি লাভ করেছিলেন।। এঁরা যেভাবে সাধনা করতেন কারো সাথে কারো যেমন মিল নেই তেমনি আবার অনেকের ভিতর ছিল কামনা বাসনা চরিতার্থ করার ফন্দি বা ভড়ং । অবধূত নানা তীর্থে উপনীত হয়েছেন পথে নানা সাধু-সন্তের দেখা পেয়েছেন কিন্তু কাউকেই একান্তভাবে অনুসরণীয় বলে তাঁর মনে হয়নি। ভোলানাথ প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের

সাধু একনিষ্ঠ 'ব্রাহ্মণ । তিনি চেয়েছিলেন অবধূতকে মায়ের কাজে বহাল করে কয়েকদিনের জন্য যাবেন মা আনন্দময়ীর সাথে। কিন্তু প্রজ্ঞানাথজী তা নিষেধ করেন। খাঁটি ব্রাহ্মণ ভিন্ন এ কাজ করা সম্ভব নয়। মা আনন্দময়ী তা মেনে নেন একটি সাধারণ মেয়ের মতই। অবধূত আচার-সর্বস্বতাকে ধর্মের প্রধান বিষয় ব'লে ভাবতেন না। বিদুরবাবার প্রায়শ্চিত্য করানোর পদ্ধতি তাঁর কাছে একেবারেই অপছন্দের মনে হয়েছে। বিদুরবাবা সম্পর্কে অবধূত বেশ বুঝেছিলেন যে তাঁর শরীর ভোগে অশক্ত অথচ তিনি বিকৃত কামের শিকার। এই বিকৃত কাম পিপাসা মেটানোর জন্য তিনি পাপের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদেরই প্রায়শ্চিত্য করান। এই কাজে সাহায্য করার জন্য এক খাণ্ডারণী মহিলাও যুক্ত। এই মহিলার কামেচ্ছা মেটানোর জন্য মূক সন্ন্যাসী অবধূতকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কথক তথা অবধূত সেখান থেকে গুজরাটের মেয়ে যশোদা পারেখের সাহায্যে গভীর রাত্রের অন্ধকারে পালিয়ে অব্যাহতি পান। যশোদা পারেখও পালাতে চাইছিলেন এই নরক থেকে। কথককে সাহায্য করার সুযোগে দুজনে একসাথে পালানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এঁর সাথে পালানোর সূত্রে কথককে প্রায় বিশ পঁচিশ দিন পাহাড়ে জঙ্গলে রাত কাটাতে হয়। মেয়েটি জ্বরে অসুস্থ ও বেহুঁশ হ'য়ে পড়লে কথককে বয়ে বেড়াতে হয়। যুবতী নারীকে কাঁধে ক'রে ব'য়ে বেড়াতে গিয়ে কামজয়ের সাধক মৌনী সন্ন্যাসী বুঝতে পারেন কাম কী প্রবল শত্রু! অবধূত এই সূত্রে পাঠককে জানালেন যে কামনা কীভাবে মানুষের শরীরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে আটকে থাকে। মরুভূমি, হিমালয় সমুদ্র---সর্বত্র ঘুরে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেন যে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণেই আছে ভগবান-লাভের রাস্তা। পরিশ্রমের বিনিময়ে যা আয়ত্ত্ব করা যায় তাই মোক্ষ্য । এরজন্য ব্যক্তির নিজের মনের দুর্বলতা জয় করা দরকার। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।'---এ কথার সারমর্ম বুঝতে পারেন তিনি। অধিকাংশ তীর্থস্থান দুর্গমে কেন হয় তার একটি ব্যাখ্যা তিনি নিজের প্রাণান্ত অভিজ্ঞতা থেকে পেয়ে যান। তিনি মনে করেন পথের কষ্টে যখন মানুষ সকল চাওয়া ভুলে যেতে পারবে তখনই সে ঈশ্বরের দেখা পাবে। আজকের যুগে ধর্ম পালনের আনুষ্ঠানিকতার আড়ালে সাধনা হারিয়ে যায়। অবধূত কোনো ধর্মীয় আচার সেভাবে পালন না করেও ফলাহারী বাবার কৃপায় স্বর্গের আরতি ঘন্টা শুনতে পেয়েছিলেন। কেদারের পথে একসঙ্গে যাওয়ার সময় পরমহংস ব্রহ্মাবধূত দেবীদাস মহারাজ কথক অবধূতকে বিস্মিত করে বলেছিলেন সেই যাত্রার দেড় বছর আগের ঘটনা! কেদারের ধ্বসে যাওয়া দুর্গম পথটিতে পড়ে রইলো তাঁর দেহ। আর তাঁর আত্মা লক্ষ করলো যে এক অশক্ত বৃদ্ধা; যাঁকে তিনি প্রজ্ঞানাথজীর আশ্রমে খাওয়াতেন তিনিই তাঁর দেহকে টেনে পার করে দিচ্ছেন সেই দুর্গম পথ। আজকের পৃথিবী ধর্মযুদ্ধ থেকে মুক্তি পেতে পারে যদি দেশনেতারা অবধূতের মত অনুভব করেন যে ব্যক্তির ধর্মাচরণ তার ভিতরের ব্যাপার মন্দির-মসজিদের নয়। অবধূতের রচনা প্রয়োজন মেটানোর দিত থেকে থেকে অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

চার. 'টপ্পাঠুংরি': পারিবারিক জীবনের সতর্কতা ও উত্তরণ

'টপ্পা ঠুংরি' বা 'আমার চোখে দেখা' উপন্যাসের প্রথম কাহিনিতে কথকের জবানীতে শুরু হয়েছে গল্প বলা। একেবারে প্রত্যক্ষ করা জীবন সত্যের উপস্থাপনা। প্রতিবেশী রঘুদয়ালের একমাত্র কন্যা ঝুনুর হঠাৎ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার সঙ্গে জড়িয়ে গেল বদন বাবুর নাম। এই পরিবারের মামা পরিচয়ে ঢুকে সে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে সন্তর্পণে মিটিয়ে চলেছিল তার জৈবিক ক্ষুধা। অবশেষে আত্মগ্লানিতে যখন অসহায় মৃত্যু বরণ করলো রঘুদয়াল লাহিড়ির মেয়ে ঝুনু, তখনও তার স্বরূপ বোঝা পুলিশের অসাধ্য। তারপর কাহিনির অগ্রগমনের সাথে সাথে একটু একটু করে খুলে গেল রহস্যের জট---ঠিক যেন একটা ডিটেকটিভ বড় গল্প।

সেবা সোমের ছোঁড়া অ্যাসিড বাল্বে মুখ আর সর্ব শরীর ঝলসে গেল বদন বাগচীর আর কথকের সামনে খুলে গেল এক নতুন বিশ্ব। যৌনতার বীভৎস রূপ। বদন বাগচী যার বুদ্ধিদাতা সেই লোকটিই আসল। তার নাম ক্ষেত্র চাটুয্যে। তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন: 'ক্ষেত্র চাটুজ্যে অন্ধকারের অন্তরে বাস করেন। অন্ধকারের জীবটি কি করছেন এখন কে বলতে পারে।'[৮]

মানুষের প্রবৃত্তিকে দমন করা দেবতারও অসাধ্য কৃচ্ছ্রসাধনার মাধ্যমে এর সংযম হয়ত সম্ভব কিন্তু তা বড় কঠিন। প্রসঙ্গত নীতিবিজ্ঞানের কথা স্মরণে আসে : `The subjection of the individual, impulsive,sentiment self to the order of reason is a Herculean task' [৯]

প্রথম কাহিনীতে প্রতিবেশী কন্যার হঠাৎ আত্মহত্যার সংবাদে বিমূঢ় কথক কিছুতেই ভাবতে পারেননি যে এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর ভক্ত পাঠক রুচিশীল মধ্যবয়স্ক বদনবাবু কোনোভাবে যুক্ত হতে পারেন, অথচ তাঁকে অবাক করে বদন বাবুর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলো আসল ভিলেন শুধু তাই নয় একটি অতি সাধারণ মেয়ে সেবা সোম তার নিজের সতীত্ব বিসর্জন দিয়েও বান্ধবীর অকালবিনষ্টির মূল পাণ্ডা বদন বাগচীকে তারই বাথরুমে নিজের হাতে হত্যা করে চরমতম ঘৃণার প্রকাশ ঘটালো এবং যুগপৎ প্রতিশোধের আনন্দ অনুভব করলো। এই কাহিনি থেকে অবধূত সমাজ জীবনে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত মানুষকে সাবধান করে আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন বলে আমরা মনে করি।

'টপ্পাঠুংরি' উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনিতে দেখি গোপেশ্বর বাবুর পরিবারে 'সানুদির' বিয়ে হয়েছিল ২০ বছর বয়সে। তখনকার সমাজব্যবস্থায় বাঙালি সমাজে প্রায় বিয়ে না হওয়ার মত বয়সে পৌঁছেই বিয়ে হয়-এই সানুদির । দেখা গেল ---বিবাহকারীর উদ্দেশ্যও তেমনি দুর্ভাগ্যজনক। বাতের রুগী জ্যাঠা-শ্বশুরের বাতের তেল গরম করে দিত এই নববধূ। বাইরে চাকুরি করা গোপেশ্বর বাবুর বাড়ি পাহারা দিত এই নববিবাহিতার স্বামী। সানুদি দাম্পত্যজীবন বলতে কিছুই পায়নি। বলাবাহুল্য তার নিঃসঙ্গ অবহেলিত জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। দেখা গেল বাঙালী পরিবারে নিতান্ত অবহেলার জীবন উপেক্ষা করলেন। ঘটনাক্রমে সংস্কারের গণ্ডী পেরিয়ে, নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে ব্যতিক্রমী এই নারী এক প্রৌঢ় মাড়োয়ারী বড়োলোক শ্রীকিষণ কুন্দন ভট্টজীর জীবনে এলেন। অতঃপর নিজগুণে পিয়ারী বধূ শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্ট

হিসেবে নিজের জায়গা করে নিলেন। এখানেই গল্পটির শেষ হয়নি। সানুদির জীবনে সাফল্য লাভের কথা জানিয়েছেন এ কাহিনির কথক । সানুদি তিন ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেরা একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনীয়ার, একজন উকিল; ওদের বউয়েরা শান্তিনিকেতন থেকে নাচ-গান শিখেছেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং লেখিকা হিসেবে অধুনা শ্রীমতী সান্ত্বনা ভট্ট ওরফে সানুদির দুচারটি গল্প হিন্দি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

দ্বিতীয় কাহিনির গল্পটির শেষাংশে পৌঁছে কথক কেবল অনুভব করেছে তার পরিচিত সদা হাস্যময়ী ও লাস্যময়ী এই রমণীটিকে, যে এখন সম্পূর্ণ জড়তামুক্ত এক নারীব্যক্তিত্ব -যার মধ্যে পূর্বাপর আত্মপ্রকাশের কোন দ্বিধা নেই। কথকের এনে দেওয়া বই, মূলত যা তার নিঃসঙ্গ সময়ে অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থতার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই বোধকরি তার সতেজ মনের খোরাক হিসেবে তাকে উজ্জীবিত করে রাখত। বলা যায় একদা তাঁর গৃহশিক্ষা তাঁকে বাঁচতে শিখিয়েছে, নতুন জীবন খুঁজে নেওয়ার তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার সাহস যুগিয়েছে এমন কি স্বীয় বাসনা চরিতার্থতার উপায় শিখিয়েছে, কেবল তাই নয়---সেই প্রৌঢ়ার কাছে কথককেও শিখতে হয়েছে যে, নিজের মধ্যের দ্বিধা না কাটাতে পারলে নিজের চাওয়া কোন দিনই ফলপ্রসূ হয়না।

কাহিনীর কথক মনে মনে ভেবেছেন নিজে পুরুষ হয়েও মনের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, অথচ নারী হয়ে সানুদি তা পেরেছেন, সরস মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে এ নারী বাংলা উপন্যাসে বেশ কয়েকটি ব্যতিক্রমী নারী চরিত্রের মধ্যে থেকেও অগ্রণী। ‘সঙ্কোচের বিহ্বলতায়’ ম্রিয়মাণ কথককে এ নারী পরোক্ষে লজ্জা দিতেও ছাড়েননি। আজকের নারীদের অগ্রগমন এবং স্বচ্ছন্দ জীবনধারার প্রতিচ্ছবি প্রায় পাঁচ যুগ আগে অবধূত তাঁর রচনায় দেখাতে পেরেছিলেন আজকের দিনে তাঁর প্রাসঙ্গিকতার এটা বড় একটা কারণ হিসেবে দেখতে পেয়েছি আমরা।

পাঁচ. ‘সপ্তস্বরা পিনাকিনী’: আধুনিক জীবনের বার্তা

‘সপ্তস্বরা পিনাকিনী’ উপন্যাসে শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তার চেয়ে বড়ো কথা কথাসাহিত্যের বিচারে শিল্প সার্থক এ উপন্যাস। এর প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত ও কাহিনি বাস্তবসম্মত। তদুপরি আজকের যুগে এ উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা নানা কারণে স্বীকার্য। ‘সপ্তস্বরা পিনাকিনী’ উপন্যাসে একজন মাস্টারমশায়ের পরিবারের দুঃখজনক পরিণতি সমাজের সাধারণ মানুষকে সচেতন করে। বিন্দুবাসিনীর ছেলে নিখিল দানবের মত খাটে। মিলে ওর খাটবার শক্তি দেখে বিদেশী সাহেবরাও স্তম্ভিত হোয়ে যান। তার পেশাগত উন্নতি তো হবেই। স্কুল শিক্ষকের ছেলে, জানা গেলো সেই খাটুনির পর বাড়ি ফিরে,সে ঘুমিয়ে পড়ে। কারও সঙ্গে মেশে না, আড্ডা দেয় না, দল পাকায় না---নাইট-ডিউটিও করে না। কারণ শক্তিতে কুলায় না। নির্ভেজাল জীবনে ফল হোল বিপরীত। পাড়ার লোকে বুঝল মিলে কাজ ক’রে ভালো টাকা আয় করে ব’লে ‘ডাঁট’ হোয়েছে। অতএব ডাঁট ভাঙতে হবে। এখানে অবধূত সাধারণ মানুষের ঈর্ষাকাতরতার নির্ভেজাল চিত্র আঁকলেন। ব্যক্তিজীবনে নিজের কাজে তৎপর থাকলেই হলো না। মানুষকে

সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। নইলে সাংঘাতিক হিংসার কারণ হয়ে যেতে হয়, লেখক তা দেখালেন :

> "কিছুদিন পরে পোপনে থানায় নানা অভিযোগ করে তাকে গ্রেপ্তার করালো। সে নাকি একজন পহেলা নম্বরের সমাজবিরোধী। ছেলের বাপ শয্যা নিলেন। উকিল মোক্তার লাগিয়ে ছেলের জামিন করালেন প্রিন্সিপ্যাল[১০] কিন্তু বিচার আর হয় না। বারবার টালাতে থাকে। এরপর কাটতে থাকে বছরের পর বছর। ছেলে একদিন মুরুব্বী মশায়ের বাড়ি যায়,জানতে চায় আর কতদিন তাকে ভুগতে হবে। 'চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিলেন তিনি, যতদিন না তেল মরবে।"[১১]

--সেই তাঁর শেষকথা ধরা ধামে। নিখিল ঝাঁপিয়ে পড়ল মরুব্বীর ওপর। উলটে পড়লেন তিনি চেয়ার নিয়ে। টুঁ শব্দ করতে পারলেন না। সেই সময় সেখানে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা কেউ ছিল না। একটু পরে তারা চা-পান-সিগারেট খাবার জন্য জুটল। পান-বিড়ি-সিগারেট-চা মাথায় উঠল। দেখল মুরুব্বী পড়ে আছেন মেঝেয়, তাঁর গলা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, নাক নেই, চোখ নেই, এক কথায় মুখখানাকে আর চেনাই যাচ্ছে না। শুধু কামড়ের পর কামড় বসিয়েই প্রিন্সিপ্যালের ছেলে নিখিল সেই হুজুরকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানে অবধূত নৃশংসভাবে 'হুজুর'কে তার বৈঠকখানায় হত্যার কাহিনি জানিয়েছেন। অথচ পাঠক যেন নিখিলের হাতে তার মৃত্যুকে কাম্য বলেই মনে করেন। দেশের আইন নিশ্চয়ই নিখিলকে সমর্থন করে না। এর নৃশংসতা এবং অশ্লীলতা অস্বীকার করা না গেলেও হুজুরের দুর্ব্যবহারের শাস্তি হিসেবে তা প্রাপ্য বলেই মেনে নিতে হয়। অবধূত দেখালেন কীভাবে একটি নিরপরাধ ছেলে সমাজবিরোধী হয়ে যায়। অতএব এ যুগেও সমাজ-সচেতন অবধূত অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

ছয়. প্রসঙ্গ : প্রেম---কৃষ্ণা ও করুণাকেতন

কৃষ্ণা করুণাকেতনকে ভালোবাসে। নানা নারীর সাহচর্য পেতে অভ্যস্ত করুণাকেতন তাঁকে নিয়ে ঘর বাঁধার সময়ই পান না । অবশেষে করুণাকেতন আবিষ্কার করলেনকৃষ্ণা দস্তিদার আর সকলের থেকে আলাদাই। তার প্রতি মোহ করুণাকেতনের কিছুতেই কাটে না। সাহসে সৌন্দর্যে বুদ্ধিমত্তায় সে সকলের ওপরে। এবার আর ভোলা নয় উপেক্ষা নয় উভয়ে এবার সহমত পোষণ করেছে যে তারা বিবাহ করবে। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে 'Man proposes God disposes' শেষপর্যন্ত ওদের ইচ্ছা পূরণ হোতে দেয়নি। বাচ্চা সিং আর ওরা দুজন কোলকাতার উদ্দেশ্যে পাহাড়ি পথ ধরে নামছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হোল না। করুণাকেতন চীনাদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলছিল। সে চীনাদের চর হিসেবে কাজ করছিল। চীনারা ভেবেছে সে কৃষ্ণার সাথে প্রেমের সূত্রে তাদের গোপন খবর তার দাদা বিপ্লবকী গোপিকারমণ দস্তিদারকে দিয়ে দেয়। এরফলে তারা প্রবল প্রতিশোধ নিল। রাস্তায় প্রচুর গাড়ি আসা যাওয়া করলেও এমন গরুও থাকে যারা মোটর গাড়ির আওয়াজ পেলে ভড়কে যায়। করুণাকেতন দেখলেন, অনেক আগে একখানি গোরুর গাড়ি চলেছে রাস্তার বাঁ ধার দিয়ে। তার কাছাকাছি পৌঁছতেই হঠাৎ গাড়িখানা

ডান ধার ঘুরে রাস্তার মাঝখানে চলে এল। 'অগত্যা তিনি গাড়ি থামালেন।'[১২]---আসলে চীনারাই এই গোরুর গাড়ির বাধা তৈরী করেছিল। চারিদিক থেকে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের ওপর। এখানেই গাড়ির ড্রাইভার বাচ্চা সিংকে খুন করলে ওরা। করুণাকেতন দত্ত এবং কৃষ্ণা মারা পড়ল। কৃষ্ণা শেষবার যখন ওকে দেখেছিল :

> "নাকটা থেবড়ে গেছে, দুই ভুরুর ওপর থেকে চামড়া ঝুলে পড়ে দু'চোখ ঢেকে ফেলেছে, একটা কান নেই। তখন তার হুঁশ ছিল কিনা বোঝা যায়নি। তারা তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল,তার সামনেই কৃষ্ণার গা থেকে কাপড়গুলো ছিঁড়ে নিয়েছিল। করুণাকেতনের পায়ের কাছে ফেলে প্রথমে কয়েকজন তার শরীরটা নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছিল। তারপর তারা করুণাকেতনকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। তখন ছেলে বুড়ো সবাই মিলে তাকে ছিঁড়ে খেতে লাগল। আর মেয়েগুলো বাচ্চাকাচ্চা কোলে করে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে।"[১৩]

---এখানে অবধূত চীনা আক্রমণের পটভূমিতে দেশীয় অবজ্ঞাত মানুষের প্রতিশোধ-স্পৃহা কোন নীচতায় পৌঁছাতে পারে তা দেখালেন। চীনারা কলকারখানার শ্রমিকদের চোখে এদেশের মালিক পক্ষকে ক্রিমিনাল বানিয়ে দিয়েছে। তাই তারা প্রতিশোধে মেতে উঠেছে। কৃষ্ণার সর্বনাশ বাচ্চা কোলে করে মেয়ে হয়েও তারা সানন্দে দেখেছে! ধনবৈষম্যকে কাজে লাগিয়ে এদেশের একাংশকে কীভাবে আরেক শ্রেণির উপর খেপিয়ে তোলা যায় তা অবধূত দেখালেন। এভাবে অবধূত আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। দেশবাসীর কাছে একাত্মবোধ যে কত বড় শিক্ষা তা এই সূত্রে উপলব্ধ হচ্ছে। চীনা কম্যুনিস্টদের বক্তব্যের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেলো :

> "আলো যেমনই হোক বক্তৃতাটা সবই শোনা গেল। ধোঁয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বক্তা হিন্দী বাঙলা মেশান জবান ছোটাতে লাগলেন -'ভারত মাতা ঝাঁজরা হো গিয়া হায়। মিত্র লোক আগিয়া হায়। নেপাল ভূটানমে আদমী কায়েম হো গিয়া হায়। লেও এক এক লাল রসিদ, রাখ দেও আপনা পাস, যব মিত্রলোক পৌঁছায়গা ইধার, ঐ রসিদ দেখলাও। ইয়ে রসিদ যিসকা পাস রহেগা, উসকো সব কুছ মিলেগা। আউর নজর রাখ হারামজাদা মালিক লোক কোই চিজ লেকর ভাগনে নেই শেকে। সব কুছ তুম লোক বানায়া, বাগিচা ফ্যাক্টরী, গাড়ী লরি যো কুছ হায় হিঁয়া পর, সবকুছকা মালিক কোন হায়? তুম লোক মালিক হায়। হুঁশিয়ার রহো, হারামজাদা মালিক লোক কই চিজ লেকে নেহি ভাগনে শেকে।"[১৪]

শ্রমিকদের কীভাবে মালিকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপানো হয় এখানে তা দেখানো হয়েছে। অবধূত 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' উপন্যাসে বিদেশী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করেছেন। আজকের সময়ে যখন চীনা আক্রমণে ভারত অস্বস্তিতে তখন কী অবধূতের কথা মনে পড়ে না! এ উপন্যাসের একটি সক্রিয় চরিত্র যশোদা। সে যেভাবে বুঝলো আজকের পাঠকেরাও সেভাবে অনুমান করতে পারবেন দেশের বিপন্নতায় কীভাবে দেশকে রক্ষা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা ছদ্মবেশী যশোদার কানে শোনা কথাগুলি থেকে চীনা-ষড়যন্ত্রকে বুঝে নেব :

> "যারা আজ মালিক সেজে বসে আছে, তাদের ঘরে যে খুবসুরত আওরতরা রয়েছে, যারা সেজেগুজে ভাল কাপড় জামা পরে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়, সেগুলোও তোমাদের সম্পত্তি। তিব্বত নেপাল ভূটানকে আজাদী দিয়ে যে মিত্ররা আসছেন,তাঁরা সর্বাগ্রে তোমাদের অধিকার দেবেন মালিকদের সেই আওরত গুলোকে ইচ্ছামত ব্যবহার করবার। তোমাদের আওরতরা খেটে খেটে যে টাকা বানিয়েছে সেই টাকায় ঐ আওরাতরা আরামে খেয়ে দেয়ে মোটর চড়ে বেড়িয়ে খবসুরত হোয়েছে। অতএব সেই সমস্ত সম্পত্তিও তোমাদের। মুক্তিফৌজের জন্য চাঁদা তোল, বেদম চাঁদা তোল,আর চাঁদার লাল রসিদখানি রেখে দাও। এসে পড়ল বলে মুক্তিফৌজ পৌঁছে গেছে বললেও হয়। কয়েকদিন পরে আর খেটে খেতে হবে না। হরদম গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়াবে, মালিকদের খুবসুরত লেড়কি একটি পাশে বসিয়ে নিয়ে ঘুরবে। কোনও চিন্তা নেই। চাঁদার রসিদখানি দেখালেই মুক্তিফৌজ তোমাদের মিত্র বলে চিনতে পারবে।"[১৫]

সাত. 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী': সরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসক

সরকারি হাসপাতালের ওপর গোটা দেশের বেশিরভাগ মানুষকে নির্ভর করতে হয়। সাধারণ মানুষের নানা কাজে সরকারি হাসপাতালে যেতেই হয়। রোগীর বাড়ির লোকেদের কীভাবে হাসপাতালে হেনেস্থা করা হয় 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' নামের বইটি সে প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পিনাকীর মনে হয়েছিল: 'অদ্ভুত জীব!' এ কথাটি শুনে চণ্ডী নিজে বলেছিল 'এতক্ষণ লাগল আপনার বুঝতে---আশ্চর্য!'[১৬] আজকের দিনে আমরা আর ছেলে মেয়ে আলাদা ভাবে মানুষ করি না। মেয়েদের আচরণ ঠিক কেমন হবে একালে তার চুল চেরা বিচার করার দিন শেষ হয়েছে। নারীর নিজের যোগ্যতাই তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার যে মেয়ে ছোটবেলায় ডানপিটে হয় বড় হয়ে সে সেবিকা আলো বন্দ্যোপাধ্যায়ে যদি বদলাতে পারে তবে তা আজকের আনেকের কাছেই কাঙ্ক্ষিত। পেশায় সরকারি হাসপাতালের মেট্রন সিস্টার সে। হসপিটালের খাতায় তার নাম আলো বন্দ্যোপাধ্যায় সে সত্যই নতুন আলো ফেলেছে---এ উপন্যাসে। এই আলোয় পিনাকীর জীবন কেবল বদলে যায়নি, বদলেছে সাধারণ পাঠকের অভিজ্ঞতা। হাসপাতালের পৈশাচিক কাণ্ড লোকচক্ষুর সামনে এসেছে। বর্তমানের চিকিৎসা সঙ্কট হয়তো আরো ভয়াবহ তা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় আমরা বুঝতে পারি। স্বাস্থ্য পরিসেবা একশ' বছর আগেও যে কিছু ভালো ছিলো না তা আমরা এ উপন্যাস পড়ে জানতে পারি। এ প্রসঙ্গ আমাদের সচেতন করে। আজকের দিনেও তাই অবধূতকে জানলে পাঠক উপকৃতই হবেন।

হাসপাতালে সেদিনের পরিস্থিতি কী ছিল অবধূত 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' উপন্যাসে সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছেন। এই পরিচয় আমরা পেয়েছি আলো বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এই চরিত্রটি লেখক নির্মাণ করেছেন আকৈশোর পরিবর্তনের পারম্পর্য মেনে। সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এমন একটি নারী চরিত্র কীভাবে তৈরী হলো তা বুঝতে আমাদের জানতে

হয়েছে আশৈশব একরোখা চণ্ডীকে। 'চণ্ডী' ওরফে চামুণ্ডার শৈশব কৈশোরের আচরণে লুকিয়ে আছে তার চরিত্রের ভবিতব্য। চণ্ডীর মাতামহ সদাশিব জ্যোতিষ গণনা প্রসঙ্গে পিনাকীকে বলেছেন চণ্ডীর কথা। চণ্ডী ছোটো থেকেই অ্যাডভেঞ্চার-খ্যাপা। ছোটবেলায় ওর ঠিকুজী বানাবার সময় ব্যাপারটা বুঝতে পারেন সদাশিব। তাই তিনি নাতনীর নাম রাখেন চণ্ডী। চামুণ্ডা রাখলেই ভালো হত। ছোটবেলাতেই বোঝা গিয়েছিল, মেয়ে কি রকম জেদি হবে। যত জেদ তত সাহস। সদাশিব বাবুর জামাই, মানে চণ্ডীর বাবা চাকরি করতেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। ঐ মেয়ে জন্মায় আসামের জঙ্গলে, সেখানেই বড় হয়। ছ'বছর বয়স যখন তখন সদাশিব নাতনীকে নিজের কাছে এনে স্কুলে ভরতি করে দেন। সাত দিনের দিন স্কুল থেকে চণ্ডীকে তাড়িয়ে দেয়। চণ্ডী নাকি এমন মারপিট শুরু করে দিয়েছিল যে ওকে না তাড়ালে স্কুলসুদ্ধ মেয়েরা পালিয়ে যেত। এমন একজন মারকুটে মেয়ে শান্ত হয়ে গেলো। হাসপাতালের দক্ষ নার্স হলো --- এসব জানলে মেয়েরা অনুপ্রাণিত হবেই। এই সূত্রে চণ্ডী ওরফে আলো বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন আমরা দেখে নিতে পারি।

স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবার দরুন চণ্ডী গেল ক্ষেপে। ক্ষেপে গিয়ে এমন পড়াশুনা করতে লাগল যে ওর ক্লাসের মেয়েরা যখন ক্লাস সেভেনে পড়ছে, তখন ও ম্যাট্রিক দিয়ে ফেললে। তারপর গেল কলেজে, সেখানেও মারপিট। এবার আর মেয়েদের সঙ্গে নয়, ছেলেদের মঙ্গে খুনোখুনি করতে লাগল। অগত্যা কলেজ থেকেও ছাড়িয়ে আনা হোল। হঠাৎ খেয়াল হোল নার্স হোতে হবে। ওর দাদা তখন ডাক্তারি পড়ছিল ও গেল নার্সিং শিখতে। নার্সিং পাশ করার পরে হাসপাতালেই চাকরি পেল। বড় বড় সার্জনরা শক্ত অপারেশন করতে গেলে সর্বপ্রথম ওকে খোঁজেন। সিস্‌টার ব্যানার্জিকে চাই, সিস্‌টার ব্যানার্জি যদি অপারেশনের সময় থাকেন তাহলে রোগীর জীবন রক্ষা হবেই। রোগীর বাড়ির লোকের বিশ্বাস এমন যে সিস্‌টার ব্যানার্জির ছোঁয়া রোগী কিছুতেই মরে না। হসপিটালে আলো বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব সুনাম হোয়ে গেল।দেখা গেল, ঐ একটি জায়গায় চণ্ডী শান্ত হোয়ে থাকে। রোগীদের প্রাণ দিয়ে সেবা-যত্ন করে; রোগীর মুখে হাসি ফুটে উঠলে ও যেন কৃতার্থ হোয়ে যায়। সদাশিব নাতনি গর্বে দস্তুরমত উত্তেজিত হোয়ে তার জেদের কথা বললেন পিনাকীকে। আলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো রোগীর ব্যাপারে অত্যন্ত সহমর্মী ও সংবেদনশীল। পাঠক জেনে গেলেন শৈশব কৈশোরে যারা দামাল যৌবনে আবার তারা হ'তে পারেন হৃদয়বান ও পরোপকারী।

> 'সার্জন হয়তো বললেন অপারেশন করে লাভ নেই, রুগী বাঁচবে না। চণ্ডী জেদ ধরে বসল, অপারেশন করতেই হবে, রুগী বাঁচবেই। এই রকমের ব্যাপার বহু ঘটেছে। তাই নামজাদা ডাক্তাররা ওকে ভয়ানক খাতির করেন'।[১৭]

--এ হেন সেবাপরায়ণা আত্মনিবেদিতা চণ্ডীর বক্তব্যকে অবিশ্বাস করা যায় না। অবধূত আলো বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রটি এমনভাবে নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যাতে তার মুখে বলা কথা সহজেই পাঠকের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে। লক্ষণীয় যে অবধূত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি খুব সহজভাবে আলোচনার সূত্রে বিনা আড়ম্বরে আনতে পেরেছেন। এটা সমাজের মঙ্গলের

জন্য পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে লেখকের মনে ছিল ব'লে মনে হয় না। সার্থক এই চরিত্র আজকের যুগে অনেকের আদর্শ হতে পারে। অবধূতের রচিত কথাসাহিত্য তাই আজকের দিনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ব'লে আমাদের মনে হয়েছে।

সরকারি হাসপাতাল : সেবার নামে সর্বস্ব হরণ

স্বাস্থ্যই সম্পদ। জনজীবনে সেখানেই প্রতারণা সবচেয়ে বেশি। এ সমস্যা দিনে দিনে আরো বেশি করে দেখা দিচ্ছে। সরকারি হস্তক্ষেপেও এর থেকে রেহাই পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। হাসপাতালের ওষুধ চুরি করে বাইরের বাজারে বিক্রি করা হ'চ্ছে। মিডিয়ার প্রচারে প্রায়ই সাধারণ মানুষ এখন দেখে থাকেন। 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' উপন্যাসে অবধূত সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আমরা জানি বাসে চাপা পড়ে বেহুঁশ হয়ে গেছিল পিনাকী। তাই সে জানে না,অ্যাক্সিডেন্টের পরে ঘটনা কী ঘটেছিল। আলো বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে চণ্ডী সে কথা জানিয়েছে পিনাকীকে। আমরা সেই সুত্রে জেনেছি সরকারি হাসপাতালে কী ভয়ানক অনাচার হয়! সিস্টার ব্যনার্জির মুখ থেকে সরকারি হাসপাতালের দুটি খবর দিয়েছেন লেখক :

১. "সেগুলো তাহলে খুলে নিয়েছে ওরা। ঐ রকম কাণ্ডই ওরা করে। বেহুঁশ বেওয়ারিশ রুগী অ্যাম্বিউল্যান্সে তুলে দিলে অ্যাম্বিউল্যান্সেই সব হাতিয়ে নেয়। পিষে যাওয়া ঠ্যাংটার সঙ্গে যে ঐ ব্যাগটা মিশে ছিল তা ওরা জানতে পারে নি, জানতে পারলে ওটাও যেত।"[১৮]

২. সিস্টার আলো বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ থেকে আমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিষয়েও জানতে পারি :

   "পিশাচেও বোধ হয় পারবে না এ রকম কাজ করতে। শুনুন তাহলে। রাত ন'টার সময় এক বউ অপারেশন টেবিলে মারা গেল। ভোর বেলা তার আত্মীয়রা এল সংবাদ নিতে। ডাক্তার-বাবু অম্লান বদনে বললেন তাদের, এই ইনজেক্শন আর এই সমস্ত ওষুধ এখনই কিনে দিতে হবে। অবস্থা ভাল নয়। ছুটল তারা ওষুধপত্র আনতে। এনে দিল ডাক্তার-বাবুকে। সেগুলো তিনি হজম করে ফেললেন। ওধারে তারা বসে আছে। ডাক্তারবাবু ব্যস্ত মানুষ, তাঁর তো একটা রুগী নয়। দৌড়দৌড়ি করছেন। ঘন্টা দুয়েক পরে ডাক্তার তাদের জানিয়ে দিলেন, সর্বরকম চেষ্টা করেও বউটি মারা গেল। আরও এক ঘন্টা পরে খাটিয়া এনে মুর্দফরাসকে বক্শিশ দিয়ে ঠাণ্ডা ঘর থেকে তারা লাশ পেলে।"[১৯]

প্রসঙ্গত আর এক সাধকের কথা মনে পড়ে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: 'এখনকার ডাক্তাররা তো সব হাত পেতেই আছে বলে ভালো করতে পারবো না,মন্দ করবো কী দেবে দাও।'[২০]অবধূত মানুষের অর্থপিপাসাকে নিবৃত করতে যেন মোক্ষম দাওয়াই[২১] দিয়েছেন। অর্থপিপাসু পরশুরাম বর্তমানের তথা চিরকালের সৃষ্টি। মেট্রপলিটন মন, কলকাতার ব্যবসায়িক উত্তরাধিকার, অর্থপিপাসু জীবনাচার-সবমিলিয়ে যে ইঁদুর দৌড় অবধূতের সাহিত্যে তার স্বাভাবিক প্রতিফলন। কথাসাহিত্যে অবধূতের নির্মোহ উপস্থাপন। এ ব্যাপারে সত্য-দ্রষ্টা অবধূতের

নিস্পৃহতা প্রশংসনীয়। এ দেশে পাল যুগে নগরশোভিনীরা খুবই সম্মানিত হতেন। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য আর অসামান্য গুণাধিকারিণীরা কেনো অবস্থাতেই ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি হতে পারেন না। যুগের ধর্ম মেনে আম্রপালিকে রাজা বিম্বিসার ভালোবাসলেও বিবাহ করতে অক্ষম ছিলেন। সমাজের দাবি মানুষের ব্যক্তি প্রয়োজনকে বহুদিন দাবিয়ে রেখেছে। রাজ্যের প্রয়োজনে মন্ত্রী আপনার পুত্রবধূকে রাজ্যের কল্যাণে সন্ন্যাসীর[২২] অঙ্কশায়িনী করেছেন। দেশের জন্য শান্তা নিজে রাজকন্যা---মহামন্ত্রীর ভাবি পুত্রবধূ হয়েও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বিবাহ করেন। অবধূত শাস্ত্রজ্ঞ এবং প্রত্যাশিত জীবনাভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। তাই সমকালের পক্ষে তাঁর রচনায় কন্দর্পপ্রভাব বাহুল্য বলে মনে হলেও একালে ও ভাবিকালে অবধূতের রচনা গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

পরশুরাম মিত্তির তার ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটাতে স্ত্রী মিনতির দেহ-সৌন্দর্যকে কাজে লাগান। মিনতি স্বামীর ইচ্ছাতে কাজ করেন কিন্তু নিজে কোনো স্বাধীনতা ভোগ করেন না। মিনতির উপর পাহারা বসানো আছে। মিনতি পরশুরামকে বলেছে :

> “মাথা খারাপ হোয়েছে বলে তুমি আমায় পাগলা গারদেও পাঠাতে পারো, তোমায় বিশ্বাস নেই। সতর বছর ধরে তুমি আমাকে ভাড়া খাটাচ্ছ, বহু বড় লোকের ছেলের মাথা চিবিয়েছ তুমি আমাকে ভাড়া খাটিয়ে। তোমার খিদে কিছুতেই মিটল না। টাকা টাকা আর টাকা, তোমার ঐ রাক্ষুসে খিদের জন্যে দুনিয়ার সব জাতের সব রকমের পুরুষকে আমি ঐ দেহ দিয়েছি। আর নয়, আমার প্রাপ্য আমাকে মিটিয়ে দাও, এবার আমি ছুটি চাই।”[২৩]

মিনতিকে তাঁর স্বামী বিশ্বাস করতেন না। ক্যাঙারুকে লাগিয়েছিলেন মিনতিকে পাহারা দেবার জন্যে। ক্যাঙারু তাঁর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। বাধ্য হয়ে ক্যাঙারুকে মেরে ফেলার কথা ভেবেছিলেন মিনতি। এ ব্যাপারে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন ‘ওস্তাদ’কে। ঘটনা কী ঘটেছিল তা জানা যায় ওস্তাদের কাছে :

> “দ্যাট গার্ল মিনটি মিটার একবার আমায় বলেছিল ওকে খতম করে দিতে। তার হাজব্যাণ্ড ওকে লাগিয়েছিল ওয়াইফের ওপর নজর রাখবার জন্যে। ওয়াইফ কোথায় যায়, কার সঙ্গে মিট্ করে সব এ গিয়ে রিপোর্ট করত। টোটালি মিজার‍্যাবল্ করে তুলেছিল এ মিনটি মিটারের লাইফটা।”[২৪]

ওস্তাদ অচেতন ক্যাঙারুর সম্বন্ধে একথাগুলি বলেছে পিনাকীকে। আমরা পাঠকেরা এই সূত্রে দেখলাম অন্যায় পথে পা ফেললে কীভাবে মানুষ পাকে পাকে নিজের ফাঁদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। পরে সে ফাঁস কেটে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। অবধূতের কথাসাহিত্য এদিক থেকে নাগরিক সমাজের লালসাকে সংযত করতে সাহায্য করে। অবধূতের কথাসাহিত্য সুন্দর সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে আজও প্রাসঙ্গিক।

আট. আজকের যুবগোষ্ঠী ও অবধূতের সাহিত্যাদর্শ

সমাজশিক্ষার জন্য রামমোহন রায়,ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত

বিশ শতকের কোনো লেখক কলম ধরেছেন এমনটা শোনা যায় না। তবে মানুষের আদর্শ ও বিশ্বাস তাঁর নিজের রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় এসত্য না বললেও চলে। অবধূত বীরাচারী সন্ন্যাসী কোনো পরিস্থিতিতে ভয় পান না। পাহাড়ে জঙ্গলে, সমুদ্রে ,অনাহারে, অনিদ্রায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তিনি অটল। কথাসাহিত্যের জগতে জীবনের উপলব্ধ সত্যকে বলবার সাহস অনেকে দেখাতে পারেন না। অবধূত তা নন। তিনি ভাষার উপর দখল পেয়েছিলেন বলেই যেকোনো ব্যক্তি বা অবস্থাকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর অসুবিধা হত না। হিমালয়ের পথে বাক্‌সিদ্ধ পরমহংস দেবীদাস বাবাজী তাঁকে স্রষ্টা হিসেবে সফল হওয়ার যে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন তা প্রতিফলিত হতে দেখি তাঁর কলমে। ক্ষতস্থানকে এড়িয়ে চলার মত অনেকে সমাজ-ব্যাধিকে সাহিত্যক্ষেত্রে আনেন না। অবধূত তা করেন নি। পরশুরাম মিত্তির টাকার লোভে তাঁর স্ত্রীকে রোজগার করার জন্য বড় ঘরের ছেলেদের পিছনে লেলিয়ে দিতেন। 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' উপন্যাসে মিনতি-কাজল সম্পর্ক সেভাবে গড়ে উঠেছিল। এখন আমরা তার পরিণতি কী হলো আর আমরাই বা তার থেকে কী পেলাম তা জেনে নেব। এই সূত্রে অবধূত যে একালে খুবই প্রাসঙ্গিক তা আমরা বুঝে নেবো।

কাজল গুপ্ত বিখ্যাত আইন-ব্যবসায়ীর ছেলে : হতাশার শিকার

অনুশোচনাবিদ্ধ কাজল গুপ্ত একজন তরুণ চিত্রশিল্পী। তিনি ব্যারিস্টার বাদল গুপ্তের ছেলে। ধনী আর মানী বাড়ির ব্যস্ত ও নিঃসঙ্গ পরিবেশে সে হতাশা-গ্রস্ত। সময়-কাটানোর জন্য সে মিশেছিল মিনতি মিত্রের সঙ্গে। মারও খেয়েছিল মিনতির স্বামীর ভাড়া করা গুণ্ডার হাতে। মিনতির যে কোনো দোষ ছিল না তা না জেনে রাগ হয়েছিল মিনতির উপরে। আক্রোশের আগুনে পুড়ে তাই সে গুলি করে হত্যা করেছিল তার প্রেমিকাকে। এখন সে অনুশোচনা-বিদ্ধ। সে আর নিজে বাঁচতে চায় না। এ কাহিনিতে দেখা গেছে ছলে যুবককে প্রেমের জালে আবদ্ধ করে তাকে ফাঁদে ফেলে টাকা আদায়ের ফিকির করে শেষপর্যন্ত মরতে হল মিনতি মিত্রকে--আত্মগ্লানিতে ভুগে। তার ওপর সন্দেহ বশে বিষ খাওয়া শরীরে পিস্তলের গুলি চালিয়ে দিল অপমানিত প্রেমিক।'সপ্তস্বরা পিনাকিনী'-র কাহিনি যেমন টান টান উত্তেজনা আর কৌতূহলের মধ্যে দিয়ে পরিণতির দিকে সার্থক ভাবে এগিয়েছে তেমনি আমরা জানতে পারলাম বাদল গুপ্তর মত কেবল টাকার পিছনে ছুটলে হারাতে হতে পারে নিজের ছেলেকেও। পরশুরাম মিত্তিরের মত চোরাপথে বড়লোক হওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখা কতখানি বিপজ্জনক তাও জানা গেলো এই সূত্রে। অর্থের পিছনে গোটা বিশ্ব আজ ছুটে চলেছে ---এর পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করে দিলেন অবকধূত। অবধূতের কথাসাহিত্য তাই এ যুগে খুবই প্রাসঙ্গিক।

অন্যদিকে কামোন্মত্ততার ফল কী হোতে পারে তা কাজল গুপ্তকে দেখে যেন শিখে নেয় যুবসমাজ -এই কি অবধূতের বার্তা ! আমরা মনে করি সাহিত্য-সেবার মধ্যে দিয়ে তিনি আগামী বিশ্বের সংকটকে তুলে ধরেছেন। আজকের ভোগান্ধ যুগে তাই তিনি পুনরায় আলোচিত হওয়ার দাবি রাখেন। কাজল গুপ্ত একজন শিল্পী গুণী আইনজ্ঞ বাবার সন্তান শুধু চরিত্র হারিয়ে তিনি

শেষ হয়ে গেলেন স্বামীজী বলেছেন 'When money is lost, nothing is lost, when health is lost, something is lost, when Character is lost everything is lost.' বিবেকানন্দের মত তাঁকেও বলা হত স্বামীজী। বিবেকানন্দের সেই কথাকেই যেন কথাসাহিত্যের মাধ্যমে জীবন্ত করে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিলেন। আমরা দেখলাম এখানে নিজের কাজ-পাগল একজন ব্যারিস্টার নিজের ছেলেকে নৈতিক শিক্ষা দিতে ভুলেছেন; তার ফল হয়েছে মারাত্মক। আজকের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে এ এক গভীর সমস্যা । বাবা-মায়ের ব্যবসা বা চাকরীর ব্যস্ততায় গভীর নিঃসঙ্গতায় ভুগছে বয়স সন্ধিক্ষণের বাচ্চারা। সঙ্গদোষে বিগড়ে যাচ্ছে। বাদল গুপ্ত ও কাজল গুপ্তের মধ্যে দিয়ে লেখক আমাদের সেদিকে সাবধান করে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে ব্যারিস্টারের ছেলে এই অনৈতিক পথে গেল তার কারণ একাকীত্বের সমস্যা। সমাজ এখন এই কঠিন ব্যাধিতে ভুগছে। আজকের ফ্ল্যাট বাড়ীর জীবনে বিলাস বৈভব থাকলেও প্রাণের যোগ নেই। বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও সেখানে প্রবল ---অবধূতের সাহিত্য পড়লে যুবকেরা নিজের ভ্রান্তি ও পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন---এই প্রত্যাশাও পূরণ হয় অবধূতের কথাসাহিত্যে।

মানুষভেদে মূল্যবোধ আলাদা হয় কিনা সেকথা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েই তবে অকর্ম-কুকর্ম-যাই করুক না কেন করে। অপরাধ-দুনিয়ায়ও মানুষের এমনি বোঝাপড়া থাকে জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' তে ওস্তাদ-সাহেব, হিরু ড্রাইভার ওরফে শোভান,ক্যাঙারু, কাইজার প্রত্যেকের আছে সেই ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায়ের সংবিধান। তার ধারা মিলিয়ে শত্রু নির্বাচন ও শাস্তি প্রদান। অবধূত জীবনকে তলানি-ঘুলিয়েও দেখেছেন। জীবনের প্রতি টান ছিল বলেই তিনি রসসাহিত্যের সার্থক স্রষ্টা। কাজল গুপ্ত সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, ছেলে-মেয়ে বাবা-মার কাছে বড় নাও হতে পারে তাই বলে তাদের ক্রাইম করার ক্ষমতা হ্রাস পায় না।

ব্যারিস্টার গুপ্ত যেন আজকের ব্যস্ত-সমস্ত অভিভাবকদের সতর্ক করেছেন। ইঁদুর দৌড়ের জীবনে অনেক বাবা মা নিজের সন্তানের মনের কথা জানেন না। বয়:সন্ধিক্ষণের ছেলে মেয়েরা নানা অসামাজিক কামনা-বাসনার শিকার হয়ে যান। কাজল গুপ্ত তারই একটা উদাহরণ মাত্র। কাজলের বাবা প্রতিষ্ঠিত বড় মাপের ব্যারিস্টার। আইনের রক্ষক হয়ে তাঁর যদি এই অবস্থা হয় তাহলে এ জাতীয় বিপদে সাধারণ মানুষের কী হতে পারে? সমাজের মঙ্গলে সাহিত্য রচনার ধারা প্রশংসার যোগ্য কি-না এর আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক না হলেও পাখির চোখ নয়। তবে সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি---যাইহোক না কেন সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরে গেলে তা দুর্বল। জনপ্রিয়তা সাহিত্যের জন্য একমাত্র প্রয়োজন না হলেও অন্যতম প্রয়োজন অবশ্যই। আজকের সমাজ জীবনে জনগণেশের বড় কদর।

সত্য-শিব-সুন্দর নিজের চারপশে কূটতর্কের নানা প্রশ্নে শতধা ছিন্ন। তাই আমরা স্বীকার করব অবধূতের বাস্তবমুখি এ ধরনের গল্পের প্রয়োজন উত্তরোত্তর বাড়বে। যুবগোষ্ঠীর সামনে ভোগ আর হতাশা যেভাবে অভ্যস্থ বাস্তবতার রূপ পেয়েছে তাতে আদিম রস-পিপাসা আর অপরাধ প্রবণতা বাড়বেই। কাজল গুপ্তের পরিণতি দেখানো যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয়েও থাকে

তবু এ উপন্যাসেরপরিবেশ রচনা এবং রসনির্মাণ-সর্বত্রই অবধূত সফল। দেখা গেলো বিষাদে অবসাদে প্রতাপশালী ব্যারিস্টার গুপ্ত মাথা নুইয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মুখ তুলে বললেন যে দেরি হোয়ে যাচ্ছে তাঁর কোর্টে যাবার। ছেলে মরেছে বলে কাজ কামাই করবেন না তিনি। তবে তাঁর সঙশয় হচ্ছে যে মিত্তির এখনও তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করবে কি-না! ছেলে মরেছে, সেই মরা-ছেলেটাকে যদি সে সে রেহাই দেয় তাহলে এই হতভাগ্য বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা তাকে দিতে পারেন, কিন্তু তারপরেও যদি সে তাঁর সম্মান নিয়ে খেলে তাহলে কী হবে , এ কথা ভেবে তিনি দিশাহীন হ'য়ে যাচ্ছেন। তাঁর ছেলে কাজল মিনতি মিত্রের শিকার হোয়ে মারা গেছে–তাতেও রেহাই নেই। একজন আইন-বিশারদের যদি এই স্তরে অসহায়তা থাকে তবে সাধারণ মানুষের কী হোতে পারে? সাধারণ পাঠককে যেন সাবধান করলেন অবধূত। আমরা বিশ্বাস করি এই সাবধানতা আজকের দিনেও অবধূতের উপন্যাস-গল্পের প্রাসঙ্গিকতা স্মরণ করায়। সপ্তস্বরা পিনাকিনী শৈল্পিক উদ্দেশ্য সফল করেও সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে---এ কথা স্বীকার্য। অবধূত একালে তাই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

নয়. 'কৌশিকী কানাড়া' : পঞ্চম বাহিনী---বিশ্বাসঘাতক দেশবাসী

যুদ্ধ কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়। যুদ্ধবাজেরা অন্যের দেশ দখল করে এবং নিজেদের শক্তি বাড়ায়। যুদ্ধ শুরু হলে যেকোনো উপায়ে জেতাটাই উভয় পক্ষের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন সত্য হয়ে ওঠে ইংরাজিতে বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ :'All is fair in love and war'সংগ্রাম তাই বহু-স্তরিক। আক্রমণকারীর সাথে প্রতিরক্ষার সংগ্রাম একই রকম ভয়াবহ। তখন কে আক্রমণ কারী আর কে আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালাচ্ছে---এটা বিচার্য থাকে না। উভয় দলই সবরকম ভাবে চেষ্টা করে বিজয়ী হতে। দেশের সাধারণ মানুষও আর দূরে থাকতে পারে না। নারী শিশুও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায় না। অবধূত এ উপন্যাসে তা বেশ সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। দেশরক্ষার সংগ্রাম কেবল দেশের সেনা বাহিনীর নয়। সেনাবাহিনীর কাজ প্রতিরক্ষা। শত্রুর আক্রমণ সরাসরি প্রতিহত করা---প্রতি আক্রমণ করা। কিন্তু একটি দেশের সামরিক শক্তিতে সাধারণ মানুষের দায়িত্বও কম নয়। এ উপন্যাসে অবধূত আমাদের তা দেখিয়েছেন। উপন্যাসে অনেক পরে আমরা যশোদার মুখে জানলাম গোপিকারমণ দস্তিদার বা তার দলের উদ্দেশ্য :

১. ''শত্রুর মর্মস্থানে আঘাত হানতে হবে।' যশোদা বোঝাচ্ছিল যোগজীবনকে -'শত্রুর মর্মস্থান হোল তার পঞ্চম বাহিনী, এই দেশের লোক এই দেশে বসে আছে, কিন্তু সর্বনাশ করছে দেশের, শত্রুকে সব সংবাদ দিচ্ছে, কিম্বা দেশের লোকের মন বিষিয়ে তুলছে। এই পঞ্চম বাহিনীকে ধ্বংস করা আমাদের ব্রত। এদের ধ্বংস করতে পারলে শত্রুর মর্মস্থানে আঘাত লাগবে। তারপর আর বেশী ক্ষণ তাদের হাত পা চালাতে হবে না। আমাদের জোয়ানদের সামনে তারা ঠুঁটো হোয়ে পড়বে।''[২৫]
২. ''সরকারের শক্তি অসীম নয়। হাজার হাজার কর্মচারী দিয়ে সরকার তাঁর হুকুম কার্যে পরিণত করেন। হুকুমটা কাগজে লিখে ফেললেই হুকুমমত কাজ হয় না। যারা কাজ

> করবে, তাদের মধ্যে মজা লোটবার লোকই বেশী। পঞ্চম বাহিনী সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও আছে। সবচেয়ে বড় কথা, দেশ যখন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত, তখন দেশের লোকের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে দেশের সরকার কিছুই করতে পারে না। আমরা ঠুঁটো নই, আমরা জানোয়ার নই, আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে।"[২৬]

স্বাভাবিক ভাবে শত্রুকে ঘায়েল করার কাজ সরকারের। তাই শত্রুর মোকাবিলা করার কথা তারা ভাবে না। তাতে যা হয় সেকথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে যশোদার মুখে। দেশের বিপন্নতার সামনে এই সচেতনতা খুবই জরুরী। বর্তমানে ভারত চীনা আক্রমণের মোকাবিলায় ব্যস্ত এর আগেও ভারতকে চীনা আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছে। ভারতবাসী কেন যেকোনো আক্রান্ত দেশের মানুষের কর্তব্য কী তা াবধূতের লেখা পড়লে জানা যায়। একালেও তাই অবধূত অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।[২৭]

দশ. 'ভোরের গোধূলি' : ধর্মপ্রাণ মানুষের স্বার্থপরতা

বর্তমানে আমরা ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখছি। শরৎচন্দ্র গোফুরকে অত্যাচারিত হতে দেখেছেন তথাকথিত গোভক্তি পরায়ণ হিন্দু সমাজের কাছে। যদিও মহেশ তার নিজের সন্তানের মতই ছিল। এখানে অবধূত তির্যকভাবে গোয়ালাদের গোভক্তির কথা শোনালেন। প্রসঙ্গক্রমে একথা গুলি এসেছে কিন্তু আজকের সমাজেও ভালো ভাবে বুঝে নেওয়ার আছে। লেখক জানাতে ভোলেন না গরুর প্রতি গোয়ালাদের অমানবিক আচরণের কথা। ইতর প্রাণীর সঙ্গে সমপ্রাণতা ঈষৎ তির্যকতায় প্রকাশিত। সমাজ জানে আহীরী লোকেরা পরম ধার্মিক; গোমাতার সেবার জন্যে তারা বিখ্যাত অথচ সেই গোমার সন্তানের জন্য এতটুকু দুধও অবশিষ্ট রাখে না। না খেয়ে তারা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়। পায়ে পা জড়িয়ে যায়। আহীরীদের ঠেলায় চলতে চলতে একদিন যখন তারা ম'রে যায় তখন তাদের হাড় ক'খানা বের করে খড় ঢুকিয়ে দেয়। দেখতে বাছুরের মতো লাগে, তাতেই গরুর দুধ ক্ষরিত হয়। লোভী গোয়ালাদের হাতে এই নৃশংস গো-হত্যা লেখকের মনকে ব্যথিত করে। উপায় নেই এর হাত থেকে বেরুনোর তাই রসিকতার মোড়কে জানিয়ে লেখক বোধহয় কষ্টটা ভাগ করে নেন পাঠকের সাথে :

> "গরুদের পিছনে আসে বাচ্চারা, আপন আপন মায়ের সঙ্গে আসে। তাদের কিন্তু ঠেলে ঠেলে আনতে হয়, স্ব-ইচ্ছায় লাফাতে লাফাতে আসতে পারে না, সে সামর্থ্য ওদের নেই। চারখানা ঠ্যাং ঠোকাঠুকি খাচ্ছে, মচকে পড়ছে, মাথাটা উঁচু করে তুলতে পারছে না। শুধু একখানা ছাল, আর ছালের ভেতর সরু সরু কয়েকখানা হাড়। ... অত কষ্ট, বেশী দিন অবশ্য সইতে হয়না ওদের। শেষপর্যন্ত ছালের ভেতর থেকে হাড়কখানা বার করে নিয়ে তার বদলে খড় ভরতি করা হয়। তখন ওরা আসে বগলের মধ্যে, যার বগল তার কাঁধের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে।... ওটুকু ভেজাল মোটে ধরতেই পারে না। হাজার হলেও গরু গরুই, মানুষের চালাকি গরুতে ধরতে পারবে কেন!"[২৮]

---এই আহীরী রমণীরা দুধ দোহানোর জন্য নিযুক্ত হয় কিন্তু দুধ তারা খেতে পায় না। এদের জীবন বড়ো কষ্টের। অবধূতের দৃষ্টি এড়ায় না যে চোখ মেলে আহীরীরা কেবল দুধ দোয়ানো দেখতে পায় খেতে পায় না। তাই তাদের কাছে খাঁটী-অখাঁটীর কোনও মূল্য নেই। তারা জন্মেছে মাইনে নিয়ে চাকরি করার জন্যে, দুধ গেলবার জন্যে তারা জন্মায় নি। দরিদ্র মানুষরা কীভাবে শোষিত হয় তার কিছু নমুনা এ উপন্যাসে দিয়েছেন লেখক। বাঁচবার জন্য এসব মহিলাদের রাতের ঘুমটাও নষ্ট হয় পরকে খুশী করার জন্য। বোঝা যায় অবধূত বলতে চান গরীব লোকের কোনো মূল্য নেই। হিন্দু-মুসলমান বলে কোনো কথা নেই---স্বার্থের বিচারে সব জাতই এক। গরু মানুষ পোষে নিজের গরজে নিজের স্বার্থে। এখানে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা গরুকে বা মানুষকে বিশেষ ভালো বাসবে---তা হতে পারে না। অকারণ আবেগে না ভাষার শিক্ষা অবধূতের লেখায় আমরা পেয়ে যাই। সমাজে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ না করে নিষ্ঠুরতা যে সব সমাজেই আছে তা দেখালেন।

অকারণে যৌবন অনেকসময় নিজেকে বলি দেয়---ব্যাখ্যার যথেষ্ট কারণ না রেখে। 'ভোরের গোধূলি' উপন্যাসের ধীরেন ঘোষও তাই করেছে এ যেন আত্মদানের উপকরণেই তৈরী। আগেই দেখা গেছে দাদা নিজের গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি উদাসীন ভালোমানুষির লোক বলে ধীরেন তার বৌদির জন্য যথেষ্ট করেছে। এই ধারা মেনে ধীরেন সারাজীবন চলেছে। মৌরীর মন না জেনেও সে তার জন্য সব-কিছু বাজি রেখেছে এমন কি নিজের জীবনটাও। তার মনের গঠনটাই অন্যরকম। যে সব মানুষ জীবনের যেকোনো অপচয়ে নিজেকে দায়ী করে ধীরেন ঘোষ তাদের দলে। তার ভালোবাসা মৌরীর কাছে সামান্য প্রশ্রয় পেয়েছে অথচ সে ভালোবাসা নিজের কাছে প্রত্যয়ী হয়ে ওঠার আগেই ধীরেন সর্বস্ব খুইয়ে দিয়েছে। ধীরেনকে দেখে আজকের যুব সমাজ নিজেদের অযৌক্তিক আত্মবলিদানের যথার্থরূপ কত কঠিন হয়, তা বুঝতে পারবে। অবধূত তাই আজও প্রাসঙ্গিক।

এগারো. দারিদ্র্য ও দেশভাগের অসহায়তাঃ অবলম্বন 'পিয়ারী'

পণ্ডিত চর্তুর্ভুজ ত্রিবেদী অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানী। ইনি সপরিবারে পূর্ব বাংলায় সাত পুরুষের বাস্তু ত্যাগ করে এসেছেন বারানসীতে। স্বভাবসুলভ ঠাট্টার সুরে রাজনৈতিক মন্তব্য করলেন লেখক অবধূত। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বেদনার কথা :

> "বিস্তর মানুষ দিবারাত্র অষ্টপ্রহর দরজায় দরজায় চেঁচাতে লাগল---একটু ফেন দাও গো মা। হাহাকারের জ্বালায় ইংরেজ আর এ দেশে তিষ্ঠোতে পারল না। বাঙ্‌লার পুব দিকটাকে মক্কা মদিনার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তল্পি গোটালে। ফলে শাস্ত্র মেনে চলবার আশায় রাশি রাশি গৃহস্থ পুব দিক ছেড়ে পশ্চিমে চলে এসে পথের ওপর আশ্রয় নিলে। শাস্ত্র যা করতে পারলে না পথ তাই করলে। পথ

তাদের বেমালুম গ্রাস করে ফেলে ধর্ম নষ্টের দায় থেকে বাঁচালে।"[২৯]

রাষ্ট্রবিপ্লবে পণ্ডিত ত্রিবেদীর ঠিকানা হীরামন হাভেলী : শকুনবাড়ি

'দাবানল' নামক কথাসাহিত্যে দেখি নবাবী আমলের তৈরী হীরামন হাভেলীতে সপরিবারে উঠেছেন মহাজ্ঞানী চতুর্ভুজ ত্রিবেদী। হীরামন হাবেলীর ছাতের বুক সমান উঁচু পাঁচিলের গায়ে দুহাত অন্তর একটি থাম। থামের মাথায় নিরেট গম্বুজের মাঝখান থেকে নিশান বাঁধা এক হাত উঁচু লোহার শিক একটি করে খাড়া হয়ে আছে। এখন প্রত্যেকটি শিক ঘেঁষে এক একটি শকুন বসে থাকে। দেখে মনে হয় যেন ওরাও চুন-বালির তৈরী, এতটুকু নড়ন-চড়ন নেই। নজর কিন্তু ঠিক আছে, গঙ্গার এধারে ওধারে যত দূর দৃষ্টি পৌঁছয় ততদূর পাহারা দিচ্ছে। খাবার মত কিছু ভেসে যেতে দেখলেই একজন ওড়ে। আকাশে একটা চক্কর দিয়ে পৌঁছে যায় ঠিক জায়গায়, ঝপ করে নেমে পড়ে খাবারের ওপর। তার পর টাল সামলে ঠিকঠাক হয়ে বসে মন দেয় খাওয়ায়, খেতে খেতে মহা আরামে ভেসে চলে।

একজনকে উড়তে দেখেই বাকি সবাই গলা উঁচিয়ে দেখে নিলে ব্যাপারটা। তারপর আরম্ভ হল ছোঁ মারা, ছোঁ মেরে এক খাবলা ঠোঁটে নিয়ে আকাশে ওঠে। সেটুকু শেষ হলে আবার ঝাঁপ দেয়। তখন আর কারো পক্ষেই আহার্যের ওপর বসে শান্তিতে খাওয়া সম্ভব নয়। এইভাবে ছোঁ দিতে দিতে খাদ্যের সঙ্গে উধাও হয় সবাই, আকাশে জলে কোথাও এক প্রাণীর চিহ্ন নেই। ঘন্টাখানেক পরে একে একে সবাই ফেরে ত্রিবেদীর ছাতে। ছাত বোঝাই শকুনের জন্যেই বোধ হয় ঐ বাড়িতে চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর কাছে বিধান নেবার জন্যে যেত না কেউ। শকুনরা ত্রিবেদীদের পসার জমতে দিলে না।

শাস্ত্র-সম্মত চিন্তার কোনও কারণ সত্যি ছিল না -শকুনগুলোও নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের বংশ বৃদ্ধি করছিল। কলুষনাষিনী গঙ্গা ওদের সহায় ওদের ভাবনা নেই। এখন কীভাবে পূর্ব বঙ্গ থেকে এপার বাংলায় চর্তুভুজ ত্রিবেদী সপরিবারে চলে এলেন তার একটা ইতিহাস আছে - সেটা লেখক সংক্ষেপে জানিয়েছেন। 'ইতিহাসের রসটুকুর' প্রতি তাঁর লোভ। তার সত্যাসত্যের দিকে তিনি নজর দেন নি। তার প্রয়োজনও নেই। প্রয়োজন আছে কেবল একটা প্রেক্ষিতের। পণ্ডিতের এক শিষ্য, অনেকদূরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে তাঁর বাড়ি। তিনি দুঁদে জাতের উকিল। তাঁর সাহায্যেই এই বাড়ি মিলেছে। এই উকিলের এক মক্কেলের বাড়ি ছিল এটা। ঘটনাটা এভাবে জানিয়েছেন লেখক :

> "তাঁর এক মক্কেল কোন এক নামজাদা নবাবের বংশধর। সেই সময় ফৌত হয়ে পড়লেন মামলা-মোকদ্দমার প্যাঁচে পড়ে। উকিলবাবুর পরামর্শে তিনি চলে গেলেন বাঙ্‌লার পুবে ত্রিবেদীদের বাস্তুভিটায়। তাঁর বাড়িখানি নিলেন ত্রিবেদীরা। সুশৃঙ্খলে সব কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল। উকিলবাবু তাঁর মক্কেলের মঙ্গল করলেন এবং গুরু বংশকে গঙ্গাতীরে স্থাপন করলেন। একঢিলে দুই পাখি বধ হল।"[৩০]

বারাণসী সমতুল গঙ্গার পশ্চিম কূলে বাস করছেন এখন ত্রিবেদীরা শকুনদের আশ্রয়ে।

বাড়িখানি শকুনগুলো সমেতই নিয়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই। নিয়েছিলেন মানে দাঁও মত পেয়ে গিয়েছিলেন। ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে এই বাড়িখানি পাবার, সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে আসার উপযুক্ত হেতু আছে। সে সব হোল সেই সাবেককালের কথা।

> ''তখন ইংরেজরা ছিল এই দেশে, তারা আবার তাদের জ্ঞাতি-গুষ্ঠির সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছিল তখন। লড়াইটা চলছিল দুনিয়ার অন্য প্রান্তে, তার ছোঁয়াচ এসে পৌঁছে গেল বাঙলার পূব দিকটায়। ওলট-পালট হয়ে গেল অনেক রকম, জাগ্রত দেব-দেবীর মন্দিরের দরজায় রাতের অন্ধকারে শিঙ্ সুদ্ধ গরুর মাথা আবির্ভূত হতে লাগল। মাথা-গুলোই এল শুধু ধড়গুলোর পাত্তা নেই। ধড়ের খোলসটাকে খাবার জলের পুকুরে ভাসতে দেখা গেল। আরও নানাজাতের বিদকুটে বিপত্তি ঘটতে শুরু করল একে একে। মাতৃশ্রাদ্ধে ঘটা করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাচ্ছিলেন চাটুয্যেরা, অনাহূত একদল অতিথি এসে রৈ রৈ করে বসে পড়ল পঙক্তিতে। কন্যা সম্প্রদান করতে বসেছেন প্রসন্ন বিশ্বাস, গ্রামেরই চেনাজানা ছেলেরা উপস্থিত হল রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে। কন্যাটিকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল সকলের নাকের ডগা থেকে। আরও কত কি ! ত্রিবেদী মশাই শাস্ত্র ঘেঁটে দেখলেন, দুর্জনের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।''[৩১]

এই ঘটনা থেকে আমরা জেনে নিতে পারি দাঙ্গা হলে ঠিক কেমন ঘটনা ঘটে। 'দাঙ্গা' বাঁধানোর রাজনীতি এখনো চলছে। যেকোনো সময়ে বারুদে আগুন লাগার মত ঘটে যেতে পারে তাই সাবধান থাকা দরকার। ধর্ম বিষয়টা মনের মধ্যে রাখা উচিত, আগুন না জ্বললে আগুনের দাহিকা শক্তি অনুমান করা যায় না। অবধূত 'দাবানল' উপন্যাসে তার পরিণাম কী ভয়াবহ হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সমাজ ধ্বংস হলে মানুষ ধ্বংস হতে বাধ্য। সমাজের বিপদ কোন ছিদ্রপথে ধ্বংসের আয়োজন করে সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা খুবই প্রয়োজন। অবধূত সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করেছেন। অবধূত তাই আজও প্রাসঙ্গিক।

দেশভাগ-বিধ্বস্তা মুক্তা : নিরাশ্রয়া যুবতী

'দাবানল' উপন্যাস বা বড়গল্পের সগোত্র। গল্পটি মনস্তাত্ত্বিকই বটে। চতুর্ভুজ ত্রিবেদীর ছোট ভায়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে মুক্তা এসেছে প্রায় এক বছর। সে ছোট ভায়ের বউয়ের কি রকম এক সম্পর্কের দিদি। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। স্বামী রেলে চাকরি করত।

> ''চাঁদপুর থেকে যে লাইনটা চলে গেছে আখাউড়ার দিকে,---সেই লাইনের কোনও স্টেশনে টরে টক্কার কল ঠুকত। কোয়ার্টার পেলে বউ নিয়ে যাবে, এই আশায় ছিল। হঠাৎ একদিন বিস্তর লোক দা টাঙি নিয়ে ঢুকে পড়ল স্টেশনে। মাস্টারবাবু, টরেটক্কা বাবু, টিকিট বাবু মায় যে লোটটা ঘন্টা বাজাত গাড়ি ছাড়বার সময়, সকলকে কুপিয়ে কেটে রেখে চলে গেল তারা। যাবার সময় মাস্টারবাবু আর টিকিট বাবুর কোয়ার্টার থেকে তাঁদের বউ ছেলে -মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

> টরেটক্কা বাবুর নতুন বিয়ে করা পরিবার বাপের বাড়ি ছিল, তাই রক্ষা পেলে। রক্ষা পেয়ে বাপ ভায়েরা একদা পুব ছেড়ে পশ্চিমে চলে এল। বাপ ভাই তখন নিজেদেরই সামলাতে পারে না। অগত্যা তাকে নিজের ভার নিজে নেবার জন্যে তৈরী হতে হল।"[৩২]

তৈরীই হয়ে ছিল যেন সব তার জন্যে। ত্রিবেদী মশায় মহা পণ্ডিত ব্যক্তি। আজন্ম ব্রহ্মচারী। তাঁর সেবায় নিযুক্তা হোল মুক্তা। বাংলা সে সুন্দর পড়তে পারে। সংবাদ পড়ে শোনায়। শাস্ত্র পড়তে না পারলেও বই পড়ে শোনায়। মূলত ত্রিবেদী মশায়কে হাত ধরে এঘর ওঘর নিয়ে বেড়ানোই তার কাজ। এছাড়া পূজার যোগাড় করে দেওয়া, জলের গেলাস হাতে তুলে দেওয়া, কাপড় গামছা গুছিয়ে দেওয়া, হাতে ধরে পাতের সামনে আসনে বসানো তারপর খাওয়া হলে হাতে জল ঢেলে পা ধুইয়ে দিয়ে খাটের ওপর তুলে দেওয়া -সব করে মুক্তা ; সে অন্ধের যষ্ঠি। অন্ধ ত্রিবেদী মশাইয়ের একমাত্র অবলম্বন।

> "এতকাল অবশ্য ত্রিবেদী মশাই শুধু শাস্ত্রই পড়েছেন, এবার অনেক কিছু পড়তে লাগলেন মুক্তার চোখ দিয়ে।... দৃষ্টি হারিয়ে দৃষ্টি খুলে যেতে লাগল ত্রিবেদী মশায়ের, তিনি একটু অন্য রকম ভাবে বেঁচে থাকার স্বাদটা পেতে লাগলেন। ভারি মজা!"[৩৩]

অন্ধ ত্রিবেদী মশাই মুক্তার একটি রূপ কল্পনা করে নিয়েছেন। একটি বেঁটে খাঁটো মানুষ, একটু মাজা রঙ। অপর্যাপ্ত চুল ফেঁপে ফুলে মেঘের মত ঢেউ তুলেছে, চুলের ঢল নেমেছে পিঠে। পিঠ ছাপিয়ে কোমর ছাড়িয়ে পৌঁছেছে চুলের রাশি পায়ের গোছ পর্যন্ত। পথ হারিয়ে ফেলতেন ত্রিবেদী মশাই সেই চুলের অরণ্যে, ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়তেন চুলের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে। তখন স্পষ্ট দেখতে পেতেন তাঁর মনগড়া মুক্তার মনোময়ী আঁখি দুটিকে। যে কথা তলিয়ে আছে সেই আঁখি দুটির অতল গহ্বরে, তা যেন তিনি স্পষ্ট ধরতে পারতেন। বুকের ভেতরটা তাঁর মুচড়ে উঠত। চিন্তা পরম্পরায় তাঁর মনে হলো :

১. 'মুক্তার বুকের মধ্যে কি জাতের বোবা বেদনা কাঁদে, তা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কে বুঝবে !' [৩৪]

২. 'আশ্রয় যখন পেয়েছে বরাত জোরে, তখন একটু সদয় ব্যবহার পেতেই বা বাধা কি!

৩. '... তাছাড়া কুটুমের মেয়ে স্বজাতি স্ব-ঘর,তার সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কখনও !

৪. অষ্টপ্রহর যার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তার সঙ্গে নীচু দরের ব্যবহার করবেন, এতটা ছোট নিশ্চয়ই চর্তুভুজ ত্রিবেদী নন।

৫. কৃপা অনুকম্পা দিয়ে তৈরী মস্ত একটা ফানুস উড়ছিল ত্রিবেদী মশায়ের মন- আকাশে। ফানুষের তলায় ভারি মিষ্টি চোখ জুড়নো একটু আলো জ্বলছিল---চোখ দুটি মুক্তার। বসে বসে এও ভাবতে লাগলেন যে কৃপা বা অনুকম্পা কে পাচ্ছে আর কে দিচ্ছে, এটা একটা সমস্যা বটে ! এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ত্রিবেদী মশাই।

রাত্রে কখন যে সিনেমা থেকে ফিরে মুক্তা মশারী টাঙিয়ে দিয়েছিল কে জানে---এ কথা ভেবে মাধুর্যে মন ভরে গেল তাঁর! 'রজনী' উপন্যাসের মত এখানে অন্ধ ত্রিবেদী মশাই যেভাবে নিজের মনে অনুভব করেছেন তাতে লেখকের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার দক্ষতাই প্রমাণিত হয়। এ উপন্যাসে অবধূত দেখালেন কেমনভাবে একজন মানুষ অন্যের উপর নিজের অজান্তে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এ উপন্যাস পড়লে পাঠক মানব মনস্তত্ত্বের গভীরে ঢুকতে পারবেন। জীবনকে চিনতে শিখবেন---অবধূত পাঠের প্রাসঙ্গিকতা এখানে।

খড়ম পাদুকা

বার তিথি নক্ষত্র সমস্ত ঠিকঠাক মিলে গেলে, একটি পুরুষ গোসাপ ধরে দু'খানা কাছিমের খোলার ভেতর পুরে চণ্ডালকন্যার চুলের দড়ি দিয়ে বেঁধে শ্মশানের সাড়ে চারহাত মাটির ভেতর পুঁতে তার ওপর বসে এক লক্ষ বেতাল-মন্ত্র জপ করতে হবে। জপটা চলবে একপক্ষ ধরে। যে তিথিতে বসা হবে, পরের পক্ষে ঠিক সেই তিথিতে উঠে সেই মরা গোসাপটাকে নদীতে নিয়ে গিয়ে ধুতে হবে। স্রোতের টানে তার পচা মাংস হাড়গোড় সবই ভেসে চলে যাবে। কিন্তু একখানি হাড় চলতে থাকবে বিপরীত দিকে অর্থাৎ স্রোতের টান যে ধারে সে ধারে যাবে না, উলটে উজানে উঠতে থাকবে। সেই হাড়খানিই হোল বেতাল -পাদুকা বা খড়ম। সেই হাড় হাতে নিয়ে বেতাল-মন্ত্র আওড়ে ছুঁড়লেই হাতখানি অদৃশ্য হোয়ে যাবে। এবং চক্ষের নিমেষে হুকুম তামিল করে হাতে ফিরে আসবে। অবধূত এইসব অন্ধ সংস্কারে বিশ্বাসী মানুষদের খুব কাছ থেকে চিনতেন। এ উপন্যাসে তাদের খুব সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন।

আজকের দিনে বাংলা ভাষার বড়ো দুর্দিন। হিন্দী ভাষা সরকারি ভাষার নামে রাষ্ট্রভাষা হতে চাইছে। সরকারী আমলারা এ বিষয়ে নীরব। 'বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসে অবধূত আগেই এ বিষয়ে আমাদের সচেতন করেছেন। বললাম :

> "তাহ'লে হিন্দীতে লিখলে না কেন? আমাদের রাষ্ট্রভাষা ওটা, ও ভাষায় যা খুশি লেখা যায়। গালাগালিও যদি রাষ্ট্রভাষায় দাও, কোনও ভয় নেই। রাষ্ট্র তোমার পেছনে রয়েছে।"[৩৬]

ধীরেন ঘোষকে বলেছিলেন রসিক অবধূত। ঠাট্টার ছলে আজকের বাংলাভাষীদের সামনে সাংঘাতিক সত্যটি তুলে দিলেন লেখক। আমরা দেখেছি কোনো সভা-সমিতিতে যোগ্য বক্তা অনেকসময় মঞ্চের বাইরে। অযোগ্য আমলারা বা রাজনৈতিক বক্তারা সভামুখ্য হয়ে বসে আছেন। অবধূত একথা আমাদের আগেই জানিয়েছিলেন।

> "একজনকে প্রধান-অতিথি হিসেবে ডেকে এনে সভাস্থ করে অন্য সকলকে অপ্রধান প্রতিপন্ন করবার রেওয়াজ টি চালু হয়নি তখনও। এবং সকলের অল্পবিস্তর চৈতন্য ছিল বলে, চেতনা সঞ্চার করার জন্যে উদ্বোধক ডাকার প্রয়োজনই হত না।"[৩৭]

এই বক্তব্যের মধ্যে তির্যক শব্দের প্রয়োগ করে বর্তমান কোলকাতার নিন্দাও করেছেন। জনসাধারণকে বোকা বানাবার কৌশলকে তিনি ভালো চোখে দেখতেন না।

> "বিসর্জনের শোকযাত্রায় ধেই ধেই করে কেউ স্ফুর্তিতে নাচত না। কারণ বিসর্জনের বাজনায় বিষাদের সুর শোনা যেত, হিন্দী সিনেমার সুর শোনা যেত না।"[৩৮]

এখানে ইতিবাচক কথার পাশেই নেতিবাচক বাক্যের ব্যবহারে প্রকাশের অভিনবত্ব অবধূত এ উপন্যাসে বহুক্ষেত্রেই সফলভাবে ব্যবহার করেছেন।

বারো. বিশুদ্ধ হাসির ক্ষমতায় 'পথভুলে'

রংপুর স্টেশনে দাঁতের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ রায়কে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন রায়বাহাদুর অমরনাথ এবং গুণদা। মুশকিল হলো ডাক্তারবাবুকে যিনি চেনেন সেই বিনোদবাবু পরের ট্রেনে আসছেন এ ট্রেনে নয়। আরো একটি দল এই গল্পের মঞ্চে উঠে আসছে---এঁরাও অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছেন ফ্যালারাম সহ ম্যানেজার স্বয়ং। বিখ্যাত গাইয়ে ও অভিনেতা নটবর লাহিড়ি আসছেন। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে : 'বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কন্দর্পকান্তি, কিন্নরকণ্ঠ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট্ নটবর লাহিড়ী...।'[৩৯] উপস্থাপনার দৃশ্যই বলা যায় বর্ণনাগুণে যেন নাটকের মত অভিনীত হচ্ছে। তার সাথে উপযুক্ত ভাষা তা সে সংলাপেই হোক আর বর্ণনার ক্ষেত্রে হোক। ম্যানেজার '...কি ব্যাপার বল্ দেখি! গোটা প্ল্যাটফর্মটাই যে দন্ত বিকাশ করে হাসছে...'[৪০] ফ্যালারাম সগর্ব্বে জবাব দিলে, 'তাতে আর আশ্চর্য্য কি ! অত বড় অভিনেতা আসছেন...' দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর সম্বর্ধনা সমিতির এক সভ্য কথাটা শুনে বললেন :

> "অভিনেতা আবার কে? ডেন্টিস্ট কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ডাক্তার রায় আসছেন। ম্যানেজার সে কথায় বিরক্ত হয়ে যা বললেন তা একদিকে ব্যঙ্গাত্মক অন্যদিকে স্রষ্টার সংলাপ রচনার দক্ষতাকে প্রমাণ করে। ম্যানেজার : 'আসছেন নাকি ! তাই বুঝি স্টেশনে এমন দাঁত কপাটি লেগেছে। কিন্তু তিনি তো আর গোটা ট্রেনটা কামড়ে আসছেন না, ট্রেণে অন্য দু-চারজন লোকও আছে। নটবর লাহিড়ির নাম শুনেছেন---বিখ্যাত গাইয়ে ও অভিনেতা। তিনিও আসছেন এই ট্রেণে আমাদের থিয়েটারে অভিনয় করতে, বুঝলেন?"[৪১]

মজা জমেছে নিম্নোক্ত সূত্রে :

১. সকলেই কথা বলতে ব্যস্ত কেউ শুনতে মনোযোগী নয়। নিজেকে বড়ো প্রমাণের চেষ্টায় হাস্যকর হয়ে উঠেছে।
২. যাঁরা অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছেন তাঁরা দুই তরফেই ব্যর্থ। অথচ নিজের নিজের অবস্থানে বড়াই করতেই তাঁরা চেয়েছিলেন!
৩. অবস্থানগত উচ্চতায় থেকে থিয়েটারের ম্যানেজার ফ্যালারামকে ছোট করতে গিয়েও পারে না। নিজেই কুঁকড়ে যায় কেননা সে ছ' বছরের মাস মাইনেটাই দিতে পারে নি। হকের টাকা না দিতে পারার জন্য সে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয় এই বিপরীত বিনত আচরণে দর্শক-পাঠকের মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

যেমন : 'ফ্যালারাম বললে আজ্ঞে ওটা মাঝখানে নয়, সামনে হবে। থিয়েটার তো আর

যাত্রা নয়। ম্যানেজার চটে উঠলেন : "দ্যাখ ফ্যালা, বিশবছর থিয়েটার চালাচ্ছি,তুই এসেছিস আমায় বিজ্ঞাপন লেখাতে? আমার খুশি আমি মাঝখানে লিখবো। আমি যদি সামনের বদলে পিছনে লিখি কি করতে পারিস তুই? ফ্যলারাম বললে, পেছনে কেন আপনি ল্যাজে লাগান, আমায় বাকী ছ-বছরের মাইনে চুকিয়ে দিন, থিয়েটারে কাজ আমি করতে চাই না। ম্যানেজার সুর নরম করে বললেন, আহা চটিস কেন, চটিস কেন। এবারটা যা হয়ে গেছে যাক, আসছে বারে ঠিক সামনে লাগিয়ে দেব দেখিস।"[৪২]

চরিত্র ও লঘু মেজাজ : বর্তমান সমাজের প্রতিচ্ছবি

চরিত্র পরিকল্পনায় হাল্কা রসিকতার আমেজ রক্ষিত হয়েছে। ডাক্তার-এর চরিত্র যেমন দাঁত কেন্দ্রিক রসিকতায় শুরু থেকে লঘু চালের। তার সঙ্গীর নামও তেমনি গোবিন্দ। সুজিতের পরিচয় : 'বঙ্গীয় বেকার-সঙ্ঘের অবৈতনিক সেক্রেটারী' তার সঙ্গী নাম আবার ফকির ! ভাষণ লক্ষ করার মত : 'ফকির ; 'রেখে দাও তোমার বেকার -সঙ্ঘ আর তার কর্তব্য !---ফকির বললে একটু ঝাঁঝালো স্বরে: বেকার-সঙ্ঘের সেক্রেটারী হয়ে এত ঘোরাঘুরি করেও তো একটা কাজ জোটাতে পারলে না।

সুজিত তাতেও দমলো না, বললে আরে কাজ জুটলেই তো সাকার হয়ে যাব, তখন তো আর বেকার থাকবো না। তার আগে বেকার যুবকদের তরফ থেকে সমস্ত শহর জরীপ করে বেড়াচ্ছি ...কোথায় কাজের কি ভরসা হঠাৎ মিলে যেতে পারে কে জানে !' আজকের যুগের হতাশ বেকার যুবকের সামনে এ উপন্যাস আশা সঞ্চার করে।

ভাষা ও সংলাপ দক্ষতা

লঘু পরিবেশে দ্ব্যর্থবোধক ভাষা আর পরিবেশ সৃষ্টির কথায় আসা যায়। সুজিৎ আর ফকির তাদের কম্পার্টমেন্ট থেকে নামবার উপক্রম করতেই কে একজন বললে :

> "ওই যে---ওই সেকেণ্ড-ক্লাস কম্পার্টমেন্টে---ওই তো দাঁড়িয়ে আছেন, চেহারা আর পোষাক দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে...'

এরপরে যেভাবে পরিবেশগত হাস্যকরতা জমে উঠলো তার মূলে কাজ করেছে কথা ভালো করে না শুনে নিজের নিজের ধারণা অনুসারে বুঝে নেওয়া ও সেইমত আচরণ করা। প্রতিটি কথার ইঙ্গিত অর্থে না গিয়ে বক্তা তার মত করে ব্যাখ্যা করেছে। ফলে সংশ্লিষ্ট সংলাপে পাঠকের মনে হাস্যরসের জন্ম হয়েছে। এভাবে কাহিনিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া কঠিন। এ কাজটি লেখক করেছেন স্বভাব সঙ্গত সাবলীলতায় ও পরম মুন্সীয়ানায়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় : সুজিত বেকার তাই বলেছে 'অন্যায় বৈকি! আমাদের দিয়ে টিকিট কেনানো অত্যন্ত অন্যায়।'[৪৩]

(বক্তব্যটির সারাংশ এই যে গরীব হলে বা বেকার হলে টিকিট না কাটার অধিকার জন্মে যায়। প্রাপ্ত বয়স্কের শিশু-সুলভ ভাবনার জেরে তামাশার পরিবেশ রচিত হচ্ছে। আবার এখানে

মাত্রা যুক্ত হচ্ছে যখন না বুঝে রায়বাহাদুর সুজিতকে সমর্থন করছেন।) আর রায় বাহাদুর বলতে চান গুণীমানুষের এমন সেবার সুযোগ হাতছাড়া করাটাই ভুল। তাই তিনি বলেন 'ঠিক কথাই তো। আপনারা টিকিট কিনবেন কি?' (ঐ) সে তো যাঁরা দায়িত্বে আছেন তাঁরাই টিকিট কাটবেন!

এরপর সুজিৎ বিনা ভাড়ায় রেলে চাপবার সমর্থন পেয়েছে মনে করে ফকিরকে যা বলে তাতে হাসি চেপে রাখা কঠিন। বৈষম্যই এখানে হাসির জনক। কথাটা আর ভঙ্গিটা পর্যন্ত আমাদের প্রত্যক্ষবৎ অনুভূতি এনে দেয় : 'সুজিৎ ফকিরের দিকে চাইলে, তারপর বললে,'আমিও ঠিক এই কথাই রেলকোম্পানী আর ফকিরচাঁদকে বোঝাতে চাই।'[৪৪]

কাহিনি

দাঁতের প্রতিভাবান ডাক্তার রায়কে ভুল করে থিয়েটার -এর নায়ক ভাবা হয়েছে। আর বেকার যুবককে ভাবা হয়েছে প্রতিভাবান ডাক্তার। অন্দর মহলে সে নানা আদর আপ্যায়ণে সময় কাটিয়েছে তার সঙ্গী ভীষণ ভয় পেলেও সুজিৎ নানাভাবে পরিস্থিতি সামলে দিয়েছে। সে যে ডাক্তার নয় তা কোনোভাবে বোঝা যায় নি শেষপর্যন্ত থিয়েটার ওয়ালার গ্রীণরুম থেকে বেরিয়ে ডঃ রায় যেদিন রায়বাহাদুরের বাড়িতে বিনোদকে সাথে নিয়ে এসেছে সেদিন সুজিতকে চেনা গেল। সুজিৎ নানাভাবে সত্য কথা বলার চেষ্টা করেছিল। রায়বাহাদুর তাকে অপরাধী ভাবতেই পারেন না। বিনোদ অনেক বেশি কম কথা বললেও রায়বাহাদুর বলেন নি। বিপত্নীক এই রায় বাহাদুর কন্যাকে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চাইছিলেন। একই সাথে তাঁকে কন্যা সমর্পণ করার আগ্রহে রায় বাহাদুরের ভগিনি রাজলক্ষ্মী নানা হাস্যকর আচরণ করেছে। ।বধূত রচিত উপন্যাস 'পথভুলে'-র রাজলক্ষ্মী এবং রায়বাহাদুরের সংলাপ যেন চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছে :

> "শোন কথা। ডাক্তার কি করবে। পারো তো সেই জোচ্চরটাকে ধরে আন---খাতির করে যাকে ঘরে ঢুকিয়েছিলে। সে গিয়ে অবধি মেয়ে চোখে অন্ধকার দেখছে। খাওয়া নেই ঘুম নেই---তুই কার কথা বলছিস? সেই সুজিত? হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার সেই পেয়ারের জালিয়াৎ সুজিত। মেয়ে তো তারি জন্যে হেদিয়ে মরছে। ডাঃ রায়কে বিয়ে করতে রাজী হবে ও? ডাক্তার রায়ের সঙ্গে হেসে দুটো কথা কইতেও তো এ পর্যন্ত দেখলাম না। শেষ কথাটা রাজলক্ষ্মী অবশ্য একটু রং চড়িয়ে বললেন। মঞ্জুর কবল থেকে ডাক্তার রায় উদ্ধার পাক, এইটেই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে,তাহলে রমার এগোবার পথটা পরিষ্কার হয়।" [৪৫]

রায়বাহাদুরের কন্যা দাঁতের ডাক্তার পছন্দ করে না। সে অকারণে সুজিতকে অপমান করেছে। সুজিত শান্ত ভাবে তার কথার প্রত্যুত্তর দিয়েছে। বিপদের সময় পাশে থেকেছে। বেজায় রাগী অথচ মনের দিক থেকে কুসুম কোমল এই মেয়েটি শেষ পর্যন্ত সুজিতকে ভালোবেসেছে। প্রণয়-ঘটিত সমস্যার সমাধান করতে না পেরে কত বেআইনী ঘটনা ঘটায় মানুষ! অবধূত এ উপন্যাস-কল্প রচনায় তার সুন্দর সমাধান দেখিয়েছেন । অবধূতের কাহিনি এ যুগের সমস্যা ও সমাধানকে পরিবেশন করেছে। তাই তাঁকে একালেও সমান প্রাসঙ্গিক বলে

মনে হয়েছে আমাদের। এখন সরস উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে তা সম্ভব হয়েছে কি-না তা জানা বড়ই জরুরী। নটবর লাহিড়ি থিয়েটার ওয়ালা ফিরে আসায় ডাক্তার রায় বন্দী দশা থেকে রেহাই পেয়েছেন। ততদিনে নাটকের মহড়া কেমন হোলো তার প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ ঘটে গেল। রায়বাহাদুরের বাড়ি শেষপর্যন্ত প্রকৃত ডাক্তার সুজিতের সামনে এসেছে। সুজিতকে নানা কথায় বিনোদ অভিযোগ করেছে। তার জালিয়াতি প্রমাণে জেল হাজতে যাওয়ার প্রসঙ্গে সুজিতের মহানুভবতার প্রকাশ ঘটেছে। তবু তাকে তো আর জামাই করা যায় না। এবার আগ্রহী পিসিমা ও তার কন্যা যখন সুজিতের উপর ভয়ংকর খ্যাপা তখন রায়বাহাদুর-কন্যা মঞ্জু তারই জন্য উদাসিনী। ডাক্তার রায় নিজে ভিলেন সেজে সুজিতের সাথে মিলন ঘটিয়ে দিলেন। পরিবেশটি রচনা করলেন ডাক্তার যাতে সুজিত আর মঞ্জু পরস্পরকে মনের কথা বলতে পারে। 'তিনি আবার মঞ্জুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, মঞ্জু তাঁর কাছ থেকে সরে এসে ডাকলো, ড্রাইভার, ড্রাইভার---সুজিত থমকে দাঁড়াল।

মঞ্জু তার কাছে গিয়ে বললে, তাকে অনুরোধ করলো মঞ্জুকে যাতে সে বাড়ি পৌঁছে দেয়। ছদ্মবেশ থাকায় মঞ্জু জানতেই পারে না যে ড্রাইভার আসলে তারই বাঞ্ছিত সুজিত। কাহিনি জমে উঠেছে নাটকের দৃশ্যপটের মত। গল্পকে অবধূত এভাবেই কখনো কখনো নাটকে বদলে দেন। পাঠকের তখন একটাই কাজ। চোখ মেলে দেখা আর রসে ডুবে যাওয়া। এখানে জমে উঠেছে কৌতুক আর হাস্য রস।

মঞ্জু তার খামখেয়ালি স্বভাব ত্যাগ করে যে সত্যিকারের মানুষ চিনতে পারছে তা জেনে ডাক্তার মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এমনি একটি মুহূর্তের জন্যই তো তাঁর এত আয়োজন, এত চেষ্টা ! ডাক্তার রায় তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখে হাসি ! মঞ্জুকে মোটরে তুলে সুজিত গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।'এর পর ডাক্তারের হৃদয়ঘটিত একটি খবর পাওয়া গেল :

> 'রংপুরের পূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজার ভাগ্যে জোর করে তাঁকে স্টেজে ঠেলে দিয়েছিল, নইলে তাঁর এতবড় সুপ্ত প্রতিভার কথা তিনি বোধ হয় জানতেও পারতেন না। এই ভেবে তিনি খুশী হবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মনে হোলো চোখে কি পড়েছে জল আসবে নাকি?'[৪৬]

ডাক্তার যে মঞ্জুকে ভালো বেসে ফেলেছেন -তা আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না। নির্মেদ চেহারার এ কাহিনি এ প্রসঙ্গে থেমে থাকে না। আমরাও এ গল্প থেকে অবধূতকে কেন আমাদের চর্চা করতে হবে তার কয়েকটি উত্তর পেয়ে যেতে পারি :

১. বেকারত্ব ও অবধূত চর্চা

সুজিত একজন বেকার যুবক হয়েও সে একজন শিক্ষিতা মেয়ের ও সম্ভ্রান্ত বাবা রায় বাহাদুরের প্রীতি অর্জন করেছে। অতএব বেকারত্বের কালে হতাশ না হয়ে মানুষের মনের কাছে পৌঁছানো সবচেয়ে বড় দরকার। লেখক যেন বলতে চেয়েছেন নিজে হাসতে ও হাসাতে দুঃখ জয় করা যায়। জানলে বিধাতা কারো হাসি কেড়ে নেন না। লেখক অবধূত তাঁর সাধনার ব্যক্তি-উপলব্ধির

নির্যাস টুকু দিয়ে সাহিত্যের পাত্রে সুধারস ভরে দিয়েছেন। অবধূত তাই একালেও সমধিক প্রাসঙ্গিক বলে আমাদের মনে হয়েছে।

২. মানুষকে চেনার প্রসঙ্গ ও অবধূত

মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে অনেক প্রৌঢ় ব্যক্তি পাতানো মামা কাকা ইত্যাদির ছদ্মবেশে নিজেদের কামতৃষ্ণা চরিতার্থ করে। বিষাদগ্রস্ত হয়ে মেয়েরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এই বিশেষ বয়সের মানুষের মনের ভাষা পড়া যায় না অবধূত সেকথাই 'টপ্পাঠুংরি' -র বদন বাগচীর চরিত্রে দেখিয়েছেন। বদন বাগচীর কাম-লালসা চরিতার্থ করতে গিয়েই বিষন্নতায় একটি নিরীহ মেয়ে কীভাবে অসহায় মৃত্যু বরণ করে তা লেখক আমাদের দেখিয়েছেন।

৩. পরিজন ও গোপন হিংসা

একান্নবর্তী পরিবার আজকাল খুব-একটা দেখা যায় না। স্মৃতিময় সে-সব সময়ের সঙ্গে আজকের দিনের তুলনায় আমাদের মনে হতাশা কাজ করে। তবে অতীতের সেই পারিবারিক সহাবস্থানের সবটাই যে সুন্দর নয়, স্বীয় স্বার্থপূরণের চক্রান্তে তারা যে অনেক সময় সত্যকে বিকৃত করত, অবধূত রায়বাহাদুরের বোন রাজলক্ষ্মীকে দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রসঙ্গটি এখন স্মরণ করা যেতে পারে।

'পথভুলে' একটি বড় গল্প। নায়িকা মঞ্জুর পিসিমা রাজলক্ষ্মী। তিনি বিবাহযোগ্যা কন্যার বিধবা মা। রাজলক্ষ্মী চান না তার ভাইয়ের মেয়ের সাথে ডাক্তারের বিয়ে হয়। ইতোমধ্যে তিনি জেনেছেন নিজের মেয়ের মনের কথা। আপন মেয়ের সঙ্গে ডাক্তারের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাটা গোপন রেখে তাই ভাইঝির ওপর দোষারোপ করছেন। ভাবটা এমন যেন মঞ্জু ডাক্তারকে পছন্দ না করে বেকার সুজিতকে ভালোবাসছে-এতে তার ভবিষ্যৎ খারাপ হবে ভেবে তিনি বিরক্ত। সেই অসহায় বিরক্তি হিতৈষী জনের মত। সেটা হওয়াই উচিত। বিধবা ভগিনী নিজের দাদার সংসারে থেকে তার ভালো চাইবেন -এটাই তো হয়। অবধূত দেখালেন তা সত্য নয়। নিজের স্বার্থের বাইরে সচরাচর সংসারি মানুষ বেরুতে পারে না।

লেখক রাজলক্ষ্মীর মুখে জানিয়েছেন :

> "শোন কথা। ডাক্তার কি করবে। পারো তো সেই জোচ্চরটাকে ধরে আন---খাতির করে যাকে ঘরে ঢুকিয়েছিলে। সে গিয়ে অবধি মেয়ে চোখে অন্ধকার দেখছে। খাওয়া নেই ঘুম নেই---
>
> ---তুই কার কথা বলছিস? সেই সুজিত?
>
> হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার সেই পেয়ারের জালিয়াৎ সুজিত। মেয়ে তো তারি জন্যে হেদিয়ে মরছে। ডাঃ রায়কে বিয়ে করতে রাজী হবে ও? ডাক্তার রায়ের সঙ্গে হেসে দুটো কথা কইতেও তো এ পর্যন্ত দেখলাম না। শেষ কথাটা রাজলক্ষ্মী অবশ্য একটু রং চড়িয়ে বললেন। মঞ্জু-র কবল থেকে ডাক্তার রায় উদ্ধার

পাক,এইটেই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে, তাহলে রমার এগোবার পথটা পরিষ্কার হয়।"[৪৭]

অবধূতের সাফল্য এখানে যে অবধূত মধ্যবিত্ত জীবনের এই ফাঁক ও ফাঁকি আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। তবে জীবনের এগুলি অঙ্গ একে বাদ দেওয়া যায় না বড় কোনো ফাটল এর জন্য ঘটে না। সংসারে এসব নিয়েই বাঁচতে হয়। রাজলক্ষ্মী রায়বাহাদুরের নিজের বোন। গল্পের পরিণতিতে তার চরিত্রের এই সঙ্কীর্ণ দিকটাকে দেখিয়ে দিয়েও লেখক রাজলক্ষ্মীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মুখিয়ে ওঠেননি। হাল্কা হাসির বাতাসে জীবনের দুঃখকে উড়িয়ে গল্পের প্রকৃতি অনুসারেই মিলন-মধুর পরিণতিই দিয়েছেন।'পথভুলে'-র অন্তিম পর্বে।

আজকের গোমড়া-মুখো জটিল-জীবনে সুজিতের এই হাসির হাওয়া খুবই প্রয়োজন। সে দুর্মুল্যের বাজারে অমূল্য যে হাসি আর আনন্দ তা সবার মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার শিক্ষা দেয়। তাকে ভালোবেসে মঞ্জু ডাক্তারকে বিয়ে করেনি-অর্থমূল্যে সুখ কেনার হিসেব করলে অবশ্যই তা ভুল। অর্থ-সর্বস্ব বর্তমান নৈরাশ্যের পৃথিবীতে অবধূতের আবির্ভাব নব-আশার সঞ্চারক। অবধূত -চর্চার এটা হোলো হাতে পাওয়া লাভ।

যদি গল্পের শিল্প পরিণতির কথা বলি তাহলে -এটাই কাম্য ছিল। রায়বাহাদুরের মেয়ে হওয়ার জন্যই সে নিজের মর্জি-মাফিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেই তো অর্থকে তুচ্ছ করা যায়। দাঁতের নামকরা ডাক্তার তাই 'মঞ্জু'-র পছন্দের তালিকায় স্থান পায় না। অন্যদিকে রমা আর রাজলক্ষ্মীর সমস্ত ইন্দ্রিয় সে বিষয়ের গুরুত্ব-সচেতন হয়ে ওঠে। এ গল্পে রমা-রাজলক্ষ্মী কেন্দ্রিয় চরিত্র নয়। তারা দাঁতের ডাক্তারকে তাদের মহার্ঘ পাত্র হিসেবে পেয়ে যাক বা না যাক তাতে গল্পের রস অক্ষুণ্নই থাকে। কেননা গল্প প্রথমাবধি হাল্কা মেজাজেই এগোচ্ছিল। যাকে বলে গল্পের মর্জি-সেও কোনো সুচিন্তিত পথে সিরিয়াস গল্পের মত ছিল না। শুরুটাও ছিল আকস্মিকতায় আর অনির্দিষ্টতায় ভরা। শেষটাও তাই মিলনে আনন্দে কাম্য রস পরিণতি লাভ করেছে। এ গল্পের আবেদন তাৎপর্যপূর্ণ এবং যুগপৎ রসাস্বাদী। অবধূত তাই লেখক হিসেবে একালের পাঠকের কাছে শ্রদ্ধেয় ও রসিক রূপেই বরণীয়।

'বিশ্বাসের বিষ' উপন্যাসে কথক এবং বিশেষ চরিত্র কালীর সাথে কথোপকথনের সূত্রে একটি স্বাভাবিক রসিকতার মোড়কে বাংলা ভাষাভাষির যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে। আগন্তুক কালী বললেন :

'তা' হলে হিন্দীতে লিখলে না কেন? আমাদের রাষ্ট্রভাষা ওটা, ও ভাষায় যা খুশি লেখা যায়। গালাগালিও যদি রাষ্ট্রভাষায় দাও, কোনও ভয় নেই। রাষ্ট্র তোমার পেছনে রয়েছে।'[৪৮]

রসিক অবধূত স্বল্প পরিসরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেন। বাংলা ভাষার দুরবস্থার দিন যে এগিয়ে আসছে পাঠক এ সূত্রে তা জানতে পারলেন।

বাঙালির সভা-সংস্কৃতির নানা পরিবর্তন ঘটেছে ভালোর সাথে সাথে মন্দও এসেছে। অবধূত সেবিষয়ে সজাগ ছিলেন। রসিকতার মোড়কে বললে উদ্দেশ্যমূলকতা চাপা পড়ে যায়। অমরা অবধূতের কাছে তা জানতে পারলাম।

"একজনকে প্রধান-অতিথি হিসেবে ডেকে এনে সভাস্থ করে অন্য সকলকে অপ্রধান

> প্রতিপন্ন করবার রেওয়াজ টি চালু হয়নি তখনও। এবং সকলের অল্পবিস্তর চৈতন্য ছিল বলে, চেতনা সঞ্চার করার জন্যে উদ্বোধক ডাকার প্রয়োজনই হত না।''[৪৯]

---এই বক্তব্যের মধ্যে তির্যক শব্দের প্রয়োগ করে বর্তমান কোলকাতার নিন্দাও করেছেন। জনসাধারণকে বোকা বানাবার কৌশলকে তিনি ভালো চোখে দেখতেন না। 'বশীকরণ' উপন্যাসের উপরি-উক্ত অংশে সেকথা স্পষ্ট হ'য়ে গেছে। বাঙালির জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা। এর পিছনে অনাদিকালের সংস্কার কাজ করে। মায়ের বিসর্জন মুহূর্তটি বিষন্নতায় ঢাকা। অথচ আজকাল ক্লাব-কালচারে যে পূজা হয় সেখানে বিসর্জন যেন কী আনন্দের! অবধূত এর বিরোধিতা করেছেন :

> ''বিসর্জনের শোকযাত্রায় ধেই ধেই করে কেউ স্ফুর্তিতে নাচত না। কারণ বিসর্জনের বাজনায় বিষাদের সুর শোনা যেত, হিন্দী সিনেমার সুর শোনা যেত না।''[৫০]

---বর্তমানে বিসর্জন উপলক্ষে আমরা অবশ্য একথা মনে রাখতে পারি। লক্ষ্যণীয় যে এখানে ইতিবাচক কথার পাশেই নেতিবাচক বাক্যের ব্যবহারে প্রকাশের অভিনবত্ব সফলভাবে ব্যবহার করেছেন।

'বহুব্রীহি' গল্পগ্রন্থের 'ইজ্জত'

'বহুব্রীহি' গল্পগ্রন্থের 'ইজ্জত' গল্পটি আমাদের কাছে যথেষ্ট শিক্ষামূলক। পুরিয়া দেবী ছাড়া গল্পটির মধ্যে আরো একটি চরিত্র আছে যে ব্যতিক্রমী কিন্তু তাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে পারেনি কেউই। সে আর কেউ নয় সে ওই পরিবারেরই ছেলে যে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না তার দিদিকে আর দলের পাণ্ডা মল্লারকে। বাবার তাতে মনে হযেছিল বোধহয় এ সবের মূলে কাজ করছে ঈর্ষা। দিদিকে,অর্থাৎ পুরিয়া দেবীকে সবাই ভালোবাসে সিনেমা দেখায়, ভালো ভালো পোশাক দেয় মাখবার উপকরণ দেয় তাই হিংসা করে ভাই। এক কথায় ব্যর্থতার আক্রোশে ফেটে পড়ছে ব'লে নন্তু সম্পর্কে সস্মিত হাস্যে উদাসীন দূরত্ব ও একপ্রকার অবজ্ঞার ভাব পোষণ করে তার বাবা। মা এ গল্পে প্রথমে যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ছিলেন পরে তাঁকে আর দেখা গেল না। অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে গল্পের শেষ কাহিনি শোনালেন লেখক।এই অংশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নন্তু। সে তার পরিবারের জন্য কতখানি ভাবত তার প্রমাণ লেখক খুব ছোট অবসরে দিয়েছেন প্রথম দিকেই। এর পর যেন তার দিদির অভ্যুত্থানে সে ঈর্ষান্বিত -এমনই মনে হয়েছিল। তার বাবা এজন্য নন্তুকে তার মামার বাড়ি কৃষ্ণনগরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। -গল্পটি এভাবেই চলতে চলতে হঠাৎ মোড় ফেরে। সবচেয়ে যে দুর্বল আর অসহায় এক চরিত্র হিসেবে গল্পে স্থান করে নিয়ে কোনরকমে টিঁকে ছিল,পাঠকের সেই অবজ্ঞাত নন্তুই নিয়ে নিল সবটুকু আলো। মানব মনের অপার রহস্য মানুষ কী জানে? বাবাও ছেলেকে বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে তার পরিবারের সম্মান বজায় রাখার জন্য যেভাবে নিত্য একক প্রতিবাদ,প্রচেষ্টা ও সাহস দেখিয়েছে তা নিশ্চয় প্রশংসনীয়। নাটকীয় ভঙ্গিতে বাবার মাধ্যমে লেখক ঘটনার বিবৃতি দিয়েছেন।

"নন্তুর জন্যে আমার ইজ্জত অনেক বেড়ে গেল। মাইনে বেড়ে গেল ত্রিশ টাকা। নন্তু টাকা পেলে,মেডেল পেলে, সার্টিফিকেট পেলে।"[৫১]

ঘটনাটি তাক লাগাবার মত বাগান বাড়িতে যেখানে মল্লার আর তার সঙ্গীরা বিকৃত কামনার চরিতার্থতা ঘটাত সেটা আগেই জেনে সকলের অজ্ঞাতে সে বাগানবাড়ির খাটের নিচে ঢুকে বসেছিলো। সেদিন ওদের লোভের শিকার ছিল অনিমেশ বাবুর মেয়ে। নন্তুর এই অভাবনীয় প্রাপ্তির পর এ পরিবারে সুখ আসতেই পারত। কিন্তু বাস্তব দর্শী অবধূতের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। বাস্তব চাওয়াকে ধরি ধরি করেও ধরতে পারা যায়না-আশা ছলনাময়ী। এই পরিবার তাই সুখকে কিছুতেই ধরতে পারলো না। গল্পের শেষটি এপ্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ।এদিকে নন্তুর হাত ধরে পরিবার যখন হাসতে চেষ্টা করছে তখন চাবুকের বাড়ি পড়ল পিঠে :

'.'..কিন্তু আমার মেয়ের গা ময় বিশ্রী ঘা দেখা দিলে। তখন আর মুখ দেখাবার উপায় রইল না কোথাও। আরও তিন মাস পরে ধরা পড়ল আমার মেয়ে ছ'মাস গর্ভবতী। তারপর-আমরা পাড়া ছাড়লাম। আর আমার নন্তু সেই যে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গেছে আজও তার পাত্তা নেই।"[৫২]

সময়মত সাবধান হলে নন্তুর বাবা-মাকে এভাবে সপরিবারে শেষ হয়ে যেতে হত না। এভাবে অবধূত সমাজে বসবাসকারী মানুষদের সমস্যাকে তুলে ধরে তার বাস্তবসম্মত সমাধানের সূত্রও নির্দেশ করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে বলে আমাদের মনে হয়েছে । অবধূত তাই শতবর্ষের মূল্যায়নেও প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক।

'শুভায় ভবতু': বেকারত্ব, সমসাময়িক কলকাতা

অবধূত সেসময়ের সমাজ-জীবনের কথা বলেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে প্রেমে পড়বার উপায় ছিল না বলেই লোকে খপ করে বিয়ে করে ফেলত। বিয়ে করেই নিজের সেই কচি বউয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ত। তার ফলে জন্মাত ছেলেপুলে। আর তখন লোকে চাকরির চেষ্টায় লেগে যেত। তেত্রিশ টাকায় তখন বি. এন. আর. অফিসে লোক নেওয়া হত। পঁয়তাল্লিশ টাকায় নেওয়া হত পোর্ট-কমিশনার অফিসে।'গর্মেন্ট'-এর অফিসে ঢুকত 'গর্মেন্ট'-এর লোকের ছেলে-পুলেরা, পুলিশে ঢুকত পুলিশের শালা-ভগ্নীপতি। পশ্চিমের মানুষ কলকাতায় আসত পোষ্ট অফিসের পিয়ন আর রাস্তার জমাদার সাহেব হবার জন্যে। অন্য সব অফিসের সাহেবেরা বড়বাবুদের কথায় লোক নিতেন। বড়বাবুদের নজর ছিল খুব বড়, তাঁদের দিয়ে সাহেবকে কিছু শোনাতে হলে বড় ব্যাপার করতে হত। ছোট কিছু তাঁদের নজরে ধরত না। ইঙ্গিতে অবধূত সরকারি অফিসে ঘুষ নেওয়ার কথা বললেন। আজকের যুগেও একথা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। অবধূত বাস্তব সমাজের চেহারাটাই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

"কোনও দিকে কোন কিছুর সুরাহা করতে পারত না যারা, তারা বার্ড কোম্পানীর অফিসে নাম লেখাত। তারপর খিদিরপুরের দিকে গিয়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজত।"[৫৩]

আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে পৌঁছে আমরা মনে করি বেকার সমস্যা এবং

সাধারণ শিক্ষিত মানুষদের সমস্যা আলোচনা করার ক্ষেত্রে অবধূত যে-সব সমস্যার কথা বলেছেন সেগুলি আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক।

তেরো. কথাসাহিত্যে সমাজ-সমস্যা : অবলম্বন অবধূতের উপন্যাস ও গল্প

'বশীকরণ' উপন্যাসের তোরাব বড় লাঠিয়াল। আসামী তোরাব জেলে বসে তার নিজের পরিবারের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে তাদের জন্য কষ্ট পায়। কথককে সে প্রায়শই স্মৃতিচারণার মত করে তার পরিবারের কথা বলে। তার মেয়ে সাকিনার বয়স হল এই সম্ভবত বারো, ছেলে নুরুর এই দশ, আর ছোটটার বয়স অন্তত আট তো বটেই। সে ভেবে পায় না যে ওদের মা নিজের পেট চালিয়ে আরও তিনটে পেট কি করে চালাবে? তাই সে আশঙ্কা করে যে মেয়েটাকে হয়ত কারো ঘরে কাজে দিয়েছে। তোরাব ভাবে তার দুই ছেলেও হয়তো কারও গরু বাছুর রাখে। সে বেদনার্ত হয়। এমনও ভাবে যে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে না তো! সে ভয় পেয়ে যায়। সান্ত্বনা দিয়ে কথক বলতেন :

> "দূর, না খেয়ে মরে নাকি কেউ কোথাও? তোমার যেমন মাথা খারাপ। দেশে কি মানুষ নেই নাকি, কেউ না কেউ ওদের দেখাশুনো করছেই।"[৫৪]

তোরাবের যন্ত্রণা বড়ো গভীর। সমাজকে সে চেনে। তাই সে ভাবে তার পরিবারের লোকেরা যদি কারও কাছে আশ্রয় পেয়েও থাকে, তবে তার বদলে দিতে হয়েছে তার স্ত্রীর ইজ্জৎ। তোরাবের এই কথা মাধ্যমে অবধূত নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত মুসলিম সমাজের হৃদয়হীনতার বাস্ত ব চেহারাটাই তুলে ধরেছেন। তবে বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বেশি উদাহরণ থাকলেও এই লালসার শিকার আজ বহু মানুষ! তাই তোরাব যখন বলে যে তার স্ত্রীর কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই মিলবে না, যদি সে কারও সঙ্গে নিকেয় না বসে থাকে, তখন আমরা বাস্তবটাকে যেন দেখতে পাই আমরা। নিজের বলতে যা কিছু তার সবটুকু ধুয়ে মুছে না ফেললে কারও দরজায় আশ্রয় নেই। তোরাবের মেয়ে সাকিনা তোরাবের ছেলে নুরু, তোরাবের বাচ্চারা যতক্ষণ না আর একজনকে 'বাপজান' বলে ডাকবে, যতক্ষণ না তাদের মা আর এক জনের সন্তানকে পেটে ধরতে রাজী হবে, ততক্ষণ তাদের মুখে দানা পানিও কেউ দেবে না। এসব চিন্তায় তার ভিতরের মানুষটা অসীম যন্ত্রণায় ছটফট করত জেলের মধ্যে আর দিন গুণত কবে সে তার পরিবারের কাছে যেতে পারবে। তোরাবের যন্ত্রণা বড়ো গভীর। সে বলে যে ওরা যদি কারও কাছে আশ্রয় পেয়েও থাকে, তার বদলে দিতে হয়েছে ইজ্জৎ। অবধূত নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত মুসলিম সমাজের হৃদয়হীনতার বাস্তব চেহারাটাই তুলে ধরেছেন। কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই মিলবে না, যদি সে কারও সঙ্গে নিকেয় না বসে থাকে। নিজের বলতে যা কিছু তার সবটুকু ধুয়ে মুছে না ফেললে কারও দরজায় আশ্রয় নেই। তোরাবের মেয়ে সাকিনা তোরাবের ছেলে নুরু---তোরাবের বাচ্চারা---

> "যতক্ষণ না আর একজনকে 'বাপজান' বলে ডাকবে, যতক্ষণ না তাদের মা আর এক জনের সন্তানকে পেটে ধরতে রাজী হবে, ততক্ষণ তাদের মুখে দানা

পানিও কেউ দেবে না।"[৫৫]

---পাঠক 'বশীকরণ' উপন্যাসে যেন দেখতে পান একজন অপরাধী যখন শাস্তি পায় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনা অপরাধে শাস্তি পায় সেই পরিবারের অনেকেই। ন্যায় বিচার যদি করতেই হয় আগে নিরপরাধের শাস্তি না হয় সে ব্যাপারটা সুনিশ্চিৎ করা প্রয়োজন। কথকের মুখে লেখক তোরাবের সেই অসহায়তার কথা বলেছেন। জেলবন্দী তোরাব বেদনায় মূক হয়ে যেত। কথাহারা হলে তার সেই কটা চোখের চাহনি তখন বাকি টুকু বলে দিত। কোনও পশুকে বেঁধে খাঁড়ার তলায় গলাটা টেনে ধরলে যে ভাষা তার চোখে ফুটে ওঠে, সেই মর্মান্তিক অসহায় ভাষা যেন মুখর হয়ে উঠত তোরাব আলির দুই চোখে। প্রাণ ফেটে তার কান্না বেরিয়ে আসত :

"আমার সাকিনা আমার নুরু হায় আল্লা, কে জানে আজ তারা কোথায় ! আর কি কখনও আমি তাদের ফিরে পাব?"[৫৬]

---এই উপন্যাসে জেলখানার কয়েদীদের ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণার কথা বাস্তবতার সাথে উঠে এসেছে। সংশোধনাগারে আসামীকে আটকে রাখার সাথে সাথে তাদের নিরপরাধ বাচ্চাদের কী হবে সে ব্যাপারে সরকার বাহাদুরকে ভাবতে হবে। অবধূত এ উপন্যাসে তা আমাদের শিখিয়েছেন। জেল-বন্দী মানুষের পরিবারের কথা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। অপরাধীকে শাস্তি দিতে আমরা যখন নিষ্ঠুর হয়ে উঠি তখন যেন নিরপরাধের শাস্তি না হয় সেদিকটাও আমাদের ভাবা উচিত। ন্যায়বিচারের প্রার্থী সব সুস্থ নাগরিক; কিন্তু পাওয়ার উপায় কী---এসব প্রশ্ন তুলেছেন এবং উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন বলে অবধূত শতবর্ষেও সমান প্রাসঙ্গিক বলে আমাদের মনে হয়েছে।

অবধূতের দৃষ্টি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলি বিষয়কে সুস্পষ্ট করেছে। ধর্মের ভয়ে আমরা অবিবেচনায় অনেক কাজ করে ফেলি। সেখানে দেবতার মাহাত্ম্য যে ক্ষুণ্ণ হয় একথা ক'জনে মাথায় রাখেন? অবধূত এও দেখেছেন দেবমন্দিরের এমন দুর্দশা হয় যে দেবতার করুণা ভিক্ষার কথা আর মনের কোণেও আসে না। বরং দেব মন্দিরের ভগ্ন দশায় দেবতার প্রতি করুণা হয়। অন্যদিকে দেবতার সেবার নামে পাণ্ডার অত্যাচার দেবমাহাত্ম্যকে নষ্ট করে বামন-পুরুতের নির্দয়তাকেই বড় করে তোলা হয়। 'হিংলাজের পরে' উপন্যাসের এগারো পরিচ্ছেদে বলেছেন :

- "মন্দির যদি বানাতেই হয় তবে মনের মধ্যেই বানানো শ্রেয়। অবহেলা পাবার জন্যে দেবতাকে পাষাণকারায় বন্ধ করা কিছুতেই উচিত নয়।"
- তেরো পরিচ্ছেদে :"বেচারা ঈশ্বর ঐ জ্বরাজীর্ণ মন্দিরের মধ্যে বসে মাথা কপাল চাপড়াচ্ছেন হয়তো, উঠে হেঁটে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এসে চেলাদের বাধা দেবেন সে উপায় নেই। ঈশ্বরকে পাকাপোক্ত ভাবে পাথরের মধ্যে পুরে পাথরের সঙ্গে গেড়ে ফেলা হয়েছে যে, নড়বেন কেমন করে?"

---এর মধ্যে দিয়ে রসিক অবধূত যে বার্তা দিলেন তা হলো মানুষ ভগবানের কল্যাণময়

রূপকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। কোটেশ্বর মন্দিরের নিয়ম হলো ত্রিশূল গরম করে হিন্দু ভক্তকে তার ছাপ বসিয়ে নিতে হবে। জায়গাটা পুড়ে গিয়ে সারা জীবনের জন্য চিহ্ন রেখে যাবে। এর জন্য পাণ্ডারা আড়াই টাকা করে পাবে। মুসলমান বিদ্বেষ এতটা গভীর যে হিন্দু যদি তাদের সংসর্গে যায় তবে তাকে যবনত্ব ঘোচাবার জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত্য করতে হবে। ভৈরবী মাকে যবনত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কোটেশ্বরের পাণ্ডারা নির্মমভাবে গরম লোহায় দেগে দিল। ভৈরবী ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো। নাকে দাগা দেওয়ার ফলে মুখ ফুলে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। এমতাবস্থায় তাঁকে যবনরাই সেবা শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুললো। পাণ্ডারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দাঙ্গা বাধিয়ে দিল। ঢাল সড়কি নিয়ে নেমে পড়লো সবাই। হিন্দু ভক্তদের তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। কথক হিন্দু পাণ্ডাদের টাকা না দিয়ে হৃদয়বান মুসলমানদের জলের সমস্যা দূর করার জন্য ভৈরবীর কাছে রাখা সমস্ত টাকা দিয়ে ওদের ব্যবহারের জন্য কুয়ো খুঁড়তে সব দান করলো। অবধূত দেখালেন মানবধর্মই সকল ধর্মের সেরা। আমরাও আমাদের সামাজিক কর্তব্য কী তা আমরা বুঝতে পারি।

অবশেষে আমরা সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনার শেষ পর্বে পৌঁছে বলতে পারি কঠিন সাধনার মাধ্যমে সফলতা পাওয়া সম্ভব---কোনো ফাঁকির কাজে সাফল্য আসে না---অসীম ধৈর্য আর নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম---এ দুটিই একমাত্র অবলম্বন। 'মরুতীর্থ হিংলাজ'(১৯৫৪), 'নীলকণ্ঠ হিমালয়'(১৯৬৫) সর্বত্র---এই দুর্গমতা আমাদের পরিশ্রমী হওয়ার শিক্ষা দেয়। প্রাপ্তিতে নয় ত্যাগে সকল শান্তি লুকিয়ে থাকে। আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে আছে। এছাড়া কর্মফলের ভোগান্তি চিত্রিত হয়েছে 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী'তে, প্রসন্ন পরোপকারে নিজের যন্ত্রণার উপশমের বার্তা আছে 'পথভুলে' উপন্যাসে,ক্ষমার চেয়ে বড় ধর্ম নেই সেকথা আমরা জেনেছি 'মরুতীথ হিংলাজ' উপন্যাসটি পড়ে।

সমাজবিরোধী বলে যারা সমাজে চিহ্নিত তারা বেআইনী কাজ করে তার ফল ভোগ করে। বড়জোর আইনের চোখ এড়িয়ে কেউ কেউ বেঁচে যায়। সমাজে বসবাসকারী মানুষের---এসব কথা অজানা নেই। কিন্তু বাইরে থেকে যাঁরা অত্যন্ত ভদ্র-সভ্য---হয়তো দেশনেতা; তাঁরাই চোর-ডাকাত পুষে রাখেন অবধূত সেকথা আমাদের জানিয়েছেন 'বিভ্রম' গল্পে। এরা ভাড়া করা সমাজবিরোধী। এদের একান্ত গোষ্ঠীগত কথা রাতের অন্ধকারে শুনে নিয়েছে বক্সী। তারা জানে ডাকাতির সময় খুন-জখম হলে কোনো ভয় নেই :

> "কেউ আমাদের সন্দেহই করবে না! তাছাড়া কংগ্রেসী বাবুরা আমাদের হয়ে লড়বে। থানার দারোগা তো কংগ্রেসী বাবুদের হাতের মুঠোয়।"[৫৭]

তাদের কথা শুধু কথার কথা নয়---প্রতিশোধ পরায়ণ হলে রাজনৈতিক নেতারা পারেন না এমন কাজ নেই। গুণ্ডা-বদমাইশদের তারা পুষবেই। সাদা পোশাকে কাদা না লাগিয়েও তাদের কাজটা হাঁসিল করতেই হয় ,আর এজন্য এদের তো লাগবেই। ভোটে জেতার সময় যারা টাকা ঢালেন রাজনীতির লোকেরা তাকেই অন্যায় কাজে সমর্থন করবে। রাতের অন্ধকারে ডাকাত-দলের কথাবার্তায় তা সুস্পষ্ট হয়ে যায় :

> "দেওয়ান বাড়ির কথায় চৌধুরী বাবুদের গদিতে হাত দিলে রক্ষে থাকত নাকি? গুষ্টিকে গুষ্টি শেষ করত কংগ্রেসী বাবুরা। ওঁনারাই তো আজকাল কংগ্রেসে টাকা ঢালেন।"[৫৮]

---অবধূতের কথাসাহিত্য পড়লে তথাকথিত দেশহিতৈষী রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হতে পারে। সমাজের সত্যকার রূপ চিনতে অবধূত সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁর রচনা বিশ্লেষণ করে বারবার একথা মনে হয়েছে আমাদের।।

অনেক সময় মৃতের সহযাত্রীদের বিরাট শোভাযাত্রা দেখে লোকটিকে আমরা শ্রদ্ধেয় কোনো ব্যক্তি বলে অনেক সময় ভাবি। অবধূত দেখালেন যে মরণযাত্রায় যারা সঙ্গে থাকে তারা যে সব সময় ভালোবেসে থাকে---এমনটা না হতেও পারে। 'ডঙ্কাদা'-র আকস্মিক প্রয়াণে যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়েছিল তা দেখে সেরকমই মনে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু লেখক শেষপর্যন্ত জানিয়ে দিলেন তার মৃত্যু মানুষের কাছে রেহাই পাওয়া ছিল। 'ডঙ্কাদা' গল্পটি স্মরণ করা যাক।

'ডঙ্কাদা'-র মৃত্যুর এই মহাযাত্রা আরম্ভ হোল ঠিক বেলা এগারোটার সময়। পাঁচ জায়গায় থামতে হোল। পাঁচ জায়গা থেকে ফুলের মালা দেওয়া হোল ডঙ্কাদার নশ্বর দেহের উপর। 'তারপর ঝাড়া আধ ঘন্টা এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে আমরা যথাস্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।'[৫৯]

রাত তখন ন'টা চন্দন কাঠের চিতা উঠল জ্বলে। বহু মানুষের বর্ণাঢ্য আবেগী শোকসভার প্রচার হোল কাগজেও। এমন একজন সমাজসেবীর অভাবে মানুষ বিষণ্ন হবেন এটাই স্বভাবিক ছিল ভাবা গিয়েছিল পূজার সময়ে তার অকালে চলে যাওয়ার কষ্ট এবারের পূজার আনন্দকে ম্লান করে দেবে। কিন্তু সে-সব কিছু হলো না। ডঙ্কাদার মৃত্যুর পরে কেটে গেছে এক বছর। আবার এসেছে পূজা। এবার গল্পের শেষে পৌঁছে লেখক জানালেন :

> "শেষে এসে গেল কালী পূজা। আমরাও তখন আবার লেগে গেলাম সর্বজনীন শ্যামাপূজার আয়োজনে। সেই পূজার রাত্রেই জানতে পারলাম সকলের হৃদয়ের কতখানি জুড়ে অধিষ্ঠান করছিলেন ডঙ্কাদা। কথা হচ্ছিল। মেয়েদের ওধারে ডঙ্কাদাকে নিয়ে। কে বললেন, 'মরেছে না হাড় জুড়িয়েছে সকলের।' কম বয়সী কয়টি গলার খিল খিল শব্দে হাসি উথলে উঠল।" [৬০]

সমাজে বসবাসকারী মানুষ হিসেবে সকলের যে আরো বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন, অবধূত তাঁর কথাসাহিত্যের নানা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে বিষয়ে বার বার সাবধান করেছেন বলে মনে হয়েছে আমাদের। অবধূতের শতবর্ষ পূর্তিতে আমাদের মনে হয়েছে আজকের পারিবারিক,রাজনৈতিক এবং সামাজিক সঙ্কটের ক্ষেত্রে তিনি এখনো বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

'সপ্তস্বরা পিনাকিনী' (প্রকাশকাল অজ্ঞাত) উপন্যাসে দেখা যায় মিনতি মিত্রকে কাজে লাগিয়ে টাকা রোজগার করে ধনীলোক হতে চায় তার স্বামী -পরশুরাম মিত্র। স্বামীর ইচ্ছাতে সে নেমেছে সমাজের ধনী-মানী বাড়ির পুরুষকে ফাঁসানোর কাজে। প্রেমে ফাঁসিয়ে ব্লাকমেল করে কোটিকোটি টাকা রোজগার করে মিনতি দিচ্ছে তার স্বামীকে। এই কাহিনি-সূত্রে নানা অসংযমী ভদ্রবেশির মুখোশ খুলেছেন অবধূত। লোকনাথ রায় তেমনই এক ভদ্রবেশী যশোলোভী সমাজ-সেবক। পরশুরাম মিত্তিরের সে একজন শিকার। পরশুরাম মিত্তির জানে :

"মান সম্মান খোয়াবার ভয়ে লোকনাথ এখন টাকা ঢালবে। বিলেত ফেরৎ ডাক্তার ছেলে, বিলেত ফেরত এঞ্জিনীয়ার জামাই, মস্তবড় লোকের ঘরে বিয়ে দিয়েছে ছেলের, সেই বড়লোক কুটুমরা, আর ওর ব্যবসা, সমস্ত ঘুচে যাবার ভয়ে টাকা ঢালবে। খবরের কাগজে ওর নাম ছাপা হয়, সভাপতি হোয়ে মালা গলায় দেয়, ধর্ম সমাজ ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দেয়। নারীকল্যাণ সমিতিকে কয়েক হাজার দান করেছে। আশা করে আছে যে ম'লে ওকে বিরাট শোকযাত্রা করে নিয়ে যাবে, ওর নামে রাস্তার নাম হবে।"[৬১]

লেখক দুদিক তেকে আমাদের সাবধান করেছেন। সম্মানীয় ব্যক্তিকে অবশ্যই সংযমী হতে হবে। মিনতি মিত্র বা পরশুরাম মিত-র মত লোককে বুঝতে হবে ফাঁকি দিযে বড় কিছু করা যায় না। সমাজের দায় লেখককে নিতে হবে এমন কথা অনেকেই স্বীকার করেন না। আমরা দেখেছি অবধূতের লেখার প্রকৃতিই এমন যে, তাঁর রচনার শিল্পগুণ পুরোপুরি বজায় থাকার পরেও একধরণের ব্যক্তিগত বা সমাজগত সতর্কতা পাঠক উপরিলাভ হিসেবে পেয়ে যান। বস্তুত আমরা অবধূতের কথাসাহিত্য যে একালেও প্রচুর ভাবে প্রাসঙ্গিক তা তাঁর নানা উপন্যাস ও গল্প বিশ্লেষণের সূত্রে দেখতে পেয়েছি।

সরকারি হাসপাতাল : সেবার নামে সর্বস্ব হরণ

'রাহী' এবং সন্ন্যাসী ব'লে অবধূত কেবল আত্মমগ্ন ছিলেন না, এমনকি তিনি নিসর্গ-পাগলও নন। তিনি মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত ছিলেন । সমাজের নানা বিচ্যুতি তাই তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি বিশেষভাবে দেখেছেন যে, রোগীকে রোগমুক্ত করার জন্য সরকার হাসপাতাল করেছেন। সেই হাসপাতালে নারকীয় কাণ্ড চলে। রোগমুক্ত করার মহান ব্রত তাঁদের নেই, রোগীরা তাঁদের ব্যবসায়ের উপকরণমাত্র। এখন যা দেখা যাচ্ছে তা হলো নিষ্ঠুরতায় এঁরা পিশাচকেও হার মানান।'পিশাচেও বোধ হয় পারবে না এ রকম কাজ করতে'---সিস্টার বললেন। অবধূত অত্যন্ত নির্লিপ্ততার সাথে তা জানিয়েছেন। হসপিটালের মেট্রন সিস্টার আলো ব্যানার্জির মুখ থেকে সরকারি হাসপাতালের খবর দিয়েছেন লেখক :

"শুনুন তাহলে। রাত ন'টার সময় এক বউ অপারেশন টেবিলে মারা গেল। ভোর বেলা তার আত্মীয়রা এল সংবাদ নিতে। ডাক্তার-বাবু অম্লান বদনে বললেন তাদের, এই ইনজেক্শন আর এই সমস্ত ওষুধ এখনই কিনে দিতে হবে। অবস্থা ভাল নয়। ছুটল তারা ওষুধপত্র আনতে। এনে দিল ডাক্তার-বাবুকে। সেগুলো তিনি হজম করে ফেললেন। ওধারে তারা বসে আছে। ডাক্তারবাবু ব্যস্ত মানুষ, তাঁর তো একটা রুগী নয়। দৌড়াদৌড়ি করছেন। ঘন্টা দুয়েক পরে ডাক্তার তাদের জানিয়ে দিলেন, সর্বরকম চেষ্টা করেও বউটি মারা গেল। আরও এক ঘন্টা পরে খাটিয়া এনে মুর্দফরাসকে বকশিশ দিয়ে ঠাণ্ডা ঘর থেকে তারা লাশ পেলে।"[৬২]

---স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বসে থাকা সব ডাক্তার কর্তব্যপরায়ণ নন।---অনেকেই নির্লজ্জ অর্থপিশাচ-

--ছিনতাইকারীরও অধম। 'সপ্তস্বরা পিনাকিনী'(প্রকাশকাল অজ্ঞাত) উপন্যাসের চণ্ডীর মুখে শোনা যাক সরকারি হাসপাতালের খবর। একটা পান মুখে দিয়ে সে শুরু করল যে সরকারি হাসপাতালে মাইনে নিচ্ছে গুনে গুনে অথচ তার জন্য নির্দিষ্ট করা যে কাজ তা করবে না, ফাঁকি দেবে। যারা ফাঁকিবাজ বা অসৎ নয় তারা সেটা যদিবা সহ্য করে তবে ঐ চুরি করা আর ছ্যাঁচড়ামো করাটা বরদাস্ত করে কীভাবে? দুই একজনের প্রতিবাদে কিছুই হয় না। তাই হাসপাতাল গুলো অধিকাংশই হয়ে উঠেছে চোরের আড্ডা- যে যা পারে সরায়---সরকারি হাসপাতালের কর্মচারীরা এসব কাজ অভ্যাসে করে তার কাজে লাগুক চাই না লাগুক। যেসব সাধারণ মানুষ ডাক্তারদের এরূপ চেনেন না, তাঁদের সাবধান করেছেন অবধূত। মানুষকে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে সাবধান করেছেন। লেখক হিসেবে সার্থক অবধূত সামাজিক দিক থেকেও একালে তাই সমধিক প্রাসঙ্গিক।

বনমালী লস্কর : প্রকৃত ধার্মিক

সমাজ দেহে ব্যাধির কথা যেমন অবধূতের কথাসাহিত্যে এসেছে তেমনি, আত্মপ্রচার বিমুখ মানুষের মহত্ত্বও তিনি শুনিয়েছেন। সমাজে ভালো মানুষেরা নীরবে কাজ করে যান। অবধূতের কলমে তাঁরা অমর হয়ে আছেন। এঁদের জীবন থেকে সমাজের শিক্ষা হয়। 'সাচ্চা দরবার' উপন্যাসে দেখি অগুণতি উপার্জন করেছেন বালিখাদানের মালিক বনমালী লস্কর। শহরে অফিস খুলেছেন হাজার হাজার বালি ভর্তি লরি পাঠিয়েছেন শহরে আর সিন্দুকে ঢুকেছে সীমাহীন অর্থ। উদার-হৃদয় বনমালী লস্কর মানুষের কষ্ট সইতে পারতেন না। সব দুস্থ মানুষকে নিজের পরিবার ভুক্ত জেনে পাশে দাঁড়াতেন। মন্দির পূজা -এসবের ধার ধারতেন না। দান করবার কথা শুনলে উনি খেপে উঠতেন। দান করার মত নির্লজ্জ স্পর্ধা ছিল না তাঁর, কিন্তু কখন কার কি দরকার পড়ে তার খোঁজ রাখবার গরজ ছিল। দরকার পড়লেই হল, লস্কর মশাই তৎক্ষণাৎ টের পেয়ে যেতেন দরকারটি, এবং সেই দরকারটিকে নিজের দরকার বলে জ্ঞান করতেন। আশপাশের দশ বিশটা গ্রামের সব মানুষের আপদে বিপদে নিজেই যুক্ত হয়ে যেতেন। দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। ফলে দান করা আর হয়ে উঠত না। সমস্ত দায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিতেন । তথাকথিত দান-ধ্যান একদম না করে বিশখানা গাঁয়ের যাবতীয় মানুষকে কাঁদিয়ে সজ্ঞানে শিবলোকপ্রাপ্তি হল যেদিন লস্কর মশায়ের, সেদিন ওঁর বড় বড় লোহার সিন্দুকগুলোয় কি ছিল কত ছিল কেউ জানতেও পারল না। লেখকের কাজ সত্যকে জানা এবং জানানো। বাইরের ব্যবসায়ী পরিচয়ের আড়ালে বনমালী লস্করের যে একটা বিরাট হৃদয় আর বিশাল চেতনা ছিল তা অবধূত জানালেন। এধরনের ঘটনার প্রতি মানুষের কৌতূহল চিরকালই থাকবে। অবধূতের প্রাসঙ্গিকতা তাই বাংলাসাহিত্যে আজও বর্তমান।

অবধূতের সবচেয়ে উল্লেখ্য তাঁর সত্য-সন্ধানী দৃষ্টি শক্তি---কোথাও তার ব্যত্যয় হয় না। 'সাচ্চাদরবার' উপন্যাসে তিনি দেখেছেন যে দু:খী মানুষরাই আসছে। শহরের পথে যারা রিক্শা টানে, মাল টানে, ইঁটের নৌকায় যারা ইঁট বোঝাই করে, যারা হাটে বাজারে রেলস্টেশনে মোট

বয়, যারা ফিরিওয়ালা,যারা গরুর গাড়ি মোষের গাড়ি চালায়, যারা ফুটপাথ শুয়ে রাত কাটায় তারা সবাই আসছে তাদের অনন্ত দুঃখের পসরা নিয়ে। গঙ্গাজলের সঙ্গে বুকভাঙা হাহাকার মিশিয়ে তারা আশুতোষকে স্নান করাবে।

কণ্ঠে যিনি হলাহল ধারণ করে আছেন, তিনিই পারেন মানুষের অনন্ত দুঃখ মাথা পেতে নিতে। দুঃখের বোঝা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে যাবে সবাই। ফিরে গিয়ে নব উদ্যমে আবার দুঃখের সঙ্গে লড়বে। সাধারণ মানুষের বঞ্চনার প্রসঙ্গে রেশন দোকানের কুকীর্তির কথাও বলেছেন। চাল বা গমের সাথে কাঁকর মেশানো চিনির বস্তায় একমগ করে জল ঢালা এসব প্রসঙ্গ এসেছে বলে এর মধ্যে উপন্যাসের নিখুঁত দৃষ্টিশক্তির পরিচয় মেলে। মাঝে মাঝে সরস মন্তব্য অবধূতের রসিক মনের পরিচয়বাহী :

> "এখন মাসে দশটা দিনও দোকানে যেতে পারেন না, বিঘোষণ দোকান চালায়। ভালোই চালায়। ভালই চালাচ্ছে। ভালভাবে না চালালে মুরলী দেবী এবং তাঁর দুই বোনের অত শাড়ী ব্লাউজ জুতোর দাম আসছে কোথা থেকে? অত টাকা চাঁদাই বা দেন কি করে মুরলী দেবী অ্যামেচার ক্লাবে।"[৬৩]

---মুরলী দেবীর আজ্ঞাবাহী বকরাক্ষস ভুজঙ্গ সরকারের চাকর। জাতে বাগ্দী এই লোকটি জ্যান্ত পাঁঠা কামড়ে খেতে পারে। জনসমক্ষে একদিন এক ফাংশন ওয়ালা বক রাক্ষসকে দিয়ে ঐ বীভৎস শো-টি দেখাতে গিয়েছিল, ফলে মাসখানেক বককে জেল খেটে আসতে হয়। তারপর থেকে জ্যান্ত পাঁঠা খাওয়া সে ছেড়ে দিয়েছে; সুবিধে পেলে কেজিখানেক কাঁচা মাংস সে খেয়ে ফেলে। দরকার পড়লে লাঠি হাঁকড়ে বিশ-পঞ্চাশটি লোককে সে খতম করে দিতে পারে। সেই গুণের জন্য দুষ্ট ব্যবসায়ী ভুজঙ্গ সরকার তাকে পুষেছিল। সে একবার সামলেও ছিল। অত্যধিক পরিমাণে ধুলো বালি-কাঁকর মেশানো চাল গম দেওয়ার দরুন একবার শতখানেক মানুষ সরকার মশায়ের দোকান লুঠতে এসেছিল। বকের সাহস আর বীভৎস শক্তির জন্য কিছুই করতে পারেনি। বকের লাঠি খেয়ে জনা-দশেককে যেতে হয় হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ঢোকে জেলে কেননা সরকার মশায় তাঁর দোকান লুট হয়েছে বলে নালিশ ঠোকেন। এখানে অবধূত বাস্তব পরিস্থিতি কেমন হতে পারে তা দেখিয়ে প্রতিবাদের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলেন। একজন দোষী ডিলার রেশন কেলেঙ্কারীতে না ফেঁসে ভুল পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জনগণকেই ফাঁসিয়ে দিল। এই জাতীয় শিক্ষা সাহিত্যের রসবোধের ধারায় মিশে গেছে বলে আমাদের কোনো বিরক্তি আসে না। বরং এ শিক্ষা জীবনেও কাজে লাগে। তাই আমাদের মনে হয় অবধূত আজকের প্রতিবাদ-মুখর সমাজব্যবস্থায় যথেষ্টই প্রাসঙ্গিক।

অবধূত শেঠ সমাজের একটি বড় অংশের মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এই চৌহান শেঠের মাধ্যমে। এরা ধর্ম পরায়ণ অথচ আত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষম। এরা হিংসুক নয় প্রতিবাদীও নয়--- দেব-দ্বিজে ভক্তিও অসামান্য! এদের সমাজে দান-ধ্যানের বহু দৃষ্টান্তও আছে। অবধূতের ভাষাভঙ্গি এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র।

> "শেঠানীকে সাথে নিয়ে শ্রীচৌহান বদরীনারায়ণ কেদারনাথ দর্শন করে এলেন।

> হরিদ্বারের সাধুরা মস্ত সভা করে শ্রী চৌহানকে ধর্মরক্ষক উপাধি দান করেন। দিল্লীর বড় বড় পত্রিকায় ছবিসুদ্ধ সেই সভার বিবরণ ছাপা হয়েছিল। সেই ছবিতেও বোলতা মাকড়া আর বৈতালকে চেনা যাবে।"[৬৪]

লেখক যেমন তার নামডাকের কথাও বলেছেন তেমনি তার স্বভাবের পরিচয় দিতে উল্লেখ করেছেন বোলতা, মাকড়া আর বৈতালের কথাও। অবশেষে শ্লেষ মিশ্রিত আত্মগত ভঙ্গিতে লেখক বলে যান যে কি আর করা যাবে, শ্রীচৌহানের সমাজে এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে একটি বা দুটি কালো কুচকুচে আট-ন-দশ বছরের মেয়ে পেলে নিজের শরীরের বিষটা নামিয়ে ফেলা যায়। ঐ বিষ নামাতে গিয়েই না প্রথমবার শ্রীচৌহান বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন! অর্থাৎ সাদামাটা ভঙ্গিতে ভয়ংকর সংবাদ পরিবেশন করেন সত্যের খাতিরে! তবে গলাবাজি করে প্রতিকারে অসমর্থ মিথ্যা নাটক করতে তিনি অসমর্থ।

> "সে-বছর অবশ্য সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি যোগিয়াকে আর যোগিয়ার ন'বছরের মেয়ে লয়লাকে। উঠেছিলেন বাজারে গুঞ্জরি বাড়িউলির ঘরে। সাচ্চা দরবারের কৃপায় সবই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হল। মেয়ের মুখ চেপে ধরে রইল যোগিয়া, শ্রীচৌহান তাঁর শরীরের বিষ নামালেন। কিন্তু তারপর সামলানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা বেহুঁশ হয়ে পড়ল, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তখন যোগিয়ার জামাকাপড় পর্যন্ত, মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে যোগিয়া পাগল হয়ে উঠল। যাইহোক কেলেঙ্কারি করেনি যোগিয়া। তারপর তো সন্তর্পণ ঠাকুর শ্রীচৌহানের সম্মান রক্ষা করলেন !"[৬৫]

---লেখক যেন বলতে চান সমাজে ভালো মানুষ আছেন , তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাঁরা সমাজসেবী ও দাতা বলে খ্যাত প্রকৃত পক্ষে তাঁরা তা নন। বাস্তবচেতনা সম্পন্ন অবধূত তাই এখানেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

অন্যদিকে সত্যকার বাঙালী ভক্ত চন্দ্রচূড়কে বাবার অন্য ভক্তরা এবার চিনতে বাধ্য হল। কেউ যা পারেনি চন্দ্রচূড় তা পেরেছে। বাবার দায়িত্ব আগে কেউ একা নিতে পারেনি। চন্দ্রচূড় তা ক'রে দেখিয়েছে।

তাঁর প্রকাশভঙ্গি এতটাই সুস্পষ্ট যে সমাজের অধঃপতনের চিত্র তাঁর কলমে এমনভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে বীভৎস আর কদাকার রূপের স্রষ্টা হিসেবে তাঁর গায়ে লেবেল পড়ে গেছে। প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করবো যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নয় ইতিবাচকতাই অবধূতের বৈশিষ্ট্য। মহাত্মা মহারাজ জটিলেশ্বরের বহু ধনী ভক্ত। এক কাপড়ের কলওয়ালা শিষ্য প্রেমজী ভাই দোসানি---ইনি নতুন বস্ত্র দান করলেন। যমুনাপ্রসাদজী ভাই যেসব ভক্ত বাঁক কাঁধে করে আসে তাদের মেওয়া দান করার জন্য খুলে ফেলেন সেওয়াসদন। হরসুখ লালজী ভাই এই যজ্ঞে দুজন চোখের ডাক্তার আরেক জন দাঁতের ডাক্তার এনে দাঁত তোলা আর চশমা দেওয়া করালেন বিনা খরজে। লেখক রসিকতা করে বলেছেন : 'সাচ্চা দরবারের ভোলে বাবা বোম্ বাবা জটিলেশ্বর বাবার প্রতাপ দেখে বোধ হয় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।'

বাবা জটিলেশ্বর কাউকেই অভুক্ত রেখে অন্ন গ্রহণ করেন না। সবার দুর্দশা শোনার পরে তাঁদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেন। চন্দ্রচূড় তাই বাবার সকল ভক্তের জন্য সবরকম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বশেষ অনুষ্ঠান ---তুলাব্রত সমাপন করলেন চন্দ্রচূড়। অতি ক্ষীণদেহী বাবাকে বসানো হল রুপোর চেনে বাঁধা থালার ওপর। আরেকটিতে দেওয়া সাড়ে বাইশ সের সোনা আর সাড়ে বাইশ সের রুপো এবার বাবার সমান হোলো। সেই রুপোর তুলাদণ্ড সুদ্ধ সোনারুপোর বাটগুলো শ্রীগুরু চরণে দক্ষিণা স্বরূপ অর্পণ করা হোল। এত সোনা রুপো রাখা বেআইনী কিনা সে প্রশ্ন উঠল না জটিলেশ্বর বাবা সমস্ত সোনা -রুপো দিয়ে দিলেন সরকারের হাতে। সরকার অন্ধদের হিতার্থে ঐ সম্পদ খরচা করবেন যুদ্ধের কাজে লাগানো যাবে না। দিন পনের পরে বিদায় হলেন জটিলেশ্বর বাবা। সঙ্গে সঙ্গে লোকে জানতে পারল চন্দ্রচূড় একদম ফতুর হয়ে গেছেন। মায় সেই মুদিখানাটাও বিক্রী হয়ে গেছে। অবধূত সত্যকার সমাজসেবক কেমন হবেন তার একটা মডেল এখানে দেখালেন। এই চরিত্রটি অনুসরণযোগ্য। তেমনি জনসাধারণও দেখতে পেলেন সম্মানীয় মানুষ কেমন হয়ে থাকেন।

'দুরি বৌদি' বা 'শুভায় ভবতু' উপন্যাসে সমকালীন কলকাতার ছবি পাই। পাশাপাশি উঠে এসেছে পূর্ববাংলায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতার লড়াই। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাঁধিয়ে মজা লুটেছে ইংরেজ শাসকেরা। বাংলার উচ্চশিক্ষিত এবং উদারচেতা মানুষেরা দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁদের আহ্বানে বুঝে না বুঝে এসেছে প্রচুর দেশবাসী যুবক-যুবতীরা। ইংরেজ বিতাড়নের পরে দেশটা যাদের হাতে পড়বে তারা যদি নিজেকে উপযুক্ত করে গড়তে না পারে তাহলে দেশের মানুষ অনুশোচনা করবে কেন ইংরেজ বিতাড়ন করা হলো। এমন ভাবনার কথাও উপন্যাসে এসেছে। সরকারের পক্ষে যারা লড়ছে তারা সকলেই যে ইংরেজ তা তো নয়! এ দেশের মানুষই সরকারী কর্মচারী। কেউ পুলিশ কেউ পুলিশের খবর সংগ্রহকারী চর বা স্পাই। আবার যাঁরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা একভাবে ভাবছেন না। কেউ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা আনতে আগ্রহী আবার কেউ আলোচনার পথে দেশকে স্বাধীন করতে চান। যাঁরা দেশের স্বাধীনতা আনতে ইংরেজদের বিতাড়নের স্বপ্ন দেখেন তাঁদের গুলিতে যে কেবল ইংরেজরা মরবে এমন তো নয়। দেশের মানুষও মরবে। দেশবাসী সবাই যে শত্রু তা নয়---এমন কি সরকারি কর্মচারিরাও শত্রু নয়। বিপ্লবীরা বোঝেন সরকারি মাইনে নিয়ে তাঁরা চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। তাই পুলিশের পদস্থ অফিসার হওয়ায় ব্রজমাধব দেশের শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের না গ্রেপ্তার করে পারেন না।

নানা সমস্যা এ উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। এ উপন্যাসে বিজয়ী ইংরেজদের বর্বরোচিত ব্যবহারও উঠে এসেছে। সাহেবদের আজ্ঞাবাহী হয়ে ব্রজমাধব জেলেদের মেয়েকে তুলে নিয়ে এলো আর সাহেবরা তাকে ছিবড়ে করে ফেরৎ দিয়ে এলো। এই ঘটনার পরে ব্রজমাধবের স্ত্রী ও ছেলের ঘটলো মৃত্যু---দোষ গেলো দুরি বৌদির ওপর আসলে সে এ কাজ করেনি। করেছে ঐ অত্যাচারিতের পরিবার। লেখক এভাবে আরো বহু সামাজিক অত্যাচারের প্রতিশোধকে 'দুরি বৌদি'-র নামে চালিয়ে দিলেন। এদিকে দলে দলে তরুণ-তরুণীরা অস্ত্র

হাতে তুলে নিচ্ছে আর হত্যায় নেমে পড়ছে। লেখক এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

> ''আন্দামান ফেরৎ দাদা আর দাদার দাদারা প্লান করতে লাগলেন। রেজোলিউশন তারপর এক্‌শন।---মানুষ-মারাটা আর মানুষ মারা রইল না তখন। রেজোলিউশন অনুযায়ী সাকসেসফুলি মুভমেন্ট পরিচালনা করা হয়ে দাঁড়ালো।''[৬৬]

দুরি বৌদির নামে সবই চাপানো হতে লাগলো। ফলে ইংরেজদের পুলিশ বাহিনীর একটা বড় অংশ দুরি বৌদির পিছনে লেগে রইল। একদিকে ইংরেজ পুলিশ কর্তার পরিকল্পনা অন্যদিকে 'দুরি বৌদি'-র স্বামীর ফন্দি---দু'দিক থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে গেল 'দুরি বৌদি' নামের বিভীষিকা! দেশের ঘরে ঘরে পূজিতা হচ্ছেন দুরি বৌদি আর সরকারি পুলিশের ঘুম ছুটে যাচ্ছে এই দুরি বৌদির নাম শুনলে। দুরি বৌদি শেষপর্যন্ত হতাশার শিকার হলেন তুলে নিলেন কাগজ কলম। লিখলেন ডায়ারি। এখন তিনি সংসার জীবনে এসেছেন---অবশ্য তাঁর মহান দেশপ্রেমিক স্বামী দেশের বাইরে! দেশে রটে গেছে 'দুরি-বৌদি'-র মৃত্যু সংবাদ---আসলে একটি সাধারণ নারীর মৃত্যুকে 'দুরি'-র মৃত্যু বলে চালিয়ে দিয়েছেন ব্রজমাধব চৌধুরী। দুরির নামে মিথ্যা এক মৃত্যুর ঘটনা রটিয়ে আসল দুরিকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা করেছে সরকার। যখন সবাই দেখবে একটি নক্কার জনক মৃত্যুকে দুরির মৃত্যু বলে চালানো হচ্ছে তখন দেশের লোকই আসল খবর ফাঁস করে দুরিকে ধরিয়ে দেবে। এমনকি নিজের অহং বোধ থেকে নিজেও ধরা দিতে পারে 'দুরি বৌদি'---এমন একটা পরিকল্পনা ছিল পুলিশকর্তা ব্রজমাধবের মাথায়---এসব কথা আমরা উপন্যাসের শেষভাগে দুরির খাতা থেকে জানতে পারি। আমাদের মনে হয়েছে সমাজ-বিপ্লব বা রাজনৈতিক মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে আদর্শ-চালিত যুবক-যুবতীরা এ উপন্যাস পড়ে নিজের পথকে আরো ভালোভাবে চিনে নিতে পারবেন। আজকের দিনে অবধূতের প্রাসঙ্গিকতা তাই অনস্বীকার্য।

প্রসঙ্গনির্দেশ ও মন্তব্য

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২-২০১৩, পৃ. ৪২৮

২. দ্রষ্টব্য: ১৮.০৭. ২০২০ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা। দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায় ঘোষ -এর লেখা 'সংসার থেকে পালাতে গিয়ে অবধূত যেন বিশ্বসংসারের বাসিন্দা হয়ে গেলেন' শীর্ষক প্রবন্ধ।

৩. বহুব্রীহির সাধুত্বে উত্তরণ। দ্রষ্টব্য : চতুর্থ অধ্যায়,বহুব্রীহি(গল্পগ্রন্থ),বহুব্রীহি, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪

৪. অবধূতের চরিত্রসৃষ্টির একটি বহু চর্চিত শৈলী হলো একটি চরিত্রের মধ্যে বিপরীত স্বভাবের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ভিন্নতর একটি তৃতীয় চরিত্রগুণ আবিষ্কার করা। 'স্বপ্তস্বরা পিনাকিনী' উপন্যাসে চণ্ডী থেকে আলো বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরণ তেমনি। 'বহুব্রীহি'

ছোটগল্পে লম্পট বহুব্রীহি থেকে সেবাপরায়ণ মৌনী দণ্ডী মহারাজ হওয়া তেমনি এরকম পরিবর্তনের ধারায় নির্মিত চরিত্র।

৫. অবধূত, ভ্রমণ কাহিনী সমগ্র,মরুতীর্থ হিংলাজ, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ. ১৪৯-১৫০

৬. অবধূত,ভ্রমণ কাহিনী সমগ্র, মরুতীর্থ হিংলাজ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১৪৯-১৫০

৭. অবধূত, উদ্ধারণপুরের ঘাট, তুলি-কলম, পৃ. ১৯-২০

৮. অবধূত, টপ্পাটুংরি, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা,১৯৬৯,পৃ. ২৮

৯. The subjection of the individual, impulsive,sentiment self to the order of reason is a Herculean task' Ethical principles, Seth, Part-i, Chap - iii, p.201

১০. অবধূত , সপ্তস্বরা পিনাকিনী (প্রকাশকাল অজ্ঞাত) উপন্যাসে প্রিন্সিপ্যাল আসলে অত্যাচারিতা গ্রাম্যবধূ বিন্দুবাসিনীর আর একটি নাম। এখন তিনি হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন, দোষীর শাস্তি বিধান করেন। জীবনের পিন্সিপ্‌ল তিনি মেনে চলেন বলে তাঁর এখন নাম প্রিন্সিপ্যাল। তিনি কাইজারের মা।

১১. অবধূত, সপ্তস্বরা পিনাকিনী, পৃ. ৪৯

১২. ঐ, পৃ. ৫৬

১৩. ঐ, পৃ. ৬৫

১৪. ঐ, পৃ. ৬৭

১৫. ঐ, পৃ. ৬৮

১৬. ঐ, পৃ. ৬৯

১৭. ঐ, পৃ. ৭০

১৮. ঐ, পৃ. ৭২

১৯. ঐ, পৃ. ৭৫

২০. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকাননেনদের বাণী ও রচনা,(সঙ্কলন)বর্তমান ভারত,উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৭, পৃ. ২৮০

২১. অবধূতের লেখা 'স্বপ্তস্বরা পিনাকিনী'-তে পরশুরাম মিত্তির নিজের বিবাহিতা স্ত্রী মিনতি মিত্রকে ভাড়া খাটাতে গিয়ে শেষপর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ হলেন আর ব্যারিস্টার বাদল গুপ্ত কেবল টাকার পিছনে ছুটে অকালে হারালেন নিজের সম্ভাবনাময় ছেলে কাজল গুপ্তকে। কাজল একজন শিল্পী । সে আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করলো।

২২.· বুদ্ধদেব বসু, তপস্বী ও তরঙ্গিনী,চতুর্থ অঙ্ক, প্রকাশকাল, ১৯৬৬

২৩. অবধূত, সপ্তস্বরা পিনাকিনী,(প্রকাশকাল অজ্ঞাত) পৃ. ৭৬

২৪. ঐ, পৃ. ৭৮
২৫. অবধূত, কৌশিকী কানাড়া, কলিকাতা পুস্তকালয়, কলকাতা,১৯৬৩ পৃ. ৫৮
২৬. অবধূত, সপ্তস্বরা পিনাকিনী,(প্রকাশকাল অজ্ঞাত) পৃ. ৭৭
২৭. সব দেশে প্রতিরক্ষা সবচেয়ে বড় কথা। লড়াই যে-কোনো সময়ে বাধতে পারে দেশবাসীকে তাই সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।আমরা নিকট অতীতের কথা মনে করতে পারি ২৬.০২.২০১৯---০১.০৩.২০১৯ পাকিস্তান সীমান্তের লড়াই-এ পাকিস্তানে ধরা পড়েন উইং কম্যাণ্ডার অভিনন্দন ভারথামান। তাঁর বীরত্বপূর্ণ আত্মপ্রকাশে গোটা দেশ গর্ব বোধ করে। তিনি ষাট ঘন্টা বন্দী ছিলেন। গোটা দেশবাসী তাঁর নির্ভীকতায় গর্বিত। সাধারণ মানুষ দেশপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ। ০৫.০৫.২০২০ থেকে লড়াই চলছে ভারত-চীনা সীমান্তে আজ পর্যন্ত। ভুললে চলবে না যে চীন এখনও আগ্রাসী।
২৮. অবধূত, কৌশিকী কানাড়া, কলিকাতা পুস্তকালয়, কলকাতা,১৯৬৩, পৃ. ৭৫
২৯. পিয়ারী দুটি বড় গল্পের সংকলন। প্রথম গল্পের নামেই এ গ্রন্থের নামকরণ করেছেন লেখক---'পিয়ারী' অন্য বড় গল্পটির নাম 'দাবানল'---এটি ৭৯ পৃষ্ঠার উপন্যাস-কল্প রচনা। একে বড় গল্পও বলা যেতে পারে। তবে এতে ঔপন্যাসিক-সুলভ বৈশিষ্ট্য বেশ স্পষ্ট রেখায় আঁকা হয়েছে। জীবনের খণ্ড মুহূর্তের চিত্রণ যেখানে ছোটগল্পের অবলম্বন হয় সেখানে 'দাবানল'-এ ত্রিবেদী পরিবারের দেশান্তরে আগমন বসবাস এবং জীবনের দীর্ঘ সময়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।
৩০. অবধূত, পিয়ারী (গল্পগ্রন্থ), দাবানল(উপন্যাস-কল্প রচনা), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬১ পৃ. ৫৬
৩১. ঐ, পৃ. ৫৬
৩২. ঐ, পৃ. ৫৬
৩৩. ঐ, পৃ. ৫৬
৩৪. অবধূত, বশীকরণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৬০, পৃ. ১৫২
৩৫. ঐ, পৃ. ১৫৫
৩৬. অবধূত, পথভুলে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৬২, পৃ. ১২
৩৭. ঐ, পৃ. ১১
৩৮. ঐ, পৃ. ১৬
৩৯. ঐ, পৃ. ১৬
৪০. ঐ, পৃ. ১১৫
৪১. ঐ, পৃ. ১৫২
৪২. ঐ, পৃ. ১১৫
৪৩. ঐ, পৃ. ১১৫

৪৪. ঐ, পৃ. ১১৫
৪৫. ঐ, পৃ. ১১৫
৪৬. ঐ, পৃ. ১১৫
৪৭. ঐ, পৃ. ১১৫
৪৮. ঐ, পৃ. ১১৫
৪৯. ঐ, পৃ. ১১৫
৫০. ঐ, পৃ. ১১৫
৫১. অবধূত, বহুব্রীহি(গল্পগ্রন্থ), ইজ্জত.মিত্র ও ঘোষ,তৃতীয় মুদ্রণ,ডিসেম্বর, ১৯৬৪, পৃ. ১৬৫
৫২. ঐ, পৃ. ১৬৫
৫৩. অবধূত, শুভায় ভবতু, সুখ শান্তি ভালবাসা, তুলি-কলম, কলকাতা প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৭৮, পৃ. ১৩
৫৪. অবধূত, বশীকরণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,১৯৬০, পৃ-৫৬
৫৫. ঐ, পৃ-৪৩
৫৬. ঐ, পৃ-৬৫
৫৭. অবধূত, বহুব্রীহি (গল্পগ্রন্থ), বিভ্রম, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ১৫৪
৫৮. ঐ, পৃ. ১৫৪
৫৯. অবধূত, বহুব্রীহি(গল্পগ্রন্থ),ডঙ্কাদা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ২২৩
৬০. ঐ, পৃ. ২২৪
৬১. অবধূত, সপ্তস্বরা পিনাকিনী (প্রকাশকাল অজ্ঞাত), পৃ. ২৪
৬২. ঐ, পৃ. ২৪
৬৩. অবধূত, সাচ্চা দরবার, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃ. ১২
৬৪. ঐ, পৃ. ১১
৬৫. ঐ, পৃ. ৮
৬৬. অবধূত, শুভায় ভবতু, সুখ শান্তি ভালবাসা, ১৯৭৮, তুলি-কলম, পৃ. ২১২

পরিশিষ্ট

(গবেষণা অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত দুষ্প্রাপ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার চিত্র, দুষ্প্রাপ্য উপাদানের প্রতিলিপি, অবধূতের পরিচিত বিভিন্ন ব্যক্তির আলোকচিত্র ও ফটোকপি –ইত্যাদি।)

পৃষ্ঠা

- অবধূতের বংশ-লতিকা ৪৬৩
- পারিবারিক অ্যালবাম ৪৬৪
- অবধূতের হস্তাক্ষর ৪৬৭
- অবধূত স্মারক ৪৬৮ - ৪৭১
- অবধূত বিষয়ে সাক্ষাৎকার ৪৭২ - ৪৭৪
- অবধূতের গ্রন্থ বিষয়ক তথ্য ৪৭৫ - ৪৯৪
  ক. চলচ্চিত্রে অবধূত–সমকালের মূল্যায়ন: দ্রষ্টব্য 'জাগরণ পত্রিকা' ৪৯০
  খ. 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' সম্পর্কে সমকালের মূল্যায়ন ৪৯৪

১. অবধূতের বংশ লতিকা : (দ্রষ্টব্য: প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩২)

রামরাম মুখোপাধ্যায়

গোপাল মুখোপাধ্যায়

অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়
+
(স্ত্রী :প্রভাবতী দেবী)

দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সুখময়ী , সরোজিনী (দ্বিতীয় পক্ষ)

(নিঃসন্তান)

মৃণাল মুখোপাধ্যায়
(স্ত্রী ধীরা)

তপন, তুষার, আলপনা রুবি বিপাশা

লক্ষ্মীমণি,সরস্বতী,অনুকনা,তুলিকনা

অমল মুখোপাধ্যায়
(স্ত্রী : সূচনা মুখোপাধ্যায়)

তারাশঙ্কর
(স্ত্রী : বর্ণালী)

অন্বেষণ

সংকর্ষণ
(স্ত্রী : শর্মিষ্ঠা)

(অবধূতের দুলাল মুখোপাধ্যায়ের সম্ভাব্য বংশলতিকা, দীপ্রকলম ২০১০.পৃ.
থেকে সংগৃহিত। দ্রষ্টব্য : গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় পৃ. ২৯-৩০)

২.পারিবারিক অ্যালবাম। নামের পাশে আলোকচিত্র সংখ্যা দেওয়া হয়েছে :

(দ্রষ্টব্য : গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের কিছু অংশ, পৃ. ২৯-৩৬)

চিত্র নং ক :অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় (অবধূতের বাবা, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩১)
চিত্র নং খ:প্রভাবতী দেবী (অবধূতের মা, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩১)
চিত্র নং গ:অবধূত দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চিত্র নং ঘ: প্রথমা স্ত্রী সুখময়ী দেবী ও অবধূত ,প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩১)
চিত্র নং ঙ অমল মুখোপাধ্যায় (অবধূতের পুত্র,প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩১)
চিত্র নং চ সরোজিনী দেবী (অবধূতের ভৈরবী,প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩১)
চিত্র নং ছ অমলের স্ত্রী সূচনা দেবী (প্রথম অধ্যায়,পৃ. ৩০)
চিত্র নং জ শর্মিষ্ঠা (সঙ্কর্ষণের স্ত্রী)
বর্ণালী (তারাশঙ্করের স্ত্রী)
অন্বেষণ(বর্ণালী-তারাশঙ্করের পুত্র)
চিত্র নং ঝ সঙ্কর্ষণ ও অন্যান্যরা (প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩২)
চিত্র নং ঞ অবধূত ,শিষ্যা ও তাঁর কন্যা (প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩১)
চিত্র নং ট অবধূত পুত্র অমল মুখোপাধ্যায় , স্ত্রী সূচনা দেবী এবং দুই পুত্র (প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩১))

২.অবধূতের পারিবারিক অ্যালবাম

'দীপ্রকল্সম'-এর সৌজন্যে অবধূতের বংশীয় ও পরিজনদের নীচের কয়েকটি আলোকচিত্রে দেখে নিতে পারি :

চিত্র নং ২/ক

অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় (অবধূতের বাবা)

চিত্র নং ২/ খ

প্রভাবতী দেবী (অবধূতের মা)

চিত্র নং ২/ গ

অবধূত ওরফে দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,'উদ্ধারণপুরের ঘাট'-এর অবস্থানের অব্যবহিত পরে (১৯৩৮ সালে প্রোমে গৃহিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় পৃ. -৩১ অংশ দ্রষ্টব্য)

চিত্র নং ২/ঘ

দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী সুখময়ী দেবী

চিত্র নং ২/ ঙ

অমল মুখোপাধ্যায় (অবধূতের পুত্র)

চিত্র নং ২/ চ

অবধূতের সাধন-সঙ্গিনী এবং স্ত্রী সরেজিনী দেবী।

চিত্র নং ২/ ছ

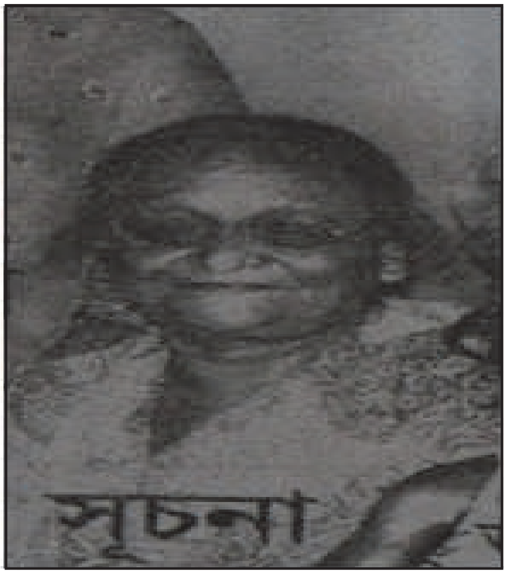

অমলের স্ত্রী সূচনা দেবী

চিত্র নং ২/ জ

দীপ্রকলম, ১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল - ২০১০, পৃঃ - ১৬

অমলের বড় ছেলে তারাশঙ্কর ও বর্ণালীর সন্তান অন্বেষণ ।

চিত্র নং ২/ ঝ

অবধূতের কোলে পৌত্র ,অমলের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ১৯.০৪.২০১৯ তারিখে পাওয়া।

চিত্র নং ২/ ঞ

অবধূত ,শিষ্যা ও তাঁর কন্যা

চিত্র নং ২/ ট

অবধূত পুত্র অমল মুখোপাধ্যায় , স্ত্রী সূচনা দেবী এবং দুই পুত্র

চিত্র নং ৩

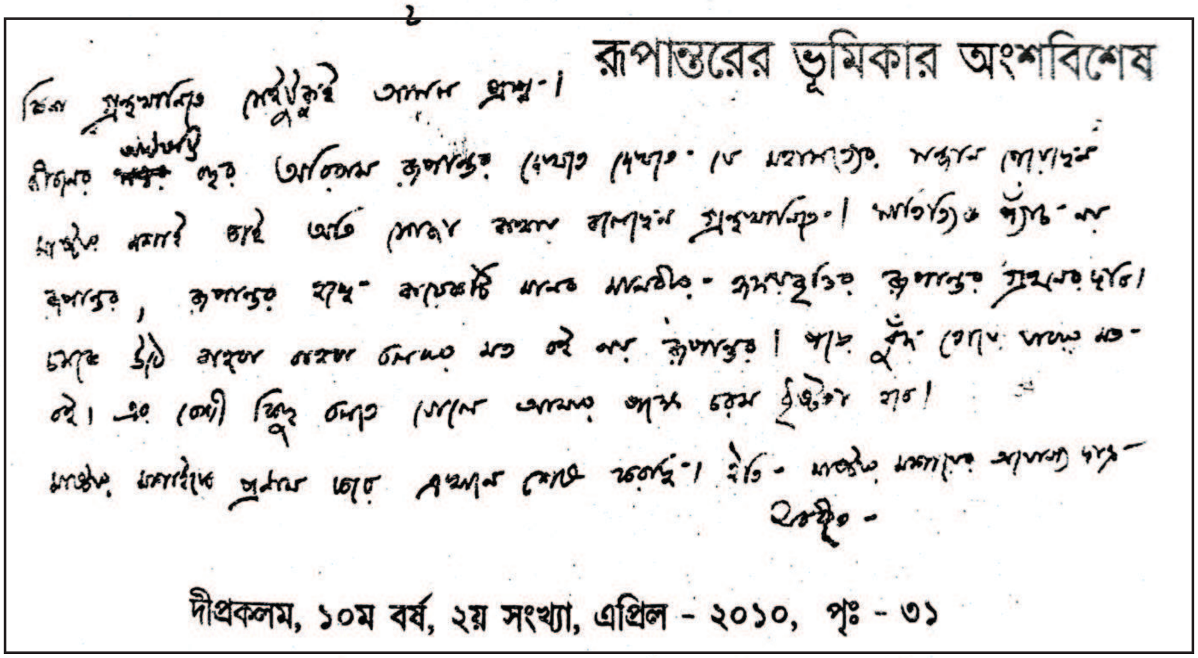

অবধূতের হস্তাক্ষর

সৌজন্যে দীপ্রকলম,১০ম বর্ষ, ২০১০, পৃ ৩১ থেকে ফটোকপিটি সংগৃহিত

চিত্র সংখ্যা ৪

উদ্ধারণপুরের মহাশ্মশান

দীপ্রকলম, ১০ম বর্ষ, ২০১০,পৃ. ২৪ থেকে চিত্রটি সংগৃহিত

চিত্র নং ৫

ক

খ

ক.জোড়াঘাটে অবধূতের পুরানো বাড়ি দীপ্রকলম,১০ম বর্ষ, ২০১০,পৃ.২২ থেকে চিত্রটি সংগৃহীত
খ. জোড়াঘাটে অবধূতের বর্তমান বাড়ি, আলোকচিত্রটি ১৯.০৪.২০১৯ তারিখে গবেষকের তোলা।

চিত্র নং ৬

অবধূতের জন্ম শতবর্ষের পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপি। সম্পাদক ,স্মৃতিরক্ষা কমিটি, চুঁচুড়া সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় পৃ. ৩১, দ্রষ্টব্য।

চিত্র নং ৭

সত্যের খোঁজে

অবধূত জন্ম শতবর্ষের উদ্‌যাপন: উপলক্ষে প্রসাদ পত্রিকা–এপ্রিল, ২০০৯ প্রকাশিত অবধূতের দুষ্প্রাপ্য চিত্র সহ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'সত্যের খোঁজে' প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার ছবি,চিত্রটি সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত ।

চিত্র নং ৮

জোড়াঘাটে অবধূতের বাড়িতে গবেষকের তোলা সাধকের
আরাধ্যা বিপরীত রতিতে রমণরতা দেবী কালিকার আলোকচিত্র।

চিত্র নং ৯

অবধূতের আবক্ষ প্রস্তর মূর্তির চিত্র :১৯.০৪.১৯ তারিখে
গবেষকের তোলা ছবি ।

চিত্র নং ১০

কেশবচন্দ্র নাগ,বিখ্যাত অঙ্কবিদ (টালিগঞ্জের ‘বুকব্রিজ’ নামে অবধূতের যে বইয়ের দোকান ছিল তার ক্রেতা,দ্রষ্টব্য পৃ. ৪৭২, চিত্রটি অর্ন্তজাল থেকে সংগৃহিত।)

চিত্র নং ১১

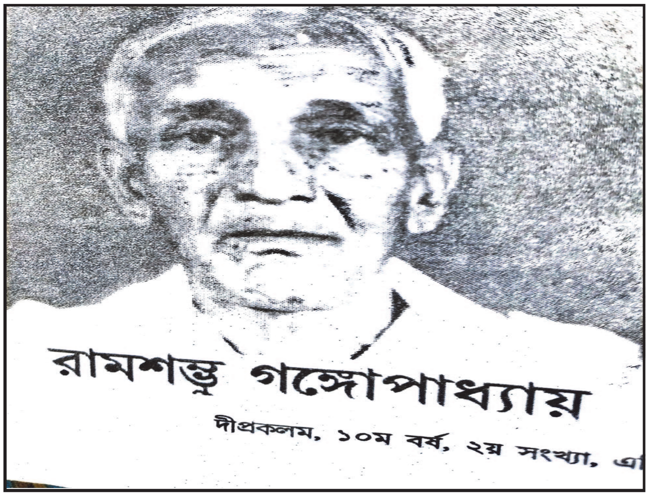

অবধূতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কীর্ণাহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক, রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়ের চিত্র, এঁকে অবধূত ‘একাঘ্নী’ নামের একটি উপন্যাস উৎসর্গ করেন, চিত্রটি দীপ্রকলম ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ. থেকে সংগৃহিত। দ্রষ্টব্যঃ প্রথম অধ্যায়ের পৃ, ৩১

১২ . অবধূতের পৌত্র তারাশঙ্কর ও অবধূতের পুত্রবধূ সূচনাদেবীর সাক্ষাৎকার

বিষয়: অবধূত
সাক্ষাৎকার দিলেন অবধূতের পৌত্র তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী : জয়ন্ত মিস্ত্রী।
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ১৯.০৪.২০১৯
স্থান: জোড়াঘাট, চুঁচুড়া,অবধূতের বাড়ি

অবধূতের জ্যেষ্ঠ পৌত্র তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের কিছু অংশ রেকর্ড করা হয়। তাঁর বক্তব্যের প্রথম দিকে লিখে নেওয়া হচ্ছিল। পরে তাঁর অনুমতিতে রেকর্ড করা হয়। ইনি অবধূত-পুত্র অমল মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পারিবারিক পরিবেশে উপস্থিত ছিলেন অমলের স্ত্রী সূচনা দেবী। তিনিও তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানিয়েছেন। কুমারী অবস্থায় অবধূত এঁকে দেখেই মন্তব্য করেন'এ বেটি আমাদের বাড়ি যাবেই।' সূচনা দেবীর মুখে একথা আমরা শুনলাম। ১৯২৮-১৯২৯ সাল নাগাত তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। তার তিন-চার বছর বাদে ১৯৩২-৩৩ সাল নাগাৎ পোর্ট ট্রাস্ট অফিসে মাসিক তিনশ টাকা বেতনে স্টোরকিপারের সমতুল চাকরি পান। ঘটনা চক্রে ইংরেজ-হত্যার দায়ে ফেরার হন। অবধূত খুব ভালো সাঁতার জানতেন।

অবধূত বা দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় -এর জন্ম এবং মৃত্যু তারিখ তাঁর জোড়াঘাটের বাসগৃহের আবক্ষ মূর্তির নীচে প্রস্তর ফলকে খোদিত হয়ে আছে। প্রস্তরফলক অনুসারে অবধূতের জন্ম: ২.১১.১৯১০ এবং মৃত্যু: ১৩.০৪.১৯৭৮। আমরা জানলাম চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে তিনি চল্লিশটি গ্রন্থই রচনা করেন। 'মরুতীর্থ হিংলাজ' এ বাড়িতে আসার আগেই লেখা হয়ে গিয়েছিল। অবধূতের অধিকাংশ উপন্যাস 'কথাসাহিত্য* প্রকাশিত হত। জ্যেষ্ঠ পৌত্র তারাশঙ্কর জানালেন টালিগঞ্জে 'বুকব্রিজ' নামে অবধূতের একটি বইয়ের দোকান ছিল । এই দোকানটি চালাতেন অবধূতের পুত্র অমল মুখোপাধ্যায়। পরে দোকানটি গণিতবিদ কে. সি নাগকে **বেচে দেন অবধূত । কে.সি নাগও পরে সম্ভবত দোকানটি বেচে দেন। অমল মুখোপাধ্যায় অবধূতের বইয়ের দোকানটি বেচে দেন কারণ কোলকাতায় খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে খুবই অত্যাচার চলছিল। যুবকদের প্রায় বিনা কারণে ধর-পাকোড় চলছিল। জীবনভোর জীবিকার প্রয়োজনে নানা কাজে যুক্ত হ'য়েছিলেন অমল। তারাশঙ্করের মুখে শোনা গেল এলাহাবাদে কুম্ভ মেলায় ১৯৫১ সালে পুণ্যার্থীদের টিকা দিতেন। পরে চলে আসেন বোম্বেতে। এরপরে বোম্বে থেকে চাকরি ছেড়ে চলে আসেন কোলকাতায়। টালিগঞ্জের বইয়ের দোকানটিও চালাতে পারেন নি।

পাদটীকা: * দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্টে কথাসাহিত্যের ফটোকপি। চিত্র নং ১৩ (পৃ.৪৭৫) এবং চিত্র নং ১৫ (৪৭৭) ।
** দ্রষ্টব্য: কেশবচন্দ্র নাগের আলোকচিত্র । চিত্র নং-১০ (পৃ. ৪৭১)

বহু বিখ্যাত মানুষের সাথে অবধূতের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নিজের স্বার্থে নয় অন্যের বিপদে তাই তিনি সাহায্য করতে পারতেন। পৌত্র তারাশঙ্কর জানালেন প্রভাবশালী বহু মানুষের মধ্যে আন্তরিক ছিলেন তুষারকান্তি ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, প্রফুল্ল সেন, অশোককুমার সরকার প্রমুখ। তুষারকান্তি ঘোষ ছিলেন যুগান্তরের সম্পাদক। অবধূতের ঘনিষ্ঠ ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি । গোয়ালন্দ নামক স্থানে অবধূতের সাথে তাঁর বন্ধ দরজার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হতো। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল সেন। ইনি আরামবাগ থেকে জিতে খাদ্য মন্ত্রী হন। পরে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। জনশ্রুতি এই যে স্বাধীনতার আগে থেকে দেশ চালায় দুই সরকার কেন্দ্রীয় সরকার আর অশোককুমার সরকার। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সম্পর্কে এখনো একথা খাটে। অশোককুমার সরকার ছিলেন আনন্দবাজারের তৎকালীন সম্পাদক। ইনি অবধূতের ছেলে অমল মুখোপাধ্যায়কে প্রিন্টিং টেকনোলজি পড়ে আসতে বলেছিলেন। পাশ করলে আনন্দবাজার বা টাইমস অব ইন্ডিয়ায় চাকরি দিতে চেয়েছিলেন। অবধূত তখন পুত্র অমলকে প্রিন্টিং টেকনোলজি পড়াতে পাঠান। এটি তিন বছরের কোর্স । অমল আই. এ পড়তে পড়তে চলে যান যাদবপুরে। প্রিন্টিং টেকনোলজির এটি প্রথম ব্যাচ ছিল। অমল আড়াই বছর পড়েন। তারপর ছেড়ে দেন। এর পরে চলে যান বোম্বেতে ।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন অবধূতকে বিপ্লবী পেনশন দিতে চেয়েছিলেন। অবধূত রাজি হননি। বলেছিলেন সাহিত্য সেবাই তাঁর জীবনের আদর্শ সেভাবেই মেটাবেন নিজের প্রয়োজন। পরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন চেয়েছিলেন খাদি গ্রামোদ্যগের চেয়ারম্যান করে দিতে । অবধূত এবারেও রাজি হননি। জোড়াঘাটের শ্রীদুর্গা হলো খাঁটি বইয়ের দোকান। মূল মালিক অশীতিপর বৃদ্ধ এখনো বেঁচে আছেন। এর পাশেই একই মাপে ছিল অবধূতের বইয়ের দোকান। আসলে মল্লিকরা জোড়া দোকান বেচেছিলেন। একটি শ্রীদুর্গ নামে বইয়ের দোকান। এ দোকানটি আজো আছে। অন্যটি ছিল অবধূতের। হিন্দুস্থান লিমিটেডে সাতবার ইন্টারভিউ দিয়ে ডানলপে অমলের চাকরি হয়নি। অমল কোনো পেশাতেই বেশিদিন মানিয়ে নিতে পারতেন না।

চুঁচুড়া শহরে দশটি টেলিফোন ছিল। একটি ছিল অবধূতের। ৪১৭ ছিল এর নম্বর। সময়টি ছিল ১৯৭২-৭৭। তখন সন্দেহভাজন যুবকদের 'মিসা' দিত। এটি দমন নীতি। এই আইনে গ্রেপ্তার করলো এক যুবককে। ছেলেটিকে প্রচুর মারলো তারপর ছেড়ে দিলো আবার ধরলো । এটাই নিয়ম --যাতে গায়েব না হতে পারে সেজন্য বার বার ধরতো এবং ছেড়ে দিত। ছেলেটির বাবা তুলোর ব্যবসায়ী। খুব বড় ধনী ব্যক্তি। তাঁর বাড়ি ছিলো রিষড়ায়। কিন্তু এই আইনে আর্মিদের বিরুদ্ধে কোনো এফ. আই. আর. হতো না। এখন আপামফা আছে। অ্যাকশান স্কোয়াডের কেসে ধরা পড়লো দুবার। দ্বিতীয়বার ছাড়ার চারদিন আগে জানা গেলো আবার ধরবে। তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়* । এবার ধরলে মৃত্যু নিশ্চিত। ছেলেটির বাবা কেঁদে পড়লেন অবধূতের কাছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে তখন পাওয়া যায়নি। তাঁর স্ত্রীকে ফোন করলেন। স্ত্রীর ফোনে কাজ

হলো। মুখ্যমন্ত্রী অবধূতের অনুরোধে এয়ারপোর্ট থেকে কলকাঠি নাড়িয়ে ছেলেটিকে ছাড়িয়ে দেন। ছেলেটির বাবা পুলিশের পরামর্শে ছেলেকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠায়। তৃতীয়বার ধরলে বাঁচতো কিনা সন্দেহ। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে ছেলেটি ঘরে ফেরে। অসুস্থ প্রফুল্ল ঘোষ বা শতঘোষের পা হোম-যজ্ঞ ক'রে সারিয়ে দেন অবধূত। এই লোটি একটি গুণ্ডা ! তার একটি পা কোনো ডাক্তারই সারাতে পারছিলেন না। অবধূত বিপদে পড়া মানুষকে সাহায্য করতেন। বহু মানুষকে অবধূত চাকরি পেতে সাহায্য করেছেন। তাঁরা এখন সে কৃতজ্ঞতা মনে রাখেন না। সবাই যে অকৃতজ্ঞ তা অবশ্য নয়। জানা গেলো অবধূতের স্মরণে যা কিছু আয়োজন হয় সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক উদ্যোগ। এ ব্যাপারে সরকারের কোনো উদ্যোগ সেভাবে দেখা যায় না। গবেষকের দ্বারা ১৯.০৪.২০১৯ তারিখে শব্দযন্ত্রে (চলভাষ) সংগৃহিত সাক্ষাৎকারের লিখিত রূপ। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ের সঠিক সমাধান উদ্ধার করার চেষ্টা করেছি আমরা। দ্রষ্টব্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩০)।

চিত্র নং ১৩

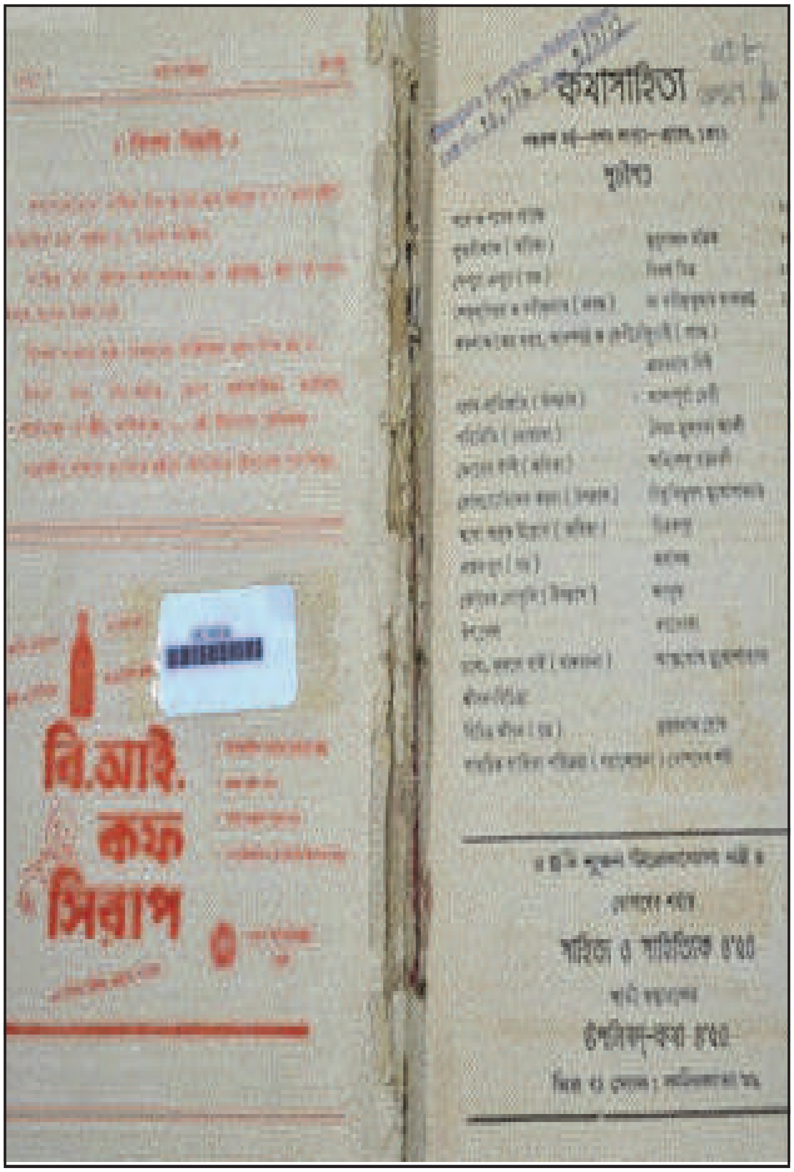

কথাসাহিত্য পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ দশম সংখ্যা, ১৩৭১ ,সূচিপত্র থেকে ফটোকপিটি সংগৃহিত। জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির সৌজন্যে প্রাপ্ত, ́অবধূতের গ্রন্থ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায়। লেখক তালিকাতে অবধূতের নাম সহ ভোরের গোধূলি উপন্যাসের উল্লেখ আছে।

চিত্র নং ১৪

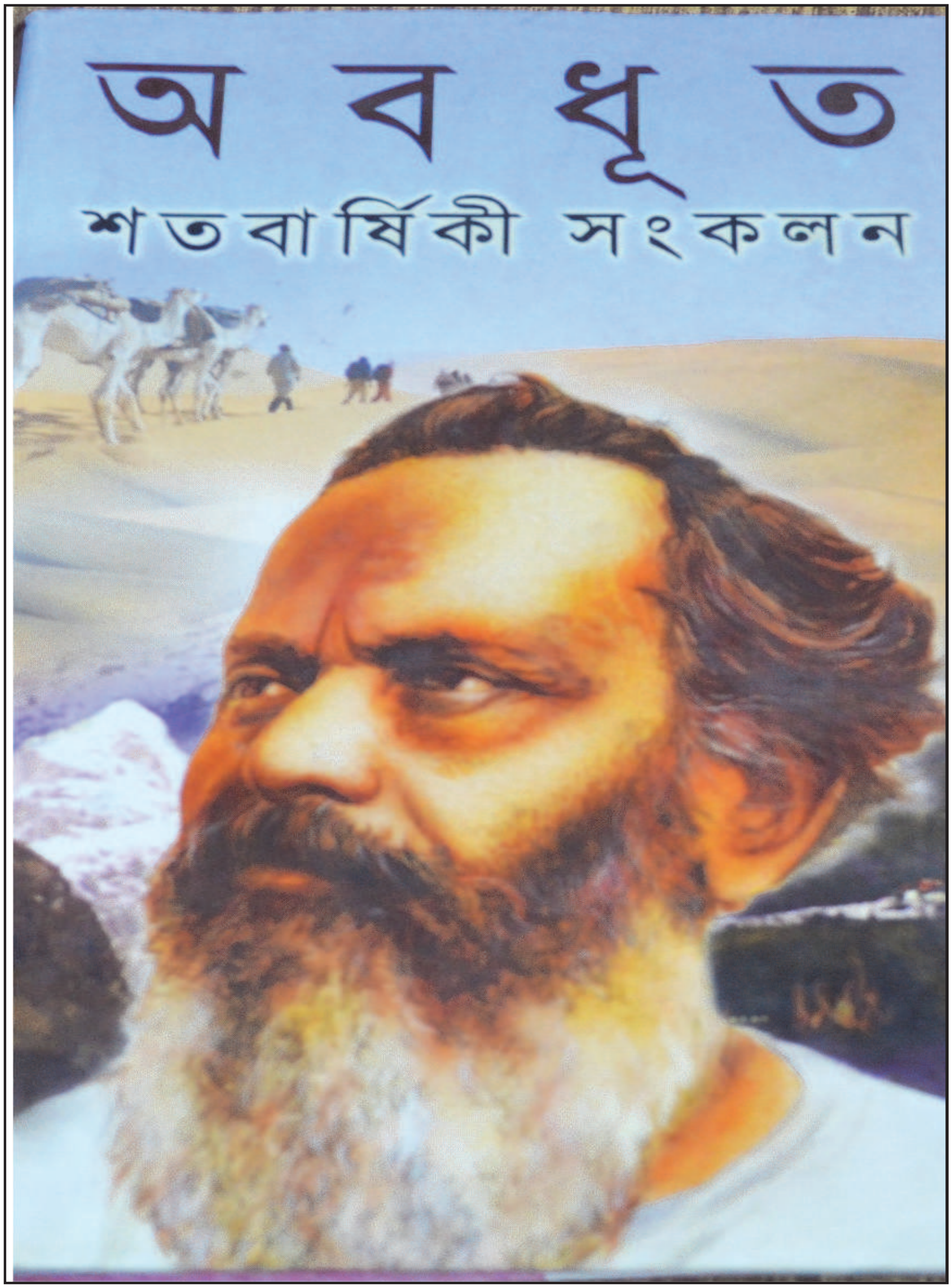

বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত 'অবধূত শতবার্ষিকী সংকলন'-এর প্রচ্ছদপত্রের আলোকচিত্র
(দ্রষ্টব্য: গবেষণা অভিসন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায় ,ফলকথা একালে অবধূতের সাহিত্য চর্চার বিচার ,পৃ. ৪১৪)

চিত্র নং ১৫

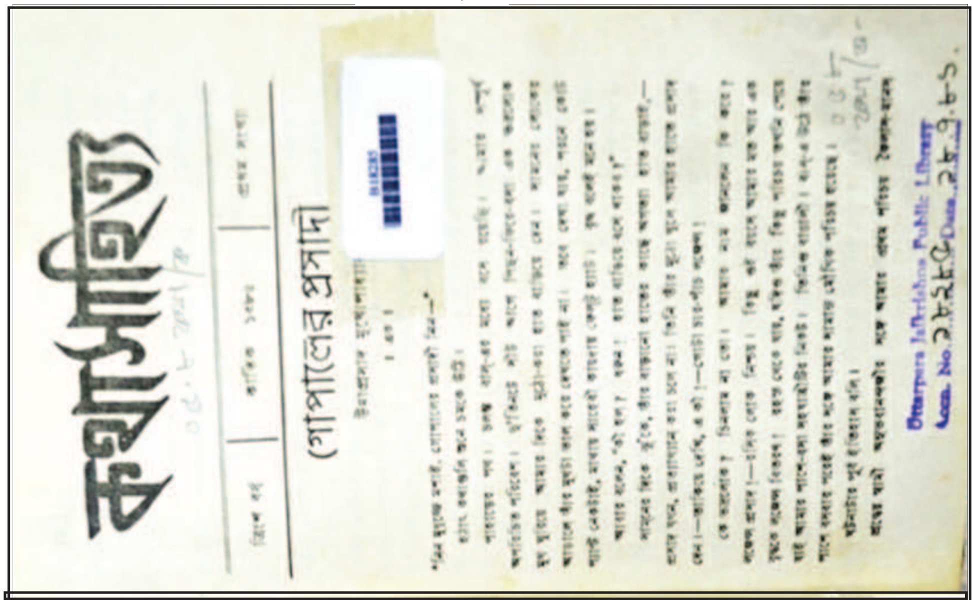

সেকালের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'কথাসাহিত্য' ও তার লেখক গোষ্ঠীর দুস্প্রাপ্য চিত্র। জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির সৌজন্যে ত্রিংশবর্ষ কার্তিক ১৩৮৫ প্রথম সংখ্যা থেকে সংগৃহিত। এখানে অবধূত ছাড়া এখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,গজেন্দ্রকুমার মিত্র , সজনীকান্ত দাস, আশাপূর্ণা দেবী , রাধারানী দেবী সহ বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকের আলোকচিত্র আছে।

চিত্র নং ১৬

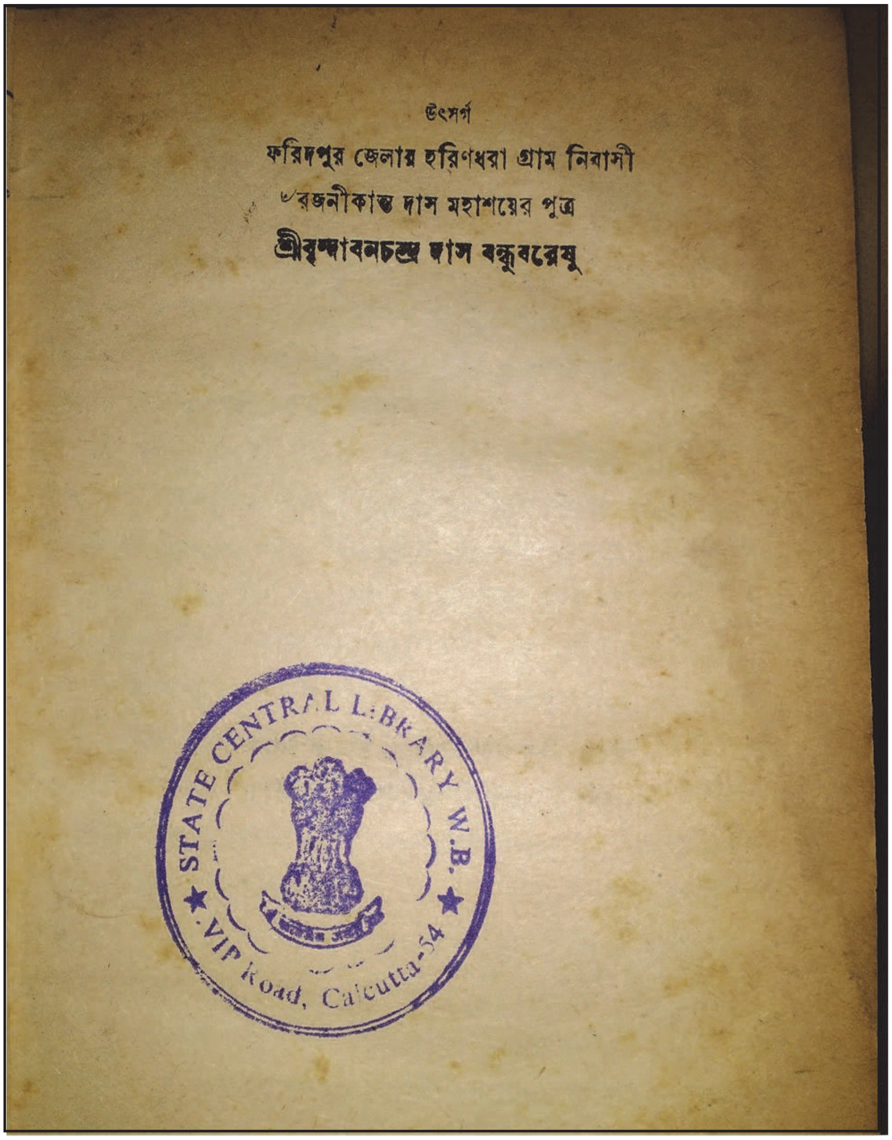

উৎসর্গ

ফরিদপুর জেলায় হরিণধরা গ্রাম নিবাসী

৺রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের পুত্র

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দাস বন্ধুবরেষু

STATE CENTRAL LIBRARY W.B.
VIP Road, Calcutta-54

'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর উৎসর্গ পত্র

'মরুতীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থটি অবধূত উৎসর্গ করেন ফরিদপুরের বৃন্দাবন দাসকে। ইনি পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে অবধূতকে ঝড় জলের রাতে নৌকায় করে পদ্মানদী পার করে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। আলোকচিত্রটি 'মরুতীর্থ হিংলাজ' উপন্যাসের প্রথম সংখ্যা, মিত্র ও ঘোষ, প্রকাশিত ১৯৫৪ সালের গ্রন্থ থেকে সংগৃহিত। গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ দ্রষ্টব্য পৃ.৩৭

চিত্র নং ১৭

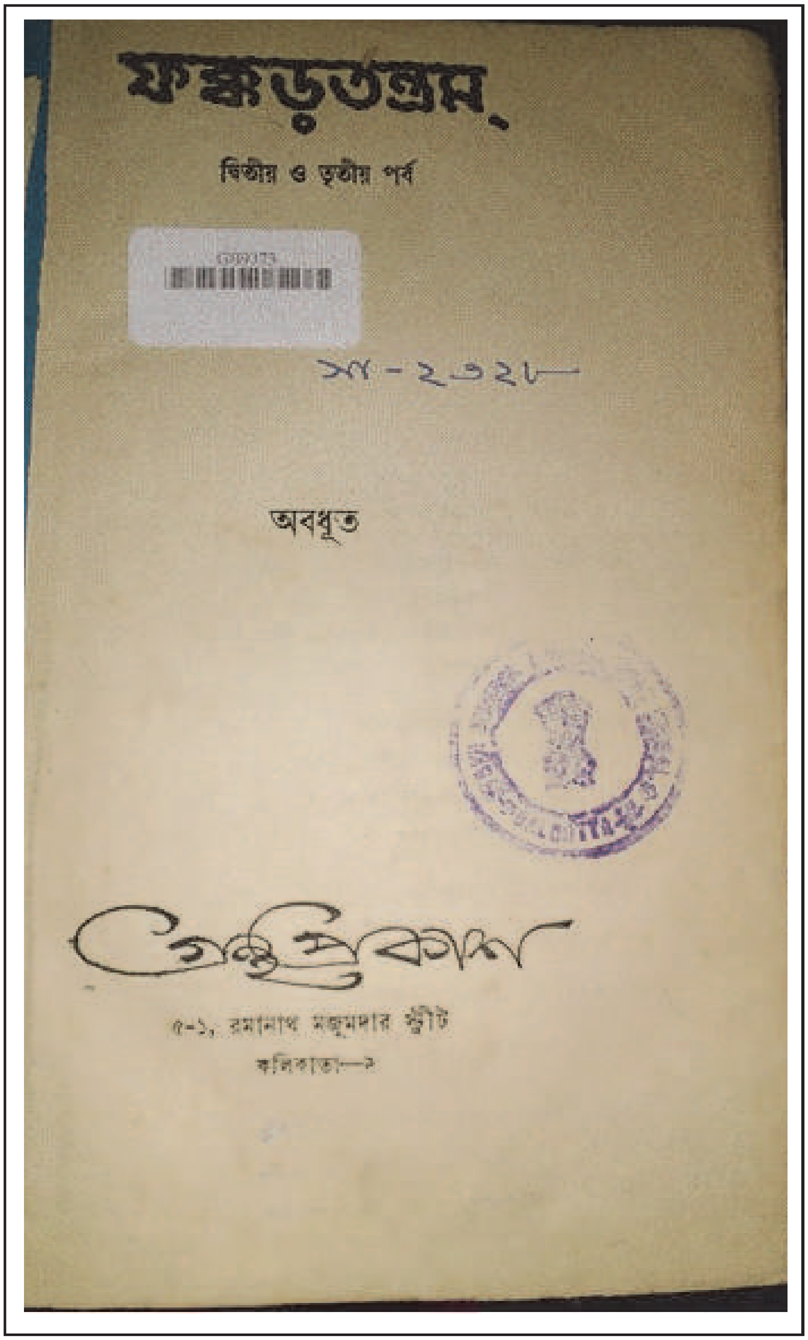

অবধূত রচিত ‘ফক্কড়তন্ত্রম’ উপন্যাসের নাম পত্রের প্রতিলিপি। চিত্রটি গ্রন্থপ্রকাশ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট , কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে সংগৃহিত গ্রন্থটি কোচবিহার সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সৌজন্যে প্রাপ্ত। দ্রষ্টব্য: গবেষণা অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যয়ের প্রাসঙ্গিক অংশ, পৃ.২০৮

চিত্র নং ১৮

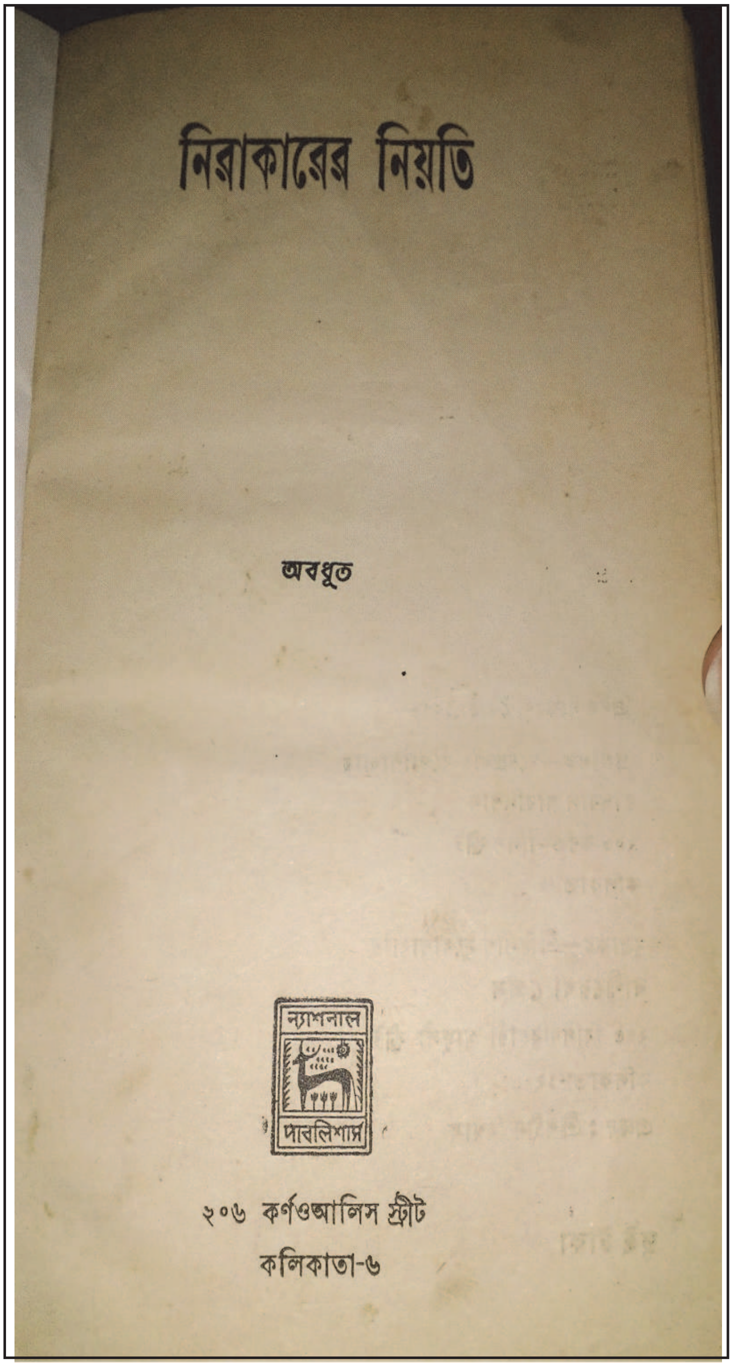

'নিরাকারের নিয়তি' প্রকাশিত হয় 'ন্যাশনাল পাবলিশার্স' থেকে। ফটোকপিটি বিধাননগর সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সৌজন্যে প্রাপ্ত

চিত্র নং ১৯

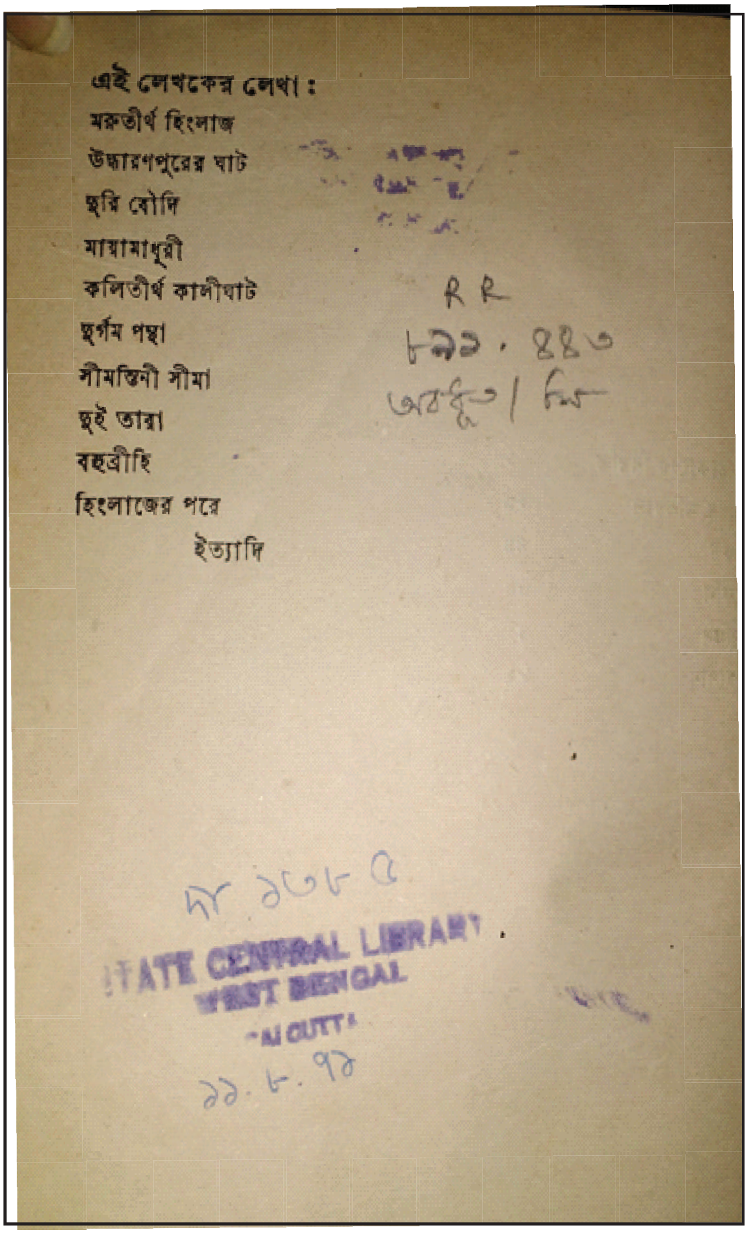

এই লেখকের লেখা :
মরুতীর্থ হিংলাজ
উদ্ধারণপুরের ঘাট
ছরি বৌদি
মায়ামাধুরী
কলিতীর্থ কালীঘাট
দুর্গম পন্থা
সীমন্তিনী সীমা
দুই তারা
বহুব্রীহি
হিংলাজের পরে
ইত্যাদি

TATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL

'নিরাকারের নিয়তি'গ্রন্থের বিজ্ঞাপন। এখানে ৭নং -গ্রন্থনাম হিসেবে 'সীমন্তিনী সীমা' এবং ৮ নং গ্রন্থনাম হিসেবে 'দুই তারা' উল্লিখিত হয়েছে। অবধূত দুলাল মুখোপাধ্যায়ের এই দুটি গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। গ্রন্থের নাম অবধূতের গ্রন্থপঞ্জির মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: ৪৯৬-৪৯৭

২০.অবধূতের গ্রন্থের প্রকাশনা বিভ্রাট বিষয়ক দৃষ্টান্ত:

'তুলি-কলম' এবং 'মিত্র ও ঘোষ' ছাড়াও অবধূতের গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন বিভিন্ন প্রকাশক : 'ফক্কড়তন্ত্রম' প্রকাশিত হয় 'গ্রন্থপ্রকাশ'থেকে(চিত্র নং ১৭, পৃ.), 'নিরাকারের নিয়তি' প্রকাশিত হয়'ন্যাশনাল পাবলিশার্স' থেকে (চিত্র নং ১৮ , পৃ.) 'টপ্পা ঠুংরি' প্রকাশিত হয় ক্লাসিক প্রেস থেকে (চিত্র নং ২০, কোলাজ-ক, পৃ.)'ভোরের গোধূলি' প্রকাশিত তুলি-কলম থেকে (চিত্র নং ২১, পৃ.), 'ক্রীম' প্রকাশিত হয় ত্রিবেণী প্রকাশনা থেকে (চিত্র নং ২৩, পৃ.) ,'কৌশিকী কানাড়া' প্রকাশিত হয় কলিকাতা পুস্তকালয় থেকে (চিত্র নং ২৫, পৃ)। অবধূতের গ্রন্থাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক অনবধানতা-জনিত প্রমাদ ঘটেছে। বিষয়-বিচারে 'দুর্গম পন্থা' আর 'পথে যেতে যেতে' একই গ্রন্থ। অর্থাৎ একই লেখা দুই নামে বেরিয়েছে। 'পথে যেতে যেতে'-এর প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৩৮২/মার্চ,১৯৭৬,প্রকাশক কল্যাণব্রত দত্ত। মুদ্রক স্বপ্না প্রেস,প্রচ্ছদ তরুণ দত্ত।

'টপ্পা ঠুংরি' গ্রন্থটি উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। -এই একই বই 'আমার চোখে দেখা' নামে প্রকাশ করেছেন তুলি-কলম,প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ,১৩৮২,জুন,১৯৭৫,প্রকাশক কল্যাণব্রত দত্ত। লক্ষ্যণীয় যে বইটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়েছিল এমন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রন্থ দুটির ফটোকপি নিচে.কোলাজে দেওয়া হলো:

চিত্র নং ২০ / কোলাজ-ক

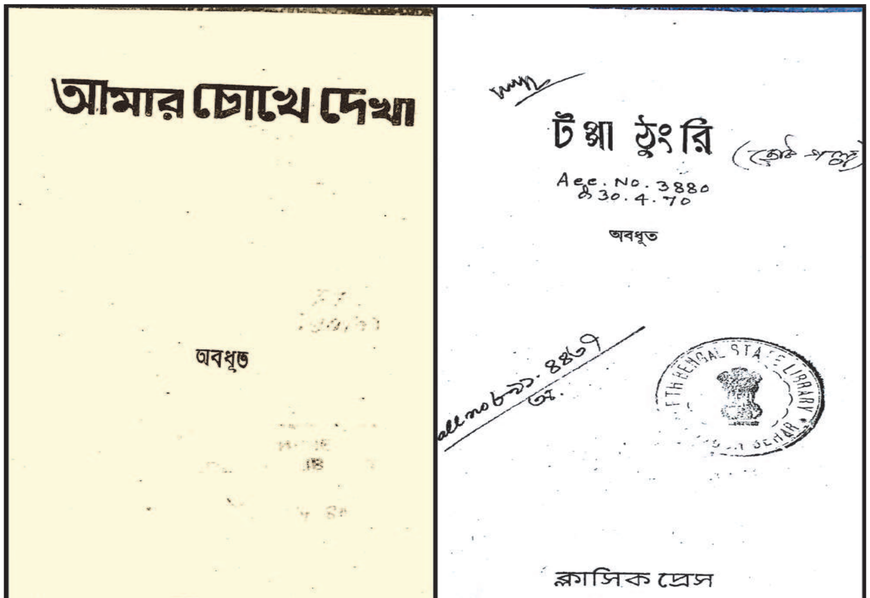

অবধূত, 'আমার চোখে দেখা ', তুলি-কলম, ১৯৭৫ ও অবধূত,'টপ্পাঠুংরি', ক্লাসিক প্রেস, ১৯৬৯

চিত্র নং ২০ /কোলাজ–খ

গল্প লিখতে হোলে নাকি ছোটবেলা থেকে সাধনা করা দরকার। হুম করে হঠাৎ কেউ লেখক হোয়ে উঠতে পারে না। গল্প উপন্যাস লিখে যাঁরা নাম করেছেন তাঁরা নাকি হাতেখড়ির দিন থেকেই জানতেন যে একদা তাঁরা সাহিত্যিক হবেন। জানতেন বলে আদা ছোলা খেয়ে ঐ হাতেখড়ির দিন থেকেই লেখক হবার জন্যে ডন বৈঠক শুরু করে দিয়েছিলেন।

কবে কোথায় কত বয়েসে গল্প লেখার সাধনা শুরু করেছিলাম, এ প্রশ্নটি হামেশা শুনে থাকি। উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েরা বিশ্বাস করতে চায় না যে কোনও কালে আমি স্বপ্নও দেখিনি গল্প লেখার। ঝাড়া ত্রিশটা বছর বেওয়ারিস জীবন-যাপন করেছি, ঝুলি-কাঁধে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। কাগজ কলম পুঁথি-পত্রের সঙ্গে ভাশুর ভাদ্রবউ সম্পর্কটা আমার সেই হাতেখড়ির দিন থেকেই বজায় আছে। পথে পথে ঘুরে যার দিন গুজরান হয়, সে কোথায় বসে গল্প লেখার তালিম নেবে?

তবে এ কথাটা যদি না মানি যে এন্তার জলজ্যান্ত গল্প দিনের পর দিন চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি, তাহলে নিশ্চয়ই আমার সেই ত্রিশ বছরের মুসাফিরির সঙ্গে নিমকহারামি করা হবে। তেমনি নিমকহারামি করা হবে আমার পরমবন্ধু সহজিয়া রাইচাঁদ দাসের সঙ্গে, যে আমাকে চোখ মেলে জলজ্যান্ত গল্প দেখতে শিখিয়েছিল। রাইচাঁদ বলত—দেখ দেখ, ভবের হাটখানা চোখ মেলে দেখে নে। হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি নায়ক, নায়িকা; দিনের পর দিন অগুনতি গল্প ঘটে যাচ্ছে নাকের ডগায়। কি রগড়! এখানে আজ যে গল্পটি ঘটল সেটিকে মনে গেঁথে নিয়ে এগিয়ে চল। কাল

১

অবধূত—১

গল্প লিখতে হোলে নাকি ছোটবেলা থেকে সাধনা করা দরকা
করে হঠাৎ কেউ লেখক হোয়ে উঠতে পারে না। গল্প
লিখে যাঁরা নাম করেছেন তাঁরা নাকি হাতেখড়ির দিন
জানতেন যে একদা তাঁরা সাহিত্যিক হবেন। জানতেন বলে
ছোলা খেয়ে ঐ হাতেখড়ির দিন থেকেই লেখক হবার জ
বৈঠক শুরু করে দিয়েছিলেন।

(কবে কোথায় কত বয়েসে গল্প লেখার সাধনা শুরু করে
এ প্রশ্নটি হামেশা শুনে থাকি। উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েরা
করতে চায় না যে কোনও কালে আমি স্বপ্নও দেখিনি গল্প
ঝাড়া ত্রিশটা বছর বেওয়ারিস জীবন-যাপন করেছি, ঝুলি
নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। কাগজ কলম পুঁথি-পত্রে
ভাশুর ভাদ্রবউ সম্পর্কটা আমার সেই হাতে-খড়ির দিন
বজায় আছে। পথে পথে ঘুরে যার দিন গুজরান হয়, সে
বসে গল্প লেখার তালিম নেবে?)

(তবে এ কথাটা যদি না মানি যে এন্তার জলজ্যান্ত গল্প
পর দিন চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি, তাহলে নিশ্চয়ই আমা
ত্রিশ বছরের মুসাফিরির সঙ্গে নিমকহারামি করা হবে।
নিমকহারামি করা হবে আমার পরমবন্ধু সহজিয়া রাইচাঁদ
সঙ্গে, যে আমাকে চোখ মেলে জলজ্যান্ত গল্প দেখতে শিখিয়ে
রাইচাঁদ বলত—দেখ দেখ, ভবের হাটখানা চোখ মেলে দে
হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি নায়ক, নায়িকা; দিনে
দিন অগুনতি গল্প ঘটে যাচ্ছে নাকের ডগায়। কি রগড়!
আজ যে গল্পটি ঘটল সেটিকে মনে গেঁথে নিয়ে এগিয়ে চল।

১

স্বপন-১

সৌজন্যে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার। 'টপ্পাঠুংরি' ও 'আমার চোখে দেখা' গ্রন্থদুটির প্রথম পৃষ্ঠার ফটোকপি একত্রে প্রদর্শিত হলো।

চিত্র নং ২০ / কোলাজ–গ

ফুল হয়ে ছিনু যবে নিলে না চয়ন করি—
ও চরণ পাব বলে মলিন হইয়া ঝরি॥

ঠিক। লুকিয়ে রাখতে হবে বেদনা। লুকিয়ে রাখতে না পারলে বেদনার মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়ে যাবে।

মলিন হয়ে ঝরে যাচ্ছে ফুল, অভিমানে মলিন হয়ে ঝরে পড়ছে। কেউ চয়ন করে নিচ্ছে না বলে তার অভিমান।

ঝরে পড়ছে কিন্তু মস্ত বড় একটা আশা নিয়ে। সেই আশাটি হল, যে তাকে চয়ন করে নিলে না সে তাকে মাড়িয়ে চলে যাবে। তোফা তোফা—

তোমার আকাশ মাঝে চাঁদ হতে চাহি না যে
শুকতারা আমি আজ— দিগন্তে ঠাঁই লব॥
স্বপন না ভাঙে যদি—

ঘুমিয়ে পড়লাম।

ফুল হয়ে ছিনু যবে নিলে না চয়ন করি—
ও চরণ পাব মলিন হইয়া ঝরি॥

ঠিক। লুকিয়ে রাখতে বেদনা। লুকিয়ে রাখতে না পার
বেদনার মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়ে ব।
মলিন হয়ে ঝরে যাচ্ছেল, অভিমানে মলিন হয়ে ঝরে পড়ছে
কেউ চয়ন করে নিচ্ছে না তার অভিমান।
ঝরে পড়ছে কিন্তু বড় একটা আশা নিয়ে। সেই আশা
হল, যে তাকে চয়ন নিলে না সে তাকে মাড়িয়ে চলে যাবে
তোফা তোফা—

তোমার আকাশ মাঝে চাঁদ হতে চাহি না যে
শুকতারা আমি আজ— দিগন্তে ঠাঁই লব॥
ন না ভাঙে যদি—

ঘুমিয়ে পড়লা

NORTH BENGAL STATE

সৌজন্যে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার।
গ্রন্থদুটির শেষ পৃষ্ঠার ফটোকপি একত্রে প্রদর্শিত হলো।

চিত্র নং ২১

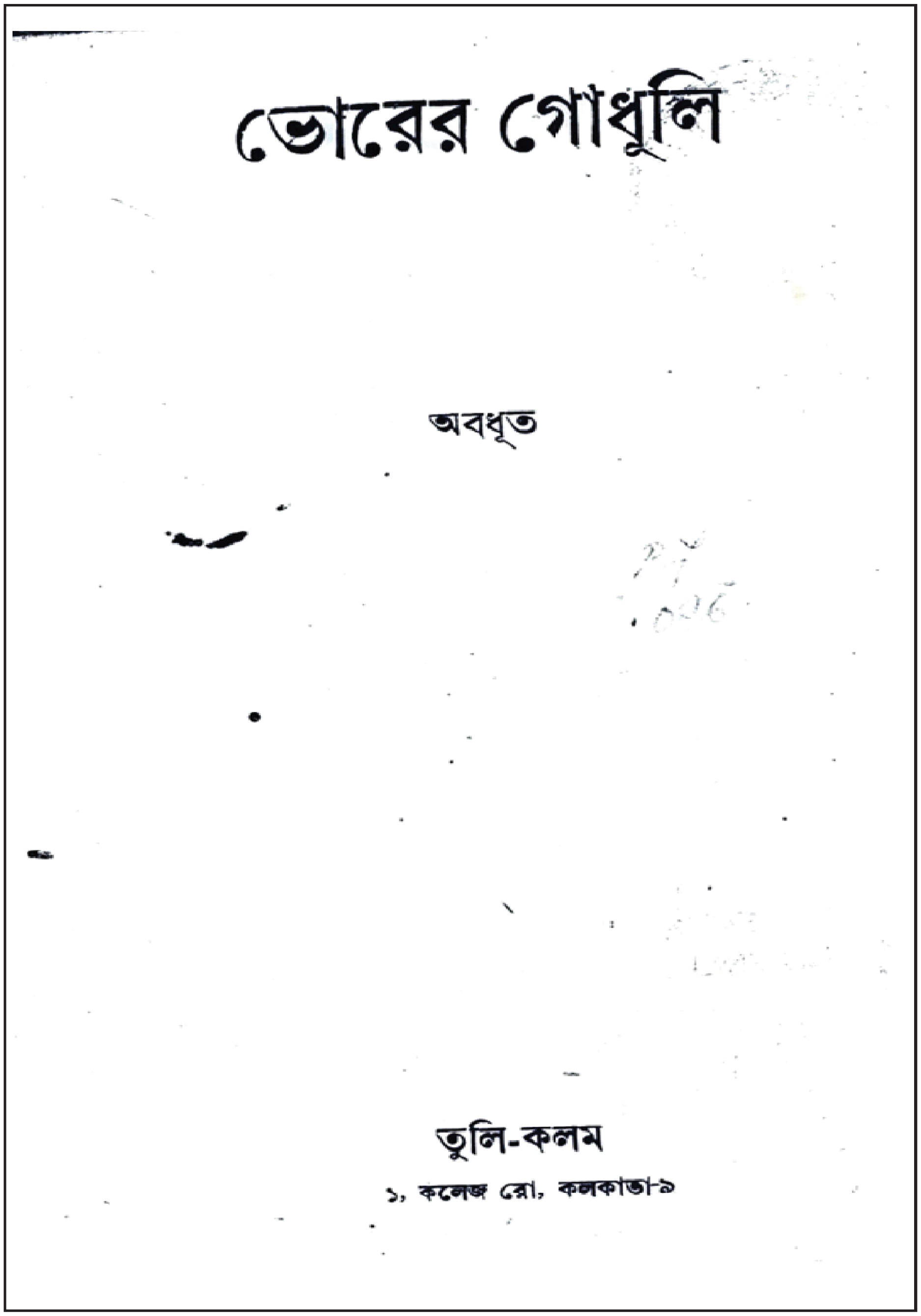

ভোরের গোধূলি

অবধূত

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

অবধূত, ভোরের গোধূলি, তুলি-কলম,১৯৬০

চিত্র নং ২২

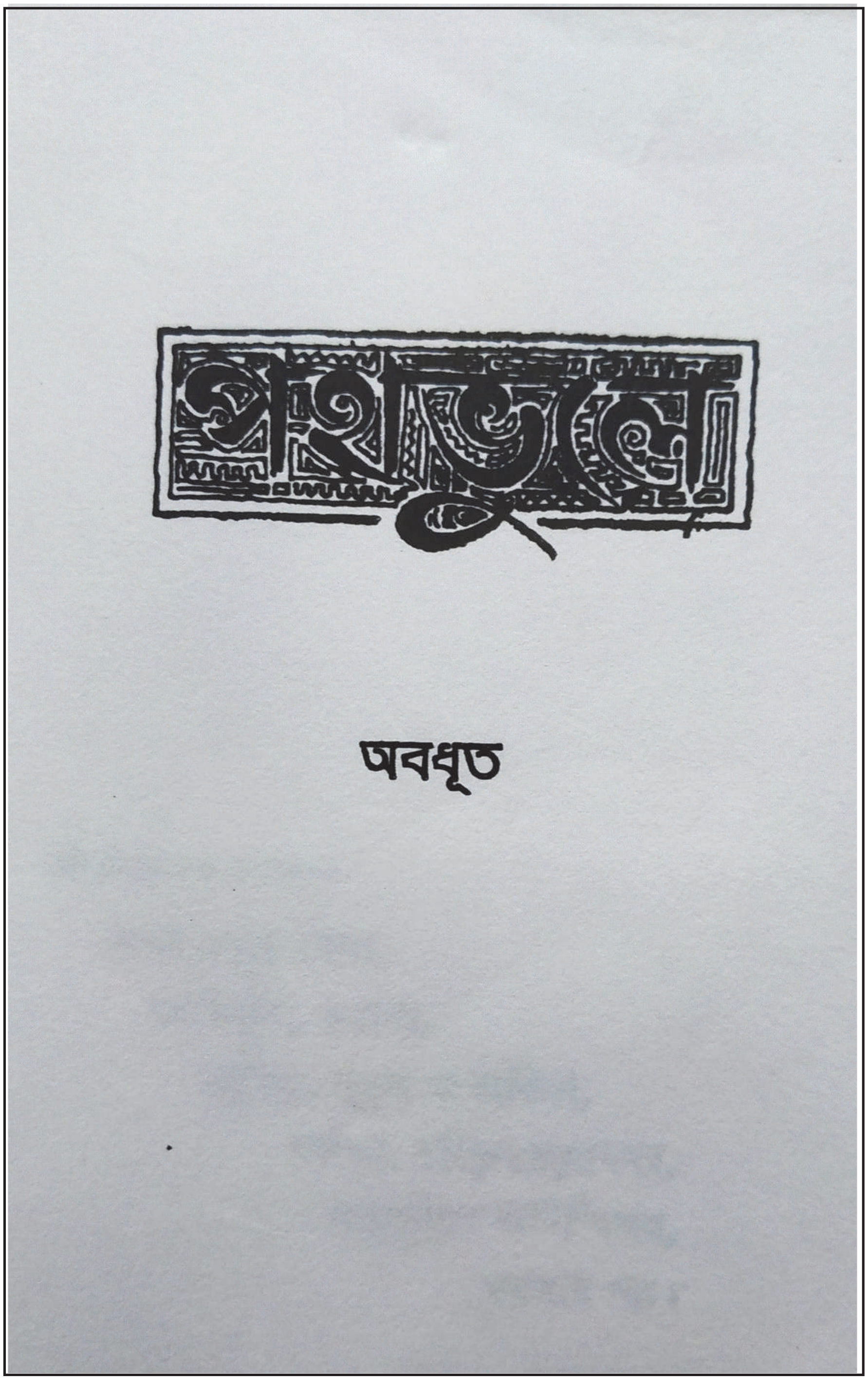

অবধূত,'পথ ভুলে' গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য।

চিত্র নং ২৩

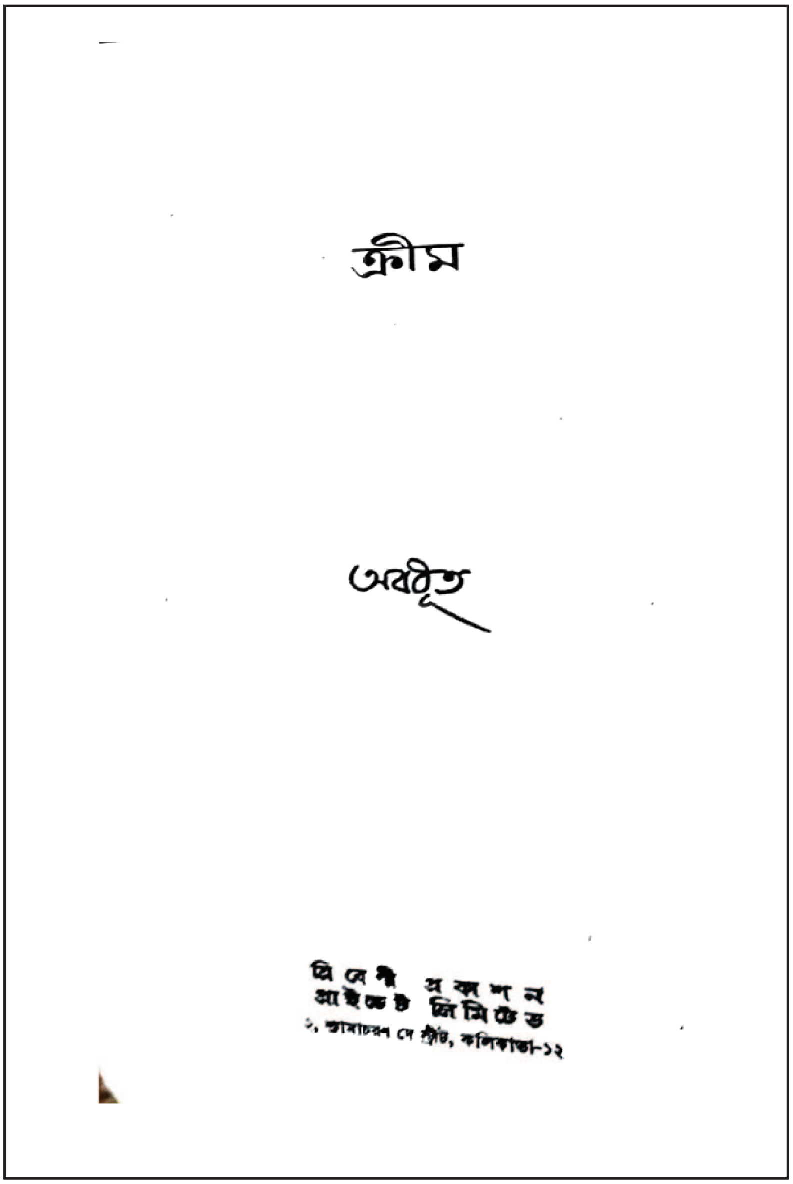
ক্রীম

অবধূত

ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উদয়শঙ্কর বর্মার সৌজন্যে।

চিত্র নং ২৪

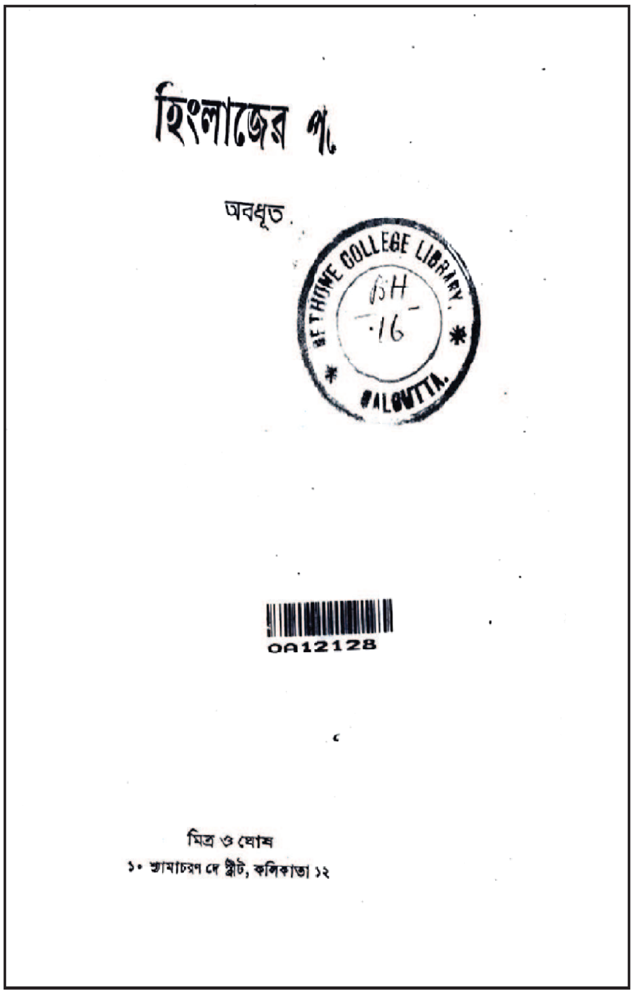

হিংলাজের প.

অবধূত

BETHUNE COLLEGE LIBRARY
CALCUTTA
OA12128

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বেথুন কলেজ লাইব্রেরির সৌজন্যে। অবধূত, 'হিংলাজের পরে',মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬২

চিত্র নং ২৫

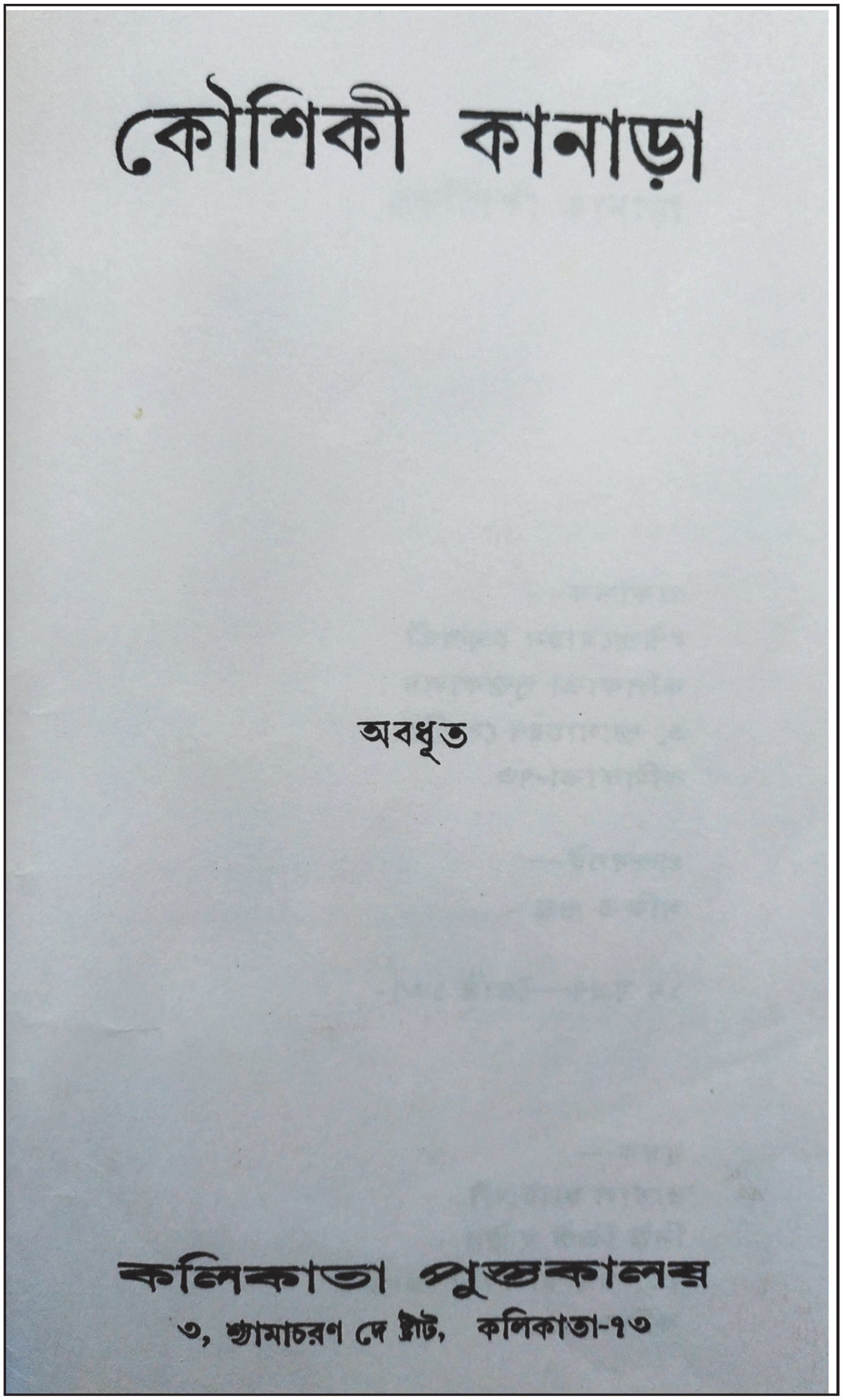

কৌশিকী কানাড়া

অবধূত

কলিকাতা পুস্তকালয়

৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

কলিকাতা পুস্তকালয় প্রকাশিত এই গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য

চিত্র নং ২৬

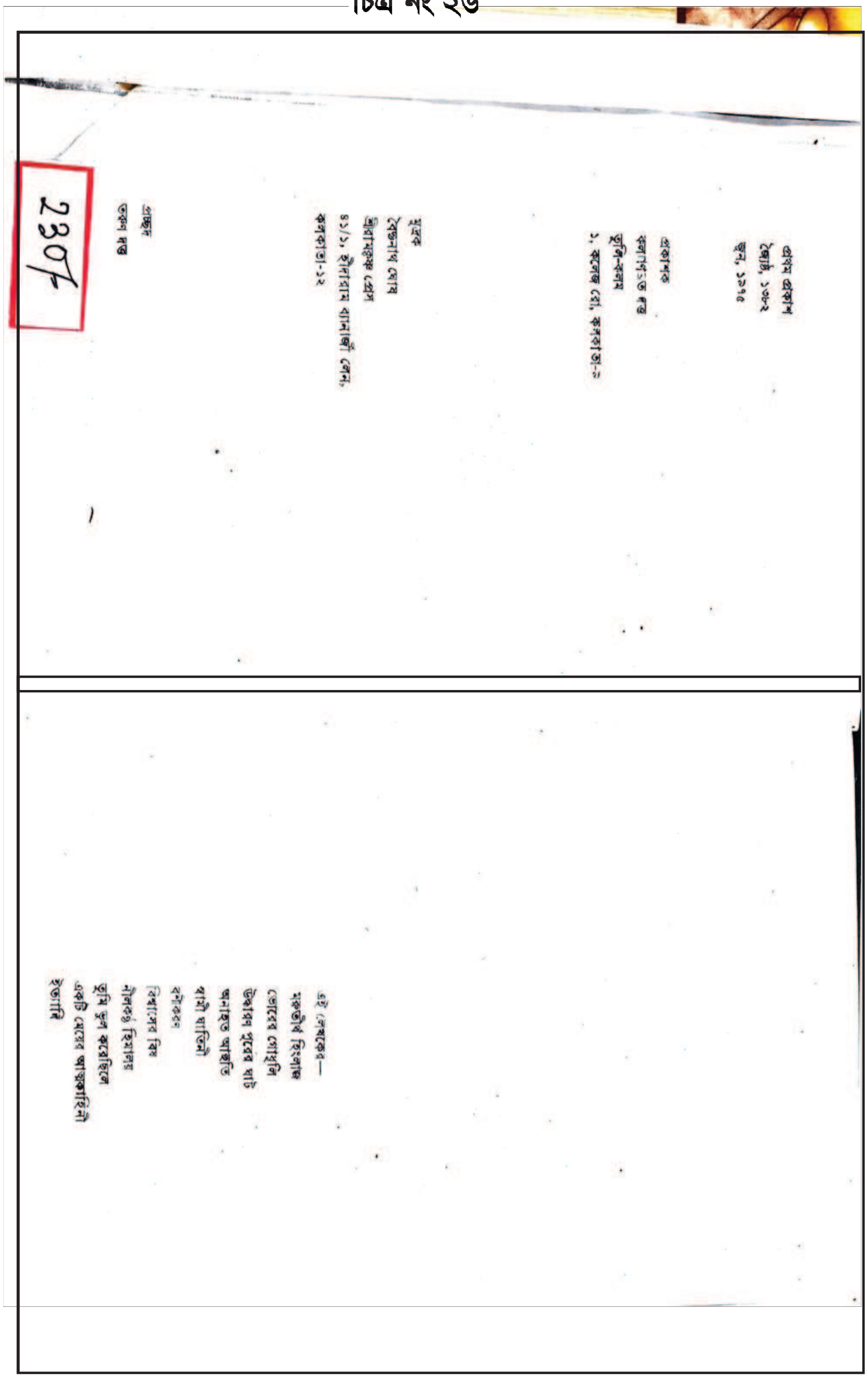

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২
জুন, ১৯৭৫

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
বৈদ্যনাথ ঘোষ
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস
৪১/১, হীরারাম ব্যানার্জী লেন,
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ
তরুণ দত্ত

এই লেখকের—
মরুতীর্থ হিংলাজ
ভোরের গোধূলি
উদ্ধারণ পুরের ঘাট
অনাহুত আহুতি
স্বামী ঘাতিনী
বশীকরণ
বিশ্বাসের বিষ
নীলকণ্ঠ হিমালয়
তুমি ভুল করেছিলে
একটি মেয়ের আত্মকাহিনী
ইত্যাদি

অবধূত, 'আমার চোখে দেখা','তুলি-কলম' (১৯৭৫)উপন্যাসের বিজ্ঞাপন অংশে অবধূতের লেখা 'অনাহুত আহুতি','স্বামীঘাতিনী','তুমি ভুল করেছিলে', 'একটি মেয়ের আত্মকাহিনী ' ইত্যাদি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। অবধূতের গ্রন্থপঞ্জিতে দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থগুলি যুক্ত হয়েছে। দ্রষ্টব্য: গ্রন্থপঞ্জি, পৃ.৪৯৫-৪৯৭

চিত্র নং ২৭

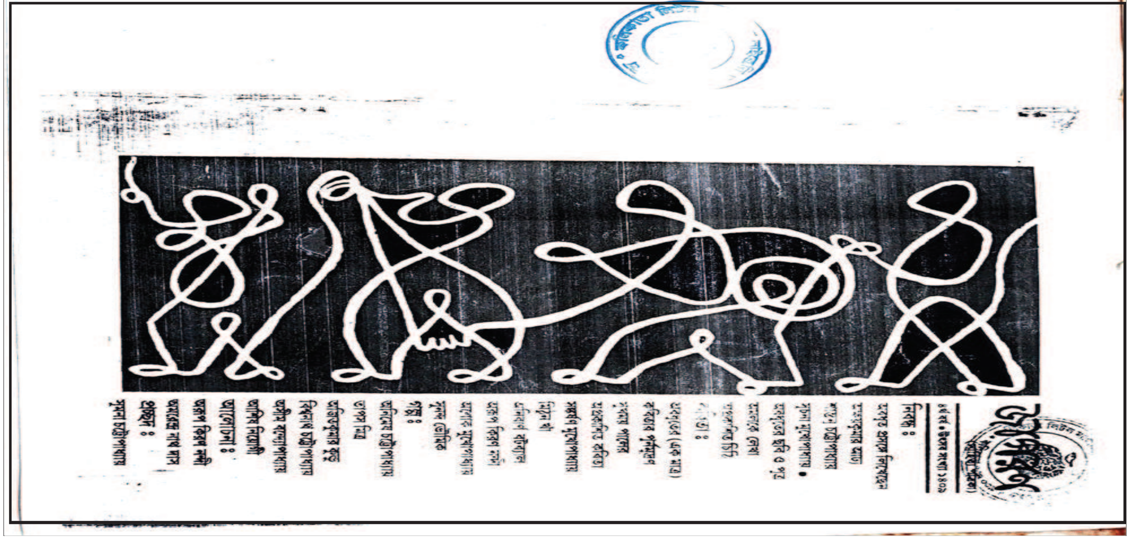

চলচ্চিত্রে অবধূত:'জাগরণ' (৪র্থ বর্ষ,উৎসব সংখ্যা,১৪০৯) সাহিত্য পত্রিকা

- অবধূতের উপন্যাস: 'মরুতীর্থ হিংলাজ 'ও ছোটগল্প 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে' চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে ছবিটি ইউটিউবে দেখা যায়।
- 'মরুতীর্থ হিংলাজ' বইটিতে প্রধান চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন: মোহান্ত –বিকাশ রায়, থিরুমল –উত্তমকুমার এবং কুন্তী–সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। দ্রষ্টব্য–'মরুতীর্থ হিংলাজ' বিষয়ক স্মৃতি কথায়, অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, জাগরণ' সাহিত্য পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, উৎসব সংখ্যা,১৪১০ পৃ.২৯-৩২
- উল্লেখ্য যে 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' গ্রন্থটিকে পরিচালক অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সিনেমা করতে শুরু করেছিলেন ১৯৮২ সালে। আর আট দিনের মত কাজ বাকি ছিল এমন অবস্থায় ধরা পড়েন প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ বসু। ইনি চিটফাণ্ডের মালিক ছিলেন গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য সিনেমাটি টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। খন্তা ঘোষ–তরুণকুমার,চরণদাস বৈরাগী–বেদশ্রী চক্রবর্তী, নিতাই বোষ্টমী–বনী–এভাবে অভিনয় করবেন বলে স্যুটিং-ও শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্রষ্টব্য: অঞ্জন দাসের সাক্ষাৎকার, জাগরণ' সাহিত্য পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, উৎসব সংখ্যা,১৪১০ ,পৃ–৩৩-৩৮ বেশ কয়েকটি চিত্রও এখানে আছে।
- অঞ্জন দাস জানিয়েছেন যে অবধূতের ছেলে অমল তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁর বাবা 'বটুক ভৈরব সিদ্ধ' ছিলেন। দ্রষ্টব্য: অঞ্জন দাসের সাক্ষাৎকার, জাগরণ' সাহিত্য পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, উৎসব সংখ্যা,১৪১০,পৃ–৩৩-৩৮,
- অবধূতের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলেছিল ১৯২৮-৩০ সালে বলে জানা যায় । দ্রষ্টব্য'কলিতীর্থ কালীঘাট–অবধূতের জীবন দর্পণ?, জাগরণ' সাহিত্য পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, উৎসব সংখ্যা,১৪১০, পৃ–৭
- অবধূতের মৃত্যুর সংবাদে উত্তমকুমার শোক প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য– উত্তমকুমারের আত্মজীবনী, 'আমার আমি', জাগরণ–পৃ.১৪ জাগরণ পত্রিকার ৫ম বর্ষ সংখ্যায় 'একা জেগে থাকি' (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭) গ্রন্থটি র প্রকাশকাল ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে।

চিত্র নং ২৮

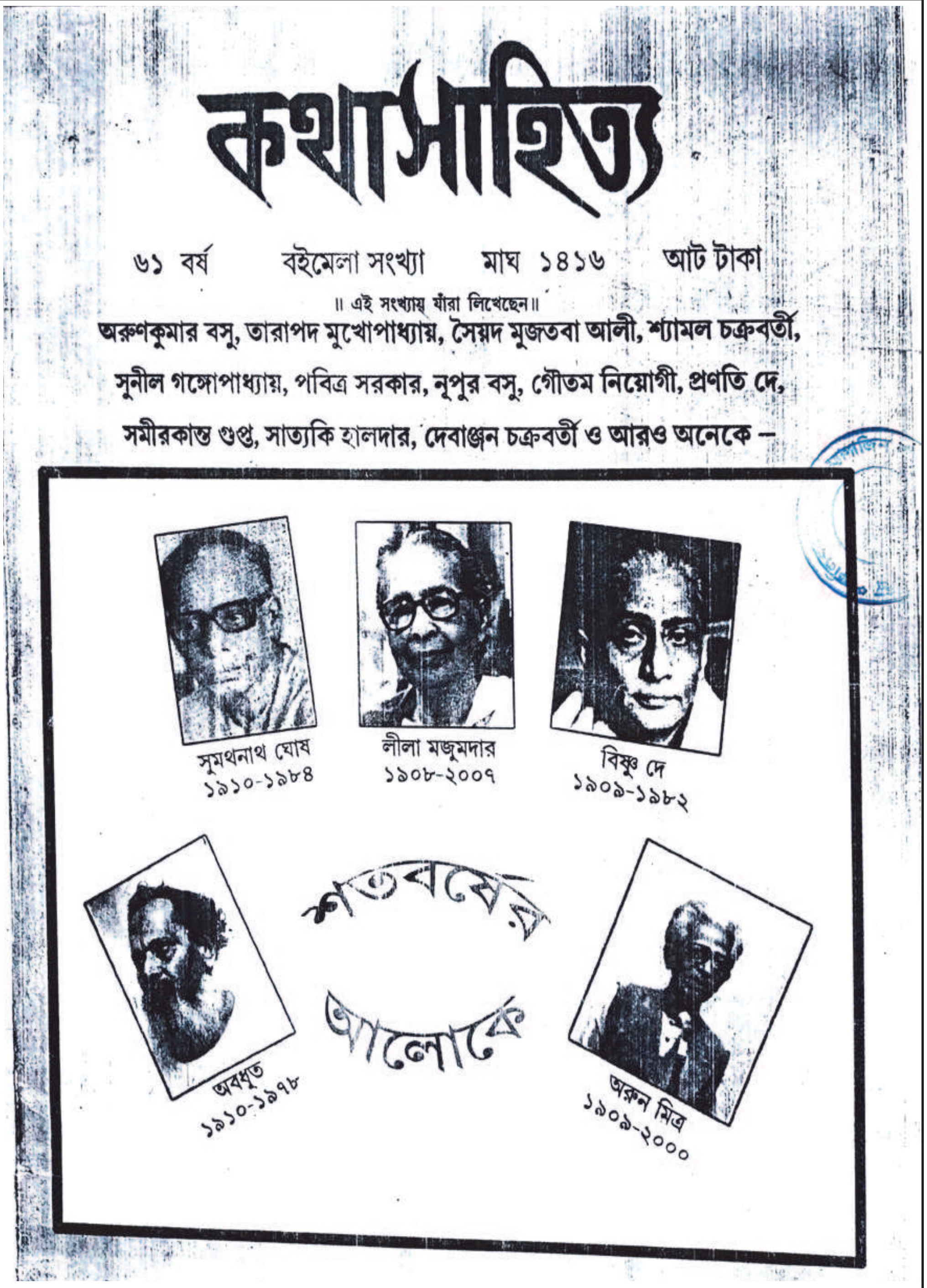

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে' কথাসাহিত্য' (৬১ বর্ষ,বইমেলা সংখ্যা,১৪১৫) সাহিত্য পত্রিকা অবধূত বিষয়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর আলোচনা প্রকাশ করে। সৌজন্যে লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি।

চিত্র নং ২৯

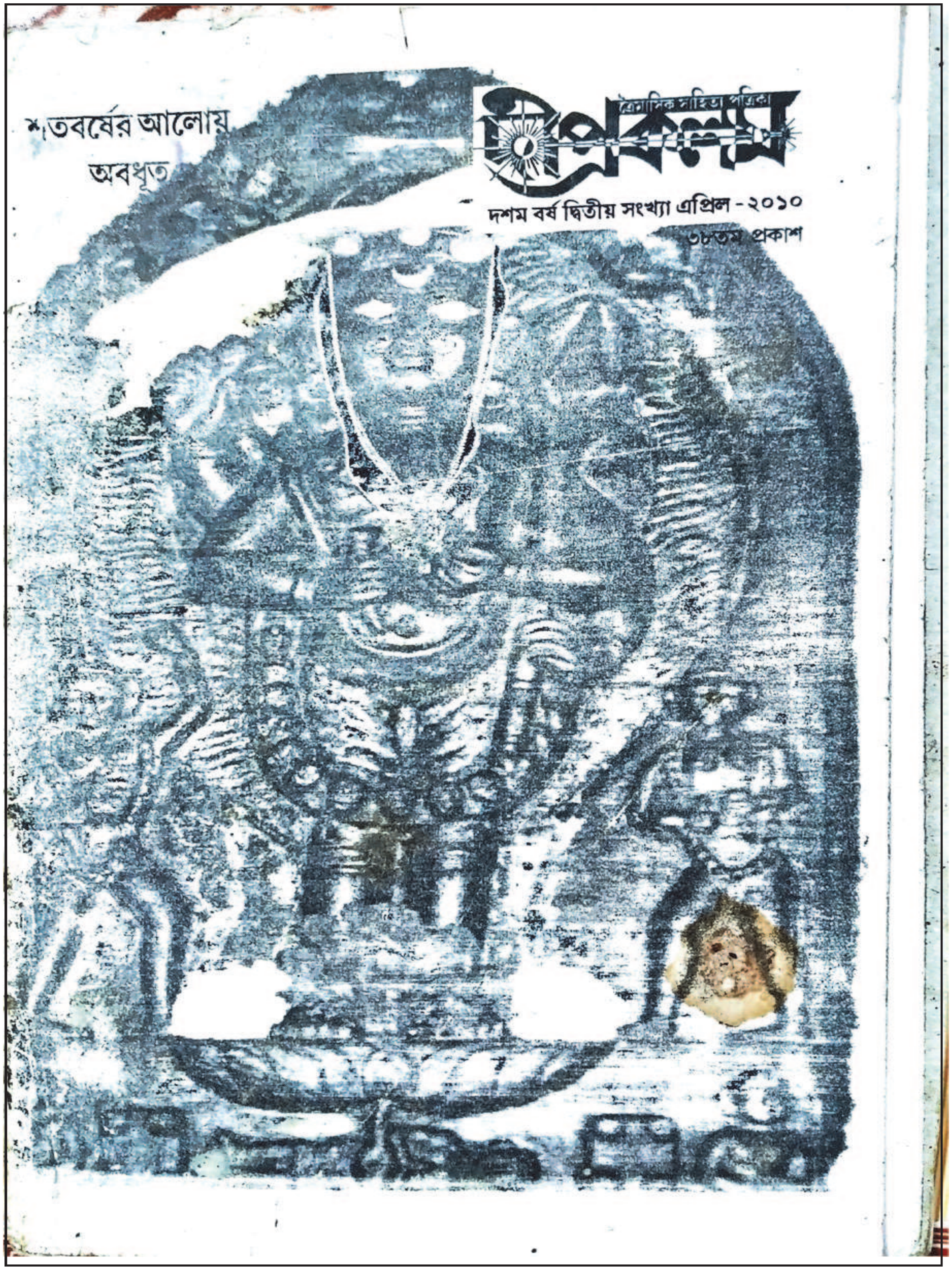

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দীপ্রকলম (১০ম বর্ষ,৩৮ তম প্রকাশ , এপ্রিল সংখ্যা,২০১০) সাহিত্য পত্রিকা অবধূত বিষয়ে সেকালের ও একালের লেখকের আলোচনা প্রকাশ করে।

চিত্র নং ৩০

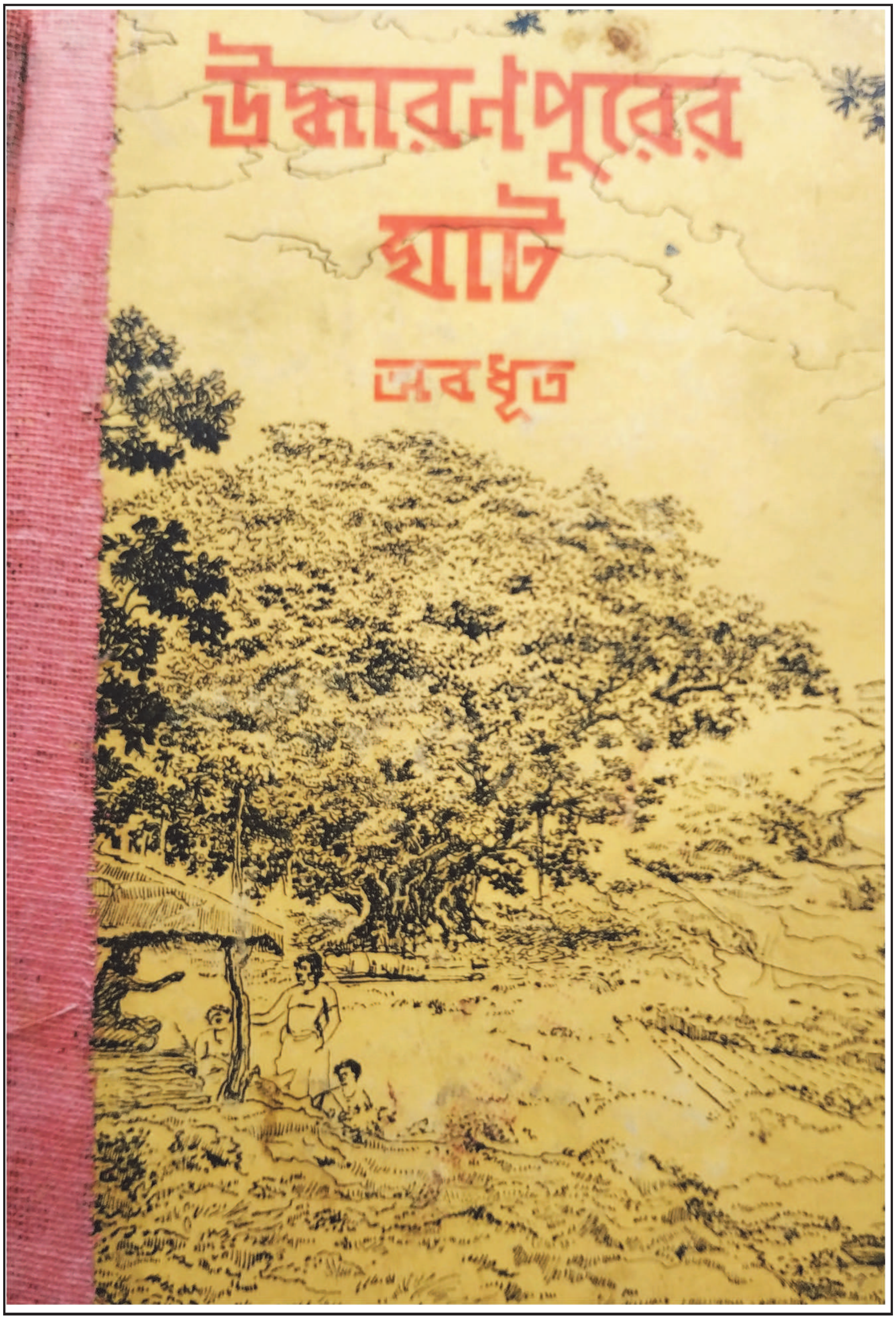

'উদ্ধারণপুরের ঘাট'(১৯৫৬) উপন্যাসের সম্মুখ প্রচ্ছদপত্রের চিত্র

চিত্র নং ৩১

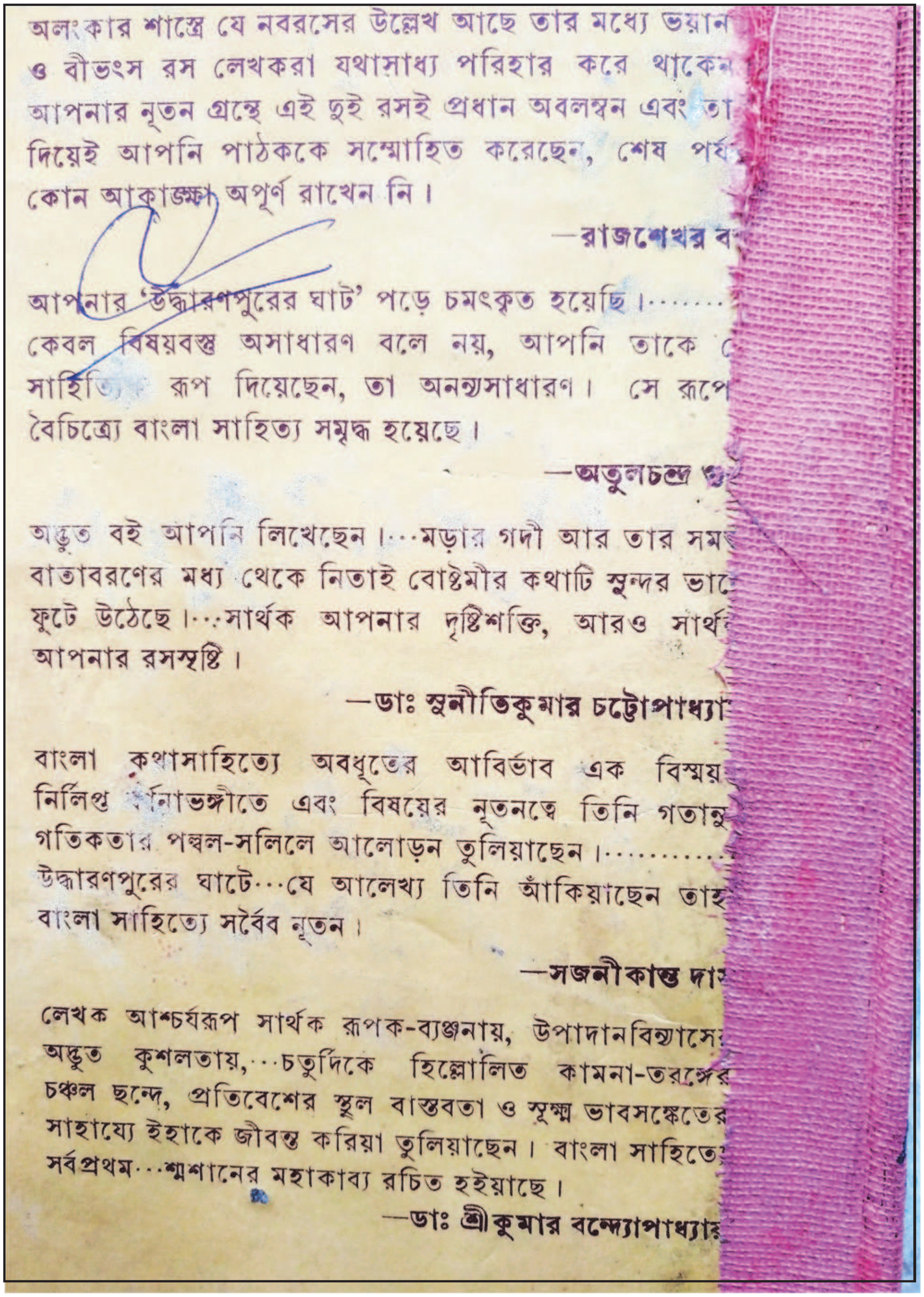

অলংকার শাস্ত্রে যে নবরসের উল্লেখ আছে তার মধ্যে ভয়ান
ও বীভৎস রস লেখকরা যথাসাধ্য পরিহার করে থাকেন
আপনার নূতন গ্রন্থে এই দুই রসই প্রধান অবলম্বন এবং তা
দিয়েই আপনি পাঠককে সম্মোহিত করেছেন, শেষ পর্য
কোন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন নি।

—রাজশেখর ব

আপনার 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' পড়ে চমৎকৃত হয়েছি।......
কেবল বিষয়বস্তু অসাধারণ বলে নয়, আপনি তাকে
সাহিত্যি রূপ দিয়েছেন, তা অনন্যসাধারণ। সে রূপে
বৈচিত্র্যে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

—অতুলচন্দ্র গু

অদ্ভুত বই আপনি লিখেছেন।...মড়ার গদী আর তার সম
বাতাবরণের মধ্য থেকে নিতাই বোষ্টমীর কথাটি সুন্দর ভা
ফুটে উঠেছে।...সার্থক আপনার দৃষ্টিশক্তি, আরও সার্থ
আপনার রসসৃষ্টি।

—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যা

বাংলা কথাসাহিত্যে অবধূতের আবির্ভাব এক বিস্ময়
নির্লিপ্ত র্ণনাভঙ্গীতে এবং বিষয়ের নূতনত্বে তিনি গতানু
গতিকতার পল্বল-সলিলে আলোড়ন তুলিয়াছেন।..........
উদ্ধারণপুরের ঘাটে...যে আলেখ্য তিনি আঁকিয়াছেন তাহ
বাংলা সাহিত্যে সর্বৈব নূতন।

—সজনীকান্ত দা

লেখক আশ্চর্যরূপ সার্থক রূপক-ব্যঞ্জনায়, উপাদানবিন্যাসে
অদ্ভুত কুশলতায়,...চতুর্দিকে হিল্লোলিত কামনা-তরঙ্গের
চঞ্চল ছন্দে, প্রতিবেশের স্থূল বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম ভাবসঙ্কেতের
সাহায্যে ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে
সর্বপ্রথম...শ্মশানের মহাকাব্য রচিত হইয়াছে।

—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যা

'উদ্ধারণপুরের ঘাট'(১৯৫৬) উপন্যাসের পশ্চাৎ প্রচ্ছদ পত্রের ফটোকপি ।
এই উপন্যাস সম্পর্কে সমকালের মূল্যায়ন ।

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

এক

আকর গ্রন্থ (Main Text)

অবধূতের রচনাবলি

(বর্ণানুক্রমিক)

১. অনাহুত আহুতি, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৬০

২. অবিমুক্ত ক্ষেত্রে, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৬৩

৩. অবধূত ভ্রমণ অমনিবাস, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৮৬

৪. আমার চোখে দেখা, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৭৫

৫. উত্তর রামচরিত, দেবশ্রী সাহিত্য সমিতি, কলকাতা, ১৯৬০

৬. উদ্ধারণপুরের ঘাট, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৫৬

৭. একটি মেয়ের আত্মকাহিনী, কলকাতা, ১৯৬০

৮. একা জেগে থাকি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭

৯. একাঘ্নী (রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন, গ্রন্থটি আমরা সরেজমিনে দেখতে পাইনি, এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে)

১০. কঙ্করতন্ত্র (গ্রন্থটি আমরা সরেজমিনে দেখতে পাইনি,এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে)

১১. কলিতীর্থ কালীঘাট, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৫

১২. কানপেতে রই, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৬০

১৩. কৌশিকী কানাড়া, কলিকাতা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৬৩

১৪. ক্রীম,ত্রিবেণী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬০

১৫. টপ্পাঠুংরি, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৯৬৯

১৬. তুমি ভুল করেছিলে, ১৯৬০

১৭. তাহার দুই তারা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৫৯

১৮. দুই তারা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৫৮

১৯. দুরি বৌদি : ১৩৬৫, ১৯৫৮

২০. দুর্গম পন্থা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬০
২১. দেবারীগণ, গুপ্ত প্রকাশিকা, কলকাতা, ১৯৬৯
২২. ন ভূতং ন ভবিষ্যতি(অবধূতের এই গ্রন্থটি আমরা সরেজমিনে দেখতে পাইনি এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে।)
২৩. নিরাকারের নিয়তি, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৩
২৪. নীলকণ্ঠ হিমালয়, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৫
২৫. পথে যেতে যেতে,মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৬
২৬. পথভুলে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ১৯৬২
২৭. পিয়ারী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬১
২৮. ফক্কড় তন্ত্রম্, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৮
২৯. বশীকরণ, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০
৩০. বহুব্রীহি, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬৪
৩১. বিশ্বাসের বিষ, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৭৪
৩২. ভূমিকালিপি পূর্ববৎ, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৬০
৩৩. ভোরের গোধূলি,তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৬৯
৩৪. ভ্রমণ কাহিনী সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭৯
৩৫. মন মানে না, ইং ১৯৬০ (গ্রন্থটি আমরা সরেজমিনে দেখতে পাইনি,এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে)
৩৬. মরুতীর্থ হিংলাজ,মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৫৪
৩৭. মায়ামাধুরী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬০
৩৮. মিড় গমক মূর্ছনা, অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৮
৩৯. যা নয় তাই (প্রকাশকাল অজ্ঞাত)
৪০. শুভায় ভবতু, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, কলকাতা, ১৯৫৭
৪১. সপ্তস্বরা পিনাকিনী, উৎসর্গ বিচারপতি শ্রীচুনিলাল ঘোষ (প্রকাশকাল, প্রকাশক অজ্ঞাত)
৪২. সাচ্চা দরবার, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬০
৪৩. সাধক জীবন সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮২
৪৪. সাধনা (গ্রন্থটি আমরা সরেজমিনে দেখতে পাইনি,এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে)
৪৫. সীমন্তনী সীমা, ১৯৬২(গ্রন্থটি আমরা সরেজমিনে দেখতে পাইনি,এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে)
৪৬. সুখ শান্তি ভালবাসা, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৯৭৮
৪৭. সুমেরু কুমেরু, জ্যোতি প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২ (গ্রন্থটি আমরা সরেজমিনে দেখতে পাইনি,এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে)

৪৮. স্বামীঘাতিনী ১৯৬০, (গ্রন্থটি আমরা সরেজমিনে দেখতে পাইনি,এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে)

৪৯. হিংলাজের পরে, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৬৯, ইং ১৯৬২,

দুই

সহায়ক গ্রন্থ (Supporting Text)

১. অমিয়ভূষণ মজুমদার, অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র, ৬ নং খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০০৮

২. জগদীশ গুপ্ত, জগদীশ গুপ্তের শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদক : সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ, জানুয়ারি, ২০১৫

৩. প্রমথ চৌধুরী, গল্প সংগ্রহ,বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৮৯৬

৪. প্রেমচন্দ,প্রেমচন্দ গল্প সংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা,অনুবাদ : ননী শূর,আকাদেমি প্রথম প্রকাশ ২০ মে১৯৮৮

৫. প্রেমেন্দ্র মিত্র, নির্বাচিতা, এম সি . সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৫

৬. বুদ্ধদেব গুহ, বুদ্ধদেব গুহ-র শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবিলিশিং, কলকাতা, জুন ১৯৮৭

৭. মণীন্দ্রলাল বসু, নির্বাচিত রচনা সমগ্র,এম.সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড,১৩৯৫

৮. মতি নন্দী, একসঙ্গে, অখণ্ড গল্পসংগ্রহ, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, ১ জুায়ারি, ২০০১

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,গল্পগুচ্ছ, অখণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা,বৈশাখ ১৩৯৭

১০. রঞ্জনকুমার দাস সম্পাদিত, শনিবারের চিঠি, নাথ ব্রাদার্স,প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪, ষষ্ঠ মুদ্রণ অক্টোবর ২০০২

১১. শঙ্কু মহারাজ, বিগলিত-করুণা-জাহ্নবী-যমুনা,মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা,প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৮, উনবিংশ মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৫

১২. সতীনাথ ভাদুড়ী, সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ গল্প, বারিদবরণ দাস সম্পাদিত, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪০২

১৩. সুবোধ ঘোষ, সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প, জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১২

১৪. সুবোধকুমার চক্রবর্তী, রম্যাণি বীক্ষ্য,এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা. লি. কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৮২, পঞ্চম সংস্করণ বৈশাখ, ১৪০২

তিন
সহায়ক গ্রন্থ (Reference)

১. অচ্যুতানন্দ, ভারতের তীর্থে তীর্থে, দেব সাহিত্য কুটীর, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি ২০০৫

২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ' প্রথম প্রকাশ ১৩৫৭, পৃ.৩৭

৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬

৪. অলোক রায়, সম্পাদিত, সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯১

৫. অপূর্ব কুমার রায়, শৈলীবিজ্ঞান মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৮৯

৬. আতোয়ার রহমান, সাহিত্য ও বিবিধ ভাবনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১

৭. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩, মাঘ ১৪০৯

৮. উত্তম দাশ, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা, বারুইপুর, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৮৬

৯. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, দে'জ,কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩,

১০. কল্যাণ মীরবরঃ বাংলাদেশের উপন্যাস, চার দশক,পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৩৯৯

১১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, বাংলা কথাসাহিত্য : প্রকরণ ও প্রবণতা, পুস্তক বিপণি,কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, ১৯৯১

১২. গোপাল হালদার, বাংলাসাহিত্যের আদিযুগ : প্রথম পর্ব, জিজ্ঞাসা,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩ ডিসেম্বর১৯৮৬

১৩. জগমোহন মুখোপাধ্যায়, গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯২

১৪. জয়ন্তকুমার ঘোষাল, বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা, পুস্তকবিপণি, কলকাতা,প্রথম জানুয়ারি ১৯৯২

১৫. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, উপন্যাস : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গ-ভারতীর ঝাঁপি, সাহিত্যলোক, অক্টোবর ১৯৮৬

১৬. তপোধীর ভট্টাচার্য, আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭

১৭. তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের প্রতিবেদন, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৯,

১৮. দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, সাহিত্যের আকাশ,পুথিপত্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৮১

১৯. দেবেশ আচার্য্য, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৮ অগাস্ট ২০১০, ভাদ্র ১৪১৭,পৃ.৭৬৪-৭৬৫

২০. দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩

২১. নগেন্দ্রনাথ সাহা, জীবন বিপর্যয় ও বাংলা উপন্যাস, দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী প্রা.লি. অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, নভেম্বর ১৯৯২,

২২. নীরদচন্দ্র চৌধুরী, 'বাঙালী জীবনে রমণী', মিত্র ও ঘোষ,কলকাতা,

২৩. নিত্যপ্রিয় ঘোষ: শুকনো পাতা মলিন কুসুম, প্যাপিরাস,কলকাতা, ১৩৯৯

২৪ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, জানুয়ারি ২০০৭

২৫. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'আধুনিক ভারত' ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, স্ট্যাটুটরি কমিশনের রিপোর্ট, ৪র্থ খণ্ড, ১ম অংশ, পৃ.১০৬

২৬. প্রদীপন দাশগুপ্ত: উত্তর আধুনিত ভাবনা ও অন্যান্য, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, জানুয়ারি ২০০৬

২৭. বনানী চক্রবর্তী: বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের রূপ ও রূপান্তর, রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারী, ২০১৩

২৮. বিমলকুমার মুখোপাাধ্যায়, সাহিত্যের মানচিত্র : দ্বীপ থেকে মহাদেশ

২৯. বিজিতকুমার দত্ত: বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশিং, মাঘ ১৪০২

৩০. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা', প্রথম প্রকাশ.১৩৪৬, পৃ.৭৬, ৮০, ৭২

৩১. ভাস্বতী সমাদ্দার, বাংলা উপন্যাসে পালাবদল (১৯৬৬-১৯৭৮)পুস্তকবিপণি,কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪

৩২. ভূদেব চৌধুরী,বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ প্রকাশ,১৯৮৯

৩৩. মহাশ্বেতা দেবী, তুতুল, স্বর্ণাক্ষর, তৃতীয় মুদ্রণ,২০১৫

৩৪. মালিনী ভট্টাচার্য, নির্মাণের সামাজিকতা ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং নভেম্বর ১৯৯৬

৩৫. যোগীলাল হালদার, বাংলা সাহিত্যে অতীন্দ্রিয়বাদের ভূমিকা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৭৮, ১০ মে, ১৯৭১,

৩৬. রফিক আহমেদ, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা,মুদ্রণভারতী প্রা. লি. ঢাকা, বাংলা একাডেমী,জানুয়ারি ১৯৯৩,

৩৭. রাসসুন্দরী দাসী,আমার জীবন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট,দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১

৩৮. শঙ্খ ঘোষ, শব্দ আর সত্য, প্যাপিরাস, নভেম্বর ১৯৮৭

৩৯. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯৬

৪০. শ্রীশচন্দ্র দাস, সাহিত্য সন্দর্শন, বামা পুস্তকালয়, এপ্রিল ১৯৯৬

৪১. শীতল চৌধুরী, সম্পাদনা, বাংলা উপন্যাসের নানা কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩

৪২. শামসুল হক, বাংলা সাময়িক-পত্র ১৯৭২-১৯৮১ বাংলা একাডেমী : ঢাকা

৪৩. ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রচণ্ডীমঠের ভৈরব, দীপ প্রকাশন,কলকাতা,২০১০

৪৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৫

৪৫. সঞ্জীবকুমার বসু, সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি',সুচিত্রা সেনচন্দ্রঃ সময়ের দর্পণঃ মাঘ-চৈত্র সংখ্যা, ১৩৯৮

৪৬. সত্রাজিৎ গোস্বামী, ছিন্নপত্রাবলী ও রবীন্দ্রনাথ : ছিন্ন পত্রাবলীর পটভূমি ও জমিদার রবীন্দ্রনাথ, জয়দুর্গা লাইব্রেরী,দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬

৪৭. সুধীর চক্রবর্তী, সম্পাদনা, বুদ্ধিজীবীর নোটবই, পুস্তক বিপণি,প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৫

৪৮. সুমিতা চক্রবর্তী, উপন্যাসের বর্ণমালা, প্রথম প্রকাশ আগষ্ট, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন

৪৯. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৫, কলকাতা, দে'জ

৫০. সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র, জি.এ.ই. পালিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০,

৫১. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রথম এ মুখার্জী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা, ডিসেম্বর, ১৯৮৭

চার

পত্রপত্রিকা (Magazine and journals)

১. এবং এই সময়, (বাখতিন বিশেষ সংখ্যা) পত্রিকা : অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২. উজাগর, একাদশ বর্ষ, ১৪২০, রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা, সম্পাদক উত্তম পুরকাইত, কলকাতা, পৃষ্ঠাঃ ৩১-৩২

৩. কথাসাহিত্য, পঞ্চদশ বর্ষ, দশম সংখ্যা-শ্রাবণ, ১৩৭১,ভোরের গোধূলি, পৃ. ১২০৫-১২১১)
৪. কথাসাহিত্য, ৬১ বর্ষ, বইমেলা সংখ্যা, মাঘ ১৪১৬, অবধূত শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে, শতবর্ষের আলোকে অবধূতের 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' নামে সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়
৫. দীপ্রকলম, দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, এপ্রিল ২০১০ (শতবর্ষের আলোয় অবধূত)
৬. প্রসাদ পত্রিকা, সত্যের খোজে, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, এপ্রিল ২০০৯
৭. জাগরণ, (সাহিত্য পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ উৎসব সংখ্যা ১৪০৯)
৮. জাগরণ, (সাহিত্য পত্রিকা ৫ম বর্ষ উৎসব সংখ্যা ১৪১০)
৯. নবকল্লোল, অশ্বিন, ১৩৭০
১০. সঞ্জীবকুমার বসু, সম্পাদিত 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', সুচিত্রা সেনচন্দ্রঃ সময়ের দর্পণঃ মাঘ -চৈত্র সংখ্যা, ১৩৯৮

পাঁচ
বাংলা ভাষার অভিধান (Bengali Dictionary)

১. অশোক মুখোপাধ্যায়, সংসদ সমার্থশব্দকোষ, সাহিত্য সংসদসংশোধিত সপ্তম মুদ্রণঃ জানুয়ারি ১৯৯৬
২. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আকাদেমি বানান অভিধান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (ভারত), ২০০৯
৩. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, প্রথম ভাগ (অ-ধ), দ্বিতীয় ভাগ-(ন-হ) সাহিত্য সংসদ কলিকাতা,দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ-আগষ্ট ১৯৮৮
৪. রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, সম্পাদনা, নতুন সংস্করণ সংসদ বাংলা অভিধান, ২০০৯
৫. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ৭ম মুদ্রণ ২০০৮ পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০১১
৬. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বঙ্গসাহিত্যাভিধান মুদ্রণ : ফার্মা কে এল এম প্রা.লি.

ছয়
বাাংলা বিশ্বকোষ (Bengali Encyclopaedia)

১. খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম, বাংলা বিশ্বকোষ (১-৪ খণ্ড), মুক্তধারা, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর, ১৯৭৫, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১, বাংলাদেশ

সাত

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থ (English Reference)

১. Edited by Devid Lodge : Modern Criticism and Theory
২. Edward Albert: History of English Literature
৩. E.M. Forster, Aspects of Novel,Edward, Arnold and Co.London,1927
৪. George Watson, Choosing a theme Writing a Thesis, Ch.- V, p.24
৫. Jonathan Culler: Literary Theory A Very Short Introduction, Oxford University press Second impression : 2007
৬. M.A.R. Habib: A History of Literary Criticism And Theory Wiley Blackwell Oxford, 2003
৭. M.H. Abrams | & Geoffery Galt Harpham: A Glossary of Literary Terms.Cengage Learning10th edition
৮. M.H Abrams: Naturaral Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature, 1971, Chapters 3-5
৯. Maugham,W.S.The Points of View, London,1958, p.147
১০. Richard Freedom: The Novel, Newsweek Books, New York
১১. S. Dinan Neill: A Short History of English Novel
১২. W. H. Hudson: An Introduction to the study of Literature', 3rd Indian Edition, 2004
১৩. W. J. Harvey: Character and the Novel- 1965, pp 69

আট

দ্বিভাষিক এবং ত্রৈভাষিক পত্র-পত্রিকা (Bilingual and Trilingual journals)

১. Heritage, An Academic Journal Bethune College, August-2014, Volume-1, ISSN No. 2349-9583
২. INTELLIGENTSIA, A Journal of Multi Disciplinary Studies, An Academic Journal of Humanities and Science, Bidhannagar College, 2016.
৩. VICTORIAN JOURNAL OF ARTS, International Seminar Special issue, Volume IX No. III, Acharya Brojendranath Seal College, Cooch Behar, Nov. 2016 Edited by Subrata Roychowdhury.

নয়

৯. বৈশ্বিক সূত্র (Internet Connections)

১. Merriam Webster since 1828
২. Google.com